গর্ভধারিণী

গ র্ভ ধা রি ণী

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

GARVADHARINI
A novel by Samaresh Majumder.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

টেলিফোনটা বাজছিল। মুখ তুলে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল জয়িতা। এগারোটা দশ। অবশ্যই এই ফোনটা ওর জন্যে নয়। ওর বন্ধুরা কেউ এই সময়ে ফোন করবে না। যদি কোনও বিপদ আপদ হয় তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু বিপদ আপদের আশু সম্ভাবনা তো ছিল না। অতএব এই ফোনটি সীতা রায়ের। যদিও সীতা রায় এখনও বাড়িতে নেই, কখন ফিরবেন তাঁরাই জানেন না এবং তার ওপর আজ যখন শনিবারের রাত তখন ওই টেলিফোন নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনও মানে হয় না। অবশ্য করাত চালানোর মত শব্দটা বেজে যাচ্ছে। যে করছে তার ধৈর্য আছে। না ধরিয়ে ছাড়বে না।

এই বাড়িতে দুটো কাজের লোক আছে। একজন দৈনিক আর একজনের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে আছে। কাজকর্ম ঠিকঠাক করে কিন্তু কানে শুনতে পায় না। সীতা রায়ের অবশ্য শ্রীহরিকে ওই কারণেই পছন্দ। বাড়ির কথা বাড়ির বাইরে যাবে না। কিন্তু মুশকিলটা হল টেলিফোনের আওয়াজটা শ্রীহরিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। খানিক আগে ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়ে তিনি চলে গেছেন নিজের ঘরে। অতএব উঠতে হল জয়িতাকে। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্পোর্টস গেঞ্জি আর জিনসের টাইট প্যান্টে ওকে আরও রোগা দেখায় কিন্তু শাড়িটারির চেয়ে এই পোশাকই ভাল লাগে জয়িতার।

রিসিভারটা অত্যন্ত অযত্নে কানে তুলে জয়িতা বলল, 'হ্যালো!'

একটু থিতনো ওপাশে, তারপর হাসির মাড় লাগানো কড়কড়ে শব্দ বাজল, 'উঃ কি ঘুম বাবা, এগারোটা বাজতে না বাজতেই যদি প্রেসিডেন্সির মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে কি করে চলবে! রিসিভার ধরে আমার হাতব্যথা হয়ে গেল।'

জয়িতার চোখ ছোট হল। সে কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'ঠিক কত নম্বর চাইছেন?'

'আঃ কাম অন বেবি! তুমি তো জয়িতা, রামানন্দের মেয়ে?'

'হ্যাঁ। তাই বলা হয়ে থাকে আমাকে।'

'বলা হয়ে থাকে?' হাসির তুবড়ি আকাশ ছুঁল এবার, 'সাবাস! শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব স্মার্ট, শাড়ি ব্লাউজ পরো না, বাট আই হ্যাভ নেবার সিন ইউ অ্যারাউন্ড! রামানন্দ একটু আগে বলছিল তুমি খুব রোগা, খুব?'

জয়িতা বাঁ দিকে তাকাল। সেখানে বেলজিয়ামের আয়নায় তাকে দেখা যাচ্ছে। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির একটা দাঁড়ি। নো বাঁক, মাংসের বাড়তি চমক কোথাও নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তার কোনও রোগ নেই। ভাল হজম হয়, চমৎকার ঘুম হয়, এবং মেয়ে বলেই সারামাসের চারদিনের যন্ত্রণাটা নিয়ম মেনেই ঘটে যায়। সে প্রেসিডেন্সিতে শতকরা চুরাশি নম্বর পেয়ে ঢুকেছিল। তার কোনও শারীরিক অসুবিধে নেই। অথচ এই মহিলা মাঝরাতে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন সে খুব রোগা কিনা! হু ইজ সী?

প্রশ্নটা করা মাত্রই মহিলা জবাব দিলেন না। বললেন, 'আসলে ব্যাপার কি জানো, আমার মনে হল তুমি এখন একা আছ। আমি জানি একজন কবিরাজকে। তার ওষুধ খেয়ে অনেকেই মোটা হয়েছে। মেয়েদের মোটা না হলে ভাল দেখায়, বল?'

'আর ইউ ড্রাঙ্ক?'

'ওমা, আমার কথা শুনে তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি! না ভাই, আমি ড্রিঙ্ক করি না, তবে খেতে চাইলে খাওয়াই। আসলে তোমার ওপর আমার স্নেহ, আই মিন, এক ধরনের অ্যাটাচমেন্ট এসে গেছে বলতে পার। জয়িতা, তোমাকে আরও বড় হতে হবে। আরও বড়। মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। তুমি জে. ই. দিলে না কেন?'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল। ইটস ইনটলারেবল! সে শীতল গলায় প্রশ্ন করল, 'লুক, আমি আপনাকে চিনি না জানি না। আপনার কাছে অনাবশ্যক উপদেশ শুনতে আমি রাজি নই। এবং এখন রাত অনেক হয়েছে।'

'রাত কত হলে তোমার বাবা বাড়িতে ফেরেন জয়িতা?'

'আই ডোন্ট নো। আই অ্যাম নট কনসারন্ড।'

'তাই তো এই ফোন। তোমাকে আমার খু-উ-ব নেগলেকটেড চাইল্ড বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে। তোমার বাবার চেয়েও বড় হতে হবে। তুমি কি এখন পড়াশুনা করছিলে জয়িতা?'

'কিন্তু আমি জানতে চাই আপনি কে?'

'দ্যাখো, কোন কোন সম্পর্ক জন্ম থেকেই তৈরি হয়, কোনটা পরে আসে। আমি তোমার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পর্কিত। এখন আমি তোমাকে নিজের মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। তোমার সম্পর্কে আমার মাদারলি ফিলিংস এসে গেছে।'

'কিন্তু কেন? কি জন্যে? আমাকে কি আপনি দেখেছেন?'

'নো। তবে শুনেছি তোমার কথা। আর এখন তো আমার সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। তোমার কোন প্রব্লেম থাকলে আমাকে বলতে পার।'

'আপনি এখনও পরিচয় দিচ্ছেন না! যদিও আপনাকে আমার ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। অ্যাট লিস্ট আপনার গলার স্বর খুব ভাল। সম্পর্কটা কি?'

'মায়ের সঙ্গে মেয়ের যা সম্পর্ক। ইন ফ্যাক্ট আমি সীতার চেয়ে ভাল মা হব।'

'মা! ভগবান। আপনার কি মাথা খারাপ! আমার বাবা এখনও ডিভোর্সী নন এবং কখনও হবেন কিনা সন্দেহ আছে। আর ইউ ম্যাড?'

'নট অ্যাট অল। তাহলে তোমাকে বলি। আমি আর রামানন্দ শ্লেপ্ট টুগেদার। একটু আগে ও উঠে গেছে আমার বিছানা থেকে। আমি এসব কথা তোমাকে বলতে চাইনি কিন্তু তুমি বাধ্য করলে। ওর জামায় আমি একটা দাগ রেখে দিয়েছি ফর ইওর ইনফর্মেশন। এখন ব্যাপারটা হল, আমি ব্যাপারটাকে কেবল আনন্দ উপভোগ হিসেবে দেখেছি না। ওর সব কিছু আমাকে ইন্সপায়ার্ড করেছে। তা থেকেই তোমার সম্পর্কে আমার মাদারলি ফিলিংস এসেছে, বুঝতে পেরেছ?' কথাগুলো শেষ করে আবার সেই কড়কড়ে হাসি জুড়লেন মহিলা।

'ডিসগাস্টিং!' চিৎকার করে উঠল জয়িতা, 'যতক্ষণ আপনি আপনার নাম না বলছেন ততক্ষণই আমার—! ওয়েল, এসব কথা আমাকে বলে কোনও লাভ নেই!'

'আমি মিসেস দত্ত। ঐন্দ্রিলা দত্ত। গুড নাইট।'

লাইনটা কেটে গেল। এখন রিসিভারে আবার ডায়াল টোন ফিরে এসেছে। একটানা শব্দটা যে কানে বাজছে প্রথমে খেয়াল করেনি জয়িতা। সে নিজের অজান্তেই ঠোঁট কামড়াল। তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে এল।

ঐন্দ্রিলা দত্ত। এই নাম সে জীবনে শোনেনি। হয়তো বাবার লেটেস্ট। কিন্তু মহিলা যেই হোন না কেন কথা বলতে জানেন। লেটেস্ট কায়দায় ব্ল্যাকমেল করা। অথচ ব্ল্যাকমেল বলে আপাত মনে হবে না। চেয়ারে বসে দুটো পা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল সে। মাঝারি দামের সিগারেট। বেশ কড়া। বছর দুয়েক হল সে সিগারেট খাচ্ছে। ওর বন্ধুরাও এই সিগারেটই পছন্দ করে। অবশ্য আনন্দ সিগারেট খায় না। কোনও নেশাটেশার মধ্যে নেই। রিয়েল সিরিয়াস গাই। নরেন্দ্রপুরের ছেলেদের মধ্যে একটা গুডি গুডি ভাব থাকে। আনন্দটা সেটাকে ভিত্তি করে আরও এগিয়েছে। সব কিছু খুব সিরিয়াসলি ভাবে। কিন্তু বোর করে না। সুদীপ বা কল্যাণ ঠিক আছে। সুদীপটা ক্যালকাটা বয়েস থেকে বেরিয়েছে। বড্ড বেশি কথা বলে। কয়েকবার পাউডার অ্যাটেম্পট্ করে বলেছে, কেন যে ওরা এসব খায় ধ্যুৎ! অনেস্ট কনফেশন। ওকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি জয়িতার। মুশকিলটা কল্যাণকে নিয়ে। ও পড়তো স্কটিশ স্কুলে। একদম মধ্যবিত্ত বলে যারা নিজেদের সান্ত্বনা দেয় তাদের একটা পরিবার থেকে। আনন্দও মধ্যবিত্ত কিন্তু কল্যাণের মত উল্টোপাল্টা মানসিকতার ছেলে নয়। কল্যাণ কোনও ব্যাপারে দারুণ স্মার্ট কথা বলল, আবার পরক্ষণেই এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক ধারণা আঁকড়ে ধরল যে ওকে খুব বিরক্তিকর বলে মনে হয় তখন। কিন্তু সব মিলিয়ে এই তিনজনেই জয়িতার বন্ধু। আনন্দ হোস্টেলে থাকে। কল্যাণের বাড়িতে ফোন নেই। সুদীপের আছে। কিন্তু এখন সুদীপ বোধ হয় বাড়িতে

ফেরেনি। ওদের দমদমে যাওয়ার কথা সন্ধ্যে সাতটায়। আনন্দ আর সুদীপের। পার্টির ডিসিশন জানতে যাবে ওরা।

তবু জয়িতার মনে হল সুদীপকে একটা ফোন করলে হয়। যতই সে ব্যাপারটার গুরুত্ব না দিক, মনের মধ্যে নোংরা লাগার মত একটা অনুভূতি পাক খাচ্ছে। মহিলা স্পষ্ট বললেন আমি তোমার বাবার সঙ্গে ঘুমিয়েছি! এরকম কেউ বলতে পারে? অবশ্য সেটা যদি সত্যিই হয় তাহলে এখন জয়িতার কিছুই আসে যায় না। পুরো ব্যাপারটা সীতা রায়ের। রামানন্দ রায় এবং সীতা রায়ের। জন্মসূত্রে ওরা অবশ্য বাবা-মা। পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক। রামানন্দ রায়ের বয়স পঞ্চাশ। হ্যান্ডসাম, স্টিল হ্যান্ডসাম, টল, চুলে কলপ দেন প্রতি রবিবার, মুখে ভাঁজ পড়েনি। ড্রিংকসের জন্যে চোখের তলায় সামান্য ব্যাগ তৈরি হয়েছে এবং পেটে ঈষৎ চর্বি। তবে স্মার্টনেসের জন্যে সেগুলো তেমন নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পান। দাঁত তুলতে রাজি নন। সেই সময় ওয়াটারলু স্ট্রিটের বারীন রায় ওর ভগবান।

রামানন্দ রায় চাকরি করতেন মাঝারি ফার্মে। খুব ছেলেবেলায় জয়িতা নিজেদের দেখেছে শোভাবাজারের বারোয়ারি বাড়িতে। তারপর ভবানীপুরে, এখন বালিগঞ্জ পার্ক রোডের ছয়তলার বারোশ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। এর ফাঁকে রামানন্দ রায় তিনটে চাকরি ছেড়েছেন এবং এখন যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে পৌঁছনোর জন্যে কলকাতার এলিট সম্প্রদায় সমানে দৌড়ে যাচ্ছে। ইদানীং বাবার সঙ্গে খুব কম দেখা হয় জয়িতার। রবিবারের সকালে সাঁতার কেটে ফিরে এসে মিনিট দশেক হয়তো বা। পড়াশুনোর খবর নিতেন আগে। এখন নেন না। সামনে বসে দু'একটা বই তুলে পাতা ওলটান। জয়িতার মনে হয় ওই সময় রামানন্দ রায়ের মনে এক ধরনের পাপবোধ কাজ করে। নাহলে বারংবার জিজ্ঞাসা করতেন না, 'এভরিথিং অল রাইট?' প্রশ্নটা মুদ্রাদোষের পর্যায়ে চলে গেছে।

সীতা রায় অবশ্য এসবের ধার ধারেন না। তিনি ঘুম থেকে ওঠেন বেলায়। উঠে লেবু চা খান। ততক্ষণে মাসাজ করার মেয়েটা এসে যায়। আগে দরজা বন্ধ থাকত, এখন খোলাই থাকে। শরীরের সর্বত্র দলাই-মালাই করে মেয়েটা মাসে আটশো টাকা পায়। তারপর একটা স্যুপ গোছের কিছু খেয়ে সীতা রায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে। ওখানে শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া, মেদবৃদ্ধি রোধের বিলিব্যবস্থা করে দেয় একটা নামকরা প্রতিষ্ঠান। সীতা রায় সেখান থেকে ফেরেন দুটো নাগাদ। তখন তাঁর খাদ্য বয়েলড ভেলিটেবল, ডিম এবং চর্বি ছাড়া সেদ্ধ মাংস। অবশ্য এর মধ্যে একবার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন নিয়ম করে। জয়িতা তখন হয়তো স্নান সেরে তৈরি হচ্ছে কলেজে যাওয়ার জন্যে, সীতা রায় ঘরে ঢুকে কাঁধ নাচাবেন, 'ও ঈশ্বর! এটা ভদ্রলোকের ঘর না ডাস্টবিন? একটু কেয়ার নিতে পার না কেন? কোনও মানুষ এত অগোছালো থাকতে পারে ভাবতে পারি না। তুমি যে কি করে আমার পেটে এসেছিলে তাই ভেবে পাই না।'

ঠাণ্ডা গলায় জয়িতা জবাব দেয়, 'বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পার।'

'ননসেন্স। তোমার কথাবার্তা খুব রাফ হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।'

'কেন?'

'হোয়াট উইল বি ইওর ফিউচার! অনেক মেয়ের চেহারা ভাল থাকে না কিন্তু একটা চেষ্টা থাকে সেটাকে ভাল দেখানোর। ইনফ্যাক্ট তোমার বয়সে সাজগোজ করলে যে কোনও ছেলে ইনভলভ্‌ড হতে বাধ্য! তোমাকে এতবার বলছি ক্লাবে এসো, পার্টিগুলো অ্যাটেন্ড করো, দেয়ার আর লট অব ফ্রেশ বয়েস—একবার বিয়ে হয়ে গেলে নো প্রব্লেম। অথচ তুমি কোনও কথাই শুনতে চাও না। এই সেদিন চোপরা বলছিল, মিসেস রায়, আপনি যখন এমন সুন্দরী তখন আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই অসামান্য রূপসী হবে। আমি আর কি বলব, ঢোক গিললাম।' সীতা রায়ের শরীরে এখন হালকা সবুজ হাউস কোট।

'কি করব বল, আমার চেহারার ওপর তো আমার হাত নেই।'

'সেকথা আমি বলিনি। আমি যখন শোভাবাজারে থাকতাম তখন কি চেহারা ছিল আমার? এখন আমার দিকে তাকালে কোনও ছেলে চোখ ফেরাতে পারে না। আমি তৈরি করেছি এইটে, ঈশ্বর দেয়নি! তুমি পড়াশুনায় ভাল তার মানে এই নয় ছেলেরা তোমার জন্যে ছুটে আসবে।'

'মা, ছেলেদের ব্যাপারে আমার কোনও আকর্ষণ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, পড়াশুনা করতেও

আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছে না।'

'তার মানে? তুমি কি করতে চাও?'

'সেইটেই ভাবছি। যখন করব তখন জানতে পারবে। শুধু আপাতত আমায় নিয়ে তোমরা ভেব না। রোজ রোজ এক কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। ফোন বাজছে, মনে হচ্ছে তোমার ফোন!' জয়িতা কথা শেষ করামাত্র সীতা রায় ঘড়ি দেখলেন। তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন টেলিফোন ধরতে। জয়িতা মায়ের দিকে তাকাল। শী ইজ অ্যারাউন্ড ফরটি টু। শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোর কৃতিত্ব আছে বটে। যৌবন শরীরের ফুলদানিতে চমৎকার সাজিয়ে রাখে। ইদানীং মা চুল ইস্ত্রি করাচ্ছে। আগে কাঁধ অবধি নামিয়েছিল। এখন সেটা কোমরে। ইস্ত্রিটা বাড়িতেই করা হয়। চওড়া টেবিলের ওপর কম্বল বিছিয়ে মা মোড়া নিয়ে পাশে বসে চুলগুলো ছড়িয়ে দেয় কম্বলে। সেগুলোকে টান টান করে বিছিয়ে তার ওপর সার্টিনের কাপড় ঢেকে কন্ট্রোলড টেম্পারেচারে ইস্ত্রি চালানো হয় ওপর থেকে ডগা পর্যন্ত। জয়িতা মাঝে মাঝেই ভেবেছে ইস্ত্রিটা যদি মাথায় ঠেকে যেত তাহলে কি রকম হত ব্যাপারটা! কিন্তু কখনই সেটা হয়নি। যে মেয়েটি এই কাজটি করে তার পটুত্ব অসাধারণ। এর ফলে পালিশ করা চুল কোমর অবধি নিয়ে মা যখন সন্ধ্যেবেলায় বের হয় তখন সেখান থেকে একটা জেল্লা ছিটকোয়। মায়ের গায়ের রঙ আগে বেশ চাপা ছিল। কী মন্ত্রে যে সেটা গমের মত হল কে জানে! সরু কোমরের অনেকটা খোলা থাকায় সেটা মুক্ত হাতের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায়। সীতা রায় লম্বা।

জয়িতা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই মাকে দেখতে পেল। রিভলভিং চেয়ারে বসে মা কথা বলছে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে। অন্যের এই রকম বাক্যালাপ শোনা উচিত নয় কিন্তু সীতা রায়ের ভঙ্গি দেখে জয়িতা চলে আসতে পারল না। ষোলো বছরের নেকি খুকির মত ভঙ্গি করছে সীতা রায়, 'ওঃ নো। য়ু আর রিয়েল নটি। কত বয়স হল জানো? এখন কি সে ফিগার আছে? বেশ, দেখি তুমিই বল। মাপার জন্যে গায়ে হাত দিতে হয় না, পুরুষদের চোখ জহুরীর মত। উঁহু হল না। আই অ্যাম থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সেভেন। দ্যাখো না ভাই, টোয়েন্টি ফাইভটাকে কিছুতেই টোয়েন্টি থ্রি করতে পারছি না। ইউ লাইক ইট! নটি বয়! না বাবা, আমি আর একটু কমাতে চাই। চোপরার কথা বলো না। লোকটার কোনও টেস্ট নেই। মিসেস গুপ্তার কোমর থার্টি টু-র নিচে হবে না। তার সঙ্গে তুই নাচছিস! খবরদার, তোমাকে যেন ওই ধুমসিটার সঙ্গে না দেখি। ইউ নো, আমি খুব অহঙ্কারী। গুপ্তার মত ইজিলি অ্যাভেলেবল নই। রামানন্দ আছে, ভালই আছে। হু কেয়ার্স। এক কালে শুনতাম টিন এজার্সদের নিয়ে ঘুরত, এখন দত্ত মেয়েটা কোত্থেকে আমদানি হয়েছে! তাই? ওর স্বামীর শুনেছি বিরাট এক্সপোর্টের কারবার। মেয়েটা সান্যালের? তোমাদের এই রোমিও সান্যাল বেশ আছে। বিয়েথা করেনি, একে ওকে বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে! না বাবা, আমার কাছে ঘেঁষতে এসেছিল। বাট আই ডোন্ট লাইক আনম্যারেড গাইস। প্যানপেনে প্রেমের রিস্কে নেই আমি। এই বয়সে বিয়ে-থা করতে বলবে—ওরে বাব্বা! বয়স বলব না? ঠিক আছে বাবা, দুধ তো শিশুদের জন্যে কিন্তু ক্ষীর ডিলিসিয়াস—সকলের সহ্য হয় না! হি হি হি। সন্ধ্যেয় ক্লাবে এসো। কোথাও হারিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, প্রমিস।' সীতা রায়কে রিসিভার নামিয়ে রাখতে দেখেও দরজা ছেড়ে নড়ল না জয়িতা। উৎফুল্ল সীতা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মেয়ের দিকে নজর পড়তেই বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

জয়িতা সেই একই ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাকে দেখছিলাম।'

কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, 'এমন বিরক্ত করে না এরা, সুন্দরী হবার এই জ্বালা! চিতায় উঠেও প্রশংসা শুনতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, তোমার টাকার দরকার?'

'না।'

'সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নেবাল জয়িতা। আজকাল সে সীতা রায়ের সামনেই সিগারেট খায়। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ লাগত। বিদ্রোহ করার ভঙ্গিতে সেটা শুরু করেছিল। কোনও প্রতিবাদ না আসায় এখন অভ্যাসে এসে গেছে। শুধু রামানন্দ রায় এক কার্টন নিজের সিগারেট মেয়ের টেবিলে রেখে বলেছিলেন, 'সিগারেট খেতে হলে এইটে খেও। সস্তা সিগারেটে শরীরের ক্ষতি হয়।'

জয়িতা দুটো প্যাকেট পাশাপাশি রেখে বলেছিল, 'আমারটায় লেখা আছে সিগারেট স্মোকিং ইজ

ইনজুরিয়াস টু হেলথ আর তোমারটায় সার্জেন জেনারেল উপদেশ দিয়েছেন। একই ব্যাপার। আমার এইটেই ভাল লাগে।'

'তুমি কি আমার কোনও কিছু গ্রহণ করবে না বলে ঠিক করেছ?'

'তুমি কি দিচ্ছ তার ওপর আমার গ্রহণ করা নির্ভর করছে, তাই না বাবা?'

'তুমি ইদানীং খুব অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ জয়ী। আই ডোন্ট লাইক দিস্।'

'ডু ইউ?'

রামানন্দ রায় সিগারেটের কার্টন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'যা ইচ্ছে তাই কর। আই নো ইউ আর টেকিং অ্যাডভানটেজ।'

আজ রাত্রে কথাটা নতুন করে মনে পড়ল জয়িতার। ওরা বলে এটা ফাস্ট লাইফ। এই জীবনযাপন করতে না পারলে ওদের সমাজে অচল হয়ে যেতে হবে। কে কতটা আধুনিক হতে পারছে তার প্রমাণ দিতে হবে কে কতটা নিচে নামতে পারছে তার মধ্যে দিয়ে। জয়িতা নিজেও জানে না সে কেন এ জীবনটাকে গ্রহণ করতে পারল না। সত্যি বলতে কি, এই বালিগঞ্জ পার্ক রোডের বনেদী বস্তিতে তার বয়েসী অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা সন্ধ্যের পর যে বল্গাহীন স্বাধীনতা পায় তা চুটিয়ে ভোগ করে। ঠিক তাদের নিচের ফ্ল্যাটেই জুনরা থাকে। বাবা মা বেরিয়ে যাওয়ার পর ওর বন্ধুরা এসে জড়ো হয়। পাউডার সিগারেটে পুরে বুকভর বাতাস নেয়। ঝিমুনি আসা মিউজিক বাজে। জুন নিজে বলেছে ও সারা মাস ট্যাবলেট খায়, কারণ কখন কি যে হয়ে যায়, কে রিস্ক নেবে! ইটস্ অল ইন দ্য গেম। জুনের বয়স মাত্র পনেরো। অথচ ওখানে যাওয়ার প্রবৃত্তিটাই কখনও এল না। আনন্দ কিংবা কল্যাণের এই প্রশ্ন ওঠে না, সুদীপটা ইচ্ছে করলে এই জীবনটা নিতে পারত, কিন্তু সুদীপ স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, 'আই হেট দেম। বিশ্বাস কর আমি ওদের মলমূত্রের চেয়ে বেশি ঘেন্না করি।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে আছিস কেন ওদের সঙ্গে?'

'প্রিটেনশন। নিজেকে ভুলিয়ে রাখা। আফটার অল দু'বেলা ভাল-মন্দ খেতে পাচ্ছি। আমার মধ্যে যে সুবিধেবাদী শয়তানটা আছে সেইটের জন্যে রয়ে গেছি।'

সুদীপ যে কথাগুলো স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করতে পারে জয়িতা তা পারে না। বস্তুত বন্ধুদের কাছে সে বাড়ির আবহাওয়ার কথা কখনও উচ্চারণ করেনি। ওরা তাকে কখনই মেয়ে বলে মনে করে না, আলাদা খাতির দেখায় না, সুদীপ তো অনেক ছেলেলি স্ল্যাং বলে যায় অনায়াসে এবং সে নিজেও ওদের ছেলে বলে সংকুচিত থাকে না। ঠিক চারটে অস্তিত্ব একাকার হয়ে যাওয়া আর কি। ব্যাপারটা কলেজের অন্য মেয়েদের চোখে করকরে ঠেকে। মেয়েদের এই অতিরিক্ত মেয়েলিপনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না জয়িতা। নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মেয়েগুলো তাদের সব রকম কনজারভেটিভ ধারণা বুকে পুষে রেখে এমন ভাবভঙ্গি করে যেন পৃথিবীর সব ছেলেই তাদের দিকে হামলে পড়ছে। হাসি পায় জয়িতার। এরা কেউ সীতা রায় নয়। লাবণ্যের মত অমিত রায়ের সঙ্গে কাঁপা কাঁপা সংলাপ বলার জন্যেই মনে মনে রিহার্সাল দেয় সব সময়। জীবনের কোন সমস্যা, দেশের মানুষের কথা ভাবতে ওদের বয়েই গেছে। একটি মনের মত স্বামী পাওয়ার জন্যে মেয়েদের কেন বড় হতে হবে?

অর্থাৎ এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, কোনটাই জয়িতার ধাতের সঙ্গে মেলে না। আর মুশকিলটা এখানেই। এই মহিলা, কি নাম যেন, ঐন্দ্রিলা দত্ত, মানে সেই এক্সপোর্ট বিজনেসের মালিকের স্ত্রী, কি স্বচ্ছন্দেই না উচ্চারণ করলেন আমি তোমার বাবার সঙ্গে শুয়েছি। এই কথা শোনার পর তার কি করা উচিত!

জয়িতা টেলিফোনের নম্বর ঘোরাল। ওপাশে রিং হচ্ছে। ঘড়িতে এখন সাড়ে এগারোটা। এই সময় টেলিফোন করার সময় নয়। ওপাশে রিসিভার উঠল, 'হ্যালো?'

স্বরে বোঝা গেল কাজের লোকজন কেউ। জয়িতা স্বস্তি পেল। সুদীপের বাবা ফোন ধরলে বড্ড খেজুরে আলাপ করেন। তুমি কেন প্যান্ট পরো, না না প্যান্ট খারাপ নয়, আসলে মেয়েদের প্যান্ট পরলে অনেক অসুবিধে, শাড়িতে তোমাকে ভালই মানাবে। সুদীপকে সে বলেনি কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে একটা টসটসে ভাব থাকে।

'সুদীপ আছে?'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আমি সুদীপের শাশুড়ী?'

নিঃশব্দে রিসিভার নামিয়ে লোকটা যেন ছুটে গেল ডাকতে ডাকতে। গলার স্বর পিছলে যাওয়াতে সেই রকম মনে হল। জয়িতার পেটের ভেতর এতক্ষণে হাসি কুলকুলিয়ে উঠল। শোনামাত্র সুদীপের মুখের অবস্থা কিরকম হবে?

'এই শালা, ইয়ার্কি মারার একটা লিমিট আছে!' সুদীপের গলায় রাগ স্পষ্ট।

'মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। আনন্দ বলেছে—।'

'জ্ঞান দিস না। এইবার কার্তিকদা বাড়িসুদ্ধু প্রচার করবে আমার একটা শাশুড়ী আছে? একেই মরছি নিজের জ্বালায়—।'

'গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলে কোনও ক্ষতি হয় না। মিটিং-এ কি হল?'

'গ্র্যান্টেড। টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছে। একজন নাকি এসে খোঁজখবর নিয়েছে আমার সম্পর্কে।'

'ওকে!'

'কেন ফোন করলি? কাল তো দেখাই হত!'

'আই অ্যাম ইন আ প্রব্লেম।'

'সেকি? তোর ওখানেও কেউ গিয়েছিল নাকি?'

'না না, এখন অতটা হিরো হইনি। প্রব্লেমটা আমার বাবাকে নিয়ে।'

'ডোন্ট বদার। গুলি মার।'

'তুই বুঝছিস না। একটু আগে একজন ভদ্রমহিলা ফোন করে আমাকে খুব জ্ঞান দিলেন। মা মা ভাব দেখালেন। কারণ আজ নাকি তিনি আমার বাবার সঙ্গে শুয়েছেন। জাস্ট ইমাজিন!'

'বয়স কত?'

'আঃ, আমি চিনি নাকি যে বয়স বলব।'

'তুই খুব ডিস্টার্বড?'

'অফকোর্স।'

'তুই একটা গাধা। যে যা করছে করুক, তোর কি?'

'আমার বাবা—।'

'তোর বাবার দায়িত্ব তোর নয়। তাছাড়া উই মে লিভ হোম এনি ডে এনি টাইম। শোন, তোর বাবা কোথায়?'

'কেন?'

'কনগ্র্যাচুলেশন জানাব। ফোনটা ওঁকে দে। বলব, চালিয়ে যান দাদা! দেশটাকে আপনারাই খোলতাই করছেন। আপনাদের সংখ্যা যত বাড়ছে তত আমরা বাড়ছি, এইটেই লাভ।'

'বি সিরিয়াস সুদীপ। আমি একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই আজ রাত্রে।'

'কি লাভ? এদেশের কম্যুনিস্টদের যেমন বিপ্লবের কথা বলে কোনও লাভ হবে না তেমনি এইসব সেক্সহান্টার্সদের বিবেক বলে কোনও বস্তুকে জাগানো যাবে না। এসব না করলে বেচারারা বেকার হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে পড়। কাল দেখা হবে। গুডনাইট।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জয়িতা। সুদীপের কথা শুনলে বোধ হয় ভাল হত। যে যা ইচ্ছে করুক, তার কি? কিন্তু মহিলার গলার স্বরটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আবার ডায়াল ঘোরাল জয়িতা।

রিং হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘুম-জড়ানো গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'মিলি আন্টি, তুমি বাড়িতে আছ? আমি জয়িতা।'

'ও। হ্যাঁরে, আমার শরীর খারাপ। অনেকদিন বের হইনি। কি ব্যাপার, এত রাত্রে?'

'আই অ্যাম সরি। আমি খুব ডিসটার্বড! আচ্ছা তুমি ঐন্দ্রিলা দত্ত বলে কাউকে চেন?'

'মাই গড! তুই ওকে চিনলি কি করে?'

'চিনেছি।'

'খবরদার ওর সঙ্গে মিশবি না। শী ইজ আ বিচ। তোর বাপ মা তো আমার সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু বুঝবে ঠ্যালা। তোর আঙ্কলের সঙ্গে ওই মেয়েটা একদিন দেখা করেছিল অফিসে গিয়ে। কি কথা হয়েছে কে জানে, আমাকে ফোন করে বলে কিনা আপনার স্বামী খুব অ্যাগ্রেসিভ, সামলানো দায়! একে ওকে এসব বলে আনন্দ পায়। অবশ্য সত্যি যে একদম থাকে না তা নয়। কেন, তোর বাবার ব্যাপারে কিছু বলেছে বুঝি?'

'কিছু না। আচ্ছা রাখছি। গুডনাইট।'

রিসিভার রেখে আর একটা সিগারেট ধরাল জয়িতা। এবার মিলি আন্টি গন্ধ খুঁজছেন। কিছু একটা ঘটনা টেনে বের করতে পারলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কলকাতায় চাউর করবেন কেচ্ছা। কিন্তু যেটুকু জানা গেল তাতে ঐন্দ্রিলা সম্পর্কে চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। আবার সুদীপের কথা মনে পড়ল। এ নিয়ে ভেবে কি লাভ! না, একমত নয় সে। উত্তরপুরুষের কাছে যদি পূর্বপুরুষ কৈফিয়ৎ চাইতে পারে তাহলে উত্তরপুরুষেরও অধিকার আছে পূর্বপুরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর। ইটস্ এনাফ। সীতা রায় স্বীকার করুক, সাহস থাকলে বলুক, আধুনিকতা বলতে তারা বোঝে মদের বোতল খোলা এবং সম্পূর্ণ না ভালবেসে, একটুও মনের কাছাকাছি না গিয়ে দেহ উপভোগ করা। সে জেগে থাকবে যতক্ষণ না ওরা ফিরে আসে।

ঘড়িতে এখন বারোটা পাঁচ। এই ফ্ল্যাটে বসে থাকলে কলকাতায় কোথায় কি হচ্ছে বোঝা অসম্ভব। যতক্ষণ না কেউ তোমার দরজার বোতামে হাত না দিচ্ছে ততক্ষণ তুমি জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। জয়িতা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। নিচে হট ট্রাক চলছে। দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজের সঙ্গে পুরুষকণ্ঠে উঁচু গলায় সুরেলা চিৎকার। অনেকটা দূর এখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে। অন্ধকারের গায়ে টুকটাক আলোর বিন্দু বসানো। এ পাড়া অর্থবানদের, এত রাত্রে তারাই জেগে থাকে যাদের কাছে ঘুম মানেই এক ধরনের মৃত্যু।

বাবা ওই ঐন্দ্রিলা দত্তের সঙ্গে ঘুমিয়েছেন—এই সংবাদে সে বিচলিত হচ্ছে কেন? উল্টোটাই 'বা ভাবছে না কেন? কেউ তো ফোন করে বলতে পারত তোমার মায়ের সঙ্গে একটু আগে ঘুমিয়ে নিলাম। কেউ বলেনি কিন্তু এমনটা যে ঘটছে না তা কে বলতে পারে! মা সেদিন কাউকে সান্যাল লোকটা সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। মজার ব্যাপার হল ওই সান্যালকে সবাই চায়। মাও। যতই ফোনে ন্যাকামি করুক মা, সান্যালের সঙ্গে মিশলে ও বিয়ে করতে চাইতে পারে, কিন্তু মা জানে সবাই জানে সান্যাল কখনই বিয়ে করবে না। যে কোন মেয়েকে সান্যাল বলে, উই আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড দ্যাটস অল! মিলি আন্টিকে একবার মাকে বলতে শুনেছিল সে। তখন মিলি আন্টির সঙ্গে এবাড়ির সম্পর্ক ভাল ছিল। রোজ বিকেলে কেচ্ছার আসর বসত। মিলি আন্টি বলেছেন, সান্যাল একটা চীজ। তোমার সঙ্গে শোবে, উপকার করবে কিন্তু সম্পর্ক চাইলে বলবে, ডোন্ট এক্সপেক্ট এনিথিং ফ্রম মি। উই আর ফ্রেন্ডস। আর মেয়েগুলোও যেমন, ওকে দেখলেই হামলে ওঠে! তোমার মেয়েটাকে সামলে রেখ। ও মা মেয়ে কাউকে বাদ দেয় না।

এই ইঙ্গিতটাই হল কাল। মিলি আন্টির সঙ্গে মায়ের সম্পর্কে চিড় ধরল। কারণ তখন সান্যাল আঙ্কলের সঙ্গে মায়ের খুব ভাব। বাড়িতে কোনও স্পেশ্যাল ডিশ হলেই সান্যাল আঙ্কল আসে। রামানন্দ রায়ই ফোন করে ডেকে আনে। কিন্তু একথা ঠিক, সান্যাল আঙ্কল তার দিকে কোনদিন তাকায়নি। হেসে দু-একবার হ্যা-ই বলেছেন মাত্র। এই সান্যাল আঙ্কল তো দিনদুপুরে এ বাড়িতে আসতেন যখন রামানন্দ রায় বাইরে থাকতেন। সেসময় নিবিড় আলোচনার জন্যে মায়ের দরজা বন্ধ থাকত। দরজা খুললে সান্যাল আঙ্কল আর দাঁড়াত না। ব্যাপারটা কেউ তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি বলেই কি তার এমন খারাপ লাগেনি যেমন বাবার ক্ষেত্রে লাগছে! চোখ বন্ধ করল জয়িতা। বছর বারো আগেও, রামানন্দ রায়কে হাম না খেতে পারলে তার ঘুম হত না। বাবার গায়ের গন্ধটা যে কি ভাল লাগত! এখন দাঁড়িপাল্লায় দুজনেই সমান। সুদীপের কথা শোনাই উচিত কাজ হবে।

সীতা রায়দের এই পৃথিবীটা অদ্ভুত। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। প্রতিনিয়ত এ ওর নামে কেচ্ছা ছড়াচ্ছে। অথচ প্রত্যহ একসঙ্গে জড়ো হয়ে মদ না খেলে এদের চলেও না। বিত্তবান মানুষগুলো

ভদ্রতার মুখোশ পরে সর্বক্ষণ সুযোগের সন্ধানে থাকে কি করে পরস্ত্রীর প্রেমহীন শরীরখনন করা যায় সেখানেই তাদের তৃপ্তি। সেই চাবিবদলের গল্পটা তো এখন প্রত্যেকের জানা। পার্টিতে শুধু স্বামীস্ত্রীদের প্রবেশাধিকার। মদ খেতে খেতে এ ওর স্ত্রীর সঙ্গে যতটা সম্ভব খেজুরে-ঘনিষ্ঠতা করার পর টেবিলের ওপর প্রত্যেকের গাড়ির চাবিগুলো রাখা হয়। এবার স্বামীরা একে একে একটা চাবি তুলে নেন। যার ভাগ্যে যে গাড়ি ওঠে তার মালিকানকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন ভাগ্যবান। এসব তো সে শুনেছে। কিন্তু কখনও আজকের মত উত্তেজনা আসেনি মনে-শরীরে। এ শুধু সরাসরি তার মুখে শব্দগুলো ছুঁড়ে মারা হল বলে? জয়িতা ধীরে ধীরে মায়ের ঘরে এল। সীতা রায় এক ঘরে বাস করেন না। যদিও মাঝখানে দরজা আছে কিন্তু সেটা বছরের কোন্ রাত্রে খোলা হয় কে জানে। এখনও বন্ধ। কিছুদিন হল জয়িতা এই ঘরে আসেনি, রামানন্দের ঘরেও যায়নি।

সীতা রায়ের ঘরে ঢুকলেই মিষ্টি কিন্তু হালকা গন্ধ পাওয়া যায়। আর ওই গন্ধটার মতনই সমস্ত ঘরটি চমৎকার সাজানো। কোথাও বাড়তি নেই, অগোছালোপনা নেই। এই ঘরে বই নেই তবে অজস্র ম্যাগাজিন আছে। দেশি-বিদেশি মেয়েদের ম্যাগাজিন যেগুলোতে শরীর সাজানোর নানান প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। আয়নার পাশে সীতা রায় দাঁড়িয়ে আছেন। ও ছবির বয়স কত তা টের পাওয়া শিবের অসাধ্য। গত সপ্তাহ কিংবা দশ বছর আগের যে কোনও সময়ের হতে পারে।

জয়িতা সীতা রায়ের ম্যাগাজিন তুলে নিল। এটাই লেটেস্ট। বিশ্বসুন্দরীর ছবি ওপরে ছাপা। দু'তিনটে পাতা ওলটাতেই একটা ছোট্ট কার্ড পড়ে গেল নিচে। পেজমার্ক করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল ওটাকে। কার্ডটা তুলতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল জয়িতার। প্যারাডাইস! এই জায়গাটার কথাই ক'দিন থেকে ওদের মধ্যে আলোচনায় এসেছে। আনন্দর কাছ থেকে খবরটা শোনার পর থেকেই সুদীপ টগবগ করে ফুটছিল। ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর একটা বিশাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা প্যারাডাইসকে দেখেও এসেছে ওরা। কিন্তু মায়ের কাছে এই কার্ডও এসে গেছে। চমৎকার! সুদীপের গলা মনে পড়ল। একটু আগেই টেলিফোনে সুদীপ জানিয়েছে, গ্রান্টেড। জয়িতা একবার ভাবল কার্ডটাকে সরিয়ে ফেলবে কিনা! তারপর মনে হল, প্যারাডাইসের হদিস যদি সীতা রায়ের জানা থাকে তাহলে এই কার্ডটা না পেলেও তার চলে যাবে। সীতা রায়কে সে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারবে না।

ঠিক এই সময় বেল বাজল। তীব্র এবং কর্কশ। যত রাত বাড়ে তত শব্দটা ওইরকম হয়ে যায়। জয়িতা চটপট নিজের ঘরে ফিরে এল। ওদের কাছে চাবি আছে, নিজেরাই দরজা খুলে ভেতরে চলে আসতে পারে, তবু বেল বাজাবে। এই সময় শ্রীহরিদা উঠবে না এবং সে নিজে দরজা খোলে না। বোধহয় রামানন্দ রায় নিজের উপস্থিতি সোচ্চারে জানাতে চান।

দরজা বন্ধ করে রামানন্দ রায় বললেন, 'ও ডার্লিং, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।'

সীতা রায় একবার মেয়ের ঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বললেন, 'সারা সন্ধ্যের ক্রাউড তোমার চেয়ে অনেক অ্যাডভান্সড।'

'মানে?'

'ওরা এই কথাটা সন্ধ্যে থেকে বলছে, তুমি রাতদুপুরে।'

'আই সি। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'থ্যাঙ্কস।' সীতা রায় গম্ভীর ভঙ্গিতে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। রামানন্দ একটু টললেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর বললেন, 'ডার্লিং, গুড নাইট!'

সীতা রায় যেন আরামবোধ করলেন কথাটায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি হাসলেন তিনি। তারপর রামানন্দ রায়ের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই জন্যেই তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি ঠিক বুঝতে পার কখন আমি ডিস্টার্বড হতে চাই না।'

'সেম টু ইউ। আই অ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড টুনাইট।'

'মি টু-উ-উ-উ। আই লাভ ইউ ডিয়ার।'

'মি টু-উ-উ। আমরা কি একটা কিস্-এর কথা ভাবতে পারি?'

'ও নটি, দ্যাটস অল ফর দ্য নাইট, না? আমি তোমার প্রশংসা করলাম একটু আগে।'

'আমিও।'

এর অধর ওর কপোল স্পর্শ করল কি না-করল দুজনেই তৃপ্ত ভঙ্গিতে দুটো দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় জয়িতা তার দরজায় এসে দাঁড়াল।

'তোমাদের একটা ফোন এসেছিল।'

দুটো মানুষই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন। রামানন্দ রায় বললেন, 'আঃ, তুমি এখনও জেগে আছ? না না, লেট নাইট করা ঠিক নয়।' তাঁর স্বরে জড়তা যাচ্ছিল না।

সীতা রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মানে? কার ফোন? কে ফোন করেছিল?'

'একজন মহিলা। ভদ্র বলতে বাধছে।'

'হোয়াট! অভদ্র মহিলা আমাকে চাইবে কেন?' সীতা রায়ের গলায় উষ্মা।

'কারণ তিনি কিছু সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন।'

এবার রামানন্দ রায় বললেন, 'আঃ, কি হেঁয়ালি করছ? চটপট বল, ঘুম পাচ্ছে।'

জয়িতা বলল, 'ভদ্রমহিলা বললেন তিনি আমাকে নাকি মেয়ের মত স্নেহ করছেন। এই স্নেহপ্রবণতা তাঁর মনে এসেছে কারণ তিনি ফোন করার একটু আগে তোমার সঙ্গে—।'

কথাটা শেষ করতে পারল না জয়িতা। তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

'ইজ ইট?' সীতা রায় স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'হু ইজ্ শী?'

রামানন্দ রায়কে হতভম্ব দেখাল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ইউ স্লেপ্ট উইথ মিসেস দত্ত?' সীতা রায় চিৎকার করে উঠল।

'হু টোল্ড ইউ?'

'সান্যাল আমাকে বলেছে। তুমি ক্লাব থেকে কেটে পড়ার সময় সান্যাল আমাকে বলেছে। আমি সান্যালকে বিশ্বাস করিনি তখন। ওঃ!'

'ন্যাকামি করো না। ইউ বিচ! ইউ হ্যাভ বিন ডিচ্‌ড বাই সান্যাল।'

'নো! সান্যাল সম্পর্কে কিছু বলার রাইট তোমার নেই।'

'বিকজ ইউ লাইক হিম! হি ইজ—, আমি জানি না তুমি কার কার সঙ্গে কি কর!'

'চুপ করো। কি করে সাহস পায় ওই মেয়েছেলেটা বাড়িতে ফোন করার! চমৎকার, সে আমার মেয়ের মা হয়ে গেল কারণ তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ!'

'ইউ কান্ট প্রুভ ইট! ক্যান ইউ? কোনও মেয়ে ফোন করে সত্যি কথা বলে না! বাট আই ক্যান প্রুভ, আমি প্রমাণ করতে পারি তুমি কার কার সঙ্গে হারাও!'

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে ছুটে গেলেন সীতা রামানন্দ রায়ের কাছে, 'প্রমাণ কর। মেয়েরা যদি পাঁকেও নামে তাহলে তাদের গায়ে কাদা লাগে না। কারণ তারা তেল মেখে নামে। কিন্তু তুমি—তুমি ইউ ফুল—তোমার শার্টের পেছনে লিপস্টিকের ছাপ, দ্যাট হোর তোমার শার্টে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে নিজের ঠোঁটে।'

এই মুহূর্তে রামানন্দ রায় চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হয়ে গেলেন। দৃশ্যটা আর দেখতে পাচ্ছিল না জয়িতা। রামানন্দ মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললেন, 'জয়ি, বিশ্বাস করো না, শী ডিড ইট! লিপস্টিকের ছাপ ওর।'

সীতা রায় চিৎকার করলেন, 'নো। জয়ি, হি ইজ আ লায়ার। ডোন্ট বিলিভ হিম।'

জয়িতা দুজনের দিকে তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এত রাত অবধি কেন জেগে আছি জানো? আমি তোমাদের একটা কথা জানাতে চাই।'

দুজনেই কোনও উত্তর দিল না।

জয়িতা হাসল। তারপর দরজার দুটো পাল্লা বন্ধ করার আগে বরফগলায় উচ্চারণ করল, 'আমি তামাদের ঘেন্না করি।' বন্ধ দরজার এপিঠে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ পর প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

॥ ২ ॥

জয়িতার সঙ্গে কথা বলে সুদীপ ব্যালকনিতে এল।

ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা বেশ চওড়া। যেহেতু রাত এখন বেশ তাই লোকজন নেই বললেই চলে। ঠাকুরের পানের দোকানটা অবশ্য খোলা। আশেপাশের বাড়ির রাঁধুনেরা এখন ওখানে আড্ডা মারছে। ও-পাশের রকটায় দুজন দাবা খেলছে রাস্তার আলোয়। এ ছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই। মাঝে মাঝেই হুস-হাস গাড়ি ছুটে যাচ্ছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। সুদীপ ভাল করে লক্ষ করল। না, কোনও অপরিচিত মুখ সে দেখতে পেল না। কেউ সন্দেহজনক ভঙ্গিতে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে নেই।

অথচ তার খোঁজে নাকি দু'বার লোকটা এসেছিল। কার্তিকদার বর্ণনা মত সে কোন চেনা লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে না। কার্তিকদার বয়স হয়েছে, ওলট-পালট হয়ে যায় সব। কিন্তু দু'বারে বলার সময় যে মিলগুলো পেয়েছে সেরকম কোনও মানুষকে চেনে না সুদীপ। তাছাড়া লোকটা এসেছিল তখন যখন বাড়িতে সে ছিল না, বাবাও নয়। দু'বারই। অস্বস্তিটা লেগে আছে শোনার পর থেকেই। আনন্দর হোস্টেলেও একই কাণ্ড ঘটেছে। আনন্দ আজ রাস্তায় হাঁটার সময় বারংবার পেছন ফিরে তাকিয়েছে। তার সন্দেহ ছিল কেউ বোধহয় অনুসরণ করছে। কিন্তু সুদীপ বলেছিল তারা এমন কোনও কাজ করেনি যে এমন কাণ্ড ঘটবে, অথচ বাড়িতে এসে কার্তিকদার কাছে শোনার পর আনন্দর কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। এত রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই। আনন্দর হোস্টেলে ফোন থাকলেও সুপার এত রাত্রে ডেকে দেবে না। কল্যাণের বাড়িতে টেলিফোন নেই। জয়িতা তো নিজেই করল। সুদীপ আশঙ্কা করেছিল ওর ওখানেও বোধ হয় কেউ হানা দিয়েছে! জয়িতার যে সমস্যা সেটা ওর অনেকদিনের দেখা। এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি দরকার! তবে এটা খুব চমকপ্রদ ঘটনা মানতেই হবে। যে মহিলাটি জয়িতাকে ফোন করে বলেছেন তিনি আজ ওর বাবার সঙ্গে শুয়েছেন তিনি নমস্যা। ওঁকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। অবশ্য যদি ভদ্রমহিলা হন!

জয়িতার বাড়ির আবহাওয়াটা তো এখন কলকাতার ওপরমহলে উঠে যাওয়া বা উঠতে চাওয়া পরিবারের। ওখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে যখন জয়িতা তখন ওদের জন্যে এত আপসেট হয় কেন ও মাঝে মাঝেই কে জানে! একমাত্র ওই একটি ব্যাপার ছাড়া জয়িতার কোন ব্যাপারে জড়তা নেই। জড়তা? সুদীপ শব্দটা নিয়ে দু'চারবার নাড়াচাড়া করল। জড়তা তার নিজের নেই? অজস্র ব্যাপারে অকারণ আড়ষ্টতা আসে কেন?

সুদীপ নিজের ঘরে ফিরে এল। কীটসব্যাগ নয়, ত্রিপলের একটা লম্বা ঝোলা আছে সুদীপের। দীপু মামা এনে দিয়েছিল জার্মানি থেকে। বেশ মজবুত, দেখতেও খারাপ নয়। এতকাল সেটা পড়ে থাকত চ্যাপটা হয়ে, এখন ফেঁপে ফুলে চমৎকার দেখাচ্ছে। বেশ কিছুকাল যাতে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় এমন জিনিসপত্র ওতে ভরা হয়ে গেছে। যে কোনও সময় নোটিস এলেই বেরিয়ে পড়তে পারে সুদীপ। হাওয়া ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এই বাড়িটা সুদীপের বাবা অবনী তালুকদারের। হাইকোর্টের নামজাদা উকিল। বিশাল বাড়িটায় তিনজন মানুষকে নিয়ে বেশ কয়েকজন ঝি-চাকর আরাম করে আছে। খাবার টেবিল ছাড়া সুদীপের সাহায্যে ওরা তেমন লাগে না। এই যে আজ একটা লোক দু'বার এল, এরা তার নাম-ঠিকানা জেনে নেওয়ার বুদ্ধিটুকুও ধরে না। সুদীপের অস্বস্তি কিছুতেই কাটছিল না।

অবনী তালুকদার সুদীপের সঙ্গে কথা বলেন না। মাস ছয়েক হল বাক্যালাপ বন্ধ। সুদীপ আশঙ্কা করেছিল তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হবে কিন্তু অবনী তালুকদার সেটা বলেননি। তবে সমস্ত খরচ-খরচা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সুদীপের অবশ্য এখন পর্যন্ত তাতে কিছু আটকাচ্ছে না। খরচ বলতে সিগারেট, বাসভাড়া, চায়ের দাম আর কলেজের মাইনে। জমানো টাকায় সেটা চলে যাচ্ছে আপাতত। তবে সে নিজে যেমন, তেমন অবনী তালুকদারও চেষ্টা করেন যাতে পরস্পরের মুখোমুখি

না হন। ওকালতি যাঁরা করেন তাঁরা তো বুদ্ধিমান হবেনই। অবনী তালুকদার তার চেয়ে বেশ বেশি কিছু মাথায় ধরেন। এমন বিষয়াসক্ত মানুষ সুদীপ গল্প-উপন্যাসেও পড়েনি। আর সেই আসক্তিতে ভদ্রলোক একটার পর একটা একনম্বর দু'নম্বর কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। তেজারতি কারবার তো আছেই, ভদ্রলোকের মনে দয়া-মায়া-ভালবাসা বলে কোন বস্তু নেই, ছিল কিনা তাতেও সন্দেহ। তবে কর্তব্যজ্ঞান ছিল। ছয় মাস আগের প্রতিটি সকালে তিনি সুদীপকে প্রশ্ন করতেন, সব ঠিক আছে? আমি চাই তুমি বড় হয়ে আমার প্র্যাকটিশে আসবে। তোমার জন্যে যে সোনার খনি রেখে যাচ্ছি তা কোনও বাপ তার ছেলের জন্যে রেখে গেলে ধন্য হত সেই ছেলে। যাও।' একদম মালা জপার মত একই শব্দাবলী রোজ আওড়ে যাওয়া। কথাগুলো শোনার সময় শেষের দিকে হাসি পেত সুদীপের। ছয় মাস আগে সেটা চুকে গেল। চুকিয়ে দিল সুদীপ।

অবনী তালুকদার আর একটি কর্তব্য নিয়মিত করে থাকেন। হাইকোর্টের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পর প্রথমেই চলে যান স্ত্রীর দরজায়। ঘরে ঢোকেন না, যেখানে দাঁড়ান সেখান থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। বেশির ভাগ দিনই নার্স জবাব দেয়। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান তিনি নিজের ঘরে। হ্যাঁ, স্ত্রীর জন্যে অবনী তালুকদার নার্স রেখেছেন। আয়া রাখলে অনেক কম খরচ হত। প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তার আসেন। ডাক্তারের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। স্ত্রীর শরীরের জন্যে পয়সা খরচ করতে কোনদিন কার্পণ্য করেননি। এসবই তাঁর কর্তব্যপালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত হবে।

আজ রাত্রে অবনী তালুকদার ফিরবেন না। খবরটা জেনেছে সুদীপ কার্তিকদার কাছ থেকে। সচরাচর অত্যন্ত লাভজনক মামলা না পেলে কলকাতা ছেড়ে নড়েন না অবনী তালুকদার। আজ নিশ্চয়ই শিকারটা বড় মাপের, না হলে পাটনায় যাবেন কেন? অতএব সেই দিক দিয়ে বাড়িটা খালি। অবনী তালুকদার থাকলেও কোন অস্তিত্ব বোঝা যেত না। বরং ঝি-চাকরদের ওপর হুকুমজারি আছে কেউ যেন গলা তুলে কথা না বলে। সব সময় একটা শান্ত পরিবেশ বাড়িতে পেতে চান অবনী তালুকদার। ঠিক দশটায় সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুদীপের অবশ্য ইদানীং তাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। সদর বন্ধ হয়ে গেলে সুদীপ পেছনের পাঁচিল টপকে ভেতরে চলে আসে। কার্তিকদার দরজা খোলাই থাকে। সেইটে দিয়ে দোতলায় উঠে আসতে কোন অসুবিধে নেই। অবনী তালুকদার যে ব্যাপারটা জানেন না, তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এই বাড়ির প্রতিটি ইট কাঠ যে কিভাবে আছে সে হিসেব তিনি নিত্য রাখেন।

সুদীপ দোতলার হলঘরে এল। ঝি-চাকররা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে। মাঝে মাঝে সামনে রাস্তায় ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া এই বাড়ি এখন একদম চুপচাপ।

মায়ের ঘরটা একদম কোণায়। দরজায় এসে দাঁড়াতেই হালকা নীল আলোয় ঘরটাকে দেখতে পেল। মা শুয়ে আছেন খাটে। একটা হালকা চাদর তাঁর গলা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া। যেহেতু এখন মায়ের শরীর ওপাশ-ফেরানো তাই এখান থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

সুদীপ কয়েক পা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল। মায়ের বিছানার ওপাশে একটা লম্বা ডেক-চেয়ারে শুয়ে আছেন একজন মহিলা। মাথাটা এক পাশে হেলানো, চোখ বন্ধ। কোলের ওপর একটি রঙিন সিনেমা পত্রিকা খুলে উপুড় করে রাখা। সেখানে বোম্বের একজন সুন্দরী শরীর আধখোলা করে মদির হাসছে। সুদীপ বুঝল এই নার্সটি নতুন। বাবার নির্দেশে মায়ের নার্স প্রতি মাসেই বদলে যায়। এ ব্যাপারে অবনী তালুকদারের থিয়োরি হল, অসুস্থ মানুষের সেবা কেউ দীর্ঘকাল করলে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য এবং সেটা এলে সেবায় গাফিলতি দেখা দেবে। অতএব নতুন নতুন নার্স চাই। এই মহিলাটিকে সুদীপ আগে দ্যাখেনি। শেষবার এই ঘরে এসেছিল সে তিনদিন আগে! মা অসুস্থ হওয়ার পর নিত্য দু'বেলা আসত সে। কিন্তু এখন—! সুদীপ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। নিজের এই পরিবর্তনের পেছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পায়নি। হয়তো দীর্ঘকালীন অসুস্থতা এক ধরনের বিরক্তি উৎপাদন করে কিংবা প্রতিনিয়ত একই যন্ত্রণার প্রকাশ দেখে দেখে তার গুরুত্ব কমে যায়। আর যে কারণটা সেটা তো ছয় মাস আগেই ঘটেছিল। মা কখনও প্রতিবাদ করতে শেখেননি। তিনি যতই অত্যাচার করুন, স্বামীর সামনে চোখ তুলে রূঢ় কথা বলা ধৃষ্টতা, মায়ের এই টিপিক্যাল দাসসুলভ মনোভাব সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। মায়ের সঙ্গে একসময় এই ব্যাপারে অনেক কথা বলেও সে একটি জবাব পেয়েছে, 'কি হবে, আমার তো যা হবার তা হয়েই গেছে, মিছি মিছি ওই মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে! শুরুতেই যখন সব মেনে নিয়েছি—।'

মাকে কখনও শ্রদ্ধা করেনি সুদীপ। মাকে সে ভালবাসত একটা নরম স্নেহপ্রবণ অনুভূতির জন্যে। অসহায় মানুষটি জানেন না তাঁর গণ্ডি কি, নিজেকে উজাড় করে দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান, দেওয়াটা ঠিক হল কিনা, যদি সে রাগ করে। এমন মানুষের প্রতি মায়া জন্মায়, মায়া থেকে ভালবাসাও আসে কিন্তু শ্রদ্ধা যদি তার সঙ্গে না মেশে তাহলে সেই ভালবাসা একসময় ফিকে হয়ে যেতে বাধ্য। মায়া আর করুণা কি এক? সুদীপ জানে না। কিন্তু মায়ের জন্যে তার কষ্ট হত। অবনী তালুকদারের বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে মা কেন এমন কুঁকড়ে থাকবেন?

কিন্তু এ তো গেল ভেতরের ব্যাপার। মায়ের শরীর নিয়ে প্রাথমিক দুশ্চিন্তা এবং কষ্টের সময়টুকু পার হয়ে গেলে সে যখন জেনেছিল আর কখনও সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই তখন থেকেই নিজের অজান্তে মনের রাশ ঢিলে হতে শুরু করেছিল। ঠিকঠাক চিকিৎসার নামে তদারকি চলছে, নার্স আছে, ব্যাস! মায়ের যন্ত্রণাগুলো, শরীরের বিভিন্ন উপসর্গগুলো বারংবার একই চেহারা নিয়ে আসছে ফিরে যাচ্ছে। এ থেকে যখন আর কোন পরিত্রাণের আশা নেই তখন অনুভূতির চামড়া একটু একটু করে মোটা হয়ে গেল। একমাত্র মৃত্যু-সংবাদ ছাড়া মা আর কোন আলোড়ন তুলতে পারবেন না এবং সেটাও একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ার মত। সত্যি বড় কষ্ট পাচ্ছিল। এভাবে বেঁচে মরে থাকার চাইতে অনেক আগেই চলে গেলে ঢের বেশি বেঁচে যেত।

অতএব, ব্যাপারটা এমনভাবে ভেবেছে সুদীপ। প্রিয়জন সে যতই প্রিয় হোক না কেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং সে অসুখে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকলে তো বটেই, মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিকারের জন্যে। হয়তো শেষ সম্বল ব্যয় করতেও কার্পণ্য করে না। কিন্তু যদি সেই অসুস্থতা দীর্ঘকালীন হয়, যদি কোনদিন সুস্থ হবার সম্ভাবনা না থাকে তখন একসময় দায় বলে মনে হতে বাধ্য। কেউ মুখে বলেন, কেউ ব্যবহারে প্রকাশ করে ফেলেন, কেউ বলেন না বোঝেন না কিন্তু মনে মনে জানেন মুক্তি পেলে ভাল হত।

সুদীপ খাটের এ-পাশে চলে এল। যত দিন যাচ্ছে তত মায়ের শরীর ছোট হয়ে আসছে। মুখ বসে গিয়েছে, চোখ কোটরে। কিন্তু চুলগুলো প্রায় একইরকম আছে। হয়তো নিয়মিত স্নান হয় না বা তেল মাখানো সম্ভব হয়নি বলে ফুলে-ফেঁপে একাকার। একটা মানুষের চেহারা পালটাতে পালটাতেও তো কিছুটা থেকে যায়। সেই থেকে যাওয়া শরীর নিয়ে মা এখন শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। মাঝে মাঝে শরীরটা কাঁপছে।

'বসুন।'

সুদীপ চমকে ফিরে তাকাল। মহিলার মুখে একটু বিব্রত হাসি, হাত বাড়িয়ে ডেক-চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি। সুদীপ মাথা নাড়ল, 'কেমন আছেন এখন?'

'আছেন এই পর্যন্ত। সমস্ত শরীরে বেডসোর হয়ে গেছে। আমি পাউডার দিচ্ছি কিন্তু—। আসলে উনি যদি বসতেও পারতেন তাহলে—।'

'বেডসোর! সে তো সেরে গিয়েছিল।'

'প্রথমবার হয়ে সেরে যায়। কিন্তু আবার হলে সামলানো মুশকিল। সেইটেই হয়েছে। দেখবেন?' সুদীপ কিছু বলার আগেই মহিলা এগিয়ে গিয়ে মায়ের শরীর থেকে চাদর সরিয়ে নিল খানিকটা। আর চমকে উঠল সুদীপ। হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত চাপ চাপ লাল ঘা বীভৎস হয়ে আছে।

মহিলা চাদর নামিয়ে দিলেন। 'এ-পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রেখেছি কারণ ওদিকটায় সামান্য কম। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে রাখাও যাবে না। ওঁর যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে কি বলব।'

'ডাক্তারবাবুকে বলেছেন?'

'আমি আসার পর একবারই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দিনে যিনি থাকেন তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন ওষুধ দিতে। বিশেষ কিছু করার নেই। আপনি বসুন না।' এবার মহিলা আর একটা চেয়ার এনে কাছে রাখলেন।

সুদীপ বসল। নার্স মহিলা বোধহয় অনেকক্ষণ কথা না বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন এবং কথা বেশি বলাই বোধহয় স্বভাব, 'খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এরকম কেস তো আমি আগে দেখেছি। কেউ কেউ বছরের পর বছর কষ্ট পেয়ে পেয়ে তবে যেতে পারেন।'

'উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ। তবে স্পষ্ট বলতে পারেন না তো। খনখনে হয়ে গেছে গলার স্বর। আর কথা বলতেও কষ্ট হয়। তবে এর মধ্যে মজার কথাও বলেছেন।'

'কিরকম?' সুদীপ অবাক হল।

'এই তো আজ বিকেলে এলে বললেন, তুমি এলে ভাল লাগে। বেশ দেখতে ভাল তুমি। আমি মনে মনে হেসে বাঁচি না! আমাকেও নাকি ভাল দেখতে।'

সুদীপ ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। একটু লাজুক অভিব্যক্তি, চোখে চোখ পড়তে মুখ নামালেন। মধ্য-তিরিশে শরীর যথেষ্ট যৌবনবতী। সে বলল, 'মাকে কি ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। না হলে যে ঘুমুতেই পারেন না। এত যন্ত্রণা নিয়ে বিনা ওষুধে কি ঘুমানো যায়?'

'ও!' সুদীপ বুঝল এখন এই ঘরে বসে কোনও লাভ নেই। নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধের পরিমাণটা বেশি না হলে অমন নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে পারে না কেউ। মানুষের জীবনীশক্তি কখনও কখনও বিস্ময় ছাড়িয়ে যায়। তিনবার সিরিয়াস অ্যাটাক হয়ে গেছে। একসময় ব্রেন কাজ করছিল না, সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল, ম্যাসেজ করে চিকিৎসায় থেকে থেকে শরীরে সামান্য সাড় এল, মুখে আবার কথা ফুটল। কিন্তু প্রেসার নিয়ত এমন কম বেশি হতে লাগল যে চতুর্থ অ্যাটাকের জন্যে তৈরি ছিল ওরা। এবং সেটাই শেষবার একথা সবাই জানত। তার বদলে ব্লাড ইউরিয়া বাড়ল। যাবতীয় রোগ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখন সব ছেড়ে শুধু বেডসোর নিয়ে দুশ্চিন্তা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এক একটা রাত আগে এমন কেটেছে যে ভোর হবার আগেই মা চলে যাবেন বলে মনে হত। অথচ এইভাবে বেঁচে মরে থাকতে হচ্ছে।

সুদীপ উঠল, 'আপনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন?'

'হ্যাঁ। ফ্ল্যাস্কে চা রেখেছি, খাবেন?'

'না। আপনি আর বসে থেকে কি করবেন! উনি যখন উঠবেন না তখন শুয়ে পড়ুন।'

'আমাদের কি শুলে চলে। পেসেন্ট ঘুমের ঘোরে পেচ্ছাপ পায়খানা করে ফেলতে পারে। জেগে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।' মহিলা হাসলেন।

সুদীপ মনে মনে বলল, সে তো দেখতেই পেয়েছি ঘরে ঢোকার সময়। সে যাওয়ার সময় বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকালে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলব।'

মহিলা বললেন, 'যদি কোনও কারণে রাত্রে ঘুম ভাঙে তাহলে খবর দেব?'

কোন জরুরি ব্যাপার নয় তবু সুদীপ না বলতে পারল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুদীপের দৃষ্টি গেল অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে। দরজাটি বন্ধ। পর্দা ঝুলছে। দরজায় তালা না দিয়ে কি অবনী তালুকদার পাটনায় যাবেন? বিশ্বাস হয় না। সুদীপ এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা সরাল। তার অনুমানে ভুল হয়নি। পিতৃদেব এত বড় ভুল করবেন না। অভিজ্ঞতা থেকেই তো মানুষ শিক্ষা নেয়।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ? সুদীপের ঠোঁটে হাসি ফুটল। অসম্ভব! কোনদিন কি কেউ নেয়? নেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। নিতে গেলে অনেক কাজ পৃথিবীতে কেউ কোনদিন শেষ করতে পারত না। সাতষট্টি থেকে একাত্তরে এদেশে যে উদ্যোগের জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল তা থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে এদেশে কেউ কখনও বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের চেহারা পালটাতে চাইবে না। কিন্তু—।

সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল তালাটা ভাঙতে। অবশ্য তালা ভাঙলেই কিছু পাওয়া যাবে? কিছুদিন আগে একদিন সকালে অবনী তালুকদার যখন কোর্টে বেরুবেন, সুদীপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ, ঠিক তখনই বাড়িটা ঘিরে ফেলেছিল পুলিশের সাহায্যে আয়কর বিভাগের লোকজন। খুব কৌতুক বোধ করছিল সুদীপ যখন আয়কর অফিসার বলেছিলেন বাড়ির সবাইকে একটি ঘরে অপেক্ষা করতে যতক্ষণ অনুসন্ধান শেষ না হয়। সেই সময় তদন্তকারী অফিসার জানতেন না, একজনের পক্ষে বিছানা ছেড়ে ওঠাই সম্ভব নয়। অবনী তালুকদার খুব চেঁচামেচি করেছিলেন। ব্যাপারটা আদালতে তুলবেন বলে হুমকিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এত নির্দিষ্ট আইনী যে তাঁকে সব হজম করতে হয়েছিল। বাড়ি ঘেরাও হচ্ছে দেখে প্রথমে সুদীপ নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিল। যদিও ওই সময় সে এমন কিছু করেনি যে

তার ওপর পুলিশের নজর পড়বে। কিন্তু যোগাযোগ থাকার অভিযোগ তো থাকতেই পারে। একাত্তরের অনেক গল্প শোনা এবং পড়া ছিল। চকিতে মনে হয়েছিল পেছনের পথ দিয়ে পালাবে কিনা? সেইসময় উত্তেজিত হয়ে অবনী তালুকদারকে ছুটে আসতে দেখেছিল সে। কপালে ঘাম জমেছে। মুখের রঙ একেবারে কালো। তাকে দেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, 'খোকা, আমাকে তুই বাঁচা— সেভ-মি! ইনকামট্যাক্স রেইড করেছে।'

এইরকম চেহারায় অবনী তালুকদারকে দেখে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সুদীপ। তবু জিজ্ঞাসা করেছিল শক্ত হয়ে, 'আমি কি করব?'

'এই ব্যাগটাকে সরিয়ে ফেল। ওরা যেন টের না পায়। কুইক!'

'কি আছে ওতে?'

'যাই থাক, তোমার তাতে কি? ব্যাগটাকে লুকিয়ে রাখ, ওরা চলে গেলে ফেরত চাই।' ছেলের হাতে সেটাকে ধরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে গেলেন অবনী তালুকদার। নিচে তখন হৈচৈ হচ্ছে। অবনী তালুকদার অফিসারদের ওপর তড়পাতে শুরু করেছেন। সুদীপ ব্যাগটা খুলতে গিয়েও খুলল না। কিভাবে ব্যাগ পাচার করবে সেটা অবনী বলেননি। পেছনের দরজায় তো পুলিশ থাকতে পারে। সে ব্যাগটাকে তুলে হলঘরের টেবিলের উপর রেখে দিল। এবং তারপরেই অফিসাররা উঠে এলেন। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

'আমি সুদীপ।'

'অবনীবাবুর ছেলে?'

নীরবে মাথা নেড়েছিল সুদীপ। এখন হলে কি করত সে জানে না।

অফিসার বললেন, 'আপনাদের বাড়িটা সার্চ করব। মিস্টার তালুকদারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে খুশি হব।' তারপর সহকারীকে বললেন, 'এই ঘরটা তো বেশ ফাঁকা। বাড়ির সবাইকে এখানেই আসতে বলুন। দেখবেন কেউ যেন এই ঘর ছেড়ে না যায়।'

সুদীপ চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর নিচ থেকে ঠাকুর চাকর সমেত অবনী তালুকদার উঠে এলেন, 'দিস ইজ টুমাচ' বাক্যটি উচ্চারণ করতে করতে। দ্বিতীয় অফিসার তাঁকে হুকুম শোনাতেই তিনি সুদীপের পাশের চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছলেন। খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। কাজের লোকেরা ঘরের অন্য কোণে জড়ো হয়েছিল চুপচাপ। রুমালটা পকেটে পুরে সামনে তাকাতেই স্থির হয়ে গেলেন এক মুহূর্তে অবনী তালুকদার। তার চোখ একবার ছেলে আর একবার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ব্যাগটার মধ্যে ঘুরল। সুদীপ দেখল উনি উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। সমস্ত মুখ মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় চাপা গলায় গর্জন করলেন যেন, 'ওটা ওখানে রেখেছ কেন?'

'রাখার জায়গা পাইনি।' ঠোঁট না নেড়ে শব্দ তিনটে উচ্চারণ করল সুদীপ।

'স্কাউন্ড্রেল! ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি? ব্যাগটাকে সরাও—ওঃ ভগবান।'

সুদীপ দেখল অফিসাররা টেবিলটার পাশেই দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিচ্ছেন কি ভাবে কাজ শুরু করবেন। ওরা কেউ ব্যাগটার কথা খেয়াল করছেন না। অবনী তালুকদারের চোখের দৃষ্টি আঠার মত ব্যাগটার গায়ে লেগে আছে। সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'ওইভাবে দেখলে ওরা বুঝতে পারবে।'

অবনী সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, 'আমার বুকে ব্যথা করছে।'

সুদীপ বাবার দিকে তাকাল। তারপর গলা তুলে অফিসারকে খবরটা জানাল। ভদ্রলোক দ্রুত ছুটে এলেন, 'হোয়াটস দ্য ট্রাবল? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

হ্যাঁ বলতে গিয়ে না বললেন অবনী, বোঝা গেল। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

অফিসার জানালেন, 'আপনার মেডিক্যাল হেলপ দরকার হলে বলবেন।'

ওঁরা সরে গেলে অবনী চাপা গলায় বললেন, 'সোয়াইন!'

সুদীপ নীরবেব মাথা নাড়ল, 'অবশ্যই।'

ধুন্দুমার কাণ্ড চলল। অনুসন্ধানকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেল। অবনী তালুকদারের ঘর থেকে সত্তর হাজার টাকার নোট পাওয়া গেল। এবং প্রচুর কাগজপত্র। সুদীপ লক্ষ্য করল অফিসাররা এই

মুহূর্তে প্রশ্ন করছেন না কিছু। তাঁরা প্রাপ্ত জিনিসগুলোর একটা তালিকা তৈরি করছেন মাত্র। এইসময় অবনী তালুকদার চিৎকার করে উঠলেন, 'ওহো নো! ওগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা সবার সামনে টেনে আনতে পারেন না!'

অফিসার নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'আপনার যেসব ব্যক্তিগত জিনিসের সঙ্গে গোপন সম্পদের কোন যোগাযোগ নেই সেগুলোয় আমরা হাত দিচ্ছি না মিস্টার তালুকদার। কিন্তু খুঁজতে হলে তো এগুলোতে হাত দিতেই হবে।'

তিনটে অ্যালবাম পড়ে আছে মাটিতে। একবার তাকিয়ে সুদীপ মাথা নামিয়ে নিল। মেয়েটাকে সে চেনে। এই বাড়িতেই কাজ করত। জন্মদিনের পোশাকে অবনী তলুকদার ওর ছবি কবে তুললেন কে জানে! কিন্তু এই মেয়েটিকে নিয়ে তো কোন গোলমাল হয়নি। যাকে নিয়ে গোলমাল হয়েছিল, তারপর এই বাড়িতে আর কোনও অল্প-বয়সী মেয়েকে কাজে রাখা হয়নি। তার আগে প্রায় প্রতি মাসে একটা করে ঝি আসত আর যেত। ঘটনার কথা মনে পড়তেই শরীর গুলিয়ে উঠল সুদীপের। অবনী তালুকদারের পাশে বসতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

বাড়িতে এসেই শুনেছিল মা খুব অসুস্থ। পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন বেশ রাত। অন্তত নার্সিং হোমে ঢোকার অনুমতি পাওয়ার মত সময় নয়। গিয়ে শুনল মাকে আই সি ইউনিটে রাখা হয়েছে। অবনী তালুকদার ভিজিটার্স রুমে বসেছিলেন, সে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক মুখ নিচু করেছিলেন। সুদীপ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে মায়ের?'

'সেরিব্র্যাল। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে বলা যাবে না।'

'কেন? সেরিব্র্যাল হল কেন?'

খেঁকিয়ে উঠেছিলেন অবনী তালুকদার ওই সময়েও, 'সেরিব্র্যাল হয় কেন জানো না? গো অ্যান্ড আস্ক দ্য ডক্টর। অশিক্ষিত!'

সুদীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সরে এসেছিল। বাবার সঙ্গে তার কোনদিনই ভাবভালবাসা তৈরি হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত সে মায়ের সঙ্গেই শুতো। তারপর তাদের তিনজনের তিনটে আলাদা ঘর হয়েছে। মায়ের সঙ্গে বাবারও কথাবার্তা যতটা সম্ভব না হলেই নয়। তাও বাবা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মা জবাব দিতেন। সেই রাত্রে মায়ের সঙ্গে ওরা দেখা করতে দেবে না জানার পর সুদীপ বাড়ি ফিরে এসেছিল। অদ্ভুত একটা কান্না সমস্ত শরীরে পাক খাচ্ছিল সে-সময়। জ্ঞান হবার পর ওরকম অনুভূতি তার সেই প্রথম। মায়ের কেন সেরিব্র্যাল হল? মা তো কখনই উত্তেজিত হতেন না। মানুষের ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেলে, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেলে, দুশ্চিন্তা থাকলে অথবা উত্তেজনার কারণ ঘটলে এই ব্যাপারটা হয়ে থাকে বলে জেনেছে সে। ওরকম ঠাণ্ডা নিরীহ এবং ব্যক্তিত্বহীনা মহিলার সঙ্গে ব্যাপারটা মিলছে না কিছুতেই।

সেই রাত্রে বাড়িটাও ছিল থমথমে। দরজা খুলে কার্তিকদা শুকনো মুখে প্রশ্ন করেছিল, 'মা কেমন আছেন?'

সুদীপ কার্তিকদার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কি হয়েছিল?'

কার্তিকদার মাথাটা নিচু হয়েছিল, 'আমি জানি না!'

'তুমি জানো।' কার্তিকদা কিছু চেপে যাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপের।

'না আমি কিছু জানি না।' সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল কার্তিকদা।

দোতলায় উঠে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরটা খালি। এমন কিছু চোখে পড়ল না যা সন্দেহজনক। বাবার ঘরে ঢুকল সে। এবং সেখানেই মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিল সে। অবনী তালুকদারের খাটের পাশে মোজায়েক মেঝেতে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দোতলার ফাইফরমাশ খাটার জন্যে মেয়েটিকে রাখা হয়েছিল। চেহারায় সৌন্দর্য শব্দটির কোন ছায়া নেই। যৌবনও কখনো কখনো কুৎসিত হয়, এই মেয়েটিকে না দেখলে সে জানত না। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। এই বাড়ির দোতলায় যারা এতকাল কাজ করে গেছে তাদের বয়স ষোলো থেকে তিরিশের মধ্যে এবং কেউ দেখতে সামান্য ভালও নয়। এই মেয়েটি তার ঘরে যেত ঝাঁট দিতে এবং ঘর মুছতে। কোনদিন কথা বলার প্রয়োজন

মনে করেনি সে। একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত খারাপ দেখতে মেয়ে এই বাড়িতে আসে কেন মা?' মা উত্তর দেননি। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতেন না।

কি হয়েছিল এই মেয়েটা জানতে পারে। সুদীপ একটু গলা তুলে মেয়েটিকে ডাকল, 'এই, শুনছ? এই যে!'

ডাক শুনে মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠল। তারপরে বোবা চোখে সুদীপের দিকে তাকাল। এবং তখনই সুদীপ দেখল মেয়েটির কালো গালে চোখের জলের দাগ শুকিয়ে আছে এখনও। এবং আচম্বিতে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল সুদীপের পায়ের ওপর, 'আমি কোন দোষ করিনি, আমি আমি—, আমাকে—, আমার এখন কি হবে?'

হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সুদীপ, 'কি হল? কি হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি বারংবার কথা বলতে যাচ্ছে কিন্তু কান্নার দমক তাকে থামিয়ে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের কি হয়েছিল?'

'বাবা আমাকে—, মা তখন এসে পড়েছিল।'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ, সুদীপ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে! ঠিক সেই সময় পেছন থেকে অবনী তালুকদার বলে উঠেছিলেন, 'এখানে কি হচ্ছে?'

সুদীপ অবশ হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপরই একটা ক্রোধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার সমস্ত সত্তায়। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই মেয়েটা যা বলছে তা সত্যি?'

'এই বাড়িতে কোন্‌টে সত্যি কোন্‌টে মিথ্যে তা বিচার করব আমি। নিজের ঘরে যাও।'

'ছিঃ, আপনি এত নোংরা! ইউ কিল্ড মাই মাদার!'

'নো। ডাক্তার বলেছে সে মরবে না। আর আমি নোংরা না ফরসা সে বিচারও আমি করব।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মা মরে গেলে আমি, আমি আপনাকে—।'

'গেট আউট, গেট আউট অফ মাই সাইট!' বীভৎস গলায় চিৎকার করে উঠেছিলেন অবনী তালুকদার। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে এসেছিল সুদীপ। বিছানায় উপুড় হয়ে নিজেকে কি ভীষণ প্রতারিত বলে মনে হয়েছিল। অবনী তালুকদারের কথাবার্তা ব্যবহার সে পছন্দ করত না, কিন্তু সেটা ছিল এক ধরনের খারাপ লাগা, এখন সমস্ত শরীরে কিলবিলে ঘেন্না। এমন কি মায়ের জন্যে জমে ওঠা উদ্বেগ এবং কষ্টটা মনচাপা পড়ে গেছে। একটা মনের ওপর আর একটা মন। এই দ্বিতীয় মনটা রাগে ঘেন্নায় নিজেকেই ছিঁড়তে চাইছে। এক মুহূর্ত নয়, এই বাড়ি ছেড়ে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে তাকে। অবনী তালুকদারের বাড়িতে সে আর থাকতে পারে না। কোথায় যাবে সে চিন্তা না করেই সুদীপ সুটকেস নামাল এবং তখনই তার মনে হল, কেন যাবে? সে এখান থেকে চলে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, অভিমান করে অথবা ঘেন্নায় এই বাড়ি থেকে চলে গেলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না কারো ওপর। আর ক্ষতি যদি হয় তো তারই। বরং মাকে ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত তার থাকা উচিত। অবনী তালুকদারের ওপর কোন বিশ্বাস নেই। আর যদি মা না ফিরে আসে তাহলে সে নিজের হাতে অবনী তালুকদারকে খুন করবে। কোন দয়া মায়া ক্ষমা নেই। আর সামনে থেকে প্রতি মুহূর্তে লোকটাকে যদি সে বোঝাতে পারে ঘেন্নার মাত্রাটা, তার চেয়ে আর স্বস্তি কিসে আছে? চলে যাওয়াটা তো সেন্টিমেন্টাল হঠকারিতার শামিল। সুদীপ বাড়ি ছাড়েনি। অবনী তালুকদার সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তবে মেয়েটা চলে গিয়েছিল। দোতলায় আর কোন কাজের মেয়ে আসেনি। মা ফিরে এলে, যখন নার্সিং হোমে রেখেও কোন কাজ হবে না জানা গেল, তখন বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর নার্স রাখা হল।

প্রথম প্রথম সুদীপ নজর রেখেছিল। না, অবনী তালুকদার কোনদিনই ওই সব সেবিকাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেননি। এবং তখনই একটা সত্য সে আবিষ্কার করেছিল, অবনী তালুকদার ফর্সা সুন্দরী কিংবা সাধারণ মহিলার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন না। সুদীপ নার্সদের সেন্টারে ফোন করে বলেছিল, 'পেসেন্ট চাইছেন তাঁকে নার্স করতে যাঁরা আসবেন তাঁরা যেন ফর্সা হয়। সেন্টার যেন সেটা খেয়ালে রাখেন।'

আয়কর বিভাগের একজন কর্মী অ্যালবামটা তুলে বললেন, 'কি আগলি!' তারপর অবনী তালুকদারের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকালেন। এবং এই সময় অবনী তালুকদারের মুখ দেখে মনে

হচ্ছিল তিনি কিছুই শুনছেন না, কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এসবে যেন কিছুই যায় আসে না তাঁর। এই সময় একজন অফিসার সুদীপকে ডাকলেন, 'ওই ঘরে আপনি থাকেন? আসুন।'

যেতে যেতে সুদীপ বলল, 'আমার ঘরে কোন লুকনো সম্পদ নেই।'

'তবু আপনি দরজায় দাঁড়ান, আমরা দেখছি।'

কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু কিছু লিফলেট, আনন্দর দেওয়া বই হাতে নিয়ে ভদ্রলোক ওর দিকে কয়েকবার তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ!'

একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল সুদীপ। রাজনীতি নিশ্চয়ই এঁদের আওতায় পড়ে না কিন্তু খবর পৌঁছে দিতে তো পারেন। কারণ ওই সব কাগজের কিছুটা সরকারের ভাল না লাগারই কথা।

মায়ের ঘর থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। সরু গলায় মা বারংবার প্রশ্ন করছিলেন, 'কি হয়েছে? এরা কারা?' জড়ানো শব্দগুলো খ্যানখেনে এবং দুর্বোধ্য।

শেষ পর্যন্ত সব দেখা হয়ে গেলে অফিসার বললেন, 'মাকে খাট থেকে নামাতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে অবনী তালুকদার হুঙ্কার দিলেন, 'খবরদার! সেরিব্র্যাল কেস। বেডসোর বেরিয়ে গেছে। ওই পেসেন্টকে নড়ালে আবার অ্যাটাক হতে পারে। তাই যদি হয় আমি ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।'

অফিসার বললেন, 'আমরা দুঃখিত। কিন্তু ওঁকে আমরা যত্ন করেই নামিয়ে নিচ্ছি। ব্যাপারটাকে হয়তো হার্টলেস বলে মনে হচ্ছে, বাট ইট্‌স মাই ডিউটি।'

অবনী তালুকদারের কোন আপত্তি টিকল না। আর সেই সময় সুদীপ আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল। যে মা সুস্থ অবস্থায় কোনদিন গলা তুলে কথা বলেননি, স্বামীর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রতিবাদ করেননি সেই মা হঠাৎ তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন। সেই চিৎকারে স্বামীর পক্ষ সমর্থন এবং আগন্তুকদের ওপর বিদ্বেষ স্পষ্ট।

আটটা কুড়ি ভরি ওজনের সোনার সাপ পাওয়া গেল তোশকের তলা থেকে। তোশকের ওপরটা বেডসোরের রসে ভিজে আছে, দাগ হয়ে গেছে কিন্তু তার তলায় সোনার সাপগুলো চুপচাপ শুয়ে ছিল। যে নার্সটি মায়ের সেবায় ছিল তার চোখ বিস্ফারিত। আর মা অদ্ভুত স্বরে কাঁদতে লাগলেন যখন সাপগুলোকে তুলে নেওয়া হচ্ছিল।

সমস্ত জিনিসের লিস্ট করে সইসাবুদ হবার পর ওরা চলে গেলে অবনী তালুকদার ছুটে এলেন এই ঘরে। সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। টেবিলের ওপর ব্যাগটা তখনও পড়ে আছে। জিনিসটার কথা খেয়ালই ছিল না সুদীপের। আয়কর অফিসাররা সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু চোখের সামনে টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটার কথা কারও খেয়ালে আসেনি। অবনী তালুকদার ছুটে গিয়েছিলেন ব্যাগটার কাছে। পরমতৃপ্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। সেখানে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

সুদীপ উঠে এসেছিল একটিও কথা না বলে।

মাঝে মাঝে খুব আপসোস হয়। নিজের হাতে সে ব্যাগটা আয়কর বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। কিন্তু সে এমন জায়গায় রেখেছিল যেখানে সকলের নজর আগে পড়বে। শেষে তালগোলে নিজেরও খেয়াল ছিল না কিন্তু ব্যাপারটা এমন হবে কে জানত! কি ছিল ওই ব্যাগটায় তা কোনদিন জানা যাবে না। আজ সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ব্যাগটার খোঁজ নিতে।

অবনী তালুকদার সেই ঘটনার পর নরম ব্যবহার করেননি ঠিক কিন্তু বিরক্তও করেননি। তবু এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। তাতে নিশ্চয়ই অবনী তালুকদার তৃপ্ত হবেন। সুদীপ আর একবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ কলকাতা। গাড়ির সংখ্যাও কমে এসেছে। কেউ নেই পথে, রাত্রের মতন যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। হঠাৎ সামনের রাস্তাটাকে অতিরিক্ত নির্জন বলে মনে হচ্ছিল তার।

যেন কোন নদীর ওপর থেকে কেউ তাকে ডাকছে অথবা ঝরনার শব্দের সঙ্গে পরিচিত কোন কণ্ঠ মিশে গেছে এইরকম একটা বোধ হওয়া মাত্র সুদীপের ঘুম ভাঙল। এবং তখনই স্পষ্ট একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল। তার নাম নয়, খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে কেউ বলল, 'শুনছেন, এই যে!'

সুদীপ চোখ মেলতেই নার্স-মহিলাটিকে দেখতে পেল। তার এই ঘরে এখন পর্যন্ত কোন মহিলা আসেননি। অতএব ঘোর কাটতে দুটো মুহূর্ত লাগল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। নার্স বললেন, 'আপনার মা জেগেছেন। আমি আবার ঘুমের ওষুধ দেব, যদি কথা বলতে চান তাহলে আসতে পারেন।'

সুদীপ বিছানা থেকে নেমে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করল।

মায়ের ঘরে ঢোকামাত্র শব্দটা কানে বাজল। খনখনে স্বরে মা কাতরাচ্ছেন। এখন তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ সুদীপ আবিষ্কার করল তার নিজস্ব কোন কথা বলার নেই। মাকে দেখতে এসেছিল আজ, নার্স বলেছিলেন, সেও মাথা নেড়েছিল মাত্র। এখনও ভোর হয়নি। ঘরে আলো জ্বলছে। সুদীপ মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মায়ের চোখ সিলিংয়ের দিকে। কাতরানিটা সমানে চলছে। নার্স মায়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মুখ নামিয়ে বেশ জোরে কথা বললেন, 'আপনার ছেলে এসেছে, দেখুন।'

যন্ত্রণায় কাতর মুখে প্রথমে অন্য কোন অভিব্যক্তি ফুটল না। কিন্তু নার্স কয়েকবার শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর মা মুখ তুললেন। নার্স আবার বললেন, 'ওই দিকে, আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।'

এবার মুখ নামল। চোখের তারা দুটো ঘুরে ঘুরে সুদীপের মুখের ওপর স্থির হল। কোনও শব্দ নেই। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চট করে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করল। সুদীপের শরীরে হঠাৎ কাঁপুনি এল। ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি সে পাচ্ছিল না। প্রায় পরিত্রাণের চেষ্টায় সুদীপ উচ্চারণ করল, 'মা!'

একটা শব্দ ছিটকে এল মায়ের মুখ থেকে। অস্পষ্ট উচ্চারণে বিকৃত হল শব্দ, কিছুই বোঝা গেল না। সুদীপ আর একটু এগিয়ে এসে মায়ের পাশে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ঘিনঘিনে গন্ধ টের পেল। পচা মাংসের গন্ধ। নার্স বললেন, 'গায়ে হাত দেবেন না।'

তখনও চোখের দৃষ্টি সরেনি। সুদীপ মুখ নামিয়ে করুণ স্বরে প্রশ্ন করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

কিছু কথা বলার চেষ্টা চলছিল তখন, অথচ শব্দগুলো কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। মায়ের মুখ উত্তেজনায় কাঁপছিল। সুদীপ চেষ্টা করছিল কথাগুলোর একটা মানে বুঝে নিতে। শেষ পর্যন্ত নার্স বাধা দিলেন, 'আর ওঁর উত্তেজিত হওয়া উচিত হবে না। আজ সন্ধ্যাবেলায় কথা এত জড়ানো ছিল না। আপনি এবার যান আমি ওষুধ দেব।'

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সুদীপ উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজার দিকে এগোতেই মা গোঙাতে লাগলেন। হঠাৎ সে স্থির হয়ে গেল। ওই গোঙানির মধ্যে যে শব্দদুটো সে শুনতে পেয়েছে তা কি সঠিক? সে ফিরে তাকাতেই মা [illegible] গেলেন। ঠোঁট বন্ধ। চোখে আকৃতি। এবং তখনই দু'চোখ বেয়ে জল নামল। মনের কথাটা ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে চোখের জলে তৃপ্ত হওয়া।

সুদীপ এক দৌড়ে ব্যালকনিতে চলে এল। ভোর হচ্ছে। কলকাতার মাথায় এখনও অন্ধকার সরেনি। অদ্ভুত শীতল বাতাস বইছে পৃথিবীতে। এখনও পথে মানুষজন নামেনি। সবে ফরসা হচ্ছে আকাশ। সুদীপ চোখ বন্ধ করল। তার সমস্ত শরীরে আবার কাঁপুনিটা ফিরে এল। কানের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি রক্তবিন্দুতে মিশে গেছে শব্দগুলো, 'কখন মরব খোকা?'

॥ ৩ ॥

সুদীপকে ছেড়ে দেবার পর আনন্দ কফি হাউসে ঢুকেছিল।

রাত বাড়লে অল্পবয়সী ছেলেরা যারা প্রেসিডেন্সি বা য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে তারা কফি হাউসে থাকে না। এই সময়টায় বয়স্ক মানুষের ভিড়। হৈ-চৈ হয় না। কেমন একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব। শুধু রাতের আইন-কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী জমিয়ে আড্ডা মারে এক দিকে। আনন্দ চারপাশে একবার তাকাতেই সুরথদাকে দেখতে পেল। সুরথদা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সুরথদার সঙ্গে যে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁকে আনন্দ চেনে না। সুরথদা ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলায় আনন্দ চেয়ার টানল।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, 'চারধারে আপাত শান্তি-শান্তি ভাব কিন্তু এই ব্যাপারটাই

আমার কাছে খারাপ লাগছে। খুব খারাপ ব্যাপার।'

সুরথদা বললেন, 'খারাপ কেন?'

'আরে ভাই, পাড়ার মাস্তানরা উধাও, কোন পরিটিক্যাল জঙ্গী অ্যাক্টিভিটিস নেই, কলাকাতার মানুষ তো ভেবেই নিচ্ছে তারা পরম শান্তিতে বাস করছে। বাট এটা তো সত্যি নয়!'

'কোন্‌টে সত্যি?'

'সেদিন মনুমেন্টের তলায় মিটিং হয়ে গেল। অর্গানাইজেশন কাজ শুরু করেছে। আরে আমার বাড়িতেও লিফলেট দিয়ে গেছে। খুব 'থ্রিলিং।'

'থ্রিলিং?'

'খুব। আমার মশাই একটা হবি আছে। আমি সব দলের মিটিং অ্যাটেন্ড করি। এদেরটাও করেছিলাম। কিন্তু পাবলিক যখন শান্তিতে মজে আছে তখন এদের কথা কি কানে ঢুকবে? খুব অশান্তি, চারপাশে ধুন্ধুমার কাণ্ড, প্রাণ অতিষ্ঠ হলেই পাবলিক পরিবর্তন চায় মশাই।' দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে একটি কফির দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'যাক, অনেকক্ষণ সময় কাটানো গেল। আপনি একা ছিলেন, আমিও, এখন আপনি দোকা হলেন, আমি যাই। নমস্কার।'

ভদ্রলোক চলে গেলে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কে সুরথদা?'

'চিনি না। তোমার জন্যে বসেছিলাম উনি এলেন।' সুরথদা বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমি কেন উটকো লোকের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছি? লোকটা তো পুলিশের কেউ হতে পারে। আমি ইচ্ছে করেই বলেছি। আমি যে বুদ্ধিমান নই, রাজনীতি নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই, এটা লোকটাকে বোঝানোর দরকার ছিল। যাক, ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমার খবর বল, গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দুটো কাণ্ড ঘটেছে। আমার হোস্টেলে কেউ এসেছিল খোঁজ-খবর নিতে। আমি কখন ফিরি, কার কার সঙ্গে মিশি এইসব ব্যাপার—।'

'দ্বিতীয়টা?'

'আজ মিটিং-এ আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি।'

সুরথদা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কফি খাবে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, না।

সুরথদা কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবশ্য খেতে চাইলে খাওয়াতে পারতাম না হয়তো। ওরা কফি হাউস আজকের মত বন্ধ করছে। চল বাইবে বেবিয়ে কথা বলি।'

কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে সুরথদা বললেন, 'প্রথমটা নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। যে কেউ তোমার খোঁজে আসতে পারে। তোমার দেশের লোকজন খবর নিতে পারেন, তুমি জানো না। কিন্তু মিটিং-এ মাথা গরম করার কোন মানে নেই। আমি তোমাকে বলেছি বিপদ ডেকে আনবে না। খামোকা মানুষকে সামনাসামনি চটাবে না। মতের অমিল হলে চেপে যাবে, পরে নিজের মত করে চাপানো সিদ্ধান্তটা কাজে লাগাবে।'

আনন্দ এক-চোখো ট্রামটাকে ছুটে আসতে দেখল। ঝড়ের মত শব্দ তুলে ওটা পার হয়ে গেলে সে বলল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁদের মতের কোন মিল হচ্ছে না। ওঁরা যে পথে চলতে চাইছেন সেটা পথই নয়।'

সুরথদা বললেন, 'দ্যাখো আনন্দ, পঁচাত্তর পর্যন্ত আমি জেলে ছিলাম। বাঁ চোখটায় কোনদিন দেখতে পাব না। সুতরাং আমি মূল্য দিয়েছি। পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর এই এগারোটা বছর আমার জীবনে খুবই মূল্যবান সময়। এই অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই কি?'

আনন্দ একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'সুরথদা, আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু যেভাবে দলের সবাই ভাবছেন সেটাকে আমার কার্যকরী বলে মনে হচ্ছে না।'

সুরথ হাসলেন, 'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না, তবে তোমার বয়স অল্প, একটা কথা খুব সত্যি জেনো, হঠকারিতা থেকে কোন ফল পাওয়া যায় না। আমরাও পাইনি।'

সুরথদার দিকে তাকাল আনন্দ। উত্তর কলকাতার একটা স্কুলে পড়ান সুরথদা। ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি মনে করেন ওরা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে

শেষপর্যন্ত সফল হওয়া যাবে?'

'আশা করতে দোষ কি?'

'আমি ভরসা পাচ্ছি না। শুধু বিপক্ষকে গালাগাল করলেই সাফল্য পাওয়া যায় না। জনসাধারণকে কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হয় আমরা তাদের উপকার করতে চাই। এটা না করলে আমরা কখনও তাদের সঙ্গে পাব না।'

সুরথদা আনন্দর কাঁধে হাত রাখলেন, 'তোমার হোস্টেলে কেউ খোঁজখবর করতে গিয়েছিল শুনেই তুমি নার্ভাস হচ্ছ, অথচ মাসের পর মাস পুলিশের ভয়ে আমরা কি না করেছি। সেসব গল্প তো তুমি জানো। আর শুধু পুলিশ নয়, রাজনৈতিক দলের গুণ্ডারাও আমাদের পেছনে পাইপগান নিয়ে তাড়া করেছিল। আসলে ব্যাপারটা তো ছেলেখেলা নয়। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে হবে। তুমি কি করতে চাইছ এইটে পরিষ্কার হওয়া দরকার। শুধু আবেগ নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা সবার আগে প্রয়োজন। তুমি একটু আগে জনসাধারণকে কাছে পাওয়ার কথা বলছিলে না? তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, একটা দল ঠিক কবল পশ্চিমবাংলাব মানুষ সুখে নেই, তাদের সুখী করতে হবে। তাদের রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে, নিরাপত্তা দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যে পরিবর্তিত অবস্থার কথা আমরা ভাবি তাই সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এই দেশে এখনই সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব নয়। সি পি এম-এর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং কংগ্রেসের শক্তির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে দেশের মানুষ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। নকশালরা সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এই দল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও থাকতে চায় না। তখন তারা একটি অভিনব পরিকল্পনা নিল। নির্বাচনের পাঁচ বছর আগে ওরা প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন প্রার্থী নির্বাচন করল। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল এই পাঁচ বছর সে তার এলাকার মানুষেব প্রতিটি সমস্যার পাশে দাঁড়াবে। নিজের ব্যবহার এবং কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের ভালবাসা অর্জন করবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে মানুষের সেবায় লাগবে। পাঁচ বছর ধীরে ধীরে সে এইভাবে মানুষের আস্থা দখল করবে। তারপর নির্বাচন এলে সে যখন প্রার্থী হয়ে সামনে আসবে তখন মানুষ তাকে ভালবেসেই ভোট দেবে। এই পাঁচ বছরে তারা জেনে যাবেই প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে এমনি একটি মানুষ মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। আর সেই মানুষের দল সামগ্রিকভাবে চাইছে দেশের পটপরিবর্তন। এইবার আনন্দ, তুমিই বল, নির্বাচনের ফল কি হবে?' অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে একটু ক্লান্ত সুরথদা আগ্রহের সঙ্গে তাকালেন।

আনন্দ বুঝতে পারছিল না কি উত্তর হওয়া উচিত। 'তবে এটা ঠিক এই দলের সভ্যদের কেউ কেউ জিততে পারেন কিন্তু সবাই জিতবেন বা দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এই আশা করা অন্যায়।' সে এই কথাই বলল।

সুরথদা বললেন, 'কেন? পাঁচ বছরের সেবার কোন দাম দেবে না জনসাধারণ?'

আনন্দ বলল, 'আসলে এখন প্রত্যেক মানুষ একটা অভ্যাসের মধ্যে এসে গিয়েছে। হয় সি পি এম নয় কংগ্রেস, ভোট দেবার সময় এই দুটোই ওদের লক্ষ্য হয়। অচেনা কোনও দলের প্রার্থী এককভাবে কিছু করছে এবং সেটা যতই ভাল কাজ হোক না কেন, ভোট দেবার সময় সেটা বোধহয় তারা ভাববে না।'

সুরথদা বললেন, 'কথাটা অর্ধসত্য। নোন ডেভিল ইজ বেটার দ্যান আননোন! ঠিক আছে। তবে এদেশের মানুষ নির্বাচনের সময় আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। মিসেস গান্ধীকে যখন হত্যা করা হল তখন কংগ্রেস যদি রাজীব গান্ধীর বদলে প্রণব মুখার্জিকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচন চাইত তাহলে হেরে ভূত হয়ে যেত। আসলে দেশের মানুষ এখনও দেখতে চায় যে দলকে তারা ভোট দিচ্ছে তাদের নেতা কে? তার প্রতি আস্থা রাখা যায় কিনা! জ্যোতিবাবু যদ্দিন সি পি এম-এর নেতা থাকবেন তদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে না। পাঁচ বছর কাজ করেও ওই দল একটিও আসন পাবে না যদি তাদের নেতা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন না হন। নকশাল আন্দোলনে কি প্রকৃত অর্থে কোন নেতা ছিলেন? চারু মজুমদার কিংবা কানু সান্যাল কি জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় নেতা, সেই সময়ে? এখনও ব্যক্তিপূজার মানসিকতা এই দেশ থেকে দূর হয়নি। তাই তুমি যা ভাবছ তা আমাদের সেই হঠকারী

ভাবনার রূপান্তর না হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কি হল?'

'আমরা অ্যাকশনে নামছি।'

'তুমি সুদীপ কল্যাণ?'

'আর জয়িতা!'

'হোয়াই জয়িতা?'

'ও নিজেকে যোগ্য মনে করে। তাছাড়া আমরাও ওকে মেয়ে বলে মনে করি না।'

'কিন্তু আফটার অল সে মেয়ে!'

'হতে পারে। কিন্তু তার ব্যবহার এবং আচরণে মেয়েলিপনা নেই।'

'ব্যাপারটা আর কে কে জানে?'

'আজকে যে তিনজনের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা আর আপনি।'

'যদি ধরা পড়?'

'পড়ব। অন্তত কাগজে খবরটা বের হবে। চারটে তরুণ ছেলেমেয়ে একটা পরিকল্পিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। হয়তো এই ঘটনা আমাদের মত অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সুরথদা, আমরা পুলিশের গলা কাটতে যাচ্ছি না, মূর্তি ভাঙার বোকামিও করব না। আসল কাজ করতে না পারার অক্ষমতায় বোকার মত নকল বিদ্রোহ-বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি করব না। আমরা সেইসব জায়গায় আঘাত করতে চাই যা মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকার পথটাকে আইনের ফাঁকির সুযোগ নিয়ে নোংরা করে দিতে চাইছে। উই উইল ডু ইট ওয়ান আফটার অ্যানাদার।' খুব নির্লিপ্তের মত কথাগুলো বলল আনন্দ।

সুরথদা কিছুক্ষণ ওর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। আমি সেন্ট্রাল কমিটির সঙ্গে কথা বলব। তোমাদের মত ব্রাইট ছেলেকে আমরা পেয়েছি, স্পষ্টই বলছি আমরা তোমাদের হারাতে চাই না।'

ঠিক এই সময় একটি পুলিশের ভ্যান বউবাজারের দিক দিয়ে ছুটে আসছিল। ভ্যানটা এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। সুরথদা বললেন, 'একসময় এই বস্তুটিকে দেখলে আমার হৃদ্‌কম্প হত। ইনি কি উদ্দেশ্যে এমন আচমকা দাঁড়ালেন?'

ভ্যানটার দিকে তাকিয়ে আনন্দর অস্বস্তি হচ্ছিল। কোন কারণ নেই, তবু। ভ্যানের দরজা খুলে একজন পুলিশ অফিসার নেমেই চিৎকার করলেন, 'কি রে সুরথ?'

তারপর ট্রাম রাস্তাটা পেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুললেন ভদ্রলোক, 'কি ব্যাপার, চিনতে পারছিস না?'

'ও তুই! কি খবর?' সুরথদাকে ঠিক স্বচ্ছন্দ বলে মনে হল না।

'চলছে গুরু। পুলিশের চাকরি করলে যেমন চলে আর কি! ওঃ, কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় পনেরো বছর, তাই না? রাউন্ডে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ তোর দিকে নজর পড়ল। মনে হল এ মালকে আমি চিনি। দ্যাখ ভুল করিনি।'

'না, ভুল করিসনি।'

'সেদিন রাইটার্সে সৌমিত্রর সঙ্গে দেখা হল। আরে ইকনমিক্স পড়ত, মনে নেই? ও শালা এখন সেক্রেটারি হয়ে গেছে। আমাকে চিনতে পেরেও ভাল করে কথা বলল না। মানতেই হবে, আফটার অল আমি একটা সাব-ইন্সপেক্টর, কলেজের বন্ধুরা কেউ কাউকে মনে রাখবে কেন? আমার সঙ্গে কথা বলতে তোর আবার অস্বস্তি হচ্ছে না তো?' হো হো করে হাসলেন ভদ্রলোক।

'না না। তুই পুলিশে চাকরি করছিস পেটের প্রয়োজনে।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তুই বোধহয় একটা কথা জানিস না—।'

'কি ব্যাপার?'

'সেভেনটি ওয়ানে আমি বউবাজার থানায় ছিলাম। একদিন রাত এগারোটায় হুকুম এল ডেঞ্জারাস নক্সালাইট নেতা লুকিয়ে আছে আমাদের এলাকায়। ইমিডিয়েটলি তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। গাড়ি নিয়ে ছুটলাম। সাফিসিয়েন্ট সেপাই ছিল সঙ্গে। নম্বর মিলিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম।

মেসোমশাইকে জিজ্ঞেস করিস আমি পনের মিনিট সময় ফালতু নষ্ট করেছিলাম। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে মেসোমশাইকে আটকে রেখে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম কেন এসেছি। পনেরো মিনিট পরে যখন অ্যাকশন নিলাম তখন তুই হাওয়া হয়ে গেছিস।' ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন, 'ওপরওয়ালা জানলে আমার চাকরি চলে যেত। কিন্তু আমি কি করে কলেজের বন্ধুকে সুযোগ না দিয়ে অ্যারেস্ট করি বল্?'

'ধন্যবাদ।' সুরথদা যেন ব্যাপারটা আনন্দের সঙ্গে নিলেন না, 'তুই নিজের হাতে ক'টা মানুষ মেরেছিস এতকাল?'

'হিসেব করিনি। কেউ যখন আমাকে খুন করতে চেয়েছে তাকে মেরেই আমাকে বাঁচতে হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বোস কত মানুষকে খুন করেছেন?'

'মানে?' আনন্দ এবার প্রশ্ন না করে পারল না।

'আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষ বসু। তাঁরই হুকুমে ফৌজ যুদ্ধ করেছে ব্রিটিশদের সঙ্গে। অতএব প্রতিটি শত্রুর মৃত্যুর পেছনে সুভাষ বসুর নিশ্চয়ই দায়িত্ব ছিল। সুভাষ বোসকে কি খুনী বলবে?'

সুরথদা বললেন, 'চমৎকার যুক্তি। তবে তুই যা বললি তাই যদি করে থাকিস তাহলে একটা ধন্যবাদ পাওনা ছিল, দিলাম। অবশ্য তোর জাতভাইরা আমার চোখটাকে নষ্ট করেছে এটাও সত্যি ঘটনা।'

হঠাৎ কথাবার্তা থেমে গেল। আনন্দ বুঝতে পারছিল যে-আবেগ নিয়ে ভদ্রলোক ভ্যান থেকে নেমে এসেছিলেন সেটা এখন উধাও হয়ে গেছে। সুরথদার কাটা কাটা কথাই এই আবহাওয়াটা তৈরি করল। শেষপর্যন্ত আনন্দই বলল, 'সুরথদা, আমার দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমি কাল সম্ভব হলে আপনার সঙ্গে কথা বলব।' সুরথদা নীরবে মাথা নাড়লেন।

পা চালাল আনন্দ। কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে মোড় ঘোরার আগে সে পেছনে তাকাল। দূরে দুটো ছায়ামূর্তি এখনো কথা বলছে। আর দুটো সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে। সুরথদাও সিগারেট ধরিয়েছেন। এবং তখনই আনন্দ বুঝতে পারল সে ছিল বলেই সুরথদা ওইভাবে কথা বলছিলেন। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বললে যদি আনন্দ কিছু ভেবে বসে তাই ছাড়-ছাড় ভাব দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা তেতো হয়ে গেল আনন্দর কাছে। পুলিশ অফিসার একসময় পুরোনো বন্ধুত্বের জন্যে উপকার করেছিলেন সুরথদার। অথচ নিজের ইমেজ বাঁচাবার জন্যে এতক্ষণ অভিনয় করলেন সুরথদা। এখন নিশ্চয়ই তাঁর চেহারা স্বাভাবিক হয়েছে। আনন্দর সুদীপের কথা মনে পড়ল। সুদীপ সুরথদাকে পছন্দ করে না। প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, বহুৎ জালি লোক। আনন্দ ওকে বহুবার এইরকম শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু সুরথদার মাধ্যমেই তো দলের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের। সুদীপ বলে, 'দ্যাখো ভাই, নকশাল আন্দোলন যারা করেছিল তারা খুব হিম্মতবাজ, নো ডাউট। কিন্তু এখন তো সব ওই ইমেজ নিয়েই হিরো হয়ে বসে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে আর ফ্যাট গ্যাদার করছে। জিজ্ঞাসা করলে হিস্ট্রি ঝাড়বে। আরে তার রেজাল্ট কি হল! যা ছিল তাই রইল, মাঝখান থেকে নাম কিনল।' জয়িতা এর সঙ্গে যোগ করেছিল, 'বাবার ক্লাবে রোজ ড্রিঙ্ক করতে আসেন এক ভদ্রলোক। জেল-টেল খেটেছেন, তাত্ত্বিক নকশাল ছিলেন, এখন পাবলিক রিলেশনস অফিসার। সবাই খুব খাতির করে।' সুদীপ মাথা নাড়ে, 'এই মালটাও সেই সুযোগ খুঁজছে।'

সুদীপ কিংবা জয়িতার সঙ্গে একমত নয় আনন্দ। ওরা সবসময় ওইরকম চড়া দৃষ্টিতে সবকিছু দ্যাখে। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে চারপাশে যা দেখেছে তাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। কল্যাণ সেদিক দিয়ে বেশ চুপচাপ। কোন ব্যাপারে চট করে মন্তব্য করে না। শুধু মাঝে মাঝে বলে, কিছু একটা করো। এভাবে ভাল লাগছে না। সুদীপ কিংবা জয়িতার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল কিন্তু বোঝাই যায় আনন্দর ওপরেই সে নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত আনন্দ কল্যাণকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয় এটুকু সে জানে কিন্তু কোনদিন নিজের বাড়িতে ও কাউকে নিয়ে যায়নি।

হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াল আনন্দ। রাস্তাটায় আলো নেই। গেট বন্ধ। কিছু দিন আগে এই হোস্টেলের একটা ছেলেকে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে খুন করা হয়েছে। তারপর থেকে কর্তৃপক্ষ খুব কঠোর হয়েছেন। খবরের কাগজে লেখালেখি এবং পুলিশী তৎপরতায় আনন্দর অবস্থা বেশ করুণ হয়েছিল

তখন। কিন্তু এত বড় হোস্টেলের ছাত্রদের ম্যানেজ করা সুপারের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা।

দরজা খোলার দরকার নেই। আনন্দ চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকল। তিনবারের বার সাড়া মিলল, 'কৌন হ্যায় জী?'

নিজের নাম বলে খাঁজে পা রেখে কাঠের গেটের ওপর উঠে বসল আনন্দ। তাকে দেখতে পেয়ে দারোয়ান ভীত গলায় বলল, 'আমার নোকরি খতম হয়ে যাবে বাবু।'

ওপাশে একটা মই আছে। দারোয়ান সেটাকে কাছে নিয়ে আসতে চটপট নেমে এল আনন্দ। তারপর বলল, 'আর বেশি দিন জ্বালাব না, ভয় নেই।'

লম্বা করিডোর দিয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা বন্ধ। ডুপ্লিকেট চাবি আনন্দর পকেটে আছে। সুরজিৎ এখনও ফেরেনি। এখন হোস্টেল অন্ধকার। হয়তো ডাইনিং রুমে গিয়ে হুজ্জত করলে কিছু খাবার পাওয়া গেলেও যেতে পারে কিন্তু সেই ইচ্ছে করল না আনন্দর। সুপারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নেই। খাবার চাইতে গেলে নানান প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। এবং তখনই মনে হল খিদেটা পাচ্ছে। একটা রাত না খেয়ে থাকলে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি রাত্রি অনাহারে কাটায়। সুতরাং ব্যাপারটা কিছুই নয়। চোখ বন্ধ করল সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘুম আসছে না।

হঠাৎ এখন মায়ের কথা মনে পড়ল আনন্দর। মা শব্দটা উচ্চারণ করলে যে চেহারাটা মনে আসে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। একা একটার পর একটা বাধা ডিঙিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছেন এখনও। আনন্দ যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমার কাছে কোন প্রত্যাশা করি না। বড় হয়েছ, নিজে কি করবে তা নিজেই বিচার করো। কর্মফল তুমিই ভোগ করবে। আমি তোমার খাওয়া থাকা পড়ার খরচ দিতে পারব আগামী ছয় বছর।'

মাকে কখনও আবেগের শিকার হতে দ্যাখেনি সে। বাবা ছিলেন খুব আমুদে মানুষ। কথায় কথায় মন খারাপ করতেন, মন ভাল হতেও সময় লাগত না বেশি। তখন ডায়মন্ডহারবারের বাড়িতে ওরা থাকত না। ওই বাড়ির দায়িত্ব ছিল এক কাকার ওপর। বাবা মাঝে মাঝে যেতেন সেখানে দেখাশোনার জন্যে। তখন বেশ ছোট আনন্দ। নিচু ক্লাসে পড়ে। বাবা চাকরি করত ভাল। রকমারি খাবারদাবার হত রোজ। শনি রবিবার গাড়িতে করে বেড়াবার রেওয়াজ ছিল। ওই বয়সেই আনন্দর মনে হত বাবা মাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। তাকে যা বাসে তার চেয়েও বেশি। এবং মা-ও তাই। এটা কি করে পাঁচ বছরের ছেলের বোধে এল তা এখন বুঝতে পারে না আনন্দ। কিন্তু সেই অনুভূতিটার কথা কথা মনে আছে। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছে বাবা আর মা ব্যালকনিতে পাশাপাশি বসে আছে চুপচাপ। ওদের ফ্ল্যাটটা ছিল চারতলায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনেকটা আকাশ দেখা যেত। সেখানে একটা ছোট বেতের সোফা ছিল। মা বাবা অত রাত্রে প্রায় জড়িয়ে ধরে কেন চুপচাপ বসে থাকত তা আনন্দ তখন বোঝেনি। কিন্তু সেই সময় হিংসে হত। সে জিজ্ঞাসা করত, 'আমি কি তোমাদের সঙ্গে বসতে পারি?'

চমকে উঠে বাবা বলতেন, 'আরে, হ্যাঁ, চলে এস।'

আর মা উঠে দাঁড়াতেন, 'না। তোমাকে আসতে হবে না। চল আমি তোমার সঙ্গে শুচ্ছি। কাল সকালে স্কুল আছে। এইটুকুনি ছেলে মাঝরাত্রে জেগে বসে থাকবে!'

কেমন একটা স্বপ্নের মত ছিল দিনগুলো। বাবা প্রায়ই ট্যুরে যেতেন। ফিরতেন যখন কিছু না কিছু আনতেন ওর জন্যে। আর ওর সঙ্গে অদ্ভুত সব রসিকতা করতেন যার অর্থ ও বুঝতে পারত না বেশিরভাগ সময়। একদিন গড়ের মাঠের কাছে গাড়িতে বসে ওর তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। জল খেতে চেয়েছিল সে। বাবা একটা রেস্তোরাঁর দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'শোন, বড় হয়ে কোনও মেয়ের কাছে জল চাইবে না।'

মা বলেছিলেন, 'আঃ কি বলছ?'

সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন হেসে, 'আনন্দ, জল দাও বললেই সে চণ্ডালিকা হয়ে যাবে।' এখন কথাগুলো মনে পড়লে লোকটাকে খুব ভাল লাগে তার। নরম মনে হয়। ঘটনাটা তার মনে আছে। বাবা গিয়েছিলেন

জামসেদপুরে। তিনদিনের কাজ ছিল। ঠিক একদিন পরে টেলিফোনটা বাজল। তখন টেলিফোন বাজলেই ছুটে যেত সে। কেউ তোলার আগেই হ্যালো বলতে বেশ মজা লাগত। হ্যালো বলতেই ওপাশে কেউ ইংরেজিতে প্রশ্ন করল। তদ্দিনে দুটো শব্দ শিখেছিল আনন্দ। 'হোল্ড অন' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে মাকে ডাকতে ছুটেছিল। মা তখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালেতে খোঁপা জড়িয়ে হাউসকোটের বোতাম আঁটছিলেন, সহজ পায়ে এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে কানে দিয়ে বললেন, 'হেলো!'

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে ছিল আনন্দ। ওর বিশ্বাস ছিল ফোনটা বাবার। অপারেটর লাইন ধরে মাকে দিচ্ছে। ও একবার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু আনন্দ অবাক হয়ে দেখল মায়ের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। থর থর করে কাঁপতে লাগলেন মা। রিসিভারটা টেবিলের ওপর রেখে থপ করে বসে পড়লেন পাশের চেয়ারে। দু'হাতে তাঁর মুখ ঢাকা, শরীর প্রচণ্ড কাঁপছে। আনন্দ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে রিসিভারটা কানে তুলে যান্ত্রিক শব্দ শুনল। সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে মায়ের দিকে তাকাল সে। মা হঠাৎ এক পাশে ঢলে পড়লেন। তার চোখ বন্ধ। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। আনন্দ চিৎকার করে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দৃশ্যটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। তাদের ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না। কাজের লোকটাও দেশে গিয়েছিল। মায়ের শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে সে ঝাঁকাতে চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে। শেষ পর্যন্ত মা চোখ খুললেন। এবং তখন সেই মাকে তার একদম অচেনা মনে হচ্ছিল। দু'হাতে তার কাঁধ ধরে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার কি হয়েছে মা?'

মা ঠোঁট কামড়েছিলেন। তারপর অদ্ভুত গলায় বলেছিলেন, 'আমাদের এখনই জামসেদপুর যেতে হবে আনন্দ। তোমার বাবা—।'

'বাবা যেতে বলেছে?'

'না। তোমার বাবা নেই। আজ সকালে তাকে হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি ঘুমের বড়ি খেয়েছেন। কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি শক্ত হতে পারব না।'

তাকে নিয়ে মা একা গিয়েছিলেন জামসেদপুরে। সেখানে তাদের চেনাশোনা মানুষ কেউ ছিল না। পাগলের মত মা থানাপুলিশ করে শেষ পর্যন্ত ওখানকার কয়েকজন বাবার অফিসের লোকের সাহায্যে মৃতদেহ সৎকার করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে মা ভীষণ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে কলকাতার বাড়িতে যেসব আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন তাঁরা নিজের মত বাবার মৃত্যু নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতেন। মা কোনদিন সেই আলোচনায় অংশ নেননি। মাস কয়েক বাদে মা কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে এলেন ডায়মন্ডহারবারে। বাবার পৈতৃক বাড়িতে। আনন্দর বাকি স্কুলজীবন কেটেছে ডায়মন্ডহারবারে। বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে কোনরকমে চলে গিয়েছে দিনগুলো। নিজেকে একদম পালটে ফেলেছেন মা। গ্রামের স্কুলে এখনও পড়াচ্ছেন। অদ্ভুত কিছু নিয়মের পরিখায় জীবনটাকে প্রবাহিত করেছেন তিনি।

আজও বাবার মৃত্যুটা আনন্দর কাছে রহস্য হয়ে রইল। একটা হাসিখুশী মানুষ, সব ব্যাপারেই যাঁকে তৃপ্ত বলে মনে হত, তিনি কি কারণে গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খেতে যাবেন বাড়ি থেকে অনেক দূরে হোটেলে বসে? সেই হোটেলে গিয়ে জানা গিয়েছিল, ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন বাবা। অপারেটর কিছুতেই লাইন দিতে পারেনি। কি কথা বলতে চেয়েছিলেন বাবা? বড় হয়ে আনন্দ একদিন সরাসরি মাকে প্রশ্নটা করেছিল। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'জানি না।' এত চেষ্টা করলাম তবু জানলাম না। এখন মনে হয় না জানতে চাওয়াই ভাল। যে পৃথিবী থেকে অকালে স্বেচ্ছায় চলে যায় সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে সুখী ছিল না। তার দুঃখের কারণটা জানতে চেয়ে এখন আর আমি কি করতে পারি!'

খিদেটা কিছুতেই মরছিল না। আর খিদে না গেলে ঘুমও আসবে না। আনন্দ উঠে বসল। গতবার যখন ডায়মন্ডহারবারে গিয়েছিল তখনই মায়ের সঙ্গে সে সোজা কথা বলে নিয়েছিল। সে যা ভাবছে, যা যা করবে বলে পরিকল্পনা করছে তার বিশদ বিবরণ মাকে জানিয়েছে। মা চুপচাপ শুনেছেন, তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, 'তুমি নিজে যা ঠিক মনে করবে সেটাই করবে। আমি তোমার পড়াশুনার খরচ দিচ্ছি মানে এই নয় বিনিময়ে তোমার কাছে কিছু আশা করছি। তবে শুধু আমি একটি কথা বলব, সাহস আর হঠকারিতা এক জিনিস নয়।'

কথাটা আনন্দ ভালভাবেই জানে। এই দেশে, এই সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিপ্লব সম্ভব নয়। ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবের কথা কেউ উচ্চারণও করছে না। চারপাশের বিস্তর অন্যায় অবিচারের সঙ্গে মানুষ চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমন কি সে নিজে যে দলের সঙ্গে যুক্ত তারাও বিপ্লবের কথা বলে না। অথচ ওইরকম একটা বাতাবরণ তৈরি করে নিজেদের জঙ্গী চেহারায় দেখতে ভালবাসে।

কানাঘুষো শুনেছিল কিছুদিন আগে থেকেই। এবার ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এল। জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে প্যারাডাইস। কয়েকটা নিরীহ গ্রামবাসীর সামনে বড় পাঁচিল তুলে বিশাল এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে তৈরি হয়েছে মনোরম উদ্যান। বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা গাছের চারা এখন বড় হয়েছে। ফুল ফুটছে সারা বছর। সমস্ত বাগানটা যাতায়াতের জন্যে সিমেন্টের সরু পথ যা বিভিন্ন কটেজের গা ঘেঁষে পাক খেয়েছে। এই কটেজগুলোর অধিকাংশই এয়ার কন্ডিশনড। এক রাত্রের জন্যে প্রায় আড়াইশো থেকে চারশো টাকা দক্ষিণা দিতে হয় সেখানে থাকতে হলে। এছাড়া আছে সুইমিং পুল; টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। আর আছে কুঁড়েঘর। যার দেওয়াল নেই, মাথার ওপর খড়ের চাল, চারপাশের চারটে খুটির ওপর পর্দা গোটানো আছে, ইচ্ছে করলেই দেওয়াল তৈরি করে নেওয়া যায়। কুঁড়েঘরে ফ্যান আছে, আলো আছে, মোটা গদি পাতা নিচে। উর্দিপরা শিক্ষিত বেয়ারারা খাবার নিয়ে ঘোরাঘুরি করে দিনরাত সরু প্যাসেজ দিয়ে। খুব শক্তিশালী জেনারেটর চালায় প্যারাডাইস। খাবারের দাম আশেপাশের গ্রামবাসীর কল্পনারও বাইরে। এইরকম একটা স্বর্গের মত বাগানে প্রবেশ করতে গেলেই টিকিট কাটতে হয় মোটা টাকায়। তাতে শুধু ঘুরে বেড়ানো যায়। থাকা এবং খাওয়ার জন্যে আলাদা দাম দিতে হবে। এক সপ্তাহের বাজারের দাম খুইয়ে গ্রামের কোন মানুষ এখানে ঢোকেনি আজ পর্যন্ত। এই উদ্যান গ্রামের মানুষের কাজে লাগে না। গ্রাম থেকেও উদ্যানের মালিক কোন কিছু সংগ্রহ করে না। এইরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গা, ডায়মন্ডহারবারের বাঁক যেখানে অনেক কিলোমিটার দূরে সেখানে রাস্তার পাশে ওই উদ্যান কেন তৈবি হল? এত টাকা খবচ করে কেন আসবে লোকে এখানে থাকতে? প্রশ্নটা গ্রামের মানুষের মনে জেগেছিল। উত্তর পেতে দেবি হয়নি। দিনবাত গাড়ি আসছে। শিক্ষিত প্রহরী দিয়ে ঘেরা এই উদ্যানের গেট খুলে গাড়িগুলো ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। সেখানে কি হচ্ছে গ্রামের মানুষের জানা নেই। তবে বেশির ভাগ গাড়িতেই মহিলা থাকছেন। কেউ কয়েক ঘণ্টা, কেউ গোটা রাত, কেউ বা তিনটে দিন কাটিয়ে ফিরে যায় কলকাতায়। প্রথম প্রথম গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দেখত এইসব মানুষদের ঢোকা বা বের হবার সময়। আইনের সাহায্যে তাদের সেখানে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ নিষ্ফল গজরায়, মুখরোচক গল্প তৈরি করে। অতি বড়লোকদের অবৈধ কাজের বাগানবাড়ি ওটা। ছেলেমেয়েদের শাসন করে ওদিকে না যেতে। কিন্তু ব্যাপারটার প্রভাব পড়ছে অল্পবয়সীদের ওপর। অথচ কেউ নেই প্রতিবাদ করার। দুটো রাজনৈতিক দল এখন গ্রামে সক্রিয়। তারা বলেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাউকে বিরক্ত না করে, শান্তি বিঘ্নিত না করে যদি স্বাস্থ্যনিবাস চালায় তাহলে প্রতিবাদ করার কোনও রাস্তা নেই। প্যারাডাইসের মালিক প্রতি মাসে তিন জায়গায় মোটা টাকা খরচ করে থাকে এটা এখন প্রচারিত। দুটো রাজনৈতিক দল এবং পুলিশের আরও হাজারটা সমস্যা আছে। স্বাস্থ্যনিবাসকে ব্যভিচারের উদ্যান ভাবার কোন কারণ তাঁরা খুঁজে পান না।

সুদীপকে নিয়ে আনন্দ জায়গাটাকে ভাল করে দেখে এসেছে। কোন রকম ছিদ্র রাখেননি প্যারাডাইসের মালিক। সাধারণত গাড়ি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। তবে সঙ্গে মেয়ে থাকলে রিকশায় কেউ **কেউ** ঢুকে গেছে। চোখ বন্ধ করলেই আনন্দ দেখতে পায় সমস্ত গ্রাম ঘুটঘুটে অন্ধকার আর প্যারাডাইসে আলোর ঢল নেমেছে।

সুদীপ কল্যাণের সঙ্গে সরাসরি স্পষ্ট কথা হয়ে গেছে। দ্বিধা জয়িতাকে নিয়ে। মেয়েটা কথা বলে কাট কাট। যদিও ওকে কখনও মেয়ে বলে মনে হয় না আনন্দর। কলেজে ঢোকার পর থেকেই চারজনে কখন এক হয়ে গেল টের পায়নি। মেয়ে বলে কোন সহানুভূতি দেখাতে গেলে প্রচণ্ড খেপে যায় জয়িতা। অতএব ওকে দলে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আজ পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোন লাভ হল না। ওদের কথার সঙ্গে সুরথদার কোনও পার্থক্য নেই। ঠিক এই অবস্থায় চিরদিন থাকলে চারজনেই জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিয়ে সুখী ভারতীয় নাগরিক হতে পারত। সেই যোগ্যতা তাদের ছিল। কল্যাণ বলে কিছু একটা

করো। সুদীপ বলে একটা ঢেউ তুলে খতম হয়ে যাই ক্ষতি নেই। যদিও রাজনৈতিক শিক্ষা এই উদ্দামতাকে সমর্থন করে না। আনন্দর টেবিলের রাজনীতির বইগুলো কখনই এই কথা বলবে না। তবু মনে হচ্ছে থিয়োরির বাইরে গেলে কেমন হয়। নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী ধাক্কা দিতে পারলে কেউ কেউ হয়তো এগিয়ে আসবে। ভারতবর্ষের মানুষের দুরবস্থার জন্যে কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকার দায়ী নয়। দায়ী তারা নিজেরাই। এই অলস কর্মবিমুখ শুধু পেতে-চাওয়া এবং নিজেরটা বোঝার মানুষগুলোকে একাত্তর সাল কোন নাড়া দিতে পারেনি। টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে তারাও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারবে। অন্তত তৃপ্ত হতে পারবে।

ঘরে কোন খাবার নেই, কাল সকালের আগে জুটবে না, আনন্দ আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করল।

ঘুম থেকে উঠেই কল্যাণের মনে হয়েছিল মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরে ব্যথা, জ্বরটা বেশ জমিয়ে এসেছে। খাট থেকে নামতে গিয়েই সে টের পেল আজকের দিনটা বাড়িতেই আটকে থাকতে হবে। সে কিছুক্ষণ খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। এখন কত বেলা বোঝা যাচ্ছে না। এককালে যে টেবিল ক্লকটা সময় জানাত সেটা দু'হাত ছড়িয়ে স্থির হয়ে আছে বছরখানেক। সুজন নেই। যদি এখন আটটা বেজে গিয়ে থাকে তাহলে তার থাকার কথাও নয়।

'নাহয় প্রথম পনেরো দিন রান্নাঘরে তিনি ঢুকবেন না, তাই বলে আমার মাথা ধরলেও উনুনে হাত পোড়াতে হবে। কেন যে ছাই এখানে পড়ে আছ তা বুঝি না!' গলাটা বড়বৌদির। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলায় ঝাঁজ ফুটল, 'হিসেবের ডিউটি করতে এসেছেন এই বাড়িতে! সকালে উনুন ধরিয়ে জল চাপিয়েই তিনি ঘরে ঢুকেছেন।'

বড়দা চাপা গলায় বলল, 'আমি কিছু জানি না। সাড়ে নটায় বেরুবো, তার আগে খাবার চাই। মাথা ধরলে যে তুমি সিমপ্যাথি পাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।'

বাবার গলা শোনা গেল, 'কি হচ্ছেটা কি! মেজবৌমার তো এই পনেরো দিন রান্নার ঘরে ঢোকার কথা নয়। সে উনুন ধরিয়েছে এই তো অনেক কথা।'

'তুমি চুপ করো। এক পয়সা দেবার মুরোদ নেই কথা বলতে আস কি সাহসে! মিলেমিশে না থাকতে পারলে এই বাড়ি ছাড়তে হবে বলে দিলাম।' মায়ের পায়ের আওয়াজ কানে গেল কল্যাণের। তিনি রান্নাঘরে যাচ্ছেন।

এই বাড়িতে বাবা এসেছিলেন চল্লিশ বছর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাকি কলকাতায় খুব সস্তায় বাড়ি পাওয়া যেত। চারঘরের এই বাড়ির ভাড়া এখনও সত্তর টাকা। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছাকাছি এমন বাড়ির চারখানা ঘরে থাকে কল্যাণ এবং তার ভাই সুজন, বাবা মা, বড়দা বউদি এবং মেজদা মেজবউ। চারটের মধ্যে দুটো ঘর বাসযোগ্য, একটায় কোনমতে থাকা যায়, চতুর্থটায় রান্না হত আগে। মেজদা কাণ্ডটা করে বসার পর থেকে রান্না হয় বারান্দার ঘেরা জায়গাটায়, রান্নাঘরটা একটু মেরামত করে নিয়ে মেজদার ঘর হয়েছে। বাড়িটায় ইঁদুর আছে প্রচুর। মেজদার ঘরেই বেশি যাতায়াত।

কল্যাণ বাবাকে আর কথা বলতে শুনল না। কিন্তু বড়দা বলল, 'বাবা, মা আমার কাছে সামনের মাসে একশ টাকা বেশি চেয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম আমার পক্ষে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোমার মাকে বল, আমি কিছু জানি না। সংসার চালান তিনি।'

'জানেন না তো অন্যের হয়ে ওকালতি করতে আসেন কেন?' এটা বড়বউদির গলা।

'যূথিকা, আমাকে কথা বলতে দাও। কল্যাণ এখনও বাড়িতে আছে।'

'আছে তো আছে। আমি কি তার খাই না পরি যে ভয় করতে যাব! তুমি কথা বলবে, দেখো আবার মিন মিন করে রাজী হয়ে যেয়ো না।' বউদি বোধ হয় বারান্দা থেকে নিজের ঘরে চলে গেল। আজ যদি বাড়িতে থাকতে হয় তো সারাদিন এইসব সংলাপ শুনতে হবে। কল্যাণ উঠল। হাঁটার সময় মাথা

ঘুরছিল। কিন্তু সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখামাত্র সবাই চুপ করে গেল। বড়দা কিছু হয়নি এমন ভান করে রয়েছে। তার পরনে বউদির শাড়ি, লুঙ্গির মত পরা। বাবার সামনে বসে মুঠোয় সিগারেট নিয়ে আছে বড়দা। ওটা সম্প্রতি আরম্ভ করেছে। বাবা ময়লা ধুতি পরে মোড়ায় বসে আছেন। কেউ তাকে কিছু বলল না। সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল সে। এই জায়গাটা সবচেয়ে নোংরা এ-বাড়ির। চৌবাচ্চা পরিষ্কার করা নিয়ে নিয়মিত ঝগড়া হয়। চৌবাচ্চার দিকে তাকালেই কাদা চোখে পড়ে। সুজন সপ্তাহে একদিন কাজটা করে। কল্যাণ আর একদিন।

বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে কানে এল, 'তোমার তিন ছেলে যদি কিছু না করে তাহলে আমার কিছু করার নেই। মেজ বিয়ে করেছে সে কত দিচ্ছে?'

'চারশো।' বাবা বললেন, 'তুই যা দিস।'

কল্যাণকে দেখে দাদা কিছু বলল না। সোজা ঘরে চলে এল সে। এই বাড়িতে কোন মানুষ ভদ্রভাবে থাকতে পারে না। বাবার জন্যে কষ্ট হয় কল্যাণের। চিরকাল কেমন বেচারা হয়ে রয়ে গেলেন। চাকরি করতেন সদাগরী অফিসে। মাইনে ছিল সামান্য। অথচ গর্ব ছিল, হয়তো এখনও আছে, তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। বাড়িতে মুরগির মাংস ঢোকেনি আজ পর্যন্ত। অবসর নেবার পর হাতে যা পেয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে কোন্‌কালে। একটা চোখে ছানি পড়েছে। চিরকাল মায়ের ছায়ায় আছেন।

বড়দা কত মাইনে পায় কেউ জানে না। খুব শৌখিন হয়ে থাকতে ভালবাসে। বউদিরও সাজগোজের দিকে ঝোঁক। প্রতি শনি-রবি দুটো সিনেমা দেখা চাই। একটা বাচ্চা হয়েছে। বাড়ির কাউকে সেটাকে ধরতে দেন না। চারশো টাকায় যদি দু'বেলা খাবার আর চা পাওয়া যায় তো মন্দ কি। আলাদা সংসার করলে এই মজাটা থাকবে না তা দুজনেই ভাল মত জানে। তবু বউদি কথা শোনাতে ছাড়ে না। একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে তিনি ওস্তাদ। এককালে কল্যাণের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা ছিল। এই বাড়িতে কল্যাণই একমাত্র ভাল ছেলে। ভাল বলতে পড়াশুনায় কখনও আশির নিচে নম্বর পায়নি। কোন প্রাইভেট টিউটর ছাড়াও অত নম্বর যে ছেলে পায় তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেই চাইবেন বড় বউদি। কিন্তু মেজদার বিয়ে নিয়ে যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপর এখন সবার সঙ্গেই তার বাক্যালাপ বন্ধ। মেজদার বিয়েব আগে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল প্রায় সাপে নেউলের মত। আশ্চর্য ব্যাপার, মেজবউদি বাড়িতে আসার পর কিছুদিন মা ছিলেন তার দিকে, এখন মেজবউদি তাঁর চক্ষুশূল। সব সময় মা কথা বলেন বড়বউদির পক্ষ নিয়ে।

মেজদা একটু অদ্ভুত রকমের মানুষ। ও যে কখনও বিয়ে করবে তা কেউ ভাবেনি। প্রেম করার ব্যাপারটা তো বিশ্বাসেই আসেনি প্রথমে। একটু বেহিসাবী, খামখেয়ালী, পাগলাটে ধরনেব মানুষ হিসাবেই সকলে জানত ওকে। যেটা মাথায় আসবে তাই করবে। বিবেকানন্দর বই পড়া থাকায় যখন তখন তাঁর বাণী আওড়াত। পার্ট ওয়ান পর্যন্ত পড়ে ওর মনে হয়েছিল লেখাপড়া ওর জন্যে নয়। ব্যবসাপত্তর করলে কেমন হয়? বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল। পায়নি। দাদাও দিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত চার বন্ধু একসঙ্গে ট্রাভেলিং এজেন্সি করেছে। ট্রাভেলিং এজেন্সি বলে বটে তবে ওটা তীর্থ স্পেশ্যাল। মেজদা ওয়ার্কিং পার্টনার। রাজগীর নালন্দা থেকে হরিদ্বার হৃষিকেষ নিয়ে যায় পার্টি যোগাড় করে। কত থাকে কি পায় কেউ জানে না। তবে মাসে চারশো টাকা মায়ের হাতে দিচ্ছে ছ'মাস। মাসের পঁচিশ দিন তাকে ওই কাজে বাইরে কাটাতে হয়। অর্থাৎ দুজনের টাকায় একজন খায়। গত মাসে তাকে টাকা বাড়াবার কথা বলায় সে সবাইকে শুনিয়ে জবাব দিয়েছিল,'আমি বাড়ির সবচেয়ে খারাপ ঘর নিয়েছি। পুরো টাকা দিয়ে পঁচিশ দিন একজন খাচ্ছি না। এরপর টাকা চাইছ কোন্ মুখে! এতকাল এইসব কথা বলিনি, এখন বলব। তবে হ্যাঁ, তোমরা আমার বউকে যা ইচ্ছে বলতে পার, আমি তাকে বলে দিয়েছি সে যেন কোন প্রতিবাদ না করে। তোমরা যা বলবে তা রেকর্ড করে রাখবে, আমি এসে শুনব।' কেউ কারও ঘরে ঢোকে না। বড়বউদির ধারণা হয়েছিল মেজর ঘরে বোধ হয় টেপ রেকর্ডার আছে। বড়দা বলেছিল, 'বাইরে বাইরে ঘোরে, টানামাল নিয়ে আসতে পারে।' মেজদা চলে যাওয়ার পর মা মেজবউদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁগো, তোমরা আবার কবে টেপ রেকর্ডার কিনলে? এক বাড়িতে আছ যখন, তখন দেখাতেও তো পার!'

মেজবউদি অবাক হয়ে বলেছিল,'ওমা, কে বলেছে আমরা টেপ রেকর্ডার কিনেছি?'

'কেন, তোমার স্বামী যে বলল সেদিন।'

'আপনি তো ওকে চেনেন মা, কি বলতে কি বলে!'

'মিছে কথা বলছ না তো বাপু?'

'আপনি ঘরে এসে দেখুন।'

তারপর থেকে আবার সোচ্চারে সংলাপ বলা হচ্ছে। মেজবউদির সঙ্গে তেমন কথাবার্তা হয় না কল্যাণের। খাবার দেওয়া নেওয়ার সময় যেটুকু। সুন্দরী তো নয়ই, তবে সুশ্রী বলা যায়। তবে অত্যন্ত রোগা। মেজদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হবে। এই মেয়ে যে কি করে মেজদার প্রেমে পড়ল তা কল্যাণ আজও ভেবে পায়নি। প্রেম করার মত কোন গুণ মেজদার নেই। মেজদাদের ট্যুরিং পার্টির সঙ্গে গিয়েছিল মেজবউদির বাবা মেয়েকে নিয়ে। হরিদ্বারে গিয়ে ভদ্রলোক খুব অসুখে পড়েন। দল চলে আসার সময় তাঁকে রেখে আসতে হচ্ছে বলে মেজদা থেকে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন তিনি রিটায়ার করতে যাচ্ছেন। স্ত্রী নেই। একটি মেয়েকে নিয়ে চিন্তা। টাকাও নেই যে ওই রোগা মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেজদা বলেছিল খাওয়াপরার দায়িত্ব সারাজীবনের জন্যে নিলে তিনি কি মেয়ের বিয়ে তার সঙ্গে দেবেন? মেজদার সেবা পেয়ে ভদ্রলোক এমন কৃতার্থ ছিলেন যে না বলতে পারেননি। আর সাতদিন একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে দাদার নাকি বউদিকে ভাল লেগে গিয়েছিল। মেজবউদি হরকে পিয়ারীর ঘাটে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'বাবার যদি কিছু হয় তাহলে আমার কি হবে?' তখন দাদা নাকি হাত ধরে বলেছিল, 'কেন, আমি আছি। আমাকে তুমি পছন্দ করবে বিনীতা?'

মেজবউদি নাকি জবাবে এত মাথা নুইয়েছিল যে চিবুক গিয়ে বুকে ঠেকেছিল। এখনও এই বাড়িতে মেজবউদি ওই একই ভঙ্গিতে কাজ করে যায়। সিনেমা থিয়েটার দূরের কথা, বাপের বাড়িতে যাওয়ার সময় সুযোগ হয় না। সুজনের সঙ্গে মেজবউদির বেশ ভাব। বয়সে সুজন বছর খানেকের ছোট হবে। তাই নিয়ে বড়বউদির খোঁটা শুরু হয়েছে সুজনের অসাক্ষাতে।

সুজন ওদের ছোটভাই। মাধ্যমিক পাস করতে পারেনি। দু'বার চেষ্টা করেছিল। এখন কান ঢাকা চুল, ঘাড়ের কাছে ঈষৎ বাবরি, অমিতাভ বচ্চনের মত একটা প্যাটার্নও এবং ওর বন্ধুদের মধ্যে চালু। মাস্তানি করার প্রবণতা আছে কিন্তু পার্টি করে। এ পাড়ার অনেক বেকার ছেলে পার্টি করার দৌলতে চাকরি পেয়েছে। পাসটাস করা থাকলে সুজনও পেয়ে যেত অ্যাদ্দিনে। কিন্তু মাধ্যমিক ফেল করা যোগ্যতা নিয়ে যে চাকরি পাওয়া যায় তা সে করবে না। কিন্তু তার আয় আছে। কোত্থেকে টাকা পায় কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি কেউ। কল্যাণের ঘরেই সে শোয় যদি রাতে ফেরে। প্রত্যেক মাসে একশ টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলে, 'বিয়ে করলে চারশো দেব নইলে একশ।' প্রায়ই সে কল্যাণকে শোনায়, 'দাদা তুই বি. এ. পাস কর, তোর চাকরির জন্যে আমি বলে রেখেছি।'

'কাকে বলেছিস?' কৌতুক বোধ করত কল্যাণ।

'অভিরামদাকে। নেক্সট ইলেকশনে পার্টির ক্যান্ডিডেট হচ্ছে।'

'কেন, এখন যে এম এল এ আছে সে কোথায় যাবে।'

'বুড্ডা হয়ে গেছে বহুত, চেয়ারম্যান বলেছে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হবে।'

'তোর কি হবে?'

'আমার লাইন ফিট করা আছে। হাওয়া খারাপ বুঝলে পাল্টি খাব।'

'পাল্টি খাবি?'

'ইয়েস। ওই পার্টি থেকে দর দিচ্ছে আমাদের। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার ভাঙানোর কথা শুনিসনি? যে মাল দেবে আমরা তার প্লেয়ার।'

কল্যাণ খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা সুজন, তোর কখনও মনে হয়, এই সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার যদি পালটে যেত তাহলে কেমন হত?'

'অ্যাই দাদা, মজাকি করিস না। সব শালা বড়দা বড়বউদির মত। ওসব ফালতু ইমোশন কারও নেই। কেউ কিছু পালটাবে না। অতবড় নকশালরা হাপিস হয়ে গেল। মাল্ কামাও জিন্দা রহ। এই হল শ্লোগান।'

'শ্লোগান?'

'চেঁচিয়ে বলি না। বন্দে জিন্দাবাদ!'

'সুজন, এই বাড়িটাকে তোর কেমন মনে হয়?'

'চোখ কান বুজে রাত কাটানোর পক্ষে ফাইন জায়গা।'

মায়ের হাতে কল্যাণ দেয় দেড়শ টাকা। প্রত্যেক সকালে তাকে টিউশনি করতে যেতে হয়। দুটি এইট মাইনের মেয়েকে সপ্তাহে ছ'দিন পড়ালে মাসে দুশো টাকা পাওয়া যায়। কলেজের খরচ লাগছে না। নাম্বার কি করে ভাল হল কল্যাণ জানে না কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে ভরতি হতে মোটেই অসুবিধে হয়নি।

অর্থাৎ হাজার পঞ্চাশ টাকায় মাকে এই সংসার চালাতে হয়। আটজন মানুষ ওই টাকায় খায়। সপ্তাহে একদিন মাছ আসে। কলকাতার বাজার দর এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাতে মা কি উপায়ে যে তাদের তিরিশ দিন খাবার বেড়ে দিচ্ছেন তা সত্যি গবেষণার বিষয়। ভাত ডাল সেদ্ধ আর তরকারি। তাই বা জোটে কিভাবে! বাড়িভাড়া, ইলেকট্রিক বিল থেকে আরও দশটা খরচ আছে। এইসব ভাবলে মায়ের জন্যে এক ধরনের কষ্ট হয় কল্যাণের। চিরকাল মহিলা অভাবের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন। তবু বাবা চাকরিতে থাকতে তাঁকে সহজ মনে হত। যেন রাশটা ভাল ধরা থাকত। কিন্তু বড়বউদি অন্যায় করছে দেখেও তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। মা জানেন বড়দাকে চটিয়ে এখন থাকা যাবে না। মেজছেলের চাকরি নয়, অর্থাগম নিয়মিত হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ছোট দুজন চাকরি করে না। এই সময় মাকে সুজনের মতই মনে হয়। যে ক্ষমতায় তার দিকে পাল্লা ঝুলিয়ে থাকা।

এই বাড়ি কল্যাণকে কিছু দেয়নি। শুধু পরিচয় ছাড়া। স্কুল-জীবনে তার কখনও মাইনে লাগেনি। বইপত্র পেয়েছে চেয়েচিন্তে বা কখনও স্কুলের অনুগ্রহে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ে, এখনও তার ভাল পোশাক বলতে একটা জিনসের প্যান্ট আর হ্যান্ডলুমের শার্ট। বেশির ভাগ সময় পাজামা আর খাদির পাঞ্জাবি পরে। ইদানীং সিগারেট খায় মাঝেমধ্যে। কলেজে ঢুকে প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল আনন্দর সঙ্গে। তারপর সেইসূত্রে সুদীপ আর জয়িতা। অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার এক ধরনের কমপ্লেক্স কাজ করে। তিন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সময় সেটা হয় না। জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দেয়নি কল্যাণ। দিয়ে লাভ হত না। যদি মেডিক্যাল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পাওয়াও যেত তাহলে সেই খরচ কে টানতো? এখন আরও কয়েক বছর পড়শুনা করলে অধ্যাপনা কিংবা মাস্টারির ক্ষীণ সুযোগ আছে। আর বি. এ.-টা পাস করলে বি সি এস দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব করে কি হবে! আনন্দ ঠিকই বলে। যেজন্যে গরু পোষে মানুষ, যত্ন করে শিশুকাল থেকে খোল-বিচুলি খাওয়ায়, তেমনি করে আমরা তৈরি হই একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে। সেই মোক্ষলাভ হলেই যদি চাকরি ভিক্ষে পাওয়া যায় তো প্রথমে কাছের আত্মীয়দের উপকার, পরে নিজের সংসার তৈরি করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এই করতে করতে একদিন বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া। আর এই সময় যত অন্যায় অবিচার মুখ বুজে সয়ে যাওয়া, নইলে নিজের দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে। শুধু স্বার্থপর হওয়ার জন্যে পড়াশুনা করে চাকরি জোটানো। কিংবা এদেশের ছেলেদের কিছু করার পথ খোলা নেই বলেই পড়াশুনা নামক নিয়মটার মধ্যে আটকে থাকা। কল্যাণ এতদিন কলেজ করে স্পষ্ট বুঝে গেল তেমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাবে। এবং তারপর সে তো শিক্ষিত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হবে। কিন্তু সে নিজে জানে তার কিছুই জানা নেই। যে বিষয় নিয়ে সে অনার্স পড়ছে তার কয়েকটা অধ্যায়, বাঁধাধরা প্রশ্ন এবং কিছু বাড়তি নোটস তাকে বৈতরণী সসম্মানে পার করে দেবে। এই শিক্ষার কোন মানে হয়? একটা সুপরিকল্পিত চালাকির মধ্যে তাদের প্রতি বছর ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর তারা সেই খাতে ঘোলা জল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

'কি হল, কলেজ নেই?'

কল্যাণ আবার বিছানায় ফিরে এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে মাকে দেখল। নিচু গলায় বলল, 'আছে।'

'কখন গিয়ে উদ্ধার করবে?'

'যাব না আজকে।'

'কেন? কিছু হয়েছে নাকি? মুখচোখ ওরকম কেন?'

'জানি না। হয়েছে কিছু। তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে?'

'অনেকক্ষণ। তোমার জন্যে ভরদুপুরে কেউ চা করতে পারবে না। শোন, তুমি পড়াশুনা করছ বলে আমি কিছু বলতে পারছি না। কলেজে যদি না যেতে ইচ্ছে করে তাহলে চাকরির চেষ্টা করো। সুজন বলছিল ও নাকি ইচ্ছে করলে পার্টিকে বলে চাকরি পাইয়ে দিতে পারে।'

'বিরক্ত কোর না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'তোমাদের সঙ্গে কথা বললেই বিরক্ত হও। আমি কি করে সংসার চালাব বলতে পার? একজন তো বিয়ে করে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন কন্যাকুমারিকা।'

'তুমি খামোকা মেজবউদির পেছনে লাগছ। অবশ্য এটা তোমাদের ব্যাপার।'

মা যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, 'আমি কি করছি না করছি তা নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। তুমি নিজেরটা দ্যাখো। মনে হচ্ছে জ্বরটর বাধিয়েছ, ওষুধ আনাব?'

'দরকার নেই। শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভাত খাবি কি খাবি না?'

'না।'

চোখ বন্ধ করে কল্যাণ পড়ে রইল অনেকক্ষণ। ঠিক কখন মেজবউদি ঘরে ঢুকেছিল টের পায়নি। নরম গলায় শুনতে পেল, 'চা।'

শব্দটাকে অমৃত বলে মনে হল। চোখ খুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দরকার ছিল?'

'মা পাঠিয়ে দিলেন।' মেজবউদি বলে চলে যাচ্ছিলেন।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'মেজদা কবে ফিরবে?'

'জানি না। কেন?'

'তোমার ওপর যা ঝড় যাচ্ছে তা সামলানো দরকার।'

'এসব জেনেই তো এসেছি।' মেজবউদি চলে গেল।

চা খাওয়া শেষ হলে বাবা দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'জ্বর কত?'

'দেখিনি। বেশি নয়।' কল্যাণ উঠে পাঞ্জাবিটা টেনে নিল।

'শুনলাম কলেজে যাবি না?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ নইলে কামাই করবি কেন?'

কল্যাণ জবাব না দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল।

'কোথায় বেরুচ্ছিস?'

'কাছেই।'

'কলু, তোকে নিয়ে আমার কত গর্ব। আমার বংশে কেউ ফার্স্ট ডিভিশনে স্টার পেয়ে পাস করেনি। কোনরকমে বি. এ.-টা পাস করে সরকারি পরীক্ষা দিয়ে দিলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে চাকরি পেয়ে যাবি।'

'তাতে তোমার কি লাভ হবে?'

'মানে?' বাবা যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'চাকরি করে তোমাদের হাতে চারশো টাকা ধরিয়ে দেব প্রতি মাসে বড়দা যেমন দেয়? তখন তোমার এই গর্ববোধটা থাকবে?'

'তা থাকবে। বলতে পারব তো চিরকাল আমার সেজ ছেলে স্টার পেয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। তবে কিনা একটা কথা, সন্তান তার আচরণের মাধ্যমেই পিতামাতার স্নেহ অথবা ভয় আদায় করে নেয়। তোমার দুই দাদার সঙ্গে তোমার তো চরিত্রের পার্থক্য থাকবেই। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়।' ঝাপসা চোখে শীর্ণ বৃদ্ধ দরজায় একটা হাত রেখে যেন খুব গূঢ় তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন।

'বাবা, তোমার কারও ওপর রাগ হয় না?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ল কল্যাণ।

'হয়। নিজের ওপরে হয়। কেন বাবা?'

'আর কারও ওপর হয় না? তোমার চারপাশে এত অন্যায় ঘটছে!'

'হয় না। ভোররাত থেকে কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায় অথচ দেখি সুজনের

বন্ধুরা লাইন কন্ট্রোল করার নামে ব্ল্যাক করছে সমানে, তখনও রাগ হয় না। মনে হয় এই যে দাঁড়িয়ে আছি তাতেও তো সময় কেটে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির অনিলবাবু বলছিলেন, আপনার চিন্তা কি। ছেলে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে, ভাল চাকরি পাবেই। আমি তখন খুশী হই। দ্যাখো, সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, এখন আর রাগারাগি করে কি লাভ বল! তোমার কি খুব জ্বর বেড়েছে? মুখ চোখ লাল কেন?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।'

'তোমার মায়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। যাকে সব সামলাতে হয় তার মাথা ঠিক থাকে না। মানুষটা কোনদিন আরাম পেল না। আমিও দিতে পারিনি, এরাও পারল না।'

কল্যাণ বলতে চাইল, আমার ওপর এত ভরসা কোর না বাবা। কারণ এইভাবে ইঁদুরের মত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার। কিন্তু তার জিভ আড়ষ্ট হল। বাবার পাশ কাটিয়ে সে চুপচাপ বেরিয়ে এল বাইরে। কল্যাণের মনে হচ্ছিল এইভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। বাবার জন্যে কষ্ট হয়, মায়ের জন্যেও, যে মেজবউদি এই সেদিন এল তার জন্যেও। কিন্তু সেসব কষ্ট আলাদা আলাদা। যখন সব মিলিয়ে দেখা যায় তখন আর কষ্টটা থাকে না। বরং তার বদলে একটা ক্রোধ আসে। প্রত্যেককেই স্বার্থপর বলে মনে হয় তখন। এইখানে একটু হোঁচট খেল কল্যাণ। মেজবউদিকে ঠিক স্বার্থপর বলার কোন কারণ এখনও পায়নি। কিন্তু ওই যে সব সহ্য করে এঁটুলির মত এই সংসারে লেগে থাকা—তার মধ্যেও এক ধরনের জেদ কাজ করে যা কল্যাণের মোটেই পছন্দ নয়।

বেশ রোদ উঠেছে। গলি থেকে বেরিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল কল্যাণের। চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু সেটা যে খুব সাময়িক তা বুঝতে পারেনি। কল্যাণ ধীরে ধীরে হেঁটে মোড়ের মাথায় চলে এল। বঙ্কিমদা তখন দোকান খুলে সবে বসেছে। এখনও খদ্দের আসেনি। কল্যাণকে দেখে বলল, 'কি হয়েছে? জ্বর?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'বোধ হয়। কাল রাত্রে ঠিক ছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি—কিন্তু এটাকে আজই সারিয়ে ফেলতে হবে। কালকের মধ্যে ফিট হতে হবে।'

বঙ্কিমদা হাসল, 'ঠিক আছে। ভেতরে এসে বোস্। আমি তোর জ্বরটা দেখি। ডাক্তার না হয়েও তোর জন্যে ডাক্তারি করছি, পুলিস জানলে—।'

এই সময় একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন কাউন্টারে, 'কাল থেকে ছ'বার বাহ্যি গিয়েছি। একটা ওষুধ দাও তো।'

'কি ওষুধ দেব?'

'সে আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝ তাই দাও।'

বঙ্কিমদা কয়েকটা ট্যাবলেট এগিয়ে দিয়ে কিভাবে খেতে হবে বুঝিয়ে পয়সা নিল। কল্যাণ বলল, 'তুমি তো ডাক্তারদের বারোটা বাজাবে, দোষ দিলে আমাকেই।'

জ্বর বেশি নয়। এক পয়েন্ট চার। ওষুধ খাইয়ে বঙ্কিমদা বলল, 'বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাক। দুপুর বিকেল রাত্রে বাকিগুলো খেয়ে নিস।

কিন্তু কাউন্টারের ভেতরের চেয়ারে বসে থাকতে ভাল লাগছিল কল্যাণের। এখান থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে ওষুধ কিনতে লোক আসছে। তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ভুলে থাকা যায়। সে বঙ্কিমদাকে বলল, 'আমি একটু বসি বঙ্কিমদা।'

'বোস্।' বঙ্কিমদা খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তখনই মনে পড়ল আজ সকালে টিউশনিতে যাওয়া হল না। বুড়ো খুব খচবে। কাউকে দিয়ে খবর দেওয়াও সম্ভব নয়। খচুক বুড়ো, অসুখ-বিসুখ কাউকে নোটিস দিয়ে আসে না। কল্যাণ দেখছিল খদ্দেরদের। কতরকমের অসুখ মানুষের হয়। বিচিত্র সব নামের ওষুধ। প্রেসক্রিপসন দেখে বঙ্কিমদা চটপট বলে দিচ্ছে আছে কি নেই। আধ ঘণ্টা বাদে সে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'আচ্ছা বঙ্কিমদা, তুমি কতগুলো ওষুধের নাম জানো?'

একজন ভদ্রমহিলাকে প্যাকেট দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বঙ্কিমদা, 'মানে?'

'যে যা চাইছে ফটাফট দিয়ে যাচ্ছ কিংবা নেই বলছ, এত মনে থাকে?'

'অব্যেস বৎস অব্যেস।' মাথা নেড়ে বঙ্কিমদা আর এক খদ্দেরকে বলল, 'ওষুধটা নেই। তবে একই

জিনিস অন্য কোম্পানির আছে, দেব?'

লোকটি আপত্তি জানিয়ে চলে গেল। বঙ্কিমদা চাপা গলায় বলল, 'ডাক্তারের কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসবে। ডবল খাটুনি।'

'কেন?'

'আগের ওষুধটা বন্ধ হয়ে গেছে সে-খবর ডাক্তার জানে না।'

'তুমি তো বেশ জানো।'

'আঃ এ ছোঁড়া তো দেখছি বড্ড জ্বালাচ্ছে!'

'বেশ বেশ, আমি উঠছি।' কল্যাণ হাসল।

'আমি উঠতে বলিনি। চা চলবে?'

'চলতে পারে। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।' ওষুধের গুণেই হোক কিংবা এই ওষুধের ভিড়ে বসেই হোক এখন একটু ভাল লাগছিল কল্যাণের। এইসময় সে শুভব্রতকে দেখতে পেল। শুভব্রত এ পাড়ায় থাকে না। কল্যাণ হাসল, 'কি খবর?'

'আরে কল্যাণ! ব্যাপারটা কি বল তো?'

'কিসের ব্যাপার?'

'তুমি তিন মাস হঠাৎ ডুব মারলে কেন? বিমলেশদা তোমাকে খুব খুঁজছে। বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল। খুব ভাল রোল ছিল তোমার নেক্সট নাটকে। কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'তুমি কি আর গ্রুপে যাবে না বলে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। বিমলেশদা বা তোমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আসলে আমার ভাল লাগছে না কিছু।'

শুভব্রত একটু বাঁকা হাসল, 'গ্রুপ থিয়েটার করার মত মানসিকতা সবার থাকে না। ঠিক আছে, চলি।' কল্যাণ ওর চলে যাওয়াটা দেখল। তারপর মাথা নেড়ে গলা তুলে বলল, 'বঙ্কিমদা চা থাক, আমি বাড়িতে যাচ্ছি।'

'আরে এসে গেল বলে!' কাউন্টারের ভেতর থেকে চেঁচালো বঙ্কিমদা।

'না থাক।' হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণ বুঝল তার শরীরে যে সুস্থবোধটা ফিরছিল শুভব্রতর সঙ্গে কথা বলার পর তা উধাও হয়েছে। আবার মাথাটা টিপটিপ করছে, হাত পা কামড়াচ্ছে, সমস্ত শরীরে ম্যাজম্যাজানি। আজ সারাটা দিন তাকে পড়েই থাকতে হবে।

গলির মুখে আসতেই বাবাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে আসতে দেখল। তাকে দেখতে পেয়েই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, বড় বউমার হাত পুড়ে গেছে।'

'সেকি! কি করে হল?'

'রান্না করতে গিয়ে। আমি বঙ্কিমের দোকানে যাচ্ছি ওষুধ আনতে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'সঙ্গে তো বেশি পয়সা নেই, বঙ্কিম যদি—।'

'আমার কথা বলো, আমি দাম দিয়ে দেব বঙ্কিমদাকে।'

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ছুটলেন দোকানের দিকে। কল্যাণ বাড়িতে ঢুকে দেখল তুলকালাম কাণ্ড চলছে। বড়দা চিৎকার করছে, মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। শুধু মেজবউদির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুজনের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

সুজন বলছে, 'রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়েছে, এ নিয়ে এত চিল্লাবার কি আছে। বাড়িটা মাইরি নরক হয়ে গেল!'

'সঙ্গে সঙ্গে বড়দা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'চোপ। বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না? রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে, ইচ্ছে করে উনুনের ওপর এমন ভাবে সসপ্যানটা রেখেছিল যাতে ছুঁলেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়।'

'কে রেখেছিল?' সুজন একটু থিতিয়ে গেল যেন।

'মেজ। এই পনেরো দিন তার ডিউটি নয়। বিপাকে পড়ে বলেছিলাম রান্নাঘরে যেতে।' মা তীব্রস্বরে জানালেন।

'কেন বলবে? তুমি যখন দুই বউকে মাসটা ভাগ করে দিয়েছ তখন কেন মেজবউদি যাবে? মেজবউদির পালা এলে কি বড়বউদি কখনও রান্নাঘরে ঢোকে?'

'সে বিষয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' মা ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

এবার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বউদির হাত কিরকম পুড়েছে?'

বড়দা বলল, 'কি রকম মানে? আমি কি ডাক্তার?'

'বেশি পুড়লে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই হত। বাবাকে কেন ছুটতে হল বঙ্কিমদার কাছে? দায়িত্বটা কার ছিল?'

'দায়িত্ব শেখাচ্ছে আমাকে? আমি যদি এক সময় টাকা বন্ধ করতাম তাহলে না খেয়ে মরত সবাই। দায়িত্ব!' বড়দা ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

সুজন হঠাৎ বলে বসল, 'আমার কেসটা গড়বড়ে লাগছে। কই দেখি, বড়বউদির হাত কি রকম পুড়েছে!'

বড়দা ঘুরে দাঁড়াল, 'তার মানে? তুই সন্দেহ করছিস? মা দ্যাখো, কিরকম অপমান করছে আমাদের! এর পরে আমার কি করা উচিত?'

সুজন বলল, 'অপমান? আরে দেওর হিসেবে বউদির হাত দেখতে চাওয়া কি অপমান করা? মা তুমি কি বল?'

এবার মায়ের গলায় কান্না এল, 'আমার আর এই বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। কি ভুল করেছি বিয়েতে সম্মতি দিয়ে।'

'সম্মতি না দিলে চারশো টাকা লস করতে প্রত্যেক মাসে।'

এই সময় বাবা ফিরে এলেন মলম হাতে, 'এই যে নাও, ভাল করে হাতে লাগিয়ে দাও। তবে বঙ্কিম বলল বেশি পুড়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কতটা পুড়েছে?'

মা বাবার হাত থেকে মলমটা টেনে নিয়ে বললেন, 'হাসপাতালে যেতে হবে না।'

তারপর বড়দার দরজায় এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এইটে লাগিয়ে দে খোকা। দেখিস বেশি চাপ যেন না পড়ে।'

বাবা কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বঙ্কিম আমার কাছ থেকে পয়সা নিল না। বলল, আপনার ছেলের কাছ থেকেই নেব।'

সুজন হা হা করে হাসল, 'যাঃ বাবা, সেজদা তোরই তাহলে চোট গেল!'

'চোট কেন বলছিস?' কল্যাণ নিজের ঘরের দিকে এগোল।

'যাকে নিয়ে এত, কেন তাকে একবার নিজে দেখনি?'

'কাকে?'

'যার হাত পুড়েছে! আসলে পোড়েইনি, সব ভাঁওতা। এই হাত পোড়ার নাম করে দিব্যি পনেরো দিন কাটিয়ে দেবে খাটে বসে। রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। মেজবউদিকে তখন হেঁসেল ঠেলতে হবে। সব ট্যাক্‌টিস বোঝা আছে আমার?'

বাবা বললেন, 'কি বলছিস তুই?'

সুজন বলল, 'মিথ্যে বলছি কিনা বড়বউদি বাইরে এসে প্রমাণ দিক। হাতে কাপড় জড়িয়ে এলে চলবে না। কই আসুক!'

এতক্ষণে বড়দার ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'মাস্তানি করছে তোমার ভাই। বলে দাও এটা মাস্তানির জায়গা নয়। মেজর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক তা কি আমার জানতে বাকি আছে!'

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল একটু সময়। তারপর সুজনের হো হো হাসি শোনা গেল, 'মা, তোমার বড়বউকে পার্টি করতে বল, হেভি টপে যাবে।'

কেউ উত্তর দিল না। যে যার ঘরে চলে গেল। কল্যাণ মেজদার ঘরের দিকে তাকাল। সেখানে কেউ

আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে আর পারছিল না, ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুজন জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কিছু হয়েছে সেজদা?'

'হ্যাঁ, জ্বর।'

'ওষুধ খেয়েছিস? বাড়িটা ক্রমশ নরক হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে যে সটকাব তার উপায় নেই। একশ টাকায় কে আমাকে থাকা-খাওয়া দেবে, বল্?'

কল্যাণ জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করল।

॥ ৫ ॥

বিছানায় গা এলিয়ে প্রথমে মনে হয়েছিল ঘুম আসবে না, কিন্তু কখন যে রাতটা কেটে গেছে টের পায়নি জয়িতা। দরজা জানলা বন্ধ থাকায় ঘরটায় এখনও আবছা অন্ধকার। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। নটা বাজতে দশ। আজ সকাল দশটায় কফি হাউসে প্রত্যেকের মিট করার কথা। এত বেলা পর্যন্ত কখনও বিছানায় থাকে না জয়িতা। আজ কেউ তাকে ডেকেও দেয়নি।

আর এই সময়েই তার মনে পড়ল আগের রাত্রের কথা। এ ঘরে চলে আসার পর সে সীতারামের কোন সাড়াশব্দ পায়নি। এখনও এই বাড়িতে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। লাগোয়া বাথরুম থেকে তাজা হয়ে ফিরে এল জয়িতা। কিন্তু তখনই বুঝতে পারল মাথাটা সামান্য টিপটিপ করছে। এতটা ঘুমিয়েও স্থিরতা আসেনি।

জিনসের প্যান্ট আর নীল সার্টটা পরে নিল জয়িতা। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বোলাল। তার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ আছে। চোখে এবং চিবুকে সেটা মাখামাখি। কিন্তু আর কোথাও মেয়েলিপনা নেই। এই যে সে সার্ট প্যান্ট পরে আছে, কোথাও কোন ঢেউ নেই। আজ হঠাৎ ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে ফেলল।

বাইরে বেরিয়ে সে শ্রীহরির মুখোমুখি হল। জয়িতা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বেরুচ্ছি।'

শ্রীহরি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জলখাবার খাবে না?'

'না। সময় নেই।' চলতে চলতে উত্তর দিয়ে চারপাশে তাকাল সে। না, কোথাও সীতারামকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জয়িতা নিজেও চাইছিল না এইসময় মুখোমুখি হতে। দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে।

নিচে নেমেও মনে হল এই পাড়ায় দিন শুরু হয়নি। বড় লোকদের পাড়ার অদ্ভুত একটা আলস্যের ছায়া মাখামাখি হয়ে থাকে। ফুটপাতেও লোকজন নেই। দোকানপাট বলতে এই পথে একটা কেক-প্যাটিসের দোকান, সেটা এখনও খোলেনি।

আরও কিছুটা এগোতেই সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। একটি চোদ্দপনেরো বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে হনহন করে এগিয়ে আসছে কাঁদতে কাঁদতে আর তার খানিকটা পিছনে ছুটে আসছেন একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ় ডাকছেন, 'খুকি আয়, খুকি শোন, জাস্ট এ মিনিট।' হঠাৎ মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ডোন্ট চেজ মি, ডোন্ট কল মি খুকি!'

ভদ্রলোক ততক্ষণে কাছে এসে পড়লেন, 'আরে তুই বুঝতে পারছিস না।'

'আমার কিস্যু বোঝার দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো না।'

'না মানু, রাগ করিস না—।'

'রাগ? নো, রাগ কেন করব! হু আর ইউ? তুমি তো আমার বাবা নও। আমাকে একাই যেতে দাও।' মেয়েটা চোখের জল মুছে নিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। জয়িতা ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। এতক্ষণে তার মনে হল ভদ্রলোককে সে দু-একবার দেখেছে তাদের ব্লকে ঢুকতে। তবে এদিকে থাকে না নিশ্চয়ই, নইলে চিনতে পারত। মেয়েটি যেরকম ভঙ্গি করছে তাতে অন্য জায়গায় ভিড় জমে যেত। জয়িতা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এক্সকিউজ মি। মে আই হেল্প য়ু?'

মেয়েটা ওর দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল, 'না।'

জয়িতা এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি ওর কে হন?'

ভদ্রলোক জয়িতাকে যেন আমল দিলেন না। মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, 'খুকি, বাড়িতে চল্।'

'আমাকে তুমি খুকি বলে ডাকবে না।' মেয়েটি এবার ফুঁপিয়ে উঠল।

এবার ভদ্রলোক জয়িতার দিকে খানিকটা অসহায় চোখে তাকালেন। বোধহয় এইসময় তিনি বুঝতে পারলেন সামনে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন নিজের কাছেই সাফাই দেবার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'এই পাড়াটাকে ভদ্রপাড়া বলেই জানতাম। এখানে তো আগেও কয়েকবার এসেছি, এরকমটা দেখিনি।'

'কি হয়েছে?' জয়িতা বুঝল ভদ্রলোক খুব নার্ভাস।

'ওই তো, ট্রাম থেকে নেমে মেয়েকে নিয়ে আসছিলাম।—'

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে মেয়েটি কান্না জড়ানো গলায় ফুঁসে উঠল, 'মেয়ে বলবে না।'

'ঠিক আছে, আছে।' ভদ্রলোক চাপা দিতে চাইলেন, 'হ্যাঁ, ওই যে ওখানে একটা পার্ক আছে, ওর পাশ দিয়ে আসার সময় তিনটে ছেলে রিমার্ক পাশ করতে লাগল।'

'কোন্ তিনটে ছেলে?'

'পার্কের রেলিঙে বসে ছিল। তা আমি বললাম প্রতিবাদ করার দরকার নেই, নির্জন রাস্তা, তাড়াতাড়ি চলে এস। ওসব ছেলেরা যে কি মারাত্মক হয় তা তো জানি।' ভদ্রলোক জয়িতাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে হালকা করতে চাইলেন পরিবেশটাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি প্রতিবাদ করল, 'না, তুমি সব কথা বললে না। আমি আর বাবা আসছিলাম। তিনটে রোগা রোগা ছেলে রেলিঙে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। একজন চিৎকার করে বলল——।' মেয়েটি কান্না থামাতে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'কি বলল?' নির্বিকার মুখে জয়িতা প্রশ্ন করল।

'আমি বলতে পারব না। খুব খারাপ কথা। ওইসব বলে ওরা আমাকে ডাকছিল। আমি বললাম ছেলেগুলোকে কিছু বলো। তুমি শুনতেই চাইলে না। বরং জোরে জোরে পা ফেলে জায়গাটাকে পেরিয়ে আসতে চাইলে। আমি বললাম, ওরা আমাদের পিছনে আসছে। তুমি বললে, তাকিও না। ওরা ডেঞ্জারাস। ওরা অবশ্য এল না কিন্তু হায়নার মতো হাসতে লাগল। নিজের মেয়ের সম্মান বাঁচাতে পার না তুমি, কি করে নিজেকে বাবা বলছ?' শেষ প্রশ্নটায় স্বর উঁচুতে উঠল।

'কি বলি বলুন তো, ওখানে প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা—।'

ভদ্রলোক জয়িতার সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে তাকাতেই সে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেগুলো যদি ওকে জড়িয়ে ধরে অত্যাচার করত তাহলে কি করতেন?'

'না না, সে সাহস পাবে না। নির্জন রাস্তা বটে তবে অতটা—।'

'যদি করত?'

ভদ্রলোক জয়িতার মুখের দিকে তাকালেন। কি বলবেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না। জয়িতা বলল, 'আপনি যদি তখনই প্রতিবাদ করতেন, একটি ছেলেকে মেরে অন্য দুজনের কাছে যদি মার খেয়ে মরেও যেতেন তাহলে সারা জীবন আপনার মেয়ে বলত বাবা আমাকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন আজ কিন্তু চিরকালের জন্যে মেয়ের কাছে মরে থাকবেন।'

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, এখন বুঝতে পারছি। আসলে ওরকম কিছু হলে সরে আসাই অভ্যেস হয়ে গেছে তো!'

'ছেলেগুলো কি এখনও আছে ওখানে?'

'জানি না।'

'চলুন তো।'

'অ্যাঁ! মানে—'

'আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ওরা এখন নাও থাকতে পারে। তাছাড়া আমাদের এমনিতে খুব দেরি হয়ে

গেছে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের মামা পুলিশে বড় কাজ করে। তাকে রিপোর্ট করব আমি।' ভদ্রলোকের কথা শেষ করার আগেই মেয়েটি গন্তব্য পথে হাঁটতে শুরু করল। ভদ্রলোক যেন তাতে বেঁচে গেলেন। আর কথা না বাড়িয়ে মেয়েকে অনুসরণ করলেন।

জয়িতা ওদের চলে যাওয়াটা দেখল। ভদ্রলোককে সে বুঝতে পারছে কিন্তু মেয়েটি? তার প্রস্তাবে সে তো সাড়া দিল না। বাবাকে সে অভিযুক্ত করছিল কিন্তু এই সময় তো বাধ্য করতে পারত বাবাকে ছেলেগুলোর সামনে যেতে। ও কেন ফিরতে চাইল না?

জয়িতা সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। দু'পাশে বাগানওয়ালা চমৎকার বাড়ি। এবং তারপরেই পার্কটাকে দেখতে পেল। পার্কের রেলিঙে একটি ছেলে একা বসে আছে। তিনজনের দলটাকে ধারে কাছে দেখতে পেল না জয়িতা। সে সন্ধিগ্ধ চোখে ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি উদাসীন মুখে বসে আছে। যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এইসময় পার্কের ধারে ট্রাম স্টপে ট্রাম এসে দাঁড়াতেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে নামল। মেয়েটিকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে ছেলেটি হাত নাড়তে আরম্ভ করল। জয়িতা আর দাঁড়াল না। এবং তখনই তার নজর গেল হাত-ঘড়িতে। সর্বনাশ, আনন্দ আজ খচে ফায়ার হয়ে যাবে! একটা উত্তরের দিকে যাওয়ার বাসের জন্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাতে লাগল সে। দেরি হলে আনন্দ শুধু গম্ভীর চোখে তাকাবে কিন্তু চিমটি কাটার সুযোগ পেয়ে যাবে সুদীপটা।

কফি হাউসের সিঁড়ি ভেঙে দোতলার কোণের দিকে তাকাতেই ওদের দেখতে পেল জয়িতা। আনন্দর চোয়াল শক্ত, অর্থাৎ খচেছে। সুদীপটা ওকে দেখাবার জন্যেই ইচ্ছে করে ঘড়ির দিকে তাকাল। কল্যাণ বসে আছে চুপচাপ। ওর পাঞ্জাবির ওপরের বোতামটাও বন্ধ। অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। চতুর্থ খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল জয়িতা। সুদীপ বলল, 'আধ ঘণ্টা, এমন কিছু বেশি নয়!'

আনন্দ বোধহয় শেষপর্যন্ত সামলাল নিজেকে, 'আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত সময়টা ঠিক রাখা। বাঙালির টাইম ব্যাপারটাকে আমি ঘেন্না করি।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক হ্যায়, ওর নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধে হয়েছিল। ব্যাপারটা শোনা যাক।'

আনন্দ বলল, 'অসুবিধে তো নিশ্চয়ই হয়েছিল, নইলে দেরি করবে কেন? তবে সেটা আমাদের শোনার কোন প্রয়োজন নেই। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড নই।'

জয়িতা হেসে বলল, 'ফাইন।'

আনন্দ মুখ ফেরাল, 'ফাইন মানে?'

জয়িতা বলল, 'আমি যে টেবিলে বসে সরি বলব তার সুযোগ পর্যন্ত তোরা দিলি না। আর এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছিস যেন আমি ফাঁসির আসামী। আমি স্বীকার করছি আমার দেরি করা অন্যায় হয়ে গেছে। আর এই দেরিটা হত না যদি রাস্তায় একটা ঘটনা না ঘটত। ঠিক আছে, আমি আবার বলছি, দুঃখিত।'

সুদীপ চোখ কুঁচকে তাকাল, 'রাস্তায় আবার কি হল?'

জয়িতা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড নই।'

আনন্দ বলল, 'স্টপ ইট! তোরা কেউ কফি খাবি?'

জয়িতা বলল, 'আমি সকাল থেকে কিছুই খাইনি। আমি একটা লেট-ব্রেকফাস্ট চাই।'

কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সুদীপ জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'পকেটে মাল আছে তো?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'দ্যাটস নট ইওর হেডেক।'

এবার কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল। সেটা দেখতে পেয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হয়েছে? গলা বন্ধ করে বসে আছিস কেন?'

'জ্বর, গা হাত পা ব্যথা এবং খিদে।' কল্যাণ হাসল।

'খিদে?'

'হ্যাঁ। কাল থেকে অনশনে আছি। সারাদিন জ্বরের ঘোরে উঠতে পারিনি। সকালে একটু বেটার মনে হওয়ায় চলে এলাম। বাড়িতে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কিছু খাব কিনা।'

'সেকি!'

'এরকমই হয়। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে যদিও হয় না তবু শালা আমি মাঝে মাঝে সেন্টিমেন্টাল

হয়ে যাই। তোদের ফ্রিজ ভর্তি খাবার, তুই খাসনি আর আমার বাড়িতে খাবার নেই বলে খেতে পারিনি। তুই যা বলবি তাই আমার জন্যে বলে দে কিন্তু পয়সা আমি দিতে পারব না।' কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল, তাকিয়ে আবার হাসল।

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'দ্যাখ কল্যাণ, তোকে কথাটা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমাদের জন্মের ওপর কোনও হাত ছিল না। তুই বিত্তহীন পরিবারে জন্মেছিস, আমি বড়লোকমীতে। ফলে আমি যা দরকার তার চেয়ে বেশি পেয়েছি, তুই তার তুলনায় কিছুই পাসনি। কিন্তু তার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। তাছাড়া আমি সবসময় চেষ্টা করি বাড়ি থেকে দেওয়া ফেসিলিটিগুলো অ্যাভয়েড্ করতে। আমার মানসিকতার সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। তুই জেনেশুনে আমাকে খোঁটা দিস কেন?'

কথাগুলো কল্যাণ শুনছিল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বলল, 'আমি চাই না বলতে, কেন যে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়!'

আনন্দ বলল, 'আসলে তুই এখনও কমপ্লেক্সটা কাটাতে পারিসনি।'

'কিসের কমপ্লেক্স?'

'জয়িতা বা সুদীপ বড়লোক।'

'একমিনিট, আমি বড়লোক নই, শ্রীযুক্ত বাবু অবনী তালুকদারের সঙ্গে আমার কোন আর্থিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই ভাই।' সুদীপ হাত নাড়ল।

কল্যাণ বলল, 'তুই আমাকে এখনও বুঝতে পারিসনি আনন্দ। ওদের সম্পর্কে আমার জ্ঞানত কোন কমপ্লেক্স নেই। আসলে আমাকে কি লড়াই করে বাড়িতে একা একা বেঁচে থাকতে হয় তা তোরা কেউ জানলি না।'

সুদীপ বলল, 'তোকে লড়াই করতে হয় অভাবের সঙ্গে। আর আমাদের লড়াই নিজের বিরুদ্ধে। একা একা বেঁচে থাকাটা কিন্তু এক। আমরা তো সবাই আমাদের কথা জানি তাহলে আর এই আলোচনা কেন?'

জয়িতা বলল, 'সুদীপ, রামুকে ডাক্ তো, কল্যাণ আর আমার জন্যে খাবার বল্। আমি যা খাব তাই তোকে খেতে হবে কিন্তু।'

সুদীপ বলল, 'বাঃ, আমি আর আনন্দ?'

চারজনের জন্যেই খাবার বলল জয়িতা। তারপর সকালে দেখা মেয়েটার ঘটনা বলল। আনন্দ মাথা নাড়ল, 'এইটেই মুশকিল। পাবলিকের মেরুদণ্ডটা আটত্রিশ বছরে প্লাস্টিকের হয়ে গেছে। কেউ প্রতিবাদ করবে না। কাল আমি আর সুদীপ যখন দমদমে যাচ্ছিলাম তখন টালা ব্রিজের ওপর সব বাস মিনিবাস লরি একঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল। পাকপাড়ার কাছে ব্রিজের মুখে চারটে ছেলে টেম্পোয় সন্তোষী ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছিল নাচতে নাচতে, কেউ তাদের সরতে বলছিল না, তারাও নেচে যাচ্ছিল।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর? তোরা কি করলি?'

সুদীপ উত্তর দিল, 'আমরা আছি খালের এপাশে বাগবাজারে।'

জয়িতা হাসল, 'সবাই ওইরকম ভাবে, আমি দূরে আছি, সামনাসামনি যারা আছে তারাই প্রতিবাদটা করুক।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কথাটা ঠিক বলেছিস তুই কিন্তু কিছু করতে গেলে আমাদের এক মাইল দৌড়ে যেতে হত। ততক্ষণে জ্যামটা বাধিয়ে দিয়ে ছেলেগুলো হাওয়া হয়ে গেছে।'

ওরা প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিল। সুদীপ মাঝে মাজে জয়িতার দিকে তাকাচ্ছিল। গতরাত্রে ওরকম একটা ফোন করার পর সেই প্রসঙ্গ একবারও এল না। কথাটা তোলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। খাওয়া শেষ হলে সে খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, 'এভরিথিং নর্মাল?'

জয়িতা তখন কল্যাণের প্লেটের দিকে তাকিয়ে। ওর যে খিদে পেয়েছিল খুব তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ কল্যাণ খাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। বাকি তিনজনের শেষ হয়ে গেছে, কল্যাণ এখনও মাঝপথেই আছে। বেশ কিছুদিন আগে ও এই থিয়োরিটা জানিয়েছিল। যদি খিদে খুব বেশি থাকে এবং সেই তুলনায় খাবার কম থাকে তখন পেট ভরাবার আমেজ পাওয়ার উপায় হল ধীরে, খুব ধীরে খাওয়া। মনে হবে অনেক খেয়ে

ফেলেছি। কিন্তু ওর জন্যে আবার খাবার বলাও যাবে না, সবাই যা খেয়েছে তার বেশি ওকে দিতে চাইলে স্বাভাবিক ভাবে নেবে না। সে সুদীপের প্রশ্নটা এই সময় শুনতে পেয়ে মুখ ফেরাল, 'কোন্‌টে নর্মাল?'

সুদীপ একটু বিস্মিত, বলল, 'কাল রাত্রে যেটা বললি!'

জয়িতা কাঁধ নাচাল, 'ওই বাড়িতে থাকতে হলে ওই সব প্রব্লেম নিয়েই থাকতে হবে। সরি, কাল রাত্রে তোকে ডিস্টার্ব—!'

ওকে থামিয়ে দিল সুদীপ, 'হোয়াটস দিস?'

'মানে?'

'হঠাৎ এরকম ফর্মাল হতে আরম্ভ করলি কেন?' সুদীপের গলা চড়ল।

আনন্দ এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

জয়িতা হেসে ফেলল, 'এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই না সুদীপ?'

আনন্দ বলল, 'কাজের কথায় আসা যাক। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কল্যাণকে নিয়ে আজ গ্রামের বাড়িতে যাব। কিন্তু তোর শরীর তো ফিট নয়, রেস্ট নিয়ে সারিয়ে তোল নিজেকে। যদি মনে হয় আমার হোস্টেলে আসতে পারিস।'

কল্যাণের খাওয়া তখন শেষ পর্যায়ে। বলল, 'আমি আজ যেতে পারব।'

'পারবি তবু বিশ্রাম নে। সুদীপ চলুক। ওর কে এক আত্মীয়া থাকেন ঠাকুরপুকুর। আজই ফিরে আসার চেষ্টা করব। প্রত্যেকে কিপ ইন টাচ।' আনন্দ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানাল।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কাল দমদমে কি হল? পার্টি রাজি হয়েছে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, পার্টি এখনই কোন অ্যাকশনে নামবে না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবে? শহিদ মিনারের তলায় দাঁড়িয়ে গরম গরম কথা বলে পার্টির অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে? কি চায় পার্টি?'

আনন্দ বলল, 'পার্টি এখনই এমন কাজ করতে চায় না যেটাকে হঠকারিতা বলা হয়ে থাকে। একটু একটু করে দেশের মানুষের মন দখল করার পরেই পার্টি আন্দোলনের ডাক দেবে। একাত্তর সালে একদল যে ভুল করেছিল পার্টি তা আর করতে চায় না।'

কল্যাণ একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'পার্টি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে কবে?'

সবাই হেসে ফেলল। আনন্দ বলল, 'একটা কথা ঠিক পার্টি এখনও অর্গানাইজড নয়। এদেশে এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব নয়। একজন নেতা নেই যার ওপর দেশের মানুষ নির্ভর করবে, বিশ্বাস করতে পারবে।'

জয়িতা বলল, 'পিপ্‌ল? আই ক্যান্ট বিলিভ দেম!'

আনন্দ বলল, 'ভুলে যাস না ইউ আর ওয়ান অফ দেম।'

জয়িতা হাসল, 'সিওর। আই বিলিভ, ঠিক আছে; ক্যারি অন।'

আনন্দ মুখ নামাল, 'ব্যাপারটা হল, এখন শুধু বিপ্লব বিপ্লব খেলা করা যেতে পারে। উইদাউট অর্গানাইজিঙ পিপ্‌ল ঝাঁপিয়ে পড়া বোকামি। তার জন্যে সময় লাগবে। অনেকরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাছাড়া জনসাধারণ এখন দিনকে দিন আরও ক্যালাস হয়ে পড়েছে। তাদের ইনভলভ্‌ড্‌ করা দরকার। একাত্তরের ভুল পার্টি করতে চায় না। ওই অভিজ্ঞতাই পার্টি কাজে লাগাতে চায়। যুক্তি খুঁজতে চাইলে এই বক্তব্যে আমি কোনও ফাঁক পাইনি।'

জয়িতা চোখ ছোট করল, 'তাহলে?'

কল্যাণের খাওয়া শেষ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দ্যাখ আনন্দ, পার্টির সঙ্গে তোর সম্পর্কেই আমরা সম্পর্কিত। সুদীপ বোধহয় কিছুটা। কিন্তু আমি কিংবা জয়িতা এসব মানব কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কেউ মানতে বলেনি।'

কল্যাণ এমন উত্তর আশা করেনি। ও ভেবেছিল আনন্দ পার্টির পক্ষ নিয়ে তাকে বোঝাতে চাইবে। একাত্তরের আন্দোলন এখন শুধুই স্মৃতি। সেই স্মৃতি কোন কোন পরিবারের পক্ষে তীব্র বেদনাদায়ক। কিন্তু ওরা জেনেছে সেই সময় একটা বিরাট ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। তখন ওদের বয়স খুবই অল্প।

জয়িতা কিংবা সুদীপের কিছুই মনে নেই। আনন্দর আবছা কিন্তু কল্যাণের স্পষ্ট। তখন উত্তর কলকাতায় তাদের পাড়ায় প্রায়ই বোমা ফাটত। মা ওদের ভাইদের জড়িয়ে ধরে বসে থাকতেন। আর বাবার আসার সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হলেই তাঁর কান্না শুরু হত। আর মাঝে মাঝেই পুলিশের হামলা হত পাড়ায়। দু'দিন তাদের বাড়ি তছনছ করেছিল পুলিশ। সেই ছবিটা এখনও কল্যাণের স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু পরে একাত্তরের আন্দোলন নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা করেছে। নকসালপন্থী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তারা কেন ওই কাজ করেছিল তাই নিয়ে নানান বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। সেসবও ওদের পড়া। যত জানতে চেয়েছে তত ধোঁয়াশা বেড়েছে। পরবর্তীকালে সেই-সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ দেখে সেটা আরও ঘনীভূত হয়েছে। সেই সময়ের এক ভারতবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা এখন দিনরাত দিশী মদ খেয়ে বেড়ান। কোন দলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। বিপ্লব করার কল্যাণে তিনি সরকারি আনুকূল্য পেয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্যে। সেসব উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় মানুষের করুণা ভিক্ষে করেন মদ খাওয়ার জন্যে। সম্প্রতি ওঁরই এলাকার একদা কমরেডদের সম্মেলন হয়ে গেল কিন্তু তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তাঁর নিজেরও বোধহয় সে আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই মানুষটি বুদ্ধিমান নন। নিজের অর্জিত নামকে তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। কিন্তু আন্দোলন খতম হয়ে গেলে যেসব মাঝারি নেতা জীবিত রইলেন তাঁরা কিছুদিন অপেক্ষার পর চেহারা পালটাতে লাগলেন দ্রুত। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়ে একে অপরের নিন্দে করা শুরু করলেন। যে আন্দোলন একটা মহৎ প্রচেষ্টার সম্মান পেতে পারত তাকে ছিন্নভিন্ন করার প্রবণতা দেখা দিল এইসব যদুনায়কদের। তারপর এঁদের অনেকেই ফিরে গেলেন সেইসব মানুষ, প্রতিষ্ঠান কিংবা ধারাব কাছে যাঁদের এতকাল এঁরা গালাগাল দিয়ে এসেছিলেন বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট বলে। যাঁরা এককালে নির্বাচন পদ্ধতিকে গালিগালাজ করেছেন তাঁরাই অতঃপর নির্বাচনের দিকে ঝুঁকেছেন। মজার কথা, দু-একজন ছাড়া কাউকেই জনসাধারণ নির্বাচিত করেনি। তাও প্রথমবার, পরের নির্বাচনে তাঁদের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

তবে বেশিরভাগই গুছিয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছেন। এঁরা অবশ্য সেইসময় সম্মুখ সমরে নামেননি, বুদ্ধি চালান করে পুলিশের বিরাগভাজন এবং জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। যদিও খুব অন্তরঙ্গ মহলে একটা গোপন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বাতাবরণ সৃষ্টি করে রাখেন এঁদের কেউ কেউ কিন্তু আসল সত্যিটা এতদিনে প্রকট হয়ে পড়েছে। আর যাঁরা সম্মুখ সমরে নেমেও জীবিত আছেন তাঁরা ক্রমশ বুঝে যাচ্ছেন কিছু করার নেই। জীবনের সবচেয়ে দামী সময় আন্দোলনে কাটিয়ে দেওয়ায় এঁদের পক্ষে এখন পায়ের তলায় মাটি পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর ফলেই বিভিন্ন উপদলের উৎপত্তি হয়েছিল, পরস্পরকে সন্দেহ এবং গালিগালাজ করার প্রবণতা বেড়েছিল। এখন সেসবও থিতিয়ে গেছে। অতবড় একটা আন্দোলন, যৌবনের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস যেন কোন কাজেই লাগল না। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না। দেশের ষাট থেকে সত্তর কখনও আশিভাগ নাগরিক ভোটের বাক্সে কাগজ ফেলে নিশ্চিন্তে ঘরের কোণায় জায়গা খুঁজেছে। দেশটার দায়দায়িত্ব দুটো রাজনৈতিক দলের ওপরে দিয়ে তারা জেনে গিয়েছে কিছু করার নেই। যে তাদের পাইয়ে দেবে সেই দলই ব্যালটটা পাবে। মাঝে মাঝে আবেগের হাওয়ায় অবশ্য ভাসাভাসি চলে কিন্তু স্বার্থ শব্দটার বাইরে আর কিছুর কথা জনসাধারণ ভাবতে রাজী নয়। ক্রমশ এই স্বার্থ শব্দটার ক্ষেত্রও ছোট হয়ে আসছে। এখনও পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে নিজেরটা বাঁচাও-এর মধ্যে সীমিত আছে। কদিন পরে পাশের ঘরে মা বাবা পুড়ে মরলে সে নিজের শরীরটাকে বাঁচাতে আগে ছুটবে।

এই পরিস্থিতিতে নবগঠিত পার্টি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বেশ কিছু অচলায়তনকে ধাক্কা দেওয়া রক্তগরম করা শব্দাবলী একত্রিত করে ছাপা একটি লিফলেট ওদের হাতে পড়েছিল। ওরা বিস্মিত হয়েছিল কিছু মানুষ এ ব্যাপারটা নিয়ে সক্রিয় ভাবনা ভাবছেন এবং খুব গোপনে সংগঠন গড়ে তুলছেন। এরপরেই আনন্দর সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ হয়। আনন্দ প্রায় নিয়মিত যাওয়া আসা করত। বাকি তিনজন ছিল অনিয়মিত। এর পিছনে কোন নির্দিষ্ট কারণ ছিল না। শুধু একটি জনসভায় উপস্থিত থেকে ওরা কিছু জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার পর ওদের মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। সেইসঙ্গে দ্বিধা। ওরা স্থির করে নেয়, আনন্দই যোগাযোগ রাখবে। ওদের ধারণা হচ্ছিল এখন কোন অবস্থাতেই পার্টির পক্ষে সাহসী হওয়া সম্ভব নয়। এমন একজন নেতা পার্টিতে নেই যাকে জনসাধারণ বিশ্বাস করবে। অতএব আরও

বিশদভাবে পরবর্তী কার্যাবলী লক্ষ্য করা দরকার বলে ওদের মনে হয়েছিল।

কল্যাণ এবার সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুরপুকুরে তোর কে থাকে?'

'কাফি দূরের রিলেটিভ। বুড়ি আমাকে পছন্দ করে বলে মনে হয়।'

'তা করুক। কিন্তু এর সঙ্গে তোর গ্রামের কি সম্পর্ক?' প্রশ্নটা আনন্দর উদ্দেশ্যে।

আনন্দ হাসল, 'এই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। তার আগে আমি প্রত্যেককে একটি প্রশ্ন করছি। যে কাজ করব বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে কারও কোন দ্বিধা বা ভয় নেই তো?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'প্রশ্নই ওঠে না।'

সুদীপ বলল, 'এই প্রশ্নটাই নিরর্থক।'

জয়িতা আনন্দর দিকে তাকাল, 'এই প্ল্যানটার কথা এখন পর্যন্ত ক'জন মানুষ জেনেছে?'

আনন্দ বলল, 'দমদমে কাল তিনজন ছিল আর ধর, আমরা ছাড়া আর চারজন জানে। কিন্তু নট ইন ডিটেলস। আমি স্পটটাও বলিনি তবে ওরা জানে আমরা চারজন একসঙ্গে আছি, দ্যাটস অল।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এই চারজনের কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, সেরকম হওয়ার চান্স খুব কম। তাছাড়া তোদের সঙ্গে কথা বলেই আমি গিয়েছিলাম। কখনও কখনও তো বিশ্বাস করতে হয়।'

জয়িতা বলল, 'এই বিশ্বাসটা যেন আমাদের খুব বড় দাম দিতে বাধ্য না করে।'

আনন্দ চট করে প্রশ্ন করল, 'তুই কি ভয় পাচ্ছিস সঙ্গে আসতে?'

'মোটেই না।' হেসে উঠল জয়িতা, 'আবার সেইসব বস্তাপচা শব্দগুলো যেন তোরা বলতে শুরু করিস না। তোরা যা করতে পারবি আমিও তাই পারব। এইভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে মরতে আর মরা দেখতে ভাল লাগে না। ভবিষ্যতের কথা যদি ভেবে ভয় পেতাম তাহলে তো নিজের ক্যারিয়ার গোছাতাম রে। তবে এখন থেকে আমাদের চারজনের বাইরে কোন কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। কারও কাছে কিছু যখন পাওয়া যাবে না—।'

সুদীপ গুনগুন করল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—।'

আনন্দ চাপা গলায় বলল, 'বি সিরিয়াস সুদীপ!'

গান থামিয়ে গম্ভীর মুখ করে সুদীপ বলল, 'আই অ্যাম অলওয়েজ সিরিয়াস।' তারপরেই দূরের এক টেবিলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'কিরে, তোদের পত্রিকা বেরিয়েছে?' ওপাশ থেকে একটি ছেলে হাত নেড়ে না বলল।

জয়িতা বলল, 'চমৎকার নমুনা।'

সুদীপ হাসল, 'যদি কেউ আমাদের লক্ষ্য করে তাহলে এখন ভাববে আমরা স্রেফ আড্ডা মারছি। এতক্ষণ যা গম্ভীর মুখে তোরা কথা বলছিলি যে দেখলেই সন্দেহ হত।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। আর ফালতু কথা নয়। শোন, আমরা বিকেলের বাস ধরে ডায়মন্ডহারবারের উদ্দেশ্যে রওনা হব। ওখানে পৌঁছতে হবে এমন সময় যাতে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসে। তোরা সবাই আমার বাড়িতে চলে আসবি। আমার এক বন্ধু ড্রাইভারি করে, মানে একসঙ্গে আমরা স্কুলে পড়তাম, তাকে বলব গাড়ি আনতে। সেই গাড়ি নিয়ে জয়িতা আর সুদীপ প্যারাডাইসে পৌঁছে যাবি।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আর একজন উইটনেস থাকছে না?'

আনন্দ বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি। কিন্তু আমাদের একটা গাড়ি দরকার।'

সুদীপ বলল, 'আমি গাড়ি চালাতে পারি। কাউকে কিছু বলার কোন দরকার নেই।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি পাবি কোথায়?'

সুদীপ হাসল, 'পেয়ে যাব। রাস্তায় এত গাড়ি আর একটা গাড়ি পাব না? আমি তো আজ আনন্দর সঙ্গে যাচ্ছি, হালচাল দেখে ওটা ঠিক করে আসব।'

আনন্দ বলল, 'ধর, তোর কিছু হল?'

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। আনন্দর প্রশ্নটা নিয়ে সুদীপ অবশ্য বিব্রত হচ্ছিল না। কারণ তার ঠোঁটে

হাসি লেগেই ছিল। জয়িতা বলল, 'আমি চালাব তাহলে।'

আনন্দ খুশী হল, 'বেশ তাহলে একটা ঝামেলা চুকল। গাড়িটা কিভাবে পাওয়া যায় তা আজ আমরা দেখে আসব। এবার কেন সুদীপের আত্মীয়ের বাড়ির কথা বলছি সে প্রসঙ্গে আসছি। সুদীপের কাছ থেকে শুনেছি যে ওই বাড়িতে ভদ্রমহিলা একা থাকেন। বেশ বড় বাড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছেই আবার আমাদের গ্রাম থেকে সোজা চলে আসা যায়। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা ওই বাড়িতে শেল্টার নিতে পারি। কিন্তু এসবই নির্ভর করছে সুদীপ কিভাবে ওর আত্মীয়াকে ম্যানেজ করবে তার ওপর। যদি তিনি রাজী হন তাহলে যতদিন না সবকিছু ঠাণ্ডা হচ্ছে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত।'

সুদীপ বলল, 'বুড়িকে আমি ম্যানেজ করে নেব, তুই চিন্তা করিস না।'

আনন্দ বলল, 'হলে ভাল নইলে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমি বলছি না যে ওই রাত্রে শেল্টারের প্রয়োজন হবেই। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে যাব হয়তো, কিন্তু সামান্য ঝুঁকি হয়ে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা হাতে রাখতে হবে। অন্যান্য যা দরকার আমি আর সুদীপ ম্যানেজ করে নেব। শুধু জয়িতা, পাঁচ হাজার টাকা দরকার। এইটের ব্যাপারে তুই কোন হেল্প করতে পারিস?'

'পাঁচ হাজার? ও সিওর!'

'কিভাবে?'

'দুটো বালা আছে, হার আছে, মানে আমার কাছে যা আছে তাতেই ওই টাকা হয়ে যাবে। শুধু আমি জানি না কোথায় বিক্রি করলে ঠিকঠাক টাকা পাওয়া যায়!'

'ওগুলো বিক্রি না করে টাকাটা পাওয়া যাবে না?'

'কিভাবে? আমার মুখ দেখে পাঁচ হাজার কেউ দেবে? টু মাচ এক্সপেকটেশন!'

'ইয়ার্কি মারিস না। বাড়ি থেকে টাকাটা ম্যানেজ করতে পারবি?'

'নো! আমি কারও কাছে ভিক্ষে চাইতে পারব না।'

কল্যাণ চুপচাপ শুনছিল, বলল, 'পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে আকাশের চাঁদের মত। এখন আমি কোন কাজেই লাগতে পারছি না, না?'

আনন্দ বলল, 'তোর কাজ পরে।' তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কিছু টাকা হাতে রাখা উচিত। বেশ কিছু টাকা, যাতে প্রয়োজন হলে কিছুদিন চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারি। সুদীপের সঙ্গে ওর বাবার রিলেশন অনেকদিন থেকেই খারাপ। তার ওপর ওদের বাড়িতে ইনকামট্যাক্স-রেইড হয়ে গেছে। এছাড়া আর একটা জিনিসের দায়িত্ব নিয়েছে সুদীপ। আমি জানতাম যতই তুই অপছন্দ করিস না কেন, তোদের সম্পর্ক সুদীপদের মত নয়। তুই চেষ্টা করলে—।'

'গতরাত্রে সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভুল বললাম, শেষ হয়েছিল অনেক আগেই, কাল তার শ্রাদ্ধ হল। এখন আর আমি কিছু চাইতে পারব না।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক হ্যায়। এখনও কিছুদিন সময় আছে হাতে। সবাই মিলে ভাবলে একটা পথ বের হয়ে যাবে। জয়িতা, আমরা যেটা করতে চাইছি সেটা এদেশের আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু আমরা মনে করি ওই অপরাধগুলো মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করবে। আমরা মনে করি ওই অপরাধগুলো করা মানুষ হিসেবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে ঘরের দুর্গ আক্রমণ করতে দোষ কি?'

'একটাই প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা যে সব অপরাধ, মানে ওই আইনের চোখে, করতে যাচ্ছি তা আরও অনেক বড় অপরাধকে নষ্ট করার জন্যেই। কিন্তু আমার বাবা-মায়ের জীবন তাঁরা তাঁদের মত চালাচ্ছেন, আমি তা মানতে পারছি না, কিন্তু তাঁরা অপরাধ করছেন কিনা সেটা প্রমাণিত হচ্ছে কোথায়?' জয়িতা খুব সরল প্রশ্ন করল।

সুদীপ ভাবছিল জবাবটা। আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, আপাতত এই প্রসঙ্গ থাক। তোরা একটু এগিয়ে আয়। পাশের টেবিলে লোক এসেছে। আমার প্ল্যানটা হল—।'

চারটে মাথা প্রায় একহাতের বৃত্তে পৌঁছে গেল চারকোণা থেকে।

'অপারচুনিস্ট!'

খানিকটা ঠাট্টার মিশেল দিয়ে জয়িতার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল সুদীপ। কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এইসময় ড্রাইভার এমন আচমকা গতি হ্রাস করল যে বেচারার হাত রড থেকে ছিটকে গেল এবং সুদীপকে আঁকড়ে ধরে সোজা হল। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা তখন ড্রাইভার কন্ডাক্টরের মুণ্ডপাত করতে শুরু করেছে। সেই ফাঁকে সামলে নিয়ে কল্যাণ খানিকটা চেঁচিয়ে বলল, 'এই, সুদীপ তোকে অপারচুনিস্ট বলছে!'

লেডিস সিটে বসে ওদের টালমাটাল ব্যাপারটা উপভোগ করতে করতে জয়িতা হাসল, 'আই ডোন্ট মাইন্ড!'

সুদীপ কল্যাণকে বলল, 'ফুটনোট না পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।'

প্রাইভেট বাসটায় ওরা উঠেছে কলেজের সামনে থেকে। তখনই ভিড় ছিল, এখন আরও বাড়ছে। ওরা চারজনে কোনমতে উঠতে পেরেছিল। লেডিস সিটে একজন পুরুষ জাঁকিয়ে বসেছিলেন মহিলাদের সঙ্গে। ওরা যখন ভিড়ে সাঁতরাচ্ছে তখন জয়িতা কোনমতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আমাকে বসতে দিতে আপনার আপত্তি আছে?'

ভদ্রলোক ভূত দেখার মত চমকে ছিলেন। জিনসের প্যান্ট আর হ্যান্ডলুমের শার্টে জয়িতাকে তিনি আবিষ্কার করে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঁধের ব্যাগটা কোলে নিয়ে আরাম করে জানলার পাশে বসে বন্ধুদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এসপ্ল্যানেড থেকে মিনিট পঞ্চাশেক লাগবে, না রে?'

'হ্যাঁ, ওইরকম। তোর ব্যাগটা সামলে রাখিস।' আনন্দ উত্তর দিল।

'ডোন্ট ওরি ম্যান! আমি ঠিক আছি।'

ভিড় বাসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে মোটেই ভাল লাগে না আনন্দর। কিন্তু সুদীপের বোধহয় চেঁচিয়ে কথা না বলতে পারলে মোটেই আরাম হয় না। ক্রমশ চাপে পড়ে ওরা তিনজনেই ভেতরের দিকে সরে আসছিল। বউবাজারের মুখে তিনটি ছেলে উঠল। ওদের অস্তিত্ব জানা গেল কারণ বাসের পাদানিতে পা রেখেই ওরা কন্ডাক্টরকে অশ্লীল ভাষায় ধমকাল স্টপেজে না বাঁধার জন্যে। এত ভিড় তবু ওদের জায়গা করে দিল যাত্রীরা লেডিস সিটের সামনে যেতে। সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'এটা এখন একটা কায়দা হয়েছে। খিস্তি করলে ফেসিলিটিস পাওয়া যায়।' আনন্দ কিছু বলল না। তার কানে খুব বিশ্রী শব্দগুলো এখনও নোংরার মত লেগে আছে। তারপরেই ওর কানে এল উঁচু গলায় গল্প করছে তিনজন। কোন একটি মেয়ে রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরে। পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দেয় না বটে তবে পয়সা ফেললেই পাওয়া যায়। এইসব গল্পগুলো বলার সময় তারা সমানে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে মজা পাচ্ছিল। নিজেদের অতৃপ্ত বাসনাকে ব্যক্ত করতে যেন ওইসব শব্দ সাহায্য করছিল। আনন্দ দেখল বাসের সবাই এইসব বাক্য শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না। বরং প্রত্যেকে এমন ভঙ্গিতে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওইসব কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না। সবকটা মুখই যেন মুখোশ পরা।

এইসময় জয়িতার গলা শুনতে পেল, 'এই যে, হয় আপনারা ভদ্রভাবে কথা বলুন, নয় বাস থেকে নেমে যান। এটা আপনাদের শোওয়ার ঘর নয়।'

তিনজনেই একটু থমকে গেল প্রথমটায়। তারপর একজন একটু ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'শোওয়ার ঘর করে নিলেই হয়। বাসটা আপনার বাদারের মাল নাকি যে বললেই নেমে যাব!'

দ্বিতীয়জন বলল, 'এগরোল মাইরি, হেভি লঙ্কাঠাসা।'

তৃতীয়জন বেঁকিয়ে বলল, 'বাঙালির মেয়ে হয়ে প্যান্ট পরেছেন লজ্জা করে না। সীতা সাবিত্রী—'

তড়াক করে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ছেলেটার কলার ধরে ঠাস করে চড় মারল জয়িতা। কিন্তু সেইসময় তিনটে ছেলে বিপরীত দিক থেকে আঘাত পেল। তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেল বাসে।

যাত্রীরা ভয়ে সরে গেল যে যে-দিকে পারে। চলতে চলতে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল একপাশে। ততক্ষণে তিনটে ছেলে ওদের পা জড়িয়ে ধরেছে। কল্যাণের স্বাস্থ্য ভাল, সে বিরক্তিতে একটা লাথি মেরে বলল, 'ভাগ, তোদের শরীরে হাত দিতেও ঘেন্না করে। এর পরের বার দেখলে মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব।'

তিনটে ছেলে ব্যাঙাচির মত লাফ দিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। এইসময় জয়িতা চাপা গলায় ফুঁসে উঠল, 'তোরা কেন এলি? আমি তোদের ডেকেছিলাম?'

কল্যাণ একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইশেলফ্। ওই তিনটে বাইপ্রোডাক্টকে ট্যাকল করার ক্ষমতা আমাব আছে। তোরা কি ভেবেছিস আমাকে?' উত্তেজিত অবস্থায় জয়িতা নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ওর পাশে বসা একটি মধ্যবয়সিনী এবার নিচু গলায় বললেন, 'আমিও সহ্য করতে পারছিলাম না ভাই। কি করে যে ওইসব কথা ওরা উচ্চারণ করছিল!'

চট করে মুখ ফেরাল জয়িতা, 'সহ্য করতে পারছিলেন না তো প্রতিবাদ করেন নি কেন?'

'ভয় করছিল। আসলে আমার তো বাইরে বলাকওযার অভ্যেস নেই।'

ক্রমশ সরে যাওয়া ভিড়টা জমাট হল। একজন বললেন, 'দেশটার কি হল! এদের কিছু বলতে ভয় হয়! শুনেছি খুরটুর থাকে এদের সঙ্গে।'

জয়িতার সামনে দাঁড়ানো এক প্রৌঢ় বললেন,'না না, ভয় ফয কোনও ব্যাপার নয়। আমি ওদের সুযোগ দিচ্ছিলাম। কতটা বাড়ে বাড়ুক তারপর প্রতিবাদ করব।'

আর একজন গলা বাড়িয়ে বললেন, 'আমার তো হাত নিশপিশ করছিল। কিছু করব করব ভাবছি—'

হঠাৎ জয়িতা চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ ইট! আপনাদের প্রত্যেকের মুরোদ জানা আছে। এতক্ষণ তো ভয়ে গর্তে ঢুকে বসেছিলেন। যেই ওদেব নামিয়ে দেওয়া হল অমনি বীরত্ব দেখাচ্ছেন। আপনারা ভীতু, প্রতিবাদ করতে পারেন না সেটা সহ্য করলেও করা যায়, কিন্তু নিরাপদে দাঁড়িয়ে আস্তিন গোটানো সহ্য করা যায় না।'

একজন বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু প্রতিবাদ কবলে তো আপনি, মানে, একটু আগে ওনাদের ধমকালেন কেন এসেছে এগিয়ে, তাই না?'

অবজ্ঞার হাসি হাসল জয়িতা, 'সেটুকু যদি বুঝতে পারতেন তাহলে অবস্থাটা অন্যরকম হয়ে যেত। সবাই তো যুধিষ্ঠির হয়ে বসে আছেন দ্রৌপদীকে দুঃশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে। রাবিশ!'

ওপাশ থেকে সুদীপ চিৎকার করে উঠল, 'ইটস অলরাইট। কেউ আর কথা বাড়াবেন না। কার কত মুরোদ তা আমরা জানি।'

ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। সামনে জব্বর জ্যাম। বউবাজারের উত্তেজনাটা এখন মিলিয়ে গেছে। যাত্রীরা যে যার নিজের বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সুদীপের সামনের সিটে বসা এক মধ্যবয়সী বললেন, 'জ্যাম তো হবেই। পাতাল রেলের ডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন এটা।'

তার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, 'পাতাল রেল এখানে কোথায়?'

মধ্যবয়সী বললেন, 'পা কেটে গেলে সমস্ত শরীরে ধনুষ্টঙ্কার হয় কেন? তাছাড়া পুলিশেরও হাত আছে। দে আর ক্যালাস। জাপানে কখনও এমন হয় না। নিউ ইয়র্কে জ্যাম হয় কিন্তু বড় জোর আধ ঘণ্টা। মস্কোতে জ্যাম হলে তো কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।'

'চীনে?'

'ওয়েল, চীনে তো এত গাড়ি নেই। সবই জাতীয় সম্পত্তি। অতএব জ্যামও নেই।'

'এদেশে সব জাতীয় সম্পত্তি করে নিলে জ্যাম হবে না বলছেন?'

'তা নেবে কেন? ওই যে পাতাল রেল, যার জন্যে এখানে আমরা বসে আছি, ওটা স্রেফ আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে তৈরি। চীনে পাতাল রেল আছে? নেই। না না, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এস না। আমি সবই জানি শুধু জানি না কবে মারা যাব!' অতি অমায়িক একটা হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

সুদীপ মুখটা নামিয়ে আনল ভদ্রলোকের সামনে, 'কিছু মনে করবেন না একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি? রেগনের ব্রেকফাস্টের মেনুতে কি কি থাকে?'

'অ্যাঁ?' ভদ্রলোকের মুখ আফ্রিকা থেকে চট করে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ হয়ে গেল।

'আপনার স্ত্রী কোত্থেকে কেরোসিন তেল যোগাড় করেন সে খবর রাখেন?'

'মানে, মানে, আপনি আমাকে অপমান করছেন?'

'গুল মারাটা বন্ধ করুন তো। এই হামবড়া ভাবটা, সব জেনে বসে আছেন। আপনাদের বয়সে এলে সব বাঙালি খবরের কাগজের নিউজ এডিটরকে হার মানিয়ে দেয়। অদ্ভুত!'

সুদীপের কথা শেষ হওয়ামাত্র আনন্দ তাকে ডাকল, 'এই নেমে আয়, এখানে জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। হাঁটলে দশ মিনিট লাগবে।'

বাস থেকে নেমে সুদীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আসলে বুঝলি দোষ কারও নয়, দোষটা আমাদের। একটা জাতের যদি মেরুদণ্ডটা প্লাস্টিকের হয়—।'

'তোর কি দরকার? সব জায়গায় নাক গলাস কেন?' আনন্দ বিরক্ত হল। কয়েক পা এগিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই দ্যাখ, জ্যামটা হচ্ছে মিছিলের জন্যে আর লোকটা অবতারের মত বলে গেল পাতাল রেল এর জন্যে দায়ী। লোকটাকে নামিয়ে আনতে ইচ্ছে করছে।'

জয়িতা চুপচাপ মিছিলটাকে দেখছিল। ও জানে এই মুহূর্তে সে অনেকের দ্রষ্টব্য। জিনসের প্যান্ট, শার্ট, ছেলেদের মত ছাঁটা চুলে যে লম্বা শরীরটা তারা দেখছে তাকে চট করে মেয়ে ভাবতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। এবং এই অসুবিধে হওয়াটা দর্শকের মনে কিলবিলে বোধের জন্ম দিচ্ছে। সংসারের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে থেকে নাক ঝাড়া ভাবের সঙ্গে রগরগে রহস্যের জন্যে খুশখুশ সুড়সুড়ি। দুটোই চলছে সমানে। বিভ্রান্ত হওয়ার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙালি মেয়েদের কাঁধ এত চওড়া এবং শরীর অমন লম্বা হয় না। তার বুক কিংবা নিতম্ব শৈশবের অসুস্থতার কারণে সঞ্চয়ী হয়নি। সে প্রসাধন ব্যবহার করে না। মেয়েলিপনার সঙ্গে তার অস্তিত্ব অনেক দূরের। ফলে যারা দেখে তাদের ভ্রান্তি হয়ই। পথেঘাটে চলতে মানুষের চোখে খটকা দেখেছে সে। ইচ্ছে করে সুবিধে আদায় করার সময় সে যখন ঘোষণা করে আমি একজন মহিলা তখন বেশ মজা পায় সে। পুরুষরা তো সব কিছু আগলে বসে আছে, ওদেরই ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে যদি কিছুটা আদায় করা যায় ক্ষতি কি! একবার একটা ত্যাঁদড় ছেলে লেডিস সিট না ছাড়তে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি যে মহিলা তা কি করে বুঝব?'

জয়িতা চটপট জবাব দিয়েছিল, 'নিজের দিকে তাকান, বুঝতে পারবেন।' এখন আর এসব নিয়ে কোন অস্বস্তি হয় না জয়িতার। তার বন্ধুরাও এই নিয়ে মাথা ঘামায় না।

হঠাৎ জয়িতা গলা তুলে বলল, 'দ্যাখ সুদীপ, লোকটাকে দ্যাখ!'

ওরা তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মিছিলটাকে দেখছিল। জয়িতা সামান্য এগিয়ে। মিছিলটা কোন কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দু'সারি লোক পুরো ধর্মতলা স্ট্রীটকে আগলে রেখে আকাশে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে বীভৎস ভঙ্গিতে। যোগ দিন যোগ দিন। আনন্দ বলল, 'এইভাবে ধমকে বললে কেউ যোগ দিতে সাহস পাবে? লোকগুলো নর্মাল বিহেভ করে না কেন?'

কল্যাণ বলল, 'কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা এটা।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ লোকটার কথা বলছিস জয়?'

'ওই যে রোগা মতন, হাওয়াই শার্ট প্যান্ট পরা, হাতে কাপড়ের ব্যাগ!' জয়িতা জানাল।

সুদীপরা দেখল। নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রকৃষ্ট উদাহরণটি হাত তুলেছেন। কিন্তু মুখে কোন শব্দ করছেন না। বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের মোটেই ইচ্ছে করছে না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। এইসময় একটি পঙ্গু মানুষ ক্রাচে ভর্ করে এগিয়ে গেল অন্য ফুটপাতে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'নেহি, নেহি! দেখতা নেহি হামলোগ মিছিল করতা হ্যায়। যানে নেহি দেগা।' ক্রাচে ভর করা মানুষটি কাকুতি মিনতি করতে লাগল কিন্তু লোকটা এই মুহূর্তে হিটলারের মত কঠোর হয়ে গেল।

ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'কাউকে মিছিল ভাঙতে দেবেন না। কেন্দ্রের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।' ভদ্রলোক এমন ভাবে হাত চালালেন যে পঙ্গু লোকটা ভয় পেয়ে সরে এল এপাশে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এই মিছিলে কত লোক অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে জানতে ইচ্ছে করছে।'

জয়িতা বলল, 'ন্যাকামি করিস না। আমরা সবাই জানি। এই মিছিলগুলো হল কোরামিনের মত।

নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে বন্ধ এবং মিছিল করতে হয় মহাপ্রভুদের।' ততক্ষণে মিছিলটা আবার চলতে শুরু করেছে। এর শেষ কোথায় বোঝা যাচ্ছে না, তবে ফেস্টুন দেখে মনে হচ্ছে শহরের চেয়ে শহরতলির মানুষ বেশি সংখ্যায় এসেছেন।

আনন্দ বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চল্, এই ফুটপাত ধরে ধরে হাঁটা যাক, সুযোগ পেলে পার হওয়া যাবে।'

সুদীপ ফুট কাটল, 'সুযোগ এরা দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।'

ওরা যখন জ্যোতি সিনেমার সামনে পৌঁছেছে তখন কল্যাণ দেখতে পেল, 'এই দ্যাখ দ্যাখ, লোকটা মিছিল থেকে সটকেছে।'

চারজনেই লোকটাকে দেখল। একটা পানের দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে মিছিলটাকে দেখছে। যেন পেছনের সারিতে কোন চেনা মুখ আছে কিনা জরিপ করে নিচ্ছে। সুদীপ চট করে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নমস্কার, কেমন আছেন?'

লোকটি থতমত হয়ে যেন চিনতে চেষ্টা করল, 'ভাল, মানে, এই একরকম।'

সুদীপ বলল, 'কতদিন পরে দেখা হল। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন ভাবিনি। যাক, এদিকে কেন এসেছিলেন?'

'এই একটু দরকার ছিল।' তারপর ফ্যাকাশে হেসে বলল, 'ওই মিছিলের জন্যে আটকে গেছি।'

সুদীপ আড়চোখে বন্ধুদের দেখে নিল, 'আপনাদের অফিসের লোকজন আসেনি মিছিলে?'

'আসেনি আবার! ঘাড় ধরে নিয়ে আসে। আমার আজ রেশন তোলা হল না।' কথাটা বলেই লোকটা সচকিত হল, 'মানে এই মিছিলের জন্যে আটকে গেলাম। আচ্ছা কোথায় দেখেছি আপনাকে—মানে—।'

'আপনার অফিসে। বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম।'

'ও তাই বলুন। আমি সেই থেকেই ভাবছিলাম চেনা চেনা, ঠিক মানে, বয়স হয়েছে তো?'

'আপনি তো লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক?'

'আজ্ঞে না, আপার ডিভিসন।'

'চলে?'

লোকটা যেন কুঁজো হয়ে গেল। তারপর বলল, 'চালাতে হয়।'

'এইসব মিছিল টিছিল করলে হয়তো মাইনে বাড়বে আপনার।'

'ছাই বাড়বে। শালারা নিজেদের ধান্দায় আমাদের মিছিলে টেনে আনে। যা দেবার সরকারের ইচ্ছে হলে তবেই দেয়। এখন তো কথায় কথায় কেন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছে।' লোকটা আবার নিবে গিয়ে বলল, 'এদের কথা শুনলে কাজ কম করলেও চলে।'

'ওহো, যে কথাটা বলতে এসেছি, আপনাকে আপনার বড়বাবু ডাকছেন। উনি এদিকে আসবেন না বলে জ্যোতি সিনেমার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে দেখে বললেন ডেকে দিতে।'

সুদীপের কথা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটি সচকিত হয়ে উঠল। এখন সামনে বেলঘরিয়ার ফেস্টুন। লোকটি বলল, 'এতক্ষণ বলেননি কেন? যাচ্চলে!'

তারপর দ্রুত রাস্তায় নেমে এগিয়ে যেতেই মিছিলের একটি মানুষ বাধা দিলেন, 'না না, যেতে পারবেন না। দেখছেন না আমরা মিছিল করছি!'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'জানি, কিন্তু আমার খুব জরুরী দরকার। একটু যেতে দিন।'

'রিঅ্যাকশনারি কথাবার্তা বলবেন না। এই দেখিস তো, বুড়োটা যেন না পার হয়।' পেছনের লোকগুলোর দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে এগিয়ে গেল জঙ্গী মানুষটি।

হো হো করে হাসছিল সুদীপ হাঁটতে হাঁটতে। জয়িতা বলল, তুই পারিস বটে।'

হাসি থামিয়ে সুদীপ বলল, 'দ্যাখ, যে লোকটা মিছিলে আসতে চায় না, ঘাড় ধরে নিয়ে আসা হয় সে-ই মিলিটারি মেজাজে একজন খোঁড়াকে রাস্তা পার হতে দেয় না। আবার নিজের বেলা বোধহয় বাপবাপান্ত করছে। এই হল আমাদের নেতাদের সৈন্যবাহিনী!'

আনন্দ বলল, 'তুই অমন ব্লাফ দিলি, লোকটা টের পেল না কিন্তু। অদ্ভুত!'

কল্যাণ বলল, 'সোজা ব্যাপার। মিছিল থেকে সটকে লোকটা ভয়ে ছিল। তাছাড়া এই ধরনের মানুষ এমনিতেই সারাক্ষণ কেঁচো হয়ে থাকে। নিজের পরিবারের বাইরে একটু ভাল পোশাকের যে কোনও মানুষকেই স্যার বলতে ওদের জিভ সুড়সুড় করে। দোষ নেই, অনেক কালের অভ্যেস। এরা চ্যালেঞ্জ করতে জানে না।'

জয়িতা বলল, 'অল রাইট। বাট আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, কি করে এই লোকটা ছেলের বয়সী সুদীপকে আপনি আজ্ঞে করে গেল!'

'বয়সটয়স কোন ফ্যাক্টর নয়। আসলে ব্যক্তিত্ব যাদের গড়ে ওঠেনি তারা তো এই রকম আচরণ করবেই।' আনন্দ কথাটা শেষ করল এই বলে, 'এদের নিয়েই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে হচ্ছে!'

কল্যাণ প্রতিবাদ করতে গেল। আনন্দ আজকাল মাঝেমাঝেই খুব উলটো-পালটা কথাবার্তা বলে। কতগুলো নিখাদ সত্য সামনে রেখে আমাদের কাজে নামাতে হয়েছে, সেটা জানার পরও এই ধরনের আক্ষেপ মনে অস্বস্তির জন্ম দেয়। সে ঠিক করল আনন্দর সঙ্গে এ নিয়ে পরে আলোচনায় বসবে। ধর্মতলার মোড়ে এসে সুদীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'চলে আয় চটপট।' সামনের মানুষজন তাড়াতাড়ি হাঁটায় মিছিলটা আলাদা হয়ে গেছে। সেই ফাঁক গলে ওরা পেরিয়ে এল।

এখন বেশ গুমোট। সময়টাকে আর দুপুর বলা যায় না। আবার বিকেলের ছায়াও নামেনি। ওরা চারজন আগুপিছু মেট্রোর সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল। হঠাৎ কল্যাণ দেখতে পেল বিমলেশদাকে। বিমলেশদা তাকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'কি ব্যাপার কল্যাণ, তোমার পাত্তা নেই কেন?'

'আমি একদম সময় পাচ্ছি না বিমলেশদা। ইনফ্যাক্ট নাটক করার ইচ্ছেটা আমার নেই।'

'কেন জানতে পারি? তুমি তো একসময় খুব উৎসাহী ছিলে!'

কথাগুলো শোনার পর বিমলেশদাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কল্যাণ পাজামা-পাঞ্জাবি পরা স্বপ্ন দেখতে চাওয়া মানুষটির দিকে তাকিয়ে এক পলক ভাবল রূঢ় কথা ব্যবহার করবে কিনা! তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি রিয়ালইজ করেছি ওই মিডিয়ামটা আমার জন্যে নয়।'

'কিন্তু তুমি তো ভাল অভিনয় করতে। বুঝতে পারছি না, তুমি সত্যি লুকোতে চাইছ কিনা!'

কল্যাণ হাসল, 'ঠিক আছে। যদি সুযোগ পাই পরে একদিন এ বিষয়ে কথা বলব। বিমলেশদা, ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু। ঠিক আছে, আজ আমাদের একটু তাড়া আছে।'

একটু জোর করেই সরে এল কল্যাণ। তার মন ভাল লাগছিল না। তিনমাস হল গ্রুপে সে যায় না। খবর এসেছে অনেকবার। সে নাটক করবে না জানিয়েও দিয়েছে। কিন্তু তবু এই মানুষটির মুখোমুখি হয়ে তার এই মুহূর্তে ভাল লাগছিল না। সুদীপ আর আনন্দ কথা বলতে বলতে সামনে হাঁটছে। জয়িতা কল্যাণের পাশে চলে এল, 'হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেলি কেন?'

কল্যাণ কাঁধ নাচাল প্রথমে। তারপর যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'বিমলেশদাদের মত সিরিয়াস লোক চিরকাল লড়াই করে যান কিন্তু বুঝতেই চান না যুদ্ধটা একতরফা। ফলাফল আগেই ঠিক করা আছে।'

জয়িতা বলল, 'সে কথা উনিও নিশ্চয়ই জানেন। তোর মন খারাপ করার কি আছে!'

কল্যাণ কথাটা শুনে একটু উত্তেজিত হল, 'তুই ব্যাপারটা বুঝবি না। আমাদের দলের জন্য পনেরো ছেলে শুধু ভাল নাটক করবে বলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা রিহার্সালরুমে কাটিয়ে দিল। কিন্তু ভাল নাটক করব বললেই করা যায় না। কলাকাতার যে দুটো হলে লোকে কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে নাটক দ্যাখে সেই দুটো হল তুই চাইলেই পাবি না। একটা হল বিখ্যাত দলগুলোর মধ্যে বিতরিত, অন্যটি সরকারি আমলা আর ধামাধরদের খেয়ালখুশিতে চলে। উত্তর দক্ষিণে যেখানেই নাটক করবি তোকে পায়ে ধরে দর্শক ডেকে আনতে হবে। সেটা দু'তিনটে শো-এর পরে অসম্ভব। বিমলেশদারা যে প্রযোজনাই করুক প্রতিটিতে ধার বেড়ে যায়। তুই বলবি মফঃস্বলে যা, গ্রামে যা। প্রযোজনার টাকাটা কে দেবে? এ তো গেল বাইরের ব্যাপার, আমরা নাটক পাব কোথায়? কলকাতায় তিনচারজন নাটক লিখতে পারতেন। বড় দলগুলো তাঁদের একচেটিয়া করে রেখেছেন। ইদানীং সেসব কলমও বন্ধ হয়ে আসছে। ফলে অনুবাদ এবং অনুসরণের জোয়ার চলছে। সেসব মঞ্চস্থ করে কি লাভ হচ্ছে তা নিয়ে কেউ ভাবছে না। আমাদের দলে কেউ নেই যে নাটক লিখতে পারে। পুরোনো নাটক অভিনয় করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সেসব করে

শুধু আত্মপ্রসাদ বাড়ানো, যৌবন এবং অর্থের অপচয়। আসলে আমাদের সব কিছুর মত এই নাটক করার মধ্যেও কোন পরিকল্পনা নেই। এসব কথা বিমলেশদাও জানেন। কিন্তু নেশা জিনিসটা বোধহয় খুব মারাত্মক, সবসময় তার চোখের পাতা বন্ধ থাকে।'

জয়িতা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তুই যে এসব নিয়ে ভাবছিস এতদিন জানতাম না।' তারপর আবহাওয়া হালকা করার জন্যে জুড়ে দিল, 'চমৎকার কথা বলতে পারিস তুই। কোথাও বক্তৃতা করার প্রয়োজন হলে তোকে আগে ঠেলে দেব।'

কল্যাণ হাত তুলল, 'ভাগ্!'

ডায়মন্ডহারবারের বাসে ওরা জায়গা পেয়ে গেল। সমস্ত কিছুই আগে থেকে বারংবার ছকে নেওয়া ছিল। গত সপ্তাহে সুদীপ এবং আনন্দ একবার পাক দিয়ে এসেছে। ঠাকুরপুকুরে সুদীপের আত্মীয়ার বাড়ি বড় রাস্তার কাছাকাছি। খুবই নির্জন বাড়িটা। বৃদ্ধা বিধবা, কোনও আত্মীয়স্বজন সেখানে থাকে না। এক চিলতে বাগান আর পেছনদিকে দু'ঘর ভাড়াটে আছে। আনন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সুদীপ। ইঙ্গিত দিয়ে এসেছিল যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওরা এক-আধদিন ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। বাড়িটার চারপাশে বেড়াবার নাম করে চিলেকোঠার ঘরটা আনন্দকে দেখিয়েছিল সে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে চমৎকার জায়গা। শুধু পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ সেখানে আসে না। আনন্দ লক্ষ্য করেছিল বৃদ্ধা নির্লিপ্ত হয়ে শুনলেন এবং নিজে যা করছিলেন করতে লাগলেন। সুদীপ বলেছিল ওটা নাকি ভাল লক্ষণ। অপছন্দ হলে এতক্ষণ চিৎকারে আকাশ ফাটাতেন। বস্তুত এই অঞ্চলে ওঁর ওই গুণের বেশ খ্যাতি আছে। অতএব এদিকটা নিয়ে ভাবনা নেই।

সন্ধ্যের পর গ্রামে পৌঁছাতে আনন্দ চেয়েছিল। এতে সুবিধে অনেক। এই লাইনে লোডশেডিং নিয়মিত ব্যাপার। রাত দশটার আগে আলো আসে না। ঠিক গ্রামের মধ্যে না নেমে মুখটায় নামলে কারও চোখে পড়ার কথা নয়। পড়লেও একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে নিশ্চিন্তি। এসব নিয়ে চিন্তা করতে হত না যদি জয়িতা সঙ্গে না থাকত। ওর ওই পোশাক গ্রামের মানুষদের স্মরণে থেকে যাবে। সংশয়ের কথা সে বলেছিল বন্ধুদের। কিন্তু জয়িতাই কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল, 'তোর বাড়ির লোকদের নিয়ে ভাব, গ্রামের মানুষদের আমি ট্যাকল করব।'

দু'বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আনন্দ জেনে গেছে জয়িতার মধ্যে কোন ন্যাকামি নেই। একটা ছেলের পক্ষে যা করা সম্ভব ওর কাছে তা অসম্ভব নয়। প্রথমদিকে তাদের তিনজনেরই যে ওর সম্পর্কে দ্বিধা ছিল এটা অস্বীকার করার মানে হয় না। কিন্তু সময় এবং কাজ সেটাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে কখন। আনন্দ ছুটন্ত বাসে বসে পেছন ফিরে তাকাল। বেশ ভিড়। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার ঠিক পাশে বসে জয়িতা উদাসমুখে জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। সে আড়চোখে যাত্রীদের মুখ দেখল। জয়িতার দিকে তাকাচ্ছে কেউ কেউ। আনন্দর মনে বিরক্তি এল। ও যদি শাড়ি পরে আসত তাহলে ব্যাপারটা এড়ানো যেত।

ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নামছে। এই লাইনে যেতে যেতে অনেকবার দৃশ্যটা দেখেছে সে। প্রথমে অনেক দূরে দিগন্তের কাছে উলের বলের মত অন্ধকার জমে। তারপর সেটা সুতো খোলার মত এগিয়ে আসে সামনে। এবং শেষমেশ রাত হয়ে যায়। এখন রাস্তা অনেক চওড়া হয়েছে, হু-হু করে ছুটতে পারে বাস। হঠাৎ সুদীপ ছটফটিয়ে উঠল, 'ওই যাঃ!'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সুদীপ বলল, 'সিগারেট কিনতে ভুলে গেছি। তোদের গ্রামে সিগারেট পাওয়া যাবে?'

পেছন থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল, 'আমার কাছে একটা প্যাকেট বাড়তি আছে। দাম দিয়ে দিস।' সঙ্গে সঙ্গে বোবা যাত্রীরা উশখুশ করে উঠল।

কল্যাণ সেটা ধরতে পেরে চোখ খুলে বলল, 'তোর কাছে রাখতে দিয়েছি বলে প্যাকেটটা নিজের হয়ে যায়নি। ওটা আমার সিগারেট। পরের জিনিস দান করা খুব সোজা।'

জয়িতা চোখ বড় করল, 'বাঃ, তুই এই আর্টটা বেশ রপ্ত করেছিস তো!'

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামনের সিট থেকে আনন্দ বাধা দিল, 'ঠিক আছে। ওখানে সিগারেট পেতে কারও অসুবিধে হবে না। তোরা বড্ড কথা বলিস।'

সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে জয়িতাকে বলল, 'এই জন্যে তোকে ভাল লাগে।'

জয়িতা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোর নিজেকে ভাল লাগে তো? তাহলেই চলবে।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, মাঝে মাঝেই দ্বীপের মত আলো দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। বাসের ভেতরে আলো জ্বলছে। আনন্দর মনে হচ্ছিল এটা নিবিয়ে রাখলেই ভাল হত। কারণ তার পরিচিত একজন অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছেন। শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আনন্দ গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

আধ-ঝুলন্ত প্রৌঢ়টি বললেন, 'আছি দেখতেই পাচ্ছ। পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

'হচ্ছে যেমন হয়।' ইচ্ছে করেই কথাটা বেঁকিয়ে বলল আনন্দ। এতক্ষণ উনি যেভাবে তাকাচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছিল কথা না বললে অন্যায় হবে। কিন্তু কথা শুরু করতেই কায়দা শুরু করেছেন। ওর গ্রামের কিছু মানুষকে এই কারণেই সে সহ্য করতে পারে না। প্রৌঢ় এবার বললেন, 'মন দিয়ে পড়াশুনা কর। তোমার বিধবা মায়ের কষ্ট তুমি ছাড়া আর কে দূর করবে! তোমার বাবা কি সরল মানুষ ছিলেন!'

আনন্দ প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করলে, 'আমার মা আপনাকে কষ্টের কথা বলেন নাকি? কি আশ্চর্য, আমাকে ওসব বলেন না!'

'মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'খুবই সামান্য কাকাবাবু। আমার মায়ের কি কি কষ্ট আছে সেটা তো আপনার জানার কথা নয়। কেন কথা বলার জন্যে কথা বলছেন?'

সুদীপ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কত পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছিলেন? ও বিরাশি পেয়েছিল। কেন ফটাফট জ্ঞান দেন?'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র একটা চাপা হাসি উঠল চারপাশে। দু-একজন আলোচনা শুরু করে দিলেন। কুড়ি বছর আগে যত ছেলেমেয়ে হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করত এখন তার দ্বিগুণ করে। যত নম্বর এরা এখন পায় তখন সেটা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। এই সময়ের ছেলেরা বেশি ব্রিলিয়ান্ট কিনা তাই নিয়ে তর্ক শুরু হল। আনন্দ দেখল সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু লোকটা চটেছে এবং সুযোগ দিলেই চিমটি কাটার চেষ্টা করবে। ছোবল মারার ক্ষমতা নেই। সে চাপা গলায় সুদীপকে বলল, 'কেন আগবাড়িয়ে কথা বলতে যাস!'

'গা জ্বলে যায়।'

'কখনও কখনও চামড়া মোটা করতে হয়।'

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল, যারা জীবনে কোন দায়িত্ব নেবে না তারাই নিরাপদে দাঁড়িয়ে জ্ঞান দিয়ে যায়।'

আনন্দ আর কথা বাড়াল না। সুদীপের বাড়ির অবস্থা সে জানে। প্রাচুর্য সেখানে দমবন্ধ করে ছড়ানো। ওর নিকট আত্মীয়স্বজন যে স্তরের তাতে ভারতবর্ষের একশ্রেণীর সুবিধের চাবি হাতে নিয়ে জন্মানো ছেলেমেয়ের মত সেইরকম জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারত। ইংলিশ মিডিয়ামে ওর রেজাল্ট চোখে পড়ার মতই ছিল। ও তার নম্বরটা চেঁচিয়ে বলেছে কিন্তু নিজেরটা বলতে লোকগুলো হোঁচট খেত। অথচ সুদীপ জে ই-তে বসল না। কিন্তু তার ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে নেই জানার পর গ্রামের যে পেরেছে সে জ্ঞান দিয়েছে।

বাস থেকে নেমে জয়িতা বলল, 'জেনারেটর চলছে রাজার মতন।'

আনন্দ বলল, 'রাজার মতনই আছে ওরা।'

সুদীপ উদাস গলায় বলল, 'আজ রাতে রাজা যাবে বনবাসে। চক্ষুলজ্জা বলেও একটা কথা আছে, সমস্ত গ্রামে টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছে আর ওখানে আলোর ফোয়ারা ছুটছে! আর এসব মানুষ মেনে নেয় চুপচাপ!'

কল্যাণ বলল, 'এটা কোন অভিযোগ নয়। আমার সামর্থ্য থাকা অপরাধ? সেটা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা রাখার জন্যে তোর রাগ করার যুক্তি নেই।'

ওরা ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে কয়েক পা এগিয়ে আসার পর পুরো এলাকাটা দেখতে পেল। ঠিক রাস্তার কয়েক পা নিচে মাধবীলতার গাছে সাজানো গেট। দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল তার দু'পাশ থেকে চলে গেছে বাড়িটাকে ঘিরতে। লোহার গেটটি বন্ধ। কিন্তু ভেতরের আলোয় বোঝা যাচ্ছে সাদা নুড়ি

বিছানো পথ চলে গেছে ভেতরে। গেটের দু'পাশে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে য়ুনিফর্ম পরে। ওরা জানে লোকদুটো নেপালি এবং খুব অনুগত। গেটের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ালে একজন গেট খুলে দেয়, অন্যজন প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিক নির্দেশ করে। এদের বিশদ বিবরণ চারজনেই জানে। ওরা দেখল গেটের ওপর ইংরেজিতে লেখা আছে জায়গাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অতএব প্রবেশ এবং প্রস্থান অনুমতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। যাঁরা রাত্রে থাকবেন না তাঁদের বলা হয়েছে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে উদ্যান ছেড়ে যেতে হবে নইলে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া কর্তৃপক্ষের সম্ভব নয়। চারপাশের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিশাল এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটাকে স্বপ্নের জাহাজের মত মনে হচ্ছে। জয়িতা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় পেছনে হেডলাইটের তীব্র আলো এবং গাড়ির গতি হ্রাস হওয়ার শব্দ কানে এল। ওরা দ্রুত সরে এল একপাশে যাতে রাস্তার ধারের বড় গাছটার আড়াল পাওয়া যায়। গাড়িতে আরোহী দুজন। চালাচ্ছেন পঞ্চাশের কাছাকাছি খুব স্মার্ট হতে চাওয়া মানুষ। ওপাশে চটকদার এক ম্যানিকিন যিনি ন্যাকা গলায় বলে উঠলেন, 'এই তো, প্যারাডাইস, ওঃ নটি ডিয়ার!'

'বাইরে থেকেই এত এক্সাইটেড হবেন না মিসেস মিত্র, তাহলে ভেতরে গিয়ে নার্ভ ঠিক থাকবে না। দেয়ার আর মোর সারপ্রাইজ—।' পুরুষটি হাত বাড়িয়ে টান টান চুলে আঙুলের ডগা ছোঁওয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কপট অভিমানে ছিটকে সরে গেলেন ম্যানিকিন, 'তুমি এখনও মিসেস মিত্র আপনি বলে যাচ্ছ। ডোন্ট টাচ মি।'

'ইউ আর রিয়েল সুইটি।' গাড়িটা ধীরে ধীরে প্যারাডাইস সাইনবোর্ড ঝোলানো লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যেতে একজন প্রহরী কিছু জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক উত্তর দেওয়ামাত্র সসম্ভ্রমে গেট খুলে দেওয়া হল। গাড়িটা যেন আলোর সাগরে ডুবসাঁতার দিয়ে মিলিয়ে গেল। গেট বন্ধ হল।

আনন্দ বলল, 'গাড়িতে এলে বেশি প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয় না। অবশ্য হেঁটে খুব কম পার্টি আসে।'

জয়িতা বলল, 'আমরা গাড়িটা কখন পাচ্ছি?'

সুদীপ জানাল, 'এখনও ঘণ্টা আড়াই বাকি আছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। লোকজন যাওয়া আসা করছে। চল, এগোই।'

আনন্দও আর দাঁড়াতে চাইছিল না। একটু বাদে বড় রাস্তা ছেড়ে ওরা কাঁচা পথে নেমে এল। আনন্দর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একটু বেশি হাঁটতে হবে কিন্তু কারও সামনে পড়ার সম্ভাবনা কম। সুদীপ বলল, 'পা চালা, জব্বর খিদে পেয়ে গেছে।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'আমারও।'

জয়িতা হাসল, 'কি করে তোরা এইসময় খাবার কথা ভাবতে পারিস কে জানে!'

সুদীপ চেঁচাল, 'ঈশ্বর তোমাদের শরীরে এক্সট্রা একটা যন্ত্র দিয়েছেন যা দিয়ে সবরকম প্রাকৃতিক ব্যাপার তোমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা থামিয়ে রাখতে পার, বাট উই আর হেল্পলেস!'

'আহা বেচারা! কিন্তু তোর মুখে তুমি খুব অশ্লীল শোনাচ্ছে।' জয়িতা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল।

পালটা সুদীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় স্থির হ্যারিকেনের আলো দেখা গেল। আনন্দ চাপা গলায় বলল, 'আস্তে!'

বিশাল একটা বট কিংবা অশ্বত্থ গাছের গায়ে লম্বাটে মুদির দোকান। সেখানে হ্যারিকেন ঝুলছে। দোকানের সামনে মাটিতে পোঁতা বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন গল্প করছে। আনন্দরা এমনভাবে হাঁটছিল যাতে জয়িতা আড়ালে থাকে। অবশ্য অন্ধকারে কেউ তাদের স্পষ্ট বুঝতে পারবে না। কিন্তু মুখোমুখি প্রশ্নটাকে এড়াতে পারল না আনন্দ, 'কে যায়?'

'আমি আনন্দ।'

'আনন্দ? সেন-বাড়ির ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে কারা?'

'আমার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছে। ভাল আছেন মেসোমশাই?'

'হ্যাঁ, ওই আর কি!'

জায়গাটা পেরিয়ে এসেই সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এত কৈফিয়ৎ দিলি কেন?'

আনন্দ হাসল, 'প্রত্যেক জায়গার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। সেই জায়গার মানুষের ব্যবহারও সেই চরিত্রের মধ্যেই পড়ে। আমি সেটা অস্বীকার করলে সাহায্য পাব না কিন্তু সেটাকে মানিয়ে নিলে অসুবিধে হবে না, বুঝলি?'

সুদীপের যে কথাটা ভাল লাগল না এটা বুঝতে পারল আনন্দ। যারা এইরকম গ্রামে আবাল্য থাকেনি তারা বুঝে উঠবে না। তাছাড়া সুদীপ সব ব্যাপারে চাঁচাছোলা কথা বলতে ভালবাসে। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। ট্রামে যাচ্ছিল আনন্দ সুদীপের সঙ্গে। এক ভদ্রলোক কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর মুণ্ডুপাত করছিলেন। কংগ্রেস এইরকম সি পি এম সেইরকম। হঠাৎ সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কোন্ দলের?'

'মানে?'

'কংগ্রেস না সি পি এম?'

'কোন দলের নয়। আমি কোন রাজনীতিফিতি করি না।'

'ভোট দিয়েছেন গতবার?'

'হ্যাঁ, দেব না কেন? আমার ডেমোক্রেটিক রাইট!'

'আপনিই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস লোক। দেশের শত্রু।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা হেসে উঠেছিল সজোরে। এই সুদীপের কাছে গ্রাম্য কৌতূহল তো খারাপ লাগবেই।

ক্রমশ একটা অন্ধকার দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দুটো ঘরে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে কিছুটা বাগান। আনন্দ বলল, 'এই আমার বাড়ি।'

॥ ৭ ॥

ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। পরিষ্কার কাঁচের কারণে আলো বেশ উজ্জ্বল। ওরা তিনজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। জয়িতা একটা বেতের চেয়ারে বসে হ্যারিকেনের আলোয় রঙিন পত্রিকায় চোখ রেখেছিল। সুদীপ আনন্দর বিছানায় চিৎ হয়ে পড়েছে। কল্যাণ আর একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে। এই ঘরে বিত্তের চিহ্ন নেই, কিন্তু বাঙালী মানসিকতার ছাপ রয়েছে। এখন আনন্দ বাইরে।

ওরা পেছনের দরজা দিয়ে এখানে ঢুকেছে। সমস্ত তল্লাটটা অন্ধকারে ডুবে থাকায় ঢোকার সময় কেউ তাদের লক্ষ্য করেনি। এই ঘরে তাদের বসতে বলে আনন্দ বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। কোথাও কোন শব্দ নেই। জয়িতা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর শরীর ঠিক আছে?'

সুদীপ সেই অবস্থায় বলল, 'ফার্স্টক্লাস।'

জয়িতা আবার চোখ নামাল। কিন্তু সে পত্রিকা পড়তে পারছিল না। এই ঘরে আসার পর থেকেই বুকের ভেতর ছটফটানি শুরু হয়েছে। এরকম উত্তেজনা কখনও সে বোধ করেনি। এই ঘরটা যেন মেক-আপ রুম। স্টেজে নামবার আগে জিরিয়ে নেবার পালা। এতক্ষণ কলকাতা থেকে আসবার আগে অথবা বাসে বসেও এরকম অস্বস্তি একবারও হয়নি। চোখ বন্ধ করল জয়িতা। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুকের ভেতরে একটা চিনচিনে অনুভূতি শুরু হয়েছিল। কতকালের চেনা দেওয়াল, আসবাব এমনকি টুকিটাকি জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা কষ্টবোধ শুরু হচ্ছিল। ঠিক সেইসময় দরজায় শব্দ হয়েছিল। সেই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু শব্দটাকে থামাবার জন্যেই দরজা খুলতে হয়েছিল। বহুদিনের অভ্যেসে রাত্রে শোওয়ার সময় হাউসকোট থাকে ওর, দরজা খুলতেই রামানন্দকে দেখতে পেয়ে বুকের কাছটা হাত দিয়ে টেনে ধরল সে। এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সে কিছুতেই করতে পারে না। ওই মুহূর্তে সে একটুও দৃষ্টিকটু পোশাকে ছিল না কিন্তু হাউসকোট পরনে থাকার জন্যেই কি তার হাত বুকের ওপরে উঠে গিয়েছিল? শার্ট প্যান্ট পরে সারাদিনে কত মানুষের মুখোমুখি হয় সে, কিন্তু কখনই তো ওরকম আচরণ করে না। মেয়েলিপনা অভ্যেস নেই, মেয়েরা যা করে থাকে তা ওর ধাতে আসে না কিন্তু একথাও ঠিক কিছু মেয়েলি স্বভাব অগোচরেই রক্তে থেকে গেছে। অচেতন

মুহূর্তে সেটা প্রকাশ পায় এবং এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। রামানন্দকে দেখে সে সত্যি অবাক হয়েছিল। নিশ্চয়ই তার চোখে মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল নইলে রামানন্দ কেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গি করে বলবেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল। ঠিক আছে, তুই ফ্রেস হয়ে নে, আমি না হয় পরে আসব।' রামানন্দ বিব্রতভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াতেই জয়িতা বলেছিল, 'তুমি বসতে পার, আমার দু'মিনিট লাগবে।' রামানন্দ চকিতে একবার ভেতরের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর চট করে ঘরে চলে এলেন। জয়িতা আর অপেক্ষা করেনি। বাথরুমে নিজেকে ভদ্রস্থ করতে করতে সে ভেবে পাচ্ছিল না কি কারণে রামানন্দ অমন আচরণ করছেন! বোঝাই যাচ্ছে ওঁর এই আসাটা সীতার দৃষ্টি এড়িয়ে। কেমন একটা চোর-চোর ভাব আছে। হাউসকোটটা পালটাতে গিয়ে মত পরিবর্তন করল জয়িতা। সে এমন কিছু অশোভন পোশাকে নেই যে প্যান্ট পরতে হবে! অস্বস্তিটাকে উড়িয়ে দিতেই সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে দেখল একমাত্র চেয়ারে রামানন্দ বসে আছেন। খাটে পা মুড়ে বসল জয়িতা, বসে বলল, 'বল।'

রামানন্দ মাথা নামালেন। কথাটা কিভাবে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। লক্ষ্য করল জয়িতা। কিন্তু সে কিছুই বলতে চাইল না। মিনিটখানেকের মত সময় ব্যয় করে রামানন্দ চোখ না তুলে বললেন, 'ইটস নট মাই ফল্ট, নট অ্যাট অল!'

'কি ব্যাপারে বলছ?'

'ঐন্দ্রিলা ব্যাপারটায় রঙ চাপিয়েছে। এটা ওর অভ্যেস। অন্তত আরও পাঁচটা ফ্যামিলিতে ও এই কাণ্ড করেছে।'

'হঠাৎ এতদিন পরে এইসব কথা বলতে এলে কেন?'

'না, মানে, আমি ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না। তুই, তুই—।'

'ইটস অলরাইট। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন আমার নেই।'

রামানন্দ এবার চোখ তুলে তাকালেন, 'ঠিক আছে, তোকে অন্য একটা কথা বলতে চাই। অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। তুই এখন বড় হয়েছিস, তোর কথাটা জানা দরকার। তোর মা যে জীবনযাপন করছে এটা আর আমার পছন্দ নয়। কিন্তু সে আমার নিষেধ মানতে চাইছে না। এই অবস্থায়—!'

জয়িতা দেখল রামানন্দ পরের কথাটা কিভাবে বলবেন সেটা ভেবে নিচ্ছেন। সে প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'তুমি যা করে যাচ্ছ তা মা পছন্দ করছে?'

'হ্যাঁ, সে চাইছে। কারণ আমি এইরকম জীবনযাত্রায় থাকলে তার সুবিধে হয়। ও আজ দুপুরের ফ্লাইটে সান্যালের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক করে কাল আমাকে জানিয়েছে। এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'সমস্যাটা তোমার এবং মায়ের। আমাকে বলতে এসেছ কেন?'

রামানন্দ জয়িতার দিকে তাকালেন, 'জয়ী, তুই আমার মেয়ে, আমি যদি বিবাহবিচ্ছেদ চাই তাতে তোর আপত্তি আছে?'

'নোঃ, নট অ্যাট অল! এটা তোমাদের ব্যাপার। তবে যদি আমার থাকা নিয়ে কোন অসুবিধে হয় তাহলে জানিয়ে দিও। ওহো, আমাকে হয়তো কয়েকদিন কিংবা অনেকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হতে পারে। সেটা হলে তোমরা কোনরকম দুশ্চিন্তা করো না। অবশ্য তার জন্যেও তোমাদের সময় হবে না হয়তো।'

'কোথায় যাবি?' প্রায় চমকে উঠেছিলেন রামানন্দ।

'এখন কোথায় যাব আমি তোমাকে এই মুহূর্তে জানাতে চাই না।'

'তোরা কি আরম্ভ করেছিস? জয়ী, আমি তোকে অন্যরকম মেয়ে বলে জানতাম।'

'তাই? না, আমি কোন সান্যালের সঙ্গে জয়ট্রিপে যাচ্ছি না!'

রামানন্দ এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। প্রাণপণে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছিলেন বুঝতে পারছিল জয়িতা। ওর বেশ মজা লাগছিল। এই মুহূর্তে অত্যন্ত দায়িত্ববান পিতার মত মনে হচ্ছে তাঁকে। অদ্ভুত গলায় রামানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কত টাকা সঙ্গে নিতে চাও?'

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালো জয়িতা। যেন প্রস্তাবটা সে ধরতে পারছে না।

রামানন্দ এবার সরল করার চেষ্টা করলেন, তাঁর মুখ এখনও লাল, 'বাইরে যাচ্ছ, তোমার কি টাকার দরকার আছে?'

জয়িতা ঘাড় নেড়ে না বলল। রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। সেই মুহূর্তে ওই ঘরে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল জয়িতার। একটু বড় হবার পর থেকেই একা একা থাকতে থাকতে সেটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে কারও সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা না বলার প্রবণতা এসে গিয়েছিল। চুপচাপ বই পড়া গান শোনা বা ঘুমোনোর মধ্যে বেশ স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু রামানন্দ বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই শব্দহীন ঘরে বসে কিরকম একটা কাঁপুনি এল শরীরে। ও চটপট বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। এবং সেই সময় সীতার গলা কানে আসতেই কাঁপুনিটা থেমে গেল। টেলিফোনে সীতা কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দগুলো কানে যাওয়ামাত্র সহজ হয়ে গিয়েছিল জয়িতা। স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে গিয়েছিল সে।

পত্রিকাটা বন্ধ করে চোখ তুলল জয়িতা। সুদীপ কি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল? উলটোদিকে বসা কল্যাণ বলল, 'আনন্দ কোথায় গেল? দেখব?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'না। বেশি ঘোরাঘুরির দরকার নেই, কখন দেখে ফেলবে, তারপর—! আসবে নিশ্চয়ই কাজ সেরে।' তারপর নিচু গলায় প্রশ্ন করল, 'তোর এখন কি মনে হচ্ছে?'

'ঠিক হ্যায়। তাছাড়া যাচ্ছিস তো তোরা, মনে হবে তোদেরই।'

'তোরাও তো একসময় যাবি।'

'সময়টা আসুক। এখন আমার খিদে পেয়েছে খুব।'

'তুই একটা পেটুক আছিস!' হাসল জয়িতা।

'দুপুরে কি খেয়েছিস?'

'লাঞ্চ।' জয়িতা খানিকটা বিস্মিত কল্যাণের প্রশ্ন করার ধরনে।

'বাড়িতে ফাটাফাটি হয়ে গেছে আজ। উনুন ধরেনি। ভাত আর তরকারিকে যদি লাঞ্চ বলা যায় তো সেটা আমার ভাগ্যে জোটেনি।'

'আই অ্যাম সরি!'

'দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমাদের এইসব নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।'

'কেন ঝগড়া হল?'

'হল—না হয়ে কোন পথ ছিল না তাই। আসলে অভাব থেকেই তো অক্ষমতা, ঈর্ষা আসে। আর সেটাকে ঢাকতে বেশির ভাগ মানুষই গলা চড়িয়ে মেজাজ দেখানো ছাড়া কোন পথ পায় না।' কল্যাণ চোখ বন্ধ করল।

এইসময় বারান্দায় শব্দ হল এবং তারপরেই আনন্দ দরজায়, 'একটু দেরি হয়ে গেল। মা ছিল না বাড়িতে। খবর দিয়ে এলাম, এখনই আসছে।'

কল্যাণ বলল, 'তিনি আসুন, কিন্তু খাবারদাবার কিছু হবে?'

আনন্দ বলল, 'তৈরি হচ্ছে। আমি যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলাম। সুদীপ কি ঘুমোচ্ছিস, কি করে পারিস!'

সুদীপ কোন সাড়া দিল না। তার শরীরটা তখনও টানটান পড়ে আছে। আনন্দ এবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'কি শাড়ি এনেছিস?'

'দক্ষিণী।'

'মানে?' আনন্দর মুখে বিস্ময়।

'তুই বুঝতে পারবি না। ভালই কাজ চলবে।'

'চটপট পরে নে। ওপাশে একটা ঘর আছে, চলে যা।'

'এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ। যে মেয়েটা খাবার দেবে সে যেন তোর প্যান্ট শার্ট না দেখে। গ্রামের কেউ যদি লক্ষ্য করেও থাকে তাহলে তোকে মেয়ে বলে চেনেনি। সবাই ভাববে তিনটে ছেলে আমার সঙ্গে এসেছিল। একে

জিজ্ঞাসা করলে এ বলবে দুটো ছেলে একটা মেয়ে। দুটো মিলবে না। যা।'

ব্যাগটা নিয়ে উঠল জয়িতা। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। এই ঘরেও একটা হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে রাখা ছিল। দরজা বন্ধ করে সে ব্যাগটা খুলল। তারপর সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কটা বের করল। রঙটা সত্যি ভাল কিন্তু এইরকম জমকালো শাড়ি পরার ইচ্ছেই হয় না তার। শার্ট প্যান্ট খুলল সে। তারপর ধীরে ধীরে শাড়ি-ব্লাউজের খোলস চাপাতে লাগল। তার ছোট চুল এই শাড়ির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। সুদীপের পরামর্শে নকল চুল এনেছিল সে। এখন আধা-আলোয় নিজেকে আয়নায় দেখে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছিল তার। এইভাবে কোনদিন প্রসাধন করেনি জয়িতা। আজ অনভ্যস্ত হাতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সাবধানী আঙুলে নকল চুলকে প্রায় আসলের চেহারায় আনল সে। নিজের দিকে তাকিয়ে হাসি পাচ্ছিল তার। কিছুতেই নিজেকে লবঙ্গলতিকা বলে মনে হচ্ছে না। কি আর করা যাবে, সবার তো সব হয় না। প্যান্টশার্ট ব্যাগের ওপরেই রাখল সে, প্রয়োজনে যেন হাতড়াতে না হয়। দরজা খুলে পাশের ঘরে যেতেই সুদীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু, তুই আমার পাশে আসবি না?'

কথাটা সবাই শুনল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। আনন্দ আর কল্যাণ জয়িতার দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে ছিল। আনন্দ এক পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'দেখলে মনে হবে তো বড়লোকের মেয়ে ফুর্তি করতে এসেছিস্ বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে!'

জয়িতা বলল, 'সেটা তোরা বল্, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

কল্যাণ হাসল, 'ভাগ্! তোদের সোসাইটিতে দেখিস নি?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কেউ সন্দেহ করবে না। তোকে চমৎকার মানিয়েছে।'

সুদীপ চুপচাপ শুনছিল মুখে হাসি রেখে। বলল, 'উঃ, এখান থেকেই গন্ধ পাচ্ছি!'

জয়িতা চোখ ছোট করল, 'তখন থেকে কি বকছিস?'

'পারফিউম আনিসনি সঙ্গে?' নাক টানল সুদীপ।

'না।'

'এই জন্যেই তুই মেয়ে হলি না। যে মেয়ে প্যারাডাইসে যাবে তার ব্যাগে দুটো পি থাকবেই।'

'দুটো পি মানে।' কল্যাণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'একাডেমিক ডিসকাশন হিসেবে নেবে সবাই। পারফিউম অ্যান্ড প্রোটেকশন।'

'ভাগ্।' প্রায় চিৎকার করে উঠল জয়িতা।

'যে পুজোয় যে ফুল ভাই। তোর ওই নকল চুলে বিটকেল গন্ধ ছাড়ছে নিশ্চয়ই, একটু গন্ধটন্ধ ঢাললে আমার ভাল হত।' সুদীপ আবার শুতে শুতে বলল, 'চলবে আনন্দ?'

এই সময় আনন্দ পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মা আসছে।' কথাটা শোনামাত্র সুদীপ আবার উঠে বসল। জয়িতার মুখ তখনও লাল, নিজেকে সামলে নিতেই সে পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। আনন্দ বলল, 'এসো মা, এরাই আমার বন্ধু।'

পঞ্চাশঘেরা এক মহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কল্যাণের মনে হল আনন্দর মা এখনও সুন্দরী। জয়িতা মুগ্ধ চোখে দেখছিল। এত আঘাত, একাকী একটি মহিলার বেঁচে থাকার লড়াই সত্ত্বেও সর্বাঙ্গে কেমন স্নিগ্ধ মা-মা ভাব ফুটে উঠেছে। আনন্দর মা বললেন, 'তোমরা অনেকক্ষণ এসেছ শুনলাম। কিছু মনে করো না, খুব দরকারেই আমাকে বেরোতে হয়েছিল।'

কল্যাণ বলল, 'না না, আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি।'

সুদীপ বলল, 'মাসীমা ঘরে এসে বসুন, আমি সুদীপ।'

'বাঃ, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব? তুমি কল্যাণ?'

'হ্যাঁ মাসীমা।'

'আর তুমি জয়িতা, তাই তো?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। মাসীমা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি তো খুব ভাল।'

জয়িতাকে প্রণাম করতে দেখে আনন্দ উঠল। সুদীপ বলল, 'ওহো, আমি তো গতবারও প্রণাম করেছি। জয়টা না এমন ডোবায়—।'

'না না, তোমাদের ডুবতে হবে না। বসো তো সবাই। তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

মাসীমা চলে গেলেন জয়িতাকে নিয়ে। কল্যাণ বলল, 'ভাগ্যিস ও শাড়িটা পরে নিয়েছিল, প্যান্ট পরা দেখলে হয়ে যেত চিত্তির!'

আনন্দ বলল, 'কিছুই হত না। মাকে কনজারভেটিভ ভাবার কোনও কারণ নেই।'

সুদীপ বলল, 'পুরো ব্যাপারটা তোর মাথায় আছে?'

'আছে।'

'তুই আর কল্যাণ খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা পরে বের হবি। তার ঠিক ঘণ্টাখানেক পরে আমি জয়িতাকে নিয়ে ডায়মন্ডহারবার রোডের সেই বটগাছটার নিচে থাকব। আবার বলছি গাড়িটা নেবার সময় কোন ঝুঁকি নিবি না। এমন পরিস্থিতি যেন না হয় যে নেওয়ামাত্র চারধারে গোলমাল শুরু হয়ে গেল!'

'হবে না।'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। আনন্দ জিজ্ঞসা করল, 'খাবার দিয়েছ?'

একটি প্রৌঢ়া মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল। আনন্দ বলল, 'চল্ খেয়ে নিই।'

ওরা বারান্দায় এল। উঠোনটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ওদিকটায় একটা ছোটখাটো বাগান আছে, গাছের গন্ধ বাতাসে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল 'মাসীমা ব্যাপারটা জানেন? মানে, এখন যে—।'

'না।'

'কোন প্রশ্ন করবেন না?'

'না। মা মনে করেন আমি কোন অন্যায় করতে পারি না।'

সুদীপ চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'স্নেহান্ধ!'

'না। যদি বুঝি কাজটা অন্যায় হয়ে গেল তাহলে এসে মাকে জানাই।'

কল্যাণ ঠোঁটে শব্দ তুলল, 'তোকে হিংসে হচ্ছে রে! কপাল করেছিলি!'

চারজনে মাটিতে আসন পেতে খাচ্ছিল। সুদীপ পা ছড়িয়ে বসেছিল। হাঁটু মুড়ে খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় তার অসুবিধে হচ্ছিল। জয়িতা দুই হাঁটু মুড়ে শাড়ি নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে কিছুক্ষণ বাদেই টের পেল তার দুটো পা টনটন করছে, ঝিঁঝি ধরে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এইভাবে খাওয়ার অভ্যেস তারও নেই। কিন্তু ওরা দুজন মুখে কিছু বলল না। এখন তো সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হবে, এইরকম একটা ভাবনা ভাবতে চেষ্টা করছিল ওরা। কল্যাণ খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে খেতে খেতে হঠাৎ জয়িতার আওড়ানো পেটুক শব্দটা মনে পড়ে যেতেই শ্লথ হয়ে গেল। আনন্দর কোনও উত্তাপ ছিল না। মাসীমা একটু তফাতে আসন পেতে বসেছিলেন, সুদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কিছুই খাচ্ছ না—তুমিও না জয়িতা।'

সুদীপ উত্তর দিল, 'ও ফিগার ঠিক রাখছে আর আমার খিদে পায়নি।'

জয়িতা প্রতিবাদ করল, 'ওর কথায় একদম বিশ্বাস করবেন না মাসীমা। বড্ড বাজে কথা বলে।'

আনন্দ বলল, 'ওরা কিন্তু আজকেই চলে যাবে মা।'

মাসীমা অবাক হলেন, 'সেকি! তাহলে আসাই বা কেন? এই অন্ধকারে এসে ফিরে গেলে তোমরা তো কিছুই দেখবে না। চলে যাওয়াটা কি খুব জরুরী?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ।'

মাসীমা এবার গলার স্বর নামালেন, 'তুইও যাচ্ছিস?'

'এখনই বলতে পারছি না, হয়তো ফিরে আসতে পারি।'

জয়িতা লক্ষ্য করল আনন্দর মা আর কথা বাড়ালেন না। ভদ্রমহিলাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। বন্ধুদের কাছ থেকে সরিয়ে নিজের ঘরে এনে উনি বলেছিলেন, 'বোকা মেয়ে, ওভাবে শাড়ি পড়তে হয়? তোমার সায়া দেখা যাচ্ছে, পেছনদিকটা উঠে আছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে সেটা আবিষ্কার করে লজ্জিত হয়েছিল সে। শাড়ি পরার ব্যাপারে যে সে একদম আনাড়ি এটা বুঝতে ওঁর মোটেই অসুবিধে হয়নি। নিজের হাতে শাড়ি পরিয়ে দিলেন উনি। আর সেই মুহূর্তে সীতার কথা মনে হচ্ছিল খুব। অবশ্য মনে হওয়াটাও বোকামি। তারপর টুকটাক কথা। কিন্তু কখনই

জয়িতার ব্যাপারে শোভনতার বেড়া ডিঙিয়ে নয়। এমন কি এই ছেলে তিন বন্ধুবান্ধবীকে নিয়ে সন্ধ্যের পর হাজির হল তাই নিয়েও বিস্ময় নেই। অথচ মহিলাকে বোকা কিংবা সরল ভাবার কোন কারণ নেই। উনি কথা বললেন সম্ভ্রম রেখে। আনন্দ বোধহয় মায়ের স্বভাবের খানিকটা পেয়েছে। তাদের বয়সী কেউ অমন গাম্ভীর্য রপ্ত করেনি, গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি। জয়িতা আনন্দর মায়ের মুখের দিকে তাকাল। এমন নির্লিপ্ত অথচ স্নিগ্ধ মুখ সে কোনদিন দ্যাখেনি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ছেলেরা ঘরে ফিরে গেলে জয়িতা বাথরুমে ঢুকল। হ্যারিকেনটা চৌবাচ্চার উপরে রেখে সে দেখল ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার কিন্তু বালতিতে জল তোলা আছে, কলের ব্যবস্থা নেই। কমোড নেই। কথাটা মনে হতেই সে হেসে ফেলল। অভ্যেস বড় বদ জিনিস। অজান্তেই মনে কামড় দেয়।

সিগারেট ধরিয়ে সুদীপ বলল, 'মাসীমাকে কিছু বললি না?'

'না, বললে অসুবিধে অস্বস্তিতে থাকবে। হয়তো মুখে কিছু বলবে না কিন্তু মন থেকে চাইবে কিনা সন্দেহ আছে। জিনিসগুলো আলাদা কর।'

'ওগুলো আলাদা করাই আছে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নে। এখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজে, তোরা সাড়ে নটায় স্পটটায় চলে আসবি, আগে এলেও ক্ষতি নেই।'

আনন্দ সময়টা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'অন্ধকারে পৌঁছাতে পারবি তো?'

'রাস্তাটা পরিষ্কার মনে আছে, তবে অন্ধকাবে একটু—, আর একবার বল।'

'তোরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে হাঁটতে শুরু করবি। মিনিট তিনেক যাওয়ার পর রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিক দিয়ে হাঁটলেই তোরা ডায়মন্ডহারবার রোডে গিয়ে পড়বি। তারপর বাঁ দিকে খানিকটা এগোলেই গ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। মিনিট দশেক হাঁটলে পেট্রল পাম্প দেখতে পাবি।' বিশদ বুঝিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি তোদের কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসব?'

সুদীপ মাথা নাড়ল। তারপর সেই সযত্নে নিয়ে আসা ব্যাগটা খুলে দুটো প্যাকেট বের করল। ভারী প্যাকেটটা সে আনন্দর দিকে এগিয়ে দিল। ওর মুখে সামান্য কাঁপন নেই। যেন অভ্যস্ত হাতে সে কাজ করছে। তারপর দুটো রিভলবার বের করে একটা এগিয়ে দিল আনন্দর সামনে, 'গুলি লোড করা আছে, ওকে আর একবার বুঝিয়ে দিস।'

সুদীপ যন্ত্রটাকে লুকিয়ে নিল শরীরে। তারপর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল্।'

কল্যাণ উঠল। ওকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে আনন্দ বলল, 'শোন কল্যাণ, তুই ইচ্ছে করলে এখনই কলকাতায় ফিরে যেতে পারিস।'

'না, মানে, তুই এই কথা বলছিস কেন?'

'তোর যদি মনে হয়—ইটস আপটু ইউ!'

'আনন্দ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু গ্রামের পথে কেউ যদি পরিচয় জানতে চায় তাহলেই মুশকিল। আসার সময় তো দেখলাম।' কল্যাণ স্বাভাবিক হতে চাইছিল।

'তোরা বলবি আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিস। তবে চেষ্টা করবি যাতে সেরকম কারও সামনে না পড়িস।'

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই জয়িতাকে দেখতে পেল। কল্যাণ বলল,'বেরুচ্ছি।'

জয়িতা হাসল, 'উইস ইউ গুড লাক।'

সুদীপ বলল, 'নায়িকা নায়িকা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকিস। আমার কপালে শেষ পর্যন্ত এই জিনিস জুটল। ওরা ঢুকতে দেবে কিনা সন্দেহ।'

জয়িতা তীব্র প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ বাধা দিল, 'আঃ সুদীপ, এই সময়টায় না হয় ঠাট্টাটা বন্ধ রাখ।'

সুদীপ হাসল, 'পেছনে না লাগলে যেটা খেলাম সেটা হজম হত না। মাসীমা কোথায়?'

আনন্দ বলল, 'বলে যেতে হবে না। গুড বাই।'

ওরা দুজনে চুপচাপ অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা ঠিকঠাক চিনতে পারবে তো? সুদীপ তো মাত্র একবার এসেছিল!'

'সুদীপকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। চিন্তা কল্যাণের জন্যে।'

'কেন?'

'টিপিক্যাল লোয়ার মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। বিপদে পড়লে কতটা শক্ত থাকবে বলা মুশকিল।'

'আমার কিন্তু কল্যাণের ওপর আস্থা আছে। ওর তো ভাল রেজাল্ট ছাড়া কোন সম্বল কিংবা পিছুটান নেই। কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়ার সুযোগও নেই। ও যেটা করে সেটা এক ধরনের অভ্যেস থেকেই করে, বাঙালীদের অভ্যেস।'

ওরা ঘরে ফিরে এল। গ্রাম এখন আরও নিস্তব্ধ। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে কি করতে হবে সেটা আবার বলে দেবার দরকার আছে?'

মাথা নাড়ল জয়িতা, তারপর বলল, 'এই বিদঘুটে চুলটা বড্ড ডিস্টার্ব করছে!'

'কিছু করার নেই। তোর অরিজিন্যাল চুল মনে রাখতে কারও অসুবিধে হবে না।'

'আজকাল অনেক শাড়িপরা মেয়ের চুলের কাট এইরকম, আমারটা অবশ্য একটু বেশি।'

'সেইটেই আমাদের বিপক্ষে যাবে। বরং এই চুলের বর্ণনা পেয়ে কেউ আন্দাজ ঠিক রাখতে পারবে না। তুই ঠিক আছিস, এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।' আনন্দ দ্বিতীয় রিভলবারটা জয়িতার হাতে দিল; 'গুলিভরা আছে। কি করে ওপেন করবি তা জানিস? খুব প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করিস না। ওটা শরীরে রাখিস না, অসুবিধে হবে। তোর ব্যাগের ঠিক ওপরেই রেখে দে। প্রয়োজন বুঝলে বের করিস। সুদীকেও বলে দিস তোরা যে যে জিনিস নিয়ে ভেতরে যাচ্ছিস সেগুলো যেন ওখানে পড়ে না থাকে।'

জয়িতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রিভলভারটা দেখছিল। এবার হেসে বলল, 'প্র্যাকটিসের সময় আমি ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস্ পেয়েছিলাম। এবার যেন নম্বরটা একটু বাড়ে।' ওটাকে ভালভাবে রেখে দিয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের এখানে পঞ্চায়েত তো সি পি এমের?'

'না। শুধু এই দুটো গ্রাম কংগ্রেসের। এর আগেরবার সি পি এমের ছিল।'

'দুটো পার্টি প্রটেস্ট করেনি?'

'করলে আমরা এখানে আসতাম না। পোস্টারগুলো কোথায়?'

'কল্যাণের ব্যাগে। এদিকে নতুন পার্টির কোন কাজকর্ম নেই?'

'আছে, না থাকার মতন। তুই আধঘণ্টা রেস্ট নে। আমি মায়ের কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

জয়িতা আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

কল্যাণ বড় বড় পা ফেলছিল। সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'আস্তে চল্।'

পথে মানুষ নেই তা নয়। অন্তত পাঁচজনকে ওরা পেয়েছে ইতিমধ্যে। কেউ কারও মুখ দেখতে পায়নি এই রক্ষে। শুধু কল্যাণ বারংবার বলেছে, এই, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছিস তো?' প্রথম দু'তিনবার উত্তর দিয়েছিল সুদীপ, তারপর চুপ করে গেছে। অন্ধকারে পথ চেনা সত্যি অসুবিধেজনক কিন্তু ওর মনে হচ্ছে কোন ভুল করেনি। শেষপর্যন্ত গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হল। মাঝে মাঝেই অন্ধকার চিরে এক একটা গাড়ি কলকাতার দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওরা চুপচাপ ডায়মন্ডহারবার রোডে উঠে এল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'পেট্রল পাম্পটা কতদূরে?'

'দূর আছে। তোর কি হয়েছে কল্যাণ?'

'কেন, কিছু না!' চমকে উঠল যেন কল্যাণ।

'চেপে যাচ্ছিস। নার্ভাস লাগছে?'

'একটু।' সময় নিয়ে উত্তর দিল কল্যাণ, 'আসলে আমি কোনদিন ডাকাতি করিনি তো!'

'আমি করেছি? আনন্দ করেছে। তাছাড়া আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছি না।'

'জানি। কিন্তু লোকে তো তাই বলবে।'

'তা হলে কি চাস বল্? মনে হয় স্টেশনে গেলে কলকাতার ট্রেন পেয়ে যাবি।'

'আমি স্টেশনে যাওয়ার জন্যে এখানে আসিনি। তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। আমি জানি কি করতে চলেছি, সে ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার, কিন্তু তবু যে ছাই কেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি কে জানে।'

তারপর নিজেই হেসে বলল, 'মিডলক্লাস সংস্কার! নে চল্, দাঁড়াস না। আর এসব কথা আনন্দকে বলিস না।'

সুদীপ কোন কথা বলল না। হেডলাইট বাঁচিয়ে কল্যাণকে নিয়ে সে এগোতে লাগল। এখন গাড়ির সংখ্যা কম আর যারা যাচ্ছে তাদের গাড়ির গতি জোরালো। রিকশা যাচ্ছে কখনও-সখনও। কিছু মানুষ ওপাশ থেকে বোধ হয় গ্রামে ফিরছিলেন বেশ হনহনিয়ে। সুদীপ একটু আশঙ্কা করছিল কিন্তু প্রশ্ন এল না কোন। শেষতক ওরা গ্রাম ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গে কিছু নেই সুদীপের কিন্তু কল্যাণকে ব্যাগটা বইতে হচ্ছে। নিজের কথা ভেবে একটু অবাক হচ্ছিল সুদীপ। তার মনে কোন কাঁপুনি নেই। যেন খুব স্বাভাবিক কাজ সে করতে চলেছে।

এই সময় পেট্রল পাম্পের আলোটা চোখে পড়ল। উঁচুতে হ্যাজাকটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কাছাকাছি গিয়ে ওরা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। মেইন রোড থেকে নুড়ির পথটা নেমে গেছে পাম্পের দিকে। পাম্পের ওপাশে দুটো ঘর। একটায় অফিস, অন্যটায় বোধ হয় স্টোরের কাজ চালানো হয়। কল্যাণ বলল, 'দুটো লোক দেখতে পাচ্ছি।'

একজনের তো গলাই পাওয়া যাচ্ছিল। চিৎকার করে হিন্দী গান গাইছে সে হ্যারিকেনের আলোয় বসে। দ্বিতীয়জন প্রৌঢ়। চুপচাপ বসে আছে। এই দুজনকেই এর আগেরবার দেখে গিয়েছিল সুদীপ আনন্দর সঙ্গে এসে। কিন্তু আজ কোন গাড়ি নেই পাম্পে। সেদিন দুটো গাড়ি গ্যারাজ করা ছিল। একটু বাদে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে কিছু বললেন। গান থামিয়ে সে চিৎকার করল, 'উরে বাপ, এই অন্ধকারে আমি যেতে পারব না!' কথাটা বলে সে ঘরের ভেতরে প্রৌঢ়র কাছে চলে গেল।

ওই ঘরে বিরাট কাঁচের জানলা রয়েছে। কিন্তু পথ একটাই। কল্যাণ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি কোথায়?'

সুদীপ কোন উত্তর না দিয়ে ঘড়ি দেখল। এখনও মিনিট পনেরো সময় আছে। যদি তার মধ্যে কোন গাড়ি না আসে তা হলে আনন্দরা অপেক্ষা করবে। সে চাপা গলায় কল্যাণকে বলল, 'মালটা বের করে হাতে রেখে দে, পরে হয়তো চান্স পাবি না। তাড়াহুড়ো করবি তখন।'

কল্যাণ অন্ধকারেও হাসল, 'দু'রকমের মাল আছে। কোন্‌টের প্রয়োজন হবে তা আগে থেকে বুঝব কি করে? চান্স তৈরি করে নেব।' এই সময় ডায়মন্ডহারবারের দিক থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে এসে পাম্পের হদিশ পেয়ে নেমে এল নিচে। প্রচণ্ড হর্ন বাজাচ্ছিল ড্রাইভার। কল্যাণ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল গাড়িটাকে দেখে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'যাবি?' সুদীপ মাথা নাড়ল, না। কারণ গাড়িতে ড্রাইভারকে নিয়ে অন্তত ছয়জন মানুষ বসে। প্রত্যেকেই যুবক, ক্যাসেটে গান বাজছে। ছোকরাটা বেরিয়ে এসে পনেরো লিটার তেল ভরে দিল। দাম মিটিয়ে চলে গেল ওরা কলকাতার দিকে। ছোকরা ফিরে গেল ঘরের ভেতর। বাইরেটা আবার অন্ধকার। এদিকে মশাও আছে বেশ। কানের কাছে তারা ইতিমধ্যেই পাখা বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। সুদীপ আবার ঘড়ি দেখল। তিন মিনিট বাকি আছে। প্ল্যানটা ওরই। কল্যাণ কিংবা আনন্দ এই ঝুঁকি নিতে চায়নি। কিন্তু ওর মনে হয়েছিল এইটেই সহজ পথ। আনন্দর কাছে জেনেছিল এ তল্লাটে সন্ধ্যের পর লোডশেডিং হয় না এমন রাত খুব কমই আসে। সেইটে কাজে লাগাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু যদি গাড়ি না আসে আজ পাম্পে তাহলেই চিত্তির। জয়িতা চেয়েছিল কোলকাতা থেকে কারও গাড়ি সরিয়ে এখানে চলে আসতে। তাহলে আর আনন্দর বাড়ি যাওয়া যেত না। সরাসরি স্পটেই ঢুকতে হত। আনন্দ সেই ঝুঁকিটা আবার নিতে চায়নি। এর মধ্যে অনেক গাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়েছে, কারও প্রয়োজন হয়নি তেলের। সুদীপ লক্ষ্য করল যত দেরি হচ্ছে তত কল্যাণ শান্ত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সময়টা পেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আনন্দ আর জয়িতা বটগাছের নিচে অপেক্ষা করছে এতক্ষণ। সুদীপ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল। ওকে ঘড়ি দেখতে দেখে কল্যাণ বলল, 'ওদের তো অপেক্ষা করতেই হবে। যদি গাড়ি না পাই তো আনন্দর বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তখন আবার আগামীকাল ভাবতে হবে।'

সুদীপ বলল, 'কাল যদি ইলেকট্রিক চলে আসে? যা করার আজই করতে হবে।'

'লোডশেডিং যে হবেই তা আজ আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। হয়ে গিয়ে সুবিধে হয়েছে। কাল না হলে অন্য কিছু ভাবতে হবে। কিপ ইওর আইজ ওপেন।' বলেই কল্যাণ হাসল। সুদীপ ঠাট্টাটা বুঝেও বুঝল

না। ওর মনে হল কল্যাণ এতক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় কোলকাতার দিক থেকে গাড়িটাকে আসতে দেখল সে। আলো দেখেই বোঝা গেছে ওটা অ্যাম্বাসাডার। গাড়িটা গতি কমাচ্ছে। সুদীপ কল্যাণকে নিয়ে গাছের এপাশে চলে এল। হেডলাইটটা বাঁক নিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল রাস্তা ছেড়ে। পাম্পের সামনে নয়, পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। ভেতর থেকে ছোকরাটা মুখ বাড়াল, 'মাল এনেছ? দাদুর গলা শুকিয়ে গেছে। চটপট চলে এস।' রোগামতন একটা লোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মদের বোতল হাতে নিয়ে। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে। হ্যাজাকের যেটুকু আলো নাম্বার প্লেটে পড়েছিল তাতেই সুদীপ চিনতে পারল। এই গাড়িটাকেই ওরা গতবারে দেখে গেছে।

॥ ৮ ॥

ব্যাগ থেকে গ্লাভস বের করে পরে নিল সুদীপ।

এখন হঠাৎই যেন সব শব্দ মরে গেছে আচমকা। ঘন অন্ধকারে শুধু পাম্পের কাচের ঘরের আলো টিমটিম করছে। দ্বিতীয় গ্লাভসটা কল্যাণকে দিয়ে সে আর একটু সময় অপেক্ষা করল। না, ভেতর থেকে কোন মানুষ চটপট বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। যে লোকটা গাড়ি চালিয়ে এল সে নেহাতই মাসমাইনের ড্রাইভার! মালিক থাকে ডায়মন্ডহারবারে। ভাল ব্যবসা তার। অতএব কোন নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ওরা সেদিনই দেখে গিয়েছিল গাড়ির কাচ ওদের সুবিধে দেবে। বাইরে থেকে ভেতরটা বোঝা যায় না। অবশ্য এই গাড়িটাকেই যে পাবে এমন নাও হতে পারত। কিন্তু সম্ভাবনাটা কাজে লেগে যাচ্ছে। সে কল্যাণকে বলল, 'আমি গিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসছি। তুই ঘুরে গিয়ে পাম্পের দরজায় শেকলটা তুলে দিয়ে ছুটে আসবি।'

কল্যাণের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল, 'যদি চাবিটা নিয়ে গিয়ে থাকে? মাঙ্কি ক্যাপ দুটো বের করব?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না, নিয়ে যায়নি। কারণ ও যখন নামল তখন ভঙ্গি দেখলে বুঝতে পারতাম। তাছাড়া বেঢপ জায়গায় রেখেছে গাড়িটা, নিশ্চয়ই পরে পার্ক করবে বলে ভেবেছে। যা হোক, যদি চাবি না থাকে তখন ক্যাপ বের করলে চলবে। দাঁড়া, একটা গাড়ি আসছে। ওটা চলে যাক।'

কল্যাণ ঘাড় নেড়ে ঘুরিয়ে দেখল আর একটা গাড়ি আসছে। ধীরে ধীরে গতি কমাচ্ছে সেটা। এবাব খুব অস্বস্তি শুরু হল কল্যাণের। আনন্দরা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে গাছটার তলায়। ওদের যদি কিছু হয় তাহলে—সে সুদীপের সঙ্গে সরে এল গাছটার আড়ালে। গাড়িটা ছুটে গেল না। গতি কমিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। দুবার বাজাতেই একটু আগে আসা গাড়ির ড্রাইভার দরজার এসে দাঁড়াল, 'কি খবর?'

নতুন গাড়ির ড্রাইভার সিটে বসেই উত্তর দিল, 'খুব মাল টানছ দোস্ত! আমাকে এখন শালা কলকাতায় ছুটতে হবে। শোন, সাহেব বলেছে কাল ঠিক ছ'টায় গাড়ি নিয়ে যেতে।'

'ছ'টায়? সাহেব কোথায় আছে?'

'প্যারাডাইসে। কলকাতা থেকে মেহমান এসেছে। জব্বর ফুর্তি। গাড়ি আজ ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ভোরবেলায় চলে যেও।' কথা শেষ করে লোকটা গাড়ি ঘুরিয়ে কলকাতার দিকে চলে গেল।

দরজায় দাঁড়ানো ড্রাইভারটা একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে পেছন ফিরল, 'দিল শালা ফুর্তিটা জবাই করে! উনি প্যারাডাইসে মজা মারবেন আর আমাকে এখানে রাত জাগতে হবে!' বিরক্ত লোকটা ফিরে গেল নিজের গ্লাসের কাছে। ওকে বা কাউকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আবার অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চরাচর। সুদীপ আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। তারপর কল্যাণকে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। নিঃশব্দে সে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। চাবিটা রয়েছে লটকানো। সে কল্যাণকে ইশারা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দরজাটা খুলল। তারপর নিচু হয়ে সিটে বসে

ওপাশের দরজাটা খুলে দিল।

কল্যাণের বুকের মধ্যে এখন হাতুড়ির শব্দ। দুটো পা প্রায় নিঃসাড়। সে চোখের কোণে সুদীপের দিকে তাকাল। গাড়ির আদল ছাড়া কিছুই নজরে এল না। আর দেরি করা উচিত হবে না এমন বোধ হওয়ামাত্র সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ছুটে এল দরজার কাছে। ভেতরের মানুষগুলো জমিয়ে মদ্যপান করছে। দরজার দিকে মুখ করে আছে একজন। সে বিস্মিত হওয়ার আগেই দুটো পাল্লা শব্দ করে বন্ধ করে শেকলে হাত দিল। উত্তেজনায় শেকলটা হাত থেকে গলে গেল প্রথমটায়, কাঁপুনি সত্ত্বেও দ্বিতীয়বারে সেটা হস্তগত করে হুকে আটকে দিতে পারল কল্যাণ। আর তখনই চিৎকার উঠল, 'আই, কে রে?' কল্যাণ ততক্ষণে গাড়ির কাছে চলে এসেছে।

ইঞ্জিন চালু করে সুদীপ চিৎকার করল, 'উঠে আয়।'

কোনরকমে সামনের আসনে বসে দরজা বন্ধ করতেই কল্যাণ টের পেল ওর শরীরে কোন সাড়া নেই। ওপাশের দরজায় যে ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে, ঘরের ভেতরের চিৎকার কাচের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে, সুদীপ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় চলে এসেছে—এসবই ঘটে গেল অথচ টের পেল না যেন সে। ঘাম জড়ানো শরীরে শীতল অনুভূতি। একটা ছাড়া গরুকে কাটাতে সুদীপ গালাগাল করতে কল্যাণ চেতনায় ফিরল। পকেট থেকে রুমাল বের করে সুদীপের দিকে আধা অন্ধকারে তাকিয়ে বেশ লজ্জিত হল। সে কি সত্যি এতটা নার্ভাস! কই, সুদীপকে দেখে তো মনেই হচ্ছে না কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। কল্যাণ মুখ ফিরিয়ে দেখল। পেট্রল পাম্প অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কোন মানুষের সাড়া নেই পিছনে। দু'পাশে কিছু চা-সিগারেটের দোকান এল। সেখানেও কোন সন্দেহ নেই। যখন সে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন লোকটার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। দরজা বন্ধ করা মাত্র চিৎকারটা উঠেছিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে, লোকটা কি তাকে স্পষ্ট দেখেছিল? পুলিস জিজ্ঞাসা করলে হুবহু বর্ণনা দিতে পারবে? নিজের মনেই প্রশ্নগুলো নিয়ে উত্তাল হচ্ছিল কল্যাণ। সে বুঝতে পারছিল ওই আলোয় চকিতে দেখা কোন মুখ কেউ মনে রাখতে পারে না। কিন্তু যদি লোকটার স্মৃতি অসাধারণ হয়? অস্বস্তির কাঁটাটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। এইসময় সে শিস শুনতে পেল। কোন চেনা গান নয়, অথচ বেশ খুশীর শিস দিচ্ছে সুদীপ গাড়ি চালাতে চালাতে। হেডলাইটের আলোয় সামনের পথ আলোকিত। পাম্প থেকে বেরিয়ে আসার পর ও একটাও কথা বলেনি। নিজেকে শক্ত করতে চাইছিল কল্যাণ। সুদীপ যদি নার্ভাস না হয় তবে সে কেন হবে? নড়েচড়ে বসল কল্যাণ। এইসময় সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'মালগুলো আলাদা করে রাখা আছে? আর একবার চেক করে নে!'

'সব ঠিক আছে।' যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করলে কল্যাণ। তারপর আবার পিছন দিকে তাকাল। অন্ধকারে কোন আলো চোখে পড়ছে না।

সুদীপ হাসল, 'ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা যখন ঘর থেকে ছাড়া পাবে তখন আমরা নাগালের বাইরে। মনে হচ্ছে প্রথম কাজটায় কোন বাধা পাব না। মর্নিং শোজ দ্য ডে।'

কল্যাণ কোন জবাব দিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সুদীপ বড্ড বেশি স্মার্ট, এইটেই যেন শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে এসে বাঁ দিকে চেপে গাড়িটা দাঁড় করাল সুদীপ। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে বনেটটা খুলল। এখন যে কোন গাড়ি এই পথে গেলে ভাববে নির্ঘাৎ ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। আর তখনই আনন্দর গলা শুনতে পেল সে, 'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' কল্যাণ জবাব দিল।

'তুই পেছনের সিটে চলে আয়।'

কল্যাণের দরজা খোলার শব্দ হল। কলকাতার দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে। সুদীপ আরও ঝুঁকে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর। না, কোনভাবেই মুখ দেখানো কাম্য নয়। আজকাল পথেঘাটে গাড়ি খারাপ হয়ে আছে দেখলে সাধারণ কোন ড্রাইভার দাঁড়াতে চায় না। ট্রাকটা বেরিয়ে যেতে স্বস্তি হল। বনেট নামিয়ে ড্রাইভারের সিটে ফিরে এল সুদীপ। পেছনের সিট থেকে আনন্দ বলল, 'তোদের ব্যাগে সব জিনিস আছে। আর দেরি করিস না, ভেতরে ঢোকার পর তোরা ঘণ্টা চারেক সময় পাবি। তোরা সিগ্যাল পেয়ার নস, এটা মনে রাখবি। তোর ঘড়িতে কটা বাজে সুদীপ?'

ইঞ্জিন চালু করে সুদীপ বলল, 'দশটা পাঁচ। লেটস গো।' তারপর সে জয়িতার দিকে তাকাল। যেটুকু আলো ছিটকে আসছে তাতে জয়িতার মুখ স্পষ্ট না দেখা গেলেও বেশ রহস্যময়ী মনে হচ্ছে তাকে। জয়িতা বসেছে তার বাঁ দিকে। সে ঠাট্টার গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, সেন্ট মাখিসনি? তুই একটা হোপলেস! সেন্ট ফেন্ট না মাখলে প্রেম প্রেম ভাব আসে?'

জয়িতা মাথা ঝাঁকাল, 'একটা সিগারেট দে তো।'

পেছন থেকে আনন্দ বলল, 'না, সিগারেট খাবি না। ওটা দারোয়ানগুলো মনে রাখবে। আর তোরা নিজেদের তুই-তুই করে অ্যাড্রেস করবি না। এসব কাজে যারা আসে তারা তুইতোকারি করে না।'

'তুইতোকারি প্রেমে অচল, বুঝলি জয়ী, আমার কপালে কি মাল জুটল বল্। সহানুভূতি জানা ভাই। তোকেও মেয়ে আই মিন প্রেমিকা ভাবতে হচ্ছে!' জিভে শব্দ তুলল সুদীপ গাড়ি চালাতে চালাতে।

মাথা ঝাঁকাল জয়িতা, 'সেম টু ইউ।'

আনন্দ বলল, 'অনেক হয়েছে, এবার রসিকতা বন্ধ কর। প্যারাডাইস দেখা যাচ্ছে।'

'ডোন্ট গেট এক্সাইটেড ম্যান। আমি ঠিক আছি। জয়িতা মাই হনি, তুমি ঠিক আছ?'

'একটা ঘুঁষি মারব সুদীপ, ন্যাকামি করিস না।'

সুদীপ গাড়ির গতি কমাল। সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু স্বপ্নের জাহাজের মত প্যারাডাইস আলোয় ভাসছে। ধীরে ধীরে ও বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি নিয়ে হর্ন বাজাল দুবার। একটু বাদেই সেই দারোয়ানদের একজন সামান্য ফাঁক করল গেটের কপাট, 'আট বাজে বন্ধ হো যাতা হ্যায় সাব।'

সুদীপ জানলায় মুখ এনে বলল, 'টেলিফোনসে বাত হুয়া থা হামারা।'

চাপা গলায় জয়িতা বলল, 'জিভ দিয়ে চটকায় আহা রে, কি হিন্দী!'

লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেতনা আদমি হ্যায়?'

'সিরিফ দো জন।'

'কাঁহাসে আ রহা হ্যায়?'

'কলকাত্তা।'

এবার লোকটা দরজা খুলল। সুদীপ গাড়িটা ঢোকাতেই লোকটা চাপা গলায় বলল, 'লৌটনেকা টাইমমে মুঝে ইয়াদ রাখিয়ে সাব।' সুদীপ হাসল। তারপর দেখল সাদা নুড়ি বিছানো পথ চলে গেছে ভেতরে। ডানদিকে বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। দরজায় আগল তুলে লোকটা বলল, 'সাব, ডাইনামে গাড়ি রাখিয়ে।'

আর একটু এগিয়ে সুদীপ গাড়িটা একটু মুখ বেঁকিয়ে পার্ক করল। যেন প্রয়োজনেই ইঞ্জিন চালু করে ছুটে যেতে পারে সদর গেটের দিকে। সে জয়িতাকে ইশারা করল। তারপর দুটো ব্যাগ দুজনে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সুদীপ যখন দরজায় চাবি দিচ্ছিল তখন জয়িতা চারপাশে তাকাল। এপাশে সুন্দর লন আর কিছু ফুলের গাছ। ঝকঝকে আলো চারপাশে। এবার আরও তিনজন য়ুনিফর্ম পরা দারোয়ানকে দেখতে পেল সে। অর্থাৎ মোট চারজন এই জায়গার পাহারায় আছে। হঠাৎ কোমরে হাতের স্পর্শ পেল জয়িতা। সে ছিটকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সুদীপ বলল, 'নো। কিছু মনে করিস না, ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে তো! এইসব জায়গায় যারা ফুর্তি করতে আসে তারা এইভাবেই হাঁটে।' সুদীপের কাঁধের কাছে প্রায় তার কাঁধ।

জয়িতা বলল, 'আলগা করে রাখ, আমার সুড়সুড়ি লাগছে।'

কয়েক পা হাঁটতেই একটা দারোয়ান তাদের দেখে দাঁত বার করে হাসল। ওরা কি ধান্দায় এসেছে সেটা বুঝে যেন সে গলিত হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে একটা দিক দেখিয়ে লোকটা উচ্চারণ করল, 'অফিস উধার।'

মগ্ন ভঙ্গিতে নুড়ির ওপর পা ফেলে খানিকটা এগোতেই সুদীপ একটা ছোট্ট বাড়ি দেখতে পেল। গাছগাছলার মধ্যে আলো জ্বেলে কাউন্টার সমেত অফিসঘর করা হয়েছে। কমপ্লিট স্যুট পরা একটা লোক ডটপেন হাতে নিয়ে কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়েছিল। কাউন্টারে ছোট্ট বোর্ডে লেখা 'রিসেপশন'। লোকটি ওদের দেখে উষ্ণ হাসি হাসল, 'গুড ইভনিং স্যার। ওয়েলকাম টু প্যারাডাইস। বাট আই অ্যাম

অ্যাফ্রেড ইউ আর লিটল বিট লেট।'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। আই মেড এ কল।' জয়িতার কোমর থেকে হাত সরিয়ে সুদীপ পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে ধরে ইঙ্গিত করল।

লোকটা মাথা নাড়ল, 'নো, থ্যাঙ্কস। হোয়াটস ইওর গুড নেম প্লিজ?'

'এম রয়।' সুদীপ সতর্ক ভঙ্গিতে গ্লাভসটার দিকে তাকাল। এটা থাক হাতে, অনেকেই তো পরে। লোকটা একটা প্যাড টেনে নিয়ে নজর বোলাচ্ছিল। জয়িতা তখন কতকগুলো নোটিশের দিকে তাকাচ্ছিল। এই করে যতটা সম্ভব লোকটার চোখ এড়ানো যায়! নোটিশ বোর্ডে নিয়মকানুন লেখা রয়েছে। দিবা-ভ্রমণের জন্যে ভ্রমণার্থীদের পঁচিশ টাকা দিতে হবে। তারা সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উদ্যানে থাকতে পারবেন, আধুনিক কুঁড়েঘর ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ। কাউকে বিরক্ত করা চলবে না, মদ্যপান অবৈধ। রেস্তোরাঁ থেকেই খাবার কিনতে হবে। উদ্যানে রাত্রিবাসের জন্যে এ সি এবং নন এ সি কটেজে সব রকম আধুনিক ব্যবস্থা আছে। প্রতি রাত্রির জন্যে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কটেজের ভাড়া আড়াইশো থেকে চারশো টাকা। একমাত্র এই শ্রেণীর অতিথিরাই সাঁতারের পুল ব্যবহার করতে পারবেন। সাধারণত উদ্যানে মদ খাওয়া অবৈধ হলেও কটেজের ঘরে বাইরের মানুষকে বিরক্ত না করে সেটা খাওয়ায় আপত্তি নেই। তবে যে কোন মুহূর্তেই উদ্যান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা থাকবে কাউকে বহিষ্কার করার।

জয়িতা আরও হুমকি দেওয়া উপদেশাবলী পড়ল। এই সময় সুদীপ খাতায় সই করছিল। এম রায় লেখবার সময় তার নিজেরই হাসি পেল। তিনশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে লোকটি বলল, 'আপনাদের রাত শুভ হোক।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা আমরা কি একটু বাগানটা ঘুরে দেখতে পারি? খুব গল্প শুনেছি এই বাগানের। কাল ভোরেই চলে যাব তাই আর সুযোগ হবে না হয়তো।' সুদীপ হাসল।

'দুঃখিত স্যার। রাত্রে আটটার পর কারও বাগানে থাকা নিষেধ।'

সুদীপ একটা কুড়ি টাকার নোট কাউন্টারে রাখল, 'দেখুন না চেষ্টা করে।'

চকিতে নোটটা সরিয়ে নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'আধ ঘণ্টার বেশি থাকবেন না। বস আসবেন এগারোটার পরে। তার মধ্যে কটেজে ফিরে যাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

লোকটা বেল বাজাতেই অন্ধকার ফুঁড়ে স্বাস্থ্যবান একটা বেয়ারার উদয় হল। রিসেপশনিস্ট তার দিকে একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কটেজ নাম্বার টুয়েলভ। সাহেবরা কিছুক্ষণ বাগানে থাকবেন, হাবিবকে বলে দিও।'

সুদীপ খুব সহজ ভঙ্গিতে জয়িতার পাশে এসে দাঁড়াল, 'হনি, লেটস গো।' বলে একহাতের বেড়ে জয়িতাকে টেনে কাছে এনে বেয়ারাকে অনুসরণ করল।

জয়িতা ফিস ফিস করে বলল, 'ইটস টু মাচ সুদীপ!'

সুদীপ সেই গলায় জানাল, 'এইটেই স্বাভাবিক পাঁচু।'

এই আলোকিত বাড়িটাই প্রবেশপথ। কারণ দু'দিকে চারটে ঘরের মাঝখানে প্যাসেজ, সেটা গিয়ে পড়েছে বাগানে। ওপাশে কোথাও জেনারেটার চলছে। তার আওয়াজ চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও সক্রিয়। সুদীপ এবং জয়িতা বাগানটার দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে ছোট লন, সাজানো ফুলের গাছের মধ্যে দিয়ে বাঁধানো পথ চলে গেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রাখা আলো অন্ধকারকে পাতলা করে জ্যোৎস্নার আভাস এনে দিয়েছে। এখন বাগানে কেউ নেই। বেয়ারাটা ফুলের গন্ধে ডুবিয়ে তাদের নিয়ে এল পেছনদিকে। পর পর কটেজগুলো রহস্যময় আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এইগুলো?'

'না স্যার। এসি কটেজ ওপাশে।'

নন-এসি কটেজের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় নারী-পুরুষের সম্মিলিত হাসির শব্দ কানে এল। স্টিরিওতে বাজনা বাজছে আর তার সঙ্গে নেশায় জড়ানো হুল্লোড়। সুদীপ বেয়ারাটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল, 'আজকে তোমাদের গেস্ট কি রকম?'

বেয়ারা মাথা নাড়ল, 'আর দুটো কটেজ খালি আছে। হেভি ডিম্যান্ড। নিশ্চিন্তে ফুর্তি করার ব্যবস্থা আর কোথায় পাবেন?'

'ঠিক। তুমি এখানে অনেকদিন আছ?'

'না স্যার। আগে সার্কুলার রোডের একটা হোটেলে কাজ করতাম।'

একটা রঙিন কটেজের সামনে এসে দরজায় চাবি ঢোকাল বেয়ারাটা। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে এ সি চালু করল। জয়িতা মুগ্ধ হয়ে গেল। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এমন আধুনিক ব্যবস্থা সম্ভব? বেয়ারা বলল, 'আপনারা যদি রাত্রে খাবার চান বলে দিন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না, আমরা খেয়ে এসেছি।'

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল, 'ড্রিঙ্কস? আমাদের নিয়ম হল ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করা চলবে কিন্তু সেটা এখান থেকেই নিতে হবে। কি আনব স্যার?'

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা সোফায় বসে পড়েছে। সে বেয়ারাটাকে নিচু গলায় বলল, 'মুশকিল হল মেমসাহেব ড্রিঙ্ক করেন না। একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে।'

বেয়ারা হাসল, 'নো প্রব্লেম স্যার। আমাদের ককটেল রুমে গিয়ে খেয়ে আসতে পারেন।'

'ককটেল রুম! সেটা কোথায়?'

'ঠিক এই কটেজগুলোর পেছনে। ওখানে যাওয়ার সময় চাবিটা নিয়ে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। সকালে যাওয়ার আগে তোমার দেখা পাব নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ স্যার। আমাদের তো চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। আপনারা কি এই রাত্রে বাগানে যাবেন?'

'হ্যাঁ, একটু দেখব।'

'ঠিক আছে, আমি হাবিবকে বলে দিচ্ছি স্যার। সঙ্গে চাবিটা রাখবেন। ওতে কটেজ নাম্বার আছে।'

'হাবিব কে?'

'হেড গার্ড। গুডনাইট স্যার।' দাঁত বের করে জয়িতার দিকে হাসি ছড়িয়ে লোকটা চলে গেল।

এখন চারধার নিঃশব্দ নয়। নারীপুরুষের হুল্লোড়-ধ্বনি ছিটকে ছিটকে আসছে। সুদীপ চটপটে গলায় বলল, 'জয়ী, উঠে পড়।'

জয়িতা উঠে দাঁড়াল, 'শাড়িতে আমাকে খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, না?'

'উঁহু! ডিলিসিয়াস!'

'ভদ্রভাবে কথা বল্ সুদীপ। আই উইল নট টলারেট দিস।'

'জাস্ট এ মিনিট, আমি লু থেকে আসছি।' সুদীপ পাশের দরজা খুলে টয়লেটে চলে গেল। জয়িতার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল। সুদীপটার কথাবার্তা একটু লাগামছাড়াই। মনে কোনও পাপ নেই। কিন্তু এভাবে কখনও একটা ঘরে রাত্রে ওর সঙ্গে থাকেনি। শাড়িটার জন্য অস্বাচ্ছন্দ-বোধ শুরু হল জয়িতার। ভীষণ রকম মেয়ে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। শরীরের গঠন অনুযায়ী সে মেয়ে নিশ্চয়ই কিন্তু মেয়েলিপনা তাকে কখনই কবজা করেনি। নিজের শরীর সম্পর্কেও সে সচেতন ছিল না। তিন বন্ধুর চোখে কোনদিন সেরকম ছায়া দ্যাখেনি সে। বরং ওরা স্বচ্ছন্দে কলেজের লবঙ্গলতিকাদের সম্পর্কে রসালো আলোচনা করেছে তার সামনে। ন্যাকা মেয়েগুলোর সমালোচনার সময়ে জয়িতাও গলা মিলিয়েছে ওদের সঙ্গে। নিজেকে আলাদা করে ভাবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু আনন্দর মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর পর থেকেই একটা অস্বস্তি এঁটোর মত লেগে আছে মনে। সুদীপ যখন গাড়িতে তুলে নিয়ে রসিকতা আরম্ভ করল তখন থেকেই সেটা বেড়ে যাচ্ছে। প্রেম ফ্রেম সে জীবনে করেনি। করার কথা মাথায় আসেনি। আনন্দ আজকের প্রোগাম জানানোর পর তার হাসি পেয়েছিল। আউট অফ অল পার্সেন সুদীপের সঙ্গে তাকে প্রেমের অভিনয় করতে হবে। মজাও লেগেছিল। কিন্তু এখানে আসার পর সুদীপ এমন ভাব করছে যে, সে যেন একটি রক্তমাংসের খাদ্যবস্তু।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে সুদীপ টেবিল থেকে চাবি নিল, 'ফাইভ স্টার হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দেবে, বুঝলি? বাথরুমে দি সোপ অফ বিউটিফুল ওমেন রয়েছে!'

'মানে?' জয়িতার চোয়াল শক্ত হল।

'ক্যামে হোয়াইট। ক্যানাডার তৈরি। ভাব ব্যাপারটা।—তোর কি হল?'

'কিছু না।'

'চল্, ওদের বস আসবার আগেই পাক দিয়ে আসি।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওকে। সেকি ভুল বুঝেছে? জয়িতা উঠল। দরজায় চাবি দিতে গিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাগগুলো এখানে রেখে যাওয়া কি সেফ হবে? ডুপ্লিকেট কী থাকতে পারে!'

জয়িতা বলল, 'ব্যাগ নিয়ে বাগানে ঘুরলে তো ওরা সন্দেহ করবে।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা চারপাশে তাকাল। সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ছে না। সুদীপ বলল, 'চল্, আমার হাত ধর।'

জয়িতা চোখের তলায় তাকাল, 'হাত ধরতে হবে কেন?'

'প্রেম প্রেম ভাব আনতে হবে না? সবাই আমাকে কেমন স্যার স্যার বলছে দেখেছিস। আমার বয়সটা যেন কোন ফ্যাক্টারই নয়। সেক্স নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারাও কেমন অন্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে।'

সুদীপ কথা শেষ করা মাত্রই ওপাশের কটেজের দরজা খুলে গেল। একটি মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল বারান্দায়, 'না আমাকে যেতে দিন, এরকম কথা ছিল না। আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।'

সেইসময় দরজায় একটি প্রৌঢ় এসে দাঁড়াল, 'ওসব বুজরুকি ছাড়। টাকা দিয়েছি যখন তখন যা বলব তাই করতে হবে। ভেতরে এসো বলছি, নইলে হাবিবকে ডাকব।'

'আপনার পায়ে পড়ি। তিনজন থাকবেন তা ওরা বলেনি আমাকে।'

'আমি তো একজনের টাকা দিচ্ছি না। এসো ঘরে, মিলি মিসি করি কাজ, নাকি হাবিবকে ডাকব?' মেয়েটি মাথা ঝাঁকাল। তারপর পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করল।

সুদীপের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ওর দৃষ্টি বন্ধ দরজার ওপর। জয়িতা নিচু গলায় বলল, 'বি ইজি। ছোট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস না। চলে আয়।'

সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে, 'ইচ্ছে করছে মুণ্ডুগুলো ছিঁড়ে ফেলি। টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কিনে নিয়েছে। আশেপাশের গ্রামের কোন গরিব মেয়ে হয়তো!'

সুদীপের হাত ধরে জয়িতা বাগানে চলে এল, 'সব কটেজে নিশ্চয়ই একই নাটক হচ্ছে, না?'

বাগানটা বেশ বড়। অন্তত এই মুহূর্তে ওরা শেষ দেখতে পাচ্ছে না। একদিকে যেমন সাজানো লন, যত্নে গড়া ফুলের বিছানা তেমনি অন্যদিকে ঘনজঙ্গলের আদল তৈরির চেষ্টা হয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ডে-হাট। চারটে খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনি, নিচে ত্রিপল পাতা, ইলেকট্রিক লাইন আছে। এখন এইগুলো ফাঁকা। বুনো গন্ধ বের হচ্ছে সব গাছেদের শরীর থেকে। সুদীপ জরিপ করে নিল। পুরো এলাকাটা তিনটে ভাগে বিভক্ত। রিসেপশন এবং গাড়ির পার্কিং সামনের দিকে। মাঝখানে বাগান, জঙ্গল, জেনারেটর রুম এবং নন-এসি কটেজ। তৃতীয় ভাগে এসি কটেজ, সাঁতারের পুল এবং ককটেল রুম, যার কথা বেয়ারাটা বলল। এসি কটেজ থেকে দৌড়ে রিসেপশনের কাছে পৌঁছাতে তার মিনিট দুয়েক লাগবে কিন্তু জয়িতার দেরি হবে। ও নিচু গলায় বলল, 'আমার কোমরে হাত রাখ। জেনারেটারটা দেখে আসি।' জয়িতা এবার আপত্তি করল না। ওরা যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমন ভঙ্গিতে বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে জঙ্গলের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা ইলেকট্রিক বালবের আলো তাদের গায়ে পড়ছিল বটে কিন্তু তারা কোন পাহারাদার দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সুদীপ খড়ের ছাউনির তলায় ত্রিপলের নিচে গিয়ে বলল, 'মিনিট দশেক এখানে শুয়ে থাক। কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা বোঝা যাবে। তুই বোস্, তোর কোলে মাথা রেখে শুচ্ছি।'

'কোন দরকার আছে? কাউকে কাছাকাছি দেখছি না।' জয়িতা মৃদু আপত্তি জানাল।

'হাতে সময় আছে যখন তখন একটু রিল্যাক্স করা যাক।'

জয়িতা হাঁটু মুড়ে বসল। সুদীপ পা ছড়িয়ে দিয়ে তার কোলে মাথা রেখে বলল, 'একটু গন্ধ-ফন্ধ মেখে এলে পারতিস।'

'তোর তাতে কি? তোকে যা করতে বলা হয়েছে তাই কর!'

'করছি তো। এইসময় প্রেমিকারা ঠিক কি কি করে বল্ তো? মানে তাদের কি কি বিজনেস থাকে?

হাতটাত নিশ্চয়ই ধরে। গানও গায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে। তুই একটা গান গা জয়ী। ঘুম ঘুম চাঁদ মার্কা গান।' সুদীপ চোখ বন্ধ করল।

'ট্র্যাস। কতক্ষণ শুয়ে থাকবি? তোর কোমরের ওপরের শক্ত মতন জিনিসটা একটু সরা তো, আমার পায়ে লাগছে।' জয়িতা কথাটা বলে নিজেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে আবার সরিয়ে নিল। রিভলভারটা সরাতে চাইলেও সরানো যাবে না এখন। সে চোখ বন্ধ করল। তারপর মনটাকে শান্ত করার জন্যেই গুনগুন করল, 'ওয়ান্না বি স্টার্টিং সামথিং।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'চমৎকার। বাংলা গান ট্র্যাস আর মাইকেল জ্যাকসন—'

'নট দ্যাট।' ওকে থামিয়ে দিল জয়িতা, 'ইট ডিপেন্ডস অন মুড।'

'আপনারা কে?'

ঠিক এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটি বিশাল শরীর সামনে এসে দাঁড়াল। সুদীপ কোন জবাব দিল না। জয়িতা বলল, 'আমরা এখানে রাত কাটাতে এসেছি।'

'ভাল করেছেন। কিন্তু এতরাত্রে বাগানে থাকা নিষেধ। উঠুন।'

'কেন? আমরা তো কারও ক্ষতি করছি না। জাস্ট বসে আছি এখানে।'

'বসা শোওয়া সব নিজের কটেজে গিয়ে করবেন।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

এবার সুদীপ উঠে বসল। তারপর পকেট থেকে চাবিটা বের করে এগিয়ে ধরল, 'আমাদের আধঘন্টার জন্যে বাগানে থাকার অনুমুতি দিয়েছেন রিসেপসনিস্ট।'

চাবিটা হাতে নিয়ে সেই আধ-অন্ধকারে উলটে-পালটে দেখল লোকটা। সুদীপ বলল, 'আমরা আধঘন্টার মধ্যেই চলে যাব হাবিববাবু।'

লোকটা হাঁ করে তাকাল। তারপর চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাবু হয়ে বসল সুদীপ, 'কি বলেছিলাম একটু আগে? দিস প্লেস ইজ ওয়েল-প্রটেক্টেড। কিন্তু আজ রাত্রে ঠিক কতগুলো পাহারাদার আছে তা বোঝা যাচ্ছে না।'

জয়িতা বলল, 'হাবিববাবু তো ছাড়পত্র দিয়েছেন। চল্ একটু ঘুরে দেখি।'

সুদীপ জয়িতার হাত ধরে উঠল। ওরা যেদিকে হাবিব চলে গিয়েছিল সেইদিকে পা বাড়াল। না, ধারে কাছে কেউ নেই। এবং তখনই কুকুরের ডাক এবং শিস শুনতে পেল ওরা। জয়িতা সুদীপের হাতে চাপ দিতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দূরের একটা প্যাসেজ দিয়ে কেউ হাঁটছে। তার হাতের চেনে চারটে কুকুর বাঁধা। ওরা লোকটাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে। সুদীপ বলল, 'যাক, নেহাতই অ্যালসেশিয়ান! তাহলে এখানে কুকুরও আছে। লেটস গো।' ওরা হাঁটতে হাঁটতে জেনারেটারের শব্দ ধরে এগিয়ে গেল কাছাকাছি। এখানে গাছের আড়াল বেশি। জেনারেটার রাখা হয়েছে একান্তে একটি ঘরে। তার দরজা খোলা, আলো জ্বলছে ভেতরে। দরজায় টুল পেতে একটি পাহারাদার বসে আছে চুপচাপ। ধারে কাছে আর কেউ নেই। সুদীপ লক্ষ্য করল ঘরটির পেছনে একটা জানলা আছে। জানলাটাও খোলা।

ওরা আবার লনে ফিরে এল। সুদীপ বোতাম টিপে ঘড়ির আলো জ্বেলে সময় দেখল। তারপর বলল, 'প্রচুর সময় আছে। চল্ ঘরে যাই।'

ফেরার পথে ওরা দুজন পাহারাদারের দেখা পেল। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মানুষ সুনির্বাচিত। ওদের দেখে চারটে কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল। সুদীপ জয়িতার কোমরে হাত রেখে নিবিড়ভাবে হেঁটে এল নন-এসি কটেজগুলোর সামনে দিয়ে। এবার সেখানেও একজনকে নজরে পড়ল। যাওয়ার সময় লোকটিকে দেখতে পায়নি। এখনও ঘরে ঘরে বাজনা বাজছে, হল্লোড় চলছে। নিজের কটেজে ঢুকে জয়িতা বিছানায় শরীর এলিয়ে বলল, 'এবার শাড়ি চেঞ্জ করি?'

'আর একটু বাদে।' সুদীপ সোফায় বসে সিগারেট ধরালো।

জয়িতা হাত বাড়াল, 'আমাকে একটা দে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'বাঙালি মেয়ের সিগারেট খেতে নেই।'

জয়িতা চেঁচাল, 'সুদীপ!'

সুদীপ প্যাকেটটা ছুঁড়ল, 'নিজেরে পায়ে দাঁড়াতে শেখ তো। অন্যের প্যাকেট দেখলেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে, না? শোন, হাবিবকে নিয়ে আমরা বাগানে পাঁচজনকে দেখতে পেলাম। দিজ গাইজ

'আর রিয়েল টাফ। কিন্তু এদের সঙ্গে আর্মস আছে কিনা সেটা বোঝা গেল না। আমাদের প্ল্যানটা মনে আছে তো?'

সিগারেট ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে জয়িতা বলল, 'আছে।'

'মনে হচ্ছে কোন অসুবিধা হবে না। তুই তো বেশ মেজাজে শুয়ে আছিস, আনন্দ আর কল্যাণের কথা ভাব? পেছনের সিটের নিচে কিভাবে বসে আছে ওরা!'

'এসবই খেলার অঙ্গ ব্রাদার।' নির্বিকার মুখে ধোঁওয়া ছাড়ল জয়িতা।'

'তোকে মাঝে মাঝে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়।'

'তাই?'

'ভগবান তোকে মেয়েলি কোন গুণ দেয়নি।'

'দিলে কি তোর সঙ্গে প্রেম করতাম?'

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই স্পিকারটা দেখতে পেল। তার নিচেই সুইচ। সে উঠে ওটা অন করতেই বাজনা শুরু হল। দারুণ গরম বাজনা। সুদীপ জিভে শব্দ করল, 'বাঃ, এই হল ব্যবস্থা! আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছে! ওয়ার্ম আপ করাই?'

'পারিস তুই! এখন নাচের কথা ভাবছিস?' জয়িতা উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করে আলাদা করল। দুজনের কাছে দুটো ভাগ থাকবে। সীতা রায় যখন টের পাবে তাদের কিছু হারিয়েছে তখন বেশ দেরি হয়ে যাবে। পাঁচভরি সোনার হার চুরি করার সময় অবশ্য একটা অপরাধবোধ কাজ করেছিল জয়িতার মনে। কিন্তু এখন সেটা মরে গেছে অজান্তেই।

নিজের জিনিসগুলো কাছে রেখে সে সুদীপকে বলল, 'এখন কি করবি?'

সুদীপ বলল, 'একবার ককটেল রুমে যাব। মনে হচ্ছে জায়গাটা ইন্টারেস্টিং হবে। ঠিক দেড়ঘণ্টা পরে আমরা কাজ শুরু করব। তুই ততক্ষণ রেস্ট নে। এখান থেকে বেরিয়ে একটু পরে জেনারেটাবের কাছে পৌঁছাবি। যদি লোকটাকে অ্যাভয়েড না করতে পারিস তাহলে জানলাটাকে ব্যবহাব করবি। তারপর দৌড়ে যাবি রিসেপশনের দিকে। অন্ধকার হয়ে গেলেই আমি যা করার কবব। গুড লাক। আমি এগোচ্ছি।'

জয়িতা ডাকল, 'সুদীপ?'

সুদীপ ঘুরে দাঁড়াল, 'কি?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'না, থাক।'

'কি বলবি বল্ না?'

'আমি তোর সঙ্গে যাব? একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

সুদীপ কিছু চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'ভয় পাচ্ছিস?'

'না, ভয় নয়। জাস্ট একা থাকতে চাইছি না। জানি না কি হবে আজকে, কিন্তু কিছুক্ষণ তো একসঙ্গে থাকি।' জয়িতা স্পষ্ট চোখে তাকাল।

'ও কে! চল্।'

ওরা দুজন প্রস্তুত হয়েই ঘর থেকে বের হল। এবার উলটোদিকে যাত্রা। সেখান থেকে উল্লাস ছিটকে আসছে বাতাসে। ওরা একটি আলোকিত দরজা দেখতে পেল। কাছাকাছি যেতেই একটি সুবেশ মানুষ এগিয়ে এসে হাত বাড়াল। সুদীপ তাকে কটেজের চাবিটা দেখাতেই লোকটি ঝুঁকে হেসে বলল, 'গুড ইভনিং স্যার। ইউ আর ওয়েলকাম ইন দিস প্যারাডাইস।'

ককটেল রুমের দরজা খুলে ঢুকল ওরা।

॥ ৯ ॥

চাপা গলায় কল্যাণ বলল, 'আর পারছি না, একটু উঠে বসব?'

আনন্দ নাক দিয়ে যে শব্দটা করল তার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে ওরা দুজনে গাড়ির পেছনের সিটের পা রাখার জায়গায় হাঁটুমুড়ে বসে আছে। সামান্য নড়াচড়াও করতে পারছে না। এখন খুব মৃদু আওয়াজও জোরে শোনাবে। বসে থাকতে থাকতে দুই পা অসাড় হয়ে গেছে। কোমরে ব্যথা হচ্ছে। কল্যাণ সুদীপের কথা ভাবল? বেশ আরামে শুয়ে আছে নিশ্চয়ই জয়িতার সঙ্গে! জয়িতার মুখটা মনে পড়তেই আবার তার অস্বস্তি হল। জয়িতা যে মেয়ে এমন ভাবার কখনও কারণ ঘটেনি। ওর শারীরিক গঠনের কথা মনেই আসত না কখনও। নিজের পরিচিত বৃত্তে এমন মেয়ে সে কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু আজ শাড়ি পরার পর থেকেই জয়িতা যেন আচমকা পালটে গেল। হাবভাবে একটু জড়তা এসে গেছে। যখন গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল সুদীপের পাশে তখন তো একদম অপিরিচিতা বলে মনে হচ্ছিল। সুদীপের সঙ্গে, সম্ভবত এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে জয়িতা এখন কি করতে পারে? কুঁজো হয়ে বসে কল্যাণ দৃশ্যটা কিছুতেই কল্পনায় আনতে পারছিল না।

এইভাবে বসে থাকতে আনন্দরও কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে ঢোকার তো অন্য কোন উপায় ছিল না। সঙ্গে নারী না থাকলে প্রধান ফটক ওরা পেরোতেই দেবে না। এছাড়া গাড়ি অবশ্যই চাই। সুদীপ যে এই গাড়িটা সহজেই আনতে পেরেছে এটা সুলক্ষণ। ওরা এমন ভাবে বসে আছে, গাড়ির পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলেও বুঝতে পারবে না কেউ আছে। তাছাড়া গাড়িটার কাঁচও ওদের সাহায্য করছে। বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না। ওরা যদি সোজা হয়ে বসত তাহলে সামান্যই ঝুঁকি থাকত। অবশ্য সামনের কাঁচ দিয়ে যদি কেউ তাকায় তাহলেই বিপদ। কিন্তু না, কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি আনন্দ। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল এইভাবে বেশিক্ষণ থাকাও যায় না। এর পরে যখন সময় আসবে তখন হয়তো অ্যাকশনে নামা দূরের কথা হাঁটাও সম্ভব হবে না। সুদীপ জয়িতা সামনের দরজায় চাবি দিয়ে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। এই সময়ে কোন সন্দেহজনক কিছু আশপাশে ঘটেনি। আনন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি উঠে বসছি, তুই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড় এখানে।'

ধীরে ধীরে সিটের ওপর উঠে বসতেই আনন্দ বুঝতে পারল আর দেরি করলে ভুল হয়ে যেত। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন সাড় নেই। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে কিছুটা সময় নিল। তারপর একটু সুস্থ বোধ করলে সে ধীরে ধীরে জানলাব নিচে চোখ রাখল। ভৌতিক ছবির মত দেখাচ্ছে সামনের রাস্তা, গাছপালা, এবং লনটাকে। ওপাশে মৃত মোষের মত পড়ে আছে গাড়ির সারি। আনন্দ সতর্ক চোখে দেখতে চেষ্টা করছিল। বাইরে আলো খুবই কম। কিন্তু তাতে দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল না। পাহারাদারদের খোঁজার চেষ্টা করল আনন্দ। কাউকেই চোখে পড়ছে না। সে নিজের শরীরটাকে গাড়ির দরজার গায়ে এমনভাবে লেপটে রেখেছিল যে একমাত্র বনেটের ওপর বসে মুখে টর্চ না ফেললে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই সময় পায়ের তলায় সমস্ত শরীর যতটা সম্ভব ছড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলে কল্যাণ বলল, 'আঃ কি আরাম!'

আনন্দ ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও অনেক দেরি আছে। তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। শুধু দুটো জিনিস আগে থেকে পরিষ্কার রাখা দরকার। সদর দরজার তালাটা খুলে রাখতে হবে আর পাহারাদারদের কোনরকমে নিষ্ক্রিয় করে কাজ হাসিল করতে হবে। সে যে তথ্য পেয়েছিল তাতে যদি ভুল না থাকে তাহলে অসুবিধা হবার কথা নয়। এখন শুধু সঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে থাকা। সুদীপটা ঠিক থাকলেই হল। জয়িতার ওপর গোড়া থেকেই ভাল আস্থা রাখে সে। শুধু এই কল্যাণটা ঠিক সময়ে নার্ভ না হারালেই হল।

আনন্দ একটা গাড়ির হর্ন শুনতে পেল। সঙ্গে দপাদপ আলো জ্বলে উঠল লনে, রাস্তায়। তিনচারজন লোক ছুটোছুটি শুরু করে দিল, ওদেরই কেউ গেটের তালা খুলে দিল। আনন্দ চোখ রেখে দুটো তীব্র

আলো দেখতে পেল। গাড়িটা সরাসরি এগিয়ে এসে ওদের সামনে থামতেই সে আরও নিচে নেমে এল। কল্যাণ ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি হল?'

'বাইরে থেকে কেউ এসেছে। পুলিস কিনা বুঝতে পারছি না।'

'পুলিস? কি করবি?'

'কিছু না। এখানেই বসে থাকব। আর কথা বলিস না। না পুলিস না, একটাই বুড়ো মতন লোক নামছে গাড়ি থেকে। দারোয়ানগুলো ওকে খুব সেলাম করছে।'

যে লোকটি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি ক্ষমতাবান। গম্ভীর মুখে কিছু বললেন দারোয়ানদের। ঝাপসা শুনতে পেল আনন্দ। তারপর ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন ভদ্রলোক। আনন্দ এবার চিনতে পারল। প্যারাডাইস-এর মালিককে এই প্রজেক্ট শুরু করার সময় কয়েকবার দেখেছে সে দূর থেকে।

তিনি অদৃশ্য হওয়ামাত্র আলো নিবে গেল, সদরে তালা পড়ল। আনন্দ দেখল একটা দারোয়ান টুল পেতে বসে আছে পাতাবাহার গাছের পাশে। লোকটাকে এর আগে লক্ষ্য করেনি সে। বাকিরা ফিরে গেল বাঁ দিকে। তার মানে ওরা পালা করে পাহারা দেয়।

সময় হয়ে এলে আনন্দ কল্যাণকে ডাকল, 'শোন, আমি নামছি। তুই গাড়ির লকগুলো খুলে তৈরি থাক। গেট থেকে ফিরে আসা মাত্র তুই আমার সঙ্গে চলে আসবি ওগুলো নিয়ে।'

'ঠিক হ্যায়।' কল্যাণ উঠে বসল। ওর গলার স্বর বেশ শক্ত এখন। কানে লাগল আনন্দর। সে মুখে কিছু না বলে লকটা খুলল। কট্ শব্দটা যেন রাত্রের নিস্তব্ধতায় বড় হয়ে বাজল। আর একটু অপেক্ষা করল আনন্দ। না, কেউ এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। ওপাশে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে ভারী লরির কনভয় যাচ্ছে বোধ হয়। সুযোগটা হারাল না সে। টুক করে দরজা খুলে নিচে নেমে উবু হয়ে বসল। তার কাঁধে ঝোলানো সরু স্ট্রাপের ব্যাগে মালগুলো আছে। এবং এই প্রথম শরীরে একটা কাঁপুনি টের পেল আনন্দ।

পার্ক করা গাড়িগুলোর পেছন দিয়ে দ্রুত মাথা নিচু করে দৌড়ে এল সেখানে যেখানে পাতাবাহার গাছগুলো শুরু হয়েছে। লোকটা বসে আছে বাড়িটার দিকে মুখ করে। মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে। আনন্দ স্ট্র্যাপটা বের করল। তারপর শব্দহীন পায়ে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। গলায় স্ট্র্যাপটা চেপে বসতেই লোকটা কোঁক করে একটা শব্দ তুলল। তারপর এলিয়ে পড়তেই ওর কাঁধ ধরে ফেলল। এত সহজে লোকটা অজ্ঞান হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। অবশ্য মরে গেছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মাথা গাছের গায়ে এমনভাবে ঠেকিয়ে রাখল সে যাতে দূর থেকে মনে হয় ও বসে আছে। সদর দরজার চাবি ওর পকেট থেকে বের করতে সময় লাগল না। আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দেখল। কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

সদরের তালা খুলে নিঃশব্দে আনন্দ ফিরে এল গাড়ির কাছে। পাল্লা যেমন ছিল তেমনই রেখে দিল সে। যদি কারও নজর যায় কিছুই টের পাবে না। ঘড়ি দেখল আনন্দ। এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে। এইসময় কল্যাণ তার পাশে এসে দাঁড়াল, 'সাবাস্!'

আনন্দ কিছু বলল না। কয়েকদিন আগে তার একবার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা তাদের পক্ষে বেশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে তো নেহাতই আনাড়ি, ট্রেনিং ছাড়া করতে যাওয়া বোকামি। ধরা পড়লে কোন কাজই হবে না। লোকে জানতেই পারবে না তারা ঠিক কি করতে চেয়েছিল। হয়তো সামান্য ডাকাতির চেহারা দেওয়া হবে ব্যাপারটাকে। তাছাড়া একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। একাধিক এই রকম ঘটনা যদি বারংবার ঘটে যায় তাহলেই সেটা একটা স্পষ্ট চেহারা নেবে। কিন্তু প্রতিদিন খুঁটিনাটি আলোচনা করে করে শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিল এটা পারা সম্ভব। এখন কাজে নেমে মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতাটা উপরিলাভ, ইচ্ছা এবং পরিশ্রমই সার্থক হতে সাহায্য করে। এবং এই সময়ই টুপ করে আলো নিবে গেল। এবং তখনই একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল ভেতর থেকে।

দড়াম করে গেটের পাল্লা দুটো দু'দিকে ছিটকে গেল এবং রাগী সিংহের মত গর্জন করে গাড়িটা দারুণ ঝাঁকুনি সামলে উঠে এল রাস্তায়। আনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'সামলে চালা।' সুদীপ এমন কিছু

উচ্চারণ করল যার অর্থ বোঝা গেল না কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হল না। পেছনে তখন চিৎকার অনেক কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে। প্যারাডাইসের একাংশে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। শেষ বোমাটা ছুঁড়ল কল্যাণ। তীব্র শব্দে সেটা বিস্ফোরিত হল প্যারাডাইসের গেটের বাইরে মুখ বাড়ানো গাড়ির ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধাক্কা খেল রাস্তার পাশের গাছে, তারপর পাক খেয়ে উলটে পড়ল ঠিক গেটের মাঝখানে। এবং তার শরীর থেকে দপ করে একটা আগুন লাফিয়ে উঠল আকাশে। ফলে প্যারাডাইস থেকে বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ করে দিল জ্বলন্ত গাড়িটা। ভেতরের উদ্যানে তখন নারী-পুরুষের চিৎকার এবং কান্না সমান তালে চলছে। যেসব নারীপুরুষ পাগলের মত ছুটোছুটি করছিল তাদের অনেকের শরীরের লজ্জাবস্ত্র শেষ মুহূর্তে টেনে-নেওয়া। মজার কথা হল, আগুন নেবানোর কোন চেষ্টা হচ্ছে না। আতঙ্ক যেন তার থাবায় সবাইকে অবশ করে দিয়েছে। এর মধ্যেই পাহারাদাররা জানতে পেরেছে বড় সাহেব নেই। সরাসরি গুলি লেগেছে তাঁর বুকে। জ্বলন্ত ককটেল কুটিরের পাশে, তাঁর মৃতদেহ ঘিরে ছোট্ট ভিড়। ভিড় সেই পাহারাদারের পাশে বোমায় যার মাথা উড়ে গেছে। মধ্যরাত্রের এই চিৎকার এবং আগুন দেখে আশেপাশের গ্রামের মানুষজন ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে তফাতে। এই বিশাল দুর্গের মত ঘেরা স্বর্গোদ্যানে ঢোকার অনুমতি তারা কখনই পায়নি। চিরকাল কিছুটা বিস্ময় কিছুটা ঈর্ষায় তারা এইদিকে তাকিয়ে এসেছে। এখন অবশ্য দ্বিতীয়টি নেই কিন্তু বিস্ময় বাড়ছিল এরকম অঘটন কিভাবে ঘটল তাই ভেবে।

কলকাতার দিকে ঝড়ের মত ছুটে যাওয়া গাড়িটার গতি এক সময় স্বাভাবিক হয়ে এল। জয়িতার দুটো হাত জ্বলছিল তবু সে সুদীপকে বলল, 'তুই সরে আয়, আমি চালাচ্ছি।'

'ফোট্। এখন আমি স্টিয়ারিং ছাড়ব না।'

জয়িতা মুখ ফিরিয়ে আনন্দকে বলল, 'ওর মাথা থেকে এখনও রক্ত বের হচ্ছে।'

আনন্দ কিছু বলল না। ও বুঝতে পেরেছে এখন সুদীপকে কিছু বলে লাভ হবে না। এই জেদটুকুই ওর অহঙ্কার। এবং বুঝতে পারে না সেটাই ওর ত্রুটি। যতক্ষণ শক্তি থাকবে চালাক, খামোকা তিক্ততা এনে কি লাভ! সে পিছন ফিরে তাকাল। সমস্ত চরাচর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এখন প্যারাডাইস অনেক পেছনে। সে লক্ষ্য করল কল্যাণ তখন থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে আছে। এরকম একটা গাড়ির জানলা দিয়ে বোমা ছুঁড়ে ঘায়েল করা সোজা কথা নয়। কল্যাণ সেটা পারল বলেই তাদের পেছনে এখনও কোন গাড়ি নেই। সে কল্যাণের কাঁধে হাত রেখে বলল 'সাবাস্!'

মুখ না ফিরিয়ে কল্যাণ বলল, 'কি জন্যে?'

'সবকিছুর জন্যেই।' আনন্দ হাসল।

'তোকে কে সাবাস বলবে?'

'তোরা, যদি সাবাস পাবার মত কিছু করে থাকি। বি ইজি, আমাদের পেছনে আর কেউ নেই। উই আর সেফ। শুধু জয়িতা তুই চটপট শাড়িটা খুলে শার্টপ্যান্ট পরে ফ্যাল। যদি সামনের পুলিস স্টেশন গাড়ি আটকায় তাহলে তোর শরীরে ওরা যেন শাড়ি না দ্যাখে।' আনন্দ বলতে বলতে দেখল সামনের দিকে দুটো হেডলাইট এগিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ বলল, 'ভ্যান!'

'হাইওয়ে পেট্রল দিচ্ছে বোধ হয়। ওরা যদি থামায় আমরা মাথা নামিয়ে নেব। তোদের যদি উলটো-পালটা বলে, চার্জ করব, তুই ইঞ্জিন চালু রাখ।' আনন্দ কল্যাণকে ইশারা করতেই সে মাথা নামাল। গাড়িটা পুলিশের। হেডলাইট নেবাচ্ছে না। বোধ হয় ইচ্ছে করেই। সুদীপ একটা গালাগালি দিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল। জয়িতা কাপড়টাকে টানল। কটেজেই সে ভেবেছিল জিনস্ পরে নেবে। কিন্তু ককটেল কুটিরে যাওয়ার পর সেই সুযোগ পাওয়া যায়নি। না পেয়ে ভালই হয়েছে বলে মনে হল এখন। পুলিসের গাড়িটা একটু থামল। কেউ একজন মুখ বাড়িয়ে কিছু দেখল। তারপর আবার গতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ি চালু করে সুদীপ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে পাশে ফেলে বলল, 'ধরিয়ে দে।'

আনন্দ বলল, 'আমি দিচ্ছি, তুই শাড়ি ছাড় জয়িতা।'

'আমি এই গাড়ির মধ্যেই ছাড়ব নাকি?'

'ন্যাকা!' সুদীপ বলল, 'আমি তোমার জন্যে গাড়ি থামাতে পারব না।'

আনন্দ বলল, 'আমি তোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি জয়িতা, কিন্তু আমরা যদি এক মিনিট দেরি করি

তাহলে একসট্রা ট্রাবল ইনভাইট করব।' সিগারেট ধরিয়ে সুদীপের মুখে গুঁজে দিয়ে সে পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল।

একটু কাঁপন এল শরীরে। মেয়ে বলে তার কোন রক্ষণশীলবোধ নেই। কিন্তু তাই বলে চলন্ত গাড়ির সিটে বসে শাড়ি ছাড়ার কথা সে এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। ব্লাউজটা না খুললেও অবশ্য চলে, ওর ওপর শার্ট গলিয়ে নিলে বোঝা যাবে না। কিন্তু সায়া? প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপরে। তার মুখে যে রক্ত জমছে সেটা বুঝেই সে সোজা হয়ে বসল। তারপর কোমরে হাত দিয়ে শাড়ির গিঁট খুলে খানিকটা উঠে শাড়িটাকে পেঁয়াজের খোসার মত ছাড়িয়ে নিল শরীর থেকে। চোখের কোণায় সে পাশে বসা সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপের নজর সামনের দিকে। একটু স্বস্তি বোধ করল সে। সুদীপ একবারও মুখ ফেরায়নি। পেছনের দুজনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সায়ার নিচে প্যান্টি পরা থাকায় আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল জয়িতা। সায়া শাড়ি মুক্ত হয়ে শার্টটা গলিয়ে নিল ওপরে। ব্লাউজটা না থাকলে আরও সহজ হতে পারত সে। জিপার টেনে বোতাম আটকে সে চটপটে হাতে শাড়ি ভাঁজ করে সায়া দিয়ে মুড়ে ব্যাগে চালান করে দিয়ে স্থির হয়ে বসল। এবং তখনই তার মনে অদ্ভুত নিশ্চিন্তিবোধ এল। জীবনের যে কোন সময়েই সে এই তিন বন্ধুর কাছে শুধু বন্ধু হিসেবেই গ্রহণীয় হবে, নারী বলে আলাদা কোন ব্যবহারের জন্যে তাকে কখনও আতঙ্কিত থাকতে হবে না। চোখ বন্ধ করল জয়িতা। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠল।

ককটেল কুটিরে ঢোকার পরই বাজনা কানে এসেছিল। ঘরটা বিশাল। একপাশে বার কাউন্টার। এমন চমৎকার আলো-আঁধারি যে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, আবার কোন কিছুই কটকটে নয়। প্রায় কুড়ি বাইশজন নরনারী আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায়। মদ্যপান এবং চুম্বন করে যাচ্ছে সানন্দে। এই দুটো একসঙ্গে যে সম্ভব হয় তা না দেখলে কল্পনা করতে পারত না। তাদের দেখে একটি সুন্দরী হোস্টেস এগিয়ে এসে বলল, 'ওয়েলকাম।' সুদীপ মাথা নেড়ে সেটা গ্রহণ কবতেই মেয়েটি দুটো হাত ছড়িয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে তোমাদের জন্যে অনেক মজা অপেক্ষা করছে। তার আগে বল কি ড্রিঙ্ক তোমরা নেবে?'

সুদীপ তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জানাল নিজেদের দেখাশোনা তারা নিজেরাই করে নেবে, সুন্দরী স্বচ্ছন্দে অন্য গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। মুক্ত হয়ে সুদীপ বলল, 'আমাদের হাতে গ্লাস রাখা দরকার জয়, চল ওখানে যাই।'

'তুই ড্রিঙ্ক করবি?'

'আবার শালা তুই আমাকে তুই বলছিস?'

'তুই কি বলছিস?'

সুদীপ একটা ব্রান্ডি আর সফট্ ড্রিঙ্ক দুজনের জন্যে নিয়ে বলল, 'পেয়ারগুলোকে দ্যাখ। তোর আমার বয়সী কেউ নেই।'

জয়িতা গ্লাসটাকে হাতে নিয়েছিল। অন্তত চার ডাবল দাম নিয়েছে এরা। ওর দৃষ্টি এবার সামনের দিকে ছড়াল। পুরুষদের কারও বয়স চল্লিশের নিচে নয়। তাদের সঙ্গিনীরা বেশির ভাগই পঁচিশ ছোঁয়া। একজন টেকোমাথা বুড়ো উনিশ-কুড়ি বছরের সঙ্গিনীর গালে এমনভাবে কামড়ে দিলেন যে বেচারা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপরীত। বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে এসেছেন। এবং তাঁদের বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ মন্তব্য করল, 'এই বুড়িগুলোই শয়তানের বউ।' জয়িতার নজর তখন দুটো জোড়ার ওপর পড়েছে। একজন বয়স্কা এবং স্বল্পবসনা যাকে জড়িয়ে আদর করছেন বাজনার তালে সে পুরুষ নয়। মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটিকে তার চেনা চেনা লাগছিল। অথচ কিছুতেই সে ঠাওর করতে পারছিল না। তখন থেকেই শরীরে ঘিনঘিনে ভাবটা চলে এল। মেয়েটি যেন খুব মজা পেয়েছে এমন গদগদ ভাব। আলিঙ্গনের সময় ওর শরীরে মহিলার হাত সাপের মত ঘুরছে এবং মেয়েটি আরও ব্যবধান কমাচ্ছে। জয়িতা বলল, 'আমি কটেজে ফিরে যাচ্ছি।'

সুদীপ বলল, 'দাঁড়া। এই মানুষগুলো কলকাতা থেকে চুরি করে এসেছে।'

জয়িতা বলল, 'চেনাস না আমাকে। সাম অফ দেম আর নোন টু মি!'

'চিনিস?'

'আমার বাবা মায়ের মত দেখতে।' নির্বিকার মুখে বলল জয়িতা।

'ওকে।' সুদীপ হাসল, 'তবু আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এগিয়ে আয়।' জয়িতার কাঁধে হাত রেখে ও এগিয়ে গেল ভিড় কাটিয়ে। জয়িতা ইঙ্গিতে দাঁড়াতে বলল তাকে। একটা সোফায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছেন সুন্দর পোশাক পরে যে দুজন তাঁদের বয়স সত্তর পেরিয়েছে অনেকদিন। বৃদ্ধর শরীরের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। বৃদ্ধার মুখে ভাল রঙ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দুজনে যৌবন দেখছেন এমন ভঙ্গি। সুদীপ বলল, 'হা-ই।' বৃদ্ধ মুচকি হাসলেন, বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'হা-ই।'

'তোমাদের কেমন লাগছে?'

'চমৎকার। আমরা তো উপভোগ করতে সপ্তাহে একদিন এখানে আসি।'

'উপভোগ করতে?' জয়িতা প্রশ্ন না করে পারল না।

সেই সময় লোকটি ঢুকল। লম্বা, সুগঠিত শরীর, হাঁটার মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন কর্তৃত্ব ওঁর করায়ত্ত। চট করে একটা আলোর বৃত্ত তাঁকে ধরে নিল। দুটো হাত ওপরে তুলে তিনি হাতছানি দিলেন। গুঞ্জন কমে গেল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। আশা করছি আপনারা আমার প্যারাডাইসে চমৎকার আছেন। এখন হল সেই সময় যখন আপনারা যা খুশী করতে পারেন। কোন সঙ্কোচ নয়, লজ্জা ত্যাগ করুন। আমাদের প্রত্যেকের মনে যে গোপন ইচ্ছা আছে সেটা ব্যক্ত করার সময় এখন। লেটস এনজয়!'

দুম করে আলো নিবে গেল। বাজনা বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর গাঢ় নীল আলো জ্বলে উঠল হলে। জয়িতার মনে হল নীলের স্রোত বইছে যেন ঘরে। নিজেদের চেহারাই ভৌতিক হয়ে গেল আচমকা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোকটি পোশাক খুলছেন। তাঁর পাশে বিকিনি পরা দুটি মেয়ে। সযত্নে সেই পোশাকগুলো তারা সরিয়ে রাখছে। জয়িতা বিস্মিত হয়ে দেখল লোকটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে গেলেন। একটুও সঙ্কোচ নেই তাঁর ভঙ্গিতে। এবার ওপাশের দেওয়ালে হেলিয়ে রাখা একটি মসৃণ তক্তা টেনে আনা হল। তক্তাটির নিচে গোটানো পায়া ছিল। সেটি সাজিয়ে দেওয়ার পর লোকটি উপুড় হয়ে তার ওপরে শুয়ে পড়লেন। দমবন্ধ করে দেখছিল জয়িতা। ককটেল রুমের অধিকাংশ মানুষ লোকটিকে কেন্দ্র করে বৃত্ত রচনা করেছে। সেই বৃদ্ধদম্পতি সবার আগে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লোকটি এবার মুখে শব্দ করলেন। তাঁর মুখ অবশ্য এখন তক্তার ওপর চেপে রাখা, শব্দটা তাই বিকৃত শোনাল। সহকারিণীর একজন তখন দেওয়ালের কাছে ফিরে গেল। তারপরই বাতাসে সাঁ শব্দটাকে সাপের নিঃশ্বাসের মত সোচ্চার করে দু'ইঞ্চি নরম চামড়ার চাবুকটা আছড়ে পড়ল লোকটির নিতম্বে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর শরীরে। জয়িতা লক্ষ্য করল লোকটার সমস্ত পিঠে, নিতম্বে, হাঁটুর নিচে অজস্র সরু সরু দাগ। নিয়মিত ব্যবধানে চাবুক পড়ছে লোকটির শরীরে। সুদীপ বলল নিচু গলায়, 'দর্শকদের দ্যাখ।'

বৃদ্ধের গাল বেয়ে লালা পড়ছে। চোখ বিস্ফারিত। বৃদ্ধা তাকে মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছেন। দর্শকদের অনেকের চোখই জ্বলছে। এই সময় সহকারিণী আঘাত বন্ধ করল। লোকটির পেছনদিকটা এতক্ষণে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন লোকটি। তারপর দেওয়ালের পাশে দাঁড় করানো লম্বা টুলের ওপর উঠে ইঙ্গিত করলেন সহকারিণীকে। সে চটপট ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা চামড়ার স্ট্র্যাপ লোকটির মনিবন্ধে আটকে দিল। দু'হাত মাথার ওপরে রেখে নগ্ন লোকটিকে দেখিয়ে সহকারিণী চিৎকার করলেন, 'এগিয়ে আসুন, আপনাদের মধ্যে কে প্রথম সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন যার চাবুকের আঘাতে এঁর শরীরে ঝড় উঠবে, সমুদ্র মন্থিত হবে!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তিনজন সুন্দরী মধ্যবয়সিনী একই সঙ্গে এগিয়ে এলেন সামনে। প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে চাবুক চাইছেন। একটা হিলহিলে নোংরা স্রোত টেনে আনল সেই চাওয়ার শব্দগুলো। সুদীপ বলল, 'মাথা ধরার নাম করে তুই কটেজে ফিরে যা। আমি আসছি।'

জয়িতা ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই কি করবি?'

'ফিউজ বক্সের কাছে কেউ নেই। আগে আগুন জ্বালাব তারপর লোকটাকে গুলি করে মারব। এ ব্যাটাই প্যারাডাইসের মালিক।' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল সুদীপ।

'না, আমি গুলি করব।' নিঃশ্বাস বন্ধ করল জয়িতা।

'যা বলছি তাই কর। কটেজের দরজায় মালগুলো রেডি করে দাঁড়িয়ে থাকবি। চাবি নে।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। ততক্ষণে সেই মহিলা চাবুক মারার সৌভাগ্য পেয়েছেন যিনি সঙ্গিনীকে নিয়ে প্যারাডাইসে লীলা করতে এসেছেন। এই মুহূর্তে তাঁকে উন্মাদিনীর মত দেখাচ্ছিল। চাবি নিয়ে দ্রুতপায়ে জয়িতা ককটেল কটেজের বাইরে আসতেই সেই লোকটি এগিয়ে এল, 'এনি প্রব্লেম ম্যাডাম?'

'বমি পাচ্ছে, শরীর খারাপ লাগছে।' সত্যি কথাটা বলল জয়িতা।

'ও কিছু নয়, প্রথম প্রথম এরকম হয়। শরীর সুস্থ করে আবার ফিরে আসুন। এখনও অনেক আইটেম বাকি আছে।' লোকটি দাঁত বের করে হাসতেই জয়িতা পা বাড়াল। নিজেদের কটেজের কাছে এসে সত্যি তার বমি হয়ে গেল। ঈষৎ ঝুঁকে সে শব্দ করে কিছুটা অস্বস্তি বের করে দিতেই একজন পাহারাদার সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে ম্যাডাম?'

'শরীর খারাপ। ককটেল কুটির থেকে আসছি। বমি পাচ্ছে।'

'হায়! কি অবস্থা! কেন যে ওখানে যান, আপনাদের মত ভাল মেয়েদের জায়গা ওটা নয়।' লোকটা অত্যন্ত সমবেদনা মাখানো স্বরে কথাগুলো বলতেই জয়িতা মুখ তুলে তাকাল। বছর পঞ্চাশেকের মত বয়স, মুখে একটা নরম ভঙ্গি আছে। সে কোনরকমে বলল, 'আমাকে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ এনে দেবেন?'

'ওষুধ? দেখি। কোন্ কটেজে উঠেছেন?'

আঙুল দিয়ে কটেজটা দেখিয়ে দিয়ে জয়িতা চলে এসেছিল। ঘরে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে শরীর স্থির করতে সময় লেগেছিল বড়জোর পাঁচ মিনিট। সে সুদীপের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে যে তার শরীর এমন বিকল হয়ে পড়েছিল তা নিজেই টের পায়নি, সুদীপ যদি জোর করে না পাঠিয়ে দিত তাহলে ওখানেই হয়তো বমি হয়ে যেত। সে যখন শাড়ি ছেড়ে জিনস পরবে বলে ভাবছে সেই সময় গুলির শব্দটা কানে এসেছিল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতেই সুদীপের দেখা পেয়েছিল। দৌড়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সুদীপ বলেছিল, 'জেনারেটারটাকে চার্জ কর। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।' তারপর ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে গেল আবাব। জয়িতা নিজের ব্যাগটা তুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আগুন দেখতে পেল। এবং সেইসঙ্গে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে মাঠময় ছুটোছুটি করছে মত্ত-অর্ধমত্ত নরনারী। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল সে, সঙ্গে সঙ্গে একটা কটেজে আগুন জ্বলতে দেখল। পাহারাদাররা যে যেখানে ছিল ছুটে আসছে ককটেল কটেজের দিকে। এই সময় একটি নারীকণ্ঠে চিৎকার উঠল, 'সাহেব মর গিয়া।' জয়িতা আর দাঁড়াল না। বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে সোজা চলে এল জেনারেটর রুমের দিকে। যে লোকটা পাহারায় ছিল সে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দূরের আগুন দেখছে। জয়িতা চিৎকার করে বলল, 'আপনাকে ডাকছে ওদিকে।'

'আমাকে?' বলেই লোকটা দৌড়াতে শুরু করল। বোধ হয় এতক্ষণের কৌতূহল এবার মেটাতে পেরে সে খুশী হল। যেভাবে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেইভাবেই বস্তুটিকে ছুঁড়ল জয়িতা খোলা দরজা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আগুনের হলকা এবং সমস্ত এলাকাটি নিশ্চিদ্র অন্ধকারে ছেয়ে গেল। শুধু দূরের তিনটে কটেজে আগুন জ্বলছে। তারই লাল আলোয় চারধার ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। এই সময় সামনের দিকে বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং কান্না মেশানো চিৎকাব ভেসে এল। ক্রমশ ডানদিকের ব্লকেও আগুন জ্বলে উঠল। জয়িতা দৌড়ে খানিকটা এগোতেই সুদীপের চিৎকার শুনতে পেল, 'লেট মি গো ব্যাক। সরে যাও সামনে থেকে। যে বাধা দেবে তার জান খতম করে দেব।' এই গলা কখনও শোনেনি জয়িতা।

এখন সেই সুদীপ ঠোঁট টিপে স্টিয়ারিং ধরে আছে। সে ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি। ব্যাপারটা এত সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে তা কল্পনাতেও ছিল না। এখন কেউ কথা বলছে না। মধ্যরাত পেরিয়ে গেলেও ওরা কোনরকম ক্লান্তি বোধ করছিল না। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'বড্ড খিদে পাচ্ছে!'

জয়িতা অবাক হয়ে তাকাল। এইসময় কারও খিদে পায়?

আনন্দ বলল, 'বাড়িতে গিয়ে খাবি।'

'বাড়িতে গিয়ে! আমরা কি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি? সেরকম তো কথা ছিল না।' কল্যাণের গলায় আপত্তি স্পষ্ট। আনন্দ একটু সময় নিল, তারপর বলল, 'যতদূর মনে হয় আমাদের কেউ দ্যাখেনি। আর

কেউ যদি দ্যাখেও পরে মনে করতে পারবে না। আমরা কোন লিফলেট ফেলে আসিনি। অতএব ব্যাপারটা পুলিসকে ধাঁধায় ফেলবে। নিছক ডাকাতি নয় কারণ আমরা কিছু নিয়ে যাচ্ছি না আবার কোন পলিটিক্যাল চেহারা দেওয়াও মুশকিল। এখন আমরা যদি বাড়িতে ফিরে না যাই তাহলে খোঁজখবর হবেই। আমার হোস্টেল থেকে কিংবা তোদের বাড়ি থেকে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ হয়তো একটা ক্লু খুঁজে পেতে পারে। আমরা ওদের সাহায্য করব কেন?' খুব ভেবেচিন্তে শান্ত গলায় কথাগুলো বলল আনন্দ।

'কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম বাড়িতে ফিরব না। সুদীপের আত্মীয়ার বাড়ি তো সেই কারণেই দেখে এসেছিলি।' কল্যাণের প্রস্তাবটা মেনে নিতে ইচ্ছে করছিল না।

'যদি আমাদের কেউ মারাত্মক আহত হত, কেউ ধরা পড়ে যেত কিংবা কাউকে ওরা চিনে ফেলত তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতে হত। খামোখা মানুষের মনে সন্দেহ এনে কি লাভ?'

সুদীপ এতক্ষণে কথা বলল, 'তোর বাড়িতে ফিরতে এত আপত্তি কেন?'

কল্যাণ নাক দিয়ে শব্দ করল, 'আমার আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

সুদীপ বলল, 'আমারও করে না। কিন্তু হঠকারিতা করে কোন লাভ নেই। তিনটে লাশ পড়েছে আজ।'

'তিনটে?' জয়িতা চমকে উঠল।

সুদীপ স্টিয়ারিং ধরে মাথা দোলাল, 'আই অ্যাম হ্যাপি। প্যারাডাইসের লোকটাকে গুলি করেছিলাম। ঠিক সেই সময় ওই লেসবিয়ান মহিলা লোকটির নিতম্বে চুমু খাবে তা কে জানত! ফলে দ্বিতীয়বার গুলি করতে হল। বাইরে বেরিয়ে আসার পর আগুন জ্বালার পর রিসেপশনিস্ট লোকটা সামনাসামনি পড়ে গেল। গুলি করতাম না কিন্তু লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'আপনি!' অর্থাৎ ও আমাকে চিনতে পেরেছিল। ঢোকার সময় ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে, জয়িতাকে লক্ষ্য করেছে। অতএব পুলিস ওর কাছ থেকে ডিটেলস পেয়ে যেত।'

আনন্দ বলল, 'গুড। অতএব আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা বিপদ ডেকে আনতে পারে। এখন কদিন খুব নর্মাল ব্যবহার করব। অ্যাডজাস্ট করতে শেখ কল্যাণ।'

'সারাজীবন তো অ্যাডজাস্ট করে আসছি।'

'সারাজীবন?' খুক করে হাসল জয়িতা। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুলি করার সময় তোর কিরকম মনে হয়েছিল?'

'আনন্দ হচ্ছিল। আই অ্যাম ডুয়িং রাইট জব। যদি এইভাবে বাংলাদেশের নোংরা অসৎ মানুষগুলোকে গুলি করে মারতে পারতাম, আঃ, সেদিন কি আসবে!' সুদীপ বলল।

আনন্দ কল্যাণের কাঁধে হাত রাখল, 'গুলি করতে হলে ঘরে বাইরে করতে হয়। এই পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করতে হলে জঞ্জাল সরাতে হবেই। কোন আপোস চলবে না। কল্যাণ, তুই ইচ্ছে করলে কয়েকদিন আমার হোস্টেলেই থাকতে পারিস।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'না, ভোরবেলায় বাড়িতে ফিরে যাব।'

ওরা বেহালা চৌরাস্তা ছাড়িয়ে খানিকটা দূর আসতেই আনন্দ বলল, 'হাওড়া স্টেশনে চল্।'

স্টেশনের বাইরে কার পার্কে গাড়ি রেখে খুঁটিয়ে দেখে নিল আনন্দ। সুদীপের রক্ত অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি লক করে সুদীপ বলল, 'চাবিটা গঙ্গায় ফেলে দেব।' তখন ভোর হয়ে আসছে। সাত সকালের ট্রেন ধরতে ট্যাকসি ঢুকছে স্টেশনে। আগামীকাল বিকেলে কোথায় দেখা হবে স্থির করে কল্যাণ আর আনন্দ উত্তরের সবে চালু হওয়া ট্রাম ধরল। সুদীপ আর জয়িতা দক্ষিণের প্রথম দোতলা বাসের সামনের আসনে উঠে বসতেই পাতলা আঁধারে মিশতে শুরু করা আলোয় মাখামাখি গঙ্গা দেখতে পেল। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি গিয়ে বাইরে রাত কাটানোর কি কৈফিয়ৎ দিবি?'

জয়িতা চুপ করে ভোরের কলকাতা দেখছিল। প্রশ্ন শুনে মাথা নেড়ে বলল, 'কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে কেউ এখন জেগে নেই।'

॥ ১০ ॥

ভোরবেলায় কলকাতার রাস্তা বড় মোলায়েম, একটু আঁধার লেগে থাকলে আদুরে বেড়ালের মত মনে হয়। সারাদিন শহরটাকে যারা নরক করে রাখে তারা ঘরে ঘরে ঘুমিয়ে। কিছু শান্ত মানুষ গঙ্গাস্নানের জন্যে পথ হাঁটছেন। কিছু ভ্রমণবিলাসী অক্সিজেন নিচ্ছেন প্রাণভরে। জয়িতার মনে হচ্ছিল চৌবাচ্চায় জল জমার মত সারারাত যে অক্সিজেনটুকু কলকাতাকে দিয়ে থাকে তা পাওয়া যায় এই সময়টুকুতেই। যারা পথে বের হতে পারে এখন তারাই ভাগ্যবান।

সে সুদীপের দিকে তাকাল। ঠোঁট কামড়ে সুদীপ বসে আছে চোখ বন্ধ করে। ওর মাথার ক্ষতটা এখনও লালচে হয়ে আছে। এ নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া বোকামি। সুদীপ জানে কি করে নিজের যত্ন করতে হয়। ঠিক কখন লাগল সেটাও বলতে চায়নি। জয়িতা এবার বাড়ির কথা ভাবল। কাল দুপুর থেকে অদ্ভুত একটা টেনশনের মধ্যে কেটে গেল সময়টা। এমন কি একটা গোটা রাত না ঘুমোনো সত্ত্বেও অস্বস্তি হচ্ছে না। যেন অনন্তকাল সে জেগে থাকতে পারে। একটা গোটা রাত না বলে বাড়ির বাইরে কাটাল সে এই প্রথম। বেরুবার সময় জানা ছিল আর ফেরা হবে না। কিন্তু আনন্দর কথায় যুক্তি ছিল। সমস্যা হল বাড়ি ফিরে সীতা রায়কে কি জবাবদিহি দেবে সে? মুখের ওপর ঘেন্না করে বলার পর থেকেই তো বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। আজ নিশ্চয়ই বদলা নেবে ওরা। জয়িতা কপালে হাত বোলাতেই টের পেল। গত রাত্রে মাসীমা টিপটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, এত ঝামেলাতেও স্থির ছিল এটা। ফেলে দিতে গিয়ে কেমন মায়া হল ওর। এমন ভালবেসে কেউ তাকে অনেকদিন সাজায়নি। টিপটাকে সে পকেটে রেখে দিল। তারপর সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাসীমা কিচ্ছু জানেন না, না?'

'কোন্ মাসীমা?' সুদীপ চোখ খুলছিল না।

'আনন্দর মা।'

'সব জানে। আনন্দ ওঁকে সব বলেছে।'

'আশ্চর্য! আমাকে একবারও এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি।'

'তোর চেয়ে যে অনেক গভীর-স্বভাবের মানুষ, তাই।'

জয়িতা কথা বাড়াল না। সুদীপ খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারে না। শুনলে শরীর জ্বলে যায় কিন্তু ওর সঙ্গে ঝগড়া করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার পর আর একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ওকে। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে চুপচাপ থাকার পাত্র রামানন্দ কিংবা সীতা নন। জয়িতাকে যদি সরাসরি প্রশ্ন করে তাহলে সে না বলবে না। সত্যি কথা স্বীকার করে বলতে চাইলে পাওয়া যেত না তাই নিয়েছি। এতে যা হবার তা হবে। ক্রমশ একটা রোখ দখল করল তাকে। মনে মনে বাবা মায়ের মুখোমুখি হবার জন্যে সে তৈরি হয়ে নিল। আর তখনই সুদীপ বলল, 'আমি নামছি। মালগুলো নিয়ে যাচ্ছি। পারলে আজ বিকেলে কফিহাউসে আসিস।'

গুরুসদয় রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে জয়িতা চারপাশে তাকাল। রাস্তায় লোকজন নেই। রোদ্দুর ওঠেনি এখনও। একটা শীতল ছায়া গাঢ় হয়ে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর গায়ে। এবং এই প্রথম মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এটা কি ধরনের মন খারাপ তা ও নিজেই জানে না কিন্তু বুকের ভেতর একটা ভার এসে জমল। এখন কলকাতা কত ভাল, কত শান্ত। মানুষেরা যে যার ঘরে বলেই বাতাসে এখনও আদুরে ছোঁয়া। একটা হলুদ পাখি উড়ে গেল ডানা মেলে। পাখিদের কি মনখারাপ হয়?

আড়ষ্ট পায়ে বালিগঞ্জ পার্ক রোডে এল সে। বাগানওয়ালা বাড়ির দারোয়ানটা অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জয়িতার ঘুম এল। হাঁটতে হাঁটতেই মনে হল সমস্ত শরীর জুড়ে ঘুম নামছে। শুধু চোখ বন্ধ করাটাই বাকি। আর তখনই কেউ মোটা গলায় হা-ই বলে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ বড় করে জয়িতা দেখল সাদা গেঞ্জি আর শর্ট পরে তিনতলার রবীন সেন রাস্তার মাঝখানে

দাঁড়িয়ে শরীর ঝাঁকাচ্ছেন প্রাণপণে। খুব বড় চাকুরে ওই ভদ্রলোকের ওজন অন্তত আড়াইশো পাউন্ড। ওকে বেশ কয়েকবার মিট করেছে সে, লিফটে ওঠার সময় কিংবা ওই চত্বরে। একদিন অবশ্য ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। মা ওকে খবর দিতে কৃতার্থ হয়ে ছুটে এসেছিলেন। কাদের সাহায্যার্থে সীতা রায়রা কি ফাংশন করবেন তার ডোনেশন দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘুম উবে গেল জয়িতার। খাটো প্যান্টের নিচে মাংসগুলো কি বীভৎসভাবে কাঁপছে থলথলিয়ে! জয়িতার শরীর গুলিয়ে উঠল।

ব্যায়াম সেরে রবীন সেন এগিয়ে এলেন, 'মর্নিং, তুমি রোজ সকালে বের হও জানতাম না।'

জয়িতার ঠোঁট মোচড় খেল। মনে মনে বলল ব্যাঙ। রবীন সেন তখন হাত পা নেড়ে বলে যাচ্ছেন, 'তোমার রোজ মর্নিং ওয়াক জগিং করা উচিত। কে বলে কলকাতার বাতাসে অক্সিজেন নেই! আমি রোজ এত এত অক্সিজেন বুকভরে নিই। তুমি যদি দু'মাস আমার সঙ্গে বের হও তাহলে দেখবে মিসেস রায়ের মত ফিগার হয়ে যাবে।'

'কার মত?'

'মিসেস রায়। মানে তোমার মায়ের কথা বলছি। উই মাস্ট অ্যাডমিট শী ইজ এ বিউটি। কোমর কত বল তো? দ্যাখা যায় না আজকাল! আমি অবশ্য তিন সপ্তাহ বেরুচ্ছি। খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি, বুঝলে! মাত্র সাতশ ক্যালরি ডেইলি। শুনতেই সাতশ, কি খাই জানো? ভোরে অক্সিজেন। তারপর এক চামচ চিনি দিয়ে দুধ ছাড়া চা। বিশ ক্যালরি। তারপর একটা শুকা টোস্ট—, তোমাকে বোর করছি? আসলে আজকাল সারাদিন শুধু খাওয়ার চিন্তা মাথায় ঘোরে। প্রাক্টিক্যালি ভারতবর্ষের মানুষ কেন এত খায় বলতে পার? অপচয়, অপচয়। মিসেস রায় আমাকে শরীর তৈরির কারখানায় যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে বানাবো বলে ঠিক করেছি।' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন রবীন সেন।

'বানাতে পারছেন?'

'কমছে, বেশ কমছে। তবে মনে হয় কারও কারও চুমু খেলেও ফ্যাট বাড়ে। কিছু মনে করো না, এসব অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন। তুমি কি মনে কর চুমুতেও ফ্যাট জমে? ওতেও কি ক্যালরি আছে?'

'আপনি ওটা বন্ধ করে দেখুন না।'

'না ভাই, মিষ্টি, দুধ, মাংস, ডিম সব কমিয়ে দিয়েছি কিন্তু চুমু, ইম্পসিবল্। একেই ভারতবর্ষের মানুষ কম চুমু খায়, ইটস অ্যান আর্ট। তবে ওতে কত ক্যালরি আছে সেটাই জানতে হবে। খুব ঘেমে গেছি, কিছু মনে করো না।' রবীন সেন নিঃশ্বাস নিলেন।

'মিসেস রায়কে জিজ্ঞাসা করুন। এ ব্যাপারে উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। চলি।'

'আহা, দাঁড়াও না এক মিনিট। মিসেস রায় তো দার্জিলিং-এ। চমৎকার ওয়েদার এখন ওখানে। এয়ারপোর্টে ওদের দেখলাম। সান্যাল ছোকরাটা খুব লাকি। এত মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে তবু ফ্যাট জমেনি শরীরে। আসলে আমার সেক্রেটারিটাই ইনফেকশান।'

'খুব মোটা বুঝি?'

'ছিল না, মাস নয়েকের মধ্যে। ওকে ছাড়াতে হবে। তুমি চাকরি-টাকরি করলে আমাকে বলো। খুব লাইট জব। ও-কে!' রবীন সেন আবার ফিরে গেলেন শরীর নাচিয়ে হাঁটার জন্যে। এই ফাঁকে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। নরম আদুরে রোদ। জয়িতা লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। সীতা রায় তাহলে সত্যি এখন দার্জিলিং-এ। ওর মনে পড়ল কিছুদিন আগে সীতা রায় কাউকে টেলিফোনে বলছিলেন, আই ডোন্ট লাইক অ্যানম্যারেড গাইস। এই বয়সে বিয়ে-থা করতে বলবে—ওরে বাব্বা! যার সম্পর্কে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাকে নিয়েই তিনি এখন দার্জিলিং-এ আরাম করছেন।

যা হোক, একজন অন্তত কৈফিয়ত নিতে সামনে দাঁড়াবে না। সোঁ সোঁ করে লিফটে সোজা ওপরে চলে এল সে। এখনও আলো নেবেনি বাড়িটার। বোতামে চাপ দিল জয়িতা। এই প্রথম একটা গোটা রাত বাইরে কাটিয়ে সে বাড়িতে ফিরছে। বেলের আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যায় না। কিন্তু একটু বাদেই দরজা খুলে গেল। তাকে দেখে শ্রীহরিদা কি করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর কেমন গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলে সারারাত? আমি ভেবে মরি। কান খাড়া করে বসেছিলাম।'

মানুষটার জন্যে কষ্ট হল জয়িতার। সে চুপচাপ ভেতরে চলে এল। এমনিতে বেল বাজালে শ্রীহরিদার

হুঁশ হয় না। এই নিয়ে রামানন্দ এবং সীতার মধ্যে প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। সীতা রায়ের জন্যেই ওকে ছাড়াতে পারছেন না রামানন্দ। অথচ আজ একবার বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল শ্রীহরিদা। কখনও কখনও কি ও ঠিকঠাক শুনতে পায়!

পেছন পেছন আসছিল শ্রীহরিদা, 'তোমার মা বাড়িতে নেই, বাবা কাল রাত্রে ফেরেনি, তুমিও সেই লাইন ধরলে। আমার আর এই সংসার আগলাতে ভাল লাগছে না।'

নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জয়িতা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা বাড়িতে নেই?'

মাথা নাড়ল শ্রীহরিদা, 'না, বাইরে গেছে। কালকে ফিরবে। স্যুটকেস নিয়ে গেছে।'

'বাবা বাইরে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমিই তো গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম স্যুটকেসটা। সেই সান্যাল ছোকরাটা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তুমি আবার কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে?'

জয়িতা জবাব দিল না। সত্যি, শ্রীহরিদার সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে মায়ের সম্পর্কে শুনতে হচ্ছে। রামানন্দ কি বাইরে গেছেন কারও সঙ্গে? হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে জয়িতা রামানন্দ রায়ের ঘরে এল। পাশের দরজাটা বন্ধ। সীতা রায় বাইরে গেলে ঘরের দরজার চাবি নিয়ে যান।

ঘরটাকে খুঁটিয়ে সে দেখল। এই ঘর দেখে অবশ্য বোঝা যাবে না কেউ বাইরে গেছে কিনা। রামানন্দ রায়ের তিনটে স্যুটকেস পাশাপাশি রয়েছে। নতুন স্যুটকেস কেনাটা অস্বাভাবিক নয়। রামানন্দের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। পরিপাটি করে সাজানো। এমন কিছু চোখে পড়ল না যা থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায়।

ঘরে ফিরে এসে স্নান করল জয়িতা। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ সর্বাঙ্গে মাখামাখি হওয়ার পর মন প্রফুল্ল হয়ে গেল ওর। রামানন্দ রায়ের বাড়িতে না ফেরা, সীতা রায়ের ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওযায় তার কিছু এসে যায় না আর। গতরাত্রে যে কাজটা ওরা করেছে এইরকম কাজ যদি একটার পর একটা করে যেতে পারে, যদি ভণ্ড কপট মানুষগুলোর মুখোশ খুলে দিয়ে দেশের মানুষের বিবেকে কিঞ্চিৎ ঢেউ তুলতে পারে তাহলে বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পোশাক পালটে জয়িতা শুয়ে পড়ল। এই সময় শ্রীহরিদা চা নিয়ে ঢুকল। দামী কাপে গরম চা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সে। আজ যদি সুদীপের সেই আত্মীয়ার বাড়িতে তাদের থাকতে হত তাহলে কপালে কি জুটত? বালিশে মুখ গুঁজে সমস্ত শরীরে আরাম নিতে নিতে হঠাৎ ওর মনে হল এই নরম বিছানা, দামী চা, এইসব আরামদায়ক বস্তু তার জন্যে নয়। এসবই রামানন্দ রায় মারফৎ তার অভ্যেসে এতকাল মিশে ছিল। এখন চটজলদি এসব থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। ঠিক এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। করিডোর ডিঙিয়ে জয়িতার ঘরে সেই আওয়াজ ঢুকল কুকুরের কুঁই কুঁই ডাকের মতন। জয়িতা উঠে বসল। আশ্চর্য, পথে আসবার সময় তার ঘুম পাচ্ছিল স্বাভাবিক ভাবেই অথচ বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর আর দু'চোখের পাতা এক হচ্ছে না। সে নিজের ঘরের দিকে তাকাল। এই ঘরে এমন সব আসবাব আছে যা অনেকের বাড়িতে নেই। এই স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দর বাড়িতে দ্যাখেনি সে, কল্যাণের ওখানে তো কল্পনা করা যায় না। এক কথায় নিশ্চয়ই এসব ছেড়ে যাওয়া যায় কিন্তু নিরাসক্ত মন নিয়েও তো এদের সঙ্গে থাকা যায়। ভারতবর্ষের কয়েক লক্ষ মানুষ অর্ধাহারে থাকে বলেই আমাকে অর্ধাহারে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং যা সহজ তাই মেনে নেওয়া ভাল। তাতে আর যাই হোক টেনশন থাকে না।

শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভারটা তুলল জয়িতা, 'হেলো।'

'এভরিথিং অলরাইট জয়ী?'

'কে বলছেন?' ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা কর জয়িতা।

'আমার গলা চিনতে পারছিস্ না? আমি তোর বাবা।'

'ও! কি বলছ?'

'আমি হঠাৎই অফিসের কাজে জামসেদপুরে চলে এসেছি। গতকাল ফোন করেছিলাম, তোরা কেউ বাড়িতে ছিলি না। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রামানন্দ যেন কথা খুঁজছেন। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি একাই গিয়েছ জামসেদপুরে? আই মিন, তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

'আমার সঙ্গে? নো, আর কারও তো আসার কথা ছিল না। কেন বল্ তো?'

'মা দার্জিলিং-এ গিয়েছে। সঙ্গে সান্যাল আছে, তাই।'

'জয়ী!' হঠাৎ রামানন্দ রায়ের গলা রুদ্ধ হয়ে এল, 'আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু এসব তো এখন নর্মাল, খুব নর্মাল—আমাকে, আমাদের মানতেই হয়। হয়তো তোর মা কোন একটা একজিবিশনের ব্যবস্থা করতে দার্জিলিং-এ গিয়েছে।'

হঠাৎই চুপচাপ হয়ে গেল লাইনটা। রামানন্দ কথা বলছিলেন না। জয়িতা রিসিভারটা চুপচাপ কানে চেপে রেখেছিল। এটা কতক্ষণ? তিরিশ সেকেন্ড হতে পারে, এক মিনিটও। তারপর রামানন্দই বললেন, 'আমি আজ বিকেলের ট্রেনেই ফিরছি।'

জয়িতা বলল, 'আচ্ছা।'

রামানন্দ গলায় জোর আনতে চেষ্টা করলেন, 'আমি—আমি—আচ্ছা থাক, গিয়ে বলব। আসলে প্রত্যেক মানুষের তো কিছু না কিছু বলার থাকেই। গুডবাই।'

লাইনটা কেটে গেল। এবং হঠাৎই রামানন্দ রায়ের জন্যে জয়িতার কষ্টবোধ হল। সে মুখ তুলে দেওয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে এক বছরের জয়িতাকে শূন্যে তুলে ধরে রামানন্দ হাসছেন। মেয়ের আতঙ্কিত মুখ দেখে পিতার আশ্বস্ত করা হাসি।

রাস্তায় নেমে সুদীপ চারপাশে তাকাল। এই ভোরে মানুষ থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন সবাই স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়েছে। তার কাঁধের ব্যাগটা ভারী, হাতেরটা তেমন নয়। দ্রুত পা চালাচ্ছিল সে। এই সময় একটা লোককে সে ফুটপাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চোখাচোখি হওয়া মাত্র আকাশের দিকে মুখ তুলল লোকটা। সুদীপের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। এই লোকটা কে? কখনও এপাড়ায় দ্যাখেনি ওকে! এই কি ওর খোঁজে এসেছিল বাড়িতে? যদি পুলিশের চর হয় তাহলে এই মুহূর্তে তাকে অ্যারেস্ট করলে আর কিছু করার থাকবে না। হাতের ব্যাগটায় প্রচুর রসদ পেয়ে যাবে লোকটা। কিন্তু মিনি বেড়ালের মত ধরা দেবে না সুদীপ। এখনও তার কোমরে মালটা গোঁজা আছে।

সুদীপের চোয়াল শক্ত হল। লোকটা ওর দিকে আর একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। না, আর সন্দেহ করার কিছু নেই। নির্ঘাৎ ওরই জন্যে দাঁড়িয়ে। সুদীপের গতি কমে এল। এখনও হাত-দশেক বাকি। দূরে ঠাকুরের দোকানটা এখনও বন্ধ। হঠাৎই যেন রাস্তাটা আরও ফাঁকা হয়ে গেল। ডান কাঁধ থেকে বা কাঁধে স্ট্রাপটা বদল করে সুদীপ সরাসরি লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর ডান হাতটা এখন অত্যন্ত সতর্ক। লোকটা যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

চট করে মুখ ফেরাল লোকটা। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল। ঢ্যাঙা, রোগা লোকটার শরীরে তেমন শক্তি নেই। ময়লা পাজামা আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবির দু'তিন জায়গায় সেলাই-এর দাগ। সুদীপ একটু সাহস পেল, 'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'না, মানে, একটু দরকার ছিল।' লোকটার গলার স্বরে বেশ অসহায় ভাব।

'আপনি আমাকে চেনেন?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না, আমি তো এপাড়ায় থাকি না।'

'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

লোকটা মুখ নামাল। ঠিক কি উত্তর দেওয়া উচিত বুঝতে পারছিল না যেন। সুদীপ বুঝতে পারল গোয়েন্দা হিসেবে লোকটা খুব ঝানু নয়। ওর খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু কিভাবে লোকটাকে বেশ শায়েস্তা করা যায় বুঝতে পারছিল না। এই সময় আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে রে?'

সুদীপ তাকিয়ে দেখল সীতানাথ ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে। ভাল ক্রিকেট খেলে সীতানাথ, নিশ্চয়ই দৌড়াতে বেরিয়েছিল। ফাস্ট বোলার, বেশ রাগী। সুদীপ বলল, 'দ্যাখ না সীতানাথ, এই লোকটা কোন ধান্দা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বলল, 'না ভাই, আমার কোন ধান্দা নেই।'

সীতানাথ বেশ রুখু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?'

লোকটার ঠোঁট নড়ল, তারপর বলল, 'আমি একজনকে দেখতে এসেছি।'

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে দেখতে এসেছেন? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছেন?'

লোকটি মাথা নাড়ল দ্রুত, 'ঠিক রাস্তায় নয়। আসলে ওই ফ্ল্যাট বাড়িটায় ও আছে। বলেছিল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে আসবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

সুদীপ ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে তাকাল। সম্প্রতি কন্ট্রাক্টর জমি কিনে ফ্ল্যাট বানিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিক্রি করেছে। ওই ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে পাড়ার লোকের তেমন জানাশোনা হওয়ার সুযোগ নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওই ফ্ল্যাটেই গেলেন না কেন?'

'যাওয়া নিষেধ আছে। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'সুদীপ, একে ছাড়িস না। পাড়াতে বহুৎ দু'নম্বরী চলছে, এ শালার কি ধান্দা কে জানে! এই যে মশাই, বাংলা বলুন তো, ধান্দাটা কি?'

এই সময় ফ্ল্যাট বাড়ির শরীর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আটপৌরে পোশাক, সুন্দরী। তাকে দেখা মাত্র লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠল, 'আমি যাই, ও এসেছে।'

সীতানাথ বাধা দিল, 'দাঁড়ান। কে হন উনি আপনার? সাতসকালে পাড়ার মেয়ে বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন অথচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছেন!'

কথাটা শোনামাত্র হাসি পেল সুদীপের। এই মুহূর্তে সীতানাথকে বেশ পাড়ার গার্জেন বলে মনে হচ্ছে। পাড়ার মেয়ে বউরা সন্ধ্যেবেলায় ধ্যাষ্টামো করলে দোষ নেই, ভোরবেলায় সেটা দৃষ্টিকটু। মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল। তারপর দ্রুত পা ফেলে কাছে এল, 'কি হয়েছে বাবা?'

'কিছু না কিছু না। এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে এরা কারণ জানতে চাইছিলেন।'

'তুমি কেন সাতসকালে এখানে দাঁড়িয়ে থাক? তোমাকে রোজ আসতে নিষেধ করেছি না?'

'তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে খুকী।'

'এসো। ওদিকে হাঁটি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।' মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল।

লোকটি সুদীপদের দিকে তাকাল, 'আমার মেয়ে। বড়ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম। বরপণের টাকা পুরো মেটাতে পারিনি বলে আমার বাড়িতে আর পাঠায় না ওর স্বামী। শরীর খারাপ হয়েছিল বলে ডাক্তার মর্নিং ওয়াক করতে বলেছে। জামাই আবার সকালে বিছানা ছাড়তে পারে না। তাই আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি, মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। আমি যাব?'

সুদীপ হঠাৎ গলায় কোন স্বর পেল না। ও তাকিয়ে দেখল সীতানাথ হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করে দিল। লোকটার উদ্দেশ্যে ঘাড় নেড়ে সে হাঁটতে শুরু করল। নিজেকে খুব খারাপ লাগছিল। খামোকা মানুষটাকে সে সন্দেহ করল। এইভাবে সবসময় আতঙ্কিত থাকায় সব সরষের মধ্যে ভূত দেখার অভ্যেস হয়ে থাকে। তাকে হয়তো কেউ অনুসরণ করেনি, কেউ তার খোঁজ করেনি এই উদ্দেশ্যে অথচ সে সবসময় ছায়া দেখছে। ধরা যদি পড়তে হয় তাহলে একবারই পড়বে। এবং পড়ার আগে কিছু কাজ করে যাবে। সে আর একবার ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে তাকাল। মেয়েটার স্বামী এখনও ঘুমোচ্ছে। এ শালাকে শেষ করে দেওয়া উচিত। বরপণের জন্যে বউকে বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। সুদীপ মাথা নাড়ল। এরকম দেখলে দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এমন মানুষ পাওয়া যাবে যাদের মেরে ফেলতে হয় এখনই। আমরা বড় অপরাধগুলো দেখি, কিন্তু ছোট ছোট অপরাধগুলো জড়ো হয়ে যাওয়ায় বড় অপরাধগুলো শক্তি পায় প্রবল হতে। তাই সব পরিষ্কার করলেই দেশ নির্মল হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় না হলে সেটা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সেটা আবার অসম্ভব। অতএব সীমিত সুযোগে বড় বড় অপরাধগুলোকেই টার্গেট করতে হবে। তার প্রতিক্রিয়া যদি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

সুদীপের আর ঘুম পাচ্ছিল না। সে সহজভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্যারাডাইসের কথা চিন্তা করল। ঠিক কতজন লোক মারা গেছে ঠাওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আগুন লেগেছে মারাত্মক, এত দ্রুত বৈদ্যুতিক আগুন যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে তা ভাবতে পারেনি সুদীপ। এইভাবে কেউ আহত না হয়ে প্যারাডাইসের কোমর ভেঙে ফেলতে পেরে খুব ভাল লাগছে না। ওর মালিক যখন আর কোনদিনই

ফিরে আসবে না তখন ধরে নেওয়াই যায় প্যারাডাইস বন্ধ হল।

বাড়ির সামনে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। এখন অবনী তালুকদারের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনরকম ঝামেলা করার বাসনা নেই তার। অবনী তালুকদার যদি চেঁচামেচি করে কৈফিয়ত চায় তাহলে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে এড়িয়ে যেতে হবে। যে কদিন এখানে থাকতে হবে সে কদিন অশান্তি করে কি লাভ!

এইসময় কার্তিকদাকে দেখতে পেল সে। সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায় রাত্রে ঘুমায়নি। ওকে দেখে সামান্য নড়ল না পর্যন্ত। কার্তিকদার পেছনে বাড়ির সদর দরজা আধভেজানো। সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, এখানে বসে আছ কেন?'

কার্তিকদা নড়ল না। কিন্তু তার দুই চোখ জলে ভরে এল। সুদীপ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কার্তিকদা। তার শরীর কাঁপছে, দুটো হাতে মুখ ঢাকা। সুদীপ অবাক হয়ে বাড়িটা এবং কার্তিকদাকে দেখল। এবং তখনই কার্তিকদা কোনমতে বলতে পারল, 'মা নেই, মা চলে গেল।'

'কে চলে গেল?' সুদীপ হতভম্ব।

'মা। বাবু আমাকে বসিয়ে রেখেছে এখানে গাড়ি আসবে বলে।'

সুদীপের মাথাটা একপাশে সামান্য ঝুঁকল। ও যেন কথাটা বুঝতে চেষ্টা করল। মা নেই? মা মারা গেছে? এক লাফে কয়েকটা সিঁড়ি টপকেই সুদীপের খেয়ালে এল। হাতের ব্যাগ নিয়ে এইভাবে লাফালে উলটো বিপত্তি ঘটতে পারে। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল সে। নিচে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। আর তখনই অবনী তালুকদারকে দেখতে পেল। মায়ের ঘরের দরজার সামনে একটা বেতের চেয়ারে গালে হাত রেখে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি ভেতরের দিকে। সুদীপ যে উঠেছে তা তিনি খেয়ালই করলেন না। ব্যাগ দুটোকে টেবিলের ওপরে রেখে সুদীপ এগিয়ে গেল। এইবার ওকে দেখতে পেলেন অবনী তালুকদার। দেখে সোজা হয়ে বসতে বসতে আবার কি মনে করে আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন। বাবাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে মায়ের ঘরে পা বাড়াল। এবং তখনই ধূপের গন্ধ পেল। মা শুয়ে আছেন। তাঁর চিবুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।

'আর কাছে গিয়ে কি হবে! যে চুলোয় রাত কাটালে সেখানে থেকে গেলেই হত!'

সুদীপের চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু অবনী তালুকদারের কথার কোন জবাব দিল না। মায়ের মুখ কত পালটে গেছে। তার চেনা স্মৃতি, এমনকি জীবন্ত অবস্থায় শেষবার দেখা মানুষটির সঙ্গে এই মৃতদেহের কোন মিল নেই। যে চামড়াটুকু অবশিষ্ট আছে তা হাড়ের সঙ্গে লেপটে। এবং এখনই সেই বীভৎস পচা গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। মহিলা বেঁচে গেলেন। হঠাৎই এইরকম বোধ হল সুদীপের। সে মুখ তুলে নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন চলে গেছেন?'

'রাত তিনটের সময়।'

'যাওয়ার আগে জ্ঞান ছিল?'

'না।'

এইসময় সুদীপ পায়ের শব্দ পেল। অবনী তালুকদার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'কি জানতে চাইছ তুমি? না, তোমার সম্পর্কে কোন কথা জানতে চায়নি যাওয়ার আগে!'

'আপনি ছিলেন সে সময়?'

'থাকব না? সতীসাবিত্রী চলে যাচ্ছে সেই পবিত্র সময়ে থাকব না? আমি আজ লক্ষ্মীহীন হলাম। সে আমার লক্ষ্মী ছিল। ও হো!' শেষদিকে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল অবনী তালুকদারের।

সুদীপ আবিষ্কার করল, তার চোখে জল নেই, কান্না পাচ্ছে না মোটেই। অথচ এইরকম সময়ে মানুষেরা কান্নাকাটি করেই। নিজের মা চলে যাওয়ার পর তার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তানের কান্না তো স্বাভাবিকই। এইসময় অবনী তালুকদার বিছানার একপাশে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। সুদীপ নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। একটু আগে এসেছিলেন।'

সুদীপ বেরিয়ে যাচ্ছিল, অবনী তালুকদার ডাকলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'
'আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে।'
'কেন?'
'শ্মশানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না?'
'না। ও ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'
'তার মানে?'
'আমি হিন্দু সৎকার সমিতিকে ফোন করে দিয়েছি। ওরা গাড়ি নিয়ে আসছে।'
'পাড়ার মানুষ, আত্মীয়দের কেউ জানে না তো।'
'পরে জানবে। এখন দলে দলে লোক এসে নাচতে নাচতে শ্মশানে যাবে আর আমাকে ওদের গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়াতে হবে। এসব বাজে খরচ করার কোন দরকার নেই।'
'চমৎকার!'
'উঁহু, ব্যঙ্গ করে আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমি জানি কখন কি করতে হবে আমাকে।'
সুদীপ আর একবার মায়ের দিকে তাকাল। এখন ছাল ছাড়ানো পোড়া কাঠের মত লাগছে। সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে ব্যাগ দুটো নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। এবং তখনই সমস্ত শরীরে একটা ঝিমুনি ছড়িয়ে পড়ল তার। বিছানায় বসে সে দু'হাতে মুখ ঢাকল। তারপর চকিতে মনে পড়তেই তার পড়ার টেবিলের পেছনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকাল। ছোট্ট সুদীপ দু'হাতে মাকে জড়িয়ে হাসছে। মায়ের মুখে তখন স্বর্গীয় তৃপ্তি। কাছে উঠে এল সুদীপ। ও ঘরে যে শুয়ে আছে তার সঙ্গে এই শরীরের কোন মিল নেই। হাত বাড়িয়ে মায়ের ঠোঁটে আঙুল রাখল সে। এবং তখনই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে জলস্রোত ছিটকে এল। আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়ল সুদীপ!

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এগারো নম্বর ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল আনন্দ। কল্যাণ প্রথমে ভেবেছিল বাড়ি যাবে, পরে মত বদলালো। কলেজ রোর মুখের একটা চায়ের দোকান তখন খুলে গেছে। ওরা সেখানে চা খেল। তারপর ধীরে ধীরে হোস্টেলের দিকে পা বাড়াল। কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে আনন্দ বলল, 'এত ভোরে হোস্টেলে ঢোকা ঠিক হবে না। চল্, কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিই।'
'তুই আমাদের বাড়িতে যাবি?' কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল।
'তোর বাড়িতে!' আনন্দ কিছুটা অবাক। কল্যাণের বাড়ির গল্প তারা শুনেছে। কিন্তু কোনদিন যাওয়ার আমন্ত্রণ পায়নি। একটু আগে বাড়িতে ফিরবে বলে কল্যাণ নিজেই ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল।
'আমার বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই যে একটা রাত বাইরে কাটিয়ে এলাম তা নিয়ে বাবা ছাড়া কেউ কোন প্রশ্ন করবে না। উত্তর যা দিই তাই মেনে নেবে। ওই বাড়িতে আর ফিরব না বলেই বেরিয়েছিলাম। এক এক সময় মনে হয় কি জানিস, আমি যদি প্রচুর রোজগার করতে পারতাম, যদি বাড়ির কারও কোন অভাব রাখতাম না, তাহলে হয়তো মানুষগুলোর ব্যবহার পালটে যেত। কিন্তু আমার যা অবস্থা তাতে কোনদিন বড় চাকরি পাব কিনা তাই সন্দেহ ছিল। আর এখন—।'
'এখন?'
'তোকে কাল বলিনি, আমি একটা লোকের মাথা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলাম। এই আমি কোনদিন বোমা ছুঁড়তে পারব বলে ভেবেছিলাম? কিন্তু লোকটা তোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বলে স্থির থাকতে পারলাম না। পুলিশ যদি ধরতে পারে তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে, নারে?'
'আগে ধরুক তারপর চিন্তা করা যাবে। চল্ তোর বাড়িতেই যাই। এই ভোরে তোর সঙ্গে আমাকে হোস্টেলে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের গ্রামেই যখন ঘটনাটা ঘটেছে। তোর কাছে রেডিও আছে?'
'কেন?'
'সকালের খবর শুনব। কাগজে নিশ্চয়ই ছাপার সুযোগ পাবে না।'
'আমার ভাই-এর একটা ট্রানজিস্টার আছে।'

আবার ট্রামে চেপে ওরা শ্যামবাজারে চলে এল। বস্তি এলাকা বলেই সাতসকালে রাস্তায় বেশ লোকজন। ওরা নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকল। একজন মহিলা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলেন। কল্যাণ বলল, 'আমার বড় বউদি। আজ সাতসকালে কেন উঠেছে বুঝতে পারছি না।' একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক খালি গায়ে রকে বসেছিলেন, ওদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিলে সারারাত?'

'কাজ ছিল। এর সঙ্গে ছিলাম। আমার বন্ধু।'

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। নিজের ঘরে ঢুকে কল্যাণ বলল, 'আমার বাবা। এই ঘরে আমার ছোট ভাইও থাকে। মনে হচ্ছে গতরাত্রে তিনি ফেরেননি। চেয়ারটায় বোস্, আমি বিছানাটা পরিষ্কার করছি। মুখটুখ ধুবি নিশ্চয়ই! একটু দাঁড়া। হাওয়াটা কি রকম দেখে আসি।'

কিছুক্ষণ পরে কল্যাণের ভাই-এর ট্রানজিস্টারে বাংলা খবর শুনল ওরা। কিছু অসার খবরের পর সংবাদ পাঠক পড়লেন, 'গত রাত্রে ডায়মন্ডহারবার রোডের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যনিবাসের মালিকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। যাওয়ার আগে ডাকাতরা আগুন ধরিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত স্বাস্থ্যনিবাসটিকে ধ্বংস করার পেছনে ডাকাতদের কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ব্যাপক তল্লাসী চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজনকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত এটা কোনও উগ্রপন্থীদের কাজ নয়।'

আনন্দ বলল, 'দরজাটা বন্ধ কর, একটা লম্বা ঘুম দেব।'

॥ ১১ ॥

শ্মশান থেকে বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে ছিল সুদীপ। একটি মানুষ, যিনি তাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন, যাঁর সঙ্গে তার শৈশব, বাল্যকাল এবং কৈশোর কেটেছে তাঁকে বিদ্যুৎচুল্লীতে ঢুকিয়ে ছাই করে দিয়ে এসেও বুক ভেঙে পড়ছে না, চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। তার বদলে বারংবার মনে হচ্ছে, ভালই হল, খুব ভাল, তিনি তো এই চেয়েছিলেন। সুদীপ নিজেকে বুঝতে চাইছিল। সে কি নির্মম হয়ে গেছে খুব? স্নেহ-ভালবাসার সুতোগুলো কি পচে গেছে? মায়ের শরীরটা ছাই হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই কথাটা মাথায় পাক খাচ্ছিল।

কষ্টেরও কি একটা বয়স থাকে? যেই সেই সীমাটা পেরিয়ে যায় অমনি তার ধার-ভার সব লোপ পায়? যার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক, যার জন্যে জীবন দিয়ে দেওয়া যায় সে যখন অসুস্থ হয় তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে যে ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছেটাকে কেন সময় ঠুকরে ঠুকরে খায়? কখন যে ভালবাসা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তাই বোঝা যায় না বলেই গ্লানিবোধ বড় অনুভূত হয় না। সুদীপ এই নিয়ে আর ভাবতে পারছিল না। মাকে দাহ করে এসেও তার কান্না পাচ্ছিল না। মা নেই, কোনদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না এই ভাবনাটাও মাথায় আসছে না। তবে কি মানুষের মনের একটি অংশ একদম অসাড়? সম্পর্কগুলো যখন সেখানে এসে পৌঁছায় তখন এমনই হয়? এইসময় কার্তিকদা এসে জানাল তার ফোন এসেছে।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কথা বলতেও না। ঠিক শোক থেকে নয়, সব মিলিয়েই কিছুই ভাল লাগছিল না তার। সুদীপ বাইরে এসে ফোন ধরতেই জয়িতার গলা শুনতে পেল, 'ঘুমাচ্ছিলি?'

'না। কি ব্যাপার?'

'কিছু না। বাড়িতে কেউ নেই। মা এবং বাবা বলে যাদের ডেকে এসেছি এতকাল—তারা কলকাতার বাইরে। আমি কাল ছিলাম কি ছিলাম না তার খোঁজ নেবার কেউ নেই। তোর?'

'আমার মানে?'

'কিছু বলেছে কেউ?'

'আমি বলাবলির বাইরে।'

'রেডিও শুনেছিস?'

'না, কেন?'

'খবরে বলল—ওরা কি করে খবর বানায় আজ বুঝতে পারলাম। হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তবে আমরা যা চেয়েছি তাই হয়েছে।'

হঠাৎ সচকিত হল সুদীপ, 'ইটস অলরাইট। সামনাসামনি দেখা হলে এ ব্যাপারে কথা বলব।'

'তোর মাথায় ওষুধ দিয়েছিস?'

'ভুলে গিয়েছিলাম। ছাড়ছি।'

'ভুলে গিয়েছিলাম! মানে? ডোন্ট টেক রিস্ক সুদীপ। এখনই ওষুধ লাগা।'

'সময় পাইনি রে। বাড়িতে এসে দেখলাম মা মারা গেছেন। এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরছি আমরা। রাখছি, বিকেলে দেখা হবে।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুদীপ।

হলঘরটায় কেউ নেই। এই ভরদুপুরে কোন শব্দও নেই। সুদীপের খিদেও পাচ্ছিল না। এখন ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান এবং তারপর লম্বা ঘুম একমাত্র কাম্য। অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে তাকাল সে। মায়ের শরীর বলে যা অবশিষ্ট ছিল তা চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়ামাত্র ভদ্রলোক হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। অসুস্থ অবস্থায় শ্মশান নিশ্চয় বড় ভীতিকর জায়গা। তড়িঘড়ি গাড়িতে চেপে বসেছিলেন কার্তিকদাকে ভর দিয়ে। বড় দায় চুকে গেল ওঁর। এখন ফ্রি ম্যান। কিন্তু এই বয়সে এত বড় বাড়ি, প্রচুর টাকা (আয়কর বিভাগ তছনছ করার পরও), ভদ্রলোক বোধহয় কখনই একা বোধ করবেন না। টেবিলের পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে আজকের কাগজটা তুলল সে। না, কোথাও নতুন খবর নেই। ভারতবর্ষে রোজ যা হয়ে থাকে তাই ছাপা হয়েছে পাতায়। সেই কংগ্রেসের ঝগড়া, সি পি এমের হুঙ্কার, রেগনের বিবৃতি, রাজীবের প্রশস্তি। একবছর আগের কাগজটা যদি হুবহু ছেপে আজ বের করা হত তাহলে কোন প্রভেদ বুঝতে পারত না কেউ। জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন রাজীব। তার নিচেই সংবাদদাতা লিখেছেন কোন একটা কেন্দ্রীয় অফিসের সদর দপ্তর কি বিহারে উঠে যাবে কলকাতা ছেড়ে। যেন বিহার আর একটা দেশ! দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছোট্ট একটি সংবাদ আছে। নকশালপন্থী সন্দেহে চারজন যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে জনসাধারণ। পরে পুলিশ আরও দুজনকে গুলি করে মেরেছে। ঠোঁট কামড়াল সুদীপ। ঘেয়ো কুকুর, কুখ্যাত ডাকাত, নারীধর্ষণকারী লম্পট আর নকশালদের মধ্যে যেন কোন ফারাক নেই—এমন ভাব সংবাদদাতার। আনন্দ এই দেশের মানুষের মনে বিবেকবোধ জাগাতে চায়, তাদের প্রতিবাদ করার রাস্তাটা চিনিয়ে দিতে চায়। কাদের? যেসব ছেলেমেয়েরা একাত্তরে গুলি খেয়ে মরেছিল একটার পর একটা ভুল করে তাদের ভূমিকা ছিল তো দধীচির। কিন্তু এখনও এতবছর পরে গ্রামেগঞ্জে যারা তাদেরই অনুপ্রেরণায় কাজ করছে তারা তো মূর্তি ভাঙছে না, জোতদারের গলা কাটছে না! তাহলে তাদের ডাকাত ভাবার কি কারণ আছে? কেন তারা গ্রামবাসীর সহানুভূতি পাচ্ছে না? খবরের কাগজগুলোর ভূমিকা না হয় বোঝা গেল! সুদীপ চোখ বন্ধ করল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ডায়মন্ডহারবার রোডে পুলিশ গিজগিজ করছে, রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করছে। আগামীকালের কাগজে যখন খবরটা বেরুবে তখন জনসাধারণের কি প্রতিক্রিয়া হবে?

এইসময় নার্স ভদ্রমহিলাকে অবনী তালুকদারের ঘর থেকে বের হতে দেখল সে। ওঁর হাতে কাঁচের জাগ, তাতে জলের তলানি। চোখাচোখি হতেই ভদ্রমহিলা ঘাড় কাত করে হাসলেন। সুদীপ অবাক হল। মা চলে যাওয়ার পরও ভদ্রমহিলার ছুটি হয়নি? সে দেখল নার্স তার দিকে এগিয়ে আসছেন, 'উনি ভাল আছেন।'

'কে?' সুদীপের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'আপনার বাবা। ডাক্তার এসেছিলেন। শক থেকে হয়েছে, রেস্ট নিতে বলেছেন।'

'ও।'

'আমি ভেবেছিলাম আজ চলে যাব। কিন্তু আপনার বাবা আরও কিছুদিন থেকে যেতে বললেন। বয়স্ক মানুষ, আর এই সময়—!' তারপর মুখ ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা, 'কার্তিক, কার্তিক' বলতে বলতে আড়ালে চলে গেলেন।

সুদীপের এবার মজা লাগছিল। মা যতদিন বিছানায় শুয়েছিলেন ততদিন এরকম সক্রিয় ছিলেন না

মহিলা। যেন হঠাৎ কর্তৃত্ব পেয়ে গেছেন এমন উজ্জ্বল হয়ে গেছে চোখমুখ।

একটু পরেই কার্তিকদা সামনে এসে দাঁড়াল, 'চা খাবে?'

'একটু পরে, স্নান করে নিই।'

'হবিষ্যি করবে কখন?'

'হবিষ্যি?'

'এখন তো তোমাকে তাই খেতে হবে কাজ না হওয়া পর্যন্ত।'

'কেন?'

'তাই নিয়ম, হিন্দুদের তাই করতে হয়।'

'আমি যা খাই তাই খাব।'

'কি বলছ তুমি?'

'তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না কার্তিকদা। মা চলে গিয়ে যে ভাল হয়েছে তা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। আর ভাল আমাদেরও। যে মানুষটার থাকাটাই আমরা চাইছিলাম না তাঁর চলে যাওয়ার জন্যে লোক দেখিয়ে শোক করতে হবে কেন? আমি ওসব করলে মা মোটেই সুখী হতেন না। কারণ তিনি মরে যেতে চাইতেন। তাছাড়া এতকাল হিন্দুধর্মের কোন কিছু মানলাম না, ধর্ম ছাড়াই তো বেশ বেঁচে আছি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না, তখন আজ ধর্মের চোখ রাঙানো মানবো কেন! ওসব তুমি তোমার বাবুকে করতে বল। ভণ্ডামিটা উনি ভালই জানেন।' একটানা কথাগুলো সে কার্তিকদাকে বলল না নিজেকে শোনাল তা তার কাছেই স্পষ্ট নয়।

ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে উদোম হয়ে বাথরুমে ঢুকল সে। শাওয়ারটা খুলে দিয়ে দেওয়াল আয়নার দিকে তাকাল। তার স্বাস্থ্য সুগঠিত, কোথাও মেদ নেই, মুক্ত শরীর থেকে একধরনের ভিজে আভা বের হচ্ছে। বৃষ্টির ধারার মতো জলের ফোঁটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে নরম আদরের মতো। কিছুক্ষণ নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল সুদীপ। গতরাত্রে কি সহজে এই লোকটা মানুষ খুন করে ফেলল! কোনরকম প্র্যাকটিস ছাড়াই খুন করতে একটুও হাত কাঁপেনি। নিজেকে খুনী মনে হচ্ছে কি? নিজের ঠোঁটেই এক রহস্যময় হাসি দেখল সে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সুদীপ তা সে জানে না, কিন্তু এমন মড়ার মত ঘুম অনেকদিন ঘুমায়নি। চোখ মেলে সে দেখল ঘরে ঘন ছায়া এবং প্রচণ্ড খিদে শরীরে। পাঞ্জাবিটা শরীরে গলিয়ে সে ব্যাগ দুটোর দিকে তাকাল। এখনও ওদুটো ভারতীয় পুলিশের কাছে আতঙ্কের বিষয়। ধরা পড়লে চূড়ান্ত ঝামেলায় ফেলতে অসুবিধে হবে না। এগুলোকে বাড়িতে রাখা উচিত নয় কিন্তু রাখার তো তেমন জায়গাও নেই। কার্তিকদাকে ডাকার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েই সে দেখল অবনী তালুকদার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে নার্স কিছু কথা বলছেন। অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে আসতে সমর্থ হয়েছেন। সুদীপের সন্দেহ ছিল, এখন আরও সত্য বলে মনে হল, শরীরের বাহানা দেখিয়ে অবনী তালুকদার শ্মশান থেকে কেটে পড়েছেন। সে চিৎকার করে কার্তিকদাকে ডাকতেই অবনী তালুকদার মুখ ফেরালেন।

'সুদীপ! এদিকে এসো।' গলার স্বরে নখ আঁচড়ানোর শব্দ পেল সুদীপ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ। নইলে তোমায় ডাকব কেন!'

সুদীপ কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মায়ের ঘরের দরজাটা দেখতে পেল। অবনী তালুকদার সেই শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। আপাদমস্তক সময় নিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তুমি মাতৃদায়গ্রস্ত।'

'না, আমি মাতৃদায়মুক্ত। অবশ্য যেভাবে মা ছিলেন তাকে যদি দায় বলে মনে করা যায়।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

'কিছু না। আপনিই বোধহয় কিছু বলবেন বলে আমায় ডেকেছিলেন।'

অবনী তালুকদার ছেলের মুখের দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'তোমার মা আমার কতখানি ছিল তা তুমি জানো না। অমন সতী স্ত্রী আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের

সব অসুখ তিনি একাই ভোগ করে গেলেন। আমি তাঁর মৃত্যু নিয়ে হইচই করতে চাইনি। পাঁচভূতে এসে চুক চুক করে সহানুভূতি জানাবার নাম করে লুটেপুটে খাবে এটা তোমার মা পছন্দ করত না। কিন্তু পুত্র হিসেবে তোমার কর্তব্য আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যা যা করণীয় বলে স্থির করা আছে তাই কর।'

সুদীপ ঘাড় নাড়ল, 'মা বেঁচে থাকতে যখন কোনও কর্তব্যই আমি করতে পারিনি তখন—।'

'কোন্ কর্তব্য করতে পারনি?'

'চোখের সামনে উনি আপনার ব্যবহারে যন্ত্রণা পাচ্ছেন দেখেও আমি তাকে সেটা পেতে দিয়েছিলাম।'

'সুদীপ!'

'চিৎকার করে কথা বলবেন না। এখনও আপনার নার্সের প্রয়োজন হচ্ছে।'

'তুমি, তুমি আমাকে অপমান করছ!' সোজা হয়ে উঠে বসলেন অবনী তালুকদার।

সঙ্গে সঙ্গে নার্স ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হবেন না, আপনার এখন রেস্ট প্রয়োজন।'

একটা হাত নেড়ে মাছি তাড়ালেন অবনী তালুকদার, 'ছাড়ো তো তোমার রেস্ট। এমন কুলাঙ্গার পুত্রের মুখদর্শন করাও পাপ। শোন, এই বাড়িতে থাকতে হলে তোমাকে অশৌচ পালন করতে হবেই। শ্রাদ্ধটা তুমি না-হয় কালীঘাটে গিয়ে করে আসতে পার কিন্তু আজ থেকে হবিষ্যি খাও গলায় কাছা নাও। দিস ইজ মাই অর্ডার।'

'পারলাম না।'

'মানে?'

'আপনাকে খুশী করতে পারলাম না।'

'আচ্ছা! দেন গেট আউট! আমি জানব আমার স্ত্রী স্বর্গে গেছেন, আমার পুত্র মারা গেছে। আমি এখন থেকে একাই থাকব, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।' তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি এবার রেস্ট নেব, বুঝলে? আমার একটু ঘুম দরকার।' অবনী তালুকদার ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে যেন টলে গেলেন, হাত বাড়িয়ে নার্সের কাঁধ আঁকড়ে ব্যালেন্স রাখলেন। মহিলা পরমযত্নে অবনী তালুকদারকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

সুদীপ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কার্তিকদা বোধহয় অবনী তালুকদারের জন্যেই এতক্ষণ সামনে আসতে সাহস পাচ্ছিল না, এবার এগিয়ে এল, 'ডাকছ?'

'না, থাক। যে জন্যে ডাকছিলাম তার আর দরকার নেই।'

'শোন, বাবুর ওপর রাগ করো না। তুমি তো ওঁকে জানো। সারাদিন কিছু খাওনি, একটু সরবৎ আর মিষ্টি এনে দিই। আর তোমাকেও বাপু আমি বুঝতে পারছি না। মা মারা গেলে সন্তান কাছা নেবে না?'

'আমার মা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন কার্তিকদা, আজ দাহ করা হল তাঁকে। আমি নিজের মন থেকে যা সাড়া পাচ্ছি না তা করতে পারব না। তোমাকে আর সরবৎ আনতে হবে না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যেতেই হত, ওই ভদ্রলোক যাওয়াটা সহজ করে দিলেন।' সুদীপ টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল।

কার্তিকদা ছুটে এল, 'চলে যাচ্ছ মানে?'

ঘুরে দাঁড়াল সুদীপ, 'আমি আর এই বাড়িতে থাকছি না। তুমি তোমার বাবুকে হবিষ্যি করতে বল।'

'বাবুর শরীর খারাপ, ডাক্তার পথ্য ঠিক করে দিয়েছেন।'

সুদীপ হেসে ফেলল। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে নাম্বার ঘোরাতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল কার্তিকদা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। পায়ের শব্দে তার চলে যাওয়াটা টের পেল সে। তিনবার ডায়াল করেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুদীপ। কলকাতার টেলিফোন সিস্টেমটাকে নতুন করে ঢেলে না সাজালে জনসাধারণের উপকারে লাগবে না কখনই। ঠিক এইসময় নিচে বেল বাজল। সুদীপ নিজের ঘরে ফিরে এল।

চটপট ব্যাগ দুটোয় জিনিসপত্র পুরে নিল আবার। তার কাছে এখনও যা টাকা আছে সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু অবনী তালুকদারের ওই কথার পর আর এই বাড়িতে থাকা উচিত নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বোলাতে গিয়ে সে ছায়া দেখল। চমকে ফিরে সে দরজায় জয়িতাকে দেখতে পেল। জয়িতার মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি উদ্বিগ্ন। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কখন হল?'

'কাল রাত্রে। সকালেই দাহ হয়ে গেছে।'

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় বসে মুখ নামাল।

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হল?'

'মানে?'

'তুই অমন শোক-শোক মুখ করে বসে পড়লি কেন?'

'তোর কষ্ট হচ্ছে না সুদীপ?'

'আমি জানি না।' সুদীপ পলকেই ঘুরে চুল আঁচড়ানো শেষ করল, 'হঠাৎ এলি?'

'খবরটা শুনে মনে হল আমার আসা উচিত। তোর মায়ের সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার কথা বলেছিলাম, মনে আছে? সেদিন তোকে বলেছিলাম আমার মা যদি এরকম হত!' জয়িতা হঠাৎ কেঁদে ফেলল। এই কান্নাটার জন্যে ও মোটেই তৈরি ছিল না। এমন আচমকা শরীর কাঁপিয়ে জল ঢেউ হয়ে নামবে চোখে তা কে জানত।

সুদীপ ঠোঁট কামড়াল, 'স্টপ ইট জয়, আই ডোন্ট নিড ইট।'

'তোর কষ্ট হচ্ছে না?'

'না। আমি কাঁদব না, আমি কোন নিয়ম মানব না। যে মানুষটার জন্যে জীবিত অবস্থায় কিছু করতে পারিনি তার মৃত শরীরটার কথা ভেবে চোখে জল ফেলাটা একধরনের হিপোক্রেসি। লেটাস গো। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। ওদের একটা খবর দেওয়া যাবে।' সুদীপ ব্যাগ দুটো তুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছিস?' পুরো ব্যাপারটা সহজে নিতে পারছিল না জয়িতা।

'এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। তুই বোস্ আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।' বড় বড় পা ফেলে হলঘরে চলে এল সে। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরের মেঝেতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। একটা তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে ধূপ থেকে। মায়ের জিনিসপত্রগুলো চোখে পড়ল না। ধীরে ধীরে আলমারিটার কাছে এগিয়ে গেল সে। হাতলটা ঘোরাতেই সেটা আটকে গেল। চাবি দেওয়া আছে। চাবিটা এতকাল মায়ের কাছে ছিল।'

মায়ের ঘর থেকে সোজা অবনী তালুকদারের দরজায় চলে এল সুদীপ। অবনী তালুকদার শুয়ে আছেন। আর তার মাথার পাশে বসে নার্স রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে শোনাচ্ছেন। ওকে দেখতে পেয়ে ভদ্রমহিলা পড়া থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তাতে মনোযোগ নষ্ট হল অবনী তালুকদারের। চোখ খুলে তিনি পুত্রকে দেখতে পেলেন। সুদীপ বলল, 'চাবিটা দিন।'

'চাবি? কিসের চাবি?'

'মায়ের আলমারির।'

'সে চাবি নিয়ে তোমার কি হবে?'

'আমার জন্যে কিছু জিনিস মা রেখে ছিলেন। যাওয়ার সময় সেগুলো নিয়ে যাব।'

'কোন জিনিস তোমার জন্যে তোমার মা রাখেননি।'

'ঠিক বলছেন না। বিয়ের সময় তিনি বাপেরবাড়ি থেকে যা এনেছিলেন সেটাই আমার জন্যে রাখা ছিল। আপনার দেওয়া কোন সম্পদ আমি নিতে আসিনি।'

'বাপেরবাড়ি থেকে এনেছিলেন?' নাক দিয়ে শব্দ বের করলেন অবনী তালুকদার, 'তারা যে কত দেবার ক্ষমতা রাখতেন তা তোমার মা ভাল জানতেন। কিছু হবে না। কোন জিনিস তুমি এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম তার মধ্যেই ব্যবস্থা করো।'

'অত কষ্ট দেব না আপনাকে। আমি আজই চলে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে মায়ের আলমারির চাবিটা আমি চাই। উনি সব গয়না আলাদা করে তার উপর লিখে রেখেছিলেন কাকে কি দেবেন। যদি আমার

নামে কিছু লেখা না থাকে তাহলে আমি আপনার কথা মেনে নেব।'
'তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ?'
'না, ভদ্রভাবে অনুরোধ করছি।'
'যে মায়ের কাজ করতে চাইছ না তার গয়না চাইতে লজ্জা করছে না?'
'না। আমি কোনও অন্যায় করছি না। চাবিটা দিন।'
'গয়নাগুলো আমার কাছে নেই।'
'কোথায় আছে সেগুলো?'
'এখনও ইনকামট্যাক্সেই জমা আছে। কেস চলছে।'
'এতদিন ধরে ওরা আটকে রাখবে কেন? ওগুলো তো বেআইনী গয়না নয়।'
'কোন প্রমাণ নেই যে তোমার মা বাপেরবাড়ি থেকে পেয়েছিল। আমাকে তো কোনদিন দেখতে দেয়নি তাই আমার রিটার্নে ডিক্লেয়ার করাও ছিল না। আর এইসব কৈফিয়ত তোমাকে আমি দিচ্ছি কেন!'
'কোন্ অফিসে আপনার ইনকামট্যাক্স হয়?'
'কেন?'
'আমি সেখানে গিয়ে খোঁজ নেব।'
'সার্চ অ্যান্ড সিজার কেস হয় যেখানে সেখানে আমার নাম বললেই জানতে পারবে। মামারবাড়ি, উনি গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইনকামট্যাক্স ওঁকে সব খুলে দেখাবেন!'
'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি খোঁজ নেব। যদি ওরা অন্য কথা বলে তাহলে আমার কোন কাজের জন্যে আমি দায়ী থাকব না। আমি আমার মায়ের নিজস্ব গয়নাগুলো চাই।'
'কি করবে নিয়ে?'
'আর যাই করি আপনার মত যক্ষ হয়ে বসে থাকব না।'
সুদীপ আর কথা না বলে বেরিয়ে এল। জয়িতা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাগ দুটো তুলে সুদীপ বলল, 'চল্।'
জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'
'বাইরে বেরিয়ে বলব, এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।'
তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সুদীপ। জয়িতা দেখল নিচের দরজায় দাঁড়িয়ে কার্তিকদা জিজ্ঞাসা করল, 'কবে আসবে?' সুদীপ কোন জবাব দিল না।
রাস্তায় নেমে সুদীপ যেন আচমকাই সহজ হয়ে গেল। জয়িতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। কাল রাত্রে আনন্দর বাড়ির পর আর খাইনি। চল্, ওখানে একটা চাইনিজ দোকান আছে, পেটপুরে চাউমিন খাই।'
'আমার খিদে পায়নি।'
'তোকে খেতে বলিনি আমি।' বলেই মতটা পালটাল সুদীপ, 'নাঃ, এখন বেশি খরচ করা উচিত হবে না। এখানে আয়।' ফুটপাতের ওপর একটা দোকানে খাবার বিক্রি হচ্ছে। মাঝারি ভিড় আছে সেখানে। একটা বেঞ্চির কিছুটা জায়গা দখল করে সুদীপ জয়িতাকে বসতে ইশারা করে চারটে পরোটা আলুরদম আর দুটো চা দিতে বলল চেঁচিয়ে। জয়িতা লক্ষ্য করল যারা এখানে খাচ্ছে তাদের অধিকাংশই বিহারের মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণীর। তারা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্যান্ট পরা কোন মেয়ে এইরকম পাড়ায় ফুটের দোকানে খেতে আসতে পারে এমনটা বোধহয় ওদের কল্পনার বাইরে ছিল। সে একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। সুদীপ ইচ্ছে করেই এখানে খাচ্ছে, চোখে লাগাবার জন্যেই, কিন্তু এই নিয়ে রসিকতা করার লোভটা সে সংবরণ করল।
খুব আরাম করে পরোটাগুলো খেল সুদীপ। তারপর চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বলল, 'কলকাতার ধুলোয় দারুণ একটা মশলা আছে বুঝলি, তরকারির টেস্টই পালটে দেয়। আগে ভাবতাম এইসব খাবার খেলে পেট খারাপ করবে। ফোট্। যারা খায় না তাদের জন্যে আমার করুণা হয়। সারাজীবন পিটপিটিয়ে কাটাল তারা।'

চায়ের কাপ দেখেই অস্বস্তি হয়েছিল, সুতোর মত ফাটা দাগ ওপর থেকে নিচে নেমে গেছে। চুমুক দিয়েই শরীর গুলিয়ে গেল জয়িতার। এমন অখাদ্য চা সে কখনও খায়নি। বিটকেল গন্ধ বের হচ্ছে। সে কাপটা নামিয়ে রেখে আড়চোখে সুদীপকে দেখল। দুবার চুমুক দিয়েছে সুদীপ। এবার নামিয়ে রেখে হেসে ফেলল সে, 'বুঝলি জয়, সময় লাগবে, রাতারাতি তো এসবে অভ্যস্ত হওয়া যায় না।' তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে, 'তুই তখন জিজ্ঞাসা করছিলি মায়ের মৃত্যুতে আমি কেন শোকগ্রস্ত নই, কেন বাড়ি থেকে চলে এসেছি—এইসব। ব্যাপারটা হল—।'

'সুদীপ প্লিজ!' তাকে থামিয়ে দিল জয়িতা, 'আমি আর কারণগুলো জানতে চাইছি না। তুই নিশ্চয়ই ভাল মনে করায় করেছিস। তোর নিজের কাছে যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে আর কিছু বলার নেই। অতএব এই প্রসঙ্গ থাক। এখন বল্, তুই কোথায় থাকবি?'

অবাক হয়ে জয়িতার দিকে তাকাল সুদীপ। জয়িতা যে এমন দ্রুত নিজেকে পালটাতে পারে তা সে জানত না। ক'দিনের মধ্যেই মেয়েটা যেন গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে। জয়িতা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁ করে কি দেখছিস?'

'কিছু না। আমি কোথায় থাকব ঠিক করে বের হইনি। ভাবছি আনন্দর হোস্টেলে চলে যাব। ওদের ওখানে গেস্ট হয়ে কিছুদিন থাকা যায়!' সুদীপ পয়সা মিটিয়ে দিল।

'আমার মনে হয় ওখানে তোর না থাকাটাই উচিত হবে।'

'কেন?'

'তোর আর আনন্দর একসঙ্গে থাকা উচিত নয় তাই।'

সুদীপ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর নীরবে মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছিস। আমি অবশ্য আর এক জায়গায় যেতে পারি কিন্তু ওখানে গেলে দিনের বেলায় রোজ বের হওয়া যাবে না।'

'কোথায়?'

'আমার সেই বৃদ্ধা আত্মীয়ার ওখানে।'

ওরা হাঁটছিল। বিকেল এখন ঘন। যে কোন মুহূর্তেই টুক করে সন্ধ্যে নেমে পড়বে। ঘড়ি দেখল জয়িতা। তারপর হাত নেড়ে একটা ট্যাকসি দাঁড় করাল। সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই জয়িতা বলল, 'আনন্দ আর কল্যাণ বোধহয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। ওদের ওখানে চল্, তারপর একটা সিদ্ধান্ত নেব।'

সুদীপ ব্যাগ দুটো দেখাল, 'এইগুলো নিয়ে কলেজ স্ট্রীটে যাব?'

'সেই জন্যেই তো ট্যাকসি নিলাম। তুই ট্যাকসিতে বসে থাকবি, আমি ওদের ডেকে আনব।'

সংস্কৃত কলেজের সামনে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল জয়িতা। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। জয়িতা ওপরে উঠে এল। এবং তখনই দুপ করে আলো নিবে গেল এই তল্লাটের। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল কফি হাউসে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেন এক লক্ষ শেয়াল হায়েনা ডেকে উঠল। বিরাট হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খুব অসহায় চোখে তাকাল জয়িতা। তার সামনে প্রচুর মানুষ অথচ সে কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বিকট গলা করছে এক একজন। এই দঙ্গলের মধ্যে কোথাও আনন্দ এবং কল্যাণ আছে। কিন্তু সামান্য আলো না থাকলে ওদের খুঁজে বের করা মুশকিল। কখনও কখনও মানুষ কিরকম অচেনা হয়ে যায়! এইসময় বেয়ারারা মোমবাতি জ্বালাতে শুরু করল। জয়িতা চিৎকার করে আনন্দর নাম ধরে ডাকল। যতটা সম্ভব গলা তুলে সেই আওয়াজটা ছুঁড়তেই কফিহাউসের সমস্ত শব্দ আচমকা থেমে গেল। বিস্ময়ে প্রত্যেকেই ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে। এবং তার মধ্যেই কেউ ঝটপট বলে উঠল, 'কোথায় তুমি চণ্ডালিকা, জল দেবে নাকি?'

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। মুখটা দেখতে পেলে সে চড় মারতো। এবং তখনই সে কনুই-এ একটা হাতের স্পর্শ এবং টান অনুভব করল। হলের বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'তোদের দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

'আশ্চর্য! তাই বলে চেঁচাবি? আফটার অল তুই একটা মেয়ে।' কথাগুলো বলল কল্যাণ।

'ও! কোন ছেলে চেঁচালে দোষ হত না, না? আই ডোন্ট থিংক—।'

'ঠিক আছে।' আনন্দ থামিয়ে দিল, 'দেরি করলি কেন?'

একটু আগে অন্ধকার থেকে উড়ে আসা মন্তব্য আর কল্যাণের কথাটা সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়েছিল জয়িতার। সেটা সামলাবার জন্যেই সে কল্যাণকে বলল, 'কল্যাণ, একটু চোখ খুলে তাকা। পাতি বাঙালির মত ভ্যানভেনে কথা বলা বন্ধ কর। নিচে ট্যাকসিতে সুদীপ বসে আছে আনন্দ।'

'ট্যাকসিতে বসে আছে কেন?' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'ওর সঙ্গে জিনিস আছে। তাছাড়া ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আজ সকালে ওর মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ও কথা বলতে চাইছিল না। বোধহয় বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। যাই হোক, তোরা নিচে আয়।' জয়িতা কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না।

ওরা ট্যাকসিতে উঠে এল, সুদীপ ড্রাইভারকে ধর্মতলার দিকে যেতে বলল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন খবর আছে?'

'না। আমি এগারোটা নাগাদ হোস্টেলে ফিরেছি। সকালটা কল্যাণদের বাড়িতে ছিলাম। এসে শুনলাম সুরথদা আমার খোঁজ করতে এসেছিল দশটা নাগাদ। গ্রাম থেকেও কোন খবর আসেনি। তুই কোথায় থাকবি?'

'জানি না। তোর হোস্টেলে থাকব ভেবেছিলাম কিন্তু পরে সেটা বাতিল করলাম। আমি ঠাকুরপুকুরেও যেতে পারি কিন্তু সেখানে গেলে দিনের বেলায় বেশি বের হওয়া চলবে না।'

'তোর আর বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়?'

'না।'

'অন্তত আজই ঠাকুরপুকুরে যাওয়া উচিত হবে না। ওদিকটায় নিশ্চয়ই পুলিস নজর রাখছে। ব্যাপারটা থিতিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।'

জয়িতা বলল, 'আমাদের আর একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত। ট্যাকসিতে এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।'

সুদীপ বলল, 'সর্দারজীরা বুঝবে না।'

জয়িতা বলল, 'উই শুড নট টেক রিস্ক।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে বাবা। তোর সব কিছুতেই বেশি বেশি!' সুদীপ মাথায় হাত বোলালো, 'ব্যাপারটা থিতিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের দ্বিতীয় কাজটা করে ফেলা দরকার। তাহলে পুলিশ পাজ্‌ল্ড হয়ে যাবে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, এখন নয়। আমি আমাদের প্ল্যান মত না এগোবার কোন কারণ দেখছি না। ব্যক্তিগত ঝামেলা এইসময় এড়িয়ে গেলেই পারতিস সুদীপ।'

'আমি যে কটা ব্যাপারে কখনও আপোস করতে পারব না সেটা নিয়ে কেন কথা বলছিস! ব্যক্তিখুনে যদি আমি বিশ্বাসী হতাম তাহলে ওই লোকটাকে আগে খুন করতাম আমি। আমার মায়ের আটটা সোনার সাপ ছিল। মোট ওজন কত আমি জানি না। বাবা বলছে ইনকামট্যাক্স ওগুলো নিয়ে গেছে। সেটা সত্যি কিনা জানবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।' খুব জেদী দেখাচ্ছিল সুদীপকে।

আনন্দ বলল, 'মাথা গরম করিস না। আগামীকাল আমার সঙ্গে একটা লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যদি সব ঠিক থাকে তাহলে যা পাওয়া যাবে তা এনাফ।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা কত লাগবে?'

'এমাউন্টটা জানি না।'

জয়িতা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এবার বলল, 'সুদীপ আজ আমাদের ফ্ল্যাটে থাকুক। আমার মা নেই এখানে, বাবা নাও ফিরতে পারেন। আর ফিরলেও আমি ম্যানেজ করতে পারব।'

আনন্দ বলল, 'খুব ভাল। তাহলে সুদীপ তুই আজ ওখানেই থাক। আমি কাল সকালে তোদের ফোনে বলব কি করতে হবে। এখানেই নামিয়ে দে আমাদের।'

ওয়েলিংটনের মোড়ে ওরা ট্যাকসি থেকে নামল। সুদীপ মুখ বাড়িয়ে বলল, 'টাকার জন্যে চিন্তা করিস না। ওই ভারটা এবার আমি নিচ্ছি।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবে নিবি?'

ঠোঁট টিপে দুটো গাল ফুলিয়ে হাসল সুদীপ, 'আর চক্ষুলজ্জা নয়। কিন্তু তুই তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস, গোলমাল হবে না তো?'

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, 'সিগারেট দে একটা।'

রামানন্দ রায় আজও ফিরলেন না। খাওয়া দাওয়া করে গেস্টরুমে শুয়ে পড়েছিল সুদীপ। ওর আজ খুব ঘুম পাচ্ছিল। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল জয়িতা। এই প্রথম সে কোন বন্ধুকে বাড়িতে রাত কাটাতে বলল। সীতা রায় জানলে কি রকম নাটক হবে? ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সুদীপের মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা আছে। ওরা দুজনে দুজনের পেছনে প্রায়ই লাগে, কিন্তু আজ এই বাড়িতে আসার পর কেমন শান্ত হয়ে গেল। জয়িতা আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গেস্টরুমের দরজার সামনে এসে সে থমকে গেল। চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে অন্ধকার ঘর থেকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুদীপ। জয়িতা পা টিপে টিপে ফিরে এল নিজের ঘরে।

॥ ১২ ॥

ঘুম ভাঙল একটু বেলা করে। জয়িতা তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে চারপাশে তাকাল। এবং তখনই মনে পড়ল সুদীপের কথা। সুদীপ এই বাড়িতে কাল রাত্রে ছিল। সুদীপের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে আসার সময় তাকে টেলিফোনটা ধরতে হয়েছিল। রামানন্দ রায় ফোন করেছিলেন। রাতের ট্রেন ধরে ভোরে কলকাতায় পৌঁছাবেন জানিয়েছিলেন। নিজের অজান্তেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল। রাতটুকু নিশ্চিন্তে কাটবে। যদি প্রয়োজন হয় কাল ভোরেই সুদীপকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যাবে। এইরকম একটা ভাবনা মাথায় এসেছিল। যে ছেলে দুমদাম কথা বলে, কাউকে কেয়ার করে না, মা মারা গেলেও যে সহজভাবে নেয় তাকেই মাঝরাত্রে একা কাঁদতে হয় যখন তখন খুব স্বাভাবিক লাগে। সুদীপ না কাঁদলে যে জয়িতার অস্বস্তি থেকে যেত। এই নিয়ে কোন কথা ওর সঙ্গে বলা যাবে না, বলা উচিত হবে না।

জয়িতা মুখচোখে জল দিয়ে হাউসকোট পরেই ঘরের বাইরে চলে এল। এবং তখনই রামানন্দ রায়কে দেখতে পেল। সোফায় বসে রামানন্দ সিগারেট খাচ্ছেন। রাত্রি জাগরণের ছাপ চোখমুখে। এখনও বাইরের পোশাক ছাড়েননি। পায়ের আওয়াজ শুনে রামানন্দ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। জয়িতা হাসবার চেষ্টা করল, 'গুড মর্নিং।'

রামানন্দ নীরবে মাথা নাড়লেন। জয়িতা কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, 'কখন ফিরলে?'

রামানন্দ আবার মেয়ের দিকে তাকালেন পূর্ণদৃষ্টিতে, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই তো।'

জয়িতা এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'কাল তোমরা কেউ ছিলে না। আমার এক বন্ধু, সুদীপ, তুমি দেখেছ ওকে, কাল রাত্রে এখানে ছিল কারণ ওর কোথাও থাকার জায়গা ছিল না।'

'কেন?'

'অসুবিধে ছিল।'

'ওর বাড়িতে অসুবিধে হল কেন?'

'ওটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তুমি জানো না?'

'জানি।'

রামানন্দ মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা কি কোন খবর দিয়েছেন?'

'না।' তারপর বলল, 'সুদীপ আজই চলে যাবে, তোমাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না।'

'আমি দুশ্চিন্তায় নেই। তবে আমরা যখন তোমাদের বয়সে ছিলাম তখন এইভাবে বাড়ি ছেড়ে অন্য কারও বাড়িতে রাত কাটানোর স্পর্ধা দেখাতে পারতাম না। তাছাড়া তুমি এখন আর ছোট নও, আমাদের

অনুপস্থিতিতে সমবয়সী একটি ছেলেকে রাত্রে থাকতে দেওয়াটা অনেকের চোখেই শোভন বলে ঠেকবে না, এইটে তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

'তুমি কি ইঙ্গিত করছ?'

'আমি কোন ইঙ্গিত করছি না। যা বাস্তব তাই বলছি।'

'আমরা বন্ধুরা কেউ কাউকে কখনই বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। তোমার এই 'সবাই' কি বলছে তা কেয়ার করি না আমি। তাছাড়া তোমাদের বেলায় যখন এই 'সবাই' চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে তখন আমার ক্ষেত্রে চোখ খুলতে নিষেধ করো।'

রামানন্দ দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল জয়িতা। একটু সময় লাগল তার নিজেকে সামলাতে। শেষ পর্যন্ত রামানন্দ উঠলেন, 'তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে খুকী। আমরা যা করছি সেটা না করলে অস্তিত্ব রাখা যাবে না। অন্ধদের রাজত্বে গিয়ে চোখ খোলা রাখলে দলচ্যুত হতে হবে। কিন্তু বেসিক্যালি আমি তো—আমি তো—কিছু মনে করিস না, আই লাভ ইউ, আর তাই হঠাৎ ভয় হল, আমি তোর মাকে হারিয়েছি, তোকে হারাতে ভয় হয়।'

রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। নিজের ঘরের দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় 'বাবা' ডাক শুনে স্থির হলেন। জয়িতা বলল, 'আমি কোন অন্যায় করছি না।'

মাথা নাড়লেন রামানন্দ, 'আমি তোকে বিশ্বাস করি।'

'বিশ্বাস কর? তাহলে তোমাকে বলতে হয়—।'

'কি?'

'না, এখন না। সময় হলেই তোমাকে জানিয়ে যাব।'

'জানিয়ে যাবি? কোথায়?'

জয়িতা এবং রামানন্দ পরস্পর চোখের দিকে তাকালেন। রামানন্দর কাতর চোখে বিস্ময়। জয়িতার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ছেলেবেলায় একটা গল্প সে প্রায়ই শুনতো। রামানন্দ সাংসারিক কাজ একদম করতে পারতেন না। তখন ওদের এই বাড়ি ছিল না, এই অবস্থাও নয়। সেই সময় জয়িতা যখন দু'বছরের শিশু তখন মাঝরাত্রে প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল হামের ফলে। রামানন্দ রায় সেই মেয়েকে দু'হাতে আঁকড়ে সারারাত ঘরে পায়চারি করেছিলেন। মেয়ের মলমূত্র সস্নেহে পরিষ্কার করেছেন, ক্লান্ত স্ত্রীকে ঘুমুতে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য এ থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি স্নেহপ্রবণ সাংসারিক পিতা ছিলেন। তখন রামানন্দ রায়ের সীমিত আয় ছিল, গাড়ি ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার কথা বারংবার ব্যবহার করে করে নিজের গৌরব জাহির করার যে চেষ্টা তা শুধুই বিরক্তি উৎপাদন করত। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সেই মানুষটাকে দেখতে পেল জয়িতা। যার কিছু নেই অথচ সবকিছু থাকার বাতাবরণ যাকে সৃষ্টি করতে হচ্ছে।

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না এখন।'

রামানন্দ বিস্মিত হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, 'ও! খুকী, তোর বিবেকে যা সত্যি তাই করিস। এইভাবে কোনদিন তোর সঙ্গে কথা বলিনি, আবার বলার সুযোগ হবে কিনা জানি না। নিজের কাছে যদি তুই ঠিক থাকিস তাহলে কারও কাছে কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। তোর বন্ধুকে চলে যেতে বলে আমাকে ছোট করিস না। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি।' রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। তিনি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত জয়িতা তাকিয়ে থাকল। এই মানুষটার কাছে মা কি পায়নি? কোন্ অভাববোধ থেকে মা এই শেকড়হীন জীবনটাকে আঁকড়ে ধরলেন? নাকি এই মুহূর্তের রামানন্দ রায়কে সীতা রায় চেনেন না? অথবা রামানন্দ রায় তাঁর এই মুখটাকে অজস্র মুখোশের ভিড় থেকে বেশির ভাগ সময় খুঁজেই পান না বলে সীতা রায় স্রোতটাকেই বেছে নিয়েছেন। কে জানে!

'তোমার চা।' শ্রীহরিদাকে চায়ের কাপ আর কাগজ রাখতে দেখল জয়িতা। শ্রীহরিদা দাঁড়াল, 'চা ঠাণ্ডা করো না। তোমার বন্ধুকেও চা দিয়েছি। সে শুয়ে আছে।'

মাথা নাড়ল জয়িতা। সুদীপ নির্ঘাৎ এখনও ক্লান্ত। শ্রীহরিদা চলে গেলে সে চায়ে চুমুক দিল। এবং ঘুম থেকে ওঠার পর এই প্রথম তার ভাল লাগল। বাগডোগরার ফ্লাইটটা বিকেলে আসে। ততক্ষণ আর নতুন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না এই বাড়িতে। খবরের কাগজটা টেনে নিল সে। ভাঁজ

খুলতেই সোজা হয়ে বসল জয়িতা। জীবনে প্রথমবার মেরুদণ্ডে বরফের স্পর্শ পেল যেন সে। প্রথম পাতায় ছবি ছাপা হয়েছে। বাড়িঘর ঝাপসা, আগুনের শিখা লকলক করছে। কোন মানুষের চেহারাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এমন কি জয়িতা নিজেও জায়গাটাকে ভাল করে চিনতে পারা তো দূরের কথা সম্পূর্ণ অচেনা লাগছিল তার কাছে। তার পাশেই বড় অক্ষরে হেডলাইন, 'প্যারাডাইস ভস্মীভূত।' জয়িতা রিপোর্টটা খুঁটিয়ে পড়ল।

'পরশু মধ্যরাত্রে ডায়মন্ডহারবার রোডের একটি প্রমোদনিবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। শেষরাত্রে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর আমাদের অফিসে আসে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি দমকল আপ্রাণ চেষ্টা করছে আগুন নিবিয়ে ফেলতে, কিন্তু ততক্ষণে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। পুলিশসূত্রে জানা যায় একাধিক ব্যক্তি ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই প্রমোদনিবাসে প্রবেশ করে এবং নির্বিচারে 'প্যারাডাইসের' মালিক এবং দুজন কর্মীকে হত্যা করে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্যারাডাইস নামক ওই প্রমোদনিবাসটি সরকারের অলক্ষ্যে মধুকুঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ওই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঠিক কতজন অগ্নিদগ্ধ কিংবা আহত হয়েছেন তা জানা যায়নি। কারণ সেইরাত্রে যারা মধুকুঞ্জের মধু আস্বাদন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ প্রকাশ্যে আসতে চাইছেন না। অনুমান সংখ্যাটি দশের কম নয়। ডাকাতরা তাদের কাজ শেষ করে নির্বিঘ্নে গা-ঢাকা দেয়। প্রকাশ, সেই রাতেই ডায়মন্ডহারবার রোডের একটি পেট্রলপাম্প থেকে গাড়ি চুরি হয় এবং অনুমান ডাকাতরা সেই গাড়ি ব্যবহার করেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে ডাকাতরা স্থানীয়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই ডাকাতি তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় ডাকাতদের সংখ্যা বেশি ছিল না, এবং তারা প্রত্যেকেই তরুণ। প্যারাডাইসের ক্রিয়াকলাপ আশেপাশের গ্রামের মানুষ কখনই ভাল চোখে দ্যাখেনি। তথাকথিত ডাকাতি হোক বা না হোক এই কাজ প্যারাডাইসকে চিরকালের জন্যে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে অনেকেই খুশী, যদিও মৃত্যুর খবরে কেউ আনন্দিত হননি। পুলিশ বলেছে, অপরাধীরা দু-একদিনের মধ্যে ধরা পড়বেই কারণ তদন্ত খুব দ্রুত এগোচ্ছে।'

ধীরে ধীরে কনকনানিটা স্থির হল। কোথাও তার কথা লেখা হয়নি। একটি মেয়েও যে ওই দলে ছিল তা রিপোর্টে বলা হয়নি। কেউ কি পুলিশকে এই খবরটা দেয়নি? ক্রমশ নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু তারপরেই মনে হল এটা একটা চাল হতে পারে। পুলিশ তাদের নিশ্চিন্ত করতে চায় বলেই খবরটা বেমালুম চেপে গেছে। শেষের লাইনটা খুব অস্বস্তিকর। পুলিশ কি কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছে? যদি ওরা আনন্দর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে—! যে হালকাভাবটা এসেছিল তা আচমকাই চলে গেল। কাগজটাকে ভাঁজ করে ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। কাল সারা দিন এবং রাত্রে এই ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি সে। অথচ কাগজটা পড়ামাত্র ওইসব চিন্তা মাথা তুলল। সে চা শেষ করে কাগজটা নিয়ে সুদীপের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

শুয়ে শুয়ে সুদীপ সিগারেট খাচ্ছিল। জয়িতাকে দেখে উঠে বসল, 'এখনই বের হব?'

'তোর যা ইচ্ছে। আমি তোকে যাওয়ার কথা বলতে আসিনি।'

'আমি একটু বাদে বের হব। মালগুলো নিয়ে তো ঘোরা যাবে না, এগুলো এখানে রাখা যাবে? মানে তোদের যদি কোন অসুবিধে না হয়?'

'তোদের তোদের করছিস কেন?'

'আই অ্যাম সরি। তোর বাবা মা ফিরেছেন?'

'বাবা এসেছে।'

'আমার কথা জানেন?'

'হ্যাঁ। বললেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই তোর এখানে থাকতে, যদি আমার বিবেক পরিষ্কার থাকে। আজকের কাগজ।' জয়িতা কাগজটা ছুঁড়ে দিল। দিয়ে দেখল সুদীপের মাথার একদিক বেঢপ ফুলে উঠেছে।

কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে সুদীপ বলল, 'তোর বাবা তো দেখছি চমৎকার ভদ্রলোক। কখন যে এরা ঘ্যাম ব্যবহার করে আর কখন যে জালি হয়ে যায় তা শালা অনুমান করাই মুশকিল। আই বাপ, একি রে, একদম হেডলাইন!' সুদীপ এবার গম্ভীর হয়ে কাগজটা পড়া শুরু করল। শেষ লাইন অবধি খুঁটিয়ে পড়ে কাগজটাকে সরিয়ে রেখে সে মন্তব্য করল, 'কোন কাজ হল না।'

'মানে?'

'আনন্দ চেয়েছিল এইসব ঘটনা থেকে কাগজগুলো এমন মাতামাতি করবে যে সাধারণ মানুষ ধরতে পারবে ব্যাপারটা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটাবো আমরা আর সাধারণ মানুষের অসাড় হয়ে যাওয়া বোধটায় টান লাগবে। এই সো-কলড ডেমোক্রেসিতে অর্থবান মানুষদের ব্যভিচার করাই সবচেয়ে সুবিধে। যত রকমের অন্যায় করেও আইনের দোহাই দিয়ে তারা পার হয়ে যায়। ঠিকঠিক পয়েন্টে ঘা দিয়ে ওদের মুখোশ খুলে দিলে মানুষ নিজেরাই এগিয়ে আসবে। কিন্তু পরশুর ঘটনাটা কাগজ কিভাবে লিখেছে দেখেছিস? যেন আমরা সত্যি ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম! কি ডাকাতি করলাম তা লেখেনি!'

'তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস।'

'কি কথা?'

'আমরা সবে একটা ঘটনা ঘটালাম। পুলিশ কিংবা সাংবাদিকদের কোন সুযোগ নেই জানার, কারা করেছে কি জন্যে করেছে? আমরা কোন সূত্র রেখে আসিনি। কাগজে কোথাও লেখেনি আমার কথা, আই মিন দলে মহিলা ছিল সেইকথা। অর্থাৎ হয় পুলিশ চেপেছে নয় ওরা টোটাল ইনফরমেশন পায়নি। কিন্তু আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটলে জনসাধারণ জেনে যাবেই। রিপোর্টটায় পরিষ্কার বলা আছে প্যারাডাইসে মধুচক্র ছিল। পাবলিক নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটায় খুব কষ্ট পাবে না।'

জয়িতার কথা শেষ হওয়ামাত্র সুদীপ শুয়ে পড়ল। জয়িতা অবাক হল, 'কি ব্যাপার?'

'ঘুম পাচ্ছে। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'একটা অ্যাকশন করেই—!'

'না, নিজের সঙ্গে লড়াই করে। তুই বুঝবি না। আমাকে যখন যেতে হবে ডেকে দিস।'

'তোর যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ থাক।'

'বাঃ, হঠাৎ এই বাড়ির ওপর তোর কর্তৃত্ব এসে গেছে মনে হচ্ছে! আনন্দ ফোন করবে, বলবি বিকেলের আগে আমি ফ্রি হব না, অবশ্য কোন জরুরী ব্যাপার থাকলে আলাদা কথা।' সুদীপ পাশ ফিরে শুতেই জয়িতা উঠে এল। এই মুহূর্তে ওর মনে হল সুদীপ ঠিক আগের মতন নেই। কাল রাত্রে যাকে কাঁদতে শুনেছে সে এখনও সুদীপকে ছেড়ে যায়নি, কিংবা আর একটা ব্যাপার হতে পারে—আমরা যেসব মানুষকে বাইরের জীবনে নিয়মিত দেখে থাকি, যাদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে অথবা কর্মসূত্রে মিশি তাদের একটাই চেহারা আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তারা যখন নিজের শোওয়ার ঘরে ফিরে যায় তখন তাদের আচরণ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। সুদীপকে তো বাইরে থেকেই সে দেখে এসেছে। ছটফটে, টিজ করতে ভালবাসে, কোন কিছুই গায়ে মাখে না, চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এইরকম ছেলেও হয়তো বাড়িতে চুপচাপ গম্ভীর, একা একা থাকতেই ভালবাসে। জয়িতা মাথা নাড়ল, কখনও কখনও একাকী নিজেকেই বিরক্তিকর মনে হয়। সুদীপ দুই ভূমিকায় থেকে নিজেকে ব্যালেন্স করে।

রামানন্দ রায় বাইরে নেই। কাগজটাকে টেবিলের ওপর রেখে পা বাড়াবার আগেই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই আনন্দর গলা শুনতে পেল, নম্বর জিজ্ঞাসা করছে। জয়িতা বলল, 'তোকে ডিজিট চিনিয়েছিল কে? মাসিমা? ঠিক শিখিয়েছিলেন। বল্ কি বলবি।'

আনন্দ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, তারপর বলল, 'পারিস! শোন, সুদীপ কাল ঠিকঠাক ছিল তো?'

'ঠিকঠাক মানে?' জয়িতার গলাটা করকরে হয়ে উঠল আচমকা।

'কোন অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'অসুবিধের সম্ভাবনা থাকলে আমি ওকে ডেকে আনতাম না।'

'ওইভাবে কথা বলছিস কেন?'

জয়িতা নিজেকে সামলালো। কেন যে ফট করে রাগ হয়ে যায়। সে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলবার চেষ্টা করল, 'ওয়েল, ঠিক আছে, কি বলবি বল্।'

আনন্দ চট করে কথা বলল না। যেন সময় নিয়ে কি বলবে স্থির করল, 'জয়িতা, তোকে একটা কথা শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের সম্পর্কে কোন অসুবিধে আছে?'

'না। নেভার। হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'তাহলে চটজলদি ভুল বুঝছিস কেন?'

'আই অ্যাম সরি। আসলে একটু আগে বাবার সঙ্গে—, মেজাজটা ভাল ছিল না। তারপর তুই যখন জিজ্ঞাসা করলি, ঠিকঠাক শব্দটা উচ্চারণ করলি তখন—, রিয়েলি আই অ্যাম সরি। হ্যাঁ, সুদীপ ভালই ঘুমিয়েছে। একটু আগে কথা বলেছি। ও আবার ঘুমাচ্ছে।'

'তোর বাবা কি টের পেয়েছেন?'

'সুদীপকে বাবা দেখেছেন।'

'দূর, সুদীপের কথা বলছি না, টাকাটার কথা!'

'ওটা মায়ের ডিপার্টমেন্ট। শী হ্যাজ নট কাম ব্যাক।'

'ও। আমি সকালে বেরিয়ে যাচ্ছি। অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ইউ ক্যান মিট আফটার দ্যাট। কোন অবস্থাতেই আজ ঠাকুরপুকুরে যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কাল যেতেই হবে। সুদীপ আজ কোথায় থাকবে তোরা ঠিক করে নে। আর সন্ধ্যেবেলায় বসুশ্রী কফিহাউসে মিট করবি। অ্যারাউন্ড সিক্স। সুদীপকে বলবি ও যদি পারে যেটা যোগাড় করবে বলেছে যেন করে রাখে। হয়তো আজই দরকার হবে। ও কে?'

'ঠিক আছে। কল্যাণ কোথায়?'

'ওর বাড়িতেই। কাগজ দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। আনন্দবাজার।'

'টেলিগ্রাফটা দেখিস। স্বর্গে কি কি হত তার ডিটেলস ছেপে দিয়েছে। ওরা মন্তব্য করেছে যে বা যারাই কাজটা করুক তারা আইনের চোখে অন্যায় করেছে, কিন্তু গ্রামবাসীরা আশীর্বাদ বলে যদি মনে করে তাহলে দোষ দেওয়া যায় কি? দ্যাটস অল, তাই না?' আনন্দর গলায় খুশীর সুর। সকাল থেকে এই প্রথমবার ভাল লাগল জয়িতার।

ট্রামে উঠেই সুদীপ টের পেল। দুজন ভদ্রলোক খবরটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, 'পুলিশ লাইসেন্স দিয়েছে ওরা মধুচক্র চালিয়েছে, এতে দোষ কিসে? কলকাতায় তো কয়েক হাজার প্রস কোয়ার্টারস আছে তা নিয়ে তো হৈ-চৈ করেন না। বেশ্যাবৃত্তি কি আইনসম্মত?'

ওই বৃত্তিটা আইনসম্মত কিনা সে বিষয়ে যাত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গেল। কারোর কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। কেউ একজন বলল বেআইনি হলে ওরা বিধান রায়ের সময়ে মিছিল করে গিয়েছিল কি করে? সুদীপ লক্ষ্য করল, কি চটপট মানুষ প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত একজন বলল, 'না মশাই, ডাকাতরা যে দু-তিনজনকে খুন করেছে তাতে আমি একটুও দুঃখিত নই। মধুচক্রে সেদিন যারা ছিল, মানে যারা আহত হয়েছে তাদের নাম কাগজগুলো এড়িয়ে গেছে, কেন?'

আর একজন বলল, 'আপনি এই ডাকাতি নরহত্যাকে সাপোর্ট করছেন?'

এবার লোকটি জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথম লোকটি বলল, 'যাই বলুন, আমার সব পড়েটড়ে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা পলিটিক্যাল অথবা পুরোনো ঝগড়া। ওই প্যারাডাইসের অ্যান্টিপার্টি হয়তো করেছে।'

'পলিটিক্যাল কথাটা বললেন কেন? আপনি জানেন ওই অঞ্চলে কোন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ। তাছাড়া যারা এতকাল উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ছিল তারা এখন নরম হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ডাকাতদের উদ্দেশ্য কি ছিল?'

আলোচনা এখন সেই বিষয়ে চলল। আনন্দ যা চাইছে তাই কি হতে যাচ্ছে? আঙুলে কানের পাশের ফোলা জায়গাটা স্পর্শ করল সুদীপ। জয়িতার চাপে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা টেডভ্যাক নিয়ে ওষুধ লাগাতে হয়েছে। ব্যান্ডেজটা নিশ্চয়ই খুব দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে। কিরকম, তাকে কি ডাকাত ডাকাত মনে হবে কারও? ও যদি এখন এই মুহূর্তে চিৎকার করে বলে, দেখুন মশাই আমিই একজন ডাকাত যাদের কথা আপনারা বলছেন তাহলে এই ট্রামের লোকগুলো কি তাকে বিশ্বাস করবে?

ধর্মতলায় নেমে হাঁটতে লাগল সুদীপ। এখন প্রায় এগারোটা। অফিসযাত্রীদের ভিড় এখন চারপাশে। সাধারণত দশটায় অফিসগুলো চালু হওয়ার কথা। কিন্তু ট্রামে-বাসে বারোটা পর্যন্ত অফিস-টাইম শব্দটা চালু থাকে। সুদীপের সামনেই একটি মধ্যবয়সী লোক হাতে রেক্সিনের ছোট ব্যাগ নিয়ে হাঁটছিল।

এগুলোকে টিপিক্যাল কেরানিব্যাগ বলা হয়। ওপর থেকে টিফিনবাক্সটার সাইজ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত সময় যেন ওর সামনে পড়ে আছে এমন ভঙ্গিতে লোকটি হাঁটছিল।

বহুতল বাড়িটার সামনে এসে সুদীপ লক্ষ্য করল লোকটি সেখানেই ঢুকছে। সামনেই লম্বা কাউন্টার। সেখানে কেউ নেই। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। লোকটি লাইনের শেষে দাঁড়াতেই সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা রেইড করে যাঁরা গয়নাগাটি নিয়ে আসেন তাঁদের ডিপার্টমেন্টটা কোথায়?'

লোকটি ছোট চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'লাইনে দাঁড়ান, বলে দেব।'

রাক্ষসের পেটেও বোধহয় এত জায়গা থাকে না, লিফটে দাঁড়িয়ে মনে হল সুদীপের। ভাগ্যিস সব ফ্লোরে থামছে না! হঠাৎ সুদীপ শুনল, 'নেমে ডানদিকে।' বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল তার। পুরো ধর্মতলাটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দোতলা বাসগুলোকেই ছোট দেখাচ্ছে, মানুষজন লিলিপুট। অনেক উঁচু থেকে দেখলে বোধহয় এইরকম সুন্দর দেখায়।

খুঁজে খুঁজে অফিসটাকে বের করল সুদীপ। অফিসার ভদ্রলোক চমৎকার। বসতে বলে প্রশ্ন করলেন, 'অবনী তালুকদার আপনার কে হন?'

'উনি আমার বাবা। আমার মা মারা গিয়েছেন। আপনারা মায়ের গহনাগুলো নিয়ে এসেছিলেন। বাবা বলছেন তিনি সেগুলো এখনও ফেরত পাননি। কথাটা সত্যি কিনা জানতে এসেছি।'

'বাবার কথা অবিশ্বাস করছেন কেন?'

'করার কারণ আছে।'

'দেখুন, এটা অবনীবাবু এবং সরকারের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আপনি থার্ড পার্টি। আপনাকে আমরা আইনত জানাতে পারি না। ওঁর অ্যাসেসমেন্ট কোথায় হয় জানেন?'

'না, উনি আমাকে বলেননি। কিন্তু সোনাগুলো তো আমার মায়ের।'

'হতে পারে। তবে যেহেতু ওইসব আনডিসক্লোজড ওয়েলথ অবনীবাবুর বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে এবং সত্যিকারের কোন মালিক যদি প্রমাণ দেখাতে না পারেন তাহলে আমরা অবনীবাবুর সম্পদ হিসেবেই ধরব। আয়কর আইনে যা যা ব্যবস্থা নেবার তা নেওয়া হবে। তবে আমি আপনাকে আনঅফিসিয়ালি জানাচ্ছি, কিছু কিছু জিনিস আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। ডিটেলস জানতে চাইলে আপনাকে পরিচয় দিয়ে দরখাস্ত করতে হবে।'

অফিসারের কাছ থেকে বাবার যেখানে অ্যাসেসমেন্ট হয় সেখানকার ঠিকানা নিয়ে সুদীপ বাইরে বের হল। কয়েকতলা ভেঙে নির্দিষ্ট তলায় আসতেই ও থমকে দাঁড়াল। অবনী তালুকদার হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ফাইল বগলে একটা লোক। লোকটা যেন কিছু চাইছে আর অবনী ঘাড় নেড়ে খুব সম্মতি দিয়ে যেতে যেতে একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন। দরজার ওপরে টাঙানো ফলক থেকে নাম পড়ল সুদীপ। গতকাল অবনী তালুকদারকে যে অবস্থায় সে দেখে এসেছিল তাতে একবারও মনে হয়নি আজ উনি সুস্থ হয়ে মামলা করতে আসতে পারেন। একটু বাদেই সেই ফাইলবাহক বেরিয়ে এল। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে কেস আছে?'

সুদীপ মাথা নেড়ে না বলতে লোকটি বিরক্ত হল, 'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'আমার বাবা ভেতরে গেছেন তাই।'

'বাবা? অবনীবাবু আপনার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'ওহো, নমস্কার নমস্কার। আপনাদের কেসটা খুব কঠিন তবে ছাড় পেয়ে যাবেন। আমাদের এই সাহেবের মনটা নরম। একটু চেপে ধরলেই হয়ে যাবে। আমি তো বললেই ফাইল এনে দিই।' লোকটি কৃতার্থ হয়ে হাসল।

'আমাদের বাড়িতে যে সার্চ হয়েছিল তার ফাইলটা কোথায়?' সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল সুদীপ।

'ও বাবা, ওই ফাইল সাহেবের আলমারিতে। সাহেব ছাড়া কেউ হাত দেয় না। বসুন না।' কথা বলতে বলতে আর একজনকে দেখেছিল, লোকটি এবার সেইদিকে ছুটল।

সুদীপ একটু ইতস্তত করল। তারপর আলতো করে দরজায় চাপ দিতেই অবনী তালুকদারের গলা শুনতে পেল, 'না রায়সাহেব, সৎভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আপনি একটু রাজী হয়ে যান দেখবেন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার।' অবনী তালুকদারের কণ্ঠস্বর রহস্যময়।

অফিসার কিছু বলতে গিয়ে গলা তুললেন, 'কে, কে ওখানে?'

সুদীপ দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক উত্তেজিত হলেন, 'না বলে ঢুকলেন কেন? কে আপনি?'

সুদীপ দেখল অবনী তালুকদারের মুখ সাদা হয়ে গেছে। এমন অবাক বোধহয় জীবনে হননি তিনি। সে হেসে বলল, 'আপনি বলে দিন আমি কে।'

অবনী ঠোঁট চাটলেন, 'আমার ছেলে।' তাঁর গলার স্বর ফ্যাসফেসে শোনাল।

'ও।' অফিসার ইঙ্গিত করলেন একটা চেয়ার দেখিয়ে বসার জন্যে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন অবনী তালুকদার, 'স্যার, আজকে আমি চলি। আমাকে আর একটা ডেট দিন।'

'কেন? হঠাৎ ডেট চাইছেন? আমি কেসটা আর ঝুলিয়ে রাখতে চাই না।'

'প্লিজ স্যার! তুমি—তুমি, একটু বাইরে দাঁড়াবে?'

'কেন?' সুদীপ হাসল।

'ঠিক আছে স্যার। আমি পরে দেখা করব।' কাগজপত্র তুলে অবনী তালুকদার বাইরে বেরিয়ে যেতেই সুদীপ তাঁকে অনুসরণ করল। সেই জানলাটা যেখান থেকে সুন্দর কলকাতা দেখা যায় সেখানে পৌঁছে অবনী উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এখানে এসেছ কেন? কি চাই?'

'আপনিই আসতে বলেছিলেন।'

'আমি? কই কখন? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

'আমার মায়ের গহনা।'

'উঃ, সেটা এদের কাছে আছে, এদের কাছে চাও।'

'তাই তো চাইতে এসেছি।'

'ওয়েট। তুমি ওখানে গিয়ে কি বলবে?'

'যা জানি।'

'কি জানো? ডু য়ু নো আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তুমি?'

'এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি। আমি আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য চাই না। আমার মা-বাপের বাড়ি থেকে যে সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলেন তা-ই চাইছি। কারণ টাকার আমার খুব প্রয়োজন। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'এতদিন তো টাকার দরকার ছিল না। ছাত্র হিসেবে তোমার যা খরচ তা আমি দেব। তুমি হোস্টেলে গিয়ে থাকো। ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার মায়ের গয়না কবে এরা ছাড়বে জানি না। দোজ আর আনডিসক্লোসড ওয়েলথ।'

'কার?'

'মানে?'

'ওসব তো আপনার নয়। আমার মায়ের। আপনার আনডিসক্লোসড ওয়েলথ হবে কেন?'

'আমার কাছে পাওয়া গেছে যখন তখন আমার। তোমার মার নাম ওতে লেখা নেই। নট ইভন এনি পেপার। তোমার মায়ের বাবা কোত্থেকে কিনেছিলেন প্রমাণ নেই।'

'তার মানে মায়ের সম্পত্তি আপনারই হয়ে যাচ্ছে! চলি।'

'দাঁড়াও। কত টাকা দরকার তোমার?'

'অন্যসব ছেড়ে দিচ্ছি। আটটা কুড়ি ভরি ওজনের সাপের দাম কত হবে? কমপক্ষে সোওয়া তিন লক্ষ টাকা। আমাকে এক লক্ষ দিলেই হবে।' সুদীপ শান্ত মুখে বলল।

'কি? এক লক্ষ? মামারবাড়ি? ব্ল্যাকমেইলিং? পুলিশে দেব তোমাকে শুয়ার।'

'মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ।' চাপা গলায় বলল সুদীপ। সে দেখছিল কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে ওদের কথাবার্তা শুনতে। কিন্তু এখন ঠিক কি করা যায় তা ওর মাথায় আসছিল না।

অবনী তালুকদার খুব কষ্টে নিজের উত্তেজনা সামলে বললেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজ—ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাচ্ছ আমাকে! এক হাজারের বেশি এক পয়সা দিতে পারব না। ওই নিয়ে চিরজীবনের জন্যে দূর হয়ে যেতে হবে।'

'আমি চলি। আপনি যখন সহজে মুক্তি চাইবেন না তখন সেই ব্যাগটার কথাও আমাকে বলতে হবে।'

'শোন, ঠিক কত হলে চলবে তোমার?'

'এক লক্ষ।'

'অত টাকা আমি কোথায় পাব? দেখছ না এরা সব সিজ করে নিয়েছে?'

'তা হলে লিখে দিন আমার মায়ের গহনাগুলো আপনি নেবেন না। সেগুলোর একটা লিস্ট দিন।'

'ঠিক আছে। তুমি সামনের রবিবারে দেখা করো।'

'না, আজ। বিকেল চারটের মধ্যেই টাকা দরকার। কিভাবে দেবেন সেটা আপনার ব্যাপার।'

'তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

'আপনার জানার কোন প্রয়োজন আছে?'

'আমি তোমার বাবা। রাগ করে তো অনেক কথাই বলতে পারি। তোমার মা আমাকে কোনদিন শান্তি দেয়নি। ঠিক যে প্লেজার চাই তা ওর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি আমার মত থাকতে চেয়েছি সবসময়। বেশ, চারটের সময় এসো। আমি যা পারব দিয়ে দেব। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি ইওর ফেস আফটার দ্যাট!'

একা একা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সুদীপের বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। একটা যন্ত্রণা, সেটা ঠিক কি কারণে তা সে জানে না, নিঃশ্বাস ভারী করে তুলেছিল। কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্যে নয়, এমন কি নিজের জন্যেও নয়, অদ্ভুত শূন্যতা যে কতখানি ভারী হয়ে যন্ত্রণা ছড়ায় তা এর আগে সে কখনই টের পায়নি। চারটে বাজতে ঢের দেরি, তবু সে বাড়ির দিকে চলল। মায়ের ঘরটা তাকে চুম্বকের মত টানছিল।

॥ ১৩ ॥

ব্যাপারটা বেশ মজার। সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালে ছেলে আর একজনকে নিয়ে ফিরল কিন্তু এ বাড়ির কেউ সেটা দেখেও দেখল না। বাবা বসেছিলেন রকে, একবার তাকালেন এবং তারপরেই উদাস হলেন। আনন্দ থাকাকালীন এই ঘরে দু'কাপ চা এসেছিল। দরজার কাছে শব্দ হচ্ছে শুনে কল্যাণ উঠে গিয়ে দেখেছিল মেজবৌদি যার নাম বিনীতা সংকুচিত হয়ে দুটো কাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং সেই দেওয়ার দৃশ্যটি বড় বউদি যূথিকা নজর করছে তার দরজায় দাঁড়িয়ে। আশেপাশে কোথাও মা নেই। আনন্দ মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি, সে নিজেও আলাপ করিয়ে দেয়নি। সুজন আজকাল প্রায়ই রাত্রে বাড়িতে ফেরে না। প্রথম প্রথম এই নিয়ে চেঁচামেচি হলেও এখন প্রত্যেকের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কল্যাণ কাউকে কিছু না বলে এই প্রথম রাত্রেই বাড়ির বাইরে কাটাল। অথচ কেউ তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। প্রথমে মজা লাগছিল, শেষ পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে গেল।

জয়িতা আর সুদীপ চলে গেলে এই ব্যাপারটা সে আনন্দকে বলেছিল। কথাটা শুনে আনন্দ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেউ তোকে খুব জেরা করলে, ধমক দিলে তোর ভাল লাগত?'

কল্যাণ বলেছিল, 'সেই মুহূর্তে কিরকম লাগত জানি না, কিন্তু এটা না হওয়ায় এখন মনে হচ্ছে আমি যেন বিদেশে বাস করছি।'

আনন্দ বলেছিল, 'পারিবারিক সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্টগুলো না থাকলে এইরকম মনে হয়। আমার কথাই ধর, আমি হোস্টেলে আছি। অসুখ করলেও কেউ দেখার নেই। হোস্টেলের অন্য ছেলেরা যে তখন পাশে আসে না তা নয় কিন্তু তাদের ওপর তো আমি জোর করতে পারি না। এইসব করে-টরে-বেঁচে-থাকা আর কি! কার লাইন রে?'

কল্যাণ হেসে ফেলল, 'এক জীবনে যাঁর কিছুই করা হয় না।'

আনন্দ মাথা নেড়েছিল, 'কিন্তু এক জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে চাইব।'

রাত্তিরে বাড়িতে ফিরে চুপচাপ এইসব কথাই ভাবছিল সে। টাকা থাকলে এই ভারতবর্ষে বসে যে কোন অস্ত্র কেনা যায়। শুধু ঠিকঠাক লোকের কাছে পৌঁছে যেতে পারলেই হল। প্রয়োজনে তারা সেইসব অস্ত্রের ব্যবহারও শিখিয়ে দিতে পারে। তার জন্যে ভাল টাকা দরকার। কিন্তু আনন্দ চাইছে গ্রেনেড, ডিনামাইট আর রিভলভার। যেগুলো সহজে বহন করা যায় এবং যার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক, প্রয়োগ করতে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জয়িতা যে টাকা এনেছে এবং সুদীপ যা ব্যবস্থা করবে তাতে বেশ কয়েকটা অ্যাকশনে অস্ত্রের অভাব হবে না। অবশ্য ততদিন যদি পুলিস তাদের ধরে না ফেলে। প্যারাডাইসের ব্যাপারটা যেরকম নির্বিঘ্নে ঘটে গেল প্রতিবার যে তাই হবে এমন আশা করা ভুল। কিন্তু তার আগে যদি নাড়া দেওয়া যায়, পাথরের মত অনড় মানুষের মনগুলোকে যদি বিচলিত করা যায়—ব্যাপারটা খুব আশাপ্রদ বলে মনে হয় না কল্যাণের কাছে। অতবড় নকশাল আন্দোলন যা পারেনি তারা চারজন বিক্ষিপ্তভাবে সেটা করতে পারবে এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি! গ্রেপ্তার এড়িয়ে যদি বুর্জোয়া শোষকদের দুর্গগুলোতে একটার পর একটা আঘাত করা যায় তাহলে হয়তো আগামীকালের জন্যে একটা কাজ আগাম করে যাওয়া হবে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, আজ কিংবা আগামীকাল।

আনন্দ বলে পশ্চিমবাংলায় একমাত্র সি পি এম এই কাজটি করতে পারত। তাঁদের সংগঠন-শক্তি যদি এই কাজে ব্যবহার করা হত তাহলে ফল পাওয়া যেতই। কিন্তু তাঁরা এখন ক্ষমতালোভী এবং সংবিধানের আশ্রয়ে নিরাপদ থাকতে চায়। সুবিধে অনুযায়ী সর্বহারা শব্দটির সীমা বাড়িয়ে বাড়িয়ে লক্ষপতিকেও তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর কেউ নয়, কোন রাজনৈতিক দল নয়, একমাত্র দেশের মানুষ যদি এগিয়ে না আসে সক্রিয়ভাবে তাহলে এই সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যে দেশে শুধু অর্থবানরাই গণতন্ত্রের সুবিধে ভোগ করতে পারে সে দেশের মানুষ আর কতকাল শুধু দেওয়ালের কোণ খুঁজে যাবে। দিন পালটাবেই কিন্তু কবে সেটাই কেউ জানে না। সুদীপ সেদিন একটু অশ্লীল হলেও সত্যি কথা বলেছিল। পেতে হলে কিছু দিতে হয়। ত্যাগ করতে না জানলে পাওয়ার আশা অর্থহীন। সুদীপ বলেছিল, 'বাঙালি মল মূত্র এবং বীর্য ছাড়া আজ আর কিছুই ত্যাগ করতে জানে না।' কথাটা সত্যি, হয়তো বেশিরকমের সত্যি। আনন্দর কথা অনুযায়ী পরিকল্পিত পথে মানুষের অসাড় হয়ে যাওয়া বোধগুলোকে আঘাত হেনে হেনে সক্রিয় করতে হবে। তার জন্যে যদি এক জীবন খরচ হয়ে যায় কোন আক্ষেপ নেই। চাকরির জন্যে পড়াশুনা এবং বেঁচে থাকার জন্যে চাকরি করা এবং মরে যাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু অস্বস্তি অন্য জায়গায়। প্যারাডাইসকে কেন্দ্র করে যে বিরাট কাণ্ডটি ওরা করে এল তার প্রতিক্রিয়া তো কিছুই হচ্ছে না। শুধু আজ একজনকে বলতে শুনেছে, 'ভালই হয়েছে, ওসব জায়গা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই উচিত।' শুনে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু লোকটা কথা বলছিল কোন উত্তাপ না নিয়ে। খবরের কাগজগুলোতেও তাদের উদ্দেশ্যটা ছাপা হয়নি। অবশ্য ওরা জানেই না ঘটনাটার পেছনে কি পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে আনন্দ কাউকে জানাতে চায়নি। এখন কল্যাণের মনে হল এইটে ভুল হচ্ছে। এদেশের মানুষ নিজেদের যতই বুদ্ধিমান মনে করুক, আসলে তাদের বুঝিয়ে দিলেও তারা বুঝতে চায় না যেখানে সেখানে নীরব থাকা মানে পণ্ডশ্রম। একটা প্যারাডাইস পোড়ানো তখনই মূল্যবান হবে যখন তাই নিয়ে ঢোল পেটানো যাবে।

দরজায় শব্দ হল। কল্যাণ মুখ ফিরিয়ে দেখল মেজবউদি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বসতেই নিচু স্বরে প্রশ্ন হল, 'খাবে না?'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল সরাসরি উত্তর না দিয়ে, 'সবাই খেয়ে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তুমি রাত্রে ফেরনি বলে মা আজও খাবার রাখতে নিষেধ করেছিলেন।'

'তাহলে আমার খাবার আসবে কোত্থেকে?'

'আছে।'

'ভাল।' কল্যাণ কথাটা বলতেই বিনীতা ফিরে যাচ্ছিল, সে আবার ডাকল, 'শোন, তোমার খুব ভাল লাগার কথা নয় এখানে। তাহলে আছ কেন?'

বিনীতা একটু থমকে গেল। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কেন, আমি তো ভালই আছি।'

কল্যাণ হেসে ফেলল, 'চমৎকার! আচ্ছা তুমি প্যারাডাইস-এর ঘটনা জানো?'

বিনীতা নীরবে মাথা নাড়ল।

'তুমি খবরের কাগজ পড়ো না?'

'না।' তারপর সে চলে গেল।

কল্যাণ খুব বিমর্ষ হল। বিনীতারা কি করে জানবে? ওরা যতদিন না জানছে, ওদের ভাবনা যতক্ষণ না পালটাচ্ছে ততক্ষণ—!

ঠিক সেই সময় বাইরে একটি গলা শোনা গেল, 'কি ব্যাপার, সাতসকালে বাড়িটার এই অবস্থা কেন? মা—মা—?'

গলাটা মেজদার। একটু হাঁকাহাঁকির পর বাবার কথা শোনা গেল, 'সে নেই।'

'নেই মানে? মা কোথায় গেল?'

'তোর দাদার সঙ্গে তারকেশ্বরে গিয়েছে।'

'সাবাস! তোমার বাড়ির হালচাল কিরকম!'

বাবা কোন জবাব দিল না। মেজদা এবার তার বউকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল।

একটা প্রাণবন্ত মানুষ যার কোন লক্ষ্য নেই, যে সম্মান আদায় করতে জানে না, ভাবেও না, বাড়িতে ফিরল। মানুষটিকে খুব ভাল লাগছিল কল্যাণের। কিন্তু মা আর দাদা এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই তা সে জানত না। হঠাৎ তারকেশ্বরে কেন? এই বাড়িটাই যেন ভারতবর্ষ। কেউ কারও খবর জানে না, জানতে চায় না। কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। অথচ একই বাড়িতে প্রত্যেকের বাস। খাবারটা আসছে না। যতক্ষণ মেজবউদি কথা তোলেনি ততক্ষণ খিদেটাই ছিল না। কল্যাণ দেখল বড়বউদি যূথিকা যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। চোখাচোখি হতে যূথিকা এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল, 'কি খবর? আজ বাইরে রাত কাটাবে না?'

ঠোঁট কামড়াল কল্যাণ। একটা কটু কথা বলার ইচ্ছে সামলে নিল, 'না।'

'আজ তোমার ভাগ্যে আর খাবার জুটবে না। মেজকর্তা না এলে জুটতো! কেউ কি তার ভাগ ছাড়ে!'

যূথিকা হাসল। তারপর ঘরে পা দিয়ে বলল, 'অনেকদিন এই ঘরে আসিনি। বসব?'

মাথা নাড়ল কল্যাণ। যূথিকার হাতে এখনও ব্যান্ডেজ জড়ানো। কিন্তু প্রসাধনে সুখের আমেজ। খাটের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে যূথিকা বলল, 'ছোটকর্তার খবর শুনেছ?'

'কি খবর?' কল্যাণ একটু অবাক হল।

'পুলিস ধরেছে। আচ্ছাসে প্যাঁদাচ্ছে। বড্ড বাড় বেড়েছিল।'

'যাঃ! সুজনকে পুলিস ধরবে কেন? ও তো সরকারি দলের লোক।'

'অত খায় না। তোমার দাদা বলছিল ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেলগাছিয়ার ওয়াগন ব্রেকারদের কাছ থেকে যারা হিস্যা পায় তাদের কাছে টাকা চেয়েছিল, তাই। অল্পে তো মন ভরে না সোনারচাঁদের। এর আগে নাকি কেস ছিল থানায়, এখন ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেউ জামিন দিয়ে ছাড়াতে যায়নি?'

'কে যাবে? তোমার দাদা তো খবর শুনে তারকেশ্বরে চলে গেল। বাপের ক্ষমতা জানো। যাক, এইসব ফালতু কথায় আমার দরকার নেই। সেদিন তোমার কথা আমার পিসতুতো বোন বর্ষা বলছিল। অমন সুন্দরী মেয়ে যে কেন দেখা হলেই তোমার কথা বলে তা বুঝি না বাবা।' যূথিকা চোখমুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো বলে ফিক করে হেসে ফেলল। এবং তখনই দরজায় বিনীতাকে দেখা গেল একটা ডিসে রুটি আর তরকারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। যূথিকার হাসি চট করে মিলিয়ে গেল, বিনীতা খাবারটা টেবিলের

ওপর রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, যূথিকা ডাকল, 'এই যে, এখানে তো তোমার ভাসুর নেই. দেওরদের সঙ্গে তো খুব মাখামাখি, তা এখন মুখে বাক্যি নেই কেন?'

'কি কথা বলব?'

'অ! মন খারাপ? এতকাল বাদে স্বামী ঘরে এল তাও মন ভাল হল না। তা ভাল হবে কি করে? কাউকে অত মারধর করলে কি মন ভাল থাকে? কিন্তু স্বামীকে খাবার না দিয়ে দেওরকে দিচ্ছ যে বড়! রুটি তো ওই কটাই পড়েছিল!'

'উনি খেয়ে এসেছেন।' বিনীতা আর দাঁড়াল না।

কল্যাণ একমুহূর্ত চিন্তা করল। সুজনের জন্যে সে কখনও কোন টান তেমন বোধ করেনি। এর আগে মাস্তানি করার জন্যে কল্যাণ তাকে এড়িয়েছে যতটা সম্ভব। ও আছে থাকতে হয় বলেই, এইরকম একটা মনোভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ চটপট খেয়ে নিল। খিদেটাকে সে কখনই এড়িয়ে যেতে পারে না। এমন কি এ বাড়ির তরকারির সেই বিদঘুটে স্বাদটাকে পর্যন্ত খেয়াল করল না।

যূথিকা বলল, 'অত তাড়াহুড়ো কিসের! ধীরে ধীরে খাও। এরকমভাবে গল্প করার সুযোগ তো পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম, আজ বর্ষা এসেছিল। তুমি যদি ফার্স্ট ক্লাস পাও তাহলে ওর বাবা তোমাকে আমেরিকায় পাঠাতে রাজী আছেন। আমার পিসেমশাইকে তো জানো. টাকার কোন হিসেব নেই। বর্ষার সঙ্গে একটু ইয়েটিয়ে করলেই হয়ে যাবে।'

'তাতে এ বাড়ির কি লাভ?'

'এ বাড়ির কথা কে ভাবছে! তোমারই ভাল হবে, বর্ষা তো খারাপ মেয়ে না!'

'বড্ড বাজে কথা বলছ।'

'ইস! তুমি অমন করে বকছ কেন আমাকে? কতদিন পরে তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে এলাম। মেজ তো ছোটর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। আমার কপাল কেন পোড়া হবে?' যেন খুব মজার কথা বলেছে এমনভাবে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল যূথিকা।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কলতলায় মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই সে মেজদাকে দেখতে পেল।

খালিগায়ে লুঙ্গি পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর রে? বাড়িটা ডিপফ্রিজ হয়ে গেল কেন?'

কল্যাণ বলল, 'অনেকদিন বাদে এলে বলে এইরকম মনে হচ্ছে। আমি একটু আসছি।'

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস?'

প্রশ্নটা শুনে কল্যাণের ভাল লাগল। এইরকম আন্তরিক গলায় এ বাড়িতে কেউ আজকাল কথা বলে না। সে জবাব দিল, 'থানায়। শুনলাম সুজনকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'সেকি? সে-ই তো এতকাল পাড়ার হিরো ছিল। কি করেছিল সে?'

'জানি না।'

'আমি যাব তোর সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল কল্যাণ, 'না। অনেকদিন পরে এলে, তুমি এখন রেস্ট নাও।'

রাত্রের কলকাতা দিনের চেয়ে অনেক সুন্দরী। আলো-আঁধারিতে মেশা রাস্তার নির্জনতা চমৎকার শান্তি ছড়ায়। রাত হয়েছে, পথের চেহারায় মালুম হল। দু-একটা রিকশা কিংবা অলস মানুষ ছাড়া পথটা পরিষ্কার। বঙ্কিমদার ওষুধের দোকানটাও বন্ধ।

থানা বেশি দূরে নয়। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ দেখল বেশ জোরালো আলো জ্বলছে। দু'জন কনস্টেবল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে একজন মোলায়েম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ভাই?'

কল্যাণ বলল, 'দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

'ও সি সাহেব তো এখন থানায় নেই। কি ব্যাপার বলুন।' লোকটি সত্যি বিনীত।

'আমার ভাইকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে সেই ব্যাপারে কথা বলব।'

'ও, ওপাশের ঘরে যান, সেকেন্ড অফিসার আছেন।'

থানা সম্পর্কে কত উলটো-পালটা ঘটনা শুনেছিল কল্যাণ, এখন মনে হল সেগুলো সব ঠিক নয়।

ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখল তিনজন মানুষ তিনটে টেবিলের ওপাশে বসে গল্প করছেন। তাদের সামনে মোটামুটি এই রাত্রেও ভিজিটারস আছে। যে যাঁর কেস নিয়ে কথা বলছেন। তিনজনের মধ্যে যিনি বেশি সক্রিয় তাঁকেই সেকেন্ড অফিসার সাবাস্ত করল সে। ভদ্রলোক তখন তাঁর সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে আশ্বস্ত করছিলেন, 'আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি বাড়ি যান, আমরা দেখছি।' মানুষটি বিদায় হলে সেকেন্ড অফিসার চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে উঁচু গলায় মন্তব্য করলেন, 'সত্যি, মানুষ কত সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকে! মানুষের কত ঝকমারি!' তারপর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন ভাই, আপনার কি সমস্যা?'

কল্যাণ ওঁর মুখোমুখি হল, 'আমি শুনলাম আমার ভাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'ভাই-এর নাম?'

'সুজন। আমি কল্যাণ।'

'ও হ্যাঁ, সুজন আমাদের এখানে আছে। ও আপনার কিরকমের ভাই?'

'নিজের।'

'পার্টি করেন?'

'না।'

'ও থাক না এখানে কিছুদিন। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন?'

'আমি জানতে চাইছি ওর বিরুদ্ধে কেসটা কি? ও জামিন পেতে পারে কিনা?'

'কেস যেমন হয়ে থাকে। মাস্তানদের কেস হাওয়া পালটালেই তৈরি হয়ে যায়। আর জামিন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই পেতে পারে। কিন্তু জামিন পেলে ওর ক্ষতি হবে। সুজনও চাইছে না বাইরে বের হতে। অন্তত দিনচারেক। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন? যান না, ওপাশেই ওরা আছে।' হাত বাড়িয়ে আর একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন অফিসার।

কল্যাণ সেদিকে কিছুটা হাঁটার পর খাঁচাটাকে দেখতে পেল। জনা পনেরো বিভিন্ন বয়স এবং চেহারাব মানুষ শুয়ে বসে রয়েছে। কেউ কেউ আবাব তাস খেলছে! এত রাত্রে সুজন একটা সিনেমা পত্রিকা দেখছিল। তাকে দেখে বিন্দুমাত্র অসুখী মনে হচ্ছিল না। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বটে, কিন্তু কল্যাণের মনে হল সুজন মোটেই আহত নয়। মাবধরের সামান্য চিহ্ন তার শরীরে নেই। চিৎ হয়ে শোওয়া সুজনেব একটা হাঁটুর ওপর আর একটা পা দুলছিল। নিঃশব্দে সরে এল কল্যাণ, অফিসাব ঠিকই বলেছেন। সুজনের চেহারা এবং ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে মোটেই অসুখী নয়। এই অবস্থায় ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কোন মানে হয় না।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলল?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে।'

'আরে ভাই, আমরা তো চিরকাল পাবলিকের গালাগাল খেয়ে এলাম, কিন্তু মানুষের উপকারও তো কিছুটা করি। সুজন যদি বাইবে থাকত তাহলে ওর অ্যান্টিপার্টি ওকে ছিঁড়ে খেত। শেলটার নেবার জন্যে থানার চেয়ে আর ভাল জায়গা কি আছে। চার পাঁচ দিনে হাওয়া নর্মাল হয়ে গেলে হয়তো ওর অ্যান্টি পার্টি শেলটার নিতে আসবে!' কথা থামিয়ে অফিসার বেজে ওঠা টেলিফোনটাকে কবজা করলেন, 'হ্যালো! হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, হ্যাঁ, তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে, একুশ-বাইশ বছর, ও কে স্যার, ঠিক আছে।'

চলে যাওয়ার আগে শব্দগুলো কানে যাওয়া মাত্র কল্যাণ শক্ত হয়ে দাঁড়াল। সেকেন্ড অফিসার খানিকক্ষণ পরে রিসিভার নামিয়ে ঘুরে দ্বিতীয় অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাল, আমাদের তল্লাটে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ের কোন গ্যাঙ আছে?'

পাল যার নাম তিনি বললেন, 'মেয়ে? তিনটে ছেলে আর মেয়ে? ওই তো খালধারের হিমি আর তার নাগর। কিন্তু কেসটা কি?'

'প্যারাডাইসে ডাকাতি। রুটিন রিপোর্ট দিতে হবে। হিমির ফোরফাদার অবশ্য ওই কাজ করতে যাবে না, তবু ওদের ডেকে পাঠাও।'

কল্যাণ বলল, 'আমি আসছি।'

সেকেন্ড অফিসার ততক্ষণে কি সব লেখা শুরু করেছেন সেই অবস্থায় মাথা নাড়লেন। নির্জন রাস্তায় নেমে কল্যাণের পা সিরসির করতে লাগল। পুলিশ তাহলে বুঝতে পেরেছে ক'জন ছিলে। ওরা এখন পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করছে। আনন্দকে খবরটা দিতে হবে। এখন কোন অবস্থায় চারজনের প্রকাশ্যে দেখা করা উচিত নয়। জোরে জোরে পা চালাতে লাগল কল্যাণ।

সুদীপ আর অবনী তালুকদার মুখোমুখি বসেছিল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু উত্তেজিত শব্দ বিনিময় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবনী তালুকদার বললেন, 'তোমাকে টাকা দিয়ে আমার কি লাভ?'

'আপনাকে আর কখনও আমার মুখোমুখি হতে হবে না!'

'তোমাকে আমি কেয়ার করি নাকি? তোমাকে আমি ভয় পাই?'

'পান। মা এতকাল শুয়ে থাকলেও ভয় পেতেন। শেষ কাঁটা আমি। এটাকে উপড়ে ফেলার সুযোগ পাচ্ছেন, সুযোগটা হাতছাড়া করার মত বোকা আপনি নন।' সুদীপ নির্লিপ্ত গলায় বলল।

'সুদীপ, আমি তোমার বাবা, ডোন্ট ফরগেট ইট!'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'মানে? হোয়াট ডু য়ু মিন?'

'আমার বাবার মিনিমাম যেটুকু হৃদয় থাকা উচিত আপনার তা নেই।'

অবনী তালুকদারের মুখটা বুলডগের মত হয়ে গেল, 'টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?'

'ফূর্তি করব।'

'স্টপ ইট, এইভাবে কথা বলবে না আমার সঙ্গে। তুমি তাহলে এই বাড়িতে আর থাকবে না? আমার সম্পত্তির ওপর কোনদিন নজর দেবে না?'

'ঠিক বলেছেন।'

'কিন্তু এসব নিয়ে আমি কি করব? আমি মরে গেলে তো তুমি মালিক হবে। আমার ইচ্ছে না থাকলেও—।'

'আমার ইচ্ছে নেই। পাপের টাকা ভোগ করতে চাই না।'

'ও। তাহলে এখন টাকা চাইছ কেন?'

'পুণ্য করব বলে। অনেকক্ষণ একই কথা বলছেন, মালটা বের করুন।'

'ওই ভাষায় কথা বললে আমি এক পয়সা দেব না।'

'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন। নার্স কোথায়?'

'নার্স আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। আমার আয়া হলেই চলবে।'

'সাবাস!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে টাকা দিচ্ছি আমি। কিন্তু তোমাকে এখনই লিখে দিতে হবে ভবিষ্যতে আমার সম্পত্তির ওপর তোমার কোন দাবী থাকবে না।' অবনী তালুকদার উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। রাগী এবং অন্ধ মেয়ের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সুদীপ বলল, 'আপনি যা ইচ্ছে লিখে আনুন আমি সই করছি।'

হঠাৎ বেশ হালকা লাগল নিজেকে। সুদীপ দু'বার আঙ্গুলে তবলার বোল তুলল টেবিল ঠুকে। এবং সেই সময় জলের জাগ হাতে একজন অল্পবয়সী মেয়েকে সে দেখতে পেল। মেয়েটির গায়ের রঙ শুধু কালো নয়, মুখে সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। ঈশ্বর ওকে শুধু বাড়তি শরীর দিয়েছেন। মেয়েটি অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় সুদীপের দিকে স্পষ্টতই অপছন্দের দৃষ্টি রেখে গেল। সুদীপের চোয়াল শক্ত হচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। অবনী তালুকদার এখন যা ইচ্ছে করতে পারে। এই লোকটার পিতৃত্ব যখন সে অস্বীকার করেছে তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে মায়ের ঘরের দিকে তাকাল। তারপর নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। এবং তখনই বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি চলে এল। এই ঘরটায় সে এতকাল একা একা ছিল। দেওয়ালের দাগগুলো পর্যন্ত তার ভীষণ চেনা, ওই দাগগুলোকে নিয়ে মনে মনে কত ছবি এঁকেছে এককালে। এখনও বুকসেলফে তার বই, ওয়ার্ডরোবে জামা প্যান্ট। সুদীপ বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল অবনী

তালুকদার কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা এখন স্বাভাবিক নয়। একটু চিন্তিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। যদিও তিনি রাগত ভঙ্গিটা রাখার চেষ্টা করলেন, 'ওঘরে কি করছিলে?'

'শেষবার দেখে এলাম।'

সুদীপের কথা শেষ হওয়া মাত্র অবনী তালুকদার টেবিলে ফিরে গেলেন। সেখানে একটা মোটা লম্বা খাম রাখা ছিল। সেইটে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই নাও তোমার টাকা।'

সুদীপ এগিয়ে এসে খামটা তুলে নিল, 'কত আছে?'

'সত্তর। এর বেশি এক পয়সা দেবার উপায় নেই আমার। গুনে নিতে পার।

সুদীপ চিন্তা করল এক লহমা। না, আর চাপ দিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। সে নোটগুলোকে দেখল। বেশির ভাগই একশ টাকার বান্ডিল, দশও আছে। খামের মুখটা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অঙ্কে কখনই ভুল হয় না, তবে ওর মধ্যে জালি মিশে যায়নি তো?'

'জালি! জালি মানে?' হতভম্ব হয়ে গেলেন অবনী তালকুদার। ওঁর হাতে ধরা কাগজটা এবার কাঁপতে লাগল। সুদীপ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে কাগজটা টেনে নিল। তারপরেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাড়িতে টাইপরাইটার নেই। অথচ অবনী তালুকদার ইংরেজিতে টাইপ করিয়ে রেখেছিলেন। পুরো ব্যাপারাটাই তিনি পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। লেখাটা পড়ল সে। 'আমি সুদীপ তালুকদার, বয়স একুশ বছর দু'মাস তিনদিন, শ্রীঅবনী তালুকদারের একমাত্র পুত্র, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ঘোষণা করছি যে আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার পিতা শ্রীঅবনী তালুকদারের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির ওপর থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার ত্যাগ করছি। আজ থেকে আমি এবং আমার বংশধরগণ আর শ্রীঅবনী তালুকদারের স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবো না। এই ঘোষণা আমি কোন চাপের দ্বারা করতে বাধ্য হচ্ছি না।' নিচে তার নাম, আজকের তারিখ এবং ঠিকানা টাইপ করা।

সুদীপ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'সাক্ষী থাকবে না কেউ? কলমটা দিন।'

'দরকার নেই।' অবনী তালুকদার একটা সস্তা কলম টেবিলের ওপর রাখলেন।

সুদীপ বেশ যত্ন করে সই করল। তারপর কাগজ এবং কলম রেখে উঠে দাঁড়াল, 'এখন থেকে আপনি মুক্তপুরুষ। যা ইচ্ছে করুন কেউ বলতে আসবে না। চলি।'

সুপীদ পা বাড়াতেই অন্য গলায় কথা বললেন অবনী তালুকদার, 'সুদীপ, এটা কি ঠিক করছ?'

'মানে?' সুদীপ অবাক হয়ে ফিরে তাকাল।

'আফটার অল উই আর ফাদার অ্যান্ড সন। এইভাবে চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে?'

'আপনি তো এতকাল তাই চেয়েছিলেন। মাকে আপনি কোনকালেই সহ্য করেননি। আমার সঙ্গে আপনার কোন সেতু ছিল না। চিরটাকাল আপনি নিজের জন্যে ভেবে এসেছেন। তাছাড়া আমারও এই শাবকের জীবনে থাকার বাসনা নেই। প্লিজ, শেষমুহূর্তে আর কোন নাটক তৈরি করবেন না। টাকাগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।'

সুদীপ বেরিয়ে আসছিল, পেছন থেকে অবনী তালুকদার বলে উঠলেন, 'টাকাগুলো সাবধানে নিয়ে যেও, দিনকাল খারাপ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সতর্ক হল সুদীপ। এত সহজে টাকাগুলো হাতছাড়া করার মানুষ অবনী তালুকদার নন। তিনি টাকা দেবেন এটা বাড়িতে ফেরার আগেই ভেবে রেখেছিলেন, নইলে লেখাটা টাইপ করা হত না। টাকাটা যাতে হাতছাড়া না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে রাখেননি তো! দিনকালের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে নির্মল রাখার জন্যেই কি এই মন্তব্য! সুদীপ রাস্তাটা দেখল। এখন রাত হয়েছে। ঠাকুরের দোকানের সামনে দু-তিনজন খদ্দেরেব ভিড়। খানিকটা দূরে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। কোন সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ল না। বাঁ পাশের ফুটপাত দিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল সে প্যাকেটটাকে হাতে ঝুলিয়ে। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে কোনদিন হাঁটেনি বলে কেমন একটা ঘোর লাগছিল। প্রাইভেট কারটা দাঁড়িয়ে আছে ডান ফুটপাত ঘেঁষে। এই ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক। সে যখন প্রায় সমান্তরাল তখন একটা লোক গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে তাকে দেখল। সুদীপ আরও

জোরে পা চালাতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এই মুহূর্তে সাবধান হওয়া উচিত। কয়েক পা দৌড়ে চট করে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল সে। কোন দিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিল সুদীপ খামটাকে আঁকড়ে ধরে। এই গলিটা তার মুখস্থ। ছেলেবেলায় অনেক লুকোচুরি খেলেছে সে। ডান দিকের একটা বাড়ির পাশ দিয়ে একটা মানুষ যেতে পারে এমন পথ আছে। সুদীপ সেইটে ব্যবহার করল। এখন আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার কানে এল। এরা গৃহপালিত জীব। আক্রান্ত হবার ভয় নেই।

ঘড়িতে যখন এগারোটা তখন বালিগঞ্জ পার্ক রোডে পৌঁছাল সুদীপ। প্যারাডাইসে অভিযান করেও যা হয়নি এই মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিবড়ে মনে হচ্ছিল নিজেকে। বাকি পথটা অদ্ভুত আতঙ্ক নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কেউ আক্রমণ করেনি, সামনে এসেও দাঁড়ায়নি। অথচ প্রতিক্ষণই মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ আসছে।

লিফটে চেপে জয়িতাদের ফ্ল্যাটের দরজায় চলে এল সুদীপ। বেল বাজাতেই দরজা খুলল। সুদীপ দেখল অত্যন্ত সুন্দরী এবং সুবেশা এক মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে। তখনও ধাতস্থ হয়নি সুদীপ, কিছু বলার আগেই মহিলা প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

'জয়িতা আছে?'

'আছে। তুমি কে?'

'আমি সুদীপ। ওর সঙ্গে পড়ি।'

'ও। এত রাত্রে এসেছ, কি ব্যাপার?'

'আমি এখন এই বাড়িতে আছি।'

'এই বাড়িতে, মানে, আমাদের এখানে তুমি আছ অথচ আমি জানি না!'

সীতা রায়ের গলায় বিস্ময় ফুটে উঠতেই ভেতর থেকে জয়িতা বলে উঠল, 'বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে, ভেতরে আয় সুদীপ।'

॥ ১৪ ॥

সীতা রায় দুই ভ্রূ এক করে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর কোন কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। জয়িতা সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। যে ঘরে আমি ছিলাম সেখানে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। উনি হলেন সীতা রায়। আমার সম্মানিতা গর্ভধারিণী। এখন মেজাজ গরম আছে। ট্রিটমেন্টের জন্যে কিছু মনে করিস না। একটু মনের-কষ্টে
মেজাজ গরম আছে। ট্রিটমেন্টের জন্যে কিছু মনে কিরস না। একটু মনের কষ্টে আছেন।' জয়িতা কোমরে হাত রেখে বলল। এখন ওর পরনে হলদে পাঞ্জাবি আর সাদা প্যান্ট। সুদীপ কথা বাড়াল না। জয়িতা ওকে অনুসরণ করে ঘরে এল। এসে বলল, 'তোর জিনিসপত্র ওই আলমারিটার মধ্যে রেখেছি।'

সুদীপ চোখের কোণে আলমারিটা দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে।

জয়িতা টেবিলের ওপর উঠে বসে চেয়ারে পা রাখল, 'টায়ার্ড?'

'নট অ্যাট অল। জাস্ট একটু শুয়ে নেওয়া।'

'ঘুমোচ্ছিস? না চোখ বন্ধ করে ভাবছি।' এইরকম হল কথাটা।

'খাবি কিছু?'

'এখন থাক।' সুদীপ কনুইতে ভর দিল, 'অবনী তালুকদার টাকা দিয়েছেন। চাপ দিলেও আরও ম্যানেজ করতে পারতাম। কিন্তু প্রবৃত্তি হল না। আনন্দকে খবরটা জানানো দরকার।'

জয়িতার মুখটা উজ্জ্বল হল, 'গুড। টাকাগুলো কোথায়?'

সুদীপ মাথার পাশে রাখা প্যাকেটটা দেখাল।

জয়িতা একটু অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ওইভাবে হাতে ঝুলিয়ে টাকা এনেছিস? যদি পথে কিছু হয়ে যেত?'

সুদীপ বলল, 'হয়নি দ্যাটস অল। আমার জন্মদাতাই ছিনতাই করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন নিশ্চয়ই খুব আফসোস হচ্ছে ভদ্রলোকের। গয়নার ব্যাপার তোর গর্ভধারিণী জানতে পেরেছেন?'

'এখনও না। বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ফিরেছেন। দার্জিলিং-এর ঘোর এখনও কাটেনি। বোধহয় প্লেন লেট ছিল। সীতা-রামের সাক্ষাৎ হয়নি অযোধ্যায়।' জয়িতা চোখ বন্ধ করল, 'আমরা একটা প্যারাডাইস পোড়ালাম কিন্তু এখন ঘরে ঘরে প্যারাডাইসের নায়ক-নায়িকারা একই অভিনয় করে যাচ্ছে। তাদের তো জ্ঞানচক্ষু খোলাতে পারব না।'

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ এসে থামল. 'তোমার ফোন।'

সীতা রায় ঘোষণা করে ফিরে গেলেন। চট করে নেমে পড়ল জয়িতা। তারপর কোন কথা না বলে প্রায় দৌড় লাগাল। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল সুদীপ। সত্যি এখন ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু সীতা রায়কে দেখার পর থেকে খাবারের কথাটা বলতে সঙ্কোচ লাগছে। জয়িতা যাই বলুক না কেন, এই বাড়িতে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। এখন যে-কোন হোটেলে থাকার সামর্থ্য আছে তার। শুধুমাত্র পুলিস যাতে সন্দেহ না করে সেই ভয়ে এইভাবে থাকা।

চুকে গেল আজ সব সম্পর্ক। বলতে গেলে পৃথিবীতে সে এখন একা। সত্যিকারের মাতৃপিতৃহীন সে কবে হয়েছিল? নিজের মনেই সে হেসে ফেলল। জীবনের শেষদিকে মা অসুস্থ ছিলেন, একেবারেই শয্যাশায়ী কিন্তু যখন তিনি সুস্থ তখন তো বাবার কোন কাজের প্রতিবাদ করেননি। বাংলাদেশের মায়েরা চিরকালই স্বামীদের মার্শাল ল মুখ বুজে মেনে নিয়ে থাকে। তাদের সময় থেকে হয়তো অবস্থাটা পালটাবে। আবাব এই বাড়িতে সীতা রায় তো রামানন্দ রায়ের চেয়ে কোন অংশে কম যান না। স্বাধীন মহিলা হিসেবে তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরে আসতে পারেন বুক ফুলিয়ে। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তার পাল্লা নিশ্চয়ই সমান সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও জয়িতা মনে করে সে একলা। তার কোন যোগাযোগ নেই মা-বাবার সঙ্গে। ওই শ্রেণীর স্বাধীনতাভোগী মহিলারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোনভাবে নিজেদের দায়বদ্ধ বলে মনে করেন না। মিসেস অবনী তালুকদার এবং মিসেস রামানন্দ রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ হয়েও কোথায় এক হয়ে গিয়েছেন। এবং তখনই লোকটার মুখ মনে পড়ল। প্যারাডাইসের ককটেল রুমের লোকটা। কোনদিন সে চিন্তা করেনি কোন মানুষকে গুলি করে মারতে পারবে। প্রথমবার গুলিটা ছোঁড়ার সময় হাত কেঁপেছিল। দ্বিতীয়বার সরাসরি। একটি হত্যাকাণ্ড করে ফেলল সে, অথচ নিজেকে খুনী বলে মনে হচ্ছে না তার। ওই গা-ঘিনঘিনে অশ্লীল ব্যাপারটা না ঘটালে হয়তো তার মন অত শক্ত হয়ে খুন করতে পারত না। আইনের চোখে সে খুনী। কিন্তু এই আইনকে কে কেয়ার করে! যে দেশের আইন মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচার সাহায্য করে না, যে দেশের আইন শুধু অর্থবানদের পাহারাদার, সে দেশে এইরকম লক্ষটা খুন করতে সে সবসময় রাজী। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বোকামি করলে চলবে না। ঠিক এই কারণেই হোটেল নয়, আজ রাত্রে এই বাড়িতেই থাকতে হবে মেনে নিয়ে।

জয়িতা ফিরে এল। ওর মুখ উজ্জ্বল। এসে বলল, 'আনন্দ ফোন করেছিল। ওর মা এসেছিলেন। এখনও গ্রামের বাড়িতে কেউ খোঁজখবর নিতে যায়নি।'

সুদীপ চোখ বন্ধ করেই বলল, 'গেলেও লাভ হত না। অন্ধকারে কেউ দ্যাখেনি ভাল করে। তুই যে একটি মেয়ে এটাও কারও মাথায় ঢুকবে না। আনন্দটা লাকি।'

'কেন?' জয়িতা প্রশ্ন করল।

'না হলে এরকম মা পায়! ভদ্রমহিলা বিধবা। আনন্দ একমাত্র ছেলে। অথচ বাধা দেবার বদলে নিজে এসে সাহায্য করছেন। বিশ্বাস কর, আমার একটা কথা খুব মনে হয়। এদেশের মেয়েরা যদি চায় তাহলে বিপ্লব অনিবার্য। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান মেয়েরাই ঘটাতে পারে যদি প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি হয়ে যায়।' সুদীপ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল।

জয়িতা হঠাৎ উঁচু গলায় হেসে ফেলল। এবং তার হাসি থামছিল না।

সুদীপের মুখটা প্রথমে অবাক পরে গম্ভীর হয়ে গেল, 'হাসছিস কেন?'

কোনরকমে নিজেকে সামলে জয়িতা বলল, 'তোর মাইরি হেভি ফান্ডা। অবিকল মুজিবের মত কথা বলছিস।'

'মুজিব?' এবার সত্যি সত্যি বিস্মিত সুদীপ।

'মুজিবর রহমান। তোমরা সবাই ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

'ইয়ার্কি মারার লিমিট আছে জয়িতা। আর তাছাড়া মুজিব হলেন একটা ইন্সপিরেশন। একটা জাতকে যিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যদি তখনই শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে বাংলাদেশে তিনি চিরকাল আগুনের পাখি হিসেবে শ্রদ্ধা পেতেন।'

'কি হলে কি হত ভেবে লাভ নেই। এই মানুষটাকেই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিরক্তি কুড়োতে হয়েছিল তাঁর অতিরিক্ত স্নেহান্ধতার জন্যে। সেটাই ঘটনা। কোন জিনিস অধিকার করা যতটা শক্ত, তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন সেটাকে ঠিকমত লালন করা।' জয়িতা সিরিয়াস হল।

এইসময় শ্রীহরিদাকে দরজায় দেখা গেল। থপথপে পায়ে জয়িতার কাছে এসে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। জয়িতা সেটা পড়ে শ্রীহরিদাকে ইশারা করল, ঠিক আছে। শ্রীহরিদা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেলে জয়িতা ঘোষণা করল, 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ রায় তোকে জানাচ্ছেন যে তুই ওঁর ঘরে গেলে তিনি খুশী হবেন।'

সুদীপ নীরবে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, 'হয়তো তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এবাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে না। দাঁড়া। আনন্দ জিজ্ঞাসা করছিল তুই টাকা পেয়েছিস কিনা। আমি বলেছি পেয়েছিস। ও মিনিট চল্লিশের মধ্যে আসবে। ট্যাকসিতেই থাকবে। আমাকে বলেছে তোর কাছ থেকে অন্তত পনেরো হাজার টাকা নিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে। যারা মাল দেবে তারা আজ রাত্রেই টাকা চায়। আগামীকাল সকালে ও এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।'

সুদীপ বলল, 'দরকার নেই। আমি ওর সঙ্গে দেখা করছি এখন। আগামীকাল সকালে আমি এই বাড়িতে থাকব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তোর বাবার নোটটা খুব গোলমেলে। উনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন এই ঘরে।' সুদীপ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে টাকা বের করল।

জয়িতা বলল, 'না, বোকামি করিস না সুদীপ। তুই এত রাত্রে গিয়ে ট্যাকসির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে ফিরে এলে দারোয়ানরা সন্দেহ করবে। ওরা তোকে চেনে না। দিনেরবেলায় এক কথা কিন্তু রাত্রে যাই ঘটুক লোকে তা অন্যচোখে দ্যাখে। আমাকে সবাই চেনে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

সুদীপ বলল, 'আনন্দকে বলবি আমি ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে চলে যেতে চাই।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'বলব।'

সুদীপ একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর গুনে গুনে পনেরো হাজার টাকা আলাদা করে এগিয়ে দিল, 'এগুলো একটা খামে ভরে ওকে দিস। আর বলিস যাচাই করে নিতে।'

জয়িতা কিছু বলল না। আনন্দ অত্যন্ত সতর্ক ছেলে। সুদীপ যে মানসিকতা নিয়ে কথাটা বলল সে-ব্যাপারে আনন্দ অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। সে ঘড়ি দেখল। চল্লিশ মিনিট বলেছে বটে তবে পাঁচ দশ মিনিট আগেও আসতে পারে। যদিও এত রাত্রে পনেরো হাজার টাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো শোভনীয় হবে না। কিন্তু ডিনারের পরে নিচের বাঁধানো ঘেরা চাতালে অনেকেই পায়চারি করে। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে গেটের দিকে নজর রাখা যাবে। জয়িতা টাকাগুলো নিয়ে বলল, 'চল্, তোকে রামানন্দবাবুর ঘরটা চিনিয়ে দিচ্ছি। যাবিই যখন তখন দেরি করে কি লাভ!'

সুদীপ বলল, 'আমি আগে বাথরুমে যাব। এইটুকু ফ্ল্যাটে ঘর চিনতে অসুবিধে হবে না। তুই বরং নিচে যা, আনন্দ এসে পড়তে পারে।'

জিনসের প্যান্টের ওপর নোংরা গেঞ্জিটা রাখা যাচ্ছিল না। বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বাটিকের

পাঞ্জাবি চাপিয়ে চুল আঁচড়ে একটু ভদ্র হয়ে নিল সুদীপ। সিগারেটের প্যাকেটটা রাখতে গিয়েও আবার পকেটে ভরে নিল। আজকাল একনাগাড়ে অনেকক্ষণ সিগারেট ছাড়া জেগে থাকতে পারে না। খাক কিংবা না খাক পকেটে সিগারেট আছে এটাই স্বস্তিদায়ক মনে হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটটাকে খুব নির্জন বলে মনে হল তার। ছোট্ট ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটা দেখল। কোণে একটা রঙিন টিভি চলছে। কিন্তু তাকে শব্দহীন করে রাখা হয়েছে। টিভির সামনে উবু হয়ে বসে মগ্ন হয়ে দেখছে শ্রীহরিদা। লোকটা যেহেতু কানে শুনতে পায় না তাই শব্দের কোন প্রয়োজন নেই। বোবা ছবিগুলোকে অন্যরকম মনে হল সুদীপের। এর একটা আলাদা মজা আছে। যে দেখছে সে ইচ্ছেমতন সংলাপ বসিয়ে নিতে পারে পাত্রপাত্রীর মুখে। ওপাশে দুটো ঘর। তার দুটো দরজাই বন্ধ। মনে হয় ওর একটিতে রামানন্দ রায় আছেন। দু'বার পিঠে চাপ দেওয়ার পর শ্রীহরিদার সম্বিত ফিরল। সুদীপ ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ঘরটায় তাকে যেতে হবে? তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সঠিক দরজাটা দেখিয়ে দিল শ্রীহরিদা। তারপর আবার টিভিতে সেঁদিয়ে গেল। সুদীপ নির্দিষ্ট দরজায় টোকা মারতে ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'ইয়েস, কাম ইন!'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা ছিমছাম ঘর দেখতে পেল সুদীপ। রামানন্দ রায় আরাম করে বসে আছেন। তাঁর পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। সামনে একটি পাশপোর্ট হুইস্কির বোতল, জলের জাগ এবং আধাভরতি গ্লাস। বোঝাই যাচ্ছে অনেকক্ষণ পান করছেন ভদ্রলোক। এক পলকেই সুদীপ বুঝল ভদ্রলোক চুলে রঙ বোলান এবং তাঁর চোখের তলায় ব্যাগ তৈরি হয়েছে। সুদীপকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, 'এসো। তোমার কথা আমি জয়ের কাছে শুনেছি। ওখানে বসো।' টেবিলের উলটোদিকে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। সুদীপ বুঝল ভদ্রলোক মদ খাচ্ছেন বটে কিন্তু এখনও নেশা হয়নি। কিংবা কোন কোন মানুষ নাকি আট-দশ পেগ খেয়েও স্বাভাবিক আচরণ করেন, ইনি হয়তো সেই শ্রেণীর। সুদীপ চুপচাপ চেয়ারটায় বসল।

রামানন্দ গ্লাস তুলে নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হোয়াটস দ্য ট্রাবল?'

'কি ব্যাপার?' সুদীপ শক্ত হল।

'ওঃ, আমি তোমাকে এইমাত্র বললাম জয় তোমার কথা বলেছে।'

'তাহলে তো জেনেই গেছেন। ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে আমার কোন প্রব্লেম নেই একটা ছাড়া।'

'হোয়াটস দ্যাট?'

'আপনাদের ফ্ল্যাটে থাকা। আপনারা পছন্দ না করলে সেটাই স্বাভাবিক হবে।'

'কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?' রামানন্দ রায়ের চোখ ছোট হয়ে এল।

'না। কিন্তু আমার অস্বস্তি আছে। এত রাত্রে কোথাও যেতে অসুবিধে হবে। আমি ঠিক করেছি কাল সকালে চলে যাব। আপনি আমাকে কিছু বলবেন বলে ডেকেছেন?'

'ইয়েস। আমি জানতে চাই, হোয়াট ইউ পিপল আর ডুইং?'

'মানে?'

'জয় একটা রাত বাড়িতে ছিল না। তারপরে তুমি এখানে হঠাৎ এলে। আই নো মাই ডটার। কেউ যদি বলে সে ফূর্তি করার জন্যে বাইরে রাত কাটিয়েছিল আমি বিশ্বাস করব না। আমি মনে করি সে মনে করেছে যুক্তিযুক্ত তাই তোমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। কিন্তু আমার জানা উচিত কেন সে বাইরে গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল?'

'আপনার মেয়ের ওপর যখন এতটা আস্থা রাখেন তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন না কেন?'

'জিজ্ঞাসা করেছি, সে উত্তর দেয়নি। দোষটা তার নয়, আমার। আমি কোনদিন তার কথা খেয়াল করিনি। আমার সঙ্গে চিরকাল ওর একটা কম্যুনিকেশন গ্যাপ রয়ে গেল। আমি ওকে বুঝতে পারি কিন্তু—'

রামানন্দ রায় আর এক চুমুক দিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

সুদীপ মানুষটিকে দেখল। লোকটা কতখানি জালি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। সে হাসল। এবং অম্লানবদনে বলল, 'আপনি মিছিমিছি চিন্তা করছেন। আমরা সবাই ক্লাসিক্যাল মিউজিকে গিয়েছিলাম।'

'ক্লাসিক্যাল মিউজিকে?' রামানন্দ রায় হাঁ করে গেলেন।

'হ্যাঁ, আমরা সব বন্ধুবান্ধবরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম। আপনাদের বাড়িতে পাইনি বলে জয়িতা বলতে পারেনি। আপনি কখনও হোলনাইট ক্লাসিকাল মিউজিক শুনেছেন?'

মাথা নাড়লেন দ্রুত রামানন্দ, 'না, না। আমি ওসব বুঝি না। হঠাৎ তোমরা ওই অনুষ্ঠানে গেলে?'

'আমিও ঠিক বুঝি না তাই যেতে চাইনি। কিন্তু আনন্দ বলল, না গেলে ভাল লাগার অভ্যেসটা শুরু হবে না তাই গেলাম। আপনিও একবার গিয়ে দেখুন।'

রামানন্দ বাকি মদটুকু শেষ করলেন, 'এই কথাটা আমাকে বললে কি অসুবিধে হত? এই মেয়েটাকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। তোমার বাড়িতে কি গণ্ডগোল হয়েছে?'

'মানে?'

'জয় বলছিল তোমার স্টেপমাদার নাকি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলায় তুমি বেরিয়ে এসেছ!'

কোনমতে হাসি চাপল সুদীপ। সে চট করে সেই কুদর্শনা দাসীটিকে স্টেপমাদারের তকমা পরাবার চেষ্টা করল। এতে হাসিটা বিস্তৃত হল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি—আমি একটা সিগারেট খেতে পারি? যদি কিছু মনে না করেন!'

'ও সিওর।' রামানন্দ একটি বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন, 'ছেলেমেয়েদের সিগারেট খাওয়ার সঙ্কোচ করার কি আছে? আমি শুধু জয়কে বলি সস্তা দিশি কিছু খেও না। খেতে হলে বিদেশী সিগারেট, ফিলটারটা ভাল থাকে।'

সুদীপ নিজের প্যাকেটটা বের করল না। বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন সিগারেটটা ধরাল সে। এই মানুষটির আয় কত? এই সিগারেট দিনে দু'প্যাকেট, আধবোতল স্কচ হুইস্কি, বড় হোটেলে লাঞ্চ, ক্লাবে ডিনার, দুটো গাড়ি, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট সুচারুভাবে চালাতে গেলে মাসে কত ব্যয় হয়? চাকরি করে এসব চালানোর খরচ পাওয়া যায়? ওর এক সরকারি অফিসারের সঙ্গে আলাপ আছে। ভদ্রলোক মাইনে পান সাতাশ শো। এক মেয়ে লরেটোতে পড়ে। ভদ্রলোক থাকেন তিনশো টাকার ফ্ল্যাটে। কিন্তু বাড়িতে কালার টিভি-ভি সি আর আছে। এটাও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ হাজারে অ্যামবাসাডর কিনেছেন ভদ্রলোক। গাড়ির পেছনে ড্রাইভার সমেত মাসে খরচ অন্তত দু'হাজার। উনি চালান কি করে? আশেপাশের মানুষ, তাঁর সহকর্মীরা কি নির্বোধ? কিন্তু চোখ বুজে থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকের। এখন একটু সুযোগ পেলেই মানুষ দু-নম্বরী কারবার করে। এবং সেটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মুশকিল হল এইসব মানুষের সামনে আয়না ধরলে তারাই আগে ছি ছি করে উঠবে। যে কারণে প্রতুল চৌধুরীকে কেউ পছন্দ করে না। আর পাঁচটা লেখকের মত ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প লেখেন না ভদ্রলোক। সরাসরি পাঠকদের নকল সাজগুলো খুলে ফেলে দেখিয়ে দেন তারা আসলে কি এবং কি হবার ভান করে থাকে! প্রথম প্রথম লোকের মজা লাগছিল। এখন জঘন্য, অশ্লীল বলে চিৎকার শুরু করেছে। প্রতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ করেছিল সে একদিন। খুব ভাল লেগেছিল। ভদ্রলোক বিশ্বাস করেন এই দেশটার প্রধান শত্রু এর জনসাধারণ। নিরানব্বুইজনই ভণ্ড।

'কি ভাবছ?' রামানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রতুল চৌধুরীর কথা।'

'সে কে!'

'একজন বিতর্কিত লেখক। আপনি বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়েন?'

'না ভাই, অত সময় নেই আমার। তবে হ্যাঁ, ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। খুব স্ট্রাগল করে আজ এখানে এসেছি। আমার বাবা ছিলেন গরীব মাস্টার। এসব কথা এখন তো কাউকে বলা যাবে না। আমি তো তোমাদের মত রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মাইনি। তুমি স্কচ খাও? নেবে?'

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সুদীপ। তারপর হেসে বলল, 'এখনও সুযোগ পাইনি।'

'জয় তোমার গার্লফ্রেন্ড?'

'না।'

'না? আই সি! তাহলে কি?'

'আমরা বন্ধু। ওকে আমার মেয়ে বলে মনেই হয় না।'

'হ্যাঁ, ওর শরীরটা—। আসলে ছেলেবেলায় একবার টাইফয়েড হয়েছিল। যাই হোক তাই বলে মেয়ে

বলে মনে হয় না এটা ভাবা ঠিক নয়। আসলে প্যান্ট পরে বলে—।'

'না না, আপনি ভুল বুঝছেন। ওর শরীর কোন ব্যাপারই নয়। একটি মেয়ে নয়, ও আমাদের একজন বন্ধু। এর মধ্যে মেয়ে হিসেবে কোন ভূমিকা ওর নেই।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তোমার বাবা কি করেন?'

'শুনেছি আইনের ব্যবসা করেন।'

'শুনেছ মানে?'

'আমি কোনদিন দেখতে যাইনি।'

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। আনন্দকে টাকা দিয়ে জয়িতা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। রামানন্দ রায় একটু টিপসি এখন। গলার স্বর ভারী। পরিশ্রম করে চিৎকার করলেন, 'কাম ইন।'

চাবুকের মত দরজাটা খুলে গেল। সীতা রায় গনগনে আঁচের মত করে ঢুকলেন। সুদীপ চমৎকার পারফিউমের অস্তিত্ব, সুগঠিত শরীরের বিদ্যুৎ এবং দাম্ভিক পদক্ষেপ দেখল। সীতা রায় সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার ঘরে গিয়েছিলে?'

চটজলদি মাথা নাড়লেন রামানন্দ রায়, 'নো। নো ডার্লিং।'

একটু থমকে গেলেন সীতা রায়। সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় তাঁর শরীরে একটা ঢেউ গড়িয়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে এক লহমা দাঁড়িয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার আলমারি কে খুলেছিল?'

'তোমার আলমারি? স্ট্রেঞ্জ! এত সাহস কার হল?' সত্যি যেন অবাক হয়েছেন রামানন্দ।

'লিশ্‌ন! আমি কদিন ছিলাম না, একটু আগে লক্ষ্য করলাম আমার একটা ভারী হার মিসিং। যাওয়ার কদিন আগে হারটা আমি ভল্ট থেকে এনেছিলাম। আমি জানতে পারি কি কে নিয়েছে?' মহিলার মুখে রক্ত জমছে এবার।

রামানন্দ রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি বসো ডার্লিং। বসো প্লিজ!'

সীতা রায় আপত্তি করতে গিয়েও করলেন না। চেয়ারে নোংরা আছে এমন ভঙ্গিতে সেখানে শরীর রাখলেন।

রামনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চাবি দিয়ে যাওনি আলমারিতে?'

'গিয়েছিলাম। এসেও দেখছি বন্ধ আছে। শুধু গয়নাটা নেই। এই বাড়িতে কেউ কখনও আমার জিনিসে হাত দেবে ভাবতে পারিনি। হয় তুমি, জয় কিংবা ওই বুড়োটা ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। আমি ফেরত চাই, কাল সকাল আটটার মধ্যে।'

কথা শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলেন সীতা রায়, হাত তুলে ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বলল সুদীপ, 'আপনার একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।'

মেদহীন মসৃণ চামড়ার মুখটি স্প্রিং-এর মত ঘুরল, 'হোয়াটস দ্যাট?'

'তিনজন নয়, চারজন। আপনি আমার নামটা ইনক্লুড করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এই বাড়িতে ছিলাম।' সুদীপ খুব সুন্দর করে হাসল।

আর সেটা দেখে যেন সীতা রায়ের শরীর জ্বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারি না রামানন্দ এত উদার হল কি করে? মেয়ে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাড়িতে থাকছে, চমৎকার!'

রামানন্দ চটপট প্রতিবাদ করলেন, 'সুদীপ জয়ের বয়ফ্রেন্ড নয়।'

কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, 'ইটস নট মাই হেডেক! মেয়ের ব্যাপারে যা ভালমন্দ তুমি বুঝবে। ঠিক আছে, চারজন, চারজনের কেউ ওটা ফেরত দিলে খুশী হবো।'

রামানন্দ নতুন করে হুইস্কি টানছিলেন, 'কিন্তু কে চুরি করবে? কার এত সাহস? তুমি একটু নেবে ডার্লিং। ওহো, তুমি তো আবার ভদকা ছাড়া কিছু খাও না!'

সুদীপ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'বলুন'। সীতা রায় তাকালেন না।

'এখানে বলাটা ঠিক হবে?'

সীতা রায় এবার ঘুরে বসলেন, 'কি বলতে চাইছেন?'

'এমন কথা যা হয়তো আপনি চাইবেন না উনি শুনুন।'

'লুক, আপনি ভনিতা না করে বলতে পারেন।'

'হারটা আপনি দার্জিলিং-এ ফেলে আসেননি তো?'

'না। সেখানে আমি হার নিয়ে যাইনি।'

'আপনি খুব নিশ্চিন্ত?'

'মোর দ্যান দ্যাট।'

'যিনি আপনার সঙ্গে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন তাঁকে একবার ফোন করুন না। হয়তো তিনি এমন কিছু তথ্য দিতে পারেন—।'

'শুনুন, আমি বলছি হার আমি এখানেই রেখে গিয়েছিলাম। সান্যাল কিছুই জানে না।'

'তবু যখন বলছে সান্যালকে জিজ্ঞাসা করো না ডার্লিং।' রামানন্দ বললেন। এখন ওঁর গলার স্বর আরও জড়ানো। চোখ ছোট হয়ে এসেছে।

'আমি ওই স্কাউন্ড্রেলটার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'সান্যাল তো স্কাউন্ড্রেল তা সবাই জানতাম। শুধু পরের বউ-এর সঙ্গে ঘুমানো ছাড়া ওর কোন কাজ নেই। তুমি বুঝেছ, বেটার লেট দ্যান নেভার ডার্লিং!' রামানন্দ যেন তৃপ্তি পেলেন।

'আমি কি বুঝি সেটা আমি জানি। আমি দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম কিছু পাহাড়ী বাটিকের জন্যে। সান্যালও ওখানে গিয়েছিল। দ্যাটস অল। আমি কাউকে কৈফিয়ত দিতে রাজী নই। সান্যাল নিশ্চয়ই স্কাউন্ড্রেল, লম্পট, কিন্তু তোমার ওই হিপো ঐন্দ্রিলা দত্ত তার চেয়ে কম নয়। আমি যাচ্ছি।' শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সীতা রায়।

'ওয়েল।' জড়ানো গলায় বললেন রামানন্দ রায়, 'গুডনাইট। কি যেন নাম তোমার? সুদীপ। গুডনাইট। কালকে বিদায় হও ভাই। আমার স্ত্রী চাইছেন না যখন তখন কেটে পড়। গুডনাইট।' গ্লাসের বাকিটা শেষ করে টলতে টলতে বিছানার দিকে এগোলেন রামানন্দ রায়। সুদীপ উঠে পড়ল। সীতা রায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালে আমার হার চাই। এ ব্যাপারে আমি কোন কথা শুনতে চাই না।'

সুদীপ আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল শ্রীহরিদা টিভির সামনে উবু হয়ে বসে। কিন্তু টিভিতে কোন ছবি নেই। স্টেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যদিও সেটটা বন্ধ করা হয়নি। নির্ঘাৎ বুড়ো ঘুমোচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে নবটা ঘুরিয়ে দিতে সীতা রায় বেরিয়ে এলেন। স্মার্ট পায়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি তখন কি বলছিলে? দার্জিলিং-এর ব্যাপারে?'

'আপনি তো আমার কথা শুনতে চাননি!'

সীতা রায় সুদীপের আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার ঘরে এস।' তিনি আর দাঁড়ালেন না। সুদীপ জয়িতার জন্যে তাকাল। তাকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। হার নিয়ে ওই ভদ্রমহিলা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বেন না। আপাতত জয়িতাকে সন্দেহের তালিকা থেকে সরানো দরকার। সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মধ্যরাত্রে সীতা রায় চুলে বেশ ব্রাশ বোলাচ্ছিলেন। বললেন, 'সত্যি করে বলতো তুমি কে?'

'আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম। আমার মা বাবা ছিলেন। তাঁদের দেওয়া নাম সুদীপ।'

'তুমি পাস্ট টেন্সে কথা বলছ?'

'ব্যাপারটা আমার কাছে অতীত বলে।'

সীতা রায়ের মুখে হাসি ফুটল। হাসলে এই মহিলাকে এখনও মিষ্টি দেখায়। বললেন, 'তোমাকে আমার বেশ অভিনব মনে হচ্ছে। শোন, দার্জিলিং-এ আমি হার নিয়ে যাইনি। শ্রীহরির কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ও চুরি করতেই পারে না। রামানন্দর সাহস হবে না আমার জিনিসে হাত দেওয়ার, সেটা আমি জানি। বাকি থাকল জয়িতা। ওকে আমি বুঝতে পারি না আজকাল। অদ্ভুত ব্যবহার করে। অত্যন্ত উদ্ধত। মুখের ওপর যা-তা কথা বলে। আর এসবই হচ্ছে রামানন্দর প্রশ্রয়ে।'

সরল মুখে সুদীপ বলল, 'জয়িতা তো গয়না পরতে ভালবাসে না। আমরা তো দেখিনি।'

কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, 'নিজের মেয়েকে সন্দেহ করতে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগছে না, কিন্তু এছাড়া তো আর কোন রাস্তা নেই। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব একলা মনে হয়। আই অ্যাম রিয়েলি

অ্যালোন! এবার দার্জিলিং-ট্রিপটা আমার খুব খারাপ গেল।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'কি মনে হয়? তুমি জানছ কি করে?'

'একজন স্কাউন্ড্রেল লম্পট মানুষের সঙ্গে সময় নিশ্চয়ই ভাল কাটে না। তবে ওকে তো সবাই জানত—।'

'আমি শোনা কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি সান্যালকে চেন?'

অম্লানবদনে মিথ্যে বলল সুদীপ, 'হ্যাঁ। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের স্ত্রী ওর বান্ধবী।'

'গুড গড! লোকটা—। অনেকদিন পরে আমি ভুল করলাম।'

'সান্যাল নিতে পারে না?'

'না না। সে ওসব ঠুনকো জিনিস চায় না। ও যে দার্জিলিং-এ আরও একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাচ্ছে তা কে জানত! আমাকে ও প্রথমে প্যারাডাইসে যেতে বলেছিল। সেখানে গেলে তো মরে যেতাম। কাগজে যা দেখলাম—!' শিউরে উঠলেন সীতা রায়, 'বড্ড বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওখানে এই হল আর বাড়িতে ফিরে এই দেখছি।'

'আপনি কিভাবে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন?'

'কেন, প্লেনে! আমি ট্রেনে বেশি ট্রাভেল করতে পারি না। সান্যাল এল। আমি তৈরি হয়ে নিলাম। তারপর সোজা এয়ারপোর্ট। বাগডোগরা থেকে ট্যাকসিতে দার্জিলিং-এ। জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'সান্যাল এখানে এসেছিলেন আপনাকে নিতে?'

'হ্যাঁ।' বলেই সীতা রায় স্থির হয়ে গেলেন। তারপরেই তাঁর মাথা নড়ল, 'ও যখন এই ঘরে বসেছিল তখন আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও জানবে কি করে কোথায় হার আছে!'

চটপট লুফে নিল সুদীপ, 'যারা জানার তারা জানে। আচ্ছা আমি আসি।' সে আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল। ভদ্রমহিলার মুখ এখন রক্তশূন্য হয়ে য়েছে। দার্জিলিং-এ যে প্রতারণা তিনি সহ্য করে এসেছিলেন, হার হারানো তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ঠেকছে। শরীরটা তো সাবান ঘষে সাফ করে নেওয়া. যায় কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার? সুদীপ হেসে ফেলল। আনন্দ যা চেয়েছে তা করতে গেলে আজই তিনটে গুলি খরচ করতে হত। অবনী তালুকদার, রামানন্দ রায় এবং সীতা রায়দের সংখ্যা যেভাবে হু-হু করে বাড়ছে তাতে অবশ্য তিনটে গুলি বাজে খরচের মধ্যে পড়ত। এই মুহূর্তে তার ভাল লাগল প্যারাডাইসের কথা বলার সময় সীতা রায়ের শি র ওঠা মুখটা মনে পড়ায়। আনন্দ এ ক্ষেত্রে ঠিক, ধাক্কা দেওয়া দরকার। আতঙ্ক কখনও কখনও মানুষের চেতনা ফিরিয়ে আনে। একবারে না হলে একাধিকবারে।

॥ ১৫ ॥

সকাল বেলায় আনন্দ আর কল্যাণ এল। সবে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে ওদের। জয়িতা দরজা খুলে নিয়ে এল এই ঘরে। সোফায় বসে কল্যাণ বলল, 'কি দারুণ ফ্ল্যাটে থাকিস তোরা!'

জয়িতা বলল, 'সাবধানে বসিস, যে কোন মুহূর্তে পায়া ভেঙে পড়তে পারে।'

সোজা হয়ে বসল কল্যাণ, 'সেকি রে!'

হো হো করে হেসে উঠল সুদীপ, 'দারুণ বললি জয়ী, কল্যাণ কথাটার ভেতরের মানে ধরতে পারেনি। ও বলছে বাইরেটাই সাজানো, ভেতরে ফাঁকা।'

গতরাত্রে জয়িতার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে তার। সে আর জয়িতা ডাইনিং টেবিলে খেয়েছে। বাকি দুজনের খাবার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে শ্রীহরিদা। রামানন্দ রায় খেয়েছেন কিনা জানা নেই, তবে সীতা রায় যে খেতে পারবেন না এটা বিশ্বাস ছিল। ক্রমশ এক সময় রাগ নয়, ওই মানুষ দুটোর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল সুদীপের: একটা সম্পর্করহিত-সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে আছে দুজনে। শরৎচন্দ্রের একটা লেখা পড়ে আনন্দ বলেছিল একদিন, 'চমৎকার একটা ব্যাখ্যা পেলাম। নেতিয়ে পড়া আত্মীয়তা। সারা

দেশটার মানুষের এখন ওই সম্পর্ক।' টার্মসটা এখানে প্রযোজ্য।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বাবা মা কোথায়?'

জয়িতা জবাব দিল, 'তাঁরা তাঁদের মতো আছেন। এ ঘরে কেউ আসবে না।'

কল্যাণ বলল, 'আমার যদি বোন থাকত তবে তার ছেলে বন্ধুরা এইভাবে বাড়িতে এলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত!'

জয়িতা তাকাল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তোর বোন হয়ে জন্মাইনি।'

কল্যাণকে থামাল আনন্দ, 'শোন সুদীপ, তুই ঠাকুরপুকুরে যেতে চাইছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আরও তিনটে দিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'কেন?'

'ঠাকুরপুকুর আমাদের চারজনের পক্ষে ভাল শেলটার। ওটাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আমি আগে গেলে ভাল হবে। আত্মীয় বেড়াতে এসেছে বলে পাড়ার সবাই ধরে নেবে। তোরা যখন যাবি তখন কাউকে তো বাইরে বের হতে হবেই। সেই কাজটা আমিই করব। আগে থেকে থাকলে লোকে সন্দেহ করবে না।'

কল্যাণ বলল, 'কথাটা ও ঠিকই বলেছে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বেশ। তাহলে আজ দুপুরের পর ওখানে চলে যা। সঙ্গে কল্যাণকে নিয়ে যাবি। যেন দুই বন্ধু বেড়াতে এসেছিস। কলকাতা দেখবি এমন ভান করবি। বুড়িকে ম্যানেজ করার ভার তোর। তোকে তো কেউ কেউ চেনে ওখানে। যাওয়ার সময় দুটো স্যুটকেস নিয়ে যাবি। মানে লোকে বেড়াতে গেলে যেভাবে যায় সেই রকম ভাবটা যেন থাকে।'

আনন্দ একটু চুপ করল। তারপর বলল, 'আজকের কাগজে প্যারাডাইসের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু নতুন খবর বেরিয়েছে। কাগজ সন্দেহ করছে এটা উগ্রপন্থীদের কাজ। কয়েক হাজার প্রায় নিরন্ন মানুষের সামনে ওখানে যা যা ঘটত তার বিশদ বিবরণ ছেপেছে ওরা। কোন সাধারণ ডাকাত হলে তারা ডাকাতি করত। কাগজ বলেছে যারা ঘটনাটা ঘটিয়েছে তারা চেয়েছিল প্যারাডাইস চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাক। কোন আর্থিক লোভের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বলা যেতে পারে উগ্রপন্থীরা সফল।'

আনন্দ থামলে জয়িতা বলল, 'যাচ্চলে! কাজটা করলাম আমরা আর কৃতিত্ব পাচ্ছে উগ্রপন্থীরা!'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'উগ্রপন্থী কারা?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'ওই যে, মাঝেমাঝেই কাগজে দেখি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, তারাই।' আনন্দ মাথা নাড়ল, 'প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে যারা সরাসরি আঘাত হানতে চায় তারাই উগ্রপন্থী। আমাদেরও যদি ওই পর্যায়ে ফেলা হয় তাতে আপত্তি করার কি আছে? কেউ কারও কৃতিত্ব দখল করছে না, তাছাড়া তোরা নিশ্চয়ই হাততালি পাবার জন্যে কাজে নামিসনি।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ কি আমাদের খবর পেয়েছে বলে মনে হয়?'

আনন্দ বলল, 'না। পুলিশের ধারণা ঘটনাটা যারা ঘটিয়েছে তারা স্থানীয় লোক নয়। নির্দিষ্ট ফর্মুলাতে তদন্ত চালালে কখনই ওরা আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। তবে সুদীপ, ওই প্রস্তাবটা আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। এই ধরনের ঘটনা ঘটাবার পরই আমরা কাগজগুলোকে টেলিফোনে জানাব কেন ঘটালাম। সরাসরি জনসাধারণের ব্যাপারটা জানা উচিত।'

জয়িতা বলল, 'প্যারাডাইসের ঘটনাটা মাথা থেকে চলে গেছে। এবার নতুনটা শুরু কর।'

আনন্দ হাসল, 'এবার খুব সহজে হবে না। মনে রাখিস নকশালরা পর্যন্ত ওখানে একটাও বোমা ফাটায়নি। তোদের কারোর সঙ্গে কোন ওষুধের দোকানের কর্মচারীর যোগাযোগ আছে?'

চুপচাপ শুনছিল কল্যাণ, বলল, 'আমার আছে।'

'না। তোর সঙ্গে দোকানের মালিকের জানাশোনা। ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর ভদ্রলোক তোকে সন্দেহ করতে পারেন। ঠিক আছে, আমিই ম্যানেজ করব। আমি আর সুদীপ দশটা নাগাদ বড়বাজারে যাব। কল্যাণ দুটো নাগাদ সুদীপকে মিট করবি ধর্মতলায় শহীদ মিনারের সামনে। ওখান থেকে তোরা চলে যাবি ঠাকুরপুকুরে। দুদিন জায়গাটা ভাল করে ওয়াচ করতে হবে।' আনন্দ বলল।

জয়িতা খানিকটা উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি করব?'

'ঘুমুবি। চুপচাপ বাড়িতে বসে রেস্ট নে। তুই আমাদের পোস্ট অফিস। এই বাড়িতে তোর এখন ভূমিকা কেমন? তোর ঘর এটা নয় নিশ্চয়ই!'

'না।'

'তোর ঘরে প্রাইভেসি আছে?'

'আমি ছাড়া আর কেউ যায় না।'

'চমৎকার। কাল রাত্রে যে জিনিসগুলো কিনেছি সেগুলো রাখার একটা জায়গা দরকার। আমার হোস্টেল মোটেই সেফ নয়। আমি ওগুলো আজ যে-কোন সময়ে এখানে পৌঁছে দেব। তুই বাড়ি থেকে কোথাও যাস না। পুলিশের পক্ষে এতদূর চিন্তা করা সম্ভব নয়। সুদীপ, তোর কাছে আর কত টাকা আছে? টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরপুকুরে যাবি।'

সুদীপ হাত বাড়িয়ে খামটা বিছানা থেকে তুলে নিল, 'বেশ কয়েক হাজার আছে।'

কল্যাণের চোখ বড় হল, 'তুই ওভাবে টাকাগুলো ফেলে রেখেছিস?'

সুদীপ বলল, 'কী হয়েছে তাতে! এ বাড়িতে ডেকে না আনলে চোর আসে না।'

কথাটা শুনে একমাত্র জয়িতাই শব্দ করে হাসল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ছেড়ে দে। আনন্দ, তুই ব্যাপারটা আর একবার খুলে বল্।'

'মাস দুয়েক আগে আনন্দর হোস্টেলের একটি ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়। সামান্য জ্বর। টুকিটাকি ট্যাবলেট খেয়েছিল ছেলেটি। জ্বর কমছিল কিন্তু অস্বস্তি ছিল। সন্ধ্যার পর জ্বর বাড়তে শুরু করে। ওটা এমন অবস্থা যখন লোকে ডাক্তার ডাকার কথা ভাবে কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার কথা চিন্তাও করে না। রাত দশটা নাগাদ ছেলেটির পেটে ব্যথা শুরু হল এবং বমি-বমি ভাব এল অথচ বমি হচ্ছিল না। তখন ছেলেরা হোস্টেলের ডাক্তারকে খবর দিল। সব হোস্টেলেই যেমন, এখানেও ভদ্রলোকের চিকিৎসা নিয়ে ঠাট্টা চালু আছে। ঘোড়া ছাড়া কেউ ওঁর ওষুধে সুস্থ হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব যত্ন করে দেখলেন। কিছু কিছু লক্ষণ ম্যালেরিয়ার হলেও সব মিলছে না। তিনি জ্বর এবং বমি কমাবার ওষুধ দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হচ্ছিল না। বাড়তে বাড়তে জ্বর চারে পৌঁছে গেল। এবং সেইসঙ্গে বমির ভাবটা বাড়ল। কাছেই মেডিক্যাল কলেজ। ভদ্রলোক একটা বমি বন্ধ এবং পেট ব্যথা সারানোর ওষুধ ইঞ্জেকশনে পুরে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে এতে কমবে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করি। তারপর প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দও সেই ঘরে ছিল। অসুস্থ ছেলেটি ভদ্র ব্যবহারের জন্যে সবারই প্রিয়। কিন্তু ইঞ্জেকশনটা পুশ করার পরই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ছেলেটির সমস্ত শরীরে লাল লাল দাগ ফুটে উঠল। তার জ্বর কমতে লাগল হু-হু করে। হাসপাতালে পৌঁছবার আধঘণ্টা বাদেই সে মারা গেল। হোস্টেলের ছেলেদের ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। বমি এবং ব্যথার ইঞ্জেকশনে কেউ মারা যায় না। হাসপাতাল থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হল রক্তচাপে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে—এই কারণ দেখিয়ে। ছেলেরা বৃদ্ধ ডাক্তারের ওপর হামলা করেছিল। তিনি সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন। ওই দুটো ওষুধের মিশ্রণ যে কোন মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। দরকার হলে তিনি আদালত পর্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিলেন। আনন্দর খুব খটকা লেগেছিল। সে পরদিন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিল। মৃত্যু এবং ছেলেদের আক্রমণে ভদ্রলোক তখন দিশেহারা। আনন্দ একা তাঁর সামনে বসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই রকম ইঞ্জেকশন আপনি আগে কখনও দিয়েছিলেন।'

বৃদ্ধ ডাক্তার মাথা নেড়েছিলেন, 'সারাজীবন, হাজার হাজার। কিন্তু কেন এমন হল এবার বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ঠিক কি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?'

ডাক্তার ইঞ্জেকশন দুটোর নাম বললেন। হঠাৎ আনন্দর মাথায় প্রশ্নটা এল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন তো, ওই ইঞ্জেকশন দুটো জেনুইন ছিল কিনা? আজকাল শুনেছি জাল ওষুধ বাজারে বেরিয়েছে।'

বৃদ্ধ ডাক্তারকে হতভম্ব দেখাল, 'তাই যদি হয় তাহলে আমি কি করব?'

'আপনার ইঞ্জেকশনগুলো কি স্যাম্পেল হিসেবে পেয়েছেন?'

'না। ফোনে যখন ছেলেটির অসুখের কথা বলা হল তখন তোমাদের ওখানে যাওয়ার সময় দোকান থেকে কিনেছিলাম। এ বাবদ বিল করলে তোমাদের হোস্টেল থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।'

'কোন্ দোকান থেকে আপনি কিনেছিলেন?'

ডাক্তার নাম বললেন। দোকানটাকে দেখেছে আনন্দ। মাঝারি দোকান। সে ইঞ্জেকশন দুটোর নাম লিখে নিয়ে সোজা দোকানটায় হাজির হয়েছিল। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ছিলেন দোকানে। দুটো ফাইল কিনল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা ওষুধ কেনেন কোত্থেকে?'

'কেন?' ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

'না, আমি জানতে চাইছি। সরাসরি কোম্পানি থেকে কিনে আনেন?'

'না। হোলসেলারের কাছ থেকে।'

কথা বাড়ায়নি আনন্দ। ওখান থেকে সোজা প্রফেসর চ্যাটার্জীর গবেষণাগারে চলে গিয়েছিল। প্যাথলজিস্ট এই মানুষটি আত্মভোলা। আনন্দকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁকে বিস্তারিত বলেছিল সে। ভদ্রলোক বাক্সসুদ্ধ ওষুধদুটো নিয়ে দেখেটেখে বললেন, 'তোমার এমন সন্দেহ হল কেন? ব্যাচ নম্বর পর্যন্ত দেওয়া আছে। যা যা আইনে দরকার তার সবই ছাপা আছে। জাল ভাবার কোন কারণ দেখছি না।'

আনন্দ এও বলেছিল, 'হয়তো কোন কারণ নেই। কিন্তু এই দুটো দেওয়ামাত্র সমস্ত শরীরে চাকা চাকা লাল দাগ ফুটে উঠবে কেন? কেন মনে হবে রক্ত জমে যাচ্ছে চামড়ায়? আমার বিশ্বাস রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবার কারণ ওটা। পোস্টমর্টেম করলে বোঝা যেত।'

প্রফেসর চ্যাটার্জীর নির্দেশমত বিকেলবেলায় সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল আবার। এর মধ্যেই তিনি পরীক্ষা করে রাখবেন। গিয়ে দেখলে চ্যাটার্জী খুব উত্তেজিত। মুখোমুখি হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় কিনেছ এইগুলো? ইটস ডেঞ্জারাস, রিয়েল ডেঞ্জারাস।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। প্রফেসর বললেন, 'দুটো ওষুধ ওদের কোম্পানি তৈরি করতে পারে না। কারণ বমির ওষুধটাতে আর যাই থাক বমি বন্ধ হবার কোন উপকরণ নেই। ব্যথারটাতেও তাই। যারা তৈরি করেছে তারা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ষাট ভাগ কমাতে পেরেছে। এই ওষুধ পুশ করলে কার যদি উপকার হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ মানসিক। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এই ওষুধ পেশেন্টের ক্ষতি করবে না। কোন খারাপ লক্ষণও দেখা যাবে না। ফলে এটা জাল কিনা তা বোঝার কোন উপায় রইল না। কিন্তু মুশকিল হল, ওই দুটো ওষুধ মেশালে যে রি-অ্যাকশন হবে তা মারাত্মক। সরাসরি রক্তে অ্যালার্জি শুরু হয়ে যাবে। শরীরে তার চাপ বাড়বে। এবং সেইসঙ্গে রক্ত দানা বাঁধতে শুরু করবে। এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। ডাক্তাররা না জেনে পাপের অংশীদার হচ্ছেন। ইট শুড বি স্টপড্, রাইট নাউ। আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এক্ষুনি পুলিশকে ইনফর্ম করে ওই দোকানের এই সব ওষুধ সিজ করানো উচিত।' প্রফেসর খুব দ্রুত কথা বলছিলেন।

সুদীপ বলল, 'কিন্তু ওই ওষুধগুলো অন্য দোকানেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। একটা দোকান থেকে নিয়ে কি লাভ হবে? বন্ধ করতে হলে সোর্সটাকেই আটকানো দরকার।'

'অফকোর্স। আই মাস্ট রাইট। সরকারকে আমি ডিটেলস দিয়ে লিখব। ওদের তো জাল ওষুধ বন্ধ করার একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু তার আগে থানায় যাব। ওরা ইমিডিয়েটলি দোকানটা বন্ধ করুক। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?' প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন।

ওরা প্রফেসরের সঙ্গী হয়েছিল। ও সি সবকথা শান্তভাবে শুনলেন। তারপর বললেন, 'দুটো ওষুধ একসঙ্গে মিশিয়ে শরীরে ঢোকাবার কি দরকার? আলাদা আলাদা ভাবে দিলেই তো হয়।'

প্রফেসর থতমত হয়ে গেলেন, 'মানে? ওষুধগুলো তো জাল।'

ওসি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা তো অনভিজ্ঞ মশাই। আপনার অভিযোগ উপযুক্ত দপ্তরে করতে হবে।'

'সেকি! পুলিশ জাল ওষুধের কারবার বন্ধ করবে না? ওই ওষুধ শরীরে ঢোকালে কোন কাজ হয় না।'

'কিসে কাজ হয় বলতে পারেন? কোন কিছুতেই কাজ হয় না। আপনি ডায়েরি করুন। আমি ওই

দোকান থেকে এই দুটো ওষুধ সিজ করে অথরিটির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা অ্যানালিসিস করে যদি প্রমাণ পায় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব কিছুর একটা নিয়মকানুন আছে মশাই। ধরুন চোখের সামনে দেখলেন একটা লোককে কেউ খুন করল, আপনি তৎক্ষণাৎ তার ফাঁসি দিতে পারবেন? আপনারা ডায়েরি করে যান, তারপর যা ব্যবস্থা নেবার আমি নেব।'

প্রফেসরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সুদীপ বলেছিল, 'এ তো ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা! ও সি-র কথা শুনে মনে হল একশ মাসে এক বছর। কি করা যায়?'

আনন্দ বলেছিল, 'কিছু করার নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

ওরা খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিল। ওই দোকানটি ওষুধ কেনে কোত্থেকে? যারা ওষুধ এদের বিক্রি করে তারা তা কার কাছ থেকে পায়? শেষ পর্যন্ত বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে একটা রাস্তার হদিশ পেয়েছিল ওরা। আনন্দ তখন ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোতে চায়নি। কারণ ওদের সেই পরিচিত ওষুধের দোকানটি পাঁচ দিন বন্ধ থাকার পর আবার স্বাভাবিকভাবে চালু হয়েছে। সেই সময় ওই ঠিকানায় পৌঁছে কোন লাভ হত না। বরং বিপদের সম্ভাবনাই থাকত। যারা জাল ওষুধের কারবার করে তারা নিশ্চয়ই নিরীহ মানুষ হবে না। এবং তার প্রমাণও পেয়েছিল ওরা। কেউ বা কারা প্রফেসরকে টেলিফোনে হুমকি দেয়, যদি তিনি জাল ওষুধ নিয়ে বেশি মাথা ঘামান তাহলে যে কোনদিন তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস নিতে হবে। সেদিনই খবরের কাগজে 'জাল ওষুধ বাজারে' শীর্ষক একটি সংবাদ বেরিয়েছে। টেলিফোনটি পাওয়ার পর প্রফেসর সাহস হারিয়ে ফেললেন। তিনি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বন্ধ করলেন। পশ্চিম বাংলায় যে কোন সাড়াজাগানো ঘটনার পরিণতি যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হল, দু'দিনেই লোকে বিস্মৃত হল, ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যেতে তাই দেরি হল না।

কিন্তু এই ঘটনাটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে চারজনেব। বড়বাজার মানেই অসৎ মানুষের ডেরা নয়। সেখানে নিরীহ, ভদ্রমানুষ প্রচুর আছেন। কিন্তু মতলববাজ ব্যবসাযীর সংখ্যা কম নয়। আনন্দর ধারণা গ্রামের একজন জোতদারের শোষণক্ষমতার চেয়ে লক্ষ গুণ ক্ষমতাবান হল এখানকার পুঁজিপতি অসৎ ব্যবসায়ীরা। ওই একটি অঞ্চল সমস্ত পূর্বদেশেব শুধু অর্থনীতি নয়, মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। রাইটার্সে সরকার আছেন ঠিকই কিন্তু একটি অদৃশ্য শাসনব্যবস্থা এখান থেকেই চালু আছে। সাতষট্টি থেকে বাহাত্তর—সারাদেশ যখন তোলপাড় তখন সাধারণ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল সিঁথি কিংবা কসবায় কিন্তু বড়বাজারে একটাও বোমা পড়েনি। পুঁজিপাতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থাকলে সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

সুদীপ বলল, 'আমাদের জানাশোনার মধ্যে একটি প্রাণ অকারণে শেষ হয়েছিল। কিন্তু আর একজন এই জাল ওষুধের শিকার হয়েছে আমি জানি না। এসব কেউ বন্ধ করবে না। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় বৃথাই আমরা মাথা ঘামাচ্ছি। শরীরের একটা অংশে যদি পচন ধরে সেটা কেটে বাদ দিয়ে দেহটাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু যে দেহের সর্বত্র পচন সেখানে কোন্‌টা বাদ দিবি? যেদিকে তাকাবি কোরাপশন! ট্রাফিক পুলিশ থেকে সরকারী অফিসার হাত বাড়িয়েই থাকে। খাবার ওষুধ এমন কি মানুষ স্বপ্নেও ভেজালে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েগুলোকে রেখে বাকি সব সিটিজেন অফ ইন্ডিয়াকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসা যায় তাহলে হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক সমাজব্যবস্থা গড়ে নিতে পারবে।'

আনন্দ হেসে ফেলল, 'তুই যেমন এই কথা বলছিস তেমনি দেশের কিছু কিছু মানুষ ওই অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা শুধু তাঁদের আলস্যকে বিরক্ত করব। এই সব মানুষকে কিন্তু তুই সমুদ্রে ফেলছিস না!'

'কি বলতে চাইছিস?'

'আচ্ছা ধর, আমার মা। কোন রাজনীতি বোঝেন না, প্যাঁচ পয়জারে নেই, তিনি চান আমি সুস্থ থাকি, দু'বেলা নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। তার জন্যে আমার একটা ভাল চাকরি কিংবা ব্যবসা চাই। তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আমি ব্যবসায় অসৎ মানুষকে ঠকাই কিংবা ফাঁকি দিয়ে চাকরি করে কর্তৃপক্ষকে ডোবাই। কিন্তু তিনি চাইবেন খাঁটি খাবার, ওষুধে অন্ধ-নির্ভরতা। এই মানুষটিকে তুই বর্জন করবি কোন্ যুক্তিতে? আর এইরকম মা-মাসী অথবা বোনের সংখ্যাই এই দেশে বেশি। পুরুষেরা যারা

অর্থের জন্যে বাইরে বেরিয়ে তাল রাখতে পারছে না তারাই বাধ্য হচ্ছে অসৎ উপায় অবলম্বন করতে। দশ জন অন্ধের সঙ্গে তোকে এক ঘরে কয়েক বছর রাখলে তোর নিজেরই লজ্জা করবে চোখ চেয়ে দেখতে। তুই তখন চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে সহজ হবি। চারপাশে লোকে যখন বেআইনি পথে জীবনযাপন করছে তখন নিজের অজান্তেই মানুষ তাই করে ফেলে। বেআইনটাই আইন হয়ে দাঁড়ায়।'

আনন্দ থামতে জয়িতা বলল, 'তাহলে তুই বলছিস পুরুষরাই কোরাপটেড, মেয়েরা নয়।'

'তা বলিনি। তবে একথা ঠিক মেয়েদের স্থির থাকার পার্সেন্টিজ নব্বুই ভাগ। এবং তার কারণ আছে। আমাদের দেশে মেয়েরা বাড়ির বাইরে টাকা রোজগার করতে আসছে বড় জোর চল্লিশ বছর। মা'র কাছে শুনেছি কলেজে পড়ার সময় মেয়েরা অধ্যাপকের পেছন পেছন ক্লাসে ঢুকত বেরুতো। সেটা তো সাতান্ন আটান্ন সালের কথা। দীর্ঘদিন গৃহবন্দী থাকায় মেয়েদের নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতনা তৈরি হয়েছে। একটি পুরুষের চেয়ে একটি শিক্ষিতা মহিলা অনেক বেশি ডিগনিফাইড্, নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখতে অনেক বেশি সচেষ্ট। ওই পুরনো সংস্কারেই বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এলে ওঁরা একটা পর্দা ফেলে রাখেন। জীবিকার প্রয়োজনে আজ মেয়েদের বাইরে আসতে হচ্ছে। একই অভাবী অবস্থায় দুজন কর্মচারী পাশাপাশি কাজ করলে দেখা যাবে দশজনের মধ্যে আটজন পুরুষ যেখানে ঘুষ নিচ্ছেন সেখানে হয়তো দশজনের মধ্যে দুজন মহিলা ঘুষ নিতে পারেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি এই দেশে যদি কখনও বিপ্লব আসে, যদি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় তাহলে মেয়েরাই সেটা করবে। এখনও সততা শব্দটাকে ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। অতএব সুদীপ, তোর সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের চার জনের পক্ষে এই দেশের ছবিটা পালটে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ধাক্কা দিতে পারি। এই ধাক্কার কাঁপুনিটা সাধারণ মানুষের মনে পৌঁছানো দরকার। হয়তো হাতেগরম ফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু কে বলতে পারে এটাই বীজ হয়ে দেখা দেবে না এক সময়! তবে চারটে ঘটনা ঘটনোর আগে কেউ যেন আমরা ধরা না পড়ি। ধরা পড়ার সুযোগ আছে এমন ঝুঁকি যেন না নিই। এবং যদি ধরা পড়ি তাহলে আদালতে আমরা কেউ উকিলের সাহায্য নিয়ে মিথ্যে বলব না। আদালতকে স্পষ্ট বলব আমরা কি করতে চেয়েছি কেন চেয়েছি।'

কল্যাণ বলল, 'আগে ধরা পড়ি তারপর ওসব ভাবা যাবে।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর এখনও এদেশের আদালতের ওপর বিশ্বাস আছে?'

জয়িতা হাত তুলল, 'আমরা কিন্তু বারংবার পুরোনো তর্কে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা এগোচ্ছে না। আমরা কি বড়বাজারেই প্রথম অ্যাকশন করব?'

কল্যাণ বলল, 'আমার মনে হয় আগে রেসকোর্সটা টার্গেট করা উচিত।'

আনন্দ মুখ ফেরাল, 'কেন?'

কল্যাণ এবার সোজা হয়ে বসল, 'রেসকোর্সটা মোস্ট ডেঞ্জারাস, অন্তত আমাদের সামাজিক অবস্থায়। প্রথম কথা, বিশাল জায়গা খোদ শহরের বুকে ফেলে রাখা হয়েছে। কলকাতায় এত স্পেস ক্রাইসিস অথচ কতকগুলো অর্থবান সেটাকে দখল করে রেখেছে মানুষকে বধ করতে। স্পোর্টস না ছাই! হাজার হাজার মধ্যবিত্ত গরীব মানুষকে বড়লোক হবার লোভ দেখিয়ে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেওয়া হয়। সরকার চোখের সামনে এই শোষণ দেখেও নির্লিপ্ত কারণ তারা শতকরা চল্লিশ ভাগ ট্যাক্স পাচ্ছেন। আমি একদিন রেসকোর্সে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা দেখতে। অন্তত নব্বুই ভাগ গরীব মানুষ এই লোভের শিকার হয়েছেন। একটা রেসে দশটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। যে কোন একটা জিতবে। অর্থাৎ যে টাকা পাবে সে বাকি ন'জনের লাগানো টাকার একটা অংশ পাচ্ছে। যারা টাকা দিচ্ছে তারা ওই ন'জনের টাকার সামান্য অংশ বিজয়ীকে দিয়ে বাকিটা হাতিয়ে নিচ্ছে। হিসেব করলে দেখা যাবে দশ টাকা যদি রেসুড়েরা খরচ করে তার চার টাকা নেয় সরকার, চারটাকা রেসকোর্স আর দু'টাকা পায় বিজয়ীরা। আর এই দু'টাকা রোজগার করতে তাদের দুশো টাকা বেরিয়ে যায়। এই শোষণযন্ত্রের চাপে গরীব আরও গরীব হচ্ছে। হাজার হাজার সংসার তার শিকার হচ্ছে। আর আশ্চর্য ব্যাপার জানিস, রেসকোর্সে দেখলাম অল্পবয়সী ছেলেদের ভিড়। ওই বয়সেই তাদের লোভের স্বাদ দেওয়া হয়েছে। সরকার জানেন ব্যাপারটা। আইন কর্তাদের সুবিধে দিচ্ছে। এইটা বন্ধ করা দরকার। স্পোর্টসের নাম করে মানুষ মারার এই যন্ত্রটাকে অকেজো করে দেওয়া উচিত।'

আনন্দ বলল, 'আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু রেসকোর্স বন্ধ করা সোজা ব্যাপার নয়। ওদের সিস্টেমটা ব্যাপক। প্যারাডাইসের মতো চারটে বোম ফেলে বন্ধ করা যাবে না। ব্যাপারটা আমি যেভাবে ভেবেছি তাতে কিছুটা সময় দরকার। সেদিক দিয়ে কিছুটা কাজও এগিয়েছে। আমি জানি কথা বলে কোন কাজ হবে না। তবু কথা বলব। টেলিফোনেই। ওদের সুবুদ্ধির কাছে আবেদন করব। এবং নাকচ হওয়া মাত্র সেটা খবরের কাগজে জানিয়ে দেব। সারা দেশে একটা টেনশন তৈরি হোক। কিন্তু তার আগে আমাদের আর একটি কঠিন কাজ করা দরকার। সেইটে ওই জাল ওষুধ বন্ধ করা। আমি মনে করি দুটো কারণে এটাই আমাদের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত। এই মিশ্রিত ওষুধ মানুষকে মেরে ফেলছে. এককভাবে কোন উপকারেই আসছে না। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা পরবর্তীকালে আমাদের সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে। এখন কিভাবে আমরা কাজটা করব?'

ওরা আলোচনা করল। কাজের কথায় এসে গেলে সুদীপ খুব সিরিয়াস। কল্যাণের একটু তর্ক করা অভ্যেস। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছে গেল ওরা। এতক্ষণ এই ঘরে কেউ আসেনি। হঠাৎ শ্রীহরিদাকে দেখা গেল। তার হাতের ট্রেতে চায়ের কাপ এবং বিস্কুট। কল্যাণ হেসে বলল, 'যাক, আমি ভেবেছিলাম তোদের বাড়িতে এসবের কোন ব্যবস্থা নেই।'

জয়িতা বলল, 'আমি কাউকে চা দিতে বলিনি। ইনফ্যাক্ট দিতে চাইনিও।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

তার কথা বলা শেষ হওয়ামাত্রই শ্রীহরিদা ট্রে নামিয়ে রেখে ঘোষণা করল, 'সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। তোমাকে একবার দেখা করতে বলল।'

সুদীপ অবাক হয়ে জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বললে কথা বুঝতে পারে?'

'আমাদের কথা পারে। চা খেয়ে নে।' ওর বলার ভঙ্গিতে উষ্ণভাব ছিল না।

কল্যাণ বলল, 'রাগ করিস না। আমার খুব দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়েব বাড়িতে রাত আটটায় যেতে হয়েছিল একবার। খুব বড়লোক, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকেন। কথা বলছি এমন সময় ভদ্রমহিলা বললেন, 'আটটা বেজে গেছে, এখন নিশ্চয়ই তুমি কিছু খাবে না?' বলাব ভঙ্গিটা এমন যে পেটে প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও হ্যাঁ বলতে পারিনি।'

সুদীপ বলল, 'আমি হলে বলতাম আজ্ঞে না, খিদে পেয়েছে খেতে দিন। আসলে তোর মধ্যেও এক ধরনের মেকি ভদ্রতা কিছুটা ঢুকে আছে।'

'বাজে কথা বলিস না।' কল্যাণের গলা উত্তপ্ত হল, 'কথাটা শোনামাত্র ভদ্রমহিলাকে আমার দয়া করতে ইচ্ছে করল। এই সব বড়লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

'এটাও এক ধরনের কমপ্লেক্স।'

'তুই কিন্তু গায়ে পড়ে পেছনে লাগছিস সুদীপ!'

জয়িতা উঠে পড়ল, 'আমি মাঝেমাঝে ভাবি আমরা চারজন একসঙ্গে মিললাম কি করে? সব কিছুর পেছনে যে কারণ থাকে একথাটা বোধ হয় সব সময় সত্যি নয়।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বেসিক বোধটা এক বলে আমরা তাড়াতাড়ি কাছাকাছি হয়েছি এবং আমি তোদের বলব ওইটেকে বাঁচিয়ে রাখতে। নইলে তোরা জয়েন্ট দিতে পারতিস, আই এ এস হতে পারতিস, এসব করার দরকার ছিল না। ভারতবর্ষের একটি ছাপ মারা নাগরিক হতে তোদের বেশি কষ্ট করতে হত না।'

হঠাৎ আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। সুদীপ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলল। জয়িতা বেরিয়ে এসে কয়েক পা হাঁটতেই রামানন্দ রায়কে দেখতে পেল। স্যুট-টাই পরে তিনি একটু অধৈর্যভঙ্গিতে অপেক্ষা করছেন। জয়িতা মুখোমখি হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'এভরিথিং অলরাইট?'

অভ্যস্ত প্রশ্নটি শুনে জয়িতার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'ডেকেছ?'

'না, মানে, তুমি আজ বেরুবে?'

'দেখি।'

'তোমার মা খুব আপসেট।'

'তাতে আমার কি?'

'আই নো, আই নো জয়, তুই আমাদের ঘৃণা করিস এটা বলেছিস। কিন্তু আমি তো কাউকে ঘৃণা করতে পারি না। কেউ একটা অন্যায় করলে আমি পালটা আর একটা অন্যায় করে নিজেকে ঠিক রাখি। আচ্ছা চলি।' রামানন্দ রায় হঠাৎ কথা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন। জয়িতা ওঁর চলে যাওয়া দেখল। এবং এই মুহূর্তে হঠাৎ তার বুকে একটা বাষ্প গুঁড়ি দিচ্ছিল। সে ওপাশের দরজাটার দিকে তাকাল। সীতা রায় কি করছেন সে জানে না। হার হারানো, না সান্যালের জন্যে তিনি আপসেট কে জানে! ব্যাপারটা ভাবতেই তার বুক থেকে বাষ্পটা মিলিয়ে গেল।

সুদীপ আনন্দ আর কল্যাণ য়ুনিভার্সিটির স্টপেজে নামামাত্র মনে হল কানের পর্দা ফেটে যাবে। ফুটপাত দখল করে মাইকে ছাত্র-কর্মচারীরা চিৎকার করে যাচ্ছে। কাছাকাছি দুটো দল পরস্পর পরস্পরকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। ওরা উলটো ফুটপাতে চলে এল। সুদীপ বলল, 'দু-দলের ডায়ালগ এক হয়ে কানে ঢুকছে?'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ডিফারেন্স পাচ্ছিস?'

'না।'

'এদের আন্দোলনটা কিসের জন্যে?'

দু'দলই পরস্পরকে দোষী করছিল। এক দল উপাচার্যের কীর্তিকলাপ বন্ধ করতে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছিল। আর একদল এদের বামফ্রন্টের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করছিল। ওরা লক্ষ্য করল প্রতিটি বক্তাই উত্তেজিত, হাত-পা নেড়ে বিশ্বরাজনীতিপ্রসঙ্গ নিয়ে আসছিল বক্তৃতাকে জ্বালাময়ী করতে। এবং তখনই ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফাটল সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে দু'দলে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি। ভাইসব যাবেন না, কমরেড ভয় পাবেন না। পিঁপড়ের লাইন থেকে আঙুল সরিয়ে নেবার পর তারা যেমন আবার একত্রিত হয় তেমনি কিছুক্ষণ পরে আবার বক্তৃতা আরম্ভ হল। এবার দু'পক্ষই পরস্পরকে বর্বর আক্রমণের জন্যে দায়ী করতে লাগল। আনন্দরা নড়েনি। পুরো ঘটনাটা দেখার পর আনন্দ বলল, 'ওরা কি করছে বল্ তো? কি ইস্যু নিয়ে এইভাবে নিজেদের শক্তি সময় অপচয় করছে? এতে কার কি লাভ হবে? আর ওরা তা জেনেই এইটে করছে। একটা নিরাপদ আন্দোলনের মধ্যে না থাকলে নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। দাদারা যা বলেছে তাই করছে ওরা। দেশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ দূরের কথা, সহপাঠীদের জন্যেও ভাবনা নেই। বোমাটা কায়দা করে এমন জায়গায় ফাটাল যাতে কারোর গায়ে আঁচ না লাগে। এসব দেখলে বমি আসে।'

আনন্দকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সুদীপ বলল, 'তাড়াতাড়ি চল্, হাতে সময় নেই।'

॥ ১৬ ॥

সত্যনারায়ণ পার্কের ঠিক উলটোদিকে কয়েকটা সরবতের দোকান আছে। বেশ সাত্ত্বিকভাবে দোকানদাররা গুছিয়ে বসেছে। আনন্দ এদের কথা শুনেছিল। সামান্য সিদ্ধি মিশিয়ে এই রাবড়ির চেয়ে লোভনীয় স্বাদের সরবতের জন্যে জম্পেশ ভিড় জমেছে।

কলেজ স্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে হ্যারিসন রোড ধরে ওরা যতই পশ্চিম দিকে এগোচ্ছিল ততই কলকাতার একটা সর্বভারতীয় চেহারা নজরে পড়ছিল। এই পথে অনেকবার যাতায়াত করেছে কিন্তু আজকের মত খুঁটিয়ে কখনও দ্যাখেনি। ব্যাপারটা একটা সময় এমন দাঁড়াল যে কল্যাণ না বলে পারল না, 'আমরা কোথায় এসেছি? রাজস্থান না উত্তরপ্রদেশে?'

আনন্দ বলল, 'তুই প্রাদেশিকতাদোষে দুষ্ট। উলটোদিক দিয়ে ভাবতে পারছিস না কেন? এইসব পরিশ্রমী মানুষগুলো তাঁদের দেশ জমি ছেড়ে কলকাতায় এসে ধীরে ধীরে জায়গাটাকে শুধু নিজের মত করেই নেননি, এমনকি ভৌগোলিক চরিত্র বদলে দিয়েছেন। তুই এখানকার মাটি কিংবা আকাশের দিকে তাকা, দেখবি কোন বাংলাদেশী গন্ধ নেই। এটা চীনেরাও পারেনি।'

সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ চারপাশে খুঁটিয়ে নজর করছিল। দোকানপাট, বাড়িঘর

এমন কি মানুষজনের হাঁটাচলার মধ্যে বাংলাদেশ নেই। বাইরে থেকে যারা আসে তারা সাধারণত নতুন দেশের অনেকটা গ্রহণ করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিরাট একটা এলাকাকেই নিজেদের মত পালটে নেওয়া কম কথা নয়। অত্যন্ত ক্ষমতাবান না হলে সেটা সম্ভবও নয়।

এই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণ, সরবত খাবি?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'খালি পেটে সরবত জমবে না। সকাল থেকে সলিড কিছু পড়ছে না। শালা জয়িতাটাও লিকুইড খাওয়াল!'

হঠাৎ আনন্দ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল. 'তোর খুব খেতে ভাল লাগে, না?'

'হ্যাঁ ভাই।' কল্যাণ সরাসরি মাথা নাড়ল, 'আমি খেতে চাই, প্রাণভরে ভাল খাবার খেতে চাই। এক এক সময় ভাবতাম যখন চাকরি করব তখন খুব ভাল ভাল খাবার খাব। জেলখানায় তো যা দেবে তাতে আমার আশা কোনদিন পূর্ণ হবে না। আমার পকেটে যদি তিনশো টাকা থাকত তা হলে একটা সাধ মিটিয়ে নিতাম।'

'কি সেটা?' এবার আনন্দ চারপাশে নজর বোলাচ্ছিল। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ভেতরে। ওখানেই ঢুকতে হবে তাদের। ঠেলা রিকশায় বেশ মন্থর হয়ে আছে পথটা।

কল্যাণ বলল, 'আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। কলকাতার কোথায় কোন্ দোকানে কি পাওয়া যায়। সেই সব খাবারের কি বৈশিষ্ট্য। অনেক কষ্টে কমিয়ে কমিয়ে ষাটটা দোকান বেছেছি। অ্যাভারেজে পাঁচ টাকা খরচ করলে তিনশোয় হয়ে যাবে। বেলা দশটায় শুরু করলে রাত দশটায় শেষ করা যাবে। খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে এই ইচ্ছেটা?'

'মোটেই না। চল্ হাঁটা যাক। ফেরার সময় ওই মিষ্টির দোকানটায় প্রথমে ঢুকব।' কল্যাণ নামটা পড়ল। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আরে, এই দোকানটার নাম ছিল আমার লিস্টে; দারুণ মিষ্টি করে ওরা! বেনারসের ঘরানায় তৈরি ওদের একটা মিষ্টির নাম—, যাঃ শালা ভুলে গেছি।' হাঁটতে হাঁটতে আনন্দ বলল, 'তুই আজ খাবার নিয়ে খুব উত্তেজিত হচ্ছিস!'

'উত্তেজিত? মোটেই না। মন খারাপ হয়ে যায়। তুই কেন মনে করিয়ে দিলি? আসলে খাবারের বিষয়ে বেশি আলোচনা হতেই আমার কি রকম যেন হয়। আচ্ছা আনন্দ, তুই আজ অবধি যা যা খাবার খেয়েছিস তার মধ্যে বেস্ট কোন্টা?'

'মনে নেই, বিশ্বাস কর। ভাল কিছু খেলেই মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল।'

'তোকে একটা কথা বলি। আমি তো খুব বেশি কিছু খাইনি। কিন্তু ফুলকপি দিয়ে পোস্তর একটা তরকারি করেন মাতৃদেবী। তুলনা হয় না।' দ্রুত এগিয়ে আসা একটা ঠেলার আক্রমণ শেষ মুহূর্তে সামলে নিল কল্যাণ। আনন্দ দেখল এখনও ওর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন। ওর মনে হল এই খাদ্যবস্তুটা কল্যাণকে ওর মা নিশ্চয়ই সহজে দিতে পারেন। অন্তত শীতকালে। সে কল্যাণকে আর এ বিষয়ে কথা চালাতে উৎসাহিত করল না। এই কল্যাণকে সে এতকাল দ্যাখেনি। কোন কোন দুর্বল জায়গায় স্পর্শ পেলে বোধ হয় মানুষ এমন ক্রেজি আচরণ করে ফেলে।

এই রাস্তায় কোন বঙ্গসন্তান চোখে পড়ল না। হাঁটুর ওপরে কোঁচা তুলে বাণিজ্যে বের হচ্ছেন ব্যবসায়ী, মাথায় ঘোমটা তুলে স্থূলাঙ্গী মহিলারা বাজারে যাচ্ছেন। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ভাই, মেডিসিনকা দোকান কিধার হ্যায়?'

'কোন্সা মেডিসিন?'

এইবার অসুবিধেতে পড়ল আনন্দ। তার হিন্দির দৌড় খুব বেশি নয়। তাছাড়া ফ্যাক্টরির বদলে সে দোকান শব্দটা বলে ফেলেছে। চেষ্টা করে সে বলল, 'যাঁহা মেডিসিন বানাতা হ্যায়।'

লোকটা হাসল, 'ও টিমার কোম্পানি! সিধা যাকে বাঁয়া গলি। মোহনলালজী কা কোম্পানি!'

আনন্দ দোকান ছেড়ে এগিয়ে বলল, 'লোকটা টিমার কোম্পানি বলল কেন? ওই ঠিকানায় তো অন্য কোম্পানির নাম পেয়েছি। টিমার মানে কি? আর মোহনলাল লোকটা তার মালিক?'

'হবে কিছু একটা। তুই তো নম্বর জিজ্ঞাসা করলে পারতিস?'

'তুই লক্ষ্য করিসনি। এখানকার বাড়ির গায়ে নম্বর পর পর নেই। ফ্যাক্টরি তো ছোট নয়, তাই চেনা সহজ। জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য কর।' এই সময় একটা ট্রাক প্রায় রাস্তা জুড়ে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছিল। ওরা কোনরকমে একটা রকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল ট্রাকটা ওষুধের বাক্সে

বোঝাই। ট্রাকের ওপরে দাঁড়িয়ে দুটো লোক তীব্র স্বরে চেঁচাচ্ছে যাতে সামনের রাস্তা পরিষ্কার হয়। ঠেলা এবং রিকশার কল্যাণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না যদিও। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা যা সন্দেহ করছি তাই যদি হয় তাহলে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হবে।'

'কেন?' আনন্দ ট্রাকটার ওপরে সাজানো ওষুধের বাক্সগুলোকে লক্ষ্য করছিল। খুবই নিরীহ চেহারার, আর পাঁচটা যেমন হয়। কল্যাণ বলল, 'এই রকম বিশ্রী জায়গায় ওরা কোম্পানি করেছে কারণ এর চেয়ে ভাল জায়গা পায়নি। ব্যবসাটা যদি খুব চালু হত তাহলে ওরা স্বচ্ছন্দে সেই জায়গায় উঠে যেত যেখানে ট্রান্সপোর্ট প্রব্লেম নেই। বেআইনি মাল এত ঝামেলার মধ্যে কেউ ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যায় না।'

'তুই যা ভাবছিস তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু নিজের কানেই শুনলি ওই দুটো ওষুধ হোলসেলারকে সাপ্লাই করে বড়বাজারের এই ঠিকানার কোম্পানি।' আনন্দ ট্রাকটাকে এগিয়ে যেতে দেখল।

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'এইটেই আমার কাছে গোলমাল লাগছে। যে দুটো ওষুধের এরা সাপ্লায়ার সে দুটো বাজারে খুব চালু। এর যদি সেটা বাজারে ছাড়ে তাহলে অরিজিন্যাল কোম্পানির ব্যবসা মার খাবেই। তখন তারা ছেড়ে দেবে? জাল কোম্পানিকে ধরিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগবে তারা। খুব গোলমেলে ব্যাপার আনন্দ।'

'যদি হোলসেলার আর এই কোম্পানি একই কনসার্ন হয়?'

আনন্দের প্রশ্নে একটু থিতিয়ে গেল কল্যাণ। তারপর বলল, 'আমরা আধ ঘণ্টার চেষ্টাতেই হোলসেলারের ওখান থেকে জানতে পারলাম কোত্থেকে সাপ্লাই আসছে। এত সহজে খবর বেরিয়ে যাওয়ার বিজনেস করবে বলে মনে হয় এরা?'

ওষুধের হোলসেল মার্কেটে গিয়ে চমকে গিয়েছিল ওরা। বড় বড় কোম্পানির নিজস্ব বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কলকাতার পশ্চিমের এই বাজার থেকে পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগ ওষুধের দোকানগুলো রসদ সংগ্রহ করে। ওই ওষুধ দুটোর সঙ্গে আরও কিছু ওষুধের বিরাট লিস্ট করে ওরা দোকানে দোকানে ঘুরেছিল। বমির ওষুধটা মার্কেটে সাপ্লাই ছিল না সেই মুহূর্তে। ওদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেই সময় একটা টেম্পোতে নতুন মাল এল। বাক্স দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কি ওষুধ আছে। ব্যাচ নম্বর ইত্যাদি কোড তাদের জানাও ছিল না। কিন্তু তার কিছুক্ষণ বাদেই বলা হল ওষুধ এসে গেছে। টেম্পোটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ টেম্পোর হেলপারের সঙ্গে কিছুটা খোসগল্প করে জেনেছিল ওরা আসছে বড়বাজারের এই ঠিকানা থেকে। সেখানে বিশাল কারখানা আছে। কল্যাণ বলছে এত সহজে খবর বেরিয়ে যাবে এমন কাজ ওরা করবে না। কিন্তু একটু আগে ট্রাকের ওপর ওষুধের বাক্সগুলোর গায়ে যে নম্বর পড়ল তা ওই টেম্পোর ওষুধের বাক্সের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে। তাহলে সেই হেলপার ছেলেটির কথা মিথ্যে নয়।

ওরা যখন সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে আবার এসে দাঁড়াল তখন আর কোন দ্বিধা নেই। টিমার কোম্পানি যে ওষুধ তৈরি করে তার চাহিদা বাজারে নেই। সরকারের কাছে লাইসেন্স পাওয়া মাথাধরার ট্যাবলেট এবং জ্বরের ইঞ্জেকশন মোটেই চালু নয়। আনন্দর স্পষ্ট ধারণা, এরই আড়ালে ওই দুটো ওষুধ তৈরি করে। কারণ দ্বিতীয় যে টেম্পো ওখান থেকে একটু আগে বের হল তার ওপরে তোলা ওষুধের বাক্সের নম্বর আলাদা। একটু আগে শোনা নামের খোঁজে ওরা কারখানায় ঢুকেছিল। তাদের বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেইসময় একটা বেয়ারা গোছের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে আনন্দ জেনেছিল এখানে জ্বর, মাথাধরা, পেটব্যথা এবং বমির ওষুধ তৈরি হয়। লোকটা খুব গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিল এখানে কোন শ্রমিকবিক্ষোভ নেই। মালিক খুব ভাল লোক। মোট সওয়া দু'শ মানুষ এই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। কিছুক্ষণ বাদে যে খবর নিয়ে গিয়েছিল সে এসে জানাল আপনাদের ভেতরে ডাকছে। মোহনলালবাবু নামক লোকটির কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ফিনফিনে ধুতি আর টেরিকটের পাঞ্জাবি-পরা সেই ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা? কি দরকার?'

আনন্দ বলল, 'আমি চণ্ডীগড়ে থাকি। এদের বাড়িতে উঠেছি। চণ্ডীগড়ে আমাদের ওষুধের বিজনেস আছে। সেখানে আপনার এক বন্ধু প্রায়ই আসেন আমার বাবার কাছে। উনি বলেছিলেন এখানে এলে

আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে।' আনন্দর কথা বলার ভঙ্গি এত স্বাভাবিক যে কল্যাণ পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল।

মোহনলালের মুখে এবার কৌতূহল, 'তোমরা চণ্ডীগড়ে থাকো?'

'ও না, আমি।'

'ওষুধের ব্যবসা? তোমার বাবার ওষুধের ব্যবসা আছে?'

'হ্যাঁ। এস কে রায় অ্যান্ড কোম্পানি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রামনিবাস বলেছিল বটে। খুব ভারী ব্যবসা তোমাদের।' এবার খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকালেন মোহনলাল।

'খুব বড় নয়, এই আর কি!'

'রামনিবাস কেমন আছে?'

'ভালই।'

'আরে তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো বসো। কি খাবে বল? চা না কোল্ড ড্রিঙ্কস্?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না না, এখন কিছু খাব না। বাবা বলেছিলেন আপনার কাছে এলে ফ্যাক্টরিটা দেখে যেতে। ব্যবসা কি করে বড় হয় তা জানতে।'

'ব্যবসা? ব্যবসা হল আগুনের মত। তাকে যত খাবার দেবে তত বেড়ে যাবে। সব সময় সাপ্লাই দিয়ে যেতে হয়। এই কোম্পানি একটা লিমিটেড কোম্পানি। আমি একজন ডিরেকটার, ব্যস। আজ একটু অসুবিধে আছে। আমারও সময় নেই। যাওয়ার আগে একদিন এসো দেখিয়ে দেব ঘুরিয়ে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওরা ফ্যাক্টরির কিছু অংশ দেখতে পেল। ওই অঞ্চলে প্যাকিং চলছে। প্রায় সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন মোহনলাল। বললেন, 'রামনিবাসকে বলো আমাকে ফোন করতে। আমি দিল্লি যাব নেক্সট মান্থে। তখন দেখা হবে।'

যে বেয়ারা দুটো দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা সসম্ভ্রমে তাকাল। বাইরে বেরিয়ে আনন্দ উলটো দিকের রাস্তায় হাঁটতে লাগল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

আনন্দ বলল, 'আয় না।'

বাড়িটার গায়েই আর একটা সরু গলি। এ দিকটায় ছোটখাটো দোকান বেশি। ঠিক দোকান না বলে গদি বলাই ভাল। খুবই ঘিঞ্জি এলাকা। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাড়িটার পিছনে চলে এসে একটা বিশাল গেট দেখতে পেল। গেটটা বন্ধ। ভেতরে একটা দারোয়ান টুলের উপর বসে আছে। গেটের ভিতরে দুটো টেম্পো দাঁড়িয়ে। এদিকের পথটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। খানিকটা বেঁকে আবার জে এন বাজাজ স্ট্রিটে পৌঁছে গেছে। টিমার কোম্পানির প্রধান প্রবেশপথ সত্যনারায়ণ পার্কের দিকে না হয়ে এদিকটায় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

কল্যাণ বলল, 'তোর বুকের পাটা আছে। কি ঝটপট মিথ্যে কথা বলতে পারলি!'

আনন্দ বলল, 'আমি ভাবছি মোহনলালের কথা। লোকটা অনেক বড় অভিনেতা।'

কল্যাণ বলল, 'মানে?'

'আমি চণ্ডীগড় থেকে এসেছি জেনেও উনি হিন্দিতে কথা বললেন না। এস কে রায় অ্যান্ড কোম্পানির নাম জীবনে শোনেননি তবু ভান করলেন কত শুনেছেন!'

'এটা ভুল হল। হয়তো ওই রকম কোন কোম্পানির নাম শুনেছেন বন্ধুর কাছে, এখন গুলিয়ে ফেললেন। এটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।'

'তাই? উনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন ওঁর কোন্ বন্ধুর কথা আমি বলছি তা হলে কি আমি রামনিবাস নামটা বলতে পারতাম?'

'হ্যাঁ মাইরি! আমার তো রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ভদ্রলোক নিজে থেকেই বন্ধুর নামটা বলে ফেললেন! তুই যদি উলটোপালটা নাম বলতিস—কিভাবে চান্স নিলি?'

'শোন, আমি ভেবেছিলাম কোন একটা ডাকনামের সঙ্গে আঙ্কল শব্দটা জুড়ে দেব। কিন্তু মোহনলাল সেই ঝুঁকি নিতেই দিলেন না। আমার বিশ্বাস রামনিবাস বলে কোন মানুষকে মোহনলাল চেনেন না। আমাকে নিয়ে চমৎকার খেলে গেলেন ভদ্রলোক।'

'সেকি রে! উনি ফোন করতে বললেন, দিল্লিতে গিয়ে দেখা করতে বললেন, সব জালি?'

'হ্যাঁ। রামনিবাস না বলে রামঅবতার বললেও আমি তা মানতাম। আর সেই কারণেই ফ্যাক্টরি দেখানোর ব্যাপারে অসুবিধে হয়ে গেল।'

'কিন্তু উনি আমাদের ধরতে পারতেন মিথ্যে কথা বলার জন্য। তা না করে চা অফার করলেন। এটা করে কি লাভ ওঁর?'

'ঝামেলাটা বাড়ালেন না। আমাদের মিথ্যেবাদী বললে একটা কিছু করতে হত। তাতে লোক জমতো। অথচ ভদ্রব্যবহার করে কাটিয়ে দিতে অসুবিধে হল না। এর পরে নিশ্চয়ই আমরা ওঁর কাছে যাওয়ার সাহস পাব না বলে উনি ভেবেছেন। এবং আমার বিশ্বাস ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর মোহনলাল লোক পাঠিয়েছেন কোথায় যাই জানতে।'

আনন্দর কথা শেষ হওয়া মাত্র কল্যাণ চট করে চারপাশে তাকাল। বাস, ট্যাকসি, প্রাইভেট আর রিকশার দঙ্গল সামনে। ফুটপাতে যাবতীয় দোকানের সামনে ভিড়। এর মধ্যে কেউ যদি দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে তাহলে বোঝার উপায় নেই। ওর মনে হল আনন্দ বোধ হয় একটু বেশি বেশি ভাবছে। মোহনলালের সঙ্গে কথাবার্তায় লোকটাকে অতখানি ধূর্ত মনে হয়নি।

আনন্দ বলল, 'চল্, মিষ্টি খাই।'

ব্যাপারটা মনঃপূত হল কল্যাণের, সে রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এখানে এসে কাজের কাজ হল না। আমরা তো কোন ডাইরেক্ট প্রমাণ পাচ্ছি না। কি করবি এখন?'

মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়ল আনন্দ প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে। দোকানটা বিশাল। শো-কেসের ভেতরে ওপরে নানান ধরনের মিষ্টি সাজানো। চমৎকার একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবি?'

কল্যাণ থমকে গেল। এত বিরাট সাইজের রকমারি মিষ্টি সে একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি। দু-তিনটে ছাড়া বেশির ভাগই সে চেনে না। মাঝারি সাইজের একটা মিষ্টি দেখিয়ে সে দাম জিজ্ঞেস করল। সেলসম্যান জানাল, 'চার টাকা পিস।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ চাপা গলায় বলল, 'ডাকাত মাইরি! দু'টাকার বেশি হওয়াই উচিত নয়।'

আনন্দ বলল, 'কোন্টা খাবি ঠিক কর তুই।'

কল্যাণ সেলসম্যানকে একটার পর একটা মিষ্টির দাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আনন্দ বুঝতে পারছিল কোনটাই কল্যাণের পছন্দ হচ্ছে না। তখন আর মিষ্টি নয়, মিষ্টির দামটাই ওর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত কল্যাণ কাঁধ নাচাল, 'না রে আনন্দ, চল্ অন্য দোকানে যাই।'

'কি হল? তোর তো কিছু সলিড খাওয়ার দরকার ছিল?'

'ছিল। কিন্তু এত হেভি দামের মিষ্টি আমি খেতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তোকে তো দাম দিতে হচ্ছে না, তুই খা যা ইচ্ছে করে।'

'ইম্পসিবল। এগুলো যদি আমার অজানা বস্তু হত তা হলে খেয়ে নিতাম। যে জিনিস বাইরে অর্ধেকের চেয়ে কম দামে পাব সেটা এখানে খেতে যাব কেন? তোর পয়সা বলে আমার বোধ কাজ করবে না? তুই আমাকে পাবলিক ভাবছিস?'

'পাবলিক?'

'হ্যাঁ পাবলিক। সব সময় দুইয়ে নিতে চায়। অন্যের পয়সায় বিষ পেলেও খাবে। একবার একটা মেলায় দেখেছিলাম হাজারখানেক পাবলিক লাইন দিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়েছে। কি ব্যাপার? না সাহেবরা বাজারের ব্যাগ বিনা পয়সায় বিতরণ করছে। ব্যাপারটা ভাব। চল্ বের হই।'

'কিন্তু কল্যাণ, এরা যখন দাম বেশি নিচ্ছে তখন জিনিসটাও তিনগুণ ভাল দিচ্ছে।'

'আমার খিদে লাগেনি, হয়েছে?' বাইরে বেরিয়ে এল কল্যাণ। তারপর বলল, 'কোনদিন তো বেশি খরচ করিনি কিংবা করার ক্ষমতা হয়নি তাই কেমন যেন আটকে যায়। দ্যাখ না, চটি কিনতে বাটার দোকানে যাই না, ফুটপাত থেকে কিনি।'

আনন্দ কোন কথা বলল না। ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কল্যাণ টিপিক্যাল নিম্নবিত্ত ছেলে। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে দারুণ সততা আছে। নিজের বিশ্বাস বা পছন্দ সরাসরি

বলতে কখনও দ্বিধা করে না। আর এইখানেই ওর সঙ্গে ওর শ্রেণীর তফাৎ। মাঝে মাঝে আনন্দ অবাক হয়ে ভাবে কি করে তারা চারজন একত্রিত হল। চারজনের রুচি, সমাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সংঘাত লাগেনি।

হঠাৎ সচেতন হল আনন্দ। কল্যাণ চুপচাপ তার পাশে হাঁটছে। এখন ওরা মহাত্মা গান্ধী রোডে। চট করে পাশের একটা পাইস হোটেলে কল্যাণকে নিয়ে ঢুকেই পেছন ফিরে তাকাল। দুটো লোক হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একজন রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। দ্বিতীয়জন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে হোটেলের দিকে তাকাতে তাকাতে সরে গেল সামনে থেকে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রে?'

'আয় ভাত খাই। পাইস হোটেলে আমি কখনও খাইনি।' তারপর দেওয়ালে ঝোলানো মেনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিন টাকা নিরামিষ পাঁচে আমিষ। দামটা তোব আওতায় থাকছে, কি বল্?'

কল্যাণ উত্তর না দিয়ে নোংরা বেসিনে হাত ধুয়ে এল।

মোটেই তৃপ্তি করে খেতে পারল না ওরা। রান্না ভাল নয়, টেবিল এবং থালায় ময়লা দাগ লেগে আছে। আশেপাশের মানুষগুলো বোধ হয় অভ্যস্ত, তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আনন্দর নজর ফুটপাতের দিকে ছিল। মোহনলাল যদি লোক পাঠায় তাহলে প্রমাণ হচ্ছে তার দুর্বলতা আছে। কিন্তু ওই দুটো লোক কি মোহনলালের কাছ থেকে এসেছে? চোখের আড়াল হবার পর তারা আর সামনে আসছে না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?'

'বাইরে বেরিয়ে বলব।'

দাম মিটিয়ে ওরা বাইরে এল। সেই লোকদুটোকে কাছাকাছি নজরে পড়ল না। একটা ট্রাম যাচ্ছিল শিয়ালদার দিকে। আনন্দ কল্যাণকে বলল তাতে উঠে পড়তে। দৌড়ে ওরা ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে পা রেখেছে, সেই সময় ভিড় ফুঁড়ে একটা লোক ছুটে সেকেন্ড ক্লাসে উঠে পড়ল। ট্রামে দাঁড়িয়ে আনন্দ হেসে ফেলল, 'চিনেছি।'

'কি চিনেছিস?'

'মোহনলাল আমাদের পেছনে লোক পাঠিয়েছে। আমার সন্দেহটা তাহলে ঠিক।'

'কি করে বুঝলি লোক পাঠিয়েছে?'

'আমরা যখন হোটেলে ঢুকলাম তখন যে লোকটা থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটাই এখন সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছে। আমরা কোথায় থাকি সেটাই বোধ হয় জানতে চাইছে।'

'কি করবি এখন?' কল্যাণ প্রশ্নটা করেই ভেবে নিল, 'ব্যাটাকে ধরব?'

'পাগল! ও ওর মত থাক, আমরা আমাদের মত। হাতে বেশি সময় নেই, সুদীপ দাঁড়িয়ে থাকবে।' চটপট টিকিট কাটল আনন্দ।

'যাচ্চলে!' কল্যাণ বলল, 'আমাকে তো একবার বাড়িতে যেতে হবে। কিছু জামাপ্যান্ট অন্তত আনা দরকার। কতক্ষণ সময় আছে হাতে?'

'তোর এখনই বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ তোরা এখনই ঠাকুরপুকুরে যাচ্ছিস না।'

'যাচ্ছি না?'

'না। নেমে পড়, একটা ট্যাকসি খালি হচ্ছে।' বলতে বলতে আনন্দ নিচে পা বাড়াল। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ট্রাফিকের জন্যে ট্রামটা দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ ছুটে গিয়ে ট্যাকসিতে বসে পড়ল।

ট্যাকসিওয়ালা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন?'

'এসপ্লানেড। উঠে আয় কল্যাণ।' আনন্দ দেখল ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস থেকে সেই লোকটা নেমে পড়েছে। কিন্তু এবার তার কি করা উচিত বুঝতে পারছে না।

ট্যাকসিওয়ালা বলল, 'আপনারা নেমে যান, অসুবিধে আছে।'

কল্যাণ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছিল, 'অসুবিধে কেন?'

'গাড়ি খারাপ আছে।' নির্বিকার মুখে ড্রাইভার বলল।

কল্যাণ ঝুঁকে এল সামনে, 'আপনি একটু আগে প্যাসেঞ্জার নামালেন। ভদ্রভাবে বলছি এসপ্লানেড চলুন।'

আনন্দ মুখ বাড়িয়ে একজন ট্রাফিক কনস্টেবলকে চিৎকার করে ডাকল, 'এই যে দাদা, এদিকে আসুন।'

লোকটা খুব বিরক্ত হল ডাক শুনে। দূর থেকে মুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? তাই দেখে ট্যাকসিওয়ালা হাসছিল। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'দেখুন মশাই, আপনি আমাকে চেনেন?'

এবার লোকটা বলল, 'চেনাচেনির কি আছে? অফিসটাইমে অতটুকু পথ গেলে আমার লস হবে। আপনারা অন্য ট্যাকসি দেখুন।'

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে বললেন কেন গাড়ি খাবাপ আছে?'

এবার কনস্টেবল কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

আনন্দ অভিযোগ করল, 'উনি যেতে চাইছেন না। ট্যাকসিওয়ালা রিফ্যুজ করলে আপনাদের কাছে কমপ্লেন করতে বলা হয়েছে। দুপুরবেলায় উনি অফিস টাইম বলছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসিওয়ালা হাত নাড়ল, 'আরে না দাদা, গাড়ি খারাপ আছে, এঁরা শুনছেন না।'

কনস্টেবল জিজ্ঞাসা করল, 'গাডি খারাপ?'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'মিথ্যে কথা! গাড়ি ঠিক আছে। এসপ্ল্যানেড যাব বলে উনি এসব বলছেন।'

কনস্টেবল মাথা নাড়ল, 'গাড়ি খারাপ কিনা আমি কি করে বুঝব? আমি তো মেকানিক নই। এসপ্ল্যানেড গেলে বাসে চলে যান। কাছেই তো!' কনস্টেবল আবার ফিরে গেল।

কল্যাণের মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। সে বলল, 'এই যে ড্রাইভার, এক মিনিটের মধ্যে যদি গাড়ি স্টার্ট না করেন তাহলে এটাকে জ্বালিয়ে দেব।'

ওর গলার স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে ট্যাকসিওয়ালা চমকে ফিরে তাকাল। কল্যাণ বলল, 'কাগজে পড়েছেন প্যারাডাইস কিভাবে পুড়েছে?'

আনন্দ শঙ্কিত হল। উত্তেজনায় কল্যাণ আরও কিছু না বলে বসে। হঠাৎ ট্যাকসিওয়ালা স্টিয়ারিং-এর দিকে ফিরে গাড়ি স্টার্ট দিল। সেই লোকটা এখন অনেকটা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি চালু করে ড্রাইভার বলল, 'প্যারাডাইসে লোকে বদমাইসী করতে যেত এর বউ ওর মেয়েকে নিয়ে। ওটা পুড়িয়েছে যারা তারা ঠিক করেছে। আমার গাড়ি পুড়িয়ে আপনাদের কি লাভ হবে? পেটের ধান্দায় ট্যাকসি চালাই। দুটো পয়সার লোভ ছাড়ব কেন!'

কল্যাণ এবার আনন্দের চোখের দিকে তাকাল। তখনই আনন্দ ফুটপাতে দাঁড়ানো লোকটাকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নেমেছেন আর প্যাসেঞ্জারদের কথা শুনবেন না? গাড়ি জ্বালাব না বললে তো আপনি যাচ্ছিলেন না!'

'গাড়ি আপনি জ্বালাতে পারতেন না। অ্যাক্সিডেন্ট না করলে আমাদের গাড়ি জ্বলে না। আপনি প্যারাডাইসের কথাটা বলামাত্র আমার মনে হল ফালতু ঝামেলা করে কি লাভ!'

'কেন মনে হল?'

'প্যারাডাইস যারা জ্বেলেছে তারা হিম্মতবাজ লোক। আমি মশাই একবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। আপ ডাউন প্লাস তিরিশ টাকা। নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এক সাহেব তার সেক্রেটারিকে নিয়ে আমার ট্যাকসিতে ফূর্তি করতে গিয়েছিল। মেয়ের বয়সী সেক্রেটারি। ঠিক করেছে পুড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু কি লাভ? পুরো দেশটাই তো এখন প্যারাডাইস।' শেষের দিকে ট্যাকসিওয়ালা যেন নিজের মনেই কথাগুলো বলল।

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ ওকে ইশারা করল চুপ করতে। ব্যাপারটা আনন্দর মন ভাল করে দিল। এই লোকটার বিরুদ্ধে একটু আগে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যে ব্যবহার করতে ও অভ্যস্ত তাই করেছিল। এবং এখনও নিজের দোষ লোকটা দেখতে পাচ্ছে না। অথচ প্যারাডাইস সম্পর্কে বেশ খবরাখবর রাখে। অন্তত একটি মানুষকে সে দেখতে পেল যে মনে করছে কাজটা ভাল হয়েছে। আচ্ছা, যদি লোকটা জানতে পারত তার গাড়িতেই সেই 'লোকগুলো'র দুজন বসে আছে তাহলে কি করত? হাত মেলাতো, না সোজা ওদের লালবাজারে পৌঁছে দিত? ঠিক উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

মেট্রোর সামনে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ওরা। এখন বেশ রোদ। যদিও এসপ্ল্যানেডে বেশ ভিড়। মেট্রোতে যে হিন্দী ছবিটা চলছে সেখানে কোন লোক নেই অবশ্য। একজন বাঙালি পরিচালকের তৈরি

আলাদা জাতের ছবি বলে কাগজগুলো খুব লিখেছে। অথচ দর্শক আসছে না মোটেই। ওরা রাস্তা পেরিয়ে শহীদ মিনারের দিকে এগোল।

দূর থেকে দেখতে পেল ওঁরা। সুদীপ সিগারেট খাচ্ছে। ওর পাশে জয়িতা, চোখে সানগ্লাস। জয়িতা তার খাটো চুল ঝুঁটি করে বেঁধেছে। এবং অবাক কাণ্ড, এখন ও শাড়ি পরেছে। সেই শাড়িটা যেটা ও পরে গিয়েছিল প্যারাডাইসে। মেয়েটাকে শাড়ি পরলে খারাপ দেখায় না। তারপরে সুটকেস দুটো নজরে এল। দেখলে মনে হবে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। ওদের দেখে সুদীপ ঘড়ি চোখের সামনে আনল, 'কুড়ি মিনিট লেট।'

আনন্দ বলল, 'সরি! তুই সানগ্লাসটা খোল।'

জয়িতার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কেন? খারাপ দেখাচ্ছে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। সেটাই গোলমাল। সবাই তোর দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ শাড়ি পরতে গেলি কেন? সুদীপ, আমাদের হাতে সময় নেই।'

সুদীপ শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'তোদের আজই ঠাকুরপুকুরে যাওয়া হবে না। জয়িতা তোর বাড়িতে ফিরে চল্।'

'কেন? আমি তোকে বলেছি ওখানে থাকব না।' সুদীপ প্রতিবাদ করল।

'তোকে থাকতে বলছি না। আজ রাত্রেই বড়বাজারে অ্যাকশন করব আমরা। ওরা সন্দেহ করেছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাববার আগেই অ্যাটাক করা দরকার। আর দেবি করিস না, তৈরি হতে হবে আমাদের।' আনন্দ হাত বাড়িয়ে আর একটা ট্যাকসিকে থামাল।

॥ ১৭ ॥

ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে যা ছিল সম্পদ তা তুলে দিয়েছিল আনন্দ। আপাতত সব থাকবে জয়িতাদের বাড়িতে। কল্যাণ চলে যাবে টুকিটাকি জিনিসপত্র আনতে। সুদীপ নিজের একটা ব্যক্তিগত কাজ সেরে ফিরে আসবে জয়িতার ফ্ল্যাটে আটটা থেকে সাড়ে আটটায়। একটা গাড়ি দরকার। এবং এই দায়িত্বটা নিয়েছে সুদীপ। হেঁকে বলেছিল, 'কলকাতা শহরে এত গাড়ি আর আমি একটা পাব না!'

নিজের বাড়ি সম্পর্কে জয়িতা হঠাৎ যেন বেশিমাত্রায় স্থির হয়ে গেছে। ও যা ইচ্ছে করতে পারে ওখানে, কেউ কিছু বলবে না—এই ধরনের আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে ওর। একথা ঠিক, সুদীপের সঙ্গে অবনী তালুকদারের যে সম্পর্ক ওর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের তা নয়। বড়লোক মানেই সামান্য হৃদয়বোধ থাকবে না একথা পাগলরাই ভাবতে পারে। বরং উঠতি বড়লোকদের মনে এক ধরনের দুর্বলতা সব সময় তিরতির করে কাঁপে। জয়িতা সেই সুযোগটা ব্যবহার করতে চাইছে। করুক।

চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিল আনন্দ। এখন তার রুমমেট সুরজিৎ নেই। একমাত্র রাতের অন্ধকার বাড়লে ওর সঙ্গে দেখা হয়। কোথায় যায় কি করে তা বলতে চায় না। আনন্দও জিজ্ঞাসা করেনি। একই ঘরে পাশাপাশি বাস করেও দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ হল না। এই ঘরে হয়তো আজই শেষবার শেষদিন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে রইল সে। ঘুম আসছে না। যে কাজ করবে বলে তারা নেমেছে সেটা ঠিক পথ নয়, কেউ কেউ বলবেন। প্যারাডাইসে যে মানুষগুলো মরল তাঁদের সবাই শয়তান নন। হয়তো দু'একজন নিরীহ মানুষ শুধু লোভের তাড়নায় ফুর্তি করতে গিয়ে বলি হল। কিন্তু প্যারাডাইসের মালিক? সেই শোষক লোকটার বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিল না। এই হত্যা কখনই ব্যক্তিহত্যা নয়। একটা চক্রকে ধ্বংস করা মানে ব্যক্তিআক্রোশ নয়। প্যারাডাইসকে যদি চলতে দেওয়া হত তাহলে প্রাথমিকভাবে দেশ কিংবা মানুষের খুব বড় ক্ষতি কিছু হত বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু এখন সেইসব লোভী মানুষেরা ভয় পাবে, তার গ্রামের গরীব মানুষগুলো আর অন্ধকারে থেকে সেই নকল আলোকে ঈর্ষা করবে না। আইন কোনকালেই ওখানে হাত বাড়াত না। কারণ আইনকে ঠেকিয়ে রাখার মত

সবকটা মুখোশ পরা ছিল। তাদের চারজনের পেছনে যেহেতু কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই, কোন বড় সংগঠন কাজ করছে না তাই তারা যা করবে তাই গুপ্তঘাতকের কাজ হবে? না, সে একথা মনে করে না। কারণ যে সুদীপ জীবনে কাউকে আঘাত করেনি সে ওই হত্যাকাণ্ডের পর একটুও গ্লানি বোধ করছে না, তারা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে। গুপ্তঘাতক এই তৃপ্তি কখনও পায় না। সুরথদার কথা মনে পড়ছিল। বেশ কিছুদিন আগে সে সুবথদার সঙ্গে তার কল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিল। সুরথদা বলেছিলেন, 'তোমাকে এমনভাবে ব্রেইনওয়াশড করল কে? এ তো স্যাডিস্ট টেরোরিজম ছাড়া কিছু নয়।'

স্যাডিস্ট টেরোরিস্ট? নিজেকে তাই ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল আনন্দ। সুরথদারা কতগুলো নির্দিষ্ট থিয়োরিতে বিশ্বাস করেন। এই এই পথে এগোলে দেশে বিপ্লব হবে, এই সব করলে সঠিক রাজনীতির পথে চলা হবে, ব্যতিক্রম মানেই বিভ্রান্তি। যেন বই-এ লেখা অক্ষরগুলো যা তাঁরা মগজে রেখেছেন তার বাইরে গেলেই রাজনীতির বাঁধানো সড়ক থেকে সরে যাওয়া। কোন বিকার তাকে আচ্ছন্ন করেনি। সুরথদারা যাই বলুক না কেন, ভারতবর্ষের মানুষকে কখনই কোন রাজনৈতিক দল বিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। সে নিজে কিংবা তার বন্ধুরাও ব্যক্তিগত খুনে বিশ্বাসী নয়। বিত্তবান মানুষ মানেই শেয়াল-হায়না তা পাগল ছাড়া কেউ ভাবে না। কিন্তু একটা প্যারাডাইস দাহন হাজারটা মানুষকে চিন্তিত করবে এবং যে মানুষটি এই দেশে বিষাক্ত-উত্তেজনা আমদানী করছিল তাকে হত্যা করা মানে নিরীহ মানুষকে খতম করা নয়।

দরজা ভেজানো ছিল। সামান্য নক সেখানে এবং তারপরেই সুরজিৎ ঢুকল। এই সময়ে আনন্দকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বেশ অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? দারোয়ান বলল তোমাকে নাকি এক ভদ্রমহিলা দু'বার খুঁজে গেছেন।'

'ভদ্রমহিলা? আমাকে?'

সুরজিৎ তার খাটের ওপর দুটো চকচকে মলাটের ইংরেজি বই আর একটা বাংলা উপন্যাস ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। দারোয়ানকে মহিলার বয়স জিজ্ঞাসা করার পর আর কৌতূহলী হবার কোন কারণ পাইনি।'

আনন্দ উঠে বসল। সে যখন হোস্টেলে ঢুকেছিল তখন দারোয়ানকে দ্যাখেনি। সুরজিৎকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলা কিছু বলে গেছেন?'

'উঁহু। দারোয়ান বলল উনি বলে গেছেন আবার আসবেন।' সুরজিৎ সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসল, 'আমার বোধ হয় ইন্ডিয়ার পাট চুকল।'

'ইন্ডিয়া!' আনন্দ একটু হোঁচট খেল। কোন বাঙালির মুখে ইন্ডিয়া শব্দটা অস্বস্তি আনে।

'হ্যাঁ, আমার কাকা যিনি শিকাগোয় থাকেন এবার আমাকে নিয়ে যাবেনই। এতদিন বাবার আপত্তি ছিল, আমি তো এই দেশ ছাড়ার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলাম, এখন সব সেটল্‌ড।'

আনন্দ চুপ করে থাকল। সুরজিৎ যখনই কথা বলে তখনই কোন বৃহৎ ব্যাপার ছাড়া ভাবতে পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই, সম্ভবত দার্জিলিং-এর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকেই ও দেশটাকে 'ইন্ডিয়া' ভাবতে শুরু করেছে। এবং কবে স্বপ্নের দেশে পৌঁছাবে এই আশায় বসে আছে। আনন্দ ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ বাংলা বই আনলে যে!'

'আমার এক বান্ধবী উপন্যাসটা গছিয়ে দিল। তুমি তো জান আমি থ্রিলার ছাড়া কিছু পড়তে পারি না। বাংলা যা লেখা হয় তা শালা দু'পাতা পড়া যায় না। হয় প্যানপেনে সাংসারিক গল্প, জোলো প্রেমকাহিনী কিংবা যত ইডিয়টিক ভাবনা। এই উপন্যাসটা নাকি পলিটিক্স নিয়ে লেখা। বিক্রি বাড়াবার কোন ধান্দা বোধ হয়। দেখি পড়ে।'

আনন্দ হাত বাড়িয়ে উপন্যাসটা নিল। ইদানীং বইটার নাম খুব শোনা যাচ্ছে। লেখকও নতুন। কিন্তু একটি উপন্যাসে ভদ্রলোক জনপ্রিয় হয়ে গেছেন। কয়েক পাতা ওলটাল সে। তারপরেই সে চমকে উঠল। এই উপন্যাসের নায়ক বাঙালি যুবক, থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। আরাফতের গেরিলাবাহিনীর একজন সদস্য। উপন্যাসটা খাটে রেখে দেওয়ামাত্র দারোয়ান দরজায় এসে দাঁড়াল, 'ওহো, আপনি আছেন! আপনাকে একজন মহিলা ডাকতে এসেছে। এর আগে দু'বার এসেছিল।'

আনন্দ চট করে পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল।

গেটের সামনেই ভিজিটার্সদের বসবার ঘর। আনন্দ সেখানে পৌঁছে দেখল কেউ নেই। দারোয়ান মাত্র ছ'মাস এখানে কাজ করছে, সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে বলল, 'উনি তো এখানেই ছিলেন।'

আনন্দ গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই মাকে দেখতে পেল। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। ও তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কি ব্যাপার?'

মাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। গ্রামে যাওয়ার পর থেকেই চেহারা ভেঙেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল খুব শুকনো। আনন্দর চেহারাটা দেখলেন তিনি। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তোর সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে।'

একটু অস্বস্তি, সেটাকে কাটিয়ে আনন্দ বলল, 'ভিজিটার্স রুমে বসবে চল।'

'না, এখানে নয়। তোর কাছে কেউ আসেনি?'

'না। বোধ হয় তুমি এর আগে দুবার এসেছিলে!'

'বাইরে কোথাও বসা যায় না?'

আনন্দ ফাঁপরে পড়ল। নিশ্চিন্তে কথা বলার জায়গা হল কফি হাউস। কিন্তু মাকে নিয়ে সেখানে বসা যাবে না। ওই চিৎকার সহ্য হবে না ওঁর। সে বলল, 'চল, বসন্ত কেবিনে গিয়ে বসি।'

মা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করলেন। আনন্দর খুব ইচ্ছে করছিল ব্যাপারটা জানতে। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। এই হোস্টেলে অনেকদিন আগে মা একবার এসেছিলেন। প্রয়োজন হলে চিঠিতে জানান। তাছাড়া আজ মানুষটাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা করার সাহস পেল না সে। য়ুনিভার্সিটির সামনে দিয়ে ওরা এগিয়ে এসে রেস্টুরেন্টের দোতলায় উঠে এল।

এখন এখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। দরজার সামনাসামনি একটা টেবিল খালি পেয়ে গেল ওরা। প্রকাশ্যে হয়তো ওরা বসতে চায়নি। একটু স্থির হয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবে তুমি?'

মা মাথা নাড়লেন, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চা বল্।' তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, 'তুই দুপুরে ভাত খেয়েছিস?'

আনন্দ দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাওনি!'

'তাতে কিছু এসে যায় না।' বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ তাকে দুটো চা আর টোস্ট আনতে বলল।

ঠিক সেই সময় কোণার টেবিল থেকে একটি মেয়ে উঠে এল, 'আনন্দ, সুদীপের খবর কী বল তো?'

চট করে নামটা মনে করতে পারল না আনন্দ। কিন্তু একে কলেজে দেখেছে। 'ভাল আছে।'

'ও কলেজে আসছে না কেন? আমি ওর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, সেখানেও নাকি থাকে না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়?' মেয়েটি একবার আনন্দ আর একবার মায়ের দিকে তাকাল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'দেখা হয়। ও বোধ হয় আর কলেজ করবে না।'

'সে কি? কেন?'

'সেটা ওর বলা উচিত।'

'তোমরা চারজনেই কলেজ থেকে ডুব মারলে কেন?'

'এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তাই? সুদীপকে বলো দীপা কারো অবহেলা সহ্য করে না।' মেয়েটি যেভাবে উঠে এসেছিল সেইভাবে ফিরে গেল কোণায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল আনন্দ। মেয়েটি এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল যেন নিজেকেই সুদীপ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এই সময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোরা কেমন আছিস?'

আনন্দ মুখ তুলল, 'ভাল।'

'তুই কতদিন ওই হোস্টেলে থাকবি?'

'জানি না। তবে সামনের মাস থেকে তোমাকে টাকা পা ত হবে না।'

'তোর আর ওই হোস্টেলে থাকা উচিত নয়।'

'কেন? কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল আজ সকালে। লোকাল থানা থেকে নয়, কলকাতা থেকে গিয়েছিল। গ্রামের সমস্ত মানুষকে জেরা করেছে। মুদির দোকানে বিপ্রদাসবাবুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?'

আনন্দর মনে পড়ল। তারা যখন গ্রামে ঢুকছিল তখন মুদির দোকানটার সামনে দিয়ে অন্ধকারে যাওয়ার সময় বিপ্রদাসবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, কে? সে পরিচয় দিয়েছিল। কলকাতা থেকে বন্ধুরা সঙ্গে এসেছে এটাও জানিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু উনি কাউকে দ্যাখেননি?'

'সেই কথা উনি পুলিশকে বলেছেন। সেন বাড়ির ছেলে আনন্দ কলকাতা থেকে বন্ধুদের নিয়ে রাত্রে গ্রামে এসেছিল, খবরটা পেয়ে পুলিশ বাড়িতে আসে।'

এই সময় চা আর টোস্ট দিয়ে গেল বেয়ারাটা। সেদিকে না তাকিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

মা বললেন, 'আমি দেখলাম অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। তাই বলেছি তুই দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলি বেড়াতে। রাতটা কাটিয়ে বকখালি যাবি বলে গিয়েছিস।'

'ওরা বিশ্বাস করেছে?'

'সেটা বুঝতে দেয়নি। তোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কোথায় থাকিস, কি পড়িস, রাজনীতি করিস কিনা এই সব। যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর কোন বান্ধবীকে আমি চিনি কিনা।'

'তুমি জয়িতার কথা বলনি?'

'না। গ্রামের সবাই জানে তিনজন ছেলে আর একজন মেয়ে ডাকাতিটা করেছে। জয়িতা সেদিন গিয়েছিল বললে আর কিছুই বলার বাকি থাকত না।'

'ডাকাতি?'

'সাধারণ মানুষের তাই ধারণা।'

আনন্দ ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণ কি নিশ্চিন্ত হয়ে সে হোস্টেলে শুয়েছিল! আজ সকালে যদি ওরা সার্চ করত তাহলে কালকের কাগজে পুলিশের কৃতিত্বের কথা হেডলাইন হত। কি কুক্ষণে বিপ্রদাসবাবুর নজরে পড়েছিল ওরা! আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কাজের মেয়েটাকে পুলিশ জেরা করেনি? ও তো জয়িতাকে দেখেছিল!'

মা জবাব দিলেন, 'ওর বাবার অসুখ বলে সকালে তাকে দেখতে গিয়েছিল। পুলিশ ওকে পায়নি। কিন্তু গ্রামের কেউ একজন সুদীপ আর কল্যাণকে অন্ধকারে বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখেছিল। ওদের কেউ চিনতে পারেনি, কিন্তু পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোরা রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি কিনা। ওরা সন্দেহ করছে।'

'তুমি কি উত্তর দিয়েছ?' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'কি উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া স্বাভাবিক?' মা চোখ তুলে তাকাতে আনন্দ আর কিছু বলল না। চুপচাপ চা আর টোস্ট খাচ্ছিল ওরা। তারপর মা বললেন, 'তোরা এবার কি করবি ঠিক করেছিস?'

'আমরা আর থেমে থাকব না।'

'আনন্দ, আমি তোকে না বলব না কিছুতেই, কিন্তু বলব বোকামি করিস না।'

'বোকামি কাকে বলে তাই নিয়ে তর্ক হবে মা।'

'আমি সেই তর্কে যেতে চাই না। তোরা চারজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে যা করতে চাইছিস তার পেছনে কোন দলের সমর্থন নেই। অর্গানাইজড্ হয়েও যেখানে একটা দেশের শক্তির সঙ্গে সব সময় লড়াই করা যায় না সেখানে তোদের অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছিস না?'

'আমি জানি। তোমার সঙ্গে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি মা। আজ যদি ভারতবর্ষের এক নম্বর বুর্জোয়াকে কেউ খুন করে বলে দেশের শত্রুকে খতম করলাম তাহলে হয়তো আইন তাকে ফাঁসি দেবে কিন্তু দুই তিন চার নম্বর বুর্জোয়ারা সামান্য হলেও থমকে যাবে। এবং সাধারণ মানুষ—।'

আনন্দকে থামিয়ে দিলেন মা। ওঁর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল, 'তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এই জীবনে আমি আমার জন্যে কিছুই চাইনি। তোর বাবা হঠাৎ চলে গেলেন, তোকেও আমি ধরে রাখছি না। শুধু বলব যা করবি ভেবে করিস।' মা একটু নিঃশ্বাস নিলেন। এখানে খানিকক্ষণ বসে, চা খেয়ে তাঁকে

একটু শান্ত দেখাচ্ছিল। তারপর বললেন, 'পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তোরা যদি কারও বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাস তাহলে কেউ তা দেবে, যখন শুনবে তোরা মানুষ খুন করে এসেছিস? অতি কুখ্যাত খুনী যখন নিজে খুন হয়ে যায় তখন মানুষ তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। মৃতরা চিরকালই নিরীহ।'

আনন্দ বলল, 'না মা, আমরা ভুল করছি না। আমরা কেউ বেঁচে থাকব না জানি। কিন্তু ধরো, আজ রাত্রে আমরা বড়বাজারের একটা জাল ওষুধ কারখানা ধ্বংস করব ঠিক করেছি, তুমি বলবে খবরটা পুলিশকে দিলে তারা ওটা বন্ধ করে দিত। হয়তো দিত। কেউ অ্যারেস্টেড হত কেউ হত না। তিন মাস কেস লড়ে তারা ঠিক বেরিয়ে আসত। এ দেশের আইন সব সময় চারপাশে ফাঁক রেখে দেয়। তারপর সেই লোকগুলো আবার আর একটা জায়গায় ওই ব্যবসা শুরু করত। আমাদের হোস্টেলের ছেলেটার মত হাজার হাজার প্রাণ চলে যাওয়ার বদলে ওদের শেষ করাটা আমি পবিত্র কাজ বলে মনে করি। তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমাকে কিভাবে তৈরি করবে কখনও বলনি তুমি, কিন্তু আমরা আমাদের মত করে আগামীকালের জন্যে আজকের দিনটাকে উৎসর্গ করতে চাই।'

বেয়ারা এসে প্লেটে মৌরি আর বিল দিয়ে গেল। মা বললেন, 'তুই এখনই ওই হোস্টেল ছেড়ে দে। তোর ধরা পড়া মানে তোর বন্ধুদের বিপদ। কিছু করার আগেই নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তোর বাবার মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি তোর কাছে কিছু চাইব না বলে ঠিক করেছিলাম, আজও সেটা পাল্টাবার কোন কারণ নেই। যা ভাল মনে করছিস তাই কর, সেটা যদি তোকে শান্তি দেয় দেবে।'

'তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ না কেন?' আচমকা আনন্দ প্রশ্নটা করে বসল।

মা হাসলেন, 'কি লাভ? তুই যদি একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক হতিস তাহলে তো এই দেশে আর একটি সুবিধেবাদী মানুষের সংখ্যা বাড়ত, এই তো!'

আনন্দ অবাক হয়ে গেল। মা ঠিক এইভাবে কথা বলবেন সে কখনও ভাবেনি। তার মনে হল পুলিশ যদি জানতে পারে তাহলে ওরা মাকেও ছাড়বে না।

'তোকে যে কথাটা বলার জন্যে এসেছি সেটা এবার বলি।' মা সোজা হয়ে বসেছিলেন, এবার সামান্য এগিয়ে এলেন। আনন্দ বুঝতে পারল না, পুলিশ তাকে যে কোন মুহূর্তে ধরতে পারে এ ছাড়া আর কি জরুরী কথা থাকতে পারে!

একটু ইতস্তত করলেন মা, তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তুই এক সময় আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতিস কেন তোর বাবা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন? কি দুঃখ ছিল ওঁর?'

আনন্দ হঠাৎ থমকে গেল। এই মুহূর্তে মা যে ওই প্রসঙ্গ তুলবেন তা কল্পনাতেও ছিল না। সে বলল, 'আজ হঠাৎ ওসব কথা তুলছ কেন?'

'আজ বলা দরকার। তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না। তোরও জানা উচিত। তোর বাবা আত্মহত্যা করার আগে জামশেদপুরের হোটেল থেকে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চেয়েছিল। লাইন পায়নি। তারপর সে একটা চিঠি লেখে। লিখে নিচে নেমে নিজের হাতে পোস্ট করে। ওই চিঠিটা আমি পাই কলকাতা ফিরে গিয়ে। চিঠিটার কথা কেউ জানে না। আমিও তোকে বলিনি। শুনেছি আত্মহত্যা করার সময় নাকি মানুষের এক ধরনের অ্যাবনর্মালিটি গ্রো করে। চিঠিটা পোস্ট করে যে আত্মহত্যা করেছে তার একটা লাইনেও কিন্তু অ্যাবনর্মালিটি নেই।' মা ব্যাগ খুললেন। প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতরে আর একটা ছোট ব্যাগ। সেই ব্যাগের চেন খুলে তিনি একটা খাম বের করলেন। এখনও তার রঙ নতুনের মত, মা সেটা এগিয়ে দিলেন, 'এটা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম এতকাল। আর রাখার দরকার নেই। তোর যা ইচ্ছে তাই করিস। এবার আমি চলি।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে মা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। খামটা হাতে নিয়ে আনন্দ বলতে পারল, 'চলে যাবে?'

হেসে ফেললেন মা, 'বাঃ, আমি এই রেস্টুরেন্টে সারাজীবন থাকব নাকি?'

ধক্ করে বুকের মধ্যে লাগল আনন্দর। ওর সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি শুরু হল। সেটা লক্ষ্য করে মা বললেন, 'পাগলামি করিস না। আমাকে গ্রামে ফিরতেই হবে। মেয়েদের পরীক্ষা নিচ্ছি। দুজন পড়তে আসবে। বেশি রাত হলে অসুবিধে হবে।'

দাম মিটিয়ে দিল আনন্দ। পাশাপাশি চুপচাপ নিচে নেমে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইখানে ধর্মতলার বাস দাঁড়ায় না?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল আনন্দ। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর টাকাপয়সার নিশ্চয়ই দরকার, তাই না?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, টাকাপয়সা আছে।'

বাস এসে পড়েছিল। হাত দেখিয়ে সেটাকে থামিয়ে মা বললেন, 'সাবধানে থাকিস। কোন দরকার হলে জানাস।' তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেলেন বাসের দরজায়।

অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাল আনন্দ। এখন রোদ নেই। ছায়া ঘন হয়নি। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। ধীরে ধীরে সে হেঁটে যাচ্ছিল য়ুনিভার্সিটির উল্টো ফুট দিয়ে। আজ ওখানে মাইকে বক্তৃতা হচ্ছে না, জমায়েতও নেই। খামটার দিকে তাকাল সে। ঘরে এখন সুরজিৎ রয়েছে। ও ডানদিকে বাঁক নিল। কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে জায়গা খুঁজতে লাগল। সবকটা চেয়ার হয় ভাঙা, নয় কারও দখলে। শেষ পর্যন্ত একা ঘাসের ওপর বসে পড়ল আনন্দ। কাছাকাছি কেউ নেই কিন্তু চারপাশে বেশ উৎসবের আঁচ লেগেছে যেন। এই যে মানুষগুলো, এরা অন্তত এই মুহূর্তে দুঃখী নয়। কোন রাজনীতি এদের মাথায় ঢুকবে না। আত্মসুখী মানুষগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে খামের ওপর রাখল। মায়ের নাম-ঠিকানা স্পষ্ট হাতে লেখা। মায়ের নামটায় দু'বার কালি বুলিয়ে মোটা করা হয়েছে। ওপরে দুটো ডাকঘরের ছাপ। এতদিনেও তো বেশ বোঝা যাচ্ছে! জামশেদপুরের ছাপটা পড়েছিল বাবার মৃত্যুর পরের দিন। খামের কাগজটা নরম হয়ে এসেছে। বোঝা যায় খুব যত্ন করে রাখা। হয়তো এই ক'বছরে একদম হাত পড়েনি। সন্তর্পণে ভেতরের কাগজ দুটো বের করল সে। বাবার প্যাডের কাগজ। ওপরে তারিখ, আত্মহত্যা যে রাতে করেন সেই রাত্রের এগারোটা তিরিশ মিনিট। বাবার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। কালো কালিতে লেখা চিঠি এখনও ঝকঝক করছে। বাবা মাকে অনু বলে ডাকতেন। এই চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। অনু লিখে বাবা শব্দটার চারপাশে কালির বৃত্ত এঁকেছেন। কেন? চিঠিটা পড়া শুরু করল আনন্দ। একজন মৃত মানুষের লেখা এত বছর পর পড়ার সময় অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল ওর।

'অনু। একটু আগে তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অপারেটর বলল কলকাতার লাইন এখন খারাপ। আমার বরাতটাই এই রকম, নইলে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না কেন? এই মুহূর্তটুকু আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান। অতএব বাধ্য হয়ে এই চিঠি।

কাব্য করে বলতে পারতাম এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি আর পৃথিবীতে থাকব না। যদিও ব্যাপারটা সত্যি। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই খবরটা পেয়ে যাবে। কারণ তোমার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং একটা ডিক্লারেশন আমার টেবিলে রেখে যাচ্ছি যাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে দিতে পারেন। এ দেশের পুলিশদের তো এইটুকু সাহায্য করা দরকার।

অনু, আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। কারণ এছাড়া আমার কোন উপায় নেই। বেঁচে থাকাটা তাদের কাছেই মূল্যবান যাদের আগামীকালের জন্যে আশা করতে ভাল লাগে। আমাকে ঘিরে এখন নানান সমস্যা। এবং কোনটাই আমি সমাধান করতে পারব না। তাছাড়া আমার বেঁচে থাকাটা অনেক ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি করছে। সবার ওপরে, বেঁচে থাকলে আগামীকাল আমি সুস্থ থাকতে পারব না। আমাকে সুস্থ থাকতে দেওয়া হবে না। শুধু সেই বেঁচে থাকাটা তোমাদের ওপর চাপ আনবে, তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

না, আজ কোন কথা তোমার কাছে লুকাব না। অনু, এতগুলো বছর আমরা একসঙ্গে বাস করেছি, বেড়িয়েছি, আনন্দ করেছি, একই বিছানায় রাত কাটিয়েছি কিন্তু তোমার কাছে সব কথা খুলে বলিনি। আমার জীবনের একটা দিক তোমাকে জানাতে চাইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম জানলে তুমি আপত্তি করবে, পরে মনে হয়েছিল, এতদিন জানাইনি বলে তুমি অপমানিত হবে। তুমি যদি খুব সাধারণ মনের মেয়ে হতে তাহলে এসব ভাবতাম না। তোমাদের মত গভীর মনের মেয়েদের নিয়েই যত মুশকিল। অত কাছে এসেও কিসের যেন ফারাক তৈরি করে রাখ।

তুমি জানতে না, আমি নকশালপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম। আমি ভোট দিতে যেতাম না, কারণ হিসেবে তুমি ভাবতে আলস্য। আমি যে চাকরি করি তাতে দু'হাতে ঘুষ নেওয়া যায়, অনেক

উপরে স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। আমার গাড়ি ছিল, ভাল ফ্ল্যাট ছিল, সুন্দরী স্ত্রী ছিল। অতএব বিশ্বাসটা যদি বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম তাহলে আরও অনেক বুদ্ধিজীবী নকশালপন্থীর মত দেশলাইবাক্সের জীবনযাপন করতে পারতাম। এই করে কেউ কেউ তো তলার কুড়োচ্ছে আবার গাছেরও খাচ্ছে। আমি পারিনি। সেই আন্দোলনের সময় থেকে যতটা সম্ভব আড়াল রেখে আমি একটার পর একটা কাজ করে গেছি। ঘুষ না নেওয়ায় এখনও সত্তর হাজার টাকার ঋণ আমার কাঁধে, যা আসলে পার্টির প্রয়োজনে দিতে হয়েছিল। তুমি কিছু জানতে না, শুধু জানতে অফিসের কাজে আমাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়।

না, নকশালপন্থী রাজনীতি নিয়ে আমি কিছু বলতে বসিনি। বীরভূমের সিউড়িতে পুলিশ অফিসার রবীন্দ্রনাথ দত্তকে খুন করা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল, একথা কি তোমার মনে আছে? পার্টির জরুরী মিটিং ছিল। রবীন্দ্রনাথবাবু কলকাতা থেকে ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন ওখানে। যে রাত্রে মিটিং সে রাত্রে রবীন্দ্রনাথবাবু জাল গুটিয়ে এনেছিলেন। দশ মিনিট দেরি হলে সবাই ধরা পড়ত। ভদ্রলোক সন্দেহ করেননি আমি একই উদ্দেশ্যে গিয়েছি। উনি জেনেছিলেন আমি বড় কোম্পানির কাজে ওই শহরে গিয়েছি। থানায় যাওয়ার আগে আমি ওঁকে খুন করেছিলাম। সাফল্যের সম্ভাবনায় ডগমগ লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে আমার কমরেডদের বাঁচিয়েছিলাম আমি। পরদিন সবাই এটাকে উগ্রপন্থীদের কাজ বলে মনে করেছিল। আমার ওপর কোন সন্দেহ পড়েনি কারো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক রাত ঘুমুতে পারিনি আমি। কিন্তু ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পার্টি ভাঙল, আন্দোলন মুখথুবড়ে পড়ল, কিন্তু আমার ওপর আর একটা চাপ শুরু হল। চাপটা আমার প্রাক্তন দলের একজনের কাছ থেকে। সে এখন ফেরার। সে জানে আমি খুন করেছি। আর সেই কারণে আমার ওপর নিয়ত চাপ। প্রত্যেক মাসে টাকা দিয়ে যেতে হয়েছে। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলে কিছু বলার ছিল না। এইবার সুপ্রভার কথা বলছি। সুপ্রভা এই ফেরারী মানুষটার স্ত্রী। একসঙ্গে দলে ছিলাম আমরা—সেই সময় ওদের প্রণয়, বিবাহ। সুপ্রভা অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। কলকাতার একটা কলেজে পড়ায়, পাইকপাড়ার হাউসিং স্টেটে থাকে। টালা পার্ক থেকে দত্তপুকুরের দিকে যেতেই প্রথমে বাঁ দিকের হাউসিং স্টেট। স্বামীর আচরণ, পার্টিবিরোধী কাজকর্মের জন্যে সে পৃথক হয়েছিল। ডিভোর্স হয়নি ওদের। সুপ্রভার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। শুধু এটুকু হলে ক্ষতি ছিল না। অনু তুমি কষ্ট পাবে, কিন্তু এখন আমার না বলে উপায় নেই। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে আমি সুপ্রভার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। এক্ষেত্রে আমার কিছু করার ছিল না। সুপ্রভার সঙ্গে জড়ানোর ব্যাপারে আমার কোন আফসোস নেই। সে কখনও আমাকে বিরক্ত করেনি। কখনও চায়নি আমাদের বিব্রত করতে। কিন্তু চেয়েছিল আমি যেন গোপন-রাজনীতি না ছাড়ি। এখনও সে সক্রিয়—যারা এখনও স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে ও তাদের দলে। কিন্তু একাত্তরের পরে পার্টির ভাগাভাগি থেকে শুরু করে এত রকমের ছবি আমি দেখেছি যে আর আমার পক্ষে নতুন ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। এই জীবনে কিছু হবে না। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের মতই থাকবে। আর এখানেই শুরু হল সুপ্রভার সঙ্গে সংঘাত। আর সেটাকেও কাজে লাগাল ওর ফেরারী স্বামী।

আজ একটু আগে সে আমার কাছে কতকগুলো দাবী করেছিল। সেগুলো মেটালে সারাজীবন তোমাদের কাছে ছোট হয়ে থাকতাম। সে চাইছে তোমাদের ত্যাগ করে সুপ্রভাকে বিয়ে করতে হবে আমাকে। নিজেকে মৃত ঘোষণা করতে চায় সে। এই বিকৃত আবদারের পেছনে কি কারণ আমি বুঝতে পারছি না। এতে সুপ্রভার সায় আছে কিনা তাও জানি না। দ্বিতীয় দাবী ছিল টাকা। সেটা দেবার সাধ্য এখন আমার নেই। ফলে সে আজ বিহার পুলিশকে আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। বিহার পুলিশ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তাদের একজন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন হোটেল ছেড়ে যেন না যাই। রবীন্দ্রনাথ দত্তকে খুন করার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য এখন ওদের হাতে। আমি মামলা করতে পারি কিন্তু কি লাভ তাতে? আর এই মুহূর্তে আমি ফেরারী হতে পারি। তাতে কতটা গৌরব বাড়বে? ওরা আমায় ছেড়ে দেবে না, তোমাদের ওপর চাপ আসবে, তাছাড়া একজন খুনী হিসেবে তোমাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

অদ্ভুত ব্যাপার, এখন নিজেকে খুনী মনে হচ্ছে। অথচ সেই সময়, কমরেডদের বাঁচানোর সময় কখনই সেকথা মনে হয়নি। ওই আন্দোলন ব্যর্থ না হলে হয়তো মনে হত না। এখন আন্দোলনের বিভিন্ন

ফাঁকফোকর এত বড় হয়েছে, পরিকল্পনাহীনতায় মুখথুবড়ে পড়া একটি উদ্যমের অনেক ত্রুটি চোখের সামনে। তখনই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ দত্ত মশাই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁর চাকরিটা তিনি মন দিয়ে করতে চেয়েছিলেন। একটি কর্তব্যপরায়ণ মানুষকে বুর্জোয়া, শ্রেণীশত্রু ইত্যাদি বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

আগামীকাল কিংবা আজ রাত্রেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে ওই মানুষটিকে হত্যা করার অভিযোগে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবার মত অনেক তথ্য তখন সামনে দগদগ করবে। তারপর আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না অনু।

এবার তোমাকে দুটো কথা বলি। সুপ্রভার ব্যাপারটার জন্যে আমায় ক্ষমা করো, যদি সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে মেয়েটার কোন দোষ ছিল না, আজও নেই। আজ এই মুহূর্তে একটা সত্যি কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। অনু তোমাকে আমি ভালবাসি, যেহেতু তুমি আমার কাছে কাছেই ছিলে, ইচ্ছে হলে দেখতে পেতাম, চাইলে বা না চাইলেও কাছে পেতাম, তাই তোমাকে আলাদা করে কিছু ভাবিনি। নিজের ছায়াকে তো মানুষ গুরুত্ব দেয় না। দিনদুপুরে ছায়াহীন মানুষের কষ্ট কি তা এখন বুঝতে পারছি। এখন তোমাকে দেখতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করছে। আবার বলি, সবকিছু করেও আমার শেষ ভালবাসা তোমার জন্যই রইল। আমার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের কিছু টাকা তোমার নামে ট্রান্সফার করেছি আর অফিস থেকে প্রাপ্য টাকার নমিনি তুমি। জানি না তাতে তুমি হাত দেবে কিনা।

শুধু একটা অনুরোধ করব, আনন্দকে ওর নিজের মত বড় হতে দাও। তোমার কোন ইচ্ছে ওর ওপর চাপিও না। ও যা করতে চায় করতে দিও। ও যদি বড় হয়ে ভারতবর্ষের তথাকথিত সুখী নাগরিক হয় তাহলে কিছু বলার দরকার নেই, যদি তা না হয়, যদি ওর মধ্যে ঝড়ের উদ্দামতা দ্যাখো তাহলে সময় এবং সুযোগমত আমার এইসব কথা ওকে খুলে বলো। যদি চাও, এই চিঠি ওকে দ্যাখাতে পারো।

তোমাকে এই চিঠি লেখার এক ফাঁকে ট্যাবলেটগুলো খেয়েছিলাম। শরীর ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এই সময় যদি তোমাকে দেখতে পেতাম! ক্ষমা চাই, শুধু তোমার কাছে। তোমারই (তুমি চাও বা না-চাও) সুব্রত।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে রইল আনন্দ। এখনও চোখের পাতায় সেই ঘুম স্পষ্ট। অথচ ধীরে ধীরে মুখের রেখাগুলো পালটে যাচ্ছে। 'বড় হয়ে কোন মেয়ের কাছে জল চাইবে না।'

'কেন?'

'আনন্দ জল দাও বললেই সেই মেয়েগুলো চণ্ডালিকা হয়ে যাবে।'

ছোট্ট শিশুর সঙ্গে কি সরল গলায় রসিকতা করেছিল যে মানুষটি তার ব্যক্তিজীবনের আর একটা ছবি এই রকম। আনন্দর খুব ইচ্ছে করছিল সেই ফেরারী লোকটি এখন কোথায় আছে জানতে! আর এই সুপ্রভা নামের মহিলাটি?

মা কোনদিন ওদের কথা বলেনি। সুপ্রভার সঙ্গে যোগযোগ হয়েছিল কিনা তাও সে জানে না, কিন্তু বাবা নকশাল রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন এই তথ্য আজ এই মুহূর্তে মা তাকে জানিয়ে গেলেন কেন?

আনন্দ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে এল কলেজ স্কোয়ার থেকে। সে যখন রাস্তা পার হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সুরজিৎ তাকে চিৎকার করে ডাকল। সুরজিৎ সেজেগুজে তার আড্ডায় যাচ্ছিল। ওকে দেখে দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বল তো?'

'কিসের কি ব্যাপার?' আনন্দ চোখ তুলে তাকাল।

'তোমার খোঁজে পুলিশ এসেছে হোস্টেলে। লালবাজার থেকে।'

'কখন?'

'একটু আগে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললায় বেরিয়ে গেছে। ওরা সুপারের সঙ্গে কথা বলে হোস্টেলেই অপেক্ষা করছে।'

আনন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'ধন্যবাদ সুরজিৎ।'

'তুমি কি কোন ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত?'

'না।' দৃঢ় গলায় বলল আনন্দ, 'আমি ক্রাইমগুলো ভাঙতে চাই। ঠিক আছে, চলি।'

সুরজিৎ বাধা দিল, 'আনন্দ, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

আনন্দ অবাক হল, 'তুমি! তুমি কি সাহায্য করবে?'

'আমার ক্ষমতার মধ্যে যা পারি।'

'তুমি তো জান না আমি কি করেছি!'

'জানি না, কিন্তু তুমি কোন অন্যায় করেছ এটা বিশ্বাস করি না।'

'ধন্যবাদ। ঠিক এই মুহূর্তে কোন সাহায্য আমি চাই না। তবে পরে হোস্টেলের বাইরে কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে বলতে পার?'

'হ্যাঁ।' সুরজিৎ হ্যারিংটন স্ট্রিটের একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিল, 'আমি রোজ বিকেলে ওখানে থাকি। তোমার কথা আমি বলে রাখব।'

'বেশ। আমার প্যান্ট শার্ট হোস্টেলে আছে। যদি পারো সেগুলো ওখানে নিয়ে যেও। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি সুরজিৎ।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আর এখানে দাঁড়িও না। পুলিশ এখানেও থাকতে পারে। তোমার উচিত এখনই কোন ভাল ল-ইয়ারের সঙ্গে দেখা করা।'

একটা ডাবল ডেকার আসছিল শ্যামবাজার থেকে। সেদিকে তাকিয়ে আনন্দ বলল, 'আইনের বই এদেশে যারা লিখেছে তারা আমাদের জন্য কোন লাইন রাখেনি। চলি।' প্রায় দৌড়ে বাসটায় উঠে পড়ল আনন্দ। এটাকে কি ভাগ্য বলে, নইলে সুরজিৎ হঠাৎ এই সময় এখানে আসবে কেন? সে যদি সোজা হোস্টেলে ফিরত কিংবা মা যদি না আসতেন, তাহলে? আনন্দ নিজেকে বলল, বড্ড কেয়ারলেস হয়ে থাকছে সে!

এই সময় পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলছেন ভাই?'

আনন্দ মাথা নাড়ল। এবং তখনই তার খেয়াল হল বাঁ হাতে খামটাকে সে ধরে আছে। সযত্নে পকেটে ওটাকে রেখে দিয়ে দু'হাতে বাসের রড ধরল আনন্দ।

॥ ১৮ ॥

সুদীপ চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিল। পুরো রাস্তাটা আনন্দ ওদের বোঝাতে বোঝাতে এসেছে। ওরা কেউ কথা বলেনি। জয়িতা এবং কল্যাণ খুব গম্ভীর মুখে শুনছিল, কিন্তু সুদীপের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। আনন্দ সেটা লক্ষ্য করলেও কিছু বলেনি। তার ধারণা ছিল যে শিস দিচ্ছে কিংবা রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, মানে এই নয় যে কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। জয়িতা শেষ পর্যন্ত পারল না, সে আনন্দকে ইশারায় থামতে বলে রাগত গলায় বলল, 'সুদীপ, ইউ মাস্ট বি সিরিয়াস!'

সুদীপ শিস থামিয়ে বলল, 'তাই?' তারপর আবার শিস দিতে শুরু করল।

জয়িতা কাঁধ ঝাঁকাল, 'সব কিছুর একটা লিমিট আছে!'

'কি করব বল্, আমার বেশ খিদে পেয়েছে!' সুদীপ বাঁদিকে আচমকা গাড়িটা পার্ক করল, 'আনন্দ, আমরা মিনিট পনেরো পরে স্পটে পৌঁছালে খুব অসুবিধে হবে?' এবার আনন্দ হতাশ হল। ওরা রাত্রের খাওয়া সেরেছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। এখন প্রায় সওয়া এগারোটা। রাস্তাঘাট ফাঁকা। দোকানপাট বন্ধ হলেও সুদীপ যেখানে গাড়ি থামিয়েছে সেখানে একটা পাঞ্জাবী হোটেল তখনও চালু।

কল্যাণ বলল, 'আমরা তো একটু আগে খেলাম, তোর আজ এখনই খিদে পেয়ে গেল?'

'খিদে লাগলেই শুধু খেতে ইচ্ছে করে একথা তোকে কে বলল? অনেক সময় মনের শান্তির জন্যেও লোকে খায়! ওই দোকানে দারুণ কাবাব করে। অনেকদিন ভেবেছি কিন্তু খাওয়া হয়নি। আজ যদি কিছু হয়ে যায়, হয়তো এক জীবনের জন্যে বড় দেরি হয়ে যাবে। সুতরাং ইচ্ছেটা পূর্ণ করে নিতে আপত্তি কি? অবশ্য আনন্দ যদি অ্যালাউ করে!'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল, 'তোর কি মনে হচ্ছে এটাই অগস্ত্যযাত্রা?'

'হু নোজ!' তারপর সুর করে গাইল, 'এ খাওয়াই শেষ খাওয়া হয় তো!'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, চটপট খেয়ে আয়।'

সুদীপ কথা না বাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা খাবি না? আহা, কি জিনিস হারাচ্ছিস জানলি না।' ও দোকানের দিকে পা বাড়াল।

জয়িতা নিঃশ্বাস ফেলল, 'কোনদিন যে জিনিস জিভে দেয়নি তার হয়ে বিজ্ঞাপন করছে!' কেউ কোন কথা বলল না।

কল্যাণ পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে বসেছিল। বাড়ির সঙ্গে তার আজ সম্পর্ক চুকল। কিছু জামা-প্যান্ট, একটা বই এবং টুকিটাকি কিছু জিনিস নিয়ে সে চলে এসেছে নিঃশব্দে। একবার মনে হয়েছিল বাড়ির সবাইকে ডেকে বলে যে সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে বড় বউদির ঝগড়া লাগল। এটা একটু অভিনব ব্যাপার। কেননা মা এতকাল বড় বউদির ক্যাম্পেই ছিলেন। মেজদা ফিরে আসার পর এমন কি ঘটনা ঘটল, কিংবা তারকেশ্বর থেকে এসে মায়ের কোন কারণে মানসিকতা পাল্টাল তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু চিৎকারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, আর আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবার ইচ্ছেটা রইল না। কল্যাণের একটা ধারণা জন্মেছে যে যাদের হাতে পয়সা থাকে না তারাই অকারণে ঝগড়া করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়।

এই সময় জয়িতা বলল, 'গাড়িটাকে এভাবে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখা অন্যায় হচ্ছে। পুলিশ যে কোন সময় নাম্বারপ্লেট দেখে ফেলতে পারে।'

আনন্দ বলল, 'এখনও তার সময় হয়নি। লাইটহাউসের সামনে ড্রাইভারটা গাড়ির খোঁজ করে না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করবে। তার মালিক সিনেমা দেখে বের হবে পৌনে বারোটা নাগাদ। ড্রাইভারের কাছে খবর পেয়ে থানায় যাবে লোকটা। থানার অফিসার যদি সেই সময় চেয়ারে থাকেন তাহলে তিনি ডায়েরি নেবেন। নিয়ে লালবাজারে রিপোর্ট করবেন। লালবাজার সেই খবর ওয়ারলেসকে যখন জানাবে তখন খুব কমপক্ষে সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। কাল সকাল হলেও অবাক হব না।'

জয়িতার পছন্দ হল না ব্যাখ্যাটা। বলল, 'আমরা অকারণে ঝুঁকি নিচ্ছি। এই গাড়িটাকে চেনে এমন কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুদীপকে তাড়া দে।'

আনন্দ তাকাল পাঞ্জাবীর দোকানটার দিকে। সুদীপ ভেতরে ঢুকে গেছে। ও হয় সত্যিকারের সহজ কিংবা এই মুহূর্তে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এখন ওকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। ওকে ওর মত ভাবেই স্বাভাবিক হতে দেওয়া উচিত। রাতটা কলকাতায় ধীরেসুস্থে গড়াতে গড়াতে যেন আচমকা ছুটতে থাকে। রাস্তার আলোর রঙ যেন পালটে যায়। শান্ত হয়ে যায় শহরটা কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আনন্দ দরজা খোলার শব্দ শুনল। কল্যাণ নামতে যাচ্ছিল, জয়িতা বাধা দিল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'সিগারেট স্টক করে রাখি। যদি ওখান থেকে সরাসরি ঠাকুরপুকুরে যেতে হয় তাহলে অসুবিধে হবে।'

কল্যাণ জবাব দিল। তার গাড়িতে বসে থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। যখন চলছিল তখন একরকম ছিল কিন্তু সুদীপ পার্ক করার পর থেকেই অস্বস্তিটা হচ্ছিল। ডায়মন্ডহারবার রোডে সেই কেসটা করার সময় তার এই রকম অনুভূতি হয়নি।

জয়িতা বলল, 'ঠাকুরপুকুরটা কোন গভীর জঙ্গল নয় যে সিগারেট পাওয়া যাবে না। সবাই মিলে নামাওঠা করলে ঝামেলা বাড়বে। কে কখন দেখে ফেলবে তারই জের চলবে। সেদিন আগাথা ক্রিস্টির একটা লেখায় পড়ছিলাম, সবরকম সতর্কতা নিয়েও শুধু সিগারেটের টুকরো এলোমেলো ফেলার জন্যে অপরাধী ধরা পড়ল। সুদীপটাকে ডাকলি না আনন্দ?'

কল্যাণ দরজাটা বন্ধ করল। আনন্দ বলল, 'ওকে ওর মত থাকতে দে। তোকে হঠাৎ নার্ভাস লাগছে!'

'নার্ভাস? আমি'—হাসল জয়িতা। হাসলে ওকে হঠাৎ খুব সুন্দর দেখায়। পাশে বসে কল্যাণের মনে হল।

আজ সারাদিন সীতা রায় বাড়ি থেকে বের হননি। টেলিফোন রিসিভ করেননি। বলা যায় ঘর থেকেই দু'বার মাত্র বেরিয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে আছেন তিনি। যে দু'বার বেরিয়েছিলেন তার একবার রবীন সেনের জন্যে। সেই বিশালবপু মানুষটি এসেছিলেন কোন একটি দরকারি কথা

বলতে। কিন্তু সীতা রায়, যাঁর পরনের শাড়িটাকে মনে হচ্ছিল সালোয়ার-পাঞ্জাবি, খোলাচুলে একটু রুখু রুখু ভাব নিয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, 'বড় মাথার যন্ত্রণায় ভুগছি আজ, কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। আর একদিন বসা যাবে, কেমন?' বলার সময় মাথাটা একপাশে হেলিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই 'একটু' আর 'কেমন' শব্দ দুটো এমন আদুরে গলায় উচ্চারণ করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে রবীন সেন পুলকিত হয়ে 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে চলে গিয়েছিল। সীতা রায় যে এইভাবে ভেবেচিন্তে কথা বলেন না তা নয়, কিন্তু এটা তাঁর অভ্যেসে এসে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার বেরিয়েছিলেন রামানন্দ রায়ের ডাকে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকায় রামানন্দ নক্ করেছিলেন। খানিকবাদে একটা হাউসকোট শরীরে রেখে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে চোখের কাজে প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন তিনি। রামানন্দ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সীতা, কি হয়েছে তোমার?'

'আমার? আমার আবার কি হবে?' নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সীতা রায়, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও তোমরা, নিজেকে কি ভীষণ প্রতারিত মনে হচ্ছে আমার!'

রামানন্দ বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, 'কি বলছ? আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি?'

মাথা দুলিয়ে হেসেছিলেন সীতা রায়, 'তুমি করলে তো বেঁচে যেতাম। জানতাম তবু কিছু করলে।' বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন নিঃশব্দে। টেলিফোনের পাশের চেয়ারটায় বসে চুপচাপ ঘটনাটা দেখেছিল জয়িতা। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল এই মা যেন অন্যরকম। কিন্তু রামানন্দ রায়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল তার।

বন্ধ দরজার সামনে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাশ ফিরতে মেয়েকে দেখলেন তিনি। তারপর ওই ধরা পড়ে যাওয়া ভাবটা কাটাবার জন্যে নার্ভাস-হাসি হেসে স্মার্ট হবার চেষ্টা করলেন, 'এভরিথিং অলরাইট?'

ঠিক সেই মুহূর্তে মন পাল্টাল জয়িতা। এই মানুষটিকে দ্বিতীয় দুশ্চিন্তায় আজ ফেলার দরকার নেই। সে ঠিক করেছিল রামানন্দ রায়ের অনুরোধমত সব কথা খুলে বলে যাবে। এবং আজই সেই বলার দিন। কিন্তু এখন সে মাথা নেড়ে বলল, 'সব ঠিক আছে। আমি হয়তো আজ রাত্রে ফিরব না।'

'ফিরবে না?'

'হ্যাঁ। একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে বন্ধুদের সঙ্গে। যদি আটকে যাই, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

রামানন্দ রায় এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'ঝুঁকি নিয়ে ফেরার কোন দরকার নেই। তবে যদি সুবিধে হয় তাহলে লেট-নাইট হলেও ফিরে এস। আমি অপেক্ষা করব।'

এখন এই গভীর রাত্রে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে বসে জয়িতার চেপে রাখা অস্বস্তিটা মাথা তুলছিল। হঠাৎ ওই ঘটনার পর থেকে বাবা একদম পালটে গেছেন। আজকাল আর সীতা রায় রোজ সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে যান না, প্রায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরেন না। দুজন আলাদা বৃত্তে বাস করছেন। সীতা রায় যদিও একটা ব্যবধান রেখেছেন এখনও, কিন্তু রামানন্দ সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন। জয়িতার মনে পড়ল একটা লাইন, ''একমাত্র পাতি মধ্যবিত্তরাই পারে বারংবার নিজেদের খোলস পালটাতে।''

এই সময় সুদীপ ফিরে এল সিগারেট খেতে খেতে। গাড়িতে উঠে বলল, 'বুঝলি জয়, এমন কিছু নয়। এর চেয়ে ভাল কাবাব অনেক খেয়েছি। দিল্লির আজমল খাঁ মার্কেটের পাশে একটা দোকানে যা করে না! এর শুধু ফালতু নামডাক।'

কেউ কোন কথা বলল না। সুদীপ স্টার্ট দিয়ে আবার বলল, 'গাড়িটা কিন্তু খুব যত্নে ছিল। খুব স্মুথ যাচ্ছে।' তারপর ইন্ডিকেটারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেট্রল নিতে হবে।'

'নিয়ে নে।' আনন্দ এতক্ষণে জানাল।

মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকের একটা পাম্প তখন বন্ধ হতে চলেছে। সুদীপ ম্যানেজ করে পুরো ট্যাঙ্ক ভরে নিল। ওরা কেউ কোন কথা বলছিল না। হ্যারিসন রোডে ঢুকে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে এখনও কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাত পরিষ্কার। কিছু শ্রমিক পরিশ্রান্ত হয়ে ভিখিরীদের পাশে ঘুমিয়ে আছে ফুটপাতে। দোকানপাট বন্ধ। কল্যাণ দেখল সেই মিষ্টির দোকানটারও ঝাঁপ পড়েছে।

আনন্দ সুদীপকে ইশারা করতেই ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশাপাশি অন্য গাড়িগুলোকে চাবি

দিয়ে মালিকরা রাতের মত রেখে গেছে। সেখানেই গাড়িটা ঢুকিয়ে দেওয়ায় নজরে পড়বে না কারও। আনন্দকে দাঁড়াতে বলে সুদীপ ময়লা ডাস্টার বের করে গাড়ির পেছনদিকে বেঁধে দিল, 'তাড়াহুড়োয় গাড়িটাকেই বোধহয় খুঁজে পাব না। অন্যের গাড়ি চেনা খুব মুশকিল।' সত্যি, জায়গাটায় তেমন আলো নেই বলে নাম্বার প্লেটটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

খালি হাতে ওরা সেই গলিটার মধ্যে ঢুকল। কল্যাণ আর জয়িতা বসে থাকল গাড়িতে। সেই পানের দোকানটা এখনও খোলা। আনন্দ দেখল সেই একই লোক বসে আছে দোকানে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্বাস্থ্যবান লোক দেশের গল্প করছে। সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'কে বলবে এটা ইউ পি কিংবা রাজস্থান নয়!' ওরা আর একটু এগিয়ে কারখানার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই দারোয়ানটা নেই, তার জায়গায় আর একজন বসে আছে। গেটটা আধা ভেজানো। উলটোদিকের একটা বাড়ির রকে ওরা বসল।

আনন্দ নিচু গলায় বলল, 'আমার সন্দেহ ছিল মোহনলাল সাবধান হয়ে যাবে। আজ সকালে ও নিশ্চয়ই গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও ব্যাপারটাকে আমল দেয়নি।'

সুদীপ বলল, 'যে লোকটা তোদের ফলো করে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই রিপোর্ট করেছে, আর যাই হোক তোরা পুলিশের লোক ন'স। পুলিশ হলে মিষ্টি খেতে গিয়ে দাম বেশি বলে বেরিয়ে আসে না। ট্যাকসিওয়ালা রিফ্যুজ করলে কনস্টেবলকে সাহায্য করতে বলে না।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক বলেছিস। ভেতরে আলো জ্বলছে। কারখানায় কাজ হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পেছনের দিকের দরজাটা ওই গলি দিয়ে গেলে পাওয়া যাবে, যাবি ওদিকে?'

সুদীপ মাথা নাড়ল। বলল, 'আর একটু অপেক্ষা কর।'

মিনিট পাঁচেক বাদে আর একটা গাড়িকে গলির মধ্যে ঢুকতে দেখা গেল। হেডলাইটের আলো এসে সরাসরি ওদের গায়ে পড়ছে দেখে আনন্দরা সরে বসল। একটা ঝকঝকে নতুন মারুতি ভ্যান। কারখানার গেটে সেটা পৌঁছনোমাত্র দারোয়ানটা উঠে সেলাম করল। মোহনলালকে নামতে দেখে ইশারা করল আনন্দ সুদীপকে। মোহনলাল দায়োয়ানকে কিছু বলতেই সে দরজা খুলে ভেতরে ছুটল। মোহনলাল ঘড়ি দেখলেন। একটু অসহিষ্ণু দেখাচ্ছিল তাঁকে। ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

কয়েক সেকেন্ড বাদেই একটি মধ্যবয়সী লোক হন্তদন্ত হয়ে দারোয়ানের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল, 'নমস্কার।'

মোহনলাল বললেন, 'বনবিহারীবাবু, লাস্ট গাড়ি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার। সাত নম্বর একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।' লোকটি যুক্তকর মুক্ত করছিল না।

'কেমিস্ট সব কিছু চেক করেছেন?' মোহনলালকে একটু নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল।

'হ্যাঁ স্যার। এভরিথিং নর্মাল। শুধু আমাদের প্রোডাকশনগুলো চালু আছে।'

'সেগুলো থাকবে। এ মাসে আপনার একশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। শুনুন, কাল ভোরে এই কারখানায় রেইড হবে। সার্চ করা হবে। আপনারা অফিসারদের বলে আমাকে ফোন করবেন। কাউকে কোন বাধা দেবেন না। বুঝতে পারছেন?' মোহনলাল হাসলেন।

মধ্যবয়স্ক লোকটি খুব ঘাবড়ে গেল, 'এ কি বলছেন স্যার?'

'যা বলছি তা জেনেই বলছি। আমি ব্যবস্থা করেছি। নিউজপেপারে বের হবে শত্রুপক্ষ মিথ্যে করে আমার নামে বদনাম রটিয়েছে। কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম এই রকম কিছু একটা করা দরকার। আজ চণ্ডীগড়ের ছোকরাটা আসায় বুদ্ধিটা খুলে গেল।'

'চণ্ডীগড়ের ছোকরা? সেটা কি ব্যাপার স্যার?' লোকটির হতভম্ব ভাব কাটছিল না।

'সব কথা তোমার না জানলেও চলবে। বি নর্মাল, গার্ডদের বলে দাও কোন এক্সট্রা এফর্ট নিতে হবে না। আর হ্যাঁ, হোলসেলারদের দুটো কুলির আজ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না। এই রকম অ্যাকসিডেন্ট যাতে তোমার না হয় তাই যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করো। যাও, যা কাজ করছ তাই করো।'

মোহনলাল কথা শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন। উনি চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া

পর্যন্ত লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছল। দারোয়ানটা দাঁড়িয়েছিল সামনে, লোকটা এবার তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'আজ ক'জন ডিউটিতে আছে? চার্জে কে আজ?'

দারোয়ান বলল, 'সুন্দরলাল সাব। ওকে ডেকে দেব?'

'না। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি। আমি বেশি কথা বলি, মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়।' শেষ কথাগুলো যেন নিজের সঙ্গেই বলা। দ্রুতপায়ে লোকটা নিজের কাজে ফিরে যেতেই দারোয়ানটা আরাম করে বসল।

আর একটু অপেক্ষা করে আনন্দ সুদীপকে নিয়ে ফিরে এল সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে। সুদীপ বলল, 'কি কেস বল্ তো?'

'খুব বুদ্ধিমান মানুষ। নিজেই সার্চের ব্যবস্থা করেছেন সমস্ত মাল সরিয়ে। কাল যখন জানা যাবে হঠাৎ সার্চ করেও ওঁর কারখানায় কোন জাল মাল পাওয়া যায়নি তখন আরও সম্মান বাড়বে। এক বছরের মধ্যে কোন সরকারী হামলার সম্ভাবনা থাকবে না।' আনন্দ কথাগুলো বলে দূরে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে তাকাল।

সুদীপ একটু অবিশ্বাসী গলায় বলল, 'যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে কর্মচারীদের ওপর কারখানা পরিষ্কারের দায়িত্ব দিত না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব যাচাই করে ওই সিদ্ধান্তে যেত।'

আনন্দ বলল, 'সেটা আগেই করে যায়নি তাই বা কে জানে! হয়তো অতিরিক্ত বলল লোকটাকে যাতে সে ভয় পায়, কখনও মুখ না খোলে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। দুপুরে যারা ডিউটিতে ছিল তারা এখনও আছে নাকি?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি এখনও অ্যাকশনের কথা ভাবছিস নাকি? জাল ওষুধ যখন ওখানে নেই তখন---।'

'তবুও অ্যাকশন করব। মোহনলালকে সাধু সাজতে দেব না আমি। যদি এখনই ফ্যাক্টরি অ্যাটাক করে সব শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে প্রমাণ হবে না যে মোহনলাল কি ধরনের ব্যবসা করত। ভোরে সরকারী সার্চ পার্টি এসে ফিরে যাবে। এবং মোহনলাল হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে আবার দু'নম্বর ব্যবসাটা শুরু করতে সাহস পাবে না। তার চেয়ে বড় কথা পাবলিককে ব্যাপারটা জানানো দরকার। আয়।'

ওরা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কল্যাণ বেরিয়ে এল। আনন্দ জয়িতাকে ডাকল, 'তুই আমার সঙ্গে চল্। সুদীপ আর কল্যাণ থাকবে সেকেন্ড স্টেজে। আমাদের কপাল খুব ভাল। চণ্ডীগড়ের ছেলেটার অস্তিত্ব বনবিহারীবাবু জেনেছে কিন্তু কোন ডিটেলস জানে না। আমরা ভেতরে ঢুকে যাওয়ার মিনিট দুয়েক বাদে তোরা চার্জ করবি। শুধু গ্রেনেড আর পেট্রল বোমা। এই গরীব কর্মচারীদের মারার কোন ইচ্ছে নেই। কল্যাণ, তুই দেখেছিলি ফ্যাক্টরিটা কোন্দিকে? ওকে! যে যার মাল নিয়ে নে।'

চামড়ার ব্যাগের স্ট্র্যাপটা কোমরে আটকে নিল আনন্দ। জয়িতার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে মালপত্র আছে। ব্যাগের স্ট্রাপটা কাঁধের সঙ্গে আটকে নিয়েছে সে যাতে দৌড়বার সময় না পড়ে যায়। দুজনে খুব শান্তপায়ে হাঁটছিল। ওদের ঠিক পেছনেই সুদীপ আর কল্যাণ। সিগারেটের দোকানের সামনে এসে আনন্দ দেখল লোকটা এখন একা। সে কল্যাণকে বলল, 'এখান থেকে কিনে নে তোর সিগারেট। আমরা মোহনলালের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়তেই জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'আর একটা রিস্ক নিলি। ওই পানওয়ালাটাই হয়তো পরে কল্যাণদের আইডেন্টিফাই করবে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'তার আগে মোহনলাল পুলিশকে আমার বর্ণনা দেবে।'

ওরা গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দারোয়ানটা ওদের দিকে তাকাতে আনন্দ বলল, 'এই যে ভাই, চিনতে পারছেন?'

লোকটা খানিকটা অবাক হয়ে মাথা নেড়ে না বলল। ভুল হয়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে আনন্দ চটপট বলল, 'ওহো, তুমি না, সকালে যে ডিউটিতে ছিল সে আমাদের চেনে। মোহনলালজীর একবার ফেরার কথা ছিল, তিনি কি ফিরেছেন?'

লোকটি এবার মাথা নেড়ে বলল, 'সাহেব একটু আগেই চলে গেছেন। আপনারা কে?'

'আমরা চণ্ডীগড় থেকে এসেছি। সাহেব চলে গেছেন, খুব মুশকিল হয়ে গেল। বনবিহারীবাবু আছে?'

'হ্যাঁ, উনি ভেতরে আছেন। কিছু দরকার আছে?'

'দরকার না থাকলে এত রাত্রে কেউ আসে? তুমি ওকে খবর দেবে?'

আনন্দ যতটা সম্ভব জয়িতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সরে দাঁড়াতেই লোকটা ওকে দেখতে পেল। সে যেন ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না যাকে দেখছে সে ছেলে না মেয়ে! শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরে একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। তারপর দরাজ গলায় বলল, 'আপনারা যান না, বনবিহারীবাবু ভেতরে আছেন। ঢুকেই বাঁ হাতে।'

আনন্দ আর অপেক্ষা করল না। জয়িতাকে ইশারা করে ভেতরে ঢুকতে বলল। ভেতরে তীব্র আলো জ্বলছে। সকালের দেখা বারান্দাটা দিয়ে একটু এগোতেই ফ্যাক্টরির একটা অংশ চোখে পড়ল। এখন একটা তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে কোন ওষুধের। বারান্দায় একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'বনবিহারীবাবু কোথায়?' লোকটা ইঙ্গিতে যে ঘরটা দেখিয়ে দিল তার দরজায় দাঁড়িয়ে আনন্দ দেখল সাত-আটজন দারোয়ান গোছের লোককে কিছু বোঝাচ্ছেন বনবিহারীবাবু। তাদের দেখতে পেয়ে খানিকটা অবাক হয়ে কথা বন্ধ করতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'বনবিহারীবাবু কে?'

'আমি। কি চাই? এত রাত্রে ভেতরে কেন? গেটে কে আছে? অনন্ত? এদের ঢুকতে দিল কেন?'

'আমাদের মোহনলালজী পাঠিয়েছেন!' অম্লানবদনে লোকটির মুখের ওপর কথাগুলো বলল সে।

'মোহনলালজী! কই, উনি তো কিছু বলে যাননি আমাকে? কোত্থেকে আসছেন আপনারা? এবার যেন জয়িতাকে দেখতে পেল, সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল বনবিহারীর মুখে।

'চণ্ডীগড় থেকে। উনি আপনাকে কিছু বলেননি?'

এবার বনবিহারীর মুখের ভঙ্গি সহজ হল। সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাদের কথা হচ্ছিল বটে!'

'আমি এসে ওঁকে ওই বুদ্ধিটা দিলাম। সব তো ক্লিয়ার এখন?' আনন্দ সহজ গলায় প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। উনি সেটা জেনে গেছেন।' বনবিহারীবাবু আবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'ইনি?'

'পাঞ্জাবের যে ভদ্রলোক মোহনলালজীর সঙ্গে ব্যবসা করতে চান তার মেয়ে। সাত নম্বর মালটা পাঞ্জাবে পাঠাবেন ভেবেছিলেন মোহনলাল। ফার্স্ট স্যাম্পেল। তাড়াহুড়োয় এযাত্রায় হল না।'

'সাত নম্বরটা তো ব্রাবোর্ন রোডে স্টোর করতে পাঠানো হল।'

'ব্রাবোর্ন রোডে?' প্রশ্নটা করেই আনন্দর মনে হল আর সময় বেশি নেই।

'হ্যাঁ। ও, আপনারা জানেন না? এস পি অ্যান্ড কোম্পানির গুদামঘরটা সাহেবের।'

'আচ্ছা। বনবিহারীবাবু, আপনার গার্ডদের ঘরেই থাকতে বলুন। আর আপনি একটু বাইরে আসুন। খুব গোপনীয় কথা বলব।' আনন্দ কথা বলতে বলতে চোখের ইশারা করল। বনবিহারীবাবু রহস্যের গন্ধ পেয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র জয়িতা দরজা টেনে শেকল তুলে দিল। বনবিহারীবাবু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আনন্দ রিভলভারটা বের করল, 'আপনাকে আমি খুন করতে চাই না। প্রাণের মায়া থাকলে যা বলছি শুনবেন। আপনার ফ্যাক্টরিতে কতজন কাজ করছে এখন?'

'বেশি না। মাত্র আটজন নাইট ডিউটিতে আছে।' থর থর করে কাঁপছিল মানুষটা। ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

আনন্দ কড়া গলায় বলল, 'ওদের সবাইকে ওই লম্বা বারান্দাটায় এসে দাঁড়াতে বলুন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না—আমি আপনার পেছনে আছি, অন্য কিছুর চেষ্টা করলে লাশ পড়ে যাবে।'

বনবিহারীবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় বলল, আমি বুঝতে পারছি না এসব কি হচ্ছে?'

'কিছুই নয়। জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস করা হচ্ছে। এখানে জাল ওষুধ হয় না?'

'হয়। ওরা কারা? বনবিহারীবাবুর চোখের দৃষ্টিতে ততক্ষণে সুদীপ এবং কল্যাণ এসে গিয়েছে। ওরা দারোয়ানটার শরীর টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতেই সে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

আনন্দ হুকুম দিল দরজায় দাঁড়িয়ে, 'এবার ওদের বাইরে আসতে বলুন জলদি!'

রিভলভারটার খোঁচা খেয়ে বনবিহারীবাবু বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন। জলদি জলদি। এখন সব কাজ বন্ধ রাখুন।'

বিস্মিত মানুষগুলো একে একে বেরিয়ে আসতেই আনন্দ এক লাফে পেছনের বারান্দায় উঠে এসে চিৎকার করল, 'আপনাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না আমরা, যদিও জাল ওষুধের কারখানায় আপনারা টাকার জন্যে কাজ করছেন। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যদি চান তাহলে ওপাশের ওই বারান্দায় উঠে যান। কেউ বীরত্ব দেখাতে চাইলে বা পালাবার চেষ্টা করলে মারা পড়বেন।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেল বারান্দায় যাওয়ার জন্যে। বনবিহারীও তাদের সঙ্গী হল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ আর কল্যাণ ছুটে গেল ভেতরে। বিশাল হলঘরে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা। সেই ঘর পেরিয়ে প্যাকিং-এর ব্যবস্থা। সবকিছুই নিখুঁত।

চারটে শক্তিশালী গ্রেনেড চার্জ করা মাত্র মনে হল সমস্ত বড়বাজার কাঁপছে। আটটা পেট্রল বোমায় সমস্ত কারখানাটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ওরা যখন দৌড়ে রাস্তায় নামল তখন চারদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে। তীব্রগতিতে ওরা যখন গাড়ির কাছে ছুটে এসেছে তখনই আনন্দ আবিষ্কার করল কল্যাণ নেই। সুদীপ ততক্ষণে গাড়ির মধ্যে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে সেটাকে বের করে এনেছে রাস্তায়। এক পলকেই সিদ্ধান্ত নিল জয়িতা, চিৎকার করে দাঁড়াতে বলে সে ছুটে গেল আবার গলিটার দিকে। জোরে ছুটতে গিয়ে পায়ের তলায় কিছু পড়ায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিল কল্যাণ। সেই মুহূর্তেও তার খেয়াল ছিল ব্যাগটার কথা। এবং সেটাকে বাঁচাতে গিয়ে তার ডান হাতে প্রচণ্ড চোট লাগে। যারা ওদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে আসছিল তারা কল্যাণকে দেখতে পেয়ে হই হই করে ধরে ফেলেছে। কল্যাণ উঠে দাঁড়িয়ে ছাড়াতে চাইছে নিজেকে কিন্তু তিনজন শক্ত হাতের মানুষের কাছে তাকে হার মানতেই হচ্ছে। জয়িতা দেখল কল্যাণকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। সে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। গ্রেনেডটা প্রচণ্ড জোরে ফাটল সত্যনারায়ণ পার্কের ফুটপাতে। অনেকটা জায়গা গর্ত হয়ে উড়ে গেল। এবং সেই শব্দে কল্যাণের আক্রমণকারীদের এমন ভীত করল যে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পাশের বাড়ির দিকে চলে গেল। জয়িতা চিৎকার করল, 'কল্যাণ চলে আয়!'

কল্যাণ নিজে এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে জয়িতার চিৎকার না শোনা পর্যন্ত পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে প্রায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঝড়ের মত গাড়িটাকে হ্যারিসন রোডে বের করে আনতেই একটা পুলিশ ভ্যান দেখতে পেল সুদীপ। ভ্যানটা ধীরগতিতে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর দিক দিয়ে আসছিল। চেষ্টা করেও গতি কমাতে পারল না, শেষ মুহূর্তে মনে হল যত তাড়াতাড়ি ওটাকে পেরিয়ে যাওয়া যায় তত মঙ্গল। ভ্যানের সামনে বসা সার্জেন্ট খানিকটা অবাক হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া গাড়িটাকে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল, 'কি ব্যাপার? হসপিটাল কেস নাকি?' আর তখনই হইচই করা লোকগুলো ছুটতে ছুটতে হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়াল। ভ্যানটা সেখানে পৌঁছানোমাত্র সার্জেন্টের কানে যেসব অভিযোগ বর্ষিত হল তাতে ভদ্রলোকের কিছু সময় লাগল আসল কথাটা উদ্ধার করতে। তিনি অয়্যারলেসে লালবাজারে খবর পাঠালেন, 'সিরিয়াস ডাকাতি হয়ে গেছে বড়বাজারে। গাড়ির নাম্বার তিনটে পাওয়া গেছে। তিনটে নম্বর এবং কোন্ দিকে গিয়েছে জানাতে-না-জানাতেই দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল।

সুদীপরা সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে পড়ামাত্র দমকলের ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল। আনন্দ বলল, 'আস্তে চালা। যতটা সম্ভব নর্মাল। সোজা কলেজ স্ট্রীট ধরবি। কল্যাণ কেমন আছিস?'

পেছনের সিটে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কল্যাণ বসেছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার হাত ছিঁড়ে পড়ছিল। সেই অবস্থায় সে কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'ঠিক আছে।'

সুদীপ এখন অনেকটা স্বাভাবিক, 'পড়লি কি করে?'

'কলার খোসা ছিল। দেখতে পাইনি। তারপর এমন জোরে চেপে ধরল।'

'এইজন্যে বলে যেখানে সেখানে কলার খোসা ফেলতে নেই। মোস্ট অনাগরিক ব্যাপার।'

কল্যাণ শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলতে পারল, 'শালা!'

জয়িতার শরীর এতক্ষণ ঝিনঝিন করছিল। কল্যাণকে লোকগুলো জাপটে ধরেছে এই দৃশ্যটা ও দেখার পর থেকে ও ঠিক কি কি করেছে তা এখন মনে করে বলতে পারবে না। সুদীপ ঠাট্টা শুরু করতে ও স্বাভাবিক হয়ে এল, যন্ত্রণায় কাতর কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

'হাতে।' কল্যাণ চোখ বন্ধ করতেই নিজের শরীর থেকে জল বেরিয়ে গালে পড়ছে টের পেল, 'মনে

হচ্ছে পড়ার পর হাতটা ভেঙেছে। ব্যাগ সামলাতে গিয়ে হাত ভাঙল বোধ হয়।'

ওপাশ থেকে সুদীপ মন্তব্য করল, 'নইলে শরীরটাই উড়ে যেত এতক্ষণে।'

জয়িতা এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ সুদীপ! ইউ মাস্ট নট টক লাইক দিস—রসিকতার সময় নয় এটা।'

'ওকে খুকী। আমি সিক্ হয়ে যাচ্ছি এখন থেকে।' সুদীপ চটপট মুখ বন্ধ করল।

আনন্দ লক্ষ্য করছিল কেউ তাদের পেছনে আসছে কিনা। ভ্যানটা যখন দেখেছে তখন এতক্ষণে কলকাতার রাস্তায় যে সমস্ত টহলদারী ভ্যান রয়েছে তারা এই গাড়ির নাম্বার পেয়ে গেছে। অবশ্য অন্য ধান্দা ফেলে যদি সক্রিয় হয় তাহলে তারা ওদের খুঁজে বের করবেই। কিন্তু কল্যাণটাকে নিয়েই চিন্তা হচ্ছে। সুদীপের গাড়ি ততক্ষণে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোচ্ছে। এখন ঘড়িতে একটা। সুদীপ বলল, 'সিরিয়াস কথা বলছি, আমাদের গন্তব্য কোথায়?'

আনন্দ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরপুকুরে যাব। কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে অত দূর যাওয়া ঠিক নয়।'

সুদীপ জানতে চাইল, 'তাহলে এই মুহূর্তে তোর মাথায় কিছু ঢুকছে না, তাই তো?'

আনন্দ উত্তর দেবার আগে সুদীপ গাড়িটা থামাল। ইলিয়ট রোড আর ওয়েলসলি স্ট্রিটের মোড়ে একটি মেয়ে এই রাত্রে দাঁড়িয়েছিল সাজুগুজু করে। সুদীপ লক্ষ্য করেছিল বেশকিছু আগে চলতে চলতে একটা অ্যাম্বাসাডার আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার মুখ বের করে মেয়েটিকে দেখছে। মেয়েটি সেটা লক্ষ্য করে এমন ভাবভঙ্গি করছে যা শুধু হিন্দী সিনেমায় দেখা যায়। উৎসাহ পেয়ে মেয়েটির কাছে নেমে এল। এবার ঘটনাটা ওরা দেখতে পাচ্ছিল। জয়িতা চাপা গলায় বলল, 'কি হচ্ছে সুদীপ! আমাদের হাতে একদম সময় নেই, এইসব নোংরা ব্যাপার দেখার রুচিটা বন্ধ কর।'

সুদীপ বলল, 'তোরা তৈরি থাক, আমি ডাকামাত্র বেরিয়ে আসবি। আনন্দ, গাড়ির স্টিয়ারিং থেকে আমার হাতের ছাপ মুছে ফেল। গ্লাভস পরে আসতে ভুলে গেছি।' কথা শেষ করে সে শিস দিতে দিতে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল।

মেয়েটা এবার সুদীপকে দেখতে পেয়ে আরও পুলকিত হল। লোকটি তখন দ্রুত মেয়েটিকে গাড়িতে ওঠার জন্যে অনুরোধ করছে। সুদীপ শুনতে পেল মেয়েটি উদাস গলায় বলল, 'আই নিড ওয়ান হান্ড্রেড। দ্যাটস অল।'

লোকটি বিভ্রান্ত হল, 'একি কথা, একটু আগে বললে সত্তর আর ওকে দেখামাত্র তিরিশ বেড়ে গেল!'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তিরিশ বাড়িয়ে দিলে কেন? উনি ঠিকই বলেছেন। যাও ভাগো এখান থেকে, নইলে—।' সুদীপের মুখের ভঙ্গি দেখে মেয়েটি এমন ঘাবড়ে গেল যে সে কোনদিকে না তাকিয়ে পেছনের গলিতে ছুটে গেল। হেসে ফেলল সুদীপ, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন! আজকে আপনি মারা পড়তেন, ওই রকম মেয়ের সঙ্গে এত রাত্রে কথা বলে! কোথায় যাবেন?'

'গল্ফ গ্রীন।' জবাব দিয়েই লোকটি গাড়ির দিকে এগোতে লাগল। চটপট পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ বলল, 'আরে চললেন কোথায়! উপকার করলাম, একটা ধন্যবাদ জানাবেন না?'

পেছনে বা পাশে মুখ না ফিরিয়ে লোকটি বলল, 'ধন্যবাদ!'

সুদীপ চটপট গাড়ির সামনে পৌঁছে রিভলবারটা বের করল, 'গাড়ির চাবিটা কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে গেল লোকটার মুখ, 'মানে—মানে আমার কাছে মাত্র একশ টাকা আছে তাই দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আমাকে প্রাণে মারবেন না।'

'গাড়ির চাবিটা—!' হাত বাড়াল সুদীপ। চাবিটা পেতে দেরি হল না। দরজা সন্তর্পণে খুলে সে বলল, 'এবার উঠুন। আমি জোর করা পছন্দ করি না।'

শান্ত ছেলের মত ড্রাইভারের পাশের সিটে লোকটিকে তুলে সে পাশে বসে বলল, 'একদম সামনে তাকাবেন। মুখ ঘোরালেই গুলি খাবেন।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

পেছনের দরজায় শব্দ হল। ওরা তিনজন একে একে উঠে বসলে সুদীপ বলল, 'শার্টটা খুলুন!'

'অ্যাঁ?' লোকটি মুখ ফেরাতে গিয়েও সোজা হল।

'বাংলা বুঝতে পারছেন না?' সুদীপ গাড়ি চালু করল। লোকটি কোনমতে শার্ট খুলে সুদীপকে দিতেই

সে সেটাকে পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'চোখ বেঁধে ফেল।' আনন্দ চটপট পেছন থেকে লোকটির চোখ শক্ত করে বাঁধল।

সুদীপ বলল, 'বুঝতেই পারছেন. পেছনে আর একজন রয়েছে। এইবার চুপটি করে বসে থাকুন। আপনি এইভাবে রোজ মেয়ে ধরেন, তাই না?'

'না না।' অন্ধ লোকটি মুখ ফেরাল, 'বিশ্বাস করুন এই প্রথম। কি যে হল, মেয়েটাকে দেখেই—'

'আপনি তো বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে, তাই না?'

লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সুদীপ বলল, 'এই মেয়েটিকে আমি চিনি। কাল সকালে ও যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে গল্পটা করে তাহলে কেমন লাগবে? তার চেয়ে আসুন একটা রফায় আসি। আপনাকে আমি অনোয়ার শা রোডে নামিয়ে দিচ্ছি। কাল খুব ভোরে বেরিয়ে প্রিয়া সিনেমার পাশে এসে গাড়িটাকে নিয়ে যাবেন। পুলিশের ঝামেলা করলে কিন্তু মেয়েটা এসে যাবে। তখন আর একশতে হবে না, বুঝতে পারছেন?'

'গাড়িটা গাড়িটা নিয়ে কি হবে?' লোকটার গলায় আর স্বর ফুটছিল না।

'আমার এক বন্ধু বিয়ে করতে যাবে তার গাড়ি দরকার। আপনার কোন ভয় নেই।' আর কথা বলল না সে। গড়িয়াহাট-গোলপার্ক হয়ে সোজা চলে এল আনোয়ার শা রোডে। এখানেও একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে আনোয়ার শা রোডে ঢুকল। তারপর বেশ কিছুটা এগিয়ে গাড়িটা থামিয়ে বলল, 'নেমে যান। চটপট।'

লোকটি এবার ইতস্তত করছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে। আর অমনি লোকটি নেমে দাঁড়াতেই সে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে লেক গার্ডেন্সে ঢুকে পড়ল।

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'এই নাটকটার কি দরকার ছিল? লোকটাকে স্বচ্ছন্দে ওখানেই রেখে আসা যেত, সময় বাঁচত।'

সুদীপ সিগারেট ধরাল, 'এইজন্যে তোর নাম সুদীপ হয়নি। ওখানে লোকটাকে নামালে ফেলে রাখা গাড়িটাকে দেখতে পেত। পুলিশ বুঝতেই পারত আমরা গাড়ি বদল করেছি। আর এতক্ষণে সারা কলকাতায় খবর পৌঁছে যেত এই গাড়ি ধরবার জন্যে। মাথায় ঢুকেছে?'

আনন্দ বলল. 'আমি ভাবছি লোকটা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, না আজই পুলিশকে জানাবে! দেখে তো মনে হল ভীতু সম্প্রদায়ের সদস্য!'

সুদীপ বলল, 'জানাবে না। শালা এরা হল মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান, আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রেস্টিজ চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কিল খেয়ে হজম করাই রক্তের অভ্যেস। এখন বল্ কোথায় যাব, ট্যাঙ্কে দশ লিটার তেল আছে—আশি থেকে নব্বুই কিলোমিটার।'

জয়িতা বলল, 'আমাকে একবার বাড়িতে যেতেই হবে। সমস্ত মালপত্র ওখানে পড়ে আছে। তাছাড়া কল্যাণকে ইমিডিয়েটলি একজন ডাক্তার দেখানো দরকার।'

যন্ত্রণায় বোধ হয় এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে কল্যাণ। একই ভঙ্গিতে বসে থাকায় সহ্যের মধ্যে এসে গিয়েছিল। সে একটুও না নড়ে বলল, 'আমি ঠিক আছি।'

সুদীপ বলল, 'জয়, তুই কল্যাণকে নিয়ে যেতে পারবি? আমরা ঠাকুরপুকুরে চলে যাচ্ছি, ওখানে কল্যাণ গেলে ডাক্তার ডাকার অসুবিধে হবে। পারবি?

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। আজ বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। আর ওর কাছে লুকিয়ে রাখব না। তোরা আমাদের ওখানে একটু নামবি। গাড়ি আছে যখন তখন মালগুলো নিয়ে যা। একটা পুলিশ ভ্যান আসছে সুদীপ।'

সুদীপ দেখল উলটোদিক থেকে একটা ভ্যান আসতে আসতে হঠাৎ থমকে গেল।

একজন সার্জেন্ট মুখ বের করে তাদের গাড়ির নাম্বারটা পড়ার চেষ্টা করছে।

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ভ্যানটা পেরিয়ে এল সুদীপ। আনন্দ তৈরি ছিল। যদি সার্জেন্ট গাড়ি থামিয়ে চ্যালেঞ্জ করত তাহলে তাকে চার্জ করতে হতই। বিনা যুদ্ধে ধরা দেবে না তারা। সার্জেন্টটা ভাগ্যবান। কারণ সে শুধু গাড়ি থেকেই অন্য নাম্বার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুদীপ আনন্দর সতর্কতা লক্ষ্য করেছিল। একটু সহজ হয়ে সে বলল, 'রাতদুপুরে যে কোন গাড়িতে পুলিশ ইচ্ছে করলে থামাতে পারে। যদি এর পরে কোন ভ্যান আসে তাহলে কি হবে কে জানে। এক রাত্রে বারংবার ভাগ্য পক্ষে থাকে না।'

'ভাগ্য পক্ষে না থাকলে এতক্ষণ আমরা বাঁচতাম না।' পেছন থেকে জয়িতা মন্তব্য করল।

'তা যা বলেছিস।' সুদীপ হেসে ফেলল, 'সিনেমায় দেখলে বলতাম, ওয়ান প্লাস ওয়ান।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'সুদীপ রাসবিহারী পেরিয়ে ল্যান্সডাউনে পড়ে বলল, 'তুই যদি মোহনলালকে না দেখতিস তাহলে চণ্ডীগড় শব্দটা এবং বনবিহারীবাবুর অস্তিত্ব, সাত নম্বর মালের খবর জানতিস না। আর এইগুলোই হয়ে গেল ওদের কাবু করার মশলা। জয়িতা যদি মালটা না ছুঁড়ত তাহলে এতক্ষণ কল্যাণ হয়তো ছবি হয়ে যেত। এই গাড়ির মালিকের যদি পটেটোপটুত্ব না থাকতো তাহলে আমাদের চোরাই গাড়িটাকে পুলিশ এতক্ষণে ধরে ফেলত। বেশ হয়ে যাচ্ছে পর পর মাইরি।'

আনন্দ বলল, 'বাজে কথা বলছিস। রাস্তায় হাঁটতে নেমে যদি গর্ত পড়ে তো সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পরিষ্কার জায়গাটাকে কাজে লাগানো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়াটাই বোকামি বলে মনে করি। আচ্ছা এদিকে কোন টেলিফোন আছে?'

জয়িতা জিজ্ঞেস করল, 'এত রাত্রে টেলিফোন করবি কাকে?'

'বলছি। আগে বল কোথায় পাবলিক ফোন আছে?'

'গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা দেখেছিলাম। ওটা রাস্তায় পড়ে থাকে। বাড়িতে গিয়েও করতে পারিস।'

জয়িতা কথাগুলো বলতেই সুদীপ মাথা নাড়ল, 'সেইটেই উচিত হবে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এত রাত্রে টেলিফোন করলে পুলিশের নজর পড়বে। অবশ্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গেলে ঘেরা ঘর পাবি। খুব জরুরি দরকার?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। বাড়ি থেকে করতে চাইছি না। কলকাতার চারটে কাগজের অফিসে ফোন করে আমাদের উদ্দেশ্যটা বলব। ব্রাবোর্ন রোডে এস পি অ্যান্ড কোম্পানির গুদামঘরটা এখনই সিল করে দেওয়া দরকার। চারটে কাগজে খবরটা ছাপা হলে আর চাপা থাকবে না।'

শেষ পর্যন্ত ওদের বালিগঞ্জ পার্ক রোডেই চলে আসতে হল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোহার গেটটা ভেতর থেকে তালা দেওয়া। পাহারায় যিনি ছিলেন তিনি নিশ্চয়ই নানান প্রশ্ন করবেন। অথবা টেলিফোনের সংলাপ দাঁড়িয়ে শুনতেও পারেন। বিশাল ফ্ল্যাট-বাড়ির ভেতরের পার্কিং লটে গাড়িটা ঢুকিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত হল। অন্তত এখানে কিছুক্ষণ পুলিশের ভয় নেই। কল্যাণ অবশ্য অনেকটা স্থির। তবে তার হাত ভেঙেছে, সামান্য নাড়াবার ক্ষমতা তার নেই। ওর ব্যাগটা আনন্দ নিয়ে নিল। এখন কেউ জেগে নেই কোথাও। শুধু অনেক ওপরের একটা ফ্ল্যাট থেকে বিদেশী বাজনা ভেসে আসছে। গেটে দারোয়ান ছিল। সে তাদের ঢুকতে দেখেছে। কিন্তু চত্বরে আর কাউকে চোখে পড়ল না। রাত্রে লিফ্‌টম্যান থাকে না। দরজা খুলে জয়িতা বন্ধুদের নিয়ে ঢুকল। অটোমেটিক লিফ্‌ট ওদের ফ্লোরে পৌঁছে দিতে সে বলল, 'যা বলার আমি বলব। যদি কোন ঝামেলা না হয় তাহলে তোরা ঢুকবি। আর তেমন হলে আমরা মালগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাব।'

জয়িতা বেলের বোতামে চাপ দিল। সুদীপ বলল, 'কেস খারাপ নাকি?'

এই সময় দরজাটা খুলে গেল। রামানন্দ রায় রাতের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। আনন্দরা একটু আড়ালে থাকায় তাঁর নজরে পড়েনি। রামানন্দ বললেন, 'এসো।'

জয়িতা ঘরে ঢুকল, 'মা কোথায়?'

'শুয়ে পড়েছে। ওর মনের অবস্থা ভাল নয়। এত রাত্রে কিভাবে এলে?' রামানন্দকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

'আমার বন্ধুরা সঙ্গে আছে। ওদের ভেতরে আসতে বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' রামানন্দ ফিরে গেলেন হলঘরের দিকে। জয়িতা ওদের ডেকে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করল। তারপর সুদীপ যে ঘরে ছিল সেইদিকে পা বাড়াল। দূর থেকে রামানন্দ বললেন, 'জয়, তোমার এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল, 'আমার সঙ্গে বললে চলবে না? আমিই তোমাকে বলব ভেবেছিলাম!'

রামানন্দ বললেন, 'ঠিক আছে। আমি পনেরো মিনিট বাদে আসছি। তোমরা রেস্ট নাও।'

ঘরে ঢুকে কল্যাণ ধীরে ধীরে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। এবার সুদীপ ওর হাতটা পরীক্ষা করতে করতে স্বস্তির শব্দ করল, 'নাঃ, সিম্পল ফ্যাকচার! ভয়ের কিছু নেই।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'শুরুতেই আমি অকেজো হয়ে গেলাম। কি করি বল্ তো?'

আনন্দ এগিয়ে এল কল্যাণের সামনে, 'অকেজো মানে? একটা হাত কিছুদিনের জন্যে ব্যবহার করতে না পারাটাকে কি অকেজো বলে? বাজে কথা না বলে রেস্ট নে।'

কল্যাণ তবু মানছিল না, 'জয়িতা যদি না বাঁচাত—! আমি তোদের বোঝা হয়ে গেলাম!'

সুদীপ হেসে উঠল, 'এ ব্যাটার মাথায় শুধু একই চিন্তা। আমার যদি একটা পা উড়ে যেত তোরা কি করতিস? এসব চিন্তা করা মানে বন্ধুদের তোর সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত করে দিচ্ছিস।'

কল্যাণ আর কোন কথা বলল না। সুদীপ জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিশ্বাস করা যায় এমন ডাক্তার আছে এখানে? কাল সকালের আগে তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে ওর, 'হাসপাতালে গেলে আমি ধরা পড়ে যাব।'

জয়িতা বলল, 'নাঃ, আমি তো কারও ওপর রিলাই করার কথা ভাবতে পারছি না।'

আনন্দ জয়িতার দিকে ফিরে তাকাল, 'তুই তোর বাবার সঙ্গে কি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবি? এই ব্যাপারটা করার আগে আমাদের সঙ্গে তোর আলোচনা করা দরকার ছিল!'

'আমি এমন কিছু বলব না যা তোদের ক্ষতি করবে। ট্রাস্ট মি।' জয়িতা হাসার চেষ্টা করল, 'তুই ফোন করবি বলছিলি, বাবা আসবার আগে সেটা করে নে।'

জয়িতাকে অনুসরণ করে আনন্দ হলঘরটায় এল। রামানন্দ রায় এখানে নেই। শূন্য ঘরটায় আলো জ্বলছে। টেলিফোনের পাশের চেয়ারটায় বসে আনন্দ সর্বাধিক প্রচারিত কাগজটির নাম্বার গাইড থেকে খুঁজে বার করে জয়িতাকে বলল, 'বাকি তিনটে কাগজের নাম্বার বের করে রাখ।'

জয়িতা আবার হাসল, 'গড়িয়াহাটার টেলিফোনটা পেয়ে কাজ হত না। তুই সেখানে গাইড পেতিস না। তোর উচিত ছিল আগে থেকে নাম্বারটা নোট করে রাখা।'

কলকাতায় রাত্রে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে। একবারেই লাইন পেয়ে গেল। ওপাশ থেকে হ্যালো শুনে আনন্দ বলল, 'আমি একটা জরুরি খবর দেব। দায়িত্ববান কেউ কিংবা নিউজ এডিটার আছেন?'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি, আপনি কে?'

'আমি এই কাগজের রিপোর্টার। নাইট ডিউটিতে আছি। বলতে পারেন যা বলবার।'

'শুনুন, খানিক আগে বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে মোহনলালজীর বিরাট ওষুধের কারখানা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটাতে আগুন লেগেছে। মোহনলাল দুটো জাল ওষুধের কারবার করতেন। যার একটা খেলে ক্ষতি হত না কাজও দিত না। দুটো খেলে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকত। আমরা মনে করেছি এই ধরনের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মোহনলাল অক্ষত আছেন, তাঁর নিরীহ কর্মচারীরাও সম্ভব—, কিন্তু কারখানা ধসে গেছে।'

'আপনারা কারা?'

'আমরাই ডায়মন্ডহারবার রোডে প্যারাডাইস ধ্বংস করেছি। আইনের ফাঁক ব্যবহার করে যারা সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে তাদের আমরা একে একে ধ্বংস করব। মোহনলালের জাল ওষুধ স্টক

করা আছে ব্র্যাবোর্ন রোডের এস পি অ্যান্ড কোম্পানির স্টোর রুমে। ওখান থেকে ওটা সরিয়ে নেওয়ার আগেই আপনারা খবর নিন। আপনাদের কাগজের মাধ্যমে আমরা সেইসব মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যাতে তারা হাত গোটায়, নইলে একটির পর একটি এই ধরনের অ্যাকশন নেব আমরা। আমরা চাই একটি সুষম সমাজব্যবস্থা। বর্তমান সংবিধানের আশ্রয়ে তা সম্ভব নয়। এই সব কাজগুলো সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুক এটাই কাম্য।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে পর পর তিনটি কাগজে একই কথা বলল আনন্দ। শেষের কাগজের এডিটার স্বয়ং ফোন ধরেছিলেন। রাজনৈতিক রচনা লিখে তিনি খুব জনপ্রিয়। ফোন নামাবার আগে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি নকশালপন্থী?'

আনন্দ বলল, 'না। আমাদের আগে কেউ এই পথে হাঁটেননি।'

এডিটার প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের নেক্সট অ্যাকশন জানতে পারি?'

'রেসকোর্স।' রিসিভার নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াবি জয়?'

জয়িতা চাপা গলায় বলল, 'তোর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? রেসকোর্সের কথাটা বলে দিলি?'

আনন্দ উঠে সুদীপদের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'রবীনহুডের মত কায়দা আর কি। না না, আমাদের সেই রঘু ডাকাতই তো এমন করত। আমরা এই মুহূর্তে রেসকোর্সকে কিছু করতে পারব না। যত সহজে দুটো কাজ করেছি রেসকোর্সে তা সম্ভব হবে না। কাগজে যদি বের হয় খবরটা তাহলে তার নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই দেখার।'

জল খেয়ে আনন্দ বন্ধুদের কাছে ফোনের কথা বলল। অন্তত কাল সকালে কাউকে আর অনুমানের মধ্যে থাকতে হবে না, কে বা কারা কেন এই কাজ করল। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বোঝা যাবে। রেসকোর্সের ব্যাপারটা সে খুলে বলল। সরকারের প্রত্যক্ষ মদত পাচ্ছেন রেসকোর্সের কর্মকর্তারা। কারণ প্রচুর ট্যাক্স আসছে ওখান থেকে। বোমা বা গ্রেনেড ছুঁড়ে রেসকোর্স উড়িয়ে দিলে কোন কাজ হবে না। আস্তাবল থেকে যে ঘোড়াগুলো রেস করতে মাঠে আসে তাদের ক্ষতি করে কি লাভ! কিন্তু একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। প্রথমেই তার শিকার হবে দামী ঘোড়ার মালিকরা। তারা যদি এখান থেকে ঘোড়া বোম্বে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যায় তাহলে এখানকার রেসে ভিড় কমবে।'

সুদীপ বলল, 'তাতে আমাদের কোন লাভ হচ্ছে না। শুনেছি বোম্বেতে ঘোড়া ছুটছে আর কলকাতা রেসকোর্সে তার রিলে শুনে লোকে টাকা লাগাচ্ছে। লাগাতার একটা প্যানিক তৈরি করতে পারলে ওখানকার ভিড় কমবে। কিন্তু কলকাতা না হয় বন্ধ হল, বোম্বে-মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোরে তো চলবে!'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কলকাতায় আমাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য শহরের ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করবে, দেখিস।'

কল্যাণ চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণাটা যে পাক দিয়ে উঠছে তা ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, 'কলকাতার রেস যদি ভয়ে বন্ধও হয়, পাড়ায় পাড়ায় যে স্লিপ খেলা চলে তা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। সেটা বন্ধ করবি কি করে?'

আনন্দ বলল, 'সেটা সরকারই বন্ধ করবে। কারণ তা থেকে কোন ট্যাক্স পাবে না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তাহলে সরকারের ওপর এখনও আস্থা রাখিস, সিনেমা হলে যে টিকিট ব্ল্যাক হয় তা থেকে তো সরকার একটা পয়সাও ট্যাক্স পায় না, বন্ধ করছে?'

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে রামানন্দ রায়ের গলা শোনা গেল, 'জয়!'

জয়িতা বন্ধুদের দিকে তাকাল। সুদীপ বলল, 'তুই ওঁকে এখানেই আসতে বল্ না।'

জয়িতা মুখ ফেরাল, 'কেন?'

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল, 'উই ক্যান হেল্প ইউ। ঠিক মাঝরাত্তিরে লাগে ঘোর চিত্তিরে, কি বলতে কি বলে ফেলবি তার কোন ঠিক নেই। সবাই মিলে ম্যানেজ করব এই শেলটারটার জন্যে।'

জয়িতা আনন্দকে বলল, 'আমি একথার প্রটেস্ট করছি। এতে আমার ওপর অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। ওয়েল, আমি বাবাকে ডাকছি।' জয়িতা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'ডাকছ?'

রামানন্দ রায় শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। এই ঘরে এসো।' জয়িতা সরে দাঁড়াল। রামানন্দ বিস্মিত হলেন। তারপর ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকলেন। তিনজনেই ওঁর দিকে কিছুটা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকাল। জয়িতা পরিচয় করিয়ে দিল, 'সুদীপকে

তুমি দেখেছ, এ হল কল্যাণ আর ও আনন্দ!'

আনন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না এই লোকটিকে উঠে দাঁড়িয়ে কতটা সম্ভ্রম জানানো যায়। কিন্তু রামানন্দ রায় কোনদিকেই তাকাচ্ছিলেন না। তাঁকে বেশ চিন্তিত এবং কাহিল দেখাচ্ছিল। আনন্দ বলল, 'বসুন।' সে উঠে সুদীপের পাশে বসে জায়গা খালি করে দিল।

রামানন্দ রায় বসলেন না। বললেন, 'কিছু মনে করো না, এত রাত্রে তোমরা যেভাবে ঘোরাফেরা করছ তাতে সন্দেহ হচ্ছে এমন কোন কাজ করছ যা খুব স্বাভাবিক নয়। আমি কোন মন্তব্য করছি না, কিন্তু জয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, যা করছ তা কি ঠিক মনে করছ?'

'নিশ্চয়ই।' জয়িতা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল।

রামানন্দ রায় চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকাতেই কল্যাণকে দেখতে পেলেন। সেই মুহূর্তে আর একটা যন্ত্রণার ঢেউ পাক খেয়ে ওর হাত থেকে শরীরে গড়াচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সামলাচ্ছিল সে। তিনি দ্রুত কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

সেই অবস্থায় কল্যাণ একটু জোরে মাথা নাড়ল, 'কিছু না, কিছু হয়নি।'

সুদীপ আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু আগে ও আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সিরিয়াস কিছু নয় বলে মনে হচ্ছে।'

'তুমি কি ডাক্তার?' রামানন্দ রায় ধমকে উঠলেন, 'ও তো হাতটা নাড়তেই পারছে না! দেখি ঠিক কোন্‌খানে ব্যথা?' জখম হাতটা ধরতেই ককিয়ে উঠল কল্যাণ। ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিলেন রামানন্দ।

সুদীপ মন্তব্য না করে পারল না, 'আপনিও ডাক্তার নন।'

'সেটা আমি জানি। কিন্তু এই ছেলেটিকে এইভাবে রেখে দিয়েছ তোমরা? ওর হাতের হাড় ভেঙেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। ইমিডিয়েটলি ডাক্তার ডাকা দরকার। কটা বাজে এখন? ওহো, রাত দুটো বেজে গেছে! কাকে ডাকা যায়?' নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি।

এবার আনন্দ বলল, 'এখন বোধ হয় কাউকে না ডাকাই উচিত। আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে? ও যদি ঘুমোতে পারে তাহলে সকালবেলায় আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

রামানন্দ রায় কথা না বলে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সুদীপ জয়িতাকে বলল, 'দ্যাখ উনি কোন ডাক্তারকে ফোন করছেন কিনা। ডাক্তার এসে যদি আমাদের ওর সঙ্গে দেখে, তাহলে কাল সকালে কাগজ পড়ার পর দুই-এ দুই-এ চার করতে দেরি হবে না। আচ্ছা লোক!'

জয়িতাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। সে বলল, 'তোদের হয়তো খারাপ লাগছে কিন্তু আমি খুশি। মানুষটা যে এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখবেন তা কল্পনা করিনি। কখনও কেউ যখন কারও জন্যে কেয়ার নেয় তখন আমার ঈর্ষা হয়। আজ সেটা একটুও হচ্ছে না। ওই মানুষটি 'এভরিথিং অলরাইট' ছাড়া কখনও আমার মনের কথা জানতে চাননি।'

এমন একটা বিষণ্ণ সুর ছিল যে সুদীপ পর্যন্ত চুপ করে গেল। এই সময় রামানন্দ ফিরে এলেন, 'জয়, ওকে এক গ্লাস জল দাও। এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নাও তুমি। পেনকিলার, ঘুমিয়ে পড়বে?'

'ট্যাবলেট!' কল্যাণ আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমাকে একটা ট্যাবলেট দিন।'

'কেন? দুটো খেলে সকালের আগে ব্যথাটা টের পাবে না—দুটোই খেয়ে নাও।'

'না, আমি কোন রিস্ক নেব না।'

'রিস্ক? এতে রিস্কের কি আছে।' রামানন্দ বুঝতে পারছিলেন না।

আনন্দর হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন কিছু বলা ঠিক হবে না। কল্যাণের মত শিক্ষিত ছেলেও ওই ব্যাপারটা জানার পর থেকে যে কোন সরষের মধ্যেই ভূত দেখছে। জয়িতা কল্যাণকে একটি ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। রামানন্দ রায় মাথা নাড়লেন, 'মনে হয় কোন কাজ হবে না। এরকম কথা কখনও শুনিনি, দুটো ট্যাবলেট খাওয়া মানে রিস্ক!'

খালি সোফাটায় বসলেন রামানন্দ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়, তোমার কিছু বলার আছে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

এখন কেউ কোন শব্দ করছে না। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ঘরে। রামানন্দ রায় মুখ তুলছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত জয়িতা বলল, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু আশা কর?'

'আমি!' রামানন্দ রায় মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি ভাল থাক, এইটুকু।'

'তুমি কি মনে কর ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, এবং সামাজিক অবস্থায় কেউ ভাল আছে? যারা বলে আছে তারা চোখ বন্ধ করে ভাল থাকার ভান করে রয়েছে। বাবা, আমার পক্ষে চিরায়ত নিয়মগুলো মেনে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই যে কোন দিন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারি। ডোন্ট আস্ক মি কোথায় যাচ্ছি। শুধু জেনো আমরা একটা কাজ করতে চাইছি, যা কেউ করে না। আমরা মানুষের বিবেকের অটল পাথরটাকে নাড়াতে চাইছি। প্রতিবাদ করলে, এক সময় সেই ভাষাটা সাধারণ মানুষের রপ্ত হয়ে গেলে, এই গণতন্ত্রের সুবিধেভোগী শক্তিগুলো ভয় পাবে বলে বিশ্বাস করি। না, কোন রাজনৈতিক দলের কার্যসূচী আমরা অনুসরণ করছি না। পণ্ডিতরা আমাদের আচরণকে পাগলামো বলবেন, ছেলেমানুষী কিংবা অশিক্ষাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেবেন। অনেক তো দেখলাম। বিখ্যাত বিখ্যাত তত্ত্ববিদ অনেক থিয়োরি শুনিয়েছেন, ময়দানের বক্তৃতায়, পার্টির বুলেটিনে কিংবা সাপ্তাহিকের পাতায়। আর এইসব শুনিয়েই তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে মরে যাবেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। এই থিয়োরির ভাষা ওদের অজানা থাকবেই। কিন্তু ওরা চোখের সামনে দেখবে এই লোকগুলো অন্যায় করছিল, শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শোষণ করছিল আর কয়েকটা ছেলেমেয়ে সরাসরি তাদের আঘাত করছে। এই আঘাত করা যায়। নকশালবাড়ির আন্দোলনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাদের পথ আমরা মানি না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশ রাশিয়া কিংবা আমেরিকার পরাধীন নয়। তাহলে দ্রুত আগুন জ্বলত। প্রতিটি মানুষের বুক ভিয়েৎনাম হয়ে যেত। আমাদের প্রতিপক্ষ যেহেতু আমরা তাই সময় লাগছে। আমরা কি করে ভাল থাকব, বল?' জয়িতা বড় বড় নিঃশ্বাস নিল।

আনন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। জয়িতা যে এইভাবে মুখের ওপরে কথাগুলো বলতে পারবে তা সে ভাবতে পারেনি। সুদীপ খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। উত্তেজিত হয়ে জয়িতা যে ভঙ্গিতে কথা বলছে তা তার মোটেই ভাল লাগছে না। এই লোকটির কাছে সব কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও কেউ কোন কথা বলল না। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে পড়ে ছিল, একইভাবে থাকলে বোধ হয় তার যন্ত্রণা কম হচ্ছিল। রামানন্দ পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমি দুঃখিত। আমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমার সম্পর্কে তোমার বক্তব্য?'

জয়িতা এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে আর মাকে একদিন চিৎকার করে বলেছিলাম, ঘেন্না করি, তোমরা কিছুই করোনি আমার জন্যে। নিজেদের পার্থিব আনন্দ আর শারীরিক তৃপ্তির জন্য টাকা রোজগার করে গেছ। তুমি যা মাইনে পাও তা দিয়ে এত পার্টি এত মদ আর মায়ের এত বিলাস মেটানো যায় না। এসব তোমাদের ব্যাপার। আমাকে পড়াশুনার সুযোগ আর খাওয়াপরার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েই তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের মত এই দেশের সব বাবা-মা একই চিন্তা করে, কেউ ভাবে না পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করার দায়িত্ব তাঁদের। এই দেশের জন্যে আগামী প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে তাদের সময় দিতে হবে। নিজেকে ভীষণ অবহেলিত মনে হত এক সময়। এখন আর কিছু মনে করি না। যার কাছে কোন আশা করার নেই তার সম্পর্কে কোন ভাবনাও থাকে না। তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সুতোটা কখন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

জয়িতা চুপ করলে রামানন্দ কোন কথা বললেন না। হঠাৎ কল্যাণ চোখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক কথা। এ কথা আমারও। তবে তোর বাবা-মায়ের অর্থ ছিল আর আমার বাবা-মা ঠিক উলটো অবস্থায় থেকে একই আচরণ করেছিল।'

শেষ পর্যন্ত রামানন্দ উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি তোকে বুঝতে পারছি না। তুই কোথায় এইসব কথা শিখলি? এই মানসিকতা কি করে হল তোর? আমার অজান্তে কখন তুই এত দূরে পৌঁছে গেলি?'

এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না জয়িতা।

হঠাৎ রামানন্দ সুদীপের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি আজ রাত্রে কোন কিছু করেছ?'

সুদীপ ঠোঁট কামড়াল, 'আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলছেন।'

রামানন্দ বললেন, 'তোমরা সবাই একই সঙ্গে পড়, না?'

আনন্দ জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

রামানন্দ বললেন, 'জয়, তোমার মা এইসব কথা জানেন না। আমার মনে হয় ওঁকে জানানোর দরকার নেই। উনি ঠিক মানতে পারবেন না। তবে জেনো তাঁকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ সব মেয়ে একই ধরনের মা হতে পারে না। যে যার নিজের মত তা হয়ে থাকে। বাইরের জগতের ওপর ওঁর এই আকর্ষণের জন্যে আমারও দায়িত্ব ছিল। তোমরা এখন এই বাড়িতে এসেছ তাও তাঁর জানা নেই। নীতিহীনতা যদি তোমাদের লক্ষ্যবস্তু হয় তাহলে তোমরা আমাদেরও খুন করতে পারো। পাশের ঘরে গিয়ে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যাবে, কিন্তু আমি বলছি এটাও সঠিক পথ নয়। কিন্তু নিজে যেহেতু কিছু করতে পারিনি তাই তোমাদের বাধা দেব না। ডু হোয়াটএভার ইউ লাইক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা বলব। একটি শিক্ষিত রাষ্ট্রের পুলিস এবং সংগঠিত সামরিক শক্তির চোখ এড়িয়ে বেশিদিন তোমরা এসব করতে পারবে না। অবশ্য তোমরা ঠিক কি করছ তা আমি জানি না। আমি সীতাকে বলব তোমাদের যেন বিরক্ত না করে। আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটির ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। কাল সকালে আমি আমার এক বন্ধুর নার্সিং হোমে নিয়ে যাব।'

রামানন্দ রায় চলে গেলেন। হঠাৎ খুব বয়স্ক মনে হচ্ছিল তাঁকে। পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। প্রায় নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি হবে?'

আনন্দ পা ছড়াল, 'আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।'

সুদীপ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'কিন্তু উনি যদি একটা টেলিফোন করেন তাহলে আমাদের কয়েক বছর জেল তো অবশ্যই, ফাঁসিও হতে পারে। সেটা যেচে চাইছি কেন?'

জয়িতার হঠাৎই নিজেকে খুব দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। সে মাথা নাড়ল, 'আনন্দ ঠিকই বলছে। রামানন্দ রায় আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। ভয় হচ্ছে আমার জননীকে।'

'আগামীকাল সেটা চিন্তা করা যাবে। আমার মনে হয় প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা উচিত। এখন এই রাত্রে রাস্তায় কোন গাড়ি আছে বলে মনে হয় না। সেই লোকটা যদি থানায় জানায় তাহলে আমরা ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার সময় সহজেই ধরা পড়তে পারি। ওয়েল, আমি ধরছি চান্স ফিফটি ফিফটি। তাছাড়া গাড়িটা রাখবি কোথায়? ভোরবেলা অবধি লোকটা যদি অপেক্ষাও করে তাহলে প্রিয়া সিনেমার কাছে না পেয়ে সোজা থানায় যাবে। আমরা গাড়িটা ঠাকুরপুকুরে নিয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। দ্বিতীয়ত, কল্যাণকে ফেলে রেখে আমরা যেতে পারি না। ঠাকুরপুকুরে ওর ট্রিটমেন্ট কেমন হবে তা আমরা জানি না। এসব ঝুঁকি আমাদের হয়তো নিতেই হত কিন্তু জয়ের বাবাকে আমার এখন বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হচ্ছে। ঝুঁকি নিবি কিনা ভেবে দ্যাখ।' আনন্দ জানাল।

সুদীপ বলল; 'গাড়িটা আমি ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যেতাম না। খুব ভোরে প্রিয়া সিনেমার আশপাশে পার্ক করে ওখান থেকেই ট্যাকসি নিতাম। ওয়েল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তোরা দেখছি টায়ার্ডও হচ্ছিস না। কিন্তু কোথায় ঘুমাব? যে যেখানে শোও আমি বিছানাটা নিচ্ছি। এনি বডি ক্যান শেয়ার উইথ মি।'

জুতোটা খুলে টয়েলেটের দিকে এগোচ্ছিল কিন্তু জয়িতা বাধা দিল, 'তুই একটা ব্যাপার একদম ভুলে যাচ্ছিস।'

'কোন্ ব্যাপার?' সুদীপ দাঁড়াল।

'গাড়িটাকে নিচে রেখে এসেছিল। ওটাকে এখান থেকে অবিলম্বে বিদায় করা দরকার।'

'ওঃ গড। তোদের উচিত ছিল ড্রাইভিং শিখে নেওয়া। কাঁহাতক গাড়ি চালানো যায়! জয়, তুই ট্রাই করবি এখন? খুব ঘুম পাচ্ছে আমার।' সুদীপ হাই তুলল।

আনন্দ বলল, 'না রে সুদীপ, ওর যাওয়া ঠিক হবে না। শেষ রাত্রে কলকাতার রাস্তায় কোন মেয়ে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এ-দৃশ্য অনেকের সহ্য হবে না। চল্ তোতে আমাতে এখনই বেরিয়ে পড়ি। প্রিয়া সিনেমার কাছাকাছি যেতে হলে আর দেরি করা ঠিক হবে না। কে জানে ভোরে আমাদের জন্যে কোন ট্র্যাপ পাতা থাকবে কিনা!'

জয়িতা বলল, 'প্রিয়া সিনেমার কাছাকাছি যেতে হবে কেন? তোরা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কোথাও রেখে আয়। গাড়িটা দূরে থাকলেই তো হল।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'নো। আই মাস্ট গো দেয়ার। লোকটা নির্ঘাত কাল সকাল পর্যন্ত মন স্থির করতে পারবে না। যদি এসে গাড়িটা পেয়ে যায় তাহলে স্রেফ চেপে যাবে। পুলিশ জানতেই পারবে না। ওরা ভাববে আমরা ইলিয়ট রোডের কাছাকাছি শেলটার নিয়েছি। তুই যেটা বলছিস আনন্দ সেটারও সম্ভাবনা আছে। ফাঁদ পাতা থাকতে পারে। তবে তার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু কথা হল এখন ওখানে পৌঁছে ফিরব কি করে?'

'হেঁটে। পায়ে পায়ে। পণ্ডিতিয়া দিয়ে শর্টকাট করে এলে মাইলখানেকও হবে না। লেটস গো।'

আনন্দর সঙ্গে বের হবার আগে সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কল্যাণ ঘুমিয়ে পড়লে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বিছানায় বডি ফেলো না। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত জেগে থাকবে। নইলে বেল বাজালে তোর মা হয়তো দরজা খুলে ডাকাত বলে চেঁচাবে।'

কল্যাণের ঝিমুনি আসছিল। ওর কনুই-এর কাছটায় জখম হয়েছে। জয়িতা ওকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বলল। তারপর আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আসবার সময় দেখল রামানন্দ এবং সীতা রায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। এবং তখনই জয়িতার মনে হল তার স্নান করা দরকার। সন্ধ্যে থেকে একটার পর একটা টেনশনে শরীর আর বইছে না। দারুণভাবে টানছে বিছানা। অথচ ওরা যখন এত করার পরও আবার বের হতে বাধ্য হল তখন তার ঘুমানোটা অপরাধ। জানলার কাছে পৌঁছে পাল্লা দুটো খুলে দিতে ঠাণ্ডা বাতাস এল। ঝিম ধরে আছে কলকাতা। এত ওপর থেকে শেষ রাতের দিকে এগোনো শহরটার ঘুমন্ত চেহারাটা দেখে জয়িতার মনটা হঠাৎ নরম হয়ে এল। একটাও গাড়ির হেডলাইট নেই, হলদে আলোয় রাস্তাগুলো আরও নির্জন হয়ে গেছে। কাছে কিংবা দূরে কোন বাড়ির খোপে আলো জ্বলছে না। হঠাৎই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কল্যাণ পড়ে গেছে এবং লোকগুলো ওকে জাপটে ধরেছে। সেই মুহূর্তে কি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল? নইলে হঠাৎ তার শরীরে কোন শক্তি ভর করেছিল? কল্যাণকে মুক্ত করতেই হবে—শুধু এই চিন্তাটাই তাকে উদ্দাম করে তুলেছিল। কিন্তু সে পেরেছিল। গ্রেনেডটা ছোঁড়ার কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই তার হাত সক্রিয় হয়েছিল। নইলে কল্যাণকে কোনদিন আর ফেরত পাওয়া যেত না। নিজেকে তার অন্য রকম লাগছিল। সেই জয়িতা, যে কেবল দুঃখ পেত, এত বড় ফ্ল্যাটে একা একা থেকে নিজেকে যে শুধু অবহেলিত ভাবত সে কোথায় হারিয়ে গেল। এখন আমার একটু স্নান চাই। জয়িতা বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা, সারা শরীর বেয়ে তা গড়িয়ে পড়ছে, জয়িতার মনে হল এর চেয়ে শান্তি আর কোথাও নেই। রামানন্দ রায়ের মুখটা মনে পড়ল তার। এই প্রথম সে ওঁর মুখের ওপর কথাগুলো বলতে পারল। কিন্তু তাব পর থেকেই একধরনের ক্ষরণ শুরু হয়েছে মনে। কিরকম কুঁকড়ে গেল রামানন্দ রায়ের মুখ। অমন অসহায় সে কোনদিন হতে দ্যাখেনি মানুষটাকে। যে কোনভাবে আসা অর্থের স্রোত এবং নিমেষে সমশ্রেণীর মানুষের দ্রুতগতির জীবন রামানন্দকে প্রলুব্ধ করেছে যৌবনকে ধরে রাখতে। আজ যেন এক নিমেষেই মানুষটা অতিরিক্ত প্রৌঢ় হয়ে গেল।

পরিষ্কার হয়ে ঘরে ফিরে সেই জমকালো শাড়িটা বের করল সে। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল শাড়ি পরতে। শেষবার প্যারাডাইসের কাণ্ডটা হবার পর সে গাড়িতে বসে শাড়ি খুলেছিল। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা এখনই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু খুলতে তো পেরেছিল আব্রু রেখে। কত কি না হাস্যকর ব্যাপার এক জীবনে মানুষকে করতে হয়! এমন কি সেই পরচুলাটা! জয়িতার মনে পড়ল সেটাকে কোথায় রেখেছে। না, ফেলে দিতে হবে। সুদীপের পরামর্শে কিনতে হয়েছিল কিন্তু পরচুলা আর নকল দাড়ি তার কাছে একই ব্যাপার। শাড়ি ব্লাউজ পরে জয়িতা ঘড়ি দেখল। ওদের ফিরতে চারটে তো বাজবেই। এবং এই সময়টা তাকে জেগে থাকতে হবে। কি করা যায়! সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে বসল সে। ঘাড়ে হাওয়া লাগায় বেশ আরামবোধ হচ্ছে। কয়েক লাইনে চোখ বুলিয়ে পড়তেই ইচ্ছে করল না বইটা। সে ওটাকে সেলফে রেখে আর একটা তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

> ''সারাদিন মিছে কেটে গেল,
> সারারাত বড্ড খারাপ
> নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে; জীবন
> দিনরাত দিনগত পাপ

ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও শূন্যে নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।"

জীবনানন্দের কবিতার বইটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল জয়িতা। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্ট থম ধরে আছে। এখন কলকাতার, এই কলকাতার সব জ্ঞানপাপী ফিরে গেছে নীড়ে। তারপরেই এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল সে। কবিতার বইটি রেখে দিল সেলফে। না, শুধু দিনগত পাপক্ষয় করার জন্যে সে বেঁচে থাকবে না। এই হতাশা তার জন্যে নয়। বরং যে সব জ্ঞানপাপী সুবিধেমত নীড়ে ফিরে যায় তাদের টেনেহিঁচড়ে বের করে না আনা পর্যন্ত শান্তি নেই। কবিতাটিকে ভোলবার চেষ্টা করতেই যেন সে উঠে দাঁড়াল।

এই বাড়ির কোথাও কোন শব্দ নেই। যে বিদেশী বাজনা বাজছিল কোন ফ্ল্যাটে সেটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। রামানন্দ রায়ের মুখটা মনে পড়ল জয়িতার। এইরকম ভাবে তিনি কোনদিন তাকাননি। জয়িতার হঠাৎ খুব ইচ্ছে হল বাবার কাছে গিয়ে বসে। তার বক্তব্য বলার জন্যে হয়তো সে সঠিক শব্দ নির্বাচন করেনি। আমরা যখন কথা বলি তখন বেশির ভাগ সময়েই বক্তব্যটাই জানাবার চেষ্টা করি কিন্তু আপাতনিরীহ কোন শব্দ যে শ্রোতার কানে মারাত্মক অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায় তা ভাবার প্রয়োজন বোধ করি না। মুখে কোন ক্ষমা চাইতে পারবে না সে। কারণ সে বিশ্বাস করে ক্ষমা চাইবার মত কোন অপরাধ সে করেনি। কিন্তু চুপচাপ কিছুক্ষণ পাশে বসে থাকলে এক ধরনের আন্তরিকতা পৌঁছে দেওয়া যায়। জয়িতার স্থির বিশ্বাস রামানন্দ এখনও ঘুমাননি। তাছাড়া সে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। তিনি তাকে এবং তার বন্ধুদের এই ফ্ল্যাটে আশ্রয় দিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই তার পক্ষে অনুমান করতে বাধা নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিস ডেকে তাদেব ধরিয়ে দেননি। বরং তাঁর ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে তিনি পারলে উপকারই করবেন।

রামানন্দ রায়ের দরজায় নক করতে গিয়েও সামলে নিল সে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। তার পর সেটা কাটিয়ে উঠে দরজায় চাপ দিল। খোলাই ছিল ওটা. জয়িতা ভেতরে পা বাড়িয়ে অবাক হল। টানটান বিছানা দেখে বোঝা যায় কেউ সেটা ব্যবহার করেনি। ঘবে আলো জ্বলছে। বামানন্দ রায় তাঁব ঘরে নেই। ছ্যাঁত করে উঠল জয়িতার বুক। এতরাত্রে কোথায় গেলেন তিনি! যেভাবে মানুষটা বেবিয়ে এসেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে কিছু একটা করে বসা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে তো আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই। জয়িতা বাথরুমে মুখ বাড়াল। না, তিনি সেখানেও যাননি।

তাহলে কি রামানন্দ রায় বেরিয়ে গেছেন? তারা যখন ঘরে বসে কথা বলছিল তখন কি নিঃশব্দে বাইরের দরজা খুলে চলে গেছেন? এতক্ষণ যে ধারণা তৈরি হয়েছিল তা কি ভুল? বাড়ির টেলিফোন পর্যন্ত ব্যবহার না করে রামানন্দ এই নিশুতি রাতে বেরিয়ে গেছেন পুলিসকে খবর দিতে? জয়িতার মনে হল অবিলম্বে কল্যাণকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। সুদীপ আনন্দ ফিরে আসার আগেই রাস্তায় ওদের সঙ্গে দেখা করা দবকার। জয়িতা কিছুই ভাবতে পারছিল না। তার পরেই পাশের ঘরটার কথা মনে পড়ল ওর। সীতা রায় তো আজ সারাদিন প্রায় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে রয়েছেন। এমন কি বাড়িতে তিনটে অপরিচিত ছেলে এসেছে তা নিয়েও মাথা ঘামাননি। রামানন্দ তো ওই ঘরে যাননি? মনে হয় না। সীতা রায় রাত হলে স্বামীকে নিজের ঘরে ঢুকতে অনুমতি দেন না। বেশ কিছুদিন ধরে জয়িতা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। একসঙ্গে পার্টিতে যাচ্ছেন ওঁরা, হেসে কথা বলছেন অন্য ফ্ল্যাটের লোকদের সঙ্গে, গেস্ট এলে আপ্যায়নও করছেন এবং তখন দেখলে বোঝা যাবে না এই স্বামী-স্ত্রী রাত্রে পরস্পরের মুখ দেখেন না। আজ কি করে রামানন্দ সীতা রায়ের ঘরে যাবেন? অন্তত এই শেষরাত্রে? সীতা রায়ের তো জেগে থাকার কথা নয়, শরীরের প্রতি তাঁর অত্যন্ত সতর্কতা।

হঠাৎ জয়িতার মনে পড়ল বাথরুমটার কথা। পাশাপাশি দুটো ঘরের জন্যেই একটাই বাথরুম। দুটো দরজা দিয়ে ওটায় যাওয়া যায়। জয়িতা নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকল। এবং ঢুকতেই বুঝতে পারল পাশের ঘরের মানুষ জেগে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। একটু সঙ্কোচ হল তার। কিন্তু রামানন্দ রায় ওখানে আছেন কিনা তা জেনে নিশ্চিত হতে চায় সে। সে ঠিক করল অন্তত একবার সে দরজার

কাছে কান পেতে শুনবে রামানন্দ কথা বলছেন কিনা। হয়তো এটা অন্যায়, রুচিতেও বাধছে তার। কিন্তু নিজের সন্দেহটা নিজেই মিথ্যে প্রমাণ করতে চাইল সে। ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কান্না শুনতে পেল জয়িতা। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল—মা কাঁদছে।

রামানন্দ বললেন, 'কেঁদো না সীতা, প্লিজ শান্ত হও।'

সীতা রায় বললেন, 'তুমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। বল ক্ষমা করবে?'

রামানন্দ বললেন, 'আমিও যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

সীতা রায় একটু থামলেন। তারপর করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু জয়ী? জয়ী?'

রামানন্দ বললেন, 'ওকে ওর মত থাকতে দাও। কখনও ওকে বাধা দিও না। ও আর ঠিক আমাদের নেই। আমি ওর জন্যে গর্বিত সীতা।'

আর দাঁড়াতে পারল না জয়িতা। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এল। এবং হঠাৎই তার কান্না পাচ্ছিল। শূন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কাঁদছিল। অথচ তার চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়ছিল না। আর তখনই দরজা খোলার জন্যে অনুরোধের বেল বাজল।

॥ ২০ ॥

'বড়বাজারে উগ্রপন্থীদের আক্রমণ', 'জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস', 'প্যারাডাইসের পর বড়বাজার।' তিনটে খবরের কাগজের শিরোনাম সকালবেলায় ওদের চোখে পড়ল। শেষরাত্রে এই ফ্ল্যাটে ফিরে সুদীপ ঘুমাবার চেষ্টা করেছিল। আনন্দ চুপচাপ শুয়েছিল। বাবার চিঠিটার কথা অন্ধকার ঘরে কেবলই মনে পড়ছিল তার। একটা মানুষ কোন অবস্থায় অমন চিঠি লিখতে পারে? বারংবার বাবা এবং তার সেই বান্ধবীকে ভুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে আবিষ্কার করেছিল ওই ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে তার কোন বিরূপ মানসিকতা তৈরি হচ্ছে না। এমন কি হয়তো তিনি মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, তবুও। আর এইভাবেই ঘরের অন্ধকারটা মিলিয়ে গেল, জানলার বাইরে আলো ফুটল। শরীরে বেশ ক্লান্তি থাকায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল তার। ওপাশে কল্যাণ বোধ হয় ঘুমিয়েছে ওষুধের প্রভাবে। সুদীপ ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যদিও সে কল্যাণের পাশে বিছানায় একইভাবে পড়ে আছে। পায়ের তলায় মোটা কার্পেট, দামী সোফা আর সুন্দর ছবিতে সাজানো ঘরটায় সকাল এল। জয়িতাদের কালা চাকরটা দামী পটে চা দিয়ে গেল। তারপর যখন জয়িতা এল কাগজ নিয়ে তখনও আলস্য পাক খাচ্ছে ঘরে। সুদীপ উঠে এসে শিরোনামগুলো পড়ল। পড়ে হাসল, 'উগ্রপন্থী বলে কেন রে কাগজগুলো? উগ্রপন্থী শব্দটা শুনলেই নরমপন্থী শব্দটাকে মনে পড়ে। ভারতবর্ষের সবকটা মানুষ নরমপন্থী হোক এটাই যেন ইঙ্গিতে থাকে। কিন্তু ওরা ধরেছে, প্যারাডাইসের পর বড়বাজার—তার মানে দুটো যে আমাদেরই কাজ তা বুঝতে পেরেছে। ধন্যবাদ। কি লিখেছে পড় তো!'

তিনটে কাগজে খবরগুলো এক করলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়—, গতরাত্রে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের একটি ওষুধের কারখানায় উগ্রপন্থীরা আক্রমণ চালায়। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে মোহনলাল আগরওয়ালের এই ওষুধের কারখানাটি সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যবসায়ী হিসেবে মোহনলালজীর খ্যাতি আছে। মধ্যরাত্রে কয়েকজন উগ্রপন্থী কোন এক সূত্রে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করে। তারা কর্মচারীদের একপাশে সরে যেতে বাধ্য করে। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রেনেড এবং পেট্রল বোমা ছুঁড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল কারখানাটিকে ধ্বংস করে দেয়। উগ্রপন্থীরা যখন পালাচ্ছিল তখন তাদের একজনকে জনসাধারণ ধরে ফেলতে গিয়েও পারে না। প্রকাশ, একজন মহিলা উগ্রপন্থী তাকে বাঁচিয়ে উধাও হয়। কোনরকম ডাকাতি হয়নি। দমকল এবং পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু কারখানার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ক্ষতির পরিমাণ সঠিক না জানা গেলেও কয়েক কোটি টাকা বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোন মানুষ যাতে মারা না যায় সে ব্যাপারে উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য ছিল এটা বোঝা গেছে। তিনজন সামান্য আহত হয়েছেন বিস্ফোরণের ফলে। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত

শহরে জাল বিছিয়ে ফেলে—যে গাড়িটিতে উগ্রপন্থীরা অকুস্থল থেকে পালিয়েছিল সেটি ধরবার জন্যে। এই কপি প্রেসে দেবার সময় জানা যায় ইলিয়ট রোড এবং ওয়েলেসলির মোড়ে পুলিস পরিত্যক্ত গাড়িটিকে পেয়েছে। এই গাড়িটি একটি সিনেমা হলের সামনে থেকে চুরি গিয়েছিল কয়েক ঘন্টা আগে। পুলিস সন্দেহ করছে প্যারাডাইসের ঘটনাটির সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। উভয় ক্ষেত্রেই আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ধরা পড়েনি। এই দলে যে মহিলা আছে সে ব্যাপারে পুলিস নিঃসন্দেহ। এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। জোর তদন্ত চলছে। পুলিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন তাঁরা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।'

সংবাদটির মধ্যে একটি বক্স করে আর একটি সংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনটি কাগজেই। তার ছোট শিরোনাম, 'এবার রেসকোর্স? ঘটনাটির পর আমাদের অফিসে টেলিফোনে উগ্রপন্থীদের একজন জানায় তারা এবার রেসকোর্স ধ্বংস করতে চাইছে। যেহেতু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর আর তাদের কোন আস্থা নেই তাই তারা জনস্বার্থবিরোধী বলে যাদের মনে করবে তাদেরই ধ্বংস করবে। বড়বাজারের ঘটনা জানিয়ে তারা বলে যে ওই কারখানায় মানুষের জীবননাশকারী জাল ওষুধ তৈরি হত। টেলিফোনে ওই কারখানার মালিকের গোপন গুদামের খবর আমাদের জানানো হয়। সূত্রটি ধরে পুলিস সেখানে হানা দিয়ে প্রচুর ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। এখন দেখা হবে এই ওষুধ আসল না জাল! সুনিপুণ অপারেশনের পরই উগ্রপন্থীদের খবরের কাগজের সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ করে খবর দেওয়া অভিনব বলে মনে হয়েছে।'

সুদীপ চায়ের কাপটা তুলে নিল! 'খুব দামী চা খাস তো তোরা! আঃ।'

আনন্দ সত্যি অবাক হল। এই সময় যে সুদীপ এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অন্য কথা বলতে পারবে তা তার ভাবনায় ছিল না। জয়িতা কথা বলল আনন্দর অভিব্যক্তি দেখে, 'তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হয়নি? এই সব খবর পড়ে পাবলিক যা ভাববে তাই তো আমরা চেয়েছিলাম!'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'কিন্তু হোয়াই উগ্রপন্থী! ওই শব্দটা শুনলেই পাবলিক ভয় পাবে। তবে রেসকোর্স-অপারেশন আর এখন হবে না। খামোকা তুরুপের তাস তুলে দিলি—ওরা অনেক বেশি প্রটেকশন নেবে আর আমরা কাছে ঘেঁষতে পারব না!'

আনন্দ এবার কথা বলল, 'এখনই আমরা রেসকোর্সে যেতে পারতাম না। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কিন্তু এই খবরটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই এখন দেখার।'

এই সময় কল্যাণ বলল, 'আমি এখন কি করব?'

জয়িতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'আমি যে ধরা পড়েছিলাম সেটা কাগজগুলো লিখেছে।'

'কি আশ্চর্য, ওরা তো তোর নাম লেখেনি! তাছাড়া আমিও তো জড়িয়ে গেছি। কাগজে লিখেছে এইদলে যে মহিলা ছিল সে ব্যাপারে পুলিস নিঃসন্দেহ—এমন করছিস না!' জয়িতা মুখ ফেরাল।

'দূর!' কল্যাণ খিঁচিয়ে উঠল, 'আমি আমার কথা ভেবে বলিনি। আমার জন্যে তোদের বিপদ হোক এটাই চাইছি না। আমি কিছু করা দূরে থাক, দৌড়তে পারব কিনা তাই বুঝতে পারছি না।'

আনন্দ বলল, 'তোকে কিছু বুঝতে হবে না। এখন যন্ত্রণা কেমন আছে?'

'নড়তে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

জয়িতা এগিয়ে এল, 'আমি কি তোকে সাহায্য করব?'

কল্যাণ বলল, 'তুই হাতটা দে, ব্যালেন্স রেখে উঠলে যদি ওপাশটায় কম চাপ পড়ে!' জয়িতা হাত বাড়িয়ে দিল। কল্যাণ শরীরের ভর তার ওপর রেখে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামতে নামতে কয়েকবার অস্ফুট চিৎকার করল। তারপর দুর্বল পায়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে জয়িতা বলল, 'ওকে এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

সুদীপ সিগারেট ধরাল, 'তোর বাবা তো কাল ঘোষণা করে গেছে, জিজ্ঞাসা কর।'

জয়িতা সুদীপের দিকে বিরক্তি নিয়ে একবার তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আনন্দ বলল, 'দাঁড়া। তোদের কাল একটা কথা বলিনি, আমার হোস্টেলে পুলিস এসেছিল।'

সুদীপ হাসল, 'বাঃ, কখন?'

'কাল বিকেলে। ওরা আমার জন্যে ওয়েট করছিল—খুব জোর বেঁচে গেছি।'

'মহাপ্রভুরা খবর পেলেন কি করে?'

'গ্রাম থেকে। আমরা যে গ্রামে গিয়েছিলাম তা ওরা জেনে গেছে। আজ এবং আগামীকাল ছুটি। কিন্তু এর মধ্যেই ওরা নিশ্চয়ই জেনে যাবে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কারা। আমি জানি না সুদীপের বাড়িতে গেলে ওর বাবা বলবেন কিনা ও টাকা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। তবে গতকালের ঘটনা থেকে ওরা যখন জেনেছে একজন মহিলাও ছিল তখন তার বর্ণনাও নিঃসন্দেহে পেয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তোর বন্ধুত্বের খবরটা জানতে পারা খুব স্বাভাবিক। আর সেটা হলেই তোর এইখানে পুলিস হাজির হবে। অতএব যতটা তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

সুদীপ বলল, 'তাহলে একটা কাজ করা যাক। তুই আর আমি এখনই ঠাকুরপুকুরে চলে যাই, এই সকালে রাস্তায় তেমন লোকজন নেই নিশ্চয়ই। কল্যাণকে জয়িতার বাবা ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা কিংবা প্লাস্টার করিয়ে রাখুন। রাত্রে জয়িতা ওকে নিয়ে বেহালার চৌরাস্তার মোড়ে চলে আসুক, ওখান থেকে আমরা নিয়ে যাব কল্যাণকে।'

আনন্দ আপত্তি করল, 'না, এখন দু-তিনদিন জয়িতার আমাদের সঙ্গে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দরকার নেই।' এই সময় কল্যাণ বেরিয়ে এল। এবং ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল বেচারা অনেক কষ্টে যন্ত্রণা চেপে রেখেছে। আনন্দ দ্রুত তাকে জানাল কি করতে হবে। বেহালার ট্রাম ডিপোর সামনে সুদীপ বাত দশটার সময অপেক্ষা করবে। ও যেন বেশি দেরি না করে। তাহলে ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার কোন বাস পাওয়া যাবে না।

কল্যাণ শুনল। তারপর বলল, 'তোরা ঠিকানাটা দে। আমি ডাক্তারের ওখান থেকেই সরাসরি চলে যাব।'

সুদীপ প্রতিবাদ করল, 'দিনের বেলায় হাত প্লাস্টার করা কাউকে দেখলে ঠাকুরপুকুরেব সবাই মনে রাখবে। অতএব সন্ধ্যের পরেই যাওয়া ভাল।'

অতএব সিদ্ধান্ত হল রাত দশটায় নয়, সন্ধ্যে সাতটার সময় সুদীপ কল্যাণের জন্যে অপেক্ষা করবে। জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'আমি কোথায় যাব?'

সুদীপ বলল, 'তুই এখানেই থাক। পুলিস এলে পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করবি।'

জয়িতার গলার স্বর শক্ত হল, 'সেটা যদি ওরা অবিশ্বাস করে? শোন সুদীপ, আমি মেয়ে বলে কি তোদের অসুবিধা হচ্ছে? আনন্দর কথায় হয়তো যুক্তি আছে, কিন্তু সেটা অপারেশনে নামবার আগে তোদের খেয়াল ছিল না কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সরি জয়ী, তুই কিছু মনে করিস না। কল্যাণের সঙ্গে তুইও আয়। যতটা পারিস মেয়েলি ব্যাপারগুলো পাবলিকের চোখে যাতে ধরা না পড়ে তা লক্ষ্য রাখিস।'

দরজার বাইরে শব্দ হল। রামানন্দ রায় এসে দাঁড়ালেন। নির্বাক চারজনের মুখের দিকে খানিক তাকালেন। তারপর কল্যাণকে বললেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি আমার ভাগ্নে, বাথরুমে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে। তুমি কি একা আসবে, না কেউ এসকর্ট করবে?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'আমি একাই যেতে পারব।'

'বেশ। এসো।' ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, 'আমি এইমাত্র রেডিওতে নিউজ শুনলাম। আমার অনুমান তোমরাই কাজটা করেছ। আমি তোমাদের কনডেম করতে পারছি না, আবার কনগ্রাচুলেশনও জানাতে পারছি না। আমরা কেউ রাস্তাটা চিনি না। ভারতবর্ষের মানুষের জটিল অবস্থায় পণ্ডিতদের কোন থিয়োরি কাজ করবে না। তবু ভুল পথটা তো বোঝা যায়। আই মাস্ট টেল ইউ, ইটস নট দ্য ওয়ে। তোমরা আত্মহত্যা করতে চাইছ—এক ধরনের হারাকিরি। এসো তুমি।'

কল্যাণ একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ওঁকে অনুসরণ করল। ওরা চোখের বাইরে গেলে সুদীপ বলল, 'বাঙালী মাইরি জ্ঞান দিতে পারলে আর কিছু চায় না! লেটস মুভ।'

জয়িতা দেখছিল। হঠাৎ সে বলল, 'বাট হি ইজ হেল্পিং আস, ইজন'ট ইট?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি আগে যা শুনেছিলাম ওঁর ব্যবহার দেখে কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না। যে মদ খায় খারাপ পাড়ায় যায় তারও তো বিপরীত চরিত্র থাকে। বাট উই আর রিয়েলি

গ্রেটফুল টু হিম। জয়, তুই তাহলে কল্যাণকে নিয়ে ঠিক সময়ে চলে আসিস।'

ওরা কোন জিনিস ফেলে রাখল না। সুদীপ বলল, 'এইসব মাল হটিয়ে কীটস বা রুকস্যাক কিনতে হবে। বেশ কয়েকটা জিনসের প্যান্টও দরকার।'

জয়িতা হাসল, 'তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন এক্সপিডিশনে যাচ্ছিস।'

'হু নোস! পেছনে ফেউ লাগলে ছুটে বেড়াতে হয়। টাকাকড়িগুলো কি তোরা ভাগ করে রাখবি?'

'না, আপাতত তোর কাছেই রাখ।' আনন্দর হাতের ব্যাগের ওজন বেশি। সে খুব সাবধানে ওটা বহন করছিল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে মালগুলো যোগাড় করতে। এখন পর্যন্ত বিক্রেতা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ওরা দরজার দিকে এগোতেই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'কি ব্যাপার?'

সীতা রায় হলঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে হাউসকোট, চুলগুলো চূড়ো করে বাঁধা, বোধ হয় ঘাড়ে হাওয়া লাগাতে চান। এই সকালেও তাঁর মুখে হালকা প্রসাধন পড়েছে। জয়িতা জবাব দিল, 'আমার এই দুই বন্ধু চলে যাচ্ছে। আর একজন, যাকে বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে সে সন্ধ্যেবেলায় যাবে।'

'তোমার বাবা বলছিল ওরা এখানে থাকবে, দে নিড শেলটার!'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। শেলটার শব্দটা চট করে কানে লাগল। জয়িতা হাসল, 'না, আর তার দরকার নেই। ওরা কি যেতে পারে, না তোমার কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, তোমার নাম সুদীপ? কখনও যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয় তাহলে জানাতে পার। আর হ্যাঁ, তোমরা,—তোমরা কি ওই যাকে বলে নকশাল?' সীতা রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'না। আমরা কংগ্রেস, সি পি এম, নকশাল বা কোন ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত নই। আমাদের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই। সাহায্য চাইতে বললেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সুদীপ দরজাটা খুলল।

সীতা রায় যেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, হঠাৎ খেয়াল হতে বললেন, 'তোমরা কিছু না খেয়ে চলে যাচ্ছ কেন? দশ মিনিট অপেক্ষা কর, তোমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে যাবে।'

এবার আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সো কাইন্ড অফ ইউ কাকীমা। কিন্তু আমাদের এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গেছে। আপনার এই কথাটা আমাদের ভাল লাগল। বাই জয়।'

তবু জয়িতা ওদের সঙ্গে লিফট পর্যন্ত এল। আজ ছুটির দিন বলেই এই বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে এখনও আলস্য জড়ানো। জয়িতা বলল, 'সাবধানে যাবি, কোন ঝুঁকি নিবি না।'

লিফটের বোতাম টিপেছিল সুদীপ, 'থাক, আব ঠাকুমাগিরি করিস না। কল্যাণটার হাত ঠিক হয়ে গেলে বাঁচি। আর শোন, তোব মায়ের যেন কিছু হয়েছে, আমি যেদিন কথা বলেছিলাম সেদিন উনি খুব অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন, আজ বড় সাধারণ মনে হচ্ছিল। তোর দিনটা কাটাতে খুব অসুবিধে হবে না, বুঝলি?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'ওই দুটো মানুষ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমি স্বস্তিতে থাকব। সেটাই এতদিন হয়ে এসেছে, এবাড়িতে তার ব্যতিক্রম হলেই—।'

লিফট এসে গিয়েছিল। দরজা খুলে রবীন সেন নামলেন। তাঁর চোখে বিস্ময় ফুটল। দুই তরুণের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিশাল মুখটা জয়িতার দিকে ফিরল, 'এই যে, গুডমর্নিং! চললে কোথায়?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'কোথাও তো যাচ্ছি না। আপনি?'

'ওই যে, মিসেস রায়ের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করব, উনি আছেন?'

'আছেন। কিন্তু কথা বলার মত অবস্থায় আছেন কিনা জানি না।'

রবীন সেনের বিশাল দেহ জয়িতার কাছাকাছি হল। মুখটা সামান্য নামল, 'কি হয়েছে বল তো? ক্লাবে যাচ্ছেন না, কাউকে মিট করছেন না—দার্জিলিং-এ কিছু হয়েছিল?'

'আপনি ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। দরজা তো খোলাই আছে। বাই।' শেষ শব্দটি সুদীপদের দিকে ছুঁড়ে ভেতরে পা বাড়াতে বাড়াতে জয়িতা দেখল সীতা রায় একই জায়গায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। সে নিচু গলায় বলল, 'তোমার গেস্ট এসেছেন।' তারপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বালিগঞ্জ পার্ক রোডে কোন ট্যাকসি নেই। রোদ উঠেছে কিন্তু এখনও ছায়া পালায়নি। রাস্তাটায়

দোকানপাট বলতে একদম মোড়ের কাছাকাছি, লোকজনও নেই ফুটপাতে। সুদীপ বলল, 'স্যুটকেস হাতে কলকাতার রাস্তায় হাঁটলে নিজেদের যেন অন্যরকম লাগে। যাবি কি করে?'

'ট্রামরাস্তায় গেলে ট্যাকসি পাব।' আনন্দ জানাল।

ওরা ট্রামরাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল। ট্যাকসি নেই, মিনিবাসগুলো বোধ হয় এখনও বের হয়নি। সুদীপ বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে জব্বর। ব্রেকফাস্টটা ছেড়ে আসা উচিত হয়নি।'

এ সময় একটা ট্রাম আসছিল পার্ক সার্কাসের দিক থেকে। আনন্দ বলল, 'চলে আয় সুদীপ, এই ট্রামটায় উঠব।'

'সেকি রে! এইসব নিয়ে ট্রামে উঠব?' সুদীপ প্রতিবাদ করল। কিন্তু ততক্ষণে আনন্দ হাত নেড়ে ট্রামটাকে থামিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠল ওরা। কন্ডাক্টর ছাড়া কোন যাত্রী নেই।

আনন্দ বলল, 'হঠাৎ মনে হল বালিগঞ্জ পার্ক রোড থেকে ট্যাকসিটা না ধরলেই ভাল হবে। তাছাড়া গড়িয়াহাটার মোড় থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারবি। শোন, তোর ওই বৃদ্ধা আত্মীয়াকে বিরক্ত করতে চাই না। ওখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি বুড়ি অফার করে তাহলে অ্যাকসেপ্ট করব।'

আরও ঘন্টাখানেক পরে ওরা ট্যাকসিতে ঠাকুরপুকুরের দিকে যাচ্ছিল। কয়েক পাউন্ড পাঁউরুটি, জ্যাম, বিস্কুট কিনে নিয়েছিল আনন্দ। মোড়ের কাছাকাছি একটা দোকানে বসে চা আর ডিম-রুটি খেয়ে নিয়েছে ওরা। এবং তখনই জানতে পেরেছিল কলকাতার শরীরে উত্তেজনার আগুন লেগেছে। চায়ের দোকানের প্রতিটি টেবিলে এখন ওই একটাই আলোচনা। প্যারাডাইসের পর বড়বাজার—আলোচকরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে এটি নকশালদের কার্যকলাপ নয়। কেউ কেউ অবশ্য নকশাল-পরবর্তী কিছু উগ্রমতাবলম্বী দলের নাম করল। কিন্তু কেউ প্রমাণ না থাকায় অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করছে। এবার রেসকোর্স। একজন বলল, 'আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। দেশ থেকে রেস তুলে দেওয়া উচিত। কংগ্রেস থেকে একবার রেস বন্ধ করার কথা ভাবা হয়েছিল।'

'রেস বন্ধ হলে কত বুকি-পেন্সিলারের ইনকাম বন্ধ হবে তা জানেন?'

'আপনি যে অত চেঁচাচ্ছেন, এর পর যদি ওরা বলে যারা ঘুষ নেয় তাদের খতম করব, তাহলে?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি কি ঘুষ নিই? কেউ প্রমাণ করতে পারবে?'

'বড়বাজারে জাল ওষুধ তৈরি হত কেউ প্রমাণ করেছে? বড় বড় কথা বলবেন না। এই পার্টি যদি পুলিসের চোখ এড়িয়ে কাজ চালায় তাহলে অনেক পাবলিকের জান কয়লা হয়ে যাবে।'

'যাই বল ভাই, ছোকরাদের হিম্মত আছে। বড়বাজারে বোমা! আমার খুব ভাল লাগছে ওরা নিরীহ কর্মচারীদের আগেই সরে যেতে বলেছিল!'

'এটাকে কি বলবেন, বিপ্লব? সরকারের বিরুদ্ধে তো কিছুই করছে না। হরিদা, তুমি মাইরি আর দু'নম্বর মাল চালিয়ে এক নম্বরের দাম নিও না, এই দোকানেও হামলা হতে পারে।' চায়ের দোকানের প্রতিটি নিয়মিত খদ্দের হেসে উঠল।

ট্যাকসিতে বসে আনন্দ বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই এই রকম হাসিঠাট্টার পর্যায়ে না পৌঁছে যায়! লোকগুলো কিরকম হ্যা হ্যা করে হাসছিল! এত তরলভাবে দেখছে কেন বল্ তো ব্যাপারটা?'

ভাল খেলে মনটা ভাল থাকে। সুদীপ সিগারেট টানতে টানতে রাস্তা দেখছিল। আনন্দর কথায় হাসল, 'দূর! পৃথিবীর কোন দেশের পাবলিক কখনও সিরিয়াস হয়? কিন্তু আলোচনা হচ্ছে তো! দ্যাটস অল, এখনও ঠাট্টা চলছে কিন্তু এরকম কেস আরও কয়েকটা হলে ওই লোকগুলো আর হাসবে না, এখন চায়ের দোকানের মালিক দু'নম্বর মাল এক নম্বর বলে চালাচ্ছে জেনেও কোন প্রতিবাদ করছে না। কিন্তু তখন করবে। তখন এরাই বাধ্য করবে ওই লোকটাকে ঘুষ না নিতে। আসলে পাবলিক এত দেখেছে যে কোন নতুন ব্যাপারে প্রথমেই আস্থা রাখতে পারে না। আমাদের কাজ আমরা করে যাব। পাবলিক জাগল তো বহুৎ আচ্ছা! ফলের জন্যে চিন্তা করো না, কাজ করে যাও।'

ওর কথার ধরনে আনন্দ না হেসে পারল না। একটু চুপ করে বলল, রামানন্দ রায় আমার ধারণাটা বদলে দিল। ওই রঙিন মোড়ক দেওয়া লোকটা যে হঠাৎ এত চুপচাপ আমাদের সাহায্য করবে কে

ভেবেছিল! আসলে সুদীপ, কোন মানুষকেই স্ট্যাম্প করে দেওয়া উচিত নয়। কে কখন কি ব্যবহার করে—।'

'মিডল ক্লাস, পাতি মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট। রামানন্দ রায় এখন মোটা মাল কামাচ্ছেন, ফ্যাট স্যালারির চাকরি করছেন। বালিগঞ্জ পার্ক রোডে ফ্ল্যাট, গাড়ি, চারটে ক্লাবের মেম্বরশিপ, দশটা বউ-এর সঙ্গে ঘুমানো ওই সূত্রেই এসে যাচ্ছে। লক্ষ্য কর এরা কোন মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে বলে থাকেন আমি ওর সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম। সেই ঘুম কিন্তু চোখ বন্ধ করে নয়। কিন্তু বেসিকালি লোকটা এসেছে উত্তর কলকাতার এঁদো গলি থেকে। নিম্ন কিংবা মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টগুলো গেঞ্জির মত শরীরে জাপটে আছে, ওপরে যতই পোশাক চাপুক। এঁরা খুব দ্রুত নিজেদের পালটাতে পারেন। হঠাৎ কোন ধাক্কা খেলে নড়বড়ে অবস্থায় বর্তমান চরিত্রের বিপরীত আচরণ করে ফেলেন। কিন্তু যারা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে উচ্চবিত্ত, যাদের পেছনে কোন সেন্টিমেন্টাল অতীত নেই তারা এত সহজে টপকান না। শ্রীযুক্ত বাবু অবনী তালুকদার কখনই রামানন্দ রায়ের মত কল্যাণকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যেতেন না।'

সকালবেলা বলেই বোধ হয় ট্যাকসিওয়ালা ঠাকুরপুকুরে যেতে আপত্তি করল না। গলিটার মোড়ে এসে ওরা গাড়িটাকে ছেড়ে দিল। কয়েক মিনিট ভেতরে ঢোকার পর জায়গাটা বেশ ফাঁকা হয়ে এল। এ দিকটায় প্রচুর গাছগাছালি, দু'তিনটে পুকুর চোখে পড়ল। গলিটার মধ্যে দুটো মুদীর দোকান, একটা কয়লার এবং রেশনের। সুদীপের আত্মীয়ের বাড়িটিতে ঢোকার পথ দুটো। একটা ভাড়াটেরা ব্যবহার করেন, অন্যটায় সব সময় হুড়কো লাগানো থাকে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সেই অংশে উঠোন আছে, উঠোনের ওপর ঝাপড়া কাঁঠালগাছ। এখন দশটা বেজে গেছে। রোদ কড়া হয়েছে। একগাদা বাচ্চা তারস্বরে চিৎকার করছে বাড়িটার সামনে মার্বেল নিয়ে। সুদীপ বন্ধ দরজায় শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের চিৎকার থেমে গেল। ওরা যেন এখনই কিছু ঘটবে এমন আশায় চেয়ে রইল সুদীপদের দিকে। সুদীপ সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'কেসটা কি? এই খোকা, কি হয়েছে?'

ওদের মধ্যে একটি ছেলে জবাব দিল, 'বুড়ি এবার খিস্তি করবে। আমরা দরজায় ধাক্কা দিলেই করে।'

সুদীপ আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলি! হার্ডলি আট দশ বছর বয়স কিন্তু কি স্বচ্ছন্দে খিস্তি শব্দটা উচ্চারণ করল! টেনে চড় মারব?'

'না। এখানে কোন ঝামেলা করব না আমরা। এমনিতেই ছেলেগুলোর নজরে পড়ে গেছি। টোটাল অবক্ষয়ের শিকার এরা। এই দেশের পরবর্তী প্রজন্ম। হয়তো যাকে চড় মারতে চাইলি সে-ই একদিন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবে। আর তখন খিস্তিটাই স্বাভাবিক ভাষা হবে। এককালে শালা শব্দটা বড়দের সামনে উচ্চারণ করা অপরাধ ছিল, এখন তো স্বাভাবিক।' আনন্দ আবার দরজায় শব্দ করল।

'আবার, আবার হাড়হাবাতের দল, গুখেগোর দল আমাকে জ্বালাচ্ছিস! তোদের মরণ হয় না? বাপ মা তোদের পৃথিবীতে আনল কেন? আমায় একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না গো! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—।' দরজাটা খুলে গেল। আনন্দ বৃদ্ধাকে দেখল। খালি গা, থানকাপড়টি শরীরে জড়ানো। মুখের চামড়ায় অজস্র ভাঁজ। চুল ছেলেদের মত করেই কাটা। হাতে একটা ঝাঁটা। তিনি অবশ্য থমকে দাঁড়ালেন। ক্রোধের বদলে বিস্ময় ফুটল মুখে। সুদীপ হাসল, 'আমরা এসে গেছি।'

'অবনীর ছেলে না? অ! আমি ভাবলাম—!' জ্বলন্ত চোখে বৃদ্ধা দূরে দাঁড়ানো ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন একবার। তারপর একটু সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো। দরজা বন্ধ করতে হবে।'

ওরা ভেতরে ঢুকতেই আবার বাচ্চাদের চিৎকার শুরু হল। দরজা বন্ধ করে বৃদ্ধা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, অবনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু সেই অভাগীর কি দোষ? তাকে ছেড়ে এলে কেন?'

'মা নেই।' সুদীপ খুব আস্তে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল।

'নেই?' থমকে গেলেন বৃদ্ধা, 'কবে গেল? বেঁচে গেল। ভগবান এখনও মাথার ওপরে আছেন। তা অবনী তার কাজটাজ করেছে তো? এসেছ ভালই করেছ। সঙ্গে এটি কাকে জুটিয়েছ? দ্যাখো, আমি চিৎকার চেঁচামেচি একদম সহ্য করতে পারি না। কদিন থাকবে?'

'আসতে না আসতেই বিদায় করতে চাইছ! এই সেদিন এলাম তখন বললে কোন আপত্তি নেই।'

'আমি কি তাই বলেছি। যদ্দিন থাকবে থাকো কিন্তু তোমাদের খ্যাঁটনের কি হবে? আমি বাবা রাত্রে

চোখে দেখি না, মাছ মাংসের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। তারপরে ও-পাশের যে ভাড়াটে কলেজে পড়াতো তার স্ট্রোক না কি বলে তাই হয়েছে। গত মাসের ভাড়া দেয়নি। আমার তো ওইটুকু সম্বল। দু-একদিন হলে ঠিক আছে, বেশিদিন আমি তোমাদের জন্যে হেঁসেল ঠেলতে পারব না।'

বৃদ্ধার মাথাটা সবেগে দুলতে লাগল।

সুদীপ বলল, 'তোমাকে আমাদের জন্যে কিছুই করতে হবে না। আমার এই বন্ধু কবি। একটু নিরিবিলিতে কবিতা লিখতে চায় যেখানে কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। তাই এখানে নিয়ে এলাম। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেব। তুমি শুধু দেখো তোমার ভাড়াটেরা যেন ওপরে না যায়। কবিতা লেখা খুব সাধনার ব্যাপার তো!'

'কবিতা। তুমি কবিতা লেখো?' বৃদ্ধা আনন্দর দিকে তাকাল, 'আমার কর্তা এককালে কবিতা লিখত! না না, কেউ এ বাড়িতে ঢুকবে না। ভাড়াটেরা এদিকে আসে না, আসা নিষেধ। আর যত ধান্দাবাজ আত্মীয়দের বলে দিয়েছি মরে গেলে এই বাড়ি রামকৃষ্ণদেবের আশ্রমে যাবে। কেউ ভাগ পাবে না। যাও ওপরে চলে যাও। বিছানাপত্র নেই কিন্তু। সতরঞ্চি আছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আমার।'

বৃদ্ধা ঝাঁটা হাতে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দার পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির গায়ে কোনকালে সিমেন্ট পড়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটি তৈরি করার সময় মালিকের অনেক সাধ ছিল, কিন্তু সেটা কখনই পূর্ণ হয়নি। বিশাল ছাদটি ন্যাড়া। ছাদের একপাশে একটি ঘর, তার কাঠের দরজার অবস্থাও করুণ। ছাদ ডিঙিয়ে যেতে যেতে আনন্দ লক্ষ্য করল চারপাশের গাছগাছালি ছাদটাকে বেশ আড়াল করে রেখেছে। মাঝ-দুপুরের পরেই বোধ হয় এখানে ছায়া নামে। সুদীপ দরজার শেকল খুলল। একটা কবজা আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরটি পরিষ্কার। বিশাল একটা সতরঞ্চি পাতা আছে। ওপাশে একটা কাঠের জানলা। ঘরের এক কোণে স্তূপ করা কিছু পুরনো জিনিসপত্র। সম্ভবত স্টোররুম হিসেবেই ব্যবহৃত হত। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, 'সব ঠিক আছে। কিন্তু ওরা এলে একটাই প্রব্লেম হবে। স্নান-পায়খানার জন্যে নিচে নামতে হবে। জয়িতাকে বুড়ি মানতে পারবে বলে মনে হয় না।'

সুদীপ বলল, 'তুই লক্ষ্য করিসনি। এই ঘরের পেছনেই একটা ছোট ঘর আছে। সেটা বানানো হয়েছিল দোতলায় যারা ব্যবহার করবে তাদের জন্যে। তখন তো অ্যাটাচড্ বাথ বাড়িতে বোধ হয় করা হত না সংস্কারের জন্যে। দাঁড়া একবার নিজের চোখে অবস্থাটা দেখে আসি।' সুদীপ শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

এই ঘরে কোন ফ্যান নেই। কিন্তু ইলেকট্রিক কানেকশনও যে থাকবে না তা কে ভেবেছিল! আনন্দ উঠে জানলাটা খোলার চেষ্টা করল। দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থাকায় সেটাকে বন্ধনমুক্ত করতে কসরত করতে হল। দুটো পাল্লা খুলে মরচে পড়া লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতেই পুকুরটাকে দেখতে পেল আনন্দ। একদম এই বাড়ির লাগোয়া। পুকুরের চারপাশে বাগান। জল মোটেই পরিষ্কার নয়। বেলা বাড়লেও এখনও পুকুরের সর্বাঙ্গে রোদ পড়েনি। মনে মনে পাক খেতে লাগল লাইনগুলো। 'ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,/টলমল করছে পুকুরের জল,/ঝিলমিল করছে বাতাবি লেবুর পাতা।/চেয়ে দেখি আর মনে হয়/এ যেন আর কোন একটা দিনের আবছায়া/আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে/দূর কালের কার একটা ছবি নিয়ে এল মনে।' যে মানুষটি চলে গেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তিনি কেমন করে যেন চলে আসেন আধুনিকতার আড়াল ভেঙে। এবং তখনই আনন্দর নজরে পড়ল মেয়েটিকে মা'র 'সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড় দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে।' মেয়েটি এঁটো বাসন ঘাটে রেখে অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই আনন্দ সরে এল। সে বুঝতে পারছিল না মেয়েটি খোলা জানলা দেখে অবাক হয়েছে, না তাকেও দেখতে পেয়েছে! দ্বিতীয়টি কিছুতেই কাম্য নয়। এই ঘরে কেউ আছে এটা যত কম মানুষ জানতে পারে ততই মঙ্গল। জানলাটা বন্ধ করে দিতে গিয়েও সে থেমে গেল। খোলা জানলায় মেয়েটি যদি অবাক হয় বন্ধ হলে সেটা আরও বেড়ে যাবে। আসলে সেই মহান বৃদ্ধটি তার সব গোলমাল করে দিলেন। কেন যে এইভাবে সব পরিবেশ সব মন নিয়ে এমন করে শব্দে শব্দে প্রতিমা গড়ে গেছেন!

সুদীপ হাসিমুখে ফিরে এল, 'জয়িতার জন্যে চিন্তা নেই। প্যানটা ঠিক আছে বলেই মনে হল। স্নান

করতেও কোন অসুবিধে হবে না। শুধু আমাদের নিচ থেকে জল এনে দিতে হবে ওকে।'

'বুড়িকে কি কৈফিয়ত দিবি?'

'তোর কিংবা আমার পালা করে শরীর খারাপ হবে। জানলাটা খুলেছিস?'

সুদীপ সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ বাধা দিল, 'ওখানে যাসনে সুদীপ।'

'কেন? কেউ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। একটি কৌতূহলী তরুণী। বাসন মাজতে এসেছে।'

'তাই! আহা কি দৃশ্য। কেমন দেখতে রে?'

'ভাল করে দেখিনি। আমরা এখানে এসেছি তা জানাজানি হোক নিশ্চয়ই চাস না!'

'তোর কিছু হবে না। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কখনই নায়কদের বিপদে ফেলত না। এই পুকুরঘাট, দোতলার জানলা নিয়ে এককালে কত রোমান্টিক কাহিনী লেখা হয়েছে বল্।'

'বাংলা দেশের বেশির ভাগ লেখক পালিয়ে বাঁচতে ভালবাসেন। তাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন নিজের সময়টাকে এড়িয়ে গিয়ে। ছেড়ে দে, এই ঘরটা তো বেশ ভাল। কিন্তু কয়েকটা বালিশ লাগবে। আর ওই বস্তুগুলো কোথায় রাখা যায়?'

আনন্দ ঘরটাকে আর একবার জরিপ করল। তারপর একটা সুটকেস তুলে কোণার দিকে মালপত্র সরিয়ে আড়াল করল। তারপব বলল, 'এখানে সাপটাপ থাকা বিচিত্র নয়। চোখ খোলা রাখিস।' তারপর জামা খুলে সতরঞ্চিতে শরীর এলিয়ে দিল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়।'

হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল আনন্দ। সুদীপ ওর দিকে তাকাল। আনন্দর স্বাস্থ্য ভাল নয়, গায়ের রঙও ময়লা। কিন্তু এই বয়সেও ও যে কিভাবে একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে যা তার চেহারা ছাপিয়ে উঠেছে। সুদীপেরও ঘুম পাচ্ছিল। কাল রাত্রের টেনসনের জেরে এতক্ষণ চলছিল। সতরঞ্চিতে বসার পর শরীর টানছে। সে জামা খুলল। তার সুন্দর দেহ, উজ্জ্বল রঙ নিয়ে কিছুদিন আগেও একটা গর্ব ছিল। এখন আর এসব নিয়ে ভাবে না। ময়দানে জুডো এবং পরে ক্যারাটে শিখেছিল কিছুদিন। ওই বয়সে শরীরটা তৈরি করতে বেশির ভাগ ছেলের মত সে যত্নবান ছিল। কিন্তু সিগারেট ধরার পর ওসব ছেড়ে দিয়েছে। টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে শক্ত মেঝে পিঠে লাগল সতরঞ্চির আড়াল ভেদ করে। এইভাবে শোওয়ার অভ্যেস তার কোনদিনই ছিল না। দু'তিনবার পাশ ফিরে একটু আরাম তৈরি করে নিচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত সুদীপ উঠে বসল। একটা বালিশ দরকার। আনন্দ এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পারে বটে। কিন্তু সে এত দ্রুত মানাতে পারছে না। কিন্তু বালিশ ছাড়াই শুতে হবে ভাই তোমাকে। সুদীপ নিজের সঙ্গে কথা বলল। এবং তখনই জানলার দিকে নজর গেল। এবার ওখান দিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। একটু অন্ধকার করে দিলে বোধ হয় ঘুম আসবে। উঠে জানলার কাছে সন্তর্পণে যেতেই পুকুরটাকে দেখতে পেল সে। পুকুরের ধারে কেউ নেই। আনন্দ যে মেয়েটার কথা বলেছিল সে বোধ হয় কাজ শেষ করে ফিরে গেছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়েই তার চোখ আটকে গেল একটা গাছের তলায়। দুটি অল্পবয়সী ছেলে মেয়ে সেখানে মগ্ন হয়ে গল্প করছে। ওদের চেহারা, রকম এবং ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সুদীপ। তারপর জানলাটা বন্ধ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখন অবধি কোন মেয়ের সঙ্গে সে প্রেমের কথা বলতে পারল না। সুদীপ কোন একটি মেয়ের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু অবয়ব তৈরি হবার আগেই জোয়ারের মত ঘুম এল শরীরে। এমন কি কোমরে গোঁজা ধাতব বস্তুটিও আর অস্বস্তি আনল না।

বেহালা ট্রাম ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ আর একবার হাই তুললো। আজ সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু তবু ঘুমঘুম লাগছে। আনন্দ যদি ডেকে না তুলতো তাহলে এখন এখানে দাঁড়াতে পারত না। তার সঙ্গী হতে চেয়েছিল আনন্দ কিন্তু সে নিষেধ করেছে। সুদীপ একাই ও-বাড়িতে আছে এই রকমই পাড়ার লোকের জানা ভাল। বুড়ি কাউকে বলতে যাচ্ছে না এরকম বিশ্বাস করা যেতে পারে। দুপুরে অবশ্য আর একবার উঠতে হয়েছিল। ঘরের দরজায় এসে তারস্বরে চিৎকার করছিলেন বুড়ি ঘুম ভাঙানোর জন্যে। কোন রকমে চোখ মেলতেই শুনেছিল, 'রাত জেগে চুরি করে এসেছে নাকি! এত ঘুম তো বাপের জন্মে দেখিনি! ভাত রেঁধেছি, গায়ে জল ঢেলে সেগুলো উদ্ধার কর এখন।' একটা নিরামিষ

তরকারি আর ভাত। কিন্তু অমৃত বলে মনে হয়েছিল সুদীপের। ঝি-চাকরের হাতে রান্না খেতে খেতে ভুলেই গিয়েছিল নিরামিষ কতটা সুস্বাদু হয়। তারপর আবার ঘুম। কখন যে দিনটা কেটে গেল তা টেরই পায়নি।

এর মধ্যে এখানে এসে দুটো কাজ করেছে সে। একটা ছোট ট্রাঞ্জিস্টার কিনেছে। খবরের কাগজ রোজ পাবে কিনা ঠিক নেই। বুড়ির তো সে-বালাই নেই। আনন্দই বলেছিল এটা কিনতে। আর ব্যাগ ভরতি করে খাবার কিনেছে, সিগারেট নিয়েছে, সঙ্গে মোমবাতি আর হাওয়ায় ফোলানো বালিশ।

সাতটা দশ। সাতটায় আসার কথা ওদের। কল্যাণটা কোনকালেই সময় ঠিক রাখে না। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে জয়িতা। সুদীপ চারপাশে তাকাল। দেখে তো মনে হচ্ছে না কেউ তাকে নজর করছে কিন্তু বিশ্বাস কি! আজ বাড়ি থেকে বের হবার পরই ওই একটা অনুভূতি হচ্ছে। রাত দশটা বদলে সাতটা করা হয়েছিল সেটা খেয়াল আছে তো ওদের! একটার পর একটা ট্রাম আসছে আর চলে যাচ্ছে অথচ সে উঠছে না, যে কোন মানুষই তো সন্দেহ করতে পারে। সুদীপ এগিয়ে গেল। একজন পুলিশ বগলে লাঠি গুঁজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠে হেসে ফেলল সে। দূর, ওই পুলিশটাকে খুব দুঃখী-দুঃখী মনে হচ্ছে!

সাতটা পনেরো নাগাদ ট্যাকসিটা ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়াল। পেছনের জানলা থেকে কল্যাণ হাত নেড়ে ওকে ডাকছে সুদীপ দেখতে পেল। চটপট ড্রাইভারের পাশে উঠে বসে চালাতে নির্দেশ দিল সে। কল্যাণ বলল, 'পনেরো মিনিট লেট, কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

'কেন? ট্যাকসি পাসনি?'

'না, ট্যাকসি নয়। ওরা জয়িতাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।'

সুদীপ ঠোঁট কামড়াল, 'কখন?'

'আমরা যখন বের হচ্ছি। খুব অল্পের জন্যে ওরা আমাদের মিস করেছে।'

'তোর হাতের খবর কি?'

'মেজর কিছু নয়। তবে ডাক্তার প্লাস্টার করে দিয়েছে। এখন ব্যথা টের পাচ্ছি না।'

সুদীপ এবার জয়িতার দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। মাথার চুল একদম ছেলেদের মত ছেঁটে ফেলেছে জয়িতা। কলার-উঁচু শার্ট পরেছে। এখন ওকে একটি সতেরো বছরের তরুণের মত দেখাচ্ছে। একটা রসিকতা করতে গিয়ে চেপে গেল সে।

গলিটার অনেক আগেই ট্যাকসি ছেড়ে দিল ওরা। এদিকে রাত হলে লোকজন কমে যায়। ওরা হেঁটে এল চুপচাপ। জয়িতার ব্যাগটা ওর কাঁধেই ছিল, কল্যাণেরটা সুদীপ বইছিল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ বলল, 'তোরা একপাশে দাঁড়া। বুড়ি দরজা খুললে প্রথমে আমি ভেতরে গিয়ে কথা চালাব। তারপর শিস দিলেই সোজা ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ি দেখতে পাবি, শব্দ না করে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে যাবি তোরা। ওখানে আনন্দ আছে। তোরা এখন এলি বুড়ি তা জানতে না পারে।' কথা শেষ করে দরজায় শব্দ করল সুদীপ। তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে আওয়াজ ছিটকে উঠল, 'কে, কে রে? এখন কে জ্বালাতে এল?'

সুদীপ মৃদুগলায় বলল, 'আমি, আমি ফিরে এসেছি।'

॥ ২১ ॥

জয়িতা দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তোকে দেখে শরৎচন্দ্রের নায়কের কথা মনে আসছে।'

ওরা যে কখন নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসেছে টের পায়নি আনন্দ। সে সতরঞ্জিতে চিৎ হয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না থিয়েটারের আলোর মত ঘরে ঢুকেছে। কথা শুনে সে উঠে বসে বলল, 'সেকি রে। তুই শরৎচন্দ্র পড়েছিস?'

'কিছু কিছু। সব ভাল লাগেনি। তুই আমাকে কি ভাবিস বল্ তো? প্যান্ট পরি বলে বাংলা সাহিত্য

পড়ব না! যতসব অদ্ভুতুড়ে আইডিয়া। ঘরটা কিন্তু খারাপ নয়। হ্যাটস অফ টু সুদীপ!' ঘরে ঢুকে সোজা জয়িতা চলে গেল জানলার কাছে, 'আরে ব্বাস! ওটা পুকুর নাকি রে! ফ্যান্টাস্টিক! জানলা দিয়ে পুকুর, এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।'

আনন্দ বলল, 'জানলার সামনে দাঁড়ানো নিষেধ। দিনের বেলায় তো অবশ্য। আয় কল্যাণ।' কল্যাণ চটি খুলে সতরঞ্জিতে বসতেই আনন্দ ওর হাতের রঙ সাদা এবং গলা থেকে কিছু ঝুলছে দেখতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'হাড় ভেঙেছে?'

'ভাঙে নি, চিড় ধরেছে। কি ঝামেলা বল্ তো!'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোকে, নার্সিং হোমে?'

'হ্যাঁ। রামানন্দ রায় লোকটা কিন্তু ভাল। বেশি কথা বলেন না যদিও তবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ওঁর বন্ধুই ডাক্তার। তাঁকে বললেন বাথরুমে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। ভদ্রলোক সেটা বিশ্বাসও করলেন। রামানন্দ রায় আমাকে কোন প্রশ্ন করলেন না যাওয়া-আসার পথে।' কল্যাণ জানাল, 'কিন্তু এই হাত নিয়ে কিছুই করতে পারছি না, কোন কাজে লাগব না—।'

'কল্যাণ!' আনন্দ ওকে থামাল, 'তোর অবস্থা আমাদের যে কোন একজনের হতে পারত।'

এই সময় সুদীপ উঠে এল। কল্যাণ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে ছাদটা, পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ছাদটাকে দেখতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। সুদীপ সেই জ্যোৎস্না মাড়িয়ে এল। এসে বলল, 'বুড়ি আমাদের জন্যে রাত্রের রুটি করছে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা এসেছে বুড়ি জানেন?'

সুদীপ বলল, 'জানতো না। আমিই বলে দিলাম। মায়ের ব্যাপারে অবনী তালুকদারের ওপর বুড়ির খুব রাগ ছিল! সেটাকেই ক্যাশ করলাম! বললাম মা মারা যাওয়ার পর বাবা বোধহয় আবার কিছু করবে তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আমার এই বন্ধুরা আমাকে এত ভালবাসে যে সঙ্গে এসেছে। আমি যে এসেছি তা বাবা জানলে আর রক্ষে থাকবে না। বুড়ি শুনে ক্ষেপে গেল খুব! বলল, কাকপক্ষী ছাড়া কেউ টের পাবে না। তবে বন্ধুদের বাড়িতে কি জানানো হয়েছে? আমি বলেছি ওরা সবাই হোস্টেলে থাকে।'

আনন্দ হাসল, 'তোর কি মনে হয় বুড়ি এই গল্প বিশ্বাস করেছেন? আমি মনে করি না।'

'করুক বা না করুক যদি আমাদের তাড়িয়ে না দেয় তো ঠিক আছে। এই জয়ী, তুই ওই জানলার সামনে যাবি না। অসুবিধে আছে।' সুদীপ জোর গলায় বলল।

'শুনেছি।' জয়িতা জবাব দিল কিন্তু সরলো না।

'কি শুনেছিস? ওখানে দাঁড়ালে তোর চিত্ত চঞ্চল হবে। পুকুরের ধারে প্রেমের দৃশ্য দেখা যায়।'

জয়িতা ঘুরে দাঁড়াল, 'তুই প্রেম বুঝিস?'

'তোর চেয়ে বেশি। তিন-তিনটে মেয়ে আমাকে প্রপোজ করেছে জানিস।'

জয়িতা এবার সতরঞ্জিতে টান টান শুয়ে পড়ল, 'সত্যি, বাংলা দেশের মেয়েদের কি দুরবস্থা, তোকেও তারা প্রপোজ করে। আসলে সেইসব মেয়ে বোধহয় প্রেম করা ছাড়া কিছু জানে না।'

কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল, 'তুই কখনও কোন ছেলেকে ভালবেসেছিস?'

'কেন বাসব না? তুই আনন্দ সুদীপকে তো ভালই বাসি। আজ আসবার সময় মনে হচ্ছিল রামানন্দ রায়কেও ভালবেসেছি। ভালবাসা এক কথা আর প্রেম আর এক জিনিস। তুই জিজ্ঞাসা কর আমি কারও প্রেমে পড়েছি কিনা? না পড়িনি। অবশ্য আমাকে মেয়ে বলে ছেলেরা চট করে ভাবতেও পারে না। আর কেন জানি না ভাই আমার সেই ফিলিংসটাই আজ অবধি এল না। সুদীপ, দৃশ্য দেখে চিত্তচঞ্চল হবে তোর, আমার নয়।' শুয়ে শুয়েই সিগারেট ধরালো জয়িতা।

সুদীপ একটু উষ্ণ গলায় বলল, 'কথা শুনলে মাইরি অ্যালার্জি বের হয়। চিমটি না কেটে কথা বলতে পারিস না? তোর চুল ছাঁটল কে?'

জয়িতা উঠে বসল, 'তোর প্যান্ট বানায় কে?'

আনন্দ এবার হেসে উঠল, 'ঠিক আছে। আর নয়। আমার একটু সিরিয়াস কথা আছে।'

সুদীপ একটু রাগত ভঙ্গিতে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে একপাশে রাখতে লাগল। ট্রানজিস্টারটার

বোতাম টিপতেই চমৎকার শব্দ হল। তারপর ঘড়ি দেখে সেটাকে বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'মোমবাতি জ্বালাতে হবে? কারও এখন অসুবিধে হচ্ছে?'

আনন্দ বলল, 'না। বেশ তো দেখতে পাচ্ছি। জয়িতা, আমরা সারাদিন এখানে, ওদিকে কোন নতুন খবর আছে?'

জয়িতা বলল, 'আছে। সারাদিন আমি ফ্ল্যাট থেকে বের হইনি। বলতে গেলে টানা সাতঘণ্টা ঘুমিয়েছি। বিকেলে মা এসে বললেন, সারা কলকাতায় নাকি তোলপাড় হচ্ছে বড়বাজার নিয়ে। আমরা যাই বলি না কেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না ওরকম দুর্দান্ত ব্যাপার আমাদের পক্ষে করা সম্ভব। তাঁর ধারণা আমি যা করছি তা চেপে যাচ্ছি। যাক, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোদের শুনে দরকার নেই।'

এই সময় সুদীপ বলে উঠল, 'এখন থেকে আমাদের কারও কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই।'

আনন্দ চাপা গলায় বলল, 'আঃ সুদীপ। তারপর?'

সুদীপকে একবার দেখে নিয়ে জয়িতা বলতে লাগল, 'বিকেলে বাবা বাড়িতে ফিরে এল। লালবাজার নাকি উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের ধরবার জন্যে। ওর এক পুলিস অফিসার বন্ধু বলেছে যে তারা অপরাধীদের খোঁজ পেয়েছে। ধরতে পারলে একটা সংগঠিত উগ্রপন্থী দলের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া সম্ভব হবে। বাবা বলল যদি আমাদের সঙ্গে ওই ঘটনার কোন যোগাযোগ থাকে তাহলে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার। আমার এক কাকা আছে চণ্ডীগড়ে। তার কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল বাবা। আমি জানালাম আমাদের ব্যবস্থা করাই আছে। আপাতত ঠিকানা জানাতে পারছি না। প্রয়োজন হলে জানাব। বাবা আমাদের এখানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল আমি রাজী হইনি। কল্যাণকে নিয়ে যখন লিফটে নামছি তখন জানতাম না পুলিস অত তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে পৌঁছে যাবে। লিফট থেকে বের হতেই দেখলাম দুটো পুলিস-ভর্তি জিপ ঢুকল গেট দিয়ে। আমরা কোন রকমে ওদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের কেউ ফলো করেনি?'

'না। সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, তাই না কল্যাণ?'

কল্যাণ বলল, 'হ্যাঁ। আমরা পৃথিবী ঘুরে এসেছি। প্রথমে ট্যাকসি নিয়ে গেছি যাদবপুর। সেখানে আর একটা ট্যাকসি নিয়ে যোধপুর পার্কের ভেতর দিয়ে লেক গার্ডেন্স হয়ে ফাঁড়ি পেরিয়ে এলাম। এত ঘুর পথে কেউ ফলো করলে দেখা যেতই। এখানে বাথরুম কোথায়? মানে টয়লেট?'

সুদীপ হাসল, 'বাথরুম বললেই চলবে। আমাদের বাঙালিদের এইটেই অসুবিধে হয়। আয়।'

ওরা বেরিয়ে গেলে আনন্দ জয়িতাকে বলল, 'সুদীপের কথায় কিছু মনে করিস না।'

'দূর! ওর কথার কোন দাম আছে নাকি! ফালতু বকে।'

'জয়িতা আজ থেকে আমাদের আর কোন নিশ্চিত জায়গা থাকল না। তোর মন পরিষ্কার তো?'

'একশ ভাগ। নেক্সট অ্যাকশন কবে?'

'একটু সময় দে। একটু ভেবেচিন্তে করতে হবে। আগের দুটো উত্তেজনায় করে ফেলেছি। কোন ক্ষতি তেমনভাবে হয়নি বটে কিন্তু যে কোন মুহূর্তেই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই রিস্কটা আর নেওয়া চলবে না।'

'কিন্তু সময় দিলে যদি ওরা আমাদের ধরে ফেলে?'

'চান্স কম। আমরা যদি নতুন কোন ভুল না করি তাহলে ওদের অনেক সময় লাগবে।'

জয়িতা কোন কথা বলল না। তার সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। সে চারপাশে তাকিয়ে একটা অ্যাশট্রে খুঁজল। না পেয়ে কোণা থেকে একটা পুরোনো কৌটো টেনে এনে সেটাকেই অ্যাশট্রে বানাল। সুদীপরা ফিরে এল। কল্যাণ বলল, 'এই রকম জ্যোৎস্না অনেকদিন দেখিনি।'

আনন্দ কথা শুরু করল, 'আমরা এই যে জায়গাটা পেয়েছি তা যে খুব নিরাপদ আমি মনে করি না। কিন্তু যদি আমরা সতর্ক হই তাহলে কিছুদিন থাকতে পারব। আমার প্রস্তাব, সুদীপ ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না। দিনের বেলায় তো বটেই রাত্রেও ছাদে ঘোরাফেরা করা ঠিক হবে না। অন্তত দিন সাতেক স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে হবে সবাইকে।'

কেউ কোন কথা বলল না। আনন্দ আবার বলল, 'রেসকোর্সে অ্যাকশন করতে যাওয়া এই মুহূর্তে বোকামি হবে। তবে সুদীপ কাল রেসকোর্সের সেক্রেটারিকে টেলিফোন করে হুমকি দিবি। এবং সেই সঙ্গে খবরের কাগজগুলোকেও জানাবি। নেক্সট রেসের দিন তার কি প্রতিক্রিয়া হয় জেনে সেই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিস আমার খবর পেয়েছে। আজ জয়িতার সন্ধানও পেল। বুঝতে পারছি না সীতা রায় ওদের কি বলবেন। যদি সত্যি কথা বলেন তো ওদের উৎসাহ বেড়ে যাবে।'

কল্যাণ বলল, 'সীতা রায় কিছু বলবেন না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'শোন, এখন থেকে কোন অনুমানের ওপর চলবি না। না বলেন তো ভালই, বললে যা হবে তার জন্যে নিজেদের প্রটেক্ট করতে হবে। আপাতত আমরা এখানে থাকি। সুদীপ দ্যাখ কে আসছে!'

শোনামাত্র সুদীপ চট করে দরজায় চলে এল। আনন্দ দেখল কল্যাণ এবং জয়িতা যতটা সম্ভব ভেতরে সরে যাচ্ছে। চেহারাটা স্পষ্ট হলে সে নিঃশ্বাস ফেলল। সন্তর্পণে বুড়ি এগিয়ে আসছেন। দরজার সামনে সুদীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করলেন, 'ওমা তোমরা এখানে ভূতের মতন বসে আছ? একটা হ্যারিকেন লাগবে বলনি কেন?'

সুদীপ হাসার চেষ্টা করে সহজ গলায় বলল, 'আমাদের সঙ্গে মোমবাতি আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।'

বুড়ি হাসলেন, 'কি ছেলেরে বাবা! বাপের ভয়ে বন্ধুদের নিয়ে অন্ধকারে বসে আছে! কিন্তু এবার আমাকে উদ্ধার করো। আমি নটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না তবু শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম জপি। খাবে চল।'

সুদীপ বলল, 'এত তাড়াতাড়ি! দুপুরে এত খেয়েছি যে একটুও খিদে পাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে! চলুন আমাদের রুটি তরকারি নিয়ে আসি ওপরে। আপনি কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ুন, আমরা খিদে পেলে খেয়ে নেব।'

বুড়ির কপালে ভাঁজ পড়ল। এতক্ষণ যে চাপা গলায় কথা বলছিলেন তা বিস্মৃত হলেন, 'আমার সমস্ত বাড়িটা সকড়ি করবে তোমরা?'

সুদীপ দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না না। খেয়েদেয়ে ভাল করে ধুয়ে দেব।'

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল না বুড়ির। এইসময় সুদীপ বলল, 'আর একটা কথা। কিছু টাকা রাখবেন আপনি? আমাদের জন্যে তো খরচ বাড়ছে।'

'একি কথা! ছি ছি ছি, কদিন এই গরিবের বাড়িতে আছ আর আমি হাত পেতে টাকা নেব? ইচ্ছে হলে আলু পটল কিনে এনো কিন্তু ওইটুকু ছেলের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। ও হ্যাঁ, আমার এক ভাড়াটের বউ জিজ্ঞাসা করেছিল কারা এসেছে? বউটা নাকি তোমাদের জানলা দিয়ে দেখেছে। তা আমি বললাম আমার মামাতো ভাই-এর ছেলে আর তার বন্ধু। বউটার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বলবে না। আমার বাড়িতে কে এসেছে তাতে তোর কি বাপু! চলে এসো, খাবার নিয়ে যাও। এ কি রকম ব্যাপার বুঝি না!' বুড়ি তরতর করে ফিরে যেতে যেতে আবার দাঁড়ালেন। কিছু ভাবলেন তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, থাক।'

সুদীপ আগ্রহী হল, 'থাকবে কেন, বলুন না! কিছু হয়েছে?'

'না, কি আর হবে!' বুড়ি সলজ্জ ভঙ্গিতে তাকালেন, 'বলছিলাম কি, যখন দিতে চাইলে তখন আমার একটা উপকার করো। ধর্মতলার দিকে কোন দোকানে নাকি হাজার খুব ভাল ওষুধ পাওয়া যায়। আমাকে একজন নামটা লিখে দিয়েছিল, এদিকে কোন দোকানে নেই। তাই এনে দিও কয়েক কৌটো। জলে ভিজে ভিজে পায়ে এত হাজা হয়ে গেছে না বড় কষ্ট হয়।' কথা শেষ করে বুড়ি আর দাঁড়ালেন না। সুদীপ তাকে অনুসরণ করল।

জয়িতা ফিরে এসে দরজার দিকে মুখ করে বসল, 'কোন কোন মানুষের চাহিদা কত কম হয়, তাই না? এত জিনিস থাকতে হাজার ওষুধ। হাজা ঠিক কি?'

কল্যাণ বলল, 'হাতপায়ে, আঙুলের ফাঁকে হয়। দিনরাত জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘা-এর মত হয়ে যায়। গ্রামের মানুষদের বেশি হয় শুনেছি।'

আনন্দ বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছি এই মানুষগুলোর কথা। এইসব বিধবা পিসীমা, মাসীমা, দিদিমারা বাঙালির কতটা সহায় ছিল। খুব দ্রুত এঁরা চলে যাচ্ছেন। আমাদের পরের জেনারেশন এঁদের কথা শুধু বইতেই পড়বে।'

জয়িতা বলল, 'এঁদের চলে যাওয়াই উচিত। বাপ মা শিক্ষিতা করতে চায়নি, বিয়ে দিয়েছে কিন্তু স্বামী মারা গেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেয়নি। এমন একজন মেয়ের এইভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সংসারের সেবায় লাগবে বলে একদলকে কেন চিরকাল স্যাক্রিফাইস করতে হবে! ওঁরা হলেন পুরুষশাসিত সমাজের পুতুল।'

আনন্দ বলল, 'মানলাম। সত্যি কথাই বলেছিস। কিন্তু এইসব সরল মন আর স্নেহের চেহারাটা তো আর দেখা যাবে না। এইটেই বলছিলাম। জয়িতা, ট্রাঞ্জিস্টারটা দে।'

আনন্দ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। সে ঠিক সময়ে সুইচ অন করল। কয়েক সেকেন্ড বাজনার পর ঘোষিকা ঘোষণা করলেন এবার খবর হবে। ওরা সবাই উৎসুক হল। 'কানাডায় শিখদের বিষয়ে ভারত সরকারের প্রতিবাদ সেদেশের সরকার বিবেচনা করছেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট দেশদ্রোহিতা সহ্য করবেন না বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের অন্তর্ঘাতের পিছনে একটি দলই কাজ করছে।' এবার সংবাদ পাঠক বিশদে গেলেন। কল্যাণ বলল, 'ওরা তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক জানতে পারছে। এদেশের পুলিস ইচ্ছে করলেই সব জানতে পারে। ইচ্ছেটা করে না সব সময় এই যা।'

খবর হচ্ছিল। প্রথমে যে বিষয় জানানো হচ্ছিল তা তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। ওরা উৎসুক ছিল কখন সংবাদ পাঠক ওদের প্রসঙ্গে আসবেন। এই সময় সুদীপ ফিরল দুটো বড় সসপ্যান নিয়ে। ওগুলোকে মাটিতে নামিয়ে সে আনন্দকে ডাকল, চল্, জল আর থালা নিয়ে আসি। একা অত আনতে পারব না।'

আনন্দ ইশারা করল একটু অপেক্ষা করতে। এবং তখনই ট্রাঞ্জিস্টার তাদের প্রসঙ্গে এল, 'আজ বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সম্প্রতি কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ হয়েছে তা একটি দলই করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই দুটি ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রমাণ করে কোন ডাকাতদল অথবা ব্যক্তিগত লাভের জন্যে এই কাজ করা হয়নি। কলকাতা পুলিস এর মধ্যে যেসব সূত্র পেয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে এই দলটির সঙ্গে নকশালদের সম্পর্ক নেই। কিন্তু নকশাল-পরবর্তী উগ্রচিন্তার সমর্থকরাই এটা করছে। প্যারাডাইস কিংবা ওষুধ কোম্পানি যদি বেআইনি কাজ করে থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা নিতে সরকার তৎপর। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দল যদি আইন হাতে তুলে নেয় তা কখনই বরদাস্ত করা হবে না। অনুমান করা হচ্ছে এই দলটি অত্যন্ত সংগঠিত। জনসাধারণকে সরকার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করাই এদের উদ্দেশ্য। কোন বিদেশী শক্তির মদৎ এদের পেছনে আছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। রেসকোর্স বন্ধের হুমকির মোকাবিলা করার জন্যে এর মধ্যেই যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যারা এই কাজদুটো করেছে তাদের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে। তিনি আশ্বস্ত করেন, পুলিস এর মধ্যেই নির্দিষ্ট সূত্র পেয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে কলকাতার পুলিস কমিশনার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জানান যে ওই দলের সদস্যরা সবাই কলকাতার একটি নামী কলেজের ছাত্র। একজন ছাত্রীও এদের সঙ্গে আছে। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এদের কোন সংযোগ নেই।'

সংবাদ পাঠক অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়াতে ট্রাঞ্জিস্টারটা বন্ধ করল আনন্দ। সুদীপ মন্তব্য করল, 'যাক, ষোল কলা পূর্ণ হল। ওদের আর কিছু জানতে বাকি রইল না। আমি ভাবছি, শ্রীযুক্ত বাবু অবনী তালুকদার পুলিসকে আমার সম্পর্কে কি বিবৃতি দিয়েছেন! চল্ আনন্দ।'

আনন্দ কোন কথা না বলে সুদীপকে অনুসরণ করল।

এখন জ্যোৎস্না আরও সাদা। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'ফেরার পথ বন্ধ।'

চমকে উঠল জয়িতা। সে দেখল কল্যাণ অদ্ভুত চোখে বাইরের পৃথিবী দেখছে। জয়িতার খুব রাগ হচ্ছিল। সে চাপা গলায় ডাকল, 'কল্যাণ।'

কল্যাণ তাকাল, 'ভুল বুঝিস না! আসলে কি জানিস, কখনও বাড়িতে আলাদা করে যত্ন পাইনি। কেউ আমাকে খাতির করেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হত ওরা সবাই আমার নিজের লোক। কোন যুক্তি নেই তবু। আসলে একটা সংস্কার। ফিরে গেলেও কোন লাভ হবে না। তবু—। ছেড়ে দে এসব কথা।'

জয়িতা কিছু বলল না। কিন্তু তার মন বলছিল কল্যাণ অস্থির হয়েছে। কখন কি করবে তা বোঝা অসম্ভব। সে শুনেছিল নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি সেন্টিমেন্টের শিকার বেশি হয়। কল্যাণ সম্পর্কে তার একটা অস্বস্তি শুরু হল। কিন্তু এখনই কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলবে না বলে ঠিক করল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সুদীপ ফোলানো বালিশ বের করে দিল। পাশের ছোট খুপরিতে এক বালতি জল রাখা হয়েছে কল্যাণ আর জয়িতার জন্যে। এখন পৃথিবীর কোথাও কোন শব্দ নেই। আনন্দ কল্যাণ সুদীপ পাশাপাশি শুয়ে পড়ল বালিশ মাথায় দিয়ে। মুখে জল দিয়ে দ্রুত ফিরে আসছিল জয়িতা। ছাদ, আশেপাশের গাছপালা এবং স্নিগ্ধ আকাশের দিকে চোখ পড়তে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তেই সে একটা ঘোরের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল যেন। সারাটা আকাশ থেকে মায়াবী স্বপ্ন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে পৃথিবীর বুকে। ওই জ্যোৎস্নায় এমন একটা জাদু আছে যা সে কোনদিন এমন করে দ্যাখেনি। অনেকক্ষণ তার কেটে গেল একই ভাবে দাঁড়িয়ে। নিজেকে যেন জোর করে সে ফিরিয়ে নিয়ে এল ঘরে। পাশাপাশি তিনটি পুরুষ শুয়ে আছে। তিনজনই তার বয়সী। পুরুষ! নিজেই হেসে ফেলল জয়িতা। ওদের সে এই প্রথম পুরুষ বলে ভাবল, ভাবনাটা এল কেন? সে দরজাটা ভেজিয়ে এক পাশে চলে এল। তার ঠিক কাছেই সুদীপ শুয়ে আছে। জয়িতা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। শক্ত মেঝেতে প্রথমেই শরীরে অস্বস্তি এল। কখনও এমন বিছানায় শোয়নি সে। কখনও কি তিনটি পুরুষের পাশে শুয়েছিল? হঠাৎ সে নিজের ওপর রেগে গেল। নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে একটু আগে কল্যাণ যে কথাটা বলেছিল তা তাকে আহত করেছিল। কিন্তু সে নিজেও তো মহিলাদের টিপিক্যাল মানসিকতার শিকার হচ্ছে! তার এই ভাবনার কথা বন্ধুরা জানলে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হবে। সে তো সব সময় বলে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে তার কোন ফারাক নেই।

ঘুম আসছিল না। জয়িতার বন্ধ চোখের পাতায় রামানন্দ রায় বারংবার এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। এতদিনের দেখা মানুষটার চেহারা এই দু'দিনে কি দ্রুত বদলে গেছে। মুখটা মুছতে চেষ্টা করতেই তার সেই দৃশ্যটি চোখে এল। সীতা রায় রামানন্দ রায় পরস্পর কাছাকাছি এসে গেছেন। হয়তো কয়েকদিন, কিংবা কয়েক সপ্তাহ কিন্তু এই আসাটা কি আরামদায়ক!

হঠাৎ সুদীপের গলা কানে এল, 'এই জয়ী, চিৎ হয়ে শো।'

'কেন?'

'মা বলতো উপুড় হয়ে শুলে বোবায় ধরে।'

জয়িতা চিৎ হল। এবং তখনই সে আবিষ্কার করল, সে একা নয়, তার অন্য তিন বন্ধুর কারও চোখে আজ রাত্রে ঘুম আসছে না।

সকালে উঠে একটা স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম আর কাগজ কিনে নিয়ে এল সুদীপ। এই কেনাকাটা সে পাড়ার দোকান থেকে করল না। কিনে আনবার সময় এমনভাবে প্যাক করেছিল যাতে পাড়ার কেউ তার জিনিসগুলো দেখতে না পায়। কিন্তু স্টোভ জ্বালতে কেরোসিন দরকার। ওটা না পেলে সমস্যাটা থেকেই যাবে। বাজারে একজন বলেছিল ব্ল্যাকে ব্যবস্থা হতে পারে। রাজী হওয়ার কথা মনেই আসেনি। তিনটে খবরের কাগজ কিনেছে সুদীপ। হকারটা চেঁচাচ্ছিল জোর খবর জোর খবর বলে। তাড়া থাকায় খুলে দেখার অবসর পায়নি সে। হাজার ওষুধটা এখানেই পেয়ে গেল।

বাড়িতে ফিরতেই দেখল বুড়ি গজর গজর করছে। তাকে দেখামাত্র সব ভুলে গিয়ে চিৎকার শুরু হল, 'আমি সারাদিন উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছি আর কোন্ নবাবপুত্তুর ওপর থেকে সিগারেট ফেলেছে এখানে, অ্যাঁ! এসব করলে এখানে থাকা চলবে না।'

সুদীপ মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ওরা কেউ নিশ্চয়ই অ্যাশট্রেটা খালি করেছে। ব্যাপারটাকে সামাল দিতে সে বলল, 'কেউ তো ইচ্ছে করে ফেলেনি, নিশ্চয়ই কাক পাখির কাণ্ড ওটা। আমি দেখছি যেন আর না হয়।'

কাক? আমাকে কাক দেখাচ্ছ? এ বাড়ির কাক অত শয়তান নয়। চাকরিবাকরি নেই, পরের পয়সায় কত সিগারেট খেয়েছে দ্যাখো।' বুড়ির গজর গজর আবার শুরু হল।

সুদীপ একটু দাঁড়িয়ে থাকল তারপর জিনিসগুলো মাটিতে রেখে ওষুধটা বের করে বলল, 'আপনি কি এই ওষুধটার কথা বলছিলেন?'

বুড়ির মুখ বন্ধ হল। সন্দেহের চোখে সুদীপের হাতের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর কাছে এসে বললেন, 'কি ওষুধ?'

'হাজার। কাল রাত্রে খাবার দেওয়ার সময় যেটার কথা আপনি বলেছিলেন।'

'সত্যি? ওই ওষুধ এটা? শুনেছিলাম ধর্মতলা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। লোকেরা এত মিছে কথা বলে না! বড্ড কষ্ট হয়, বুঝলে? দেখি এ দিয়ে যদি কিছু উপকার হয়। বেঁচে থাক বাছা, তোমার বাবা তো কোনদিন কিছু আঙুল তুলে দেয়নি, তুমি দিলে!' বুড়ি এমন ভঙ্গিতে ওষুধ নিলেন যেন দু'হাত পেতে অমৃত নিচ্ছেন।

সুদীপ বলল, 'আমি এখনই উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছি। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'থাক। আর কাজ বাড়াতে হবে না। ওগুলো কি? কি নিয়ে এলে?'

'এই কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস। আপনার কাছে একটু কেরোসিন তেল হবে?'

'ওমা, ও জিনিস কারও কাছে থাকে নাকি? দোকানে এলে দ্যাখো না রাত থাকতে কত লোক লাইন দেয়। কেরোসিন দরকার কেন?'

'আপনার জন্যে একটা স্টোভ এনেছিলাম।'

'স্টোভ? ও মাগো! ওসব আমি ধরাতে জানি না। স্টোভ ফেটে এ-পাড়ার দুটো বউ পুড়েছে। না না, ওসব বাদ দাও, ফেরত দিয়ে এস।'

'ফেরত তো নেবে না। বিক্রী করার সময় বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর আবার ঘন ঘন চায়ের নেশা হয় কিনা! চা-পাতাও কিনে এনেছি।'

'ও, চায়ের নেশা! কিছুই আর বাদ নেই দেখছি। তা স্টোভটা এনেছিলে কার জন্যে? বন্ধুর নেশা মেটাবে বলে না আমার জন্যে?' বলতে বলতে বুড়ি কান খাড়া করল। পেছনের দিকের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। বুড়ি ওখান থেকেই চিৎকার করলেন, 'কি চাই, অ্যাঁ?'

'আপনার বাজার এসে গেছে।' ওপাশ থেকে একটি নারীকণ্ঠে জবাব এল। শোনামাত্র বুড়ি সেদিকে চলে গেলেন। সুদীপ লক্ষ্য করল ওদিকের দরজার হুড়কোটা খুলতেই সেই মেয়েটি প্রসন্ন মুখে এদিকে ঢুকল যাকে গতকাল সে পুকুরের ধারে গাছের তলায় দেখেছে। ওপর থেকে দেখার ফলে যত ছোট মনে হচ্ছিল তত কম বয়স নয়। মেয়েটি ঢুকেই আড়চোখে সুদীপকে দেখে নিল। তারপর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি মিশিয়ে বুড়িকে বলল, 'এই নিন, আলু আর ডিম। দোকানী জিজ্ঞাসা করছিল, দিদিমা হঠাৎ ডিম আনতে বললেন, খাবে কে? আমি বললাম কুটুম এসেছে।'

'কুটুম আবার কি? ভাই-এর ছেলে কুটুম হতে যাবে কোন্ দুঃখে! পয়সা ফেরেনি?'

'না। চল্লিশ পয়সা বেশি লেগেছিল, ওটা আর দিতে হবে না। ওই বুঝি আপনার ভাইপো?'

স্পষ্টতই বুড়ি বিরক্ত হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। এবার আমাকে কাজ করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতদিন বাদে এল তাই ভাবলাম মাছ না হোক ডিম খাওয়াই। ওসব তো রান্না অনেককাল হল করিনি। যাও যাও, আমার গল্প করার সময় নেই।'

মেয়েটি যাওয়ার জন্যে পেছন ফিরেই আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনার ভাইপোর যদি পিসীর হাতে খাওয়ার বায়না না থাকে তাহলে আমিই রেঁধে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। না পারলে তোমাকে বলব'খন।'

'জায়গা তো ভাল, জলেও স্বাদ আছে। দেখবেন ভাইপোর স্বাস্থ্য ভাল হবে। যেখানে ছিল সেখানে বুঝি পুকুর গাছাগাছালি ছিল না?'

'কেন?'

'বাড়ির পাশেই পুকুর, কত রকমের গাছ। সারাদিন তাকিয়ে বসে থাকলেই সময় কেটে যায়। তাই

না?' অদ্ভুত হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি বিদায় নিল।

দরজায় হুড়কো দিয়ে বুড়ি চাপা গলায় বললেন, 'ছেনাল ছেনাল! স্বামী বেঁচে থাকতেও লোভ মেটে না। পাড়ার ছেলেদের মাথা চিবোচ্ছে। তা তুমি এখানে সঙের মত দাঁড়িয়েছিলে কেন? খবরদার, ও মিশতে চাইলেও পাত্তা দেবে না।'

'কে উনি?'

'ভাড়াটের বউ। স্বামীটি দেবতুল্য মানুষ। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি আর ইনি এই করে বেড়াচ্ছেন। তা তখন কি বলছিলে? আছে একটিন। অনেকদিন হয়ে গেল। পচেটচে যায় কিনা তাও জানি না। ওতে যদি কাজ চালাতে পার তো দ্যাখো।'

এতক্ষণে মনটা ভাল লাগল সুদীপের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডিম আলু আনাতে ওদের বলতে গেলেন কেন? তাছাড়া ডিমের কোন দরকার ছিল না!'

'বেশি কথা বলতে এসো না তো! এ-পাড়ার দোকানগুলো ডাকাত। বাজারে গিয়ে কিনলে অন্তত দশ পয়সা সস্তা পাওয়া যায় বলে ভাড়াটেকে বললাম। এই রকম বেহায়া মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি গো।' বুড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর ওপাশ দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে একটা প্রায় মরচে পড়া টিন বের করে বারান্দায় রাখলেন।

সুদীপ সেটাকে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল প্যাকেটটা হাতে নিয়ে। 'বাড়ির পাশেই পুকুর, কত রকমের গাছ। সারাদিন তাকিয়ে বসে থাকলেই তো সময় কেটে যায়!' মেয়েটি তাকে শুনিয়েই কথাগুলো বলেছে। কেন? ও কি গতকাল জানলায় তাকে দেখেছে? সেই ছেলেটার সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছের তলায় তখনও কি তার চোখ ছিল জানলায়?

আনন্দ ডায়েরি লিখছিল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে কল্যাণ বসে আছে। আর জয়িতার হাতে বই। পায়ের শব্দে তিনজনেই সোজা হল। সুদীপ হেসে বলল, 'তোরা যেভাবে বসেছিস, যেন কারও বাড়িতে বেড়াতে এসেছিস। পুলিস যদি আমার বদলে উঠে আসতো তাহলে কিছুই করতে পারতিস না। যাক, চায়ের প্রব্লেম সলভ্‌ড। স্টোভ এবং কেরোসিন এসে গেছে। আনন্দ, তুই নিচ থেকে এক বালতি জল নিয়ে আয়।'

জয়িতা বই রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ দেখল বইটার নাম 'ফিউচার শক'। সে জয়িতাকে প্যাকেটটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জীবনে স্টোভ ধরিয়েছিস?'

জয়িতা গম্ভীর মুখে বলল, 'জীবনে তো কত কি করিনি! এভাবে রাতও কাটাইনি!' সে প্যাকেট খুলে স্টোভ বের করে ঘরের কোণায় নিয়ে গিয়ে ধরাবার তোড়জোড় করছিল।

আনন্দ বলল, 'পুলিস এখানে এলে আমাদের কিছুই করার নেই সুদীপ, একমাত্র লাফিয়ে নিচে পড়া ছাড়া। বুড়ি চেঁচাচ্ছিল কেন?'

'তোরা ওপর থেকে অ্যাশট্রের সিগারেট নিচে ফেলেছিস? খুব খচে গিয়েছিল।'

আনন্দ কোন কথা না বলে জল আনতে গেল। সুদীপ কল্যাণকে খবরের কাগজগুলো দিয়ে বলল, 'তোর ডিউটি নিচু গলায় কাগজগুলো পড়ে শোনানো। জয়ী ওর মধ্যে চা চিনি দুধ আছে। দ্যাখ মনে করে চামচ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। কিন্তু তুই এর আগে চা করেছিস?'

ঠিক তখনই কল্যাণ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ!'

ওরা দুইজন চমকে তাকাল। কল্যাণের সামনে খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা খোলা। সে মুখ তুলে বলল, 'আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে!'

এক লাফে ওর পাশে চলে এল সুদীপ। স্টোভ ছেড়ে ছুটে এল জয়িতাও। বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, 'চার বন্ধু না পেছনে আরও শক্তিশালী সংগঠন?' প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের জাল ওষুধ কোম্পানিতে যে দলটি আক্রমণ চালিয়েছিল কলকাতার পুলিস তাদের হদিশ পেয়েছে। এই চারজনই কলকাতার নামী কলেজের ছাত্রছাত্রী। এখন পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোন কেস পুলিসের খাতায় নেই। বস্তুত এদের দাগী আসামী বলা দূরের কথা, শেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সূত্রে অবশ্যই মেধাবী এবং কৃতী বলতে হয়। এই চারজনই এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। চারজনই বাড়ি থেকে পলাতক। পুলিস সন্দেহ করছে এদের পিছনে কোন শক্তিশালী সংগঠন কাজ করছে। যেসব অস্ত্র এরা অপারেশনের

সময় ব্যবহার করেছে তা বিদেশী শক্তির উপহার হওয়াও বিচিত্র নয়। চারজনের পারিবারিক পার্থক্যের জন্যেই পূর্ব পরিচয় থাকা সম্ভব নয়। কলেজেই এরা পরিচিত হয়েছিল। সেই সামান্য সূত্রে এরা একত্রিত হয়ে অপারেশনে নেমেছে তা পুলিস বিশ্বাস করে না। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এই ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ স্পষ্টতই দেশদ্রোহিতা। তিনি কোনভাবেই বরদাস্ত করতে পারেন না। পুলিসকে অবিলম্বে এদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে প্যারাডাইসে সরকারেব অগোচরে দুর্নীতি এবং পাপাচার হত থানার নাকের ডগায় বসে, বিখ্যাত বা খ্যাতিহীন বড়লোকেরা সেখানে যেতেন গোপন অভিসারে, বড়বাজারের মোহনলালের কারখানায় যে জাল ওষুধ তৈরি হত তাতে সন্দেহ নেই, টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদসূত্রে ব্রাবোর্ন রোডের গুদামে যেসব ওষুধ পাওয়া গেছে তা যে মোহনলালের তৈরি জাল ওষুধ এবং এসবের ধ্বংস করার চেষ্টা মানে জনসাধারণের এবং রাষ্ট্রের উপকার করা, কিন্তু আইন নিজেদের হাতে নিয়ে শক্তিপ্রয়োগ করার এই প্রচেষ্টা সরকার কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। কলকাতার পুলিস কমিশনার আশা করেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীরা ধরা পড়বে। তবু জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করে তিনি ওই চারজনের ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছেন।'

এরপরে তাদের চারজনের চারটি ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। নিচে তাদের নাম লেখা। ওরা লক্ষ্য করল ছবিগুলো তিন চার বছর আগে তোলা। নিজেদের বালক বালিকা বলে মনে হচ্ছে। এগুলো পুলিস নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। একমাত্র কল্যাণ এবং জয়িতার বর্তমান চেহারার সঙ্গে ছবির বেশ মিল আছে।

এই সময় আনন্দ জল নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

সুদীপ কাগজটা ওর সামনে রাখল। আনন্দ যতক্ষণ কাগজটা পড়ছিল ততক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিল না। সে বাকি কাগজগুলো পাশাপাশি বিছিয়ে দেখল প্রতিটিতেই তাদের ছবি ছাপা হয়েছে। একটি কাগজে লেখা হয়েছে, 'চার ডাকাত, একজন কলকাতার ফুলনদেবী?' রিপোর্টরটি প্রচুর কল্পনার রঙে জয়িতাকে রাঙিয়েছেন। দুটো ঘটনায় তার ভূমিকা নিয়ে যা লিখেছেন তা সত্যিই লোমহর্ষক ব্যাপার। কিন্তু চারটে কাগজই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে। শেষ পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছিল তাও বক্স করে পাঠকদের জানানো হয়েছে। ইংরেজি কাগজটা অবশ্য পাশাপাশি আর একটা রিপোর্ট ছেপেছে। কাগজটি লিখেছে, এই দুটো ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্যে আমরা কলকাতার বিভিন্ন মানুষের কাছে যাই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি দুষ্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং চরম শাস্তি চান। কলকাতার পুলিস কমিশনার ঘটনা দুটিকে উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি নিশ্চিত যে পুলিস কয়েকদিনের মধ্যেই এদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের একজন কর্তা বলেন, নকশাল আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দুটি ঘটনা ঘটেছে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। কোন ব্যবসায়ী যদি অসৎ হন তার জন্যে আইন আছে। পূর্বাঞ্চলের শান্তি নষ্ট করে এই আক্রমণের তিনি নিন্দা করেছেন। রেসকোর্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বিখ্যাত শিল্পপতি বলেন, 'রেস রাজার খেলা। এর একটা আলাদা সম্মান আছে। এদেশে সবরকম আন্দোলনের সময়েও কেউ রেস বন্ধ করতে চায়নি। একজন কংগ্রেস নেতা একবার এখানে সত্যাগ্রহ করবেন বলে হুমকি দিলেও পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।' একজন অফিসযাত্রী কিন্তু ঘটনা দুটোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ রকম ঘটনা হোক আমরা মনে মনে চাই কিন্তু করতে সাহস পাই না। মধুচক্র বা বেআইনি ব্যবসা এবং জাল ওষুধ তৈরি করে আইনের সাহায্যে যারা চিরকাল পার পেয়ে যায় তাদের এইভাবেই শাস্তি দেওয়া দরকার।' কলকাতার এক গৃহবধূ বলেন, 'ঠিক করেছে ওরা। নকশালরা তো পুলিস মারতো আর গলা ফাটাতো, কাজের কাজ কি করেছে? এরা তবু একটা জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস করেছে। আর প্যারাডাইস না কি বলে, ওখানে ওসব হত? ছি ছি ছি! গরমেন্ট কিছু বলত না? ঠিক করেছে পুড়িয়ে দিয়ে।' একটি তরুণ ছাত্র কফিহাউসে বসে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান, 'দারুণ ব্যাপার। জানি না এর পেছনে কোন রাজনৈতিক দল আছে কিনা, কিন্তু এই দুটো ঘটনায় অনেকে নড়ে বসবেন। জানি এরা ধরা পড়বে কিন্তু ব্যাপারটা অনেককেই ভাবাবে।' যদিও সবকটি রাজনৈতিক দল এই ধরনের কাজকে নিন্দা করেছেন

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে সাধারণ মানুষের কাছে এরা যেন সমর্থন পাচ্ছে।

সুদীপ বলল, 'এই ব্যাপারটাই তো আমরা চেয়েছিলাম।'

কল্যাণ বলল, 'তা হোক কিন্তু আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'

জয়িতা উঠে স্টোভ জ্বালাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ধরা পড়ে গেলাম মানে?'

'আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে, পাবলিকই তো ধরিয়ে দেবে।' কল্যাণের গলায় হতাশা ফুটে উঠল।

আনন্দ একটু উঁচু গলায় বলল, 'কল্যাণ, আমরা এখনও ধরা পড়িনি। এবং যতক্ষণ তা না পড়ি ততক্ষণ হতাশ হওয়ার কোন মানে হয় না। এখন শুধু দেখতে হবে আমরা এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি তা পুলিসের পক্ষে জানা সম্ভব কিনা।'

সুদীপ বলল, 'পাড়ার লোক ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কারও জানা সম্ভব নয়। আমরা সতর্ক থাকব যাতে পাড়ার লোকজন তোদের দেখতে না পায়। আমার ওই ছবির সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন মিল নেই। অতএব আমি নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি না।'

আনন্দ বলল, 'অগত্যা তাই করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এমন একটা শেলটার চাই যেখানে কোনভাবে পুলিস পৌঁছতে পারবে না।'

কল্যাণ জবাব দিল, 'তাহলে হিমালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।'

আনন্দ ওর দিকে মুখ ফেরাল, 'আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।'

ঠিক তখনই নিচে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। বুড়ি চিৎকার করে কাউকে কিছু বলছেন। যিনি লক্ষ্য তিনি চাপা গলায় কিছু জবাব দিতে চাইছেন। ওরা চারজন চুপ করে গেল। ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলে সুদীপ হাঁটু মুড়ে ছাদে চলে এল। তারপর ধীরে ধীরে কার্নিসের কাছে পৌঁছে সাবধানে উঁকি মারল উঠোনের দিকে। হাতে কয়েকটা খাম নিয়ে বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন অবনী তালুকদার।

॥ ২২ ॥

অবনী তালুকদার বলছিলেন, 'জন্মালে মরতে তো হবেই। কপালে যার যখন লেখা আছে তখন তাকে চলে যেতে হয়। আমি কি করতাম! আমি ভাল নার্স রেখেছিলাম, আয়া ছিল। এসব করতে তো কম পয়সা খরচ হয়নি! আপনি খামোকা চেঁচাচ্ছেন!'

'চেঁচাচ্ছি? আমি চেঁচাচ্ছি? তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না আমার। অমন সতীলক্ষ্মী বউটাকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল গো! আবার এসেছে তার শ্রাদ্ধের পিণ্ডি খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে। আমি কোথাও যাই না এই বাড়ি ছেড়ে।' বৃদ্ধা জানালেন।

'দেখুন, আপনি যাবেন না জানি। এই বাড়ি তো যখের মত পাহারা দিতে হবে আপনাকে। আমি বেশি লোক নেমন্তন্ন করছিও না। আপনাদের তরফে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি নিয়মরক্ষার জন্যে। সেই কুলাঙ্গার থাকলে আমাকে আসতে হত না।' অবনী তালুকদার এবার জোর করে খামটা বৃদ্ধার হাতে গছিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'ছি ছি, একি ধরনের নেমন্তন্ন করা! এসব তুমিই পারো। টাকার পাহাড়ে বসে আছ, সব পোকায় কাটবে দেখে নিও। তা কুলাঙ্গারটি কে?'

'তিনি যে অপদার্থটিকে রেখে গিয়েছেন পৃথিবীতে! কি লজ্জার কথা, আমার বাড়িতে দিনরাত পুলিস আসছে! পাড়ার লোকজনের কাছে মুখ দেখানোর উপায় রইল না!'

'পুলিশ আসছে কেন? নতুন করে আবার কি করলে? সেবার তো কারা এসে গয়নাগাটি নিয়ে গেছে জোর করে!' বৃদ্ধা মনে করে বললেন।

'ওঃ, সেটাও তো ওই শ্রীমান করিয়েছেন। বাপকে বাঁশ দিতে হবে না? গোপনে গোপনে ইনকামট্যাক্সকে খবর দিয়েছেন যাতে বাপের কালো টাকা ধরা পড়ে। আরে আমি হলাম তোর বাপ।

বনেদি রক্ত আমার গায়ে এটা তো মানেন? সব ছাড়িয়ে আনছি এক এক করে। তিনি তো হুমকি দিয়ে পার! ডাকাতি করছে, বুঝলেন? ডাকাতি! পুলিস তাই আমার কাছে খুঁজতে এসেছিল। আমি সোজা বলে দিয়েছি, ও ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যে আমার দু'লাখ টাকা চুরি করে হাওয়া হয়েছে, সে মরুক বাঁচুক আমার কিছু আসে যায় না।'

'দু-লক্ষ!' বৃদ্ধার চোখ বিস্ফারিত হল, 'সে দু'লক্ষ টাকা পেল কি করে?'

উঁকি দিয়ে দেখছিল ছাদের কার্নিশে এসে সুদীপ। তার মনে হচ্ছিল লাফিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়ায়। সে দু-লক্ষ টাকা চুরি করেছে? কাগজে সই করিয়ে হিসেব রেখে ওর এক-তৃতীয়ংশ টাকা দিয়ে যে দায় চুকিয়েছে সে কি সহজে মিথ্যে বলছে! অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করছিল সে। নিজেকে প্রকাশ করা মানে আত্মহত্যা করা। কিন্তু সেইসঙ্গে তার হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কম্পন শুরু হয়েছিল। বুড়ি যদি বলে দেয় সে বন্ধুকে নিয়ে এখানে আছে! নিশ্চয়ই এতক্ষণে অবনী তালুকদার জানেনি খবরটা। জানলে অত নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলতে পারত না। শোনামাত্র থানায় ছুটতো। অবনী তালুকদার তখন বলছে, 'আলমারিতে ছিল। একজনকে পেমেন্ট দেব বলে ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলাম। আমাকে শ্মশান করে গিয়েছে সে।'

বৃদ্ধা নিজের মনে বললেন, 'সে ডাকাতি করে?'

'মায়ের শিক্ষা, বুঝলেন! বেঁচে থেকে আমার হাড় জ্বালাতো এখন নিজের মত তৈরি করে একটি অপদার্থ রেখে গিয়েছেন। তা ইচ্ছে হলে যাবেন নইলে আর কি করা যাবে! তাঁর আত্মার শান্তি চাই বলেই এইসব করছি।' কথা শেষ করে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন অবনী তালুকদার।

হঠাৎ বৃদ্ধা শক্ত গলায় বললেন, 'শোন, তোমার মুখে পোকা পড়বে। মরবার সময় এক ফোঁটা জল দেবে না কেউ গলায়। অমন সোনার মেয়ের নামে যে কুৎসা করে তার কখনও শান্তি হবে না। মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা। ও ছেলে কখনও ডাকাতি করতে পারে না। তুমি মিথ্যে বদনাম দিচ্ছ। দূর হও এখান থেকে!'

অবনী তালুকদারের চোখ জ্বলে উঠল, 'আপনার বাড়িতে এসেছি ভদ্রতাবোধে। অনর্থক আমাকে অপমান করছেন আপনি। এই আমার শেষ আসা। তবে আপনাকে বলে দিচ্ছি সে যদি এখানে কখনও আসে তাহলে পুলিশে খবর দেবেন।'

আর দাঁড়ালেন না অবনী তালুকদার। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধা। সুদীপ উঠে দাঁড়াল। গলি থেকে অবনী তালুকদারের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। এক পলকে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিল সুদীপ। একবার ঘরের দিকে তাকাল। বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার দরকার নেই। সে সোজা নিচে নেমে এল। বৃদ্ধা তখনও একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর কোরা থান আরও বিষণ্ণ করে তুলেছিল তাঁকে। সুদীপকে দেখতে পাওয়া মাত্র তিনি দ্রুতবেগে ভেতরে চলে গেলেন উলটো দিকে মুখ করে। সুদীপ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে প্রথমে সদর দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বারান্দায় উঠে সোজা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা সাবেকী আমলের খাট। ঘরে তেমন আসবাব নেই। বৃদ্ধা সেই খাটে বসে আছেন মুখ ফিরিয়ে। সুদীপ পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'বাবা আপনাকে যা বলে গেল তা আমি শুনেছি। আপনি যদি ওসব কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমরা এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' কথাটা বলেই সুদীপের খেয়াল হল, বুড়ি যদি চিৎকার করে তাদের চলে যেতে বলে, যদি অবনী তালুকদারের অভিযোগগুলো আওড়াতে থাকে তাহলে দেখতে হবে না। ডায়মন্ডহারবার রোড পর্যন্ত তাদের পৌঁছতে হবে না আর। কিন্তু তার কথার উত্তরে বৃদ্ধা কিছুই বললেন না। তাঁর ভঙ্গিরও কোন পরিবর্তন ঘটল না। সুদীপ কি করবে বুঝতে পারছিল না। এই আশ্রয়টুকু সে কিছুতেই হারাতে চাইছিল না। অথচ ওই প্রশ্নটির উত্তর না পেলে এখানে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি করব বলে দিন।'

হঠাৎ বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, 'আমারই মাথার গোলমাল নইলে ডিম আনাই! আমার বাড়িতে বসে মায়ের কাজ করতে হবে। ছেলে বেঁচে থাকতে সে যদি কাজ না করে তাহলে মা কখনও শান্তি পায় না। অবনী যাই বলুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করছে, না করুণা করছে তা সে-ই জানে। মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম। কেউ যদি ডাকাতি করে কিংবা বাপের টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আমি আশ্রয় দেব না। কিন্তু ওই মেয়ের ছেলে বলেই

থাকতে দিয়েছি, মনে থাকে যেন।' কথাগুলো বলে তিনি তাঁর রান্নাঘরে ঢুকে ডিমগুলো বের করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল হয় ফেলে দেবেন নয় কাউকে দিয়ে দিতে চান।

সুদীপ চটপট বলল, 'ঠিক আছে, এখন যদি ডিম খেলে আপত্তি থাকে তাহলে পরে খাওয়া যাবে। কিংবা আমার বন্ধুরা তো কোন দোষ করেনি, ওদের মা-ও মারা যায়নি, ওরা তো খেতে পারে।'

বৃদ্ধা দাঁড়ালেন। প্রস্তাবটা যেন তাঁর অপছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত ডিমের প্যাকেটটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফিরে যেতে যেতে বললেন, 'যে খাবে খাক। আমি রাঁধতে পারব না। আমার বাড়িতে কাজ হবে আর আমি ডিম বাঁধব?'

আপাতত ঝড় উঠল না। সুদীপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ডিমের প্যাকেটটা তুলে উপরে উঠে এল। ওকে দেখামাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

ওদের উদ্বিগ্ন মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সুদীপ বলল, 'কেস খুব সিরিয়াস। অবনী তালুকদার এসেছিল শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে। আমার নামে বহুৎ স্টোরি বলে গেল। ওসবের একটা যদি বুড়ি বিশ্বাস করে তাহলে এখান থেকেই আমাদের থানায় যেতে হবে।'

'সে কি!' কল্যাণ প্রায় সাদা হয়ে গেল, 'অবনী, মানে তোর বাবা, আমাদের এখানকার খবর জেনে গেছেন?'

'খুব কপাল জোর, বুড়ি ওকে কিছু বলেনি। আশ্চর্য জালি পার্টি মাইরি, নেমন্তন্ন করতে এসে বলছে না গেলেও চলবে! জয়ী, ডিমগুলো নে। বুড়ি আমাদের জন্যে আনিয়েছিল। মায়ের কাজ না হওয়া পর্যন্ত আর ছোঁবে না। দেখব তুই কি রকম ডিমের কারি করতে পারিস। চা বানিয়েছিস?' সুদীপ সিগারেট ধরাল।

জয়িতা চুপচাপ সুদীপের কথাগুলো শুনছিল। ও যেভাবে চুপচাপ নেমে গেল তাতেই ওদের উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছিল। একটা লোক এসে বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলছে উত্তেজিত ভঙ্গিতে, এইটে স্বস্তিদায়ক ছিল না। কিন্তু এখন সুদীপের কথার ধরনে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ, এখানে আরও দুজন বসে আছে। তুই শুধু আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করলি ডিমের কারি বাঁধতে কেমন পারি?'

সুদীপ একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, 'তুই কাছাকাছি বসে আছিস, তাই।'

জয়িতার ঠোঁট বেঁকে গেল, 'সত্যি কথাটা বলার সাহসটুকু তোদের নেই। রান্নার ব্যাপার হলেই মেয়েদের ওপর হুকুম চালাতে হবে, না? তোর মা পিসী, দিদিও হয়তো, জন্মেছিলেন যখন তখন তাঁদের বাধ্য করা হয়েছিল ঠাকুরের কাজ করতে। সেই অভ্যেসটা তোদের রক্তে রয়ে গেছে। কিন্তু খাওয়াটা যখন তোর আমার সমান প্রয়োজন তখন খাবার তৈরি করার দায়িত্ব দুজনেরই। আজ ডিমটা তুই রান্না করবি, আমি চা করছি।'

আনন্দ হেসে ফেলল। কথাগুলো কল্যাণকে সুখী করল না। সুদীপ বলল, 'আমি কোনদিন রান্নাঘরে ঢুকিনি।'

জয়িতা চায়ের ব্যবস্থা করতে করতে উত্তর দিল, 'তুই এর আগে কখনও মানুষ মারিসনি কিংবা বোমা ছুঁড়িসনি। সরি, সংশোধন করছি, মানুষ নয়, তুই অমানুষ মারিসনি! অর্থাৎ কখনও করিনি বলে করা যায় না, তা ঠিক নয়!'

আনন্দ বলল, 'কেন ওকে এমন বলছিস জয়ী! একেই বেচারার ওপর সব চেয়ে বেশি চাপ পড়ছে!'

সুদীপ হাত তুলল 'মাইরি, এই বয়স অবধি সংসারের জন্যে যা করিনি দু'দিনে তার চেয়ে বেশি করলাম! তুই চিন্তা কর, বাজার করে বাড়ি নিয়ে আসছে আমার মত ছেলে!'

জয়ী বলল, 'নিজেদের জন্যে কিছু করলে যদি মান যায় তাহলে—।' সে কথাটা শেষ না করে নীরক্ত হাসল। তারপর চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'এখনও যখন রাস্তায় বুড়ো ভামগুলোকে মহিলাদের মেয়েছেলে বলে অ্যাড্রেস করতে দেখি তখন ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করে। একটা ছেলে প্রেম করার সময় যে সম্মান মেয়েটিকে দেয় বিয়ের পর কিন্তু বিনা মাইনের ঝি-কাম-ঠাকুর ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পরও এক ফোঁটা পালটায়নি এই মানসিকতা। ও ডিমগুলো নিয়ে এসে বলতে পারত, আমাদেরই রান্না করে খেতে হবে। কিন্তু বলল, দেখব কিরকম ডিমের কারি

করতে পারিস! একটু তাতানো ব্যাপার আছে। যেন আমি তেতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করব। তাতে রান্নার প্রব্লেমটা মিটবে। তুই ভাব, কত বড় চালাকি! যতই প্রগতির কথা বলিস সুদীপ, মেয়েদের ব্যাপারে তোদের মনে একটাই ক্যাসেট ফিট করা আছে।'

চা ভাগ করে সে তিনজনকে দেয়। সবাই চুপচাপ সেটা খাচ্ছিল কিন্তু সুদীপ হাসল, 'এটা খুব জেনুইন, আমি না বলে পারছি না। তুই যা মনে করিস করতে পারিস।'

'প্যাম্পারিং কথা একদম বলবি না সুদীপ। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট!' জয়িতা মুখ ফিরিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গেল প্রথমবার।

সুদীপ বলল, 'আমি জানি না এটাকে ঠিক প্যাম্পারিং কথার মধ্যে ফেলা যায় কিনা!' সবাই ওর দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল। কল্যাণের ঠোঁটের সঙ্গে আনন্দর ঠোঁটের অভিব্যাক্তির মিল দেখে খুশী হয়ে সুদীপ উচ্চারণ করল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট চায়ের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য দেবার জন্যে নির্মাতা হিসাবে তুই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতেই আনন্দ চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'অ্যাই আস্তে!'

সত্যি চা খাওয়া যাচ্ছিল না। রাগ মিলিয়ে গিয়ে ক্রমশ লজ্জা আচ্ছন্ন করল জয়িতাকে। অন্যের জন্যে না হোক নিজের জন্যেও তো লোকে একটু ভাল করে চা করতে শেখে! এমন লাউজি চা সে জীবনে খায়নি! এই বয়স পর্যন্ত তাকে কেউ রান্নাঘরে যেতে বলেনি, তার নিজেরও প্রয়োজন হয়নি। সে ঠিক করল এর পরের বার সিরিয়াসলি ভাল চা করবে। কল্যাণ এবং আনন্দ খানিকটা খেয়ে নামিয়ে রেখেছে কিন্তু সুদীপ পুরোটা শেষ করল। এইটেতেই রাগ হল আবার জয়িতার। স্রেফ বদমাইসি! ওকে টিজ করার জন্যে সুদীপ পাঁচনটা খেল! যা নিজে জয়িতা খেতে পারছে না তা ফেলে দিলেই সে খুশী হত। সুদীপের পুরোটা খাওয়া যেন তাকে যন্ত্রণা দেওয়া। সে পাত্রটা রেখে সুদীপকে বলল, 'কখনও কখনও উদারতা দেখানো খুন করার চেয়ে বড় অপরাধ, বুঝলি!'

'বুঝলাম।' প্যাকেট থেকে কল্যাণ আর জয়িতাকে দুটো সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে সুদীপ বলল, 'আনন্দ, একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবনী তালুকদারের সঙ্গে কথা বলার পর বুড়ির মাথায় ঢুকেছে যে মায়ের কাজটা আমাকে এখানেই করতে হবে। ইটস্ সামথিং!'

কল্যাণ অবাক হল, 'সামথিং কেন? মায়ের কাজ করতে অসুবিধে কোথায়?'

সুদীপ ঠোঁট কামড়াল, 'প্রথমত, আমি মনে করি না শ্রাদ্ধ করলেই একটি মৃত মানুষ শান্তি পাবেন। দ্বিতীয়ত, যে মানুষটার কষ্ট জীবিত অবস্থায় দূর করা আমার সাধ্যাতীত ছিল বলে এড়িয়ে গেছি, সেই মানুষটির শ্রাদ্ধ করে শান্তির ব্যবস্থা করা আমি অপরাধ বলে মনে করি।'

কল্যাণ বলল, 'কিন্তু তোর কোন সংস্কার না থাকতে পারে, বুড়ির হয়তো আছে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'সে থাকুক। কিন্তু আমি তো এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি। এখন অবনী তালুকদার যে ধান্দায় তার স্ত্রীর কাজ করতে যাচ্ছেন আমার কাজ করা তা থেকে কি খুব আলাদা?'

এই প্রশ্নের জবাব চট করে কেউ দিল না। শেষ পর্যন্ত জয়িতা বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে রাজী হোস না!'

'রাজী না হলে হয়তো ছাদের এই ঘর আমাদের ছাড়তে হবে। অবনী তালুকদার বুড়িকে বলে গেছে, আমরা ডাকাত, পুলিশ খুঁজছে। বুড়ি সেকথা বিশ্বাস করেছে কিনা জানি না। কিন্তু ওর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে কিছুতেই সহ্য করবে না। শালা উভয় সংকট! নেমন্তন্ন না করতে আসলে যেন্ন চলছিল না!'

এবার আনন্দ বলল, 'দ্যাখ সুদীপ, তোর বিবেক যা বলবে তুই তাই কর।'

সুদীপ কিছু বলল না। ও চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে ওর তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ঠিক তখনই সিঁড়িতে গলার শব্দ পাওয়া গেল, 'এই যে, নিচে একটু আসলে কি মান যাবে? যত ঝামেলা আমাকেই কি করে খুঁজে পায় কে জানে!'

আনন্দ বলল, 'তাড়াতাড়ি যা নইলে ওপরে উঠে আসবে।'

সুদীপ সিগারেটটা নিবিয়ে উঠে পড়ল। সিঁড়ির তিনটে ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন বৃদ্ধা। সুদীপকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আমি একটু ঠাকুরবাড়িতে যাব, পুরুতকে

জিজ্ঞাসা করতে হবে কি কি করা উচিত। দরজাটা বন্ধ করবে, নাকি তালা দিয়ে যাব? চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত চারধারে, আমি বেরুচ্ছি দেখলে সবার জিভ দিয়ে জল ঝরবে!'

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দিচ্ছি।' সুদীপ নেমে এল।

বৃদ্ধা বললেন, 'কেউ এলে বলবে দু'ঘণ্টা পরে ঘুরে আসতে।' বৃদ্ধা উষ্ণ আবহাওয়াতেও গায়ে চাদর রেখেছেন। এই পোশাকে তাঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। দরজা খুলে বের হওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখো বাবু, সব তোমার ওপর জিম্মা রেখে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরিও না আর চোখ কান খোলা রেখ।'

বৃদ্ধা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সুদীপ উঠোনের মাঝখানে চলে এল। এর মধ্যেই ঝাঁট দিয়ে সিগারেটের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বুড়ি যা চাইছে তা করলে এখানে আরও কয়েকটা দিন থাকা যাবে। কারও শ্রাদ্ধ করার সময় তো মাথা কামিয়ে ফেলতে হয়, ন্যাড়া হলে তাকে চেনা যাবে? এখনই খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে তার মিল পাওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তার ওপরে মাথা কামালে আর কোন চান্স থাকবে না। অবনী তালুকদার রাজী হয়েছেন কাজ করতে চক্ষুলজ্জার ভয়ে। কিন্তু তাকে রাজী হতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে। সুদীপ সিগারেট ধরাল আবার। এই কদিন খুব ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। কেউ ওখানে ধাক্কা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এগিয়ে গিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কি চাই?'

ওপাশ থেকে মহিলাকণ্ঠে জানান এল, 'দিদিমাকে একটু ডেকে দিন তো। নিমপাতা নেব।'

'দিদিমা নেই। দু'ঘণ্টা পরে ডাকলে পাওয়া যাবে।' সুদীপ এড়াতে চাইল।

'দু'ঘণ্টা পরে আবার উনুন জ্বালবে কে? দুটো নিমপাতার জন্যে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে? দরজাটা খুলে দিলেই তো হয়, কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে আসি। আমি তো চোর ডাকাত নই, একি রে বাবা!' মহিলা হেসে উঠলেন।

সুদীপ বুঝতে পারল সকালে যে ডিম দিয়েছিল সেই এখন নিমপাতা চাইছে। এই অবস্থায় কি করা উচিত? দরজা না খুললে কি সন্দেহ করবে? পুকুর থেকে তো ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। নিমপাতা নিয়ে চলে গেলে তো ঝামেলা চুকে যাবে। সে এগিয়ে হুড়কো খুলতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। হাতকাটা নীল জামা, নীল শাড়ি, খোলা চুলে যে ভাবে তাকাল তাতে রহস্যময়ী শব্দটাকে মনে পড়ল সুদীপের। খোলা দরজা দিয়ে পা ফেলে ভেতরে ঢুকে মেয়েটি নিমগাছের নিচে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে ওপরের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'ডালগুলো অত ওপরে চলে গেল কি করে?'

সুদীপ দেখল নিমগাছের ডালগুলো মেয়েটির নাগালের বাইরে! এখন অবশ্য আর ওকে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। শরীর যে কোন সুখী যুবতীর মত ভাবী। সে বলল, 'নিমপাতা পাড়তে হলে একটা বাঁশ দরকার।'

'তাই?' যুবতী যেন হেসে ভেঙে পড়ল। তারপর কোনরকমে নিজেকে সামলে বলল, 'আপনি বাঁশটা আনবেন? দিন না দুটো নিমপাতা পেড়ে, বেগুন দিয়ে ভেজে খেতে যা ভাল লাগে!'

সুদীপ হাসিটাকে অগ্রাহ্য করল। তারপর চারপাশে তাকাল একটা কিছুর জন্যে। সে মাথা নাড়ল, 'না, কিছুই তো দেখছি না।'

'আপনি গাছে উঠুন না। মই লাগবে?'

'উঠলে তো মইটা কেড়ে নেবেন!' সুদীপের রসিকতা করার লোভ হল।

'ওমা, তাই বুঝি, এত জানেন! দিদিমা কোথায় গেলেন?'

'জানি না। দু'ঘণ্টা পরে ফিরবেন বলে গেছেন।'

'ওমা, তাহলে আমার নিমপাতা খাওয়া হবে না?'

'অন্য কাউকে বলুন পেড়ে দিতে।'

'আমার কথা কে শুনবে বলুন। কর্তা গেছেন চাকরিতে, ফিরতে ফিরতে সেই রাত। ততক্ষণ আমি একদম একা।'

এইবার বিরক্ত হল সুদীপ। এমন ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। সুদীপ বলে ফেলল, 'আপনার লোকের অভাব আছে বলে মনে হয় না। পুকুরধারে ঘুরে আসুন না।'

গালে হাত দিল যুবতী, 'ওমা, এত হিংসে! ও ছোঁড়া আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে ডেকে একটা গল্প বলতে।'

'গল্প বলতে? আর জায়গা পেল না?' সুদীপ হাসল।

'কি করব বলুন! আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেব কান জানেন না তো! আমি কিছু করলেই দিদিমাকে লাগায়। সেই গল্প যদি কানে যেত তো হয়ে গিয়েছিল আর কি!'

'কিসের গল্প?' সুদীপ সূত্রটা বুঝতে পারছিল না।

'ওই যে প্যারাডাইস বলে যে জায়গাটায় আগুন লাগল, কাগজে পড়েননি? সেই জায়গায় ঠিক কি কি হত তার গল্প। বাবা, শুনেই আমার শরীর গুলিয়ে উঠেছিল। ছ্যা! আপনি ভাবলেন ওর সঙ্গে আমার বুঝি খু-উ-ব! ধ্যাৎ! ও তো আমার হাঁটুর বয়সী। আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'দেখি। ছুটি ফুরিয়ে গেলেই চলে যাব!'

'কতদিনে ছুটি ফুরোবে? আপনি এখানেই থেকে যান না, দিদিমার বয়স হয়েছে, একা থাকা ঠিক না।'

'এখানে থেকে আমার লাভ কি!' প্যারাডাইসের কথাটা শোনামাত্র বুক ঢিপঢিপ করছিল সুদীপের।

'লাভ? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আগে দেখুন আপনার ইচ্ছে আছে নাকি। আর উপায় হলে দেখবেন এত লাভ হবে সামলাতে পারবেন না। আপনি ছাদের ঘরে থাকেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি নিমপাতা পেড়ে দিলেন না, কি নিষ্ঠুর আপনি! চলি।' একরাশ হাসির শব্দ ছড়িয়ে মেয়েটি চলে গেল।

এরকম যুবতীর গল্প একমাত্র উপন্যাসেই পাওয়া যায় বলে ধারণা ছিল সুদীপের। শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী কি এই বকম? এই ঠাবেঠুরে কথাবার্তা, অকারণ হাসি, কথাব চেয়ে চোখ আর ঠোঁটের ব্যবহারে বেশি অর্থ বোঝানো। অথচ এই যুবতী বিবাহিতা। গতকাল আর একটি পুরুষের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখাও গেছে। একেই কি আগের যুগের মানুষ কুলটা বলত? মেয়েরা কখন কেন এমন হয়? এই আচরণে যখন শিক্ষাব পালিশ লাগে, বুদ্ধির ব্যবহার হয় এবং বিত্তের সম্মান জোটে তখনই যুবতীরা প্যারাডাইসের সদস্যা হয়ে যায়, কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে বয়ফ্রেন্ড পরিবৃতা হয় অথবা কাজের অছিলায় দার্জিলিং-এ বেড়াতে যায় নিজস্ব 'মানুষের' সঙ্গে। রাগ হল না, বরং এক ধরনের কষ্টবোধ হল যুবতীর জন্যে। কোথাও নিশ্চয়ই একটা ছোট্ট ফাঁক ছিল, সেটাই ওষুধের অভাবে বড় হতে হতে একটা অতল খাদ হতে চলেছে।

দরজাটা বন্ধ করে সুদীপ ওপরে উঠে এল। ছাদের মাঝখানে দাঁড়ালে আশপাশের বাড়ি তেমন দেখা যায় না গাছাগাছালির জন্যে। কিন্তু তার নজর পড়ল নিমপাতাগুলোর ওপর। গাছটা ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে ওপরে উঠেছে। এখান থেকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। ওই তেতো পাতা কারও কাছে এত লোভনীয় যা নিতে সব সময় রসের ফোয়ারা ছোটে? গণ্ডীর বাইরে গেলেই কত কি দেখা যায়!

জয়িতা ঠোঁট টিপে হাসছিল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করছিল, 'কেসটা কি?'

সুদীপ বলল, 'বুড়িকে বলে দিলাম রাজী আছি। বুড়ি যা চাইছে তা করতে দিলে কদিন এখানে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। তাছাড়া আমি ভাবছি কাজ করলে নিশ্চয়ই মাথা কামাতে হয়। আর সেটা করলে অবনী তালুকদার পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারবে না।' সুদীপ আড়চোখে স্টোভের দিকে তাকাল। ওটা নেবানো।

জয়িতা বলল, 'এতক্ষণ আমরা চল্লিশ দশকের রেডিও নাটক শুনছিলাম। তোর নায়িকা দেখতে কেমন রে?'

'মানে?' সুদীপ হকচকিয়ে গেল!

'বাঃ, এমন ন্যাকামি করিস না, এইসব অ্যাক্টিং ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে ভাই।' জয়িতা মন্তব্য করল।

'কি আশ্চর্য!' ইউ শুড নট ইউজ দিজ ল্যাঙ্গুয়েজেস! ওই মহিলা যদি নিমপাতা চাইতে আসেন তাহলে আমি কথা বলতে বাধ্য। তা না হলে সোজা ছাদে উঠে নিমপাতা পাড়তো, সেটা নিশ্চয়ই সেফ ছিল না!'

'চটছিস কেন? কলেজে তো প্রচুর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতিস, তখন ঠাট্টা করলে চটতিস না।'

'প্রত্যেকটা জিনিসের একটা লিমিট আছে! এই মহিলা বিবাহিতা।'

এবার কল্যাণ বলল, 'তাই? ডায়লগ শুনলে একদম বোঝা যায় না মাইরি! ডেঞ্জারাস।'

আনন্দ বলল, 'ওয়েল বয়েজ! প্রচুর হয়েছে। তবে এই মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়াই আমাদের মঙ্গল। যাক, আয় এবার কাজের কথা বলি। আজ রেস-ডে। আমাদের একজনের রেসকোর্সের সামনে যাওয়া উচিত। রেসকোর্সের ভেতরে ঢুকব না। পুলিশ নিশ্চয়ই সেখানে ওয়াচ করবে। একটা ট্যাকসি নিয়ে পাক খাবি। ট্যাকসি ড্রাইভার যেন সর্দারজী হয়। সর্দারজীরা বাংলা ইংরেজী কাগজ পড়বে না বলে মনে হয়। তারপর একটা নির্জন টেলিফোন বুথ থেকে প্রত্যেকটা মেজর খবরের কাগজকে টেলিফোনে জানাতে হবে যে সব মানুষ বুঝতে পেরেছেন আমরা যা করতে চলেছি তাতে আমাদের একমাত্র স্বার্থ এদেশটা বাসযোগ্য করা—তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমরা তাদের অনুরোধ করছি এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। একটা কেলেঙ্কারি না বাধালে আর তোমার চলছে না! কখন বের হব?'

'তুই যাবি?' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তোর এখান থেকে বের হওয়া উচিত হবে না। আমি যাওয়া আসা করতে করতে পাড়ার লোকের চোখ-সওয়া হয়ে গেছি। একটা নাগাদ বের হলেই হবে না?'

'হ্যাঁ। কাগজে লিখেছে রেস আরম্ভ বেলা দুটোয়। বুড়ি কোথায় গিয়েছে?'

'পুকুরের কাছে।'

'তাহলে কল্যাণ, তুই আর জয়ী চট করে স্নান সেরে আয় না নিচ থেকে। তাহলে আর ওপরে বেশি জল আনতে হয় না। সুদীপ তুই লক্ষ্য রাখ বুড়ি আসছে কিনা!' আনন্দ বলল। এই সাতসকালে স্নান করতে ওদের মন ছিল না। কিন্তু কিছু করার যখন নেই তখন স্নান করা ভাল। জয়িতা, কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই নিজে স্নান করতে পারবি? চল্, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল কল্যাণ। এক হাতে প্লাস্টার নিয়ে স্নান করা সত্যিই অসুবিধাজনক। কিন্তু সাহায্য করার প্রস্তাবটা যে জয়িতার কাছ থেকে আসবে তা অনুমান করতে পারেনি। সে চট করে বন্ধুদের দিকে তাকাল। কারও মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এবং তখনই নিজেকে খুব ছোট মনে হল তার। জয়িতাকে সে এখনও মনে মনে একটি মেয়ে ভেবেই যাচ্ছে। এই ভাবনার কথা জয়িতা জানলে প্রচণ্ড ক্ষেপে যাবে। কল্যাণ বোঝে উত্তর কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়ায় আজন্ম কাটিয়ে তার মধ্যে যেসব সংস্কার শিকড় ছড়িয়েছে সেগুলোকে টেনে ওপড়ানো সত্যিই সহজসাধ্য নয়।

ওরা নিচে নেমে গেলে আনন্দ আবার কাগজে চোখ রাখল। সুদীপ কাগজগুলো আনবার পর থেকে সে প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে পড়েছে। কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ টাকা কাজ না করায় ফেরৎ গেছে, কেন্দ্রের কাছে অন্য খাতে টাকা চেয়ে রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার তার স্বার্থানুযায়ী চলছে, কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ না থাকলেও একটি ছোট্ট খবরে তার চোখ আটকাল। কলকাতার একজন বিখ্যাত স্মাগলার বিশেষ এলাকায় সাম্রাজ্য তৈরি করেছে। সেই সাম্রাজ্যে বিদেশী নাগরিকরা পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই আশ্রয় পেয়েছে। এই স্মাগলারটি মাঝে মাঝে কলকাতায় দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এক একটি দাঙ্গার পরিণতিতে তার এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি ফাঁকা হয়ে যায়। সেই বাড়িগুলো লোকটি বেশি টাকায় ভাড়া দিয়ে থাকে। সরকার এসব তথ্য জানেন। স্থানীয় দুটো থানার সঙ্গে লোকটির দারুণ ভাব-ভালবাসা আছে। এটা থাকার কারণ একজন প্রগতিবাদী মন্ত্রী নাকি লোকটির গডফাদার হয়ে আছেন। তাঁকে নির্বাচিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে স্মাগলারটি। খবরটা বেরিয়েছে যে কাগজে তার পরিচয় এবং প্রচার খুব বেশি নয়। খবরটা পড়ার পর থেকেই আনন্দর মাথায় অনেক কিছু পাক খাচ্ছিল। প্রথম কথা, এই খবরটা সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, প্যারাডাইস অপারেশনে নামবার আগে সে পরবর্তী কার্যক্রমের তালিকা করেছিল। সেই তালিকানুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না কোন বিপদ ঘটে। সেই তালিকায় একজন মন্ত্রীর নাম ছিল।

তিনি গত চার বছর প্রায় খোলাখুলি ঘুষ নিয়েছেন তাঁর পার্টির নাম করে। সেই টাকা পার্টির নাম করে নেওয়া যেমন বেআইনি তেমনি সেই টাকা তিনি পার্টি ফান্ডে জমা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ ভদ্রলোক প্রতিটি জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজিপতি এবং শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। এই লোকটির মুখোশ খুলে দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল তারা। আনন্দ এখন উত্তেজিত হচ্ছিল এই দেখে যে ওই মন্ত্রী যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হন স্মাগলারটির সাম্রাজ্য সেখানেই।

আজ দুপুরেও নিরামিষ তরকারি আর ভাত। যদিও স্টোভে ডিম সেদ্ধ করা হয়েছিল বলে সুদীপ একটু খুশী হয়েছিল। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধা সত্যিই চমৎকার রান্না করেন। এখনও তিনি জানেন না তাঁর ছাদের ঘরে কজন রয়েছে। তিনি যে ওপরে ওঠেন না এটাই সৌভাগ্য। আজও নিচ থেকে খাবার ওপরে আনার ব্যাপারে সুদীপকে ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে। আনন্দর অনুমান, বৃদ্ধা সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। সে সুদীপকে বলেছে জয়িতার কথা না বলে বৃদ্ধাকে জানিয়ে দিতে তারা কজন ওপরে আছে। এতে আর যাই হোক ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক পরিষ্কার থাকবে। উনি যখন অবনী তালুকদারকে কিছু জানাননি তখন এটা শোনার পর বিপদের সম্ভাবনা আধাআধি। সুদীপ রাজী হয়েছে। ও বিকেলবেলায় বুড়িকে বলবে।

ঠিক একটায় সুদীপ বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জয়িতা বলল, 'সাবধানে যাস, কোন ঝুঁকি নিস না।'

সুদীপ হেসে বলেছিল, 'আমার কখনও বিপদ হবে না। কারণ বিপদটাকে আমি কখনও বিপদ বলে মনে করি না।'

খাওয়া গল্প করা এবং ঘুমানো। এছাড়া আর কোন কাজ নেই। এমন কি ওই ছাদে দাঁড়ানোর উপায় নেই। আনন্দ বুঝতে পারছিল জয়িতা এবং কল্যাণ ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠেছে। এই ঘরটাকে জেলখানা না ভাবার কোন কারণ ওদের নেই। সে নিজেও একঘেয়েমির শিকার হচ্ছিল। এইভাবে বেশিদিন এই ঘরে আটকে থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু কলকাতা শহরের কোন পথ তাদের জন্যে নিরাপদ নয়। সে অনেক চিন্তা করেছে। কেউ তাদের আশ্রয় দিতে সাহস পাবে না। অথবা দিলেও তারা নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করবে না। একটা ব্যাপার ওর কাছে খুব চমকপ্রদ মনে হচ্ছে। বড় বড় খুনের অপরাধীদের এখানকার পুলিশ ইচ্ছে করলেও খুঁজে বের করতে পারে না। অথচ কত দ্রুত ওরা সন্ধান পেয়ে গেল এই ক্ষেত্রে। কলকাতার পুলিশ এত তৎপর হবে সে কল্পনা করেনি। বোঝাই যাচ্ছে চাপ আসছে ওপর থেকে, যাদের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে এই রকম অপারেশন একটার পর একটা চললে।

কিন্তু আপাতত কিছুদিন পুলিশের থাবার বাইরে যাওয়া দরকার। গত এক বছর ধরে এই রকম একটা জায়গা খুঁজেছে সে যেখানে অজ্ঞাতবাস করা যায়। মোটামুটি একটা ছক করে নিয়েছে সে। যদি জায়গাটায় পৌঁছানো যায় তাহলে আর যাই হোক অন্তত ভারতীয় পুলিশের ভয় থাকবে না। বেশ কিছুদিন কাটানোর পর যখন এদিকের হাওয়া শান্ত হয়ে আসবে, আরও নতুন ঝামেলায় পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন আবার ফিরে আসা যাবে। কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানটিতে যেতে অনেক দূরত্ব পার হতে হবে। চারজন একসঙ্গে গেলে আর পৌঁছাতে হবে না। দুটো দলে ভাগ হয়ে তাদের যেতে হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় ইংরেজি উপন্যাসটি পড়ছিল জয়িতা। কল্যাণ পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। আনন্দ ডাকল, 'জয়ী, তোরা ঘণ্টা তিনেক একা থাক। আমি বাইরে থেকে শেকল টেনে যাচ্ছি, সাড়াশব্দ করিস না।'

'কোথায় যাচ্ছিস?' জয়িতা বইটা সরিয়ে রাখল।

'একটু চক্কর মারতে।' আনন্দ সেই মন্ত্রীর নাম করল, 'এই কাগজটা পড়ে দ্যাখ। আমার তো মনে হচ্ছে একই লোক। ওই এলাকা থেকে তো আর কেউ মন্ত্রী হয়নি।'

জয়িতা আগ্রহ নিয়ে কাগজটা চোখের সামনে ধরল। আনন্দর দেখানো অংশটিতে চোখ বোলাতে তার বেশি সময় লাগল না। তার মুখ চোখ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'লোকটা আমাদের লিস্টে নয় নম্বর ছিল, না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর প্রমোশন হল। তিন নম্বরটা ওর ভাগ্যেই জুটল। আমি তবু হালচাল দেখে আসি।'

জয়িতা তখনও ভাবছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে কিছু লোক চিরকাল মুনাফা লোটে। কিন্তু একটি প্রগতিবাদী বলে দাবী করা সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে একজন যে তাই করে যেতে পারে এবং প্রশ্রয় পায় সেটা ভাবতে অসুবিধে হয়। লোকটা চোর ঘুষখোর, এই অবধি জানা ছিল। কিন্তু—। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল আনন্দ যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। জয়িতা বলল, 'আজকেই বের হবি? খবরের কাগজের ছবি মনে করে কেউ যদি তোকে চিনে ফেলে তাহলেই—! ঝুঁকি নিচ্ছিস কিন্তু।'

আনন্দ হাসল, 'না রে, বোকামি করব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক। সুদীপ যদি এর মধ্যে ফিরে আসে তাহলে ওকে ব্যাপারটা বলিস।' ঘরের বাইরে এসে শেকল তুলে দিল আনন্দ। এখন তার কোমরে রিভলভারটা গোঁজা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে দেখল রোদের তেজ কমে এসেছে। বারান্দার দিকে চোখ পড়তেই সে বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। বড় থালায় চাল নিয়ে কাঁকড় বাছছেন। পায়ের শব্দে চোখ তুলতেই আনন্দ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি একটু বের হচ্ছি। ডাক্তারের কাছে যাব।'

'ডাক্তার? কি হয়েছে তোমার? কি আশ্চর্য!' বৃদ্ধা উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন।

'তেমন কিছু নয়। বুকে কেমন ব্যথা-ব্যথা লাগছে। আসছি।'

'এসো। এ পাড়ায় তেমন ভাল ডাক্তার নেই। ও হ্যাঁ, তোমাদের ঘরের শেকল টেনে দিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

একমাত্র প্রার্থনা বৃদ্ধা যেন ওপরে না ওঠেন। মনে মনে বলল আনন্দ। সে খানিকটা আড়ষ্ট ছিল গলিতে হাঁটবার সময়। রাস্তায় লোকজন তার দিকে মোটেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে না। সে বাস স্ট্যান্ডে আসতেই ট্যাকসি পেয়ে গেল। প্রথমে ধর্মতলার একটি বিখ্যাত দোকানে পৌঁছাল সে। একটা ম্যাপ আর জায়গাটার বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বই কিনতে প্রায় তিনশো টাকা খরচ হয়ে গেল। ইংরেজি বই-এর এত দাম! ম্যাপটা তাদের খুব সাহায্য করবে।

ট্যাকসিটাকে ছাড়ল যেখানে সেখান থেকে স্মাগলারটির এলাকা মিনিটখানেক। কলকাতার এই বিশাল এলাকার মানুষের প্রথম জীবিকা বিদেশী দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রয়বিক্রয়ে সাহায্য করা। স্মাগলারটি ওদের কাছে দেবদূতের মত। আনন্দ প্রথমে মার্কেটের সামনে পৌঁছে চারপাশে চোখ বোলাল। তারপর একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চমৎকার চা চাইল।

দোকানটা জমজমাট। শুধু চা চাইলে খুব পাত্তা দেবার মত সময় কর্মচারীদের নেই। আনন্দ একটা বেঞ্চিতে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। বেশির ভাগ খদ্দের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের। কথাবার্তা যা হচ্ছে তা ওই কেনাবেচা নিয়ে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেও সে চা পেল না এবং এমন কিছু তথ্য পেল না যা নিয়ে ভাবা যায়। শেষ পর্যন্ত আনন্দ উঠল। একটা ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু এছাড়া কোন উপায় নেই।

সে সোজা কাউন্টারটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যে লোকটি ক্যাশ নিচ্ছে সে খুব ব্যস্ত। লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, নানুভাই-এর বাড়িটা কোথায়?'

হঠাৎ লোকটার শরীর স্থির হয়ে গেল। মাছের মত চোখ তুলে আনন্দকে দেখল সে। তারপর স্পষ্ট হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি দরকার?'

আনন্দ লক্ষ্য করল, শুধু দোকনদার নয়, খদ্দেরদের অনেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। সে খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'নানুভাই-এর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার, খুব জরুরী প্রয়োজন।'

লোকটি রাস্তার উলটোদিকটা দেখাল, 'ওই গলি দিয়ে চলে যান। মিনিট তিনেক গেলে জিজ্ঞাসা করবেন।'

আনন্দ চায়ের জন্য আর তাগাদা দিল না। সে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই বুঝল একটা লোক তার সঙ্গ নিয়েছে। ক্যাশিয়ার লোকটা নানুভাই-এর নাম শুনে অমন করল, না তার মুখ দেখে চিনতে পারল বুঝতে পারছিল না সে। এই লোকটা তাকে অনুসরণ করছে কেন?

গলিটায় ঢুকল সে। যত এগোচ্ছে তত সরু হয়ে আসছে। এখন দু'পাশে কোন বাংলা শব্দ নেই। দুজন লোককে জিজ্ঞাসা করে সে যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেই বাড়িকে এই বস্তি এলাকায় আশা করেনি সে। সাদার্ন অ্যাভিন্যু বা আলিপুরে মানাতো বাড়িটা। দু'পাশের বস্তি এত ঘন যে একটা লোক

সেখানে ঢুকে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আনন্দর আফসোস হচ্ছিল। এখানে যদি চেনাশোনা থাকত তাহলে চমৎকার অজ্ঞাতবাসের জায়গা মিলতো।

সে বাড়িটার কলিং বেলে হাত দিতে যাচ্ছে এমন সময় অনুসরণকারী সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি চাই?'

'নানুভাই-এর সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি বাড়িতে নেই।' এই লোকটিও হিন্দীতে কথা বলছিল।

'কোথায় আছেন?'

'কি দরকার?'

'আমি একটা পত্রিকা থেকে এসেছি।'

লোকটি তাকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

লোকটা বাঁ দিকের পথ ধরে হাওয়া হয়ে গেলে আনন্দ চারপাশে তাকাল। সে বুঝতে পারছিল অনেকেই তাকে দেখছে। বাড়িটার ভেতরে লোক আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। একটু বাদেই সেই অনুসরণকারী ফিরে এল, 'আসুন। নানুভাই এখন খুব ব্যস্ত। শুধু পেপারেব কথা শুনে বাজী হলেন।' আবার গলি, তস্য গলি। আনন্দর গা ছমছম করছিল।

যে বাড়িটার সামনে এবার সে দাঁড়াল অনুসরণকারীর সঙ্গে সেটা একতলা। লোকটা তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা বিশাল ঘরে বসে আছে নানুভাই নামের লোকটা। তার চেহারা দেখে আনন্দর শোলের গব্বর সিংকে মনে পড়ে গেল।

॥ ২৩ ॥

নানুভাই তখন তিনজন লোকের কাছে কোন কিছুর হিসেব চাইছে। আনন্দকে চোখেব কোণায় একবার দেখে নিয়ে লোক তিনটেকে বলল, 'আমি দু'নম্বরী কথায় একদম মাথা ঠিক রাখতে পারি না। অ্যালার্জি, অ্যালার্জি জানো? সেইটে হয় আমার। সোজা ব্যবসা কর আমি তোমার সঙ্গে আছি। যাও, পাশের ঘরে যাও। তোমাদের পনেবো মিনিট সময় দিচ্ছি হিসেব ঠিক করার জন্যে।'

কথা শেষ করে সে ইঙ্গিত করতে আর একটা লোক এগিয়ে এসে লোক তিনটেকে ইঙ্গিত করল পাশের ঘরে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন ভেঙে পড়ল, 'ভাইসাব, এই রকম হবে না, আমি কথা দিচ্ছি এই রকম হবে না।' লোকটার গলায় কান্না এসে গেল। কিন্তু নানুভাই সেসব কথা যেন শুনতেই পেল না। আনন্দর পথপ্রদর্শককে ইঙ্গিত করল ব্যাপারটা জানানোর জন্যে। লোক তিনটে বাধ্য হল পাশের ঘরে চলে যেতে।

পথপ্রদর্শক লোকটি বলল, 'এই ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এখানে ওখানে খোঁজ নিচ্ছিল। বলছে কোন পেপারের লোক।'

'আঃ!' নানুভাই এগিয়ে এল। ওর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে নির্ঘাৎ। গায়ের রঙ গভীর কালো। 'পেপারের লোক! আমার মত সামান্য লোকের কাছে, একি তাজ্জব ব্যাপার। কোন্ পেপার?'

আনন্দ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দৈনিকের নাম করল।

নানুভাই সেটার কথা বোধ হয় মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'দেখুন ভাই, পেপারের লোক খুব দু'নম্বরী হয়। কলকাতার চারটে কাগজে আমাদের দোস্ত আছে। উপকার করার সময় তারা নানান ফ্যাকড়া দেখায়। আপনি কোন্ ধান্দায় এসেছেন?'

'আজকের একটা কাগজে আপনার সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছে, আপনি জানেন?' খুব সহজ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল আনন্দ।

সঙ্গে সঙ্গে নানুভাই হাসল, 'আরে হাতি হাঁটে আপন মনে আর কুত্তা চেঁচায়। ওই কাগজে কি লেখা হল তা আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে মিনিস্টারের নাম জড়ানো হয়েছে।'

'এই তো আপনাদের ধান্দা। মিনিস্টার কোন ঝামেলায় থাকেন না অথচ তাঁকে টানা হল। আমি ইচ্ছে করলে ওই রিপোর্টারকে বস্তির ভিতরে তিরিশ বছর রেখে দিতে পারি। কিন্তু মিনিস্টার চান না আপনাদের গায়ে হাত দিতে। কাগজগুলো বড্ড চেঁচায়।' নানুভাই ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কি জানতে চাইছেন? স্পষ্ট করে বলুন!'

'দেখুন, এই খবরটা আমাদের কাগজে বের হয়নি। এই সব খবরের পেছনে সত্যি আছে কিনা বোঝা যায় না। তাই এডিটর চান আপনার সঙ্গে আলোচনা করে তবে রিপোর্ট করতে।'

কয়েক পা এগিয়ে নানুভাই টেলিফোনের রিসিভার তুলল। ডায়াল শেষ হলে কান থেকে রিসিভার সশব্দে নামিয়ে বলল, 'কুত্তাকা বাচ্চা! টেলিফোনের লোকগুলো, কেউ কাজ করতে বলে না কেন? এ কালু!' গমগমে গলায় নানুভাই যাকে ডাকল সে তৎক্ষণাৎ চলে এল, 'মিনিস্টার সাহেবকে টেলিফোনে ধর। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আছে।' কালু নামের লোকটা তৎক্ষণাৎ টেলিফোন নিয়ে বসে গেল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আনন্দ, নানুভাই একগাল হেসে বলল, 'আরে, আপনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন! ছি ছি! গোস্তাকি মাপ করবেন। বসুন, কি খাবেন?'

'কিছু না। আপনি কি আমাকে কিছু সময় দেবেন?'

'সময়?' নানুভাই ঘড়ি দেখল, 'আধঘণ্টার মধ্যে তিন নম্বর ব্লকে দুটো নলকূপ বসাতে যেতে হবে। লোকগুলো খুব জলের কষ্টে আছে।'

'এই কাজটা তো কর্পোরেশনের, আপনি করছেন কেন?'

'বাঃ, আমার মানুষদের জন্যে আমি করব না? কর্পোরেশনকে বলেছি তোমাদের ওপর আমার লোকদের বিশ্বাস নেই। যা করবার আমি করব, তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।'

'এখানকার লোকগুলো আপনাকে কি মানে?'

প্রশ্নটা শুনে ঘর কাঁপিয়ে হাসল নানুভাই, 'এর উত্তর আমি জানি না। আপনি জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ওদের কাছে গিয়ে জানুন। মশাই, সব থেকে বড় ধান্দা হল পেটের। এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষেব পেট আমি ভবাই। ওদের বিপদে আমি পাশে দাঁড়াই। মিলা?'

কালু দ্বিতীয়বার ঘাড় নাড়তেই নানুভাই এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলেন, 'নানু, হ্যাঁ, না কোন গোলমাল নেই, আরে আপনি একবার বলুন আমি ও শালা রিপোর্টারের বদলা নেব চুন-চুন করে। ওই তো মুশকিল, হাঁ একজন রিপোর্টার এসেছে আমার কাছে, ওই শালা রিপোর্টার যা লিখেছে সে সম্পর্কে জানতে চায়! হাঁ, ঠিক হ্যায়,' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নানুভাই জিজ্ঞাসা করল গলা নামিয়ে, 'কোন্ পেপার বললেন যেন আপনি?' আনন্দ নামটা মনে করিয়ে দিতে সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক হ্যায়, আমি কথাবার্তা বলে নিচ্ছি। রাত্রে দেখা হবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নানুভাই বললেন, 'আপনি কি চান বলুন তো?'

আনন্দ জবাব দিল, 'শুধু এই রিপোর্টটা সত্যি কি-না তাই জানতে চাই।'

'বিলকুল ঝুটা। মিনিস্টার আমাকে ভালবাসেন, আমি ভালবাসি পাবলিককে। অ্যান্টি পার্টি বদমাইশি করে এই সব লিখিয়েছে।' নানুভাইকে আবার ঘড়ি দেখতে দেখল আনন্দ।

'আপনার যা জনসংযোগ, ইলেকশনে দাঁড়ালে তো আপনি এম এল এ হয়ে যেতেন। আপনারও তাহলে অ্যান্টি পার্টি আছে এখানে?'

'হিন্দুস্থানে কার কবে অ্যান্টি পার্টি ছিল না বলতে পারেন? এ শালা দেশটাই হল বেইমানের দেশ।' নানুভাই হাসল, 'ইলেকশনে দাঁড়াবে মিনিস্টার, আমি কে? অতুল্যবাবুকে আমার এই জন্যে খুব পছন্দ। সত্যিকারের শরিফ আদমি। হাঁ, কি জানতে চান বলুন, আমাব টাইম নেই।'

একটু সিরিয়াস হবার চেষ্টা করে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এই এলাকায় আপনার প্রতাপ কি করে হল?'

'খুব সোজা কথা। পাবলিককে ভালবাসলাম, পাবলিকও ভালবাসল।'

'আপনি কি খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ?'

'নিশ্চয়ই! ধর্ম ছাড়া আমার আর কি আছে!'

'এলাকায় আপনার ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যায় বেশি। অন্য ধর্মের মানুষের আপনার সম্পর্কে কি ধারণা?'

'একথা তাদের জিজ্ঞাসা করুন ভাই। কার মনে কি আছে তা আমি বলব কি করে!'

'এই এলাকায় ভারতীয় নয় এমন অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। তাদের পাসপোর্ট ভিসার বালাই নেই। এই লোকগুলোকে আপনি শেলটার দিচ্ছেন বলে অভিযোগ।'

'কি ফালতু কথা। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের রেশনকার্ড আছে। মাসতিনেক থাকলেই ভোট দিতে পারে। যারা এই সব অধিকার পায় তারা ফোরেনার? আমার এলাকার পাশেই বর্ডার নেই। এখানে আসতে হলে অনেক মাইল পেরিয়ে আসতে হবে। যদি বহুৎ লোক এইখানে আশ্রয় নেয় তাহলে সরকারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টটা তুলে দিতে বলুন। লোকগুলো যখন এল তখন আটকাতে পারল না? যারা রেশনকার্ড ইস্যু করল তারা কি দেখে করল? যারা ভোটে নাম তুলল তারা কি অন্ধ? আমি শেলটার দিচ্ছি? আমার কাছে যে এসে আশ্রয় চাইবে আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না।' এইবার নানুভাইকে উত্তেজিত দেখাল।

'অভিযোগ উঠেছে এই এলাকা স্মাগলারদের সাম্রাজ্য। কত টাকার লেনদেন হয় প্রতি মাসে?'

'ও হিসেব আমি দেব না। তবে প্রত্যেকটা লোক যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমার! দেখুন রিপোর্টার ভাই, আজ আমার সময় নেই। আপনি আর একদিন আসুন। তবে একটা শর্ত, আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারবেন না।' নানুভাই চিৎকার করল, 'এ কা‍ু! উনলোগকো হিসাব মিল গিয়া? পুছ লেও।'

'আপনি যদি মানুষের উপকার করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে লিখব না। কিন্তু আপনার মিনিস্টার নাকি বলেছেন আপনার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা ঠিক?'

হাসিতে মুখ ভরে গেল নানুভাই-এর, 'এক কাজ করুন। মিনিস্টারের বাড়ি চেনেন?'

'চিনে নেব।'

'পরশু সন্ধ্যেবেলায় চলে আসুন। আমিও থাকব সেখানে। তখনই বাতচিত হবে। তার আগে কিছু লিখবেন না। আর একটা কথা, আমার এলাকায় বেশি ঘুরবেন না। দু'নম্বরী লোক ভেবে যে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে।' নানুভাই ইঙ্গিত করতে সেই পথপ্রদর্শক সামনে দাঁড়াল।

ওই সরু গলিতে একবার ঢুকলে বের হওয়া নতুন লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গোলকধাঁধা বললে কম বলা হবে। দু'পাশে যে সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে বসে কথা বলছে তাদের চেহারা সুবিধের নয়। তারা আনন্দর দিকে তাকাচ্ছে কৌতূহলী চোখে, কিন্তু পথপ্রদর্শকটির ওপর নজর পড়ামাত্র শীতল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন সৌম্য চেহারার বৃদ্ধকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ। তারপর বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ভোট দেন?'

লোকটি মাথা নাড়ল। তারপর চমৎকার হিন্দীতে জানাল, বাংলা ভাল বোঝেন না, হিন্দীতে বল। পথপ্রদর্শক বুঝতে পারছিল না কি করবে? নানুভাই আনন্দকে সমীহ করে কথা বলেছে এবং কোন নির্দেশ দেয়নি তাকে। আনন্দ যতটা সম্ভব কাছাকাছি হিন্দীতে প্রশ্ন করল, 'কেন ভোট দেন?'

'এলকায় থাকব বলে। নানুভাই বলে তাই আমরা দিই।'

'কাকে দেন ভোট?'

লোকটি মন্ত্রীমশাই-এর নাম উচ্চারণ করল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আছে?'

লোকটি হাসল, 'নানুভাই-এর সঙ্গে আলাপ থাকলেই কাজ হয়, মন্ত্রীকে প্রয়োজন হয় না।'

'কেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আমি কেন এলাকার কেউ দেবে না। আপনি কে?'

'আমি খবরের কাগজে কাজ করি। আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?'

'সেভেনটি ওয়ান। ঢাকা থেকে চলে এসেছি।'

'কি করে চলে?'

'ডকে নানুভাই-এর বিজনেসে মদত দিই।'

লোকটি কথাটা বলামাত্র পথপ্রদর্শক বলল, 'চলুন সাহেব, আমার অন্য কাজ আছে।' অতএব আনন্দ পা চালাল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'নানুভাইকে সবাই খুব ভালবাসে, না?'

'পেটের ধান্দা বড় ধান্দা!' লোকটা কথা বলতে পেরে বোধ হয় খুশি হল, 'ভোটের কথা আপনি বলছিলেন না? এখানে প্রায় সবাই ভোট দেন। মিনিস্টার-ফিনিস্টার সব ফালতু, আসলে নানুভাই যা বলবে তাই হবে। আগে যে এম এল এ ছিল সে নানুভাইকে টেক্কা দিতে চেয়েছিল, এখন একদম আউট! আমাদের এলাকায় পুলিশ পর্যন্ত ঢোকে না।' লোকটা কথা বলছিল প্রায় মন খুলেই। হঠাৎ কাউকে দেখে চুপ করে গেল।

বাস স্ট্যান্ডে এসে ট্যাকসি নিল আনন্দ। এই সময় লোকটা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'সাহেব, আপনাকে যেসব কথা বললাম তা কাউকে বলবেন না। এসব বলা ঠিক না।'

ট্যাকসিতে আসতে আসতে আনন্দ নানুভাইকে অনেক রকম করে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে যেতেই সামনে তাকিয়ে বুক ধক্ করে উঠল আনন্দর। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চলে গেল কোমরে। একটা পুলিশের জিপ সামনে দাঁড়িয়ে। একজন অফিসার এবং সেপাই এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডক থেকে তো? নাম শালা গাড়ি থেকে!'

ড্রাইভার কাতর গলায় বলল, 'না স্যার, ডক থেকে না, এই বাবু একটু আগে ট্যাকসি নিলেন।'

অফিসার এবার আনন্দর দিকে তাকালেন, 'অ্যাই, কি আছে সঙ্গে?'

'কিছু নেই।'

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'নানুভাই-এর কাছ থেকে। চটজলদি নামটা ব্যবহার করল আনন্দ। অফিসার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভেতরটা মুহূর্তে কেমন ফাঁকা হয়ে গেল ওর। কিন্তু নামটা যে ম্যাজিকেব মত কাজ করবে তা কল্পনাতেও ছিল না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইশাবা করলেন ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে। একটু ব্যাক করে গাড়িটা বের করে আনছিল যখন ড্রাইভার তখন অফিসার তাঁর-বাহিনী নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন জিপের দিকে।

ড্রাইভার বলল, 'আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম দাদা।' আনন্দ উত্তর দিল না।

বেশ কিছুটা কষা মাংস আর তন্দুরীর রুটি নিয়ে আনন্দ যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বৃদ্ধা দরজা খুলে আনন্দকে দেখে একটু থমকে গেলেন, 'এত রাত করে বাড়িতে ফেরা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আজ ওপরে বসে খাওয়া চলবে না, তাকে বল নিচে আসতে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। আমি ঘণ্টাখানেক বাদেই আসছি। সুদীপ এসেছে?'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'ছেলেটা ভাল। ওর বাপ যা বলেছে তা সত্যি বলে আমি ভাবতেই পারি না। আমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে মায়ের কাজ করে আসবে বলেছে। বাপ-ছেলের এই যুদ্ধের কথা কে কবে শুনেছে বল? তোমার বাপের সঙ্গে গোলমাল নেই তো?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমার বাবা বেঁচে নেই।'

'ও।' বৃদ্ধা থমমত হয়ে একটু সময় নিলেন, 'মা?'

'মা আছেন, গ্রামের বাড়িতে।'

'আহা! পিতৃহারা ছেলের দায়িত্ব খুব বেশি। মায়ের দুঃখ দূর করবে তুমি। না হলে সন্তান কিসের?'

বৃদ্ধা ঘুরে দাঁড়াতেই আনন্দ ওপরে উঠে এল। সুদীপ কল্যাণ জয়িতা গোল হয়ে বসে তাস খেলছে। জয়িতাই বলল, 'ওই যে, এসে গেছে! উঃ, কি চিন্তা হচ্ছিল!'

'চুপ কর। মা-মা ভাব করিস না। ওই বস্তুটি আবার আমদানি করলি কেন?'

'সময় কাটানোর পক্ষে দারুণ জিনিস। তুই শালা নাইনটিন সেঞ্চুরির বিধবা। সিগারেট খাস না, মদ তো প্রশ্নই ওঠে না, কোন মেয়ের সঙ্গে আজ পর্যন্ত প্রেম করলি না, আবার তাসেও অ্যালার্জি!' সুদীপ নাটক করে কথাগুলো বলছিল। কল্যাণ এক হাতে তাস খেলছিল। সেটা অবশ্যই মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।

আনন্দ বলল, 'কি ব্যাপার, খুব ফুর্তিতে আছিস মনে হচ্ছে!'

তাস নামিয়ে রেখে সুদীপ বলল, 'দারুণ রি-অ্যাকশন। রেসকোর্সের সামনে গিয়ে দেখি গেটের বাইরে পাবলিক দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ভিড়। কিন্তু কেউ ঢুকছে না। ওপাশে যে মেম্বার্স এনক্লোজারটার সামনে গাড়ির লাইন লাগতো সেখানটা আবও ফাঁকা। আমি একদম নেকু সেজে একটা

রেসের বই বিক্রি করা ছোকরাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে সে বলল রেসকোর্সে নাকি বোমা পড়বে সেই ভয়ে কেউ ঢুকছে না। পাবলিকের প্যানিক যদি দেখতিস! শেষ পর্যন্ত ভেতর থেকে অ্যানাউন্স করল অনিবার্য কারণে আজ রেস বন্ধ থাকল। পুলিশে পুলিশে রেসকোর্স ভরতি ছিল। হেস্টিংসের স্টেবল থেকে ঘোড়াগুলো নাকি মালিকেরা আনতে চায়নি। এক একটা ঘোড়ার দাম নাকি লাখ দু' লাখ। হেভি লস হয়ে গেল গভর্নমেন্টের। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে চলে গেলাম। একটা পাবলিক টেলিফোনে সবকটা কাগজকে যা তুই বলেছিলি তাই বলেছি। লোকগুলো প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। বলেছে, আপনি যে ওদের দলে তার প্রমাণ দিন।' সুদীপ হাসতে লাগল।

খবরটা খুব পছন্দ হল কল্যাণের। সে আনন্দকে বলল, 'ব্যাপারটা বেশ, না? ধর, তোর কাছে কাগজপত্র নেই। কিছু লোক তোকে ধরে পরিচয় চাইল। তুই বললি। তারা প্রমাণ দেখাতে বলল। কোন প্রমাণ নেই। তোর পরিচয় সঠিক কিনা সেটা প্রমাণ করবে তোর পারিপার্শ্বিক। তোর আত্মীয় বন্ধু স্কুল কলেজ। কিন্তু তুই না।'

আনন্দ কোন জবাব দিল না। তার ভাল লাগছিল। সে এই রকমটাই হবে ভেবেছিল। কাগজে ওই হুমকির খবরটা পড়ে লোকে ভয় পাবে। তারা নিজেদের প্রাণের মায়ায় আজ রেসকোর্সে যাবে না। কিন্তু সেটা আজ অথবা পরের দিন। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে আবার পিল-পিল করে ঢুকবে তারা। কিন্তু মেম্বার্স এনক্লোজার, সুদীপ যা বলছে, অমন ফাঁকা হবে সে আশা করেনি। তাহলে কলকাতার উচ্চবিত্তরাই বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে? কিছু একটা করা দরকার। হুমকিটা যে অহেতুক নয় এটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আজ যে লোকটা সংসারকে বঞ্চিত করে রেস খেলতে টাকা নিয়ে এসেছিল সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে তার কিছু টাকা সংসারের পেছনে খরচ করেছে। কিন্তু এইটুকু তো তাদের পরিকল্পনায় ছিল না!

জয়িতা আনন্দকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি খবর?'

আনন্দ ওদের বিশদ বলল। একটা কাগজে যতটা সম্ভব জায়গাটা এঁকে দেখাল সে। তারপর বলল, 'নানুভাই লোকটার হাতের পুতুল হল এই মন্ত্রী। দেখলে মনে হবে আচরণে রবিনহুড, চেহারায় গব্বর সিং। কিন্তু ওকে প্রচণ্ড ভয় পায় এলাকার লোক। মানুষ যার কাছে উপকার পায় তাকে ভয় করে না। তাছাড়া ওখানে নানুভাই-এর চর ছড়ানো রয়েছে। একা একা বস্তির ভেতরে ঢোকা বেশ বিপজ্জনক হবে। অতএব নানুভাই-এর মুখোশটার নিচে যে মুখটা রয়েছে তা বীভৎস হতেই হবে। আমি সাহস পাইনি বেশি ঘাঁটানোর। ওখানে যদি আমাকে পুঁতেও রাখতো তাহলে পৃথিবীর কেউ টের পেত না। আমি ভয় পেয়েছিলাম, হয়তো নানুভাই আমার কাছে রিপোর্টারের আইডেন্টিটি কার্ড চাইবে। কিন্তু লোকটার অশিক্ষা এবং রিপোর্টার শব্দটা শোনার পরে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যার জন্যে ওটা ওর মাথায় আসেনি। ওই এলাকায় পুরো স্মাগলিং-চেনটা কন্ট্রোল করে নানুভাই। শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, পাকিস্তান থেকেও এখানে লোক আসছে বলে আমার ধারণা। একবার এলাকায় ঢুকে পড়লে রেশন কার্ড এমন কি ভোটিং রাইট পর্যন্ত পেতে অসুবিধে নেই। এম এল এ, মন্ত্রী হাতের মুঠোয়। তাদের নির্বাচন নানুভাই দেখাশোনা করে। অদ্ভুত জোট। লোকটা দাঙ্গা তৈরি করতে পারে প্রয়োজন হলে। আর পুলিশের সঙ্গে ওর সম্পর্কের চেহারা তো আসবার সময় দেখলাম। সুতরাং আমার মনে হয় আগামী পরশু আমাদের যাওয়া উচিত।'

কল্যাণ চট করে বলে বসল, 'এত তাড়াতাড়ি?'

সুদীপ বলল, 'মানে? এখানে অনন্তকাল বসে থাকতে তোর ভাল লাগছে? আমি তবু মাঝে মাঝে বেরুচ্ছি, তোদের তো দম বন্ধ হবার কথা। পুলিশের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। তাছাড়া এই লোকটাকে মিট করতে খুব ইচ্ছে করছে।'

জয়িতা বলল, 'মিনিস্টারটার কথা ভাব। খবরের কাগজ খুললেই ওর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেখা যাবে। ওর দলের লোকেরাই ওকে বলেছে বেশি কথা না বলতে। অথচ এই লোকটাই—!'

আনন্দ বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দে কিভাবে এগোবো। লোকটা হঠাৎ আমাকে মন্ত্রীর বাড়িতে যেতে বলল। এটা কোন ট্র্যাপ কিনা কে জানে। আমাকে দেখে ওর কোন সন্দেহ হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে মেলাতে পারেনি। পারলে আমাকে ছাড়তো না। ওহো,

উনি আমাদের খেতে ডেকেছেন। আজ ওপরে খাওয়া চলবে না। তোরা রুটি মাংস খেয়ে নে। সুদীপ চল্, নিচে যাই, ওঁকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই রুটি মাংস এনেছিস? ফার্স্ট ক্লাস!'

সুদীপ উঠল, 'বেশ আছিস! আমরা খাচ্ছি নিরামিষ আর তোরা মাংস সাঁটাচ্ছিস! কিছু মাল রেখে দিবি, আমি এসে খাব। চল্ আনন্দ।'

বৃদ্ধা সামনে বসে ওদের খাওয়ালেন। আনন্দর খুব ভাল লাগছিল। মাটিতে বসে খেতে খেতে সে দেখছিল বৃদ্ধা সামনে বসে ওদের সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁর হাতের পাখা মাঝে মাঝে তাদের হাওয়া দিচ্ছিল। দেখলেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কথা মনে আসে। এই শেষ, এই জেনারেশনের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবু শেষ হয়ে যাচ্ছেন। কি ভালই না ছিল সম্পর্কগুলো। বৃদ্ধা কথা বলছিল সুদীপের মায়ের কাজ নিয়ে। কালীঘাটের পুরোহিতকে টাকা ধরে দিলেই সব করে দেবে সে। এখনও হাতে কয়েকটা দিন সময় আছে। বৃদ্ধার আজ মনে হয়েছে, তাঁরও তো কেউ করার নেই। নিজের কাজটা নিজেই করে গেলে কেমন হয়! কি রকম বিষণ্ণ হয়ে গেল পরিবেশটা! এবং তার সঙ্গে মানানসই হল কাপড়ে ওঁর চোখ মোছা। সুদীপ কোন কথা বলছিল না। কিন্তু আনন্দর মনে হল সুদীপটা ভাগ্যবান। নইলে এমন দূরের সম্পর্ক, যাওযা আসা প্রায় নেই যেখানে সেখানে একজন জীবন থেকে প্রায় সরে যাওয়া মানুষের এই রকম আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়াটা কম কথা নয়।

খাওয়া শেষ হয়ে এলে সুদীপ বৃদ্ধাকে উঠে যেতে দেখে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণদের কথা বলব? এই রকমই কথা ছিল্প। কিন্তু হঠাৎ নিজের কাছেই বাধো বাধো ঠেকতে লাগল আনন্দব। এই বিশ্বাস এবং স্নেহ নষ্ট হতে পারত আজ সকালে অবনী তালুকদারের কথা শুনে। কিন্তু হয়নি। এবং এখন ইনি নিজে থেকেই সুদীপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। হঠাৎ যদি জানতে পারেন ওঁরই বাড়ির ছাদেব ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে গোপনে বাস করছে তাহলে চট করেই অবিশ্বাস আসবে। সুদীপ সম্পর্কে তাঁর এই নরম অনুভূতি দূর হবেই এবং আজ অবনী তালুকদারের কথাগুলো সত্যি বলে বোধ হবে। সে ইশাবা করল সুদীপকে কিছু না বলতে।

এই সময় পাশের দরজায় ক্রমাগত শব্দ শুরু হল। বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বারান্দায় এলেন, 'আবার কি জ্বালাতন—,' এই ধরনের কিছু বলে উঠোনে নেমে গলা তুলবেন, 'কে? কি চাই? এত রাত্রে কেন?'

ওপাশ থেকে চাপা গলায় শোনা গেল, 'দিদিমা, তাড়াতাড়ি খুলুন সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধা ছুটে গেলেন। ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ কথাটা কানে আসায ওরা কোনমতে হাত ধুয়ে উঠোনে নামল। বৃদ্ধা পেছনের দরজা খুলতেই একজন মধ্যবয়স্ক রোগা লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'দিদিমা আমাকে বাঁচান। ও—ও মনে হয় বিষ খেয়েছে!'

'কি খেয়েছে? বিষ?' বৃদ্ধা আঁতকে উঠলেন, 'ওমা কি সব্বনেশে কাণ্ড। বিষ খেতে গেল কেন?'

'আমার দোষ! বিশ্বাস করুন, কিন্তু তাতে যে বিষ খাবে ভাবিনি। একটা কথা শুনে বাড়ি ফিরে ওকে খুব বকেছিলাম। তারপর চুপচাপ ছিল। হঠাৎ দেখি কাতরাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করায় বলল ও মরে যেতে চায় বলে বিষ খেয়েছে। আমি এখন কি করি?' লোকটি অসহায় গলায় বলছিল।

'মরেনি তো! তাহলে হাসপাতালে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে দেখছ কি? গাড়ি ডাক!' বৃদ্ধা ধমকালেন।

'আহা আপনি বুঝতে পারছেন না! হাসপাতালে নিয়ে গেলেই পুলিশ কেস হবে। এখন চারপাশে যেরকম গৃহবধূ হত্যার কেস হচ্ছে তাতে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে ওর ভাইরা। ও তো বলবে আমি বকেছি বলে বিষ খেয়েছি।'

লোকটিব অবস্থা সত্যি করুণ। সে এবার আনন্দদের দেখতে পেল। বৃদ্ধা বললেন, 'চল তো, যদি তেমন দেখি তাহলে তো হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে। তোমার পাশের ভাড়াটে জানে?'

'না। তাহলে আজ রাত্রে পৃথিবীর সব লোক জেনে যাবে।' লোকটি বৃদ্ধাকে অনুসরণ করছিল।

বৃদ্ধা দরজার আড়ালে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেঁতুলজল আছে? আর নুন? নিয়ে এস এখনই।'

সুদীপ বলল, 'কেসটা কি, একবার দেখা দরকার।'

আনন্দ আপত্তি করল, 'না। খামোকা জড়াস না। আমাদের অনেক ঝামেলা আছে।'

সুদীপ বলল, 'কে বিষ খেয়েছে বুঝতে পারছিস? পুকুরধারের সেই মেয়েটা, আমার কাছে নিমপাতা চেয়েছিল। এই লোকটা মনে হচ্ছে ওর স্বামী। এমনও তো হতে পারে ও-ই বিষ খাইয়ে এখানে এসে অ্যাক্টিং করছিল! সকালে যাকে দেখেছি সে বিষ খাবে ভাবাই যায় না।'

এই সময় বৃদ্ধা চলে এলেন এপাশে। ওদের দিকে তাকিয়ে থতমত হয়ে গেলেন। তারপর না বলে যেন পারলেন না, 'চোখ উলটে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আমি বলে দিলাম হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ছেলেটার কোন দোষ নেই। নির্দোষীরাই তো মরে।'

হঠাৎ সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রাণ আছে?'

'এখনও আছে মনে হচ্ছে।'

'উনি যদি হাসপাতালে না নিয়ে যান তাহলে তো আরও বিপদ। মারা গেলে ডেথ সার্টিফিকেট লেখার ডাক্তার পাবেন না। যা হয় হোক, ওর উচিত স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া। আমি একবার দেখতে পারি?'

'তুমি! তুমি আবার কি দেখবে? তুমি ডাক্তার নাকি?' বৃদ্ধা উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

'আমি ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম।' সুদীপ তার গলায় আত্মবিশ্বাস বোঝাল। বৃদ্ধা যেন ধন্ধে পড়লেন। মনে হচ্ছিল ওই ঝামেলায় সুদীপ যেন না জড়ায় সেটাই ওঁর কাম্য ছিল। কিন্তু সুদীপের ট্রেনিং-এর খবরটা শোনার পর সরাসরি না বলতে বাধছে।

তিনি মাথা নেড়ে ডাকলেন, 'এসো। দুজনেই এসো।' যেন শুধু সুদীপকে নিয়ে যেতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। দরজার গায়েই সিঁড়ি। দুই ভাড়াটের অস্তিত্ব একটা পার্টিশন তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সামনের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরের অল্প আলোর সামান্যই বাইরে আসছে। বৃদ্ধা দরজাটা খুলতেই ওরা একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলতে দেখল। যুবতী শুয়ে আছে খাটের ওপর। ওর পায়ের কাছে মাথায় হাত রেখে সেই লোকটি কাঁদছে যতটা সম্ভব নিচু গলায়। বৃদ্ধা বললেন, 'কি ঠিক করলে? এরা আমার বাড়িতে এসেছে। খুব ভাল ছেলে। এসবের চিকিৎসা জানে বলল। দ্যাখো তো বাপু, কিছু করতে পার কিনা। না পারলে খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন দরকার নেই।'

সুদীপ এগিয়ে গেল বিছানার পাশে। পড়ে থাকা হাতটা তুলে পালস্ দেখল। জীবনের চিহ্ন রয়েছে এবং সামান্য দ্রুত ছাড়া কোন অস্বাভাবিকতা নেই। বিষ খেলে কারও দাঁত লেগে যায় বলে সে জানতো না। কিন্তু মহিলার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা প্রায় শেষের দিকে। অথচ নাড়ি তার বিপরীত কথা বলছে। সে লোকটিকে বলল, 'বমি করানো যায় এমন কিছু আনুন।'

'বমি? কি খেলে বমি করে?' অত্যন্ত নির্বোধের মত প্রশ্নটা করল লোকটা। ঠিক কাকে করল তা সে নিজেই জানে না। বৃদ্ধা বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আনন্দ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আলোর পেছনে। সে লক্ষ করছিল মহিলার সঙ্গে স্বামীর বয়সের পার্থক্যটা অনেক। সেদিন দোতলার জানলা থেকে ভাল করে নজরে পড়েনি, আজ স্পষ্ট হচ্ছে, এই মহিলার শরীরে ঈশ্বর বাড়াবাড়ি রকমের যৌবন দিয়েছেন। জয়িতা কল্যাণ একে দেখলে সুদীপকে আর একটু বেশি ঠাট্টা সহ্য করতে হত। সুদীপ মহিলার পায়ের তলায় হাত বোলাতে প্রতিক্রিয়া হল। পা নড়ে উঠে স্থান পরিবর্তন করল। সে উঠে চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না। বিষের লক্ষণ বিশেষ নেই।'

আনন্দ বলল, 'তুই ডাক্তার নস, এই সব ঝামেলায় না জড়ালেই ভাল করতিস।'

এই সময় লোকটি ফিরে এল একটা বড় পাত্র নিয়ে, 'দিদিমা বললেন এটা খাওয়াতে।'

সুদীপ বলল, 'আপনি খাওয়ান।'

লোকটিকে খুব নার্ভাস দেখাল, 'না না, আমি পারব না। আপনি চেষ্টা করুন, প্লিজ। আমার মাথায় কিছু আসছে না। কি যে করি ছাই।'

পাত্রটা হাতে নিয়ে সুদীপ হুকুম করল, 'বালতি আনুন। বমি হলে ফেলবে কোথায়?'

লোকটি আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার সুদীপ মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কিছুই হয়নি। কিন্তু ওইভাবে পড়ে থাকলে এই তরল পদার্থটি গিলে বমি করতে হবে। ভেবে দেখুন কি করবেন? বেশি সময় নেই।'

আনন্দ অবাক হয়ে দেখল পলকের জন্যেই মহিলার দুটো চোখের পাতা খুলে গেল। অদ্ভুত একটা শিরশিরে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। তারপর মায়াবী গলায় বলল, 'আমি ওকে ভয় দেখাতে চাই যাতে জীবনে আর গায়ে হাত না তোলে। ওটা গেলাবেন না, দোহাই!'

পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই চোখ বন্ধ করল যুবতী। লোকটি একটা বালতি হাতে নিয়ে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রাখব? মাথার পাশে রাখি? কিভাবে খাওয়াবেন? শুয়ে শুয়ে কি গিলতে পারবে?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। মনে হচ্ছে ওর আর খাওয়ার দরকার হবে না। বিষটা মনে হচ্ছে বুকের নিচে নামেনি। যেমন শুয়ে আছে তেমন শুয়ে থাকতে দিন।'

'বিপদ হবে না? মারা যাবে না?' লোকটি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা।

'কেন? মারা গেলে কি আপনি খুশি হতেন?' সুদীপ আনন্দকে ইশারা করে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'না না। আমি ওকে প্রচণ্ড ভালবাসি, কিন্তু ঠিক যত্ন করতে পারি না। আপনি বলছেন কোন বিপদ নেই! আঃ বাঁচালেন। তাহলে এইটে ফেলে দিই?' লোকটি তরল পদার্থটি দেখাল।

'আপনার যা খুশি।'

ওরা এপারে এসে দরজা বন্ধ করতেই দেখল বৃদ্ধা চুপচাপ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে এই পাশে তাকিয়ে আছেন। কেমন ভৌতিক মনে হল আনন্দর। মুখোমুখি হওয়ামাত্র বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'কেমন দেখলে? কি বুঝলে?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ওর কিছুই হয়নি। স্বামীকে জব্দ করার জন্যে বিষ খাওয়ার ভান করছেন। তবে আজ রাত্রে একথা স্বামীকে না বলাই ভাল হবে।'

ধীরে ধীরে বৃদ্ধার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটল। তিনি হাত বাড়িয়ে সুদীপের চিবুক ছুঁয়ে ঠোঁটে আঙুল স্পর্শ করলেন, 'জিতে গেলে বাবা! ও যে বিষ খায়নি তা আমি দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন যেতে চাইলে তখন ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি। না, অবনী খামোকা মিথ্যে দোষ দিয়ে গেল, তুমি সত্যি খাঁটি ছেলে।' বৃদ্ধা আর দাঁড়ালেন না। সেই নির্জন জ্যোৎস্নায় প্লাবিত উঠোনে দাঁড়িয়ে সে আনন্দর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই তাকে ঝাপসা দেখতে পেল। কেন যে ঈশ্বর মানুষের শরীরে এত জল দেন?

মোমবাতির আলোয় উপুড় হয়ে শুয়ে আনন্দ নোট করছিল। ওর সামনে ম্যাপটা খোলা। ম্যাপের একটা অঞ্চল ও দাগিয়ে রেখেছে গোল করে। উত্তর বাংলার শেষ প্রান্তে একদিকে সিকিম, ভুটান আর নেপালের জঙ্গলগুলো ছাড়িয়ে ও পর পর কয়েকটা জায়গার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। ট্রেন বা বাসে ওখানে পৌঁছাতে নিউ জলপাইগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। অথবা শিলিগুড়ি। মুশকিল হল, এইটেই তার পছন্দ হচ্ছে না। সে দার্জিলিং গিয়েছে। সুদীপ এবং জয়িতাও ছেলেবেলায় ওদিকে গিয়েছে। কিন্তু কেউ বাংলার বাইরে পা দেয়নি। চারজনে একসঙ্গে রওনা হলে আর পৌঁছাতে হবে না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ বাগডোগরা পর্যন্ত যায়। সেখান থেকেও ম্যাপের জায়গাটায় পৌঁছাতে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। ওই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারলে আর যাই হোক পুলিশের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না সব সময়। কিন্তু বাস বা জিপ যে পর্যন্ত যায় সেই পর্যন্ত গিয়ে তারপর হাঁটতে হবে। কল্যাণ কি হাঁটতে পারবে? ওর হাত সারতে এখনও অনেক দেরি আছে। কিন্তু কলকাতায় আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। সুদীপ হঠাৎ উপুড় হল। ম্যাপের গোল দাগানো জায়গাটায় নজর রাখল। তারপর বলল, 'কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া দরকার তার একটা লিস্ট বানানো দরকার।'

'বল্ তো!' আনন্দ ওর দিকে তাকাল।

'ওষুধ। সাপে যদি কামড়ায় তার জন্যে। বিষ ব্যাপারটা মাথায় আসার পর থেকেই মনে হচ্ছে। লেখ, পেট খারাপ হলে কম থেকে হাইডোজের সব রকমের ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল। প্রত্যেকটা একশ করে। উলটোদিকে কিছুটা জোলাপ এবং হজমের ট্যাবলেট। জ্বরের ওষুধ। সব রকমের। পোড়া এবং কাটার জন্যে ওষুধ মলম। ঠাণ্ডা লাগলে যা দরকার তাই। বেশ কিছু অ্যান্টিসেপটিক। ট্যাডভ্যাক ইন্‌জেকশন। মাথা ধরার ওষুধ। ব্যান্ডেজ। স্কিন ডিজিজের ওষুধ। বরফে ঘা হলে তার জন্যে যা দরকার। বুকের ব্যথার ওষুধ। রক্ত বন্ধ হবার ইন্‌জেকশন। চোখ কান দাঁত-এর লোশন ট্যাবলেট। সব রকম অ্যান্টিবায়োটিক। অর্থাৎ একটা মিনি ডিসপেন্সারি। হাসিস না, এটা খুব কাজে লাগবে। আমরা যদি

জনমানবশূন্য জায়গায় পৌঁছাই তাহলে এগুলোই বাঁচাবে।'

'যদি অবশ্য ওষুধের ডেটগুলো পার না হয়ে যায়। আর?'

'প্রত্যেকের দু'সেট শক্ত জুতো। শক্ত কিন্তু হালকা। চামড়ার না হলে ভাল হয়। জিনসের প্যান্ট প্রত্যেকের অন্তত ছটা করে। জিনসের জ্যাকেট। গরম ওভারকোট। ওয়াটার প্রুফ। গ্লাভস।'

'এসব নিয়ে হাঁটতে পারবি?'

'পারতে হবে। কাল তোতে আমাতে সারাদিন এইসব কেনাকাটি করব। একই দোকানে একসঙ্গে এত মাল চাইলে সন্দেহ করতে পারে। তাই সময় লাগবে। পরশুদিন আমরা ওই নানুভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে মন্ত্রীর বাড়িতে যাচ্ছি?'

'নানুভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে নয়, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাই উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই যাচ্ছি। উই নিড হিম। কিন্তু যাব তুই আর আমি। তুই যাবি আমার সঙ্গে ক্যামেরাম্যান সেজে। একটা ফালতু ক্যামেরা আজ ব্যবস্থা করতে হবে। কল্যাণের বের হবার দরকার নেই।'

'কিন্তু বাইরের গাড়িতে কেউ থাকবে না আমাদের কভার করতে?'

'জয়িতা থাকবে। সন্ধ্যের পর ওকে আর মেয়ে বলে বোঝা যাবে না। কিন্তু এবার তুই গাড়ি পাবি কোথায়? ট্যাকসিতে যেতে মন চাইছে না।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। কিন্তু পরশুর অপারেশন যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমরা রওনা হচ্ছি কবে?'

'পরশুই এই আস্তানা ছাড়তে হবে আমাদের। আমি আর তুই বাই রোড বেরিয়ে যাব। আর জয়িতা কল্যাণ পরের দিন ফ্লাইট ধরবে এয়ারপোর্টের থেকে।' আনন্দ জানাতেই কল্যাণের গলা ভেঙে এল, 'অপারেশনের সময় আমাকে বাদ দেওয়া চলবে না। আমার একটা হাত এখনও ঠিক আছে। এত আন্ডারএস্টিমেট করছিস কেন?'

॥ ২৪ ॥

ঘুম থেকে উঠে সুদীপ বেরিয়ে গিয়েছিল। চোখ খোলামাত্র খবরের কাগজগুলো ওকে টানছিল। শত্রুপক্ষ কি ভাবছে, পাবলিকের কি রিঅ্যাকশন; এই ছাদের ঘরে বসে জানা যায় না। যদিও সে বাইরে বের হচ্ছে, তবু গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে সাহস হয় না। তার ছবি দেখে যদিও কেউ চিনতে পারবে না তবু বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে। সে যখন বেরিয়েছিল তখন বন্ধুরা ঘুমিয়ে। হঠাৎ নিজেদের খুব অ্যামেচার বলে মনে হয়েছিল ওর। পুলিশ যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা এমন পাহারা না রেখে মড়ার মত ঘুমায় না। কিন্তু অ্যামেচারিশ বলেই মনের মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। তারা নিজেদের জন্যে কিছু করছে না, এমন কি মানুষ খুনও। কল্যাণের হাত নিশ্চয়ই সেট হতে চলেছে, নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে ও। আনন্দ বেশি রাত জেগেছিল, এখন হুঁস নেই। আর জয়িতা? দরজায় দাঁড়িয়ে জয়িতার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত অসাড় হয়ে ছিল সুদীপ। পরনে প্যান্ট আর শার্ট থাকা সত্ত্বেও শোওয়ার ভঙ্গি বদল হওয়ায় শরীর থেকে এক ধরনের মেয়েলি আভা বেরিয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষ অকপট হয়ে যায়। তাই আনন্দ কল্যাণকে কি সরল বালক এবং জয়িতাকে রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। সুদীপ এগিয়ে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা চাদরটা জয়িতার শরীরে ছড়িয়ে দিতেই সে একটি সরল বালক হয়ে গেল। ছাদে পা দিতে দিতে সুদীপের মনে হল ঘুমন্ত অবস্থায় তার নিজের মুখ কেমন দেখায় তা সে কোনদিন দেখতে পাবে না। জয়িতাকে বলতে হবে তার ঘুমন্ত মুখ লক্ষ্য করে যেন তার কাছে বর্ণনা করে। ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করল না বলেই সে যাওয়ার সময় বন্ধুদের ডাকেনি।

গলির মধ্যে ভোরবেলায় কারও কৌতূহল নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সময়টাতেই বোধ হয় পৃথিবীর মানুষেরা অত্যন্ত শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ থাকে। ভোরবেলাতেই কেউ কারও দিকে সন্দেহের চোখে তাকায় না। অতএব খুব সহজ মনে হেঁটে মোড়ের মাথায় এল সুদীপ। এবং তখনই লোকটিকে দেখতে

পেল। একটা ফুটের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গেলাস হাতে। তাকে দেখে একটু বিব্রত হলেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'চা খাবেন? ভাল করে ও।'

মাথা নাড়ল সুদীপ। এই সময় চা তো অমৃত। সে আশেপাশে কোন খবরের কাগজের হকারকে দেখতে পেল না। এখনও কাগজ এদিকে আসেনি বোধ হয়। লোকটি সুদীপকে বললেন, 'আপনি আমাকে কাল বাঁচিয়েছেন। চিন্তায় আমার—!'

'কেমন আছেন উনি? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?' সুদীপ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'ঘুম! ঘুম কি মশাই, খেয়ে দেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এত ঘুম। আপনি যে ক্যাপসুলটা দিয়েছিলেন ওর মুখে গুঁজে সেটা কি আপনার পকেটেই ছিল? ডেঞ্জারাস লোক তো। কখন কাকে দিতে হবে জানেন না তবু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান! মাঝরাতে চোখ মেলে বলল খিদে পেয়েছে। শরীরে অবশ্য বল ছিল না। আমিই খাইয়ে দিলাম। তখনই দু'তিনটে কথা বলল। আপনি ওর মুখে ক্যাপসুল গুঁজে দিয়েছেন বলল। তাই খেয়ে নাকি বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করলাম না কথাটা। অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর যখন বুঝলাম শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক তখন চোখ বন্ধ করলাম। ভাবুন তো, হাসপাতালে এই কেস নিয়ে গেলে কি হুজ্জোত হত। ছেলে পড়িয়ে খাই, আমার কি আর খাবার জুটত!' লোকটি যখন কথা বলছিল তখন সুদীপ তাকিয়ে ছিল। সত্যি সরল মানুষ। বউ যা বোঝান তাই বোঝেন। নইলে ক্যাপসুলের গল্প বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। অথচ লোকটিকে নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে না।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সুদীপ কোন কথা না বলে চুমুক দিল। যুবতীর উদ্দেশ্য কি? স্বামীর কাছে চটপট মিথ্যে কথা বলার কি কারণ থাকতে পারে? এর পরে লোকটি তার প্রচণ্ড রাগ হলেও যুবতীকে কোন কটু কথা বলতে সাহস পাবে না। এইটেই হয়তো কাম্য ছিল যুবতীর। কিন্তু যদি উলটো হত, যদি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত তাহলে তো ডাক্তাররা বলেই দিত সত্যি কথাটা। এ রকম ঝুঁকি নিল কেন যুবতী? সে লোকটিকে বলল, 'সাততাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়েছেন।'

'আমি তো রোজই এই সময় এখানে আসি চা খেতে। ফার্স্ট কাপ টি। ওর তো চা তৈরি করতে করতে সাতটা বেজে যায়। আজ ভাবছি আমিই এখান থেকে চা নিয়ে যাই, কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই!' লোকটির ওপর রাগ করা যাচ্ছে না কিন্তু মোটেই খুশী হচ্ছিল না সুদীপ। একজন মাস্টারমশাই এত কালাস হন কি করে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

'দিন কি বলছেন? পাঁচ বছর!'

'ছেলেমেয়ে হয়নি, না?'

লোকটির মুখ অন্য রকম হয়ে গেল। সেটাকে কাটাতেই বোধ হয় চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, 'কপাল! অনেক ট্রিটমেন্ট করালাম। সবার তো সব হয় না, আমারও হল না। যাক, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আসুন না আমার ওখানে। ও খুব খুশী হবে। কালই বলছিল, দিদিমার বাড়িতে লোক এসেছে। ওখানে যে কেউ থাকবে তা কখনও ভাবিনি। আপনারা দুই বন্ধুতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

কথাটা বলেই সুদীপ দেখল কাগজ নিয়ে হকার আসছে। সে চা শেষ করে দাম দিতে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটা সরবে প্রতিবাদ জানাল, 'ছি ছি ছি! আপনি রাখুন। গরীব মাস্টার হতে পারি, তাই বলে একটু চা খাওয়াতে পারব না ভাবলেন কি করে!'

সুদীপ যুক্তিটা কাটাতে পারত কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে সে এগিয়ে গিয়ে কাগজ কিনল। চারটে কাগজ। খুচরো ফেরত নেবার সময় একটা কাগজের প্রথম পাতায় নজর পড়তেই ওর মেরুদণ্ডে যেন শীতল বাতাস লাগল।

এই সময় লোকটি ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ ওর গলা শুনতে পেল, 'কি আরম্ভ হল বলুন তো! দেশটা পাঞ্জাব হয়ে গেল নাকি! দুটো খুন। যাক, একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। নকশালরা তাহলে এখনও অ্যাকটিভ, কি বলেন?'

সুদীপ ওর দিকে তাকাল, 'নকশালরা এসব করছে তা আপনাকে কে বলল?'

লোকটি বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে বলল, 'ওরাই তো এসব করে। কি লাভ হয় কে জানে!'

সুদীপ অনেক কষ্টে তর্ক করার লোভ সংবরণ করল। তারপর বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছেন? বাড়িতে? চলুন, আমিও তো ফিরবো।' লোকটি ওর সঙ্গ নিল।

'আপনি চা নিয়ে যাবেন বলছিলেন না?'

'চা! ও হ্যাঁ। কিন্তু এখন নিয়ে গেলে জল হয়ে যাবে। আবার আসতে হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওই যারা প্যারাডাইস পুড়িয়েছে, বড়বাজারে খুন করেছে তারা নকশাল হোক বা না হোক আমি কিন্তু সমর্থন করি না। আমার স্কুলের অনেক মাস্টার অবশ্য ওদের সমর্থন করছে, কিন্তু এই আইন নিজের হাতে নেওয়া ব্যাপারটা খুব খারাপ। তাহলে দেশটাই পাঞ্জাব হয়ে যাবে। রোজ খুন, রোজ লুঠপাট, ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকবে না। পাবলিক তো তা বোঝে না, এই সব দেখলেই তেতে ওঠে।' খুব বিরক্ত গলায় কথা বলতে বলতে পাশে হাঁটছিল লোকটি। সুদীপ এবারেও কিছু বলল না। তার ভয় হচ্ছিল, সে যদি কথা বলতে শুরু করে তাহলে লোকটির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে না। এবং এই সময় খামোকা একজনকে শত্রু বানিয়ে কোন লাভ নেই।

লোকটি বলল, 'আমি আমাদের ইংরেজি মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম এটা সম্ভব নয়। এই দেশে কেউ খুন করে, প্যানিক তৈরি করে জিতে যেতে পারে না। ধরা এদের পড়তেই হবে। চারজন ছেলেমেয়ে কোন রকম ট্রেনিং ছাড়াই এত বড় একটা অর্গানাইজড সরকারী শক্তিকে কত দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে? তাই তো হল! ধরা একজন পড়ল ওদের! এবার কান টানলেই মাথা আসবে। বাকি তিনজনের ধরা পড়তে বেশি দেরি হবে না। আপনি কি বলেন?' খুশী মনে প্রশ্ন করলেন লোকটি।

'একজন ধরা পড়লে তো সবাই ধরা পড়বে।' সুদীপ বিরস গলায় উত্তর দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। লোকটি বললেন, 'তাহলে এখন আসি। একটু বেলায় চলে আসুন। গল্প করা যাবে।'

উঠোনের দরজা খোলাই ছিল। এটা স্বাভাবিক নয়। তারপর নজরে এল বৃদ্ধা উঠোনে বসে আছেন চাদর গায়ে দিয়ে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই সুস্থ নন। সুদীপ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে আপনার? এভাবে বসে আছেন কেন?'

'জ্বর। কাল রাতেই চেপে ধরেছে। আমার তো ম্যালেরিয়া আছে, মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে। ও কিছু নয়। আমি ভাবছি তোমাদের ভাত রাঁধব কি করে?' বুড়ির শরীর কাঁপছিল।

'আমাদের জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। কোন ওষুধ খেয়েছেন?'

'ওষুধ লাগবে না। একবেলা শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে আর কোন্ যমে নেবে?'

'ঠিক আছে, আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি একটু পরে। আপনাকে আজ কিছু করতে হবে না। কি কি অসুবিধে হচ্ছে বলুন।' সুদীপ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার কপাল স্পর্শ করে দেখল জ্বর বেশ।

'আর মায়া বাড়িও না তো। ওষুধ আমার লাগবে না। দরজাটা বন্ধ করে দিও।' কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা যখন মোড়াটা নিয়ে উঠে বারান্দার দিকে এগোচ্ছেন তখন চকিতে ওঁর চোখ ওপচানো জল দেখতে পেল সে। সুদীপ আবিষ্কার করল ওর বুকের ভেতরটা টনটন করছে।

দরজা বন্ধ করে ওপরে এসে দেখল বন্ধুরা উঠে পড়েছে। জয়িতা চা করছিল। ওকে দেখামাত্র বলল, 'তুই নিশ্চয়ই এক সকালে দুবার চা খাবি না?'

আনন্দ ওকে বকল, 'আজ কিন্তু তুই প্রথমে ওর পেছনে লাগছিস! কাগজ দে।'

সুদীপ দুটো কাগজ আনন্দর দিকে ছুঁড়ে বসে পড়ল। তারপর হেডলাইনে নজর রেখে নিজের মনে উচ্চারণ করল, 'ডেঞ্জারাস! এ কি ব্যাপার?'

'হেস্টিংসের ঘোড়ার আস্তাবলে অগ্নিকাণ্ড। আটটি ঘোড়া মৃত, দুজন খুন, একজন ধৃত।' নিজের কাগজে চোখ রাখতেই আনন্দও সোজা হয়ে বসেছিল। ওরা চারজন এখন কাগজগুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। গতরাত্রে কলকাতা রেসকোর্সে যে সব ঘোড়া দৌড়ায় তাদের আস্তানায় চারজনের দুর্বৃত্ত দল হানা দেয়। বেপরোয়াভাবে বোমা মেরে তারা প্রহরীদের ভীত করে তোলে। বোমার আঘাতে দুজন প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায়। আক্রমণকারীরা তারপর আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অসহায় জীবগুলো সেই আগুনে আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগ পায়নি। আটটি ঘোড়া জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। চারটি এত পুড়েছে যে তারা আর কোনদিন দৌড়াতে পারবে না বলে রেসকোর্সের ডাক্তার জানিয়েছেন। এদের

জীবনহানির সম্ভাবনা যায়নি। মধ্যরাত্রেব কিছু পরে এই নৃশংস কাজ শুরু হয়। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় চারজন ছিল। পালাবার সময় ওদের একজন ধরা পড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার পর হুমকি দেওয়া হয়েছিল রেসকোর্স আক্রমণ করা হবে। সেই হুমকির ফলে রেসুড়েরা গতকাল রেসকোর্সে ঢুকতে সাহস না করায় কর্তৃপক্ষ রেস বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মধ্যরাত্রে এই ধরনের আক্রমণের কথা কেউ কল্পনা করেনি। যে বারোটি ঘোড়া মৃত এবং অকেজো হয়ে গেল তাদের ক্রয়মূল্য ছিল আঠারো লক্ষ টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। আক্রমণকারীরা যে সাধারণ ডাকাত নয় বা তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই কাজ করেনি তা পরিষ্কার। মধ্যরাত্রে পুলিশ কমিশনার জানান, যে আক্রমণকারীকে ধরা হয়েছে তার বয়স একুশ। সংঘর্ষে আহত হওয়ায় তাকে এখন হাসপাতালে রাখা হয়েছে। জ্ঞান ফিরলেই জেবা শুরু হবে। এবং তাহলে ওর দলের অন্যান্যদের ধরা অসম্ভব হবে না। তিনি বলেন, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের বিপ্লবীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

এর পরে কাগজগুলো বিশদ বিবরণ দিয়েছে কিভাবে ঘটনাটা ঘটে। তার পাশেই বক্স করে ওরা সুদীপের টেলিফোনের খবরটাও ছেপেছে। তারপর সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু টেলিফোন যিনি করেছিলেন তিনি জানাননি যে আর কিছুক্ষণ পরে যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতে জনসাধারণের সমর্থন পাবেই না বরং কতগুলো নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে তারা নিছক খুনী বলেই প্রতিভাত হবে।

কল্যাণ বলল, 'এটা কি ব্যাপার? আমি তো মাথামুণ্ডু বুঝতেই পারছি না।'

আনন্দ ঠোঁট কামড়ে বসেছিল। জয়িতা বলল, 'ওই চারজনের মধ্যে কোন মেয়ে আছে কিনা তা লেখেনি! একজন ধরা পড়েছে। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে।'

সুদীপ বলল, 'বুঝতেই পারছি ওই চারজন আমাদের কাজ দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে এই কাণ্ডটা করল। একবারও ভেবে দেখল না এটা আমাদের কিরকম বিপক্ষে যাবে। অবলা জানোয়ার পুড়িয়ে মারল ওরা, পুরো পাবলিক সিমপ্যাথি নষ্ট হয়ে গেল! কিন্তু এই চারজন যে খুব বিক্ষিপ্ত কোন ছেলেব দল তা মনে হচ্ছে না। উগ্রপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোন দল এটা করিয়েছে। যেভাবে মূর্তি ভাঙত, পুলিশ মারত, ঠিক সেইভাবে ঘোড়া পোড়াল। ইডিয়ট!'

আনন্দ কিছু বলছিল না। একটা চিন্তা ওর মাথায় কেবলই পাক খাচ্ছিল। কোন দল বা স্বার্থ আছে এমন কেউ বা কারা তাদের সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এমন কাণ্ডটা করালো না তো! এই ঘটনার পরে যাতে সারা দেশে ওই প্রতিবাদ ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু দুটো লোক খুন হয়েছে, যে ধরা পড়েছে তার তো মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। ফলে আদালতে সে সত্যি কথা বলবেই। সে ক্ষেত্রে নিয়োগকাবীদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। তারা কখনই চাইবে না ছেলেটা মুখ খুলুক। এখন যদি ওর জ্ঞান না ফেরাব ব্যবস্থা করতে পারে ওরা! আনন্দ প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে আবার কাগজে চোখ বোলাল। বড়বাজারের ঘটনাটার পরিপ্রেক্ষিতে মোহনলালের সম্পর্কে আরও তথ্য বেরিয়েছে। সে যে শুধু জাল ওষুধের কারবার করত তাই নয়, অনেকরকম দু'নম্বরী ব্যবসা ছিল তার প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে। প্রথম পাতাটা জুড়েই তাদের খবর। পুলিশ একে কিছুতেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে চাইছে না। অস্থিরমতি কিছু বিপথগামী ছেলেদের কীর্তি এটা। পুলিশের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে কিছু রাজনৈতিক দল। একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, 'বিপ্লবের কোন সংজ্ঞায় এরা পড়ে না। জনসাধারণের সামনে বিপ্লবের নামে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কায়েমীস্বার্থরক্ষাকারীরা এদের নিয়োগ করেছেন।' কয়েকটি উগ্রমতাবলম্বী দল স্পষ্ট বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করেছে এই বলে যে তাদের সঙ্গে এই কাজের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পুলিশ যদি আজ সকালে সন্তুষ্ট হয়, যে চারজন আগের কাজ দুটো করেছে তাদের একজনকে যখন ধরা সম্ভব হল তখন বাকি তিনজনও ধরা পড়বে সেই সন্তুষ্টি দূর হতে বেশি সময় লাগবে না। ছেলেটির পরিচয় জানামাত্র পুলিশ বুঝবে আনন্দ কল্যাণ এবং সুদীপের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। ওদের সঙ্গে কোন মেয়ে নেই এটাও ওরা জানতে পারবে। তবে এটা ঠিক, এতে পুলিশের সমস্যা বাড়বে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই চুপচাপ যে!'

আনন্দ হাসল অনেকক্ষণ পরে, 'কি বলব! এরকম হোক আমি চাইনি। যদি কোন সাধারণ ছেলের দল কাজটা করে থাকে তাহলে বলব ভুল করেছে। আটটা ঘোড়াকে না পুড়িয়ে আটজন অসৎ ব্যবসায়ী

কিংবা ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতাকে পুড়িয়ে মারলে মনে করতাম আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। আর এরা ধরা পড়লেই পুলিশ জানবে আমরা কাজটা করিনি। সেটা যদি প্রেস জানতে পারে তাহলে পাবলিক জানবে। আমাদের তরফ থেকে আজ আবার প্রেসকে জানাতে হবে এই ব্যাপারটা সমর্থন করি না আমরা। যারা আমাদের কাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে উদ্যোগ নেবে তারা যেন প্রতিটি পরিকল্পনা হাতে নেবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নেয় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কাগজগুলো যদি এই বিবৃতি ছাপে তাহলে আর জনসাধারণ আমাদের ভুল বুঝবে না। চা দে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

কল্যাণ বলল, 'আগেভাগে প্রেসকে জানালে বোকামি হবে না? পুলিশ ভাবছে কাজটা আমরাই করেছি। ছেলে তিনটে ধরা পড়লে আমাদের ওপর থেকে পুলিশের নজর সরে যাবে। অথচ আগেভাগে জানালে আমরা এই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে পারব না, তাই না?'

আনন্দ আবার হাসল, 'এরকম হলে আমিও খুশী হতাম। কিন্তু যে ছেলেটি ধরা পড়েছে তার পরিচয় জানার পর পুলিশের বুঝতে অসুবিধে হবে না আমরা আলাদা। আমরা তাই বেশিক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ পাচ্ছি না কল্যাণ।'

সকাল নটা নাগাদ যে বাংলা খবর হয় সেটাতে নতুন কোন তথ্য জানা গেল না। ধরা পড়ার পর আস্তাবলের লোকজন ছেলেটিকে এমন মারধোর করেছে যে এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। সামান্যতম সুযোগেই পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যে ট্যাকসি করে ওরা এসেছিল সেটিকে সল্ট লেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সেখানে অনেকের হাতের ছাপ পেয়েছে। এই হাতের ছাপের সঙ্গে পূর্ববর্তী দুটি ঘটনার জন্যে দায়ী সন্দেহভাজনদের হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

আনন্দ বলল, 'এই ঘটনাটার কথা আমরা ভুলে যাব অথবা উপেক্ষা করব। আগামীকাল সন্ধ্যেবেলায় কলকাতায় আপাতত তৃতীয় অ্যাকশনটি করব। আগের দুটি ঘটনায় আমরা দুটো প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছি। এবারে আমাদের লক্ষ্য ব্যক্তি। এমন একটি ব্যক্তি যিনি জনদরদী সেজে জনসাধারণের সর্বনাশ করছেন। ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও ভারতবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন ভোটে জেতার জন্যে। পার্টি তাকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছে যাতে তিনি পার্টির স্বার্থ বজায় রাখেন। এই লোকটি নিজের ব্যাঙ্কের জমানো টাকার পরিমাণ বেআইনী পথে শুধু বাড়াচ্ছেন না, একটি বিশাল এলাকায় তিনি স্মাগলারদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সাহায্য করছেন। তোরা কি সবাই একমত এই ব্যক্তিটির পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই সেই ব্যাপারে?'

সুদীপ বলল, 'এত ভূমিকা করার কোন দরকার নেই। এই মন্ত্রী যিনি ষড়যন্ত্রী তার বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাচ্ছি। আগামী সন্ধ্যায় ভাসান দিয়ে আসব।'

কল্যাণ বলল, 'এই ব্যক্তিহত্যায় কোন পাপ নেই।'

জয়িতা খিঁচিয়ে উঠল, 'পাপ! ওসব ফালতু কথা বলিস না। পাপ পুণ্য বলে কোন কথা নেই। আসল ব্যাপার হল ভাল এবং মন্দ। শুধু মন্ত্রী নয় ওই নানুভাইটাকেও সরাতে হবে। কারণ মন্ত্রীকে মারলে নানুভাই আর একটা লোককে মন্ত্রী বানিয়ে দিতে দেরি করবে না। শেকড় না ওপড়ালে অ্যাকশনটা করার কোন মানে হয় না। কি ভাবে করবি প্ল্যান করেছিস?'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আজকে একবার মন্ত্রীর বাড়িটা দেখতে যাব। এই সব জনতার সেবক বাড়িতে বেশি পুলিশ প্রটেকশন রাখবে। তাছাড়া নানুভাই এলে তার সঙ্গীরাও থাকবে। অতএব যা করতে হবে খুব ভেবেচিন্তে করতে হবে। আমি রিপোর্টার হয়ে যাব, সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা নিয়ে সুদীপ।'

আনন্দকে বাধা দিল জয়িতা, 'ক্যামেরা নিয়ে তোর সঙ্গে আমিও ভেতরে যেতে পারি।'

'পারিস কিন্তু এক্ষেত্রে নয়। কলকাতার কোন কাগজের মহিলা ক্যামেরাম্যান নেই।'

সুদীপ হেসে বলল, 'মহিলা ক্যামেরাম্যান?' কানে লাগলেও চালাতে পারিস শব্দটাকে।'

'নেই বলে হবে না কেন? এককালে তো খবরের কাগজে মেয়েদের চাকরিই দেওয়া হত না। এখন সাব এডিটিং তো অবশ্যই, বিজ্ঞাপন এমন কি সম্পাদনার কাজেও বড় কাগজগুলো মেয়েদের চাকরি দিচ্ছে। অতএব ক্যামেরা নিয়ে যেতে দোষ কি?' জয়িতা প্রতিবাদ জানাল।

'দোষ আছে আমি বলিনি। যতদিন না চোখ-সওয়া হচ্ছে ততদিন আমাদের পক্ষে এই কাজটা তোকে দিয়ে করানো ঝুঁকি হয়ে যাবে। যাক, আজ আমরা বের হব। আমি আর সুদীপ। তোদের আগেও বলেছিলাম, মাঝে হয়তো কিছুদিনের জন্যে কলকাতা থেকে আমাদের দূরে চলে যেতে হতে পারে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটবে ভাবিনি। ভারতবর্ষের কোন জায়গায় আমাদের চারজনের পক্ষে লুকিয়ে থাকা নিরাপদ হবে না। আমরা যাব ভুটান বা নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে একটা পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে যোগাযোগের কোন সুবিধে নেই। কিছুদিন সেখানে থেকে যখন এদিকে আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার ইচ্ছেয় ঢিলে পড়বে তখন আবার ফিরে আসা যাবে। তাছাড়া এই সময়টুকুতে দেশের লোকের কি প্রতিক্রিয়া হল তাও জানতে পারব আমরা। কাল রাত্রে অ্যাকশনের পরই আমরা বেরিয়ে যাব। মালপত্র নিয়ে আমরা যাব বাই রোড এবং বাই ট্রেন। কল্যাণ আর জয়িতা যাবি বাই প্লেন। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে প্লেনে কলকাতা ছাড়াই নিরাপদ। ওরা মনে করতে পারবে না বাঙালিরা প্লেনে পালাতে পারে।'

জয়িতা বলল, 'প্লেনে কোথায় যাব?'

'সেসব ডিটেলস আজ রাত্রে আলোচনা করব। তার আগে সারাদিন কিছু কেনাকাটা আছে। শীতপ্রধান অঞ্চলে যাতে বেশ কিছুদিন থাকা যায় সেই রকম ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। সুদীপ বলছে বুড়ির জ্বর হয়েছে। অতএব আজ দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে না নিচ থেকে। তোরা এখানে যা আছে তাই খেয়ে নে, ফেরার সময় আমি খাবার কিনে নিয়ে আসব। আজ অন্তত তোরা সেফ, বুড়ি হঠাৎ ওপরে উঠে আসবে না। সুদীপ, আমি আগে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার লিস্টটা সঙ্গে থাকল। যত তাড়াতাড়ি পারিস ফিরে আসিস।' গতরাত্রেই টাকা আর লিস্ট দুজনে ভাগ করে নিয়েছিল।

জয়িতা বলল, 'চুপচাপ এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না আনন্দ।'

'বুঝতে পারছি। আর একটা দিন। তারপর যে ছোটা শুরু হবে তখন বলবি আর ছুটতে পারছি না আনন্দ, এবার চুপচাপ বসতে চাই। আমি আসছি তাহলে। সুদীপ তুই একটু পরে বের হবি। নিচে আয় দরজাটা বন্ধ করে দে।' আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে সুদীপ তাকে অনুসরণ করল।

আজ দিনটা বেশ মেঘলা। নিচে নেমে আনন্দ একবার বৃদ্ধার বারান্দার দিকে তাকাল। ঘরের দরজা আধাভেজানো। সে ইশারা করতে সুদীপ ওর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। খাটের ওপর বৃদ্ধা কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। সুদীপ কাছে গিয়ে ডাকল, 'কেমন লাগছে এখন?'

বৃদ্ধা চোখ মেললেন। তারপর কোনমতে উচ্চারণ করলেন, 'জ-ল। জল দেবে?'

আনন্দ চটপট পাশের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে সুদীপের হাতে দিতে সে বৃদ্ধার সামনে গ্লাসটা ধরল। শুয়ে শুয়েই মুখ পাশ ফিরিয়ে বৃদ্ধা খানিকটা খেয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা, ভীষণ শীত করছে আমার। তোমাদের বেঁধে দিতে পারলাম না। অতিথি উপোস করে রইলে!'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ওষুধ আনা যায় বল্ তো! শীত করছে যখন তখন ম্যালেরিয়া। কুইনাইন খায় না এই সময়? নাকি কোন ডাক্তারকে গিয়ে সিমটমগুলো বলব?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'তুই চলে যা। অ্যালোপাথি ওষুধ খায় কিনা তাই জানি না। আমি আর একটুখানি দেখি, যদি না কমে তাহলে পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাক্তারের কাছে পাঠাব।'

আনন্দ বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে সুদীপ আকাশের দিকে তাকাতেই নিমগাছটার পাতা দেখতে পেল। বেশ ঝাঁকড়া হয়েছে গাছটা। অথচ বৃদ্ধা এই গাছ থেকে কোন উপকার নেন কিনা কে জানে! এসে অবধি তো দ্যাখেনি। অবশ্য কে যেন বলেছিল নিমগাছের বাতাস নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আবার ঘরটার দিকে তাকাল সুদীপ। খুব খারাপ লাগছিল ওর।

দরজায় কয়েকবার শব্দ করার পর সাড়া মিলল। লোকটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে যেন পুলকিত হল, 'আরে, আসুন আসুন। আমি বললাম ওকে বলে এলাম তবু এলেন না কেন। ভেতরে আসুন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। মানে, আপনার কাছে অন্য উদ্দেশ্যে এলাম। পিসীমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। একটু ডাক্তারকে বলে ওষুধ আনা দরকার।'

'ডাক্তার! মুশকিলে ফেলে দিলেন—!' লোকটিকে চিন্তিত দেখাল।

'অবশ্য আপনার কাছে যদি জ্বরের, মানে এই ধরনের জ্বরের কোন ওষুধ থাকে তাহলে—।'

'না না। আপনি বুঝতে পারছেন না। উনি তো অ্যালোপাথি ওষুধ খাবেন না। জোর দিলে হিতে বিপরীত হবে। মানসিক রোগ। বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে ওষুধ এনে খান দরকার হলে। আমিও দু-একবার এনে দিয়েছি। কিন্তু আজ সেই ডাক্তার এবেলা বসবেন না বলেই মুশকিল শব্দটা বললাম। ট্যাবলেট ক্যাপসুল দিলে খাবেন ভেবেছেন? জ্ঞান থাকতেও না। এক কাজ করি বরং, দুপুরের পরে যখন ফিরব তখন আমি ওষুধ নিয়ে আসব। জ্বর, কাঁপুনি! কত জ্বর?'

'সেটা তো জানি না। তবে বেশ জ্বর। দাঁড়াতে পারছেন না।'

'পায়খানা হয়েছে? খেয়েছেন কিছু?' লোকটি যেন ডাক্তার হয়ে গেল এই মুহূর্তে।

'সে-কথা জিজ্ঞাসা করিনি।'

'ঠিক আছে তাতেই চলবে। আমি তো স্নান খাওয়া সেরে বের হচ্ছিলাম, এই সময় আপনি—।'

'তাহলে আমি চলি। আপনি দয়া করে ওষুধটা আনবেন। কত দিতে হবে?'

'কত আর, পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়! হোমিওপ্যাথি ওষুধ গরিবদের জন্যে, বুঝলেন!'

সুদীপ পকেট থেকে সন্তর্পণে টাকা বের করতে গিয়ে একটা একশ টাকার নোট বের করে ফেলল। সে ভয় পেল, পালটে আর একটা বের করতে চেষ্টা করলে যদি আরও একশ বেরিয়ে পড়ে! তার পকেটে অত টাকা দেখে নিশ্চয়ই লোকটি স্বস্তি পাবে না। সে টাকাটা লোকটির দিকে এগিয়ে ধরল, 'আমার কাছে খুচরো নেই, এটা রাখুন।'

'কি আশ্চর্য! পাঁচ টাকার জন্যে একশ দিচ্ছেন কেন? ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসি, তারপর ও নিয়ে ভাবা যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না দরজা থেকে আপনি চলে যাবেন কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।' লোকটি প্রায় হাত ধরেই টানল ওকে।

সুদীপ শেষবার আপত্তি জানাল, 'আপনি তৈরি হয়ে নিয়েছেন, বেরোবেন বললেন, এই সময় আসা মানে বিরক্ত করা, তাই না?'

লোকটি এবার মুখ নামিয়ে আনল সুদীপের কাছে, 'কাল থেকে শুয়ে আছে। সকালে কোনমতে কল-পায়খানা সেরেছে। বলছে মাথা ঘুরছে আর দুর্বল লাগছে। তা আমি নিজেই সব কিছু করলাম। চা খাওয়ালাম, রান্না করলাম। ওর জন্যে ভাত ডাল ভাজা আর ডিমের ঝোল করে ঢেকে রেখে দিয়েছি। বলেছি যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমাক। এই অবস্থায় বেশি নড়াচড়া করতে হবে না। শিবের আশীর্বাদ যে কাল তিনি দেহ রাখেননি। যদি আপনার কাছে ক্যাপসুলটা—।' হঠাৎ লোকটি থেমে গেল, 'লোকে কপালে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আপনার পকেটে ওই ক্যাপসুল থাকতে, ঠিক বিষ নষ্ট করার ক্যাপসুল থাকতে যাবে কেন? আপনি তো জানতেন না ও তখন বিষ খাবে!'

লোকটি কথাটা বলে সুদীপের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। অর্থাৎ এখন লোকটির মনে সন্দেহ ঢুকেছে। অথচ এ নিয়ে বোধ হয় কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারছে না। সুদীপ চটজলদি জানাল, 'আমার বন্ধুর খুব ভয় যে ওকে সাপে কামড়াবে। মানে ওর ধারণা এসব অঞ্চলে প্রচুর সাপ আছে। ও-ই আমাকে ক্যাপসুলটা রাখতে দিয়েছিল। সাপ কামড়ালে ওটা ওর মুখে দিয়ে দিলে রক্ত বিষকে আর গ্রহণ করবে না। সেটাই পকেটে ছিল আমার।' এর চেয়ে বেশি মিথ্যে ওর মাথায় এল না। যদিও তার বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনার স্ত্রীর কিছুই হয়নি। তিনি স্রেফ ভড়কি দিয়েছেন আপনাকে।

লোকটি এবার তৃপ্তির হাসি হাসল। মানুষ কত সহজে খুশী হয়। সে নিজেও যখন জানে বোকামি করছে কিন্তু তা যদি আনন্দদায়ক হয় তখন বোকা সাজতে তার দ্বিধা থাকে না। লোকটিকে দেখে সুদীপের এখন সেই রকম মনে হচ্ছিল। যেন একটা মেঘ সরে গেছে এমন ভঙ্গি করছিল লোকটি।

কাল রাত্রের ঘরটিতে লোকটিকে অনুসরণ করে ঢুকল সুদীপ। রাতে যা আড়াল থাকে দিনে তা পরিষ্কার। লোকটির আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। সংসার চালাতে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় তা বোঝাই যাচ্ছে। ঘরের আসবাব, রেডিওর চেহারা এবং আলনার জামাকাপড় একটি বিশেষ শ্রেণীকেই চিহ্নিত করছে। লোকটির এগিয়ে দেওয়া কাঠের চেয়ারটায় বসে সামনে তাকাল সুদীপ। যুবতী উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বালিশে মুখ গুঁজে। এখন ওঁর পরনে গতরাতের শাড়িটি নেই। কিন্তু এই ঘর,

আসবাব জিনিসপত্র এবং এই লোকটির সঙ্গে ওর শোওয়ার ভঙ্গি শাড়ি এবং স্বাস্থ্য একদম বেমানান। সুদীপ যে এই ঘরে ঢুকেছে তাও যেন টের পায়নি যুবতী। লোকটি বলল, 'এখন কি করা যায় বলুন তো! এই যে ঝিমুনি, ঘুম-ঘুম ভাব, এসবই নিশ্চয় বিষের প্রতিক্রিয়া। ইঁদুর মারার বিষ এনেছিলাম তাই খেয়েছিল। এখনও ভাবলে আমার গায়ের লোম সোজা হয়ে যায়। মরে গেলে হাতে দড়ি পড়ত আমার। বিষটার প্যাকেটে বড় বড় অক্ষরে পয়জন লেখা আছে।'

সুদীপ অনেক চেষ্টা করল অভিনয় ঠিক রাখতে, 'ফাঁড়া যখন কেটে গেছে তখন আর চিন্তা করছেন কেন? রেস্ট নিতে দিন, ঠিক হয়ে যাবে। তবে আর যেন এমন না হয় তাই দেখবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাথা নাড়ল, 'ক্ষেপেছেন! ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়? আমি কি পাগল?'

সুদীপ বলল, 'দু'বার। একবার বেল মাথায় পড়ে, দ্বিতীয়বার পড়ে যাওয়া বেলটা কুড়িয়ে আনতে।'

শোনামাত্র লোকটি হ্যা হ্যা করে খানিকটা হাসল। সুদীপ আড়চোখে লক্ষ্য করল শুয়ে থাকা শরীরটার পিঠ কয়েকবার কেঁপে উঠল। লোকটি বলল, 'কতক্ষণ বাদে একটু মন খুলে হাসলাম। যাক, বলছেন তাহলে এখন আর কোন ভয় নেই! ওষুধপত্র দিতে হবে না তাহলে!' কথাগুলো বলে লোকটি উঠে বিছানার পাশে দাঁড়াল, 'শুনছ! ওগো শুনছ! দ্যাখো কে এসেছে। ও-বাড়ির দিদিমার খুব অসুখ, বুঝলে!'

সুদীপ বলল, 'আঃ, ওঁকে বিরক্ত করছেন কেন? আপনি তো বের হবেন, আমি চলি!'

লোকটি বলল, 'সেই তো মুশকিল! আমি বেরিয়ে গেলে তো দরজা দিতে হবে!'

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা বলুন তো—ওর বিষ খাওয়ার দরকার হল কেন? খামোকা তো কেউ আত্মহত্যা করতে চায় না! নিশ্চয়ই একটা কারণ থাকবে।'

এবার লোকটি কুঁকড়ে গেল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কাল থেকে আমি ভাবছিলাম কখন এই প্রশ্নটা শুনতে হবে। দোষ আমার। ও খুব বড় ঘরের মেয়ে। পড়াতে গিয়ে যা হয় আর কি! সবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করি। তারপর এই অভাব, ওর একটা সাধআহ্লাদ রাখতে পারিনি, বয়সেরও পার্থক্য, সব মিলিয়ে সুখী তো কবতে পারলাম না। ওর বাপের বাড়ির লোক বলে দিয়েছে আমাকে ত্যাগ করে যদি যেতে পারে তাহলে গ্রহণ করবে! অতএব সে-দরজা বন্ধ। তারপর বাচ্চাকাচ্চাও হল না আমাদের! কম ডাক্তার দেখালাম না তো! বয়স অল্প, চঞ্চল মন, মাঝে মাঝে দু-একটা ভুল করে ফেললে পাড়ার লোক কুকথা বলে। শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি গতকাল। তবে হ্যাঁ, কাল রাতে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কিছু বলব না। যাতে ও সুখ পায় তাই করুক। আমাকে ছেড়ে না গেলেই হল।'

সুদীপ অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এই মুহূর্তে ওকে কর্ণের মত দেখাচ্ছিল। আর তখনই যুবতী পাশ ফিরল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল, 'কেমন লাগছে এখন? ভাল আছ তো?'

যুবতী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল 'ভাল'। তারপর সুদীপের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

লোকটি বলল, 'ইনি দিদিমার বাড়িতে এসেছেন। খুব ভাল লোক। কাল এঁর ওষুধেই—।'

সুদীপ যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, 'আমি চলি।' তার আর এই অভিনয় ভাল লাগছিল না।

যুবতী বলল, 'আপনি দাঁড়ান। নিমপাতা দেননি বলে এখান থেকে চা না খেয়ে যাবেন তা হবে না।'

সুদীপ উত্তর দিল, 'আপনি অসুস্থ! আমার মনে হয় শুয়ে থাকলেই আপনার ভাল হবে।'

'কিসে ভাল হবে আমি জানি। তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

প্রায় ধমকের গলায় যুবতী কথাগুলো বলতেই লোকটি শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। বিকেলের মধ্যেই আমি দিদিমার ওষুধ নিয়ে আসব। খাবারদাবার সব—।'

যুবতী ওকে থামাল, 'বিকেলের মধ্যে নয়। স্কুলে গিয়ে দু-ঘণ্টা ছুটি নিয়ে এবেলাতেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এস। রাত্রে জ্বর হয়েছে আর তিনি তোমার ওষুধের জন্যে বিকেল পর্যন্ত বসে থাকবেন?'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল তাই করবে। তারপর আর কথা ব্যয় না করে পাশের দরজা খুলে

বেরিয়ে গেল। এবার যুবতী উঠে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, 'কথা কানে যায়নি? বসুন! আমিও চা খাব।'

সুদীপ খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই নাটকটা করলেন কেন? আর করলেনই বা তো আমাকে এর সঙ্গে জড়ালেন কেন? আপনাব স্বামী মানুষ হিসেবে খারাপ নন। ওঁকে ঠকাতে আমার খারাপ লাগছে।'

'কে কাকে ঠকায়! তাছাড়া আপনি যে এসে হাজির হবেন তা আমি জানতাম না।' যুবতী জানাল।

'কিন্তু এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। আপনি কেন এমন করলেন?' সুদীপ জেদী গলায় প্রশ্ন করল।

'বেশ করেছি। আমি আজ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। যাওয়ার আগে ওকে জব্দ করতে চেয়েছি। একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তাকে চিবকাল বাধ্য হয়ে ভালবাসতে হবে? তার সঙ্গে আমার মনের কোন মিল না থাকলে, তাকে অসহ্য মনে হলেও চিরকাল একসঙ্গে থাকতে হবে? কত বড় বড় লোকের সম্পর্ক তো না বনলেই ভেঙে যায়, দুটো দেশের কত চুক্তি তো এক মুহূর্তেই বানচাল হয়ে যায়! তাহলে একটা মানুষকে চিরকাল কেন বাধ্য করা হবে সহ্য কবতে? বাপের বাড়িতে আমি ফিরে যাব না, কারণ আমি কাবও করুণা নিতে চাই না। এসবই তো কাল ভেবেছিলাম।' যুবতী ঠিক উত্তেজিত নয় কিন্তু সাধাবণ গলায় কথা বলছিল না।

ঠিক তখনই ওপাশের দরজায় শব্দ হল। একটা চোরা গলার ডাক ভেসে এল, 'এই, শুনছ, এই, আমি এসেছি। আমি তৈরি হয়ে এসেছি! যাবে তো?'

যুবতী সুদীপকে বলল, 'একটা উপকার করবেন? দরজাটা খুলে ছেলেটাকে বলুন আমি বিষ খেয়েছি। ও যদি এখানে দাঁড়ায় তাহলে পুলিশ ওকে ধরবে।'

সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কি ব্যাপার। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে কিছুই বুঝতে হবে না। যা বলছি তাই দয়া করে করবেন?'

সুদীপ কৌতূহলী হয়ে উঠল। দরজাটা খুলতেই তাকে দেখে একটি যুবক থতমত হয়ে গেল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

যুবক বলল, 'না-মানে-কিছু নয়---।' তারপর পাশে রাখা স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে যেতে চাইল।

সুদীপ বলল, 'এই যে মশাই, আপনি দাঁড়ান। আপনাদের কি কোথাও যাওয়ার কথা ছিল?'

যুবক মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আমাকে যেতে দিন।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? এসেছিলেন কেন?'

'আপনার এখানে থাকার কথা ছিল না।'

'ও। শুনুন। উনি গতরাত্রে বিষ খেয়েছেন।'

'অ্যাঁ!' যুবকটির চোখ বিস্ফাবিত হল। সুদীপ স্পষ্ট বুঝতে পারল ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'হসপিটালে আছেন। চলুন, দেখতে যাবেন না?'

যুবকটি আর দাঁড়াল না। শেয়ালের ভঙ্গিতে দৌড়ে পালাল সে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে আসতেই যুবতী বলল, 'ধন্যবাদ। আর একবার।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা কবল, 'একে তাড়ালেন কেন?'

যুবতী বলল, 'আজ ভোব থেকেই মনে হচ্ছিল চলে যাওয়াটা হয়তো ভুল হবে। শেষবার যাচাই করলাম। এ যাত্রায় আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। নেবা উনুন থেকে গরম কড়াইতে পড়তাম আমি। দেখি কতদিন এখানে মানিয়ে থাকতে পারি! আসুন, আমার হাতের চা খাবেন না?' যুবতীর ঠোঁটে সেই হাসি ফিরে এল।

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। আমার হাতে অনেক কাজ আছে।' তারপর আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধার দরজা পেরিয়ে সেটাকে বন্ধ করল।

এবং এবার লোকটার জন্যে কষ্ট হচ্ছিল।

চারটে পিঠে-বয়ে-নিয়ে যাওয়ার ব্যাগে প্রত্যেকের জিনিসপত্র ধরে গেল। গতকাল সুদীপ আর আনন্দ সমস্ত কলকাতা চষে প্রায় সব কিছুই পেয়ে গেছে। বিকেলবেলায় ওরা চারজন ছাদের ঘরে বসে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। ওষুধপত্রের স্তূপ দেখে কল্যাণ খুব হেসেছিল। সুদীপও স্বীকার করেছে উত্তেজনায় পরিমাণটা বেশি হয়ে গিয়েছে। জয়িতা বলেছিল ওটা একটা মাঝারি হাসপাতালের এক মাসের রসদ। জয়িতার হাতে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টিকিট দুটো দিল আনন্দ। কল্যাণ কখনও প্লেনে ওঠেনি। স্বভাবতই সে টিকিট দুটো দেখে উত্তেজিত হল এবং বলেই ফেলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আজ কাগজ পড়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছাড়া যায়!'

আজকের কাগজের প্রথম পাতার খবর তারাই। আহত ছেলেটির কাছ থেকে স্টেটমেন্ট পাওয়ার পর পুলিশ গতকাল দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের বয়স একুশের মধ্যে। কলেজের ছাত্র। এর আগে কখনও কোন অ্যাকশন করেনি। যে ধরা পড়েনি সে-ই নাকি বোমার ব্যবস্থা করেছিল। খবরের কাগজ দুটো অপারেশন এবং রেসকোর্সের ওপর হুমকির খবর পেয়ে তারা উত্তেজিত হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল শুধু হুমকি দিলেই কাজ হবে না। যারা হুমকি দিয়েছিল তারা যে কাজটা করতে পারেনি তারা সেই কাজটা করে দেখাতে চেয়েছিল। মাঝারি মানের ছাত্র হওয়ায় তাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর কাজকর্মের সঙ্গে তাদের মতের কোন মিল নেই। কিন্তু এখন তারা দুঃখিত। ঘোড়াগুলো যে মরে যাবে তা তারা চিন্তা করেনি। আর যে দুজন প্রহরী মারা গিয়েছে তারা পলাতক বন্ধুর আক্রমণের শিকার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্বীকার করেছে, এই ঘটনার সঙ্গে প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। ওই দুটো ঘটনার আসামীদের ধরবার জন্যে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশের এক মহলের সন্দেহ, আততায়ীরা পাঞ্জাবের দিকে চলে গেছে। প্রতিটি কাগজই অবশ্য কাল দুপুরের টেলিফোনের কথাটাও লিখেছে। টেলিফোনে আক্রমণকারীরা তাদের জানিয়েছে যে হেস্টিংসের ঘটনা তারা সমর্থন করে না। তারা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছে অযথা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু না করে বসেন যা প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটির প্রচলিত ব্যাখ্যা অকেজো হয়ে গেছে। শ্রেণীসংগ্রামের নাম করে, মার্কস অথবা কম্যুনিজমের ইজারা নিয়ে এদেশীয় বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিগির তোলাই যাদের অস্তিস্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। তারাই সীমিত ক্ষমতা হস্তগত করে জনতাকে ব্যবহার করছেন নিজেদের স্বার্থে। যে-দেশের মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র কয়েক পয়সা সেই দেশে লক্ষপতিকেও এঁরা সর্বহারা বলতে দ্বিধা করেন না। আমাদের বলতে কোন দ্বিধা নেই এই নব্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা দেশের মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর সংস্থা বা মানুষকে চূর্ণ করতে কোন হুমকির কাছে মাথা নোওয়াব না।' সংবাদপত্রগুলো জানিয়েছে এই ফোনে সংবাদদাতা তাদের আগামী পরিকল্পনার কোন হদিশ দেয়নি।

আবহাওয়া খুব গরম হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। কল্যাণ টিকিট দুটো হাতে নিয়ে দেখছিল। দমদম থেকে বাগডোগরা। তার পরেই ওর মনে হল যদি এয়ার পোর্টে তাদের পুলিশ ধরে ফেলে! অথবা প্লেনে বসে থাকার সময়? তাহলে তো পালাবার কোন সুযোগ থাকবে না। কথাটা বলতেই আনন্দ হাসল, 'প্লেনে তোরা অনেক সেফ। সঙ্গে এমন কিছু নিবি না যা সিকিউরিটি চেকিং-এর সময় অসুবিধে সৃষ্টি করে। কোনরকম আর্মস তোদের সঙ্গে নিয়ে তোরা প্লেনে উঠতে পারবি না। জাস্ট ট্যুরিস্ট হিসেবে তোরা যাচ্ছিস। সুদীপ, তুই কখন বের হবি?'

সুদীপ ঘড়ি দেখল, 'ঘণ্টাখানেক বাদে। তোরা রবীন্দ্রসদনের সামনে সাতটার সময় অপেক্ষা করবি। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। আমার জিনিসপত্র তোরা নিয়ে যাস।'

জয়িতা বলল, 'অতদূরে কেন? আমরা তো সন্ধ্যের আগে এখান থেকে বের হচ্ছি না। তুই গাড়ি

নিয়ে ট্রাম ডিপোর সামনে চলে আয়।'

আনন্দ বলল, 'সেই ভাল। কিন্তু কাল দুপুরে ফ্লাইট। তোরা অতক্ষণ কোথায় থাকবি?'

এই সমস্যাটাই বড় হয়ে দেখা দিল। কোন পরিচিত লোকের বাড়িতে থাকতে সাহস পাচ্ছিল না ওরা। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। আনন্দর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল বাবার চিঠিটার কথা। বাবার সেই বান্ধবীর কাছে সাহায্যের জন্যে গেলে কেমন হয়! সঙ্গে সঙ্গে মতলবটা বাতিল করল সে। যাকে কখনও দ্যাখেনি তার কাছে সাহায্য চাওয়াটাই বোকামি, যদিও বাবার চিঠির ভাষা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা অন্য রকমের ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত সুদীপ পথ বাতলাল। এয়ারপোর্ট হোটেল নয়, আজ সন্ধ্যেবেলায় ওরা সোজাসুজি ভি আই পি রোডে চলে যাক। প্রায় এয়ার পোর্টের কাছাকাছি ভি আই পি রোডের গায়ে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে। সাধারণত যারা ফ্লাইট ধরবে বা ধরতে আসে তারাই ওখানে থাকে। চার্জও বেশি নয়।

আনন্দ বলল, 'তাহলে আমরা একটু ঝুঁকি নেব। কল্যাণকে এখন কোথাও রেখে যাব না। ও জয়িতার সঙ্গে গাড়িতেই থাকবে। আমরা যদি মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বের হতে পারি তাহলে সোজা ওই রেস্ট হাউসে গিয়ে ওদের নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

হঠাৎ কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'যদি না বের হতে পারিস? তোদের কিছু হলে?'

আচমকা একটা হিমবাতাস বয়ে গেল ঘরে। সেটাকে কাটিয়ে উঠল আনন্দই, 'তা হলে তোরা অপেক্ষা করবি না। আমরা ধরা পড়লেই যে তোদের ধরা দিতে হবে এমন আমি চাই না। সঙ্গে টাকা আছে, এয়ার টিকেট আছে, যেভাবেই হোক নিজেদের বাঁচাবি। আমাদের বাদ দিয়ে যদি তোরা একটাও অ্যাকশন করত পারিস তা হলে সেটাও খুব মূল্যবান হবে।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'বাগডোগরা থেকে কোথায় যাব?'

আনন্দ ওদের বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তা হলে ওরা সেইদিনই একত্রিত হবে। এখন সৌভাগ্য কতটা সেটাই দেখা যাক।

পিঠে-বওয়া-ব্যাগ ছাড়াও দুটো চামড়ার ঝোলা কিনেছে সুদীপ। ঝোলাটা ওয়াটার-প্রুফ। তাতে যাবতীয় লড়াই-এর রসদ রাখা হয়েছে। ওইটে বহন করবে আনন্দ। সুদীপ ঘড়ি দেখল। আজ বৃদ্ধার জ্বর কম, কিন্তু দুর্বল হয়ে আছেন। ওর একবার মনে হল বের হবার আগে বৃদ্ধার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে আসা দরকার। মায়ের কাজটা যে এ জীবনে করতে পারল না সেটা অবশ্য বলা যাবে না, কিন্তু একটু পাশাপাশি বসলে খুশী হবেন উনি। ও নিচে নেমে গেল।

জয়িতার কেবলই মনে হচ্ছিল কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার আগে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বাড়ির ফোনে পুলিশ আড়ি পেতেছে কিনা কে জানে। রামানন্দ রায়ের অফিসে অবশ্য যাওয়া যেত। সীতা রায় সুদীপকে বলেছিল দরকার হলে সাহায্য চাইতে। এক রাত্রে মা হঠাৎ অমন পালটে গেল কি করে। খুব ছেলেবেলায় যে মাকে সে হারিয়েছিল তাকেই এই মুহূর্তে সে দেখতে পেল। তা সত্ত্বেও নিজেকে শক্ত করতে চাইছিল সে। কারণ সে বুঝতে পারছিল অন্য দুই বন্ধুর মনের অবস্থায় খুব ফারাক নেই। আনন্দ বা কল্যাণ এখন নিশ্চয়ই ওদের বাড়ির কথা ভাবছে।

বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলার পর সুদীপ শেষ কথাটা বলল, 'আমি আজ রাত্রে ফিরব না।'

'কেন? কোথায় যাবে?' বৃদ্ধা অবাক হয়ে গেলেন।

'কয়েকটা জরুরী কাজ আছে, সারতে হবে।'

'ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি অবনীর বাড়িতে যাবে। দ্যাখো, বলছিলাম কি, যদিও আমার গুরু রাঁড় বাড়ি যায়—তবুও আমার গুরু রামানন্দ রায়। তা বাপ তো গুরুর মতই।'

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' সুদীপ উঠে পড়ল। এখন ছায়া পড়ে গেছে। আকাশে মেঘ থাকায় আলো কমে যাচ্ছে দ্রুত। সে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে উঠতে বাঁদিকে তাকাল। এখান থেকে সামনের গলির একাংশ দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে। সেখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে এপাশে তাকিয়ে। তার ঠিক পাশেই আর একটা লোক দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছে। লোক দুটোর চেহারা দেখে সুদীপের সন্দেহ হল। ওরা পুলিশের লোক না হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আর ভাবতে পারল না। দৌড়ে ছাদের ঘরে চলে এসে বলল, 'চটপট জিনিসপত্র

নিয়ে বেরিয়ে আয়। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে।'

'কারা?' কল্যাণের মুখ সাদা হয়ে গেল।

আনন্দ বলল, 'কি করে বুঝলি?'

'গলির মধ্যে দুটো সন্দেহজনক লোক দাঁড়িয়ে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।' নিজে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে সে ডাকল, 'চলে আয়।'

জয়িতা বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল, 'বুড়ি আমাদের দেখতে পাবে না?'

'পেলে পাবে। এখন ওসব ভাবার সময় নেই।'

প্রায় উবু হয়েই ওরা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল। উঠোনের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে ওরা এলে। সুদীপ চারপাশে তাকাল। বৃদ্ধা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। দরজাটা এড়িয়ে গেলে তিনি দেখতে পাবেন না। ওর মনে পড়ল পেছনের পুকুরধারে আর একটা পথ আছে। সেই পথেও পুলিশ এসে গিয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু ওই পথ ছাড়া বের হবার কোন উপায় নেই। বুড়িকে ডিঙিয়ে ওরা পেছনের দরজায় চলে এল। সে নিচুগলায় আনন্দকে বলল, 'তোরা একটু সরে দাঁড়া। সেই বউটা এলে আমি ওর সঙ্গে ঘরের ভেতরে চলে যাব। গল্প করছি দেখলে তোরা ভেতরে ঢুকে ডানদিকের বারান্দার গায়ে একটা দরজা দেখতে পাবি। সেটা খুলে সোজা বেরিয়ে যা। আমি সাতটার সময় চৌরাস্তা নয়, ক্যালকাটা হসপিটালের সামনে তোদের জন্যে ওয়েট করব।'

সে কয়েকবার দরজায় শব্দ করতে যুবতীর গলা পাওয়া গেল, 'কে!'

সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'আমি।' বলে এপাশের দরজা খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের দরজা খুলে গেল। যুবতী সেই হাসিটা ঠোঁটে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার। আমার কি সৌভাগ্য! আসুন। এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'আমার কথা? কেন?' সুদীপ আড়ালে দাঁড়ানো বন্ধুদের দিকে একবারও না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল দরজা খোলা রেখে।

ঘরে ঢুকে যুবতী বলল, 'কেন, আপনার কথা বুঝি ভাবতে নেই? আর কার কথা ভাবব বলুন? একজন প্রেমিক ছিল, বিষ খেয়েছি শুনে সে পালাল। আমি না হয় সেই রাত্রে অভিনয় করেছিলাম, কিন্তু আপনি কেন অভিনয় করলেন? কেন বাঁচালেন আমাকে?'

'কেন বাঁচালাম বলুন তো!' সুদীপ আড়চোখে দেখল তিনটে মূর্তি বারান্দার কোণা দিয়ে পার হয়ে গেল। সে প্রশ্নটা করেই এমনভাবে হেসে উঠল যে খাটে বসা যুবতী অন্য দিকে খেয়াল করার অবকাশ পেল না।

যুবতী জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কি আছে! আহা!'

সুদীপ বলল, 'আসলে আপনাকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে—।'

এই সময় ওপাশে বৃদ্ধার চিৎকার শোনা গেল, 'কে? কে ওখানে শব্দ করে?'

সুদীপ উঠে দাঁড়াল, 'এই রে, উনি বোধ হয় জানতে পেরেছেন!'

যুবতী ওর দুটো হাত ধরল, 'দাঁড়ান। আপনি যাবেন না। আমি দরজাটা বন্ধ করে আসি। আপনি যে আমার কাছে এসেছেন তা বুড়ির না জানলেই হল।'

'কিন্তু উনি যদি এখানে আসেন?'

'তাই? ঠিক আছে। আমি দিদিমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে? উনি কিছু বললে বলে দেব যে আপনাকে দেখিইনি। আমার তিনি তো রাত নটার আগে ফিরবেন না। ততক্ষণে বেশ গল্প করা যাবে। বসুন।' যুবতী দরজা দিয়ে বেরিয়ে বৃদ্ধার অংশে চলে যেতে সুদীপ চটপট বারান্দায় নেমে এল। ওপাশে পুরুষকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সুদীপ খোলা অথচ ভেজানো দরজা খুলে পুকুরধারে চলে এল। এদিকে পায়ে চলার পথ।

পথটা কোন্ দিকে যাচ্ছে সে জানে না। যদি ঘুরে ওই গলিতে পড়ে তা হলেই হয়ে গেল। এদিকে মানুষজন এই শেষ বিকেলে নেই। খুব জোরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট বাগানের ওপাশে রাস্তা দেখতে পেল সে। একটুও দ্বিধা না করে সে বাগানটা যখন পার হচ্ছে তখন একজন মহিলাকে দেখতে পেল অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছেন। ও যখন রাস্তায় পড়ে গেছে তখন তিনি চিৎকার করলেন, 'এটা কি রাস্তা?'

সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে খানিকটা হাঁটার পর একটা রিকশা পেয়ে গেল।

অবনী তালুকদারের গ্যারেজটা মোটেই বড় নয়। অর্থবান লোক হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি আছে গ্যারেজে। তিনি জানেন আর সব বিষয়ে মুঠো বন্ধ করলেও গাড়ি সারায় যারা তাদের সন্তুষ্ট রাখা উচিত। নইলে খরচ বাড়বেই। ফলে খ্যাতি হয়েছে খাতিরের কারণেই। সুদীপও বেশ কয়েকবার গ্যারেজে গিয়েছিল। যাতায়াতে তার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে গেছে মিস্ত্রিদের। সে যখন গ্যারেজে ঢুকল তখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। গ্যারেজের মালিক অম্বিকাবাবু ধারেকাছে নেই। হেডমিস্ত্রি ওকে দেখে এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার দাদাবাবু?'

'বাবা বলল গাড়িটা আবার গোলমাল করছে।'

'ও। কিন্তু আজ তো লোক কম আছে। কাল সকালে পাঠিয়ে দেব, যদি দরকার হয় এখানে নিয়ে আসব। গতবারই আমার সন্দেহ হয়েছিল বাকেটটা নিয়ে।'

'কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা। বাবার একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে। ওখানে ট্যাকসিও পাওয়া যায় না। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।' খুব নিরীহ মুখে জানাল সুদীপ।

'গাড়ি!' মিস্ত্রি একবার চারপাশে তাকাল, 'ওই অ্যাম্বাসাডারটা নতুন রঙ হবে। এমনিতে গাড়ি রানিং কন্ডিশনে আছে। ওটা নিয়ে যাও, কাল সকালে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

মিনিট পাঁচেক বাদে শিস দিতে দিতে গাড়ি চালাচ্ছিল সুদীপ। অয়েল ইন্ডিকেটার বলছে এখনও কিছুটা দূর যাওয়া যাবে। সে একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি ঢোকাল। পুরো ট্যাঙ্ক তেল ভরে নিয়ে সে ক্যালকাটা হসপিটালের দিকে যেতে যেতে খেয়াল করল তাড়াহুড়োয় ভাঙা ক্যামেরাটা ছাদের ঘরে ফেলে এসেছে। একটু গুম হয়ে গেল সুদীপ। একটা না একটা গোলমাল তার হবেই। ক্যামেরা ছাড়া কি ক্যামেরাম্যান হয়? সার্কুলার রোডের একটা দোকানে ঢুকে তাকে ক্যামেরা কিনতে হল। নিজের পছন্দটা বড্ড চড়া—নইলে এত গচ্চা যেত না।

সাতটার কয়েক মিনিট বাদেই ওরা গাড়িতে উঠে এল। জয়িতা ওর পিঠে হাত দিল, 'আমাদের খুব ভয় হচ্ছিল তোর জন্যে। ওরা কি সত্যি পুলিশ?'

স্টার্ট দিল।

কল্যাণ বলল, 'ভাগ্যিস তুই দেখেছিলি। এই রকম প্যালপিটেশান জীবনে হয়নি আমার। যে কোন মুহূর্তেই পুলিশের মুখোমুখি হব, হাঁটছি আর মনে হচ্ছে। তারপর ডায়মন্ডহারবার রোড পড়তেই একটা বাসে চেপে বসলাম।'

'কেউ তোদের কিছু বলেনি?'

'না। তবে সবাই জয়িতাকে দেখছিল। ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারছিল না।'

'আমিও পারি না।' সুদীপ মন্তব্য করতেই জয়িতা পেছন থেকে চড় মারল পিঠে।

আনন্দ বলল, 'ঠিক বাড়িটার সামনে নিয়ে যাবি। তোরা দুজন পেছনে বসে থাকবি চুপচাপ। যদি দেখিস আমাদের কেউ চেজ করছে তা হলেই চার্জ করবি। যদি না ফিরি তাহলে চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে যাবি। দশ থেকে বারো মিনিটের বেশি অপেক্ষা করবি না। সুদীপ, তোর সঙ্গে মাল আছে তো?'

'আছে। তুই দুটো গ্রেনেড দে। ক্যামেরার ঝোলার মধ্যে রেখে দিই।'

'ওটা আবার কোত্থেকে এল?'

'কিনলাম। সেটা ছাদের ঘরে ফেলে এসেছি।'

'কেয়ারলেস!' মন্তব্য করল জয়িতা। সুদীপ কোন জবাব দিল না। মন্ত্রীর বাড়ির কাছাকাছি এসে সে চারপাশে তাকাল। একজন পুলিশ রাইফেল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। আর একটা গাড়ি সামনে পার্ক করা। গাড়িটাকে ঠিকঠাক দাঁড় করিয়ে ওরা নেমে পড়ল।

সন্ধ্যের পর এই অঞ্চলের জৌলুস যেন বেড়ে যায়। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে যদিও দোকানপাট নেই তবু রাস্তায় আলোর ফোয়ারা ছুটছে, গাড়ি-রিকশাও কম নেই। কাছাকাছি কোথাও মাইকে হিন্দী ছবির গান বাজছে। জয়িতা আর কল্যাণ পেছনে বসে রইল। আনন্দ লক্ষ্য করল দুজনেই অত্যন্ত উত্তেজিত।

গাড়ির কাচের মধ্যে দিয়ে জয়িতাকে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না একটুকু। পথচলতি কারও নজর পড়বে না তাই। সামনের গাড়ির পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল। লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার। সুদীপের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে যে ভঙ্গিতে তাতে ওর বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় গাড়িটায় কাজ চলছিল।

আনন্দ আর সুদীপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। বেশ পেল্লাই দরজাটা বন্ধ। আনন্দ কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল। দরজার বাইরে মন্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা রয়েছে। যে পুলিশটা রাইফেল হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে সতর্ক চোখে ওদের দেখছে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করছে না। সুদীপ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মন্ত্রীমশাই বাড়িতে আছেন?'

হ্যাঁ অথবা না লোকটার মাথা নাড়া দেখে বোঝা গেল না। উলটে সে জানতে চাইল, 'আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে? না হলে দেখা হবে না। ভিজিটর এসেছে।'

দরজাটা খুলে গেল জবাব দেবার আগেই। সাদা প্যান্ট লাল শার্ট পরা একটা কালো লোক জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? কোত্থেকে আসছেন? মন্ত্রী কি আপনাদের আসতে বলেছেন? কি নাম?'

চার-চারটে প্রশ্ন কিন্তু আনন্দ তার ধার দিয়ে যেতে চাইল না, 'নানুভাই কি এসে গেছেন?'

এবার লোকটির গলা পালটে গেল, 'আপনাদের নাম?'

আনন্দ বলল, 'বলুন খবরের কাগজ থেকে আসছি। নানুভাই এখন আমাদের আসতে বলেছেন।'

লোকটি জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাদের গাড়িটা নিরীহ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। খবরের কাগজ শোনার পর রাইফেলধারী পুলিশটা একটু সহজ হল। সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে সারাক্ষণ বকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় না আপনার? একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসতেও তো পারেন!'

লোকটার মুখে দুঃখ-দুঃখ ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। তখনই আগের লোকটা ফিরে এল, 'আসুন। তবে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকবেন না। উনি খুব ব্যস্ত।'

কার্পেটে মোড়া করিডোর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে লোকটা একটা ঘরের দরজায় ওদের পৌঁছে দিয়ে পর্দা সরিয়ে দিল। প্রথমে আনন্দ পরে সুদীপ ঘরে ঢুকল। নানুভাই একটা লম্বা গদিমোড়া ঘুরন্ত টুলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সামনের সোফায় বসে আছেন মন্ত্রীমশাই। ঘরে আর কেউ নেই। ঢোকামাত্র মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার? রাইটার্সেই তো আসতে পার তোমরা। তোমাদের জ্বালায়—'

আনন্দ নানুভাই-এর দিকে মাথা নেড়ে হাসল। নানুভাই গম্ভীর গলায় বলল, 'সেদিন আমি ওদের আসতে বলেছি এখানে। একটা কাগজ যা-তা লিখেছে, উলটোটা লেখা দরকার।'

'অ। বেশ। কোন্ কাগজ ভাই?' মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

আনন্দ নামটা বলল। মন্ত্রী কাঁধ নাচালেন। তারপর বললেন, 'আমি সব সময় সর্বহারার পক্ষে। পার্টি আমাকে মন্ত্রী করেছে কারণ আমি কাজ করেছি, করব। নানু নাকি আমার ডান হাত, আরে বাবা ও আমার ডান হাত হতে যাবে কেন? কিসের অভাব ওর? একজন সৎ ব্যবসায়ীর নামে কেচ্ছা রটালেই হল। আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ভাই স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছে বানিয়ে লেখা নয়। আসলে তোমাদের বুর্জোয়া কাগজগুলো তো গল্প তৈরি করতে ভালবাসে। তোমাদের কথা বলছি না, সুতারকিন স্ট্রিটের কাগজটাকে তো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। যত গালগল্প খবর বলে চালায়। আর পাবলিকও হয়েছে তেমন। আমাদের কেচ্ছা পড়তে পারলে আর কিছু চায় না। কি জানতে চাও বল?'

আনন্দ বলল, 'আপনার সম্পর্কে অভিযোগ এই তল্লাটে অভারতীয়দের আপনি নানুভাই-এর সাহায্যে আশ্রয় দিচ্ছেন, দ্রুত তাদের নামে রেশন কার্ড বের করছেন, ভোটার লিস্টে বেআইনি ভাবে নাম তুলছেন। ব্যাপারটার মধ্যে কতখানি সত্যি আছে?'

'এক ফোঁটাও না। আমার কি দরকার? এলাকার ভোটাররা আমাকে ভালবাসে। ওসব কাজ আমি করব কেন?' মন্ত্রী বললেন, 'আর নানুভাই-এর সাহায্যে মানে? ও কি গুণ্ডা?'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আপনি কি এই এলাকায় সাম্প্রদায়িক জিগির বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'ইডিয়ট। ভারতবর্ষ সেকুলার রাষ্ট্র। আমি যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি সেখানে সাম্প্রদায়িক

চিন্তার কোন স্থান নেই।'

'তৃতীয় প্রশ্ন, এই এলাকায় নব্বুই ভাগ মানুষ চোরাচালানের ব্যবসায়ে লিপ্ত। তাদের মালিক হল নানুভাই। আর এই নানুভাইকে আপনি শেলটার দেন যাতে পুলিশ কিছু করতে না পারে। লোকে বলে আপনি নাকি এর একটা ভাগ পান।'

'কে বলেছে? কোন্ শালা? প্রমাণ আছে কিছু? তাহলে আমার পার্টি আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'চতুর্থ প্রশ্ন, এই এলাকায় আপনার জনপ্রিয়তা নির্ভর করছে নানুভাই-এর মর্জির ওপর। তিনিই আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। যদি আপনি নানুভাই-এর মতের বিরুদ্ধে যান তাহলে আগামী নির্বাচনে আপনার জামানত জব্দ হবে। এটা কি সঠিক কথা?'

এবার রুমালে মুখ মুছলেন মন্ত্রীমশাই। নানুভাই চুপচাপ টুলে বসেছিল। এবার তার ঠোঁটে হাসি ফুটল। মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব আমি কি দেব? নানু এখানে রয়েছে, ও-ই জবাব দিক।'

নানুভাই বলল, 'না না, এটা আপনার ব্যাপার। যা ভাল মনে করেন বলে দিন!'

মন্ত্রী বললেন, 'নানু হল শোষিত মানুষের প্রতিনিধি। আমিও তাই। অতএব দুজনে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের এলাকার মানুষের জন্যে অনেক কিছু করতে হবে। যদি কেন্দ্র আমাদের সাহায্য করে তাহলে এলাকার মানুষদের কোন দুঃখ রাখব না।'

আনন্দ বলল, 'নানুভাই নামকরা স্মাগলার। কলকাতা শহরের অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উনি বাঁধিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আপনার সংযোগ পার্টির ইমেজ নষ্ট করছে না?'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন মন্ত্রীমশাই, 'স্টপ ইট। তোমাকে আমি পুলিশে দেব। তুমি আমার নামে নোংরামি করছ। নানু যদি ইশারা করে তাহলে তুমি এই এলাকা থেকে জীবনে বের হতে পারবে? আমরা যা ইচ্ছে তাই করব, কার বাবার কি?'

নানুভাই এবার শান্ত গলায় বলল, 'বড্ড রেগে যাচ্ছেন আপনি। শুনুন ভাই, মিছিমিছি ঝামেলা করে লাভ নেই। আপনাদের কাগজে ওই খবরের উলটোটা লিখতে হবে। যা যা লেখার তা আপনারা ঠিক করে কাল মন্ত্রীমশাইকে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। পাঁচ হাজার চলবে?'

মন্ত্রী বললেন, 'ফট করে পাঁচ বললে কেন? এরা কত মাইনে পায় জানি। একেই হত।'

নানুভাই বলল, 'আমার জবান এক। পাঁচ বলেছি পাঁচ।'

আনন্দ হাসল, 'ঠিক আছে। নানুভাই, আপনি মন্ত্রীমশাই-এর পাশে এসে দাঁড়ান। আমার ক্যামেরাম্যান ছবি তুলবে। ছবির নিচে একটা ভাল ক্যাপশন দিতে হবে।'

মন্ত্রীর মুখ দেখে মনে হল কথাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু নানুভাই হেলতে দুলতে মন্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুদীপ ক্যামেরা খুলে রেডি হয়ে বলল, 'একটু হাসুন স্যার।'

মন্ত্রী বললেন, 'নানু, কাঁধের কাছ থেকে হাতটা সরাও। পাবলিক ইমেজ নষ্ট হবে।'

নানুভাই বলল, 'বাত একটু সমঝে বলবেন। পাবলিক ইমেজ!' একটু বিরক্ত হয়ে নানুভাই মন্ত্রীর দিকে তাকানো মাত্র আনন্দ রিভলভারের ট্রিগার টিপল। অতবড় শরীরটা বেঁকেচুরে পড়তে পড়তে সোফায় যখন আটকে গেল তখন মন্ত্রীমশাই শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। আনন্দর দ্বিতীয় গুলিটা মন্ত্রীমশাইকে চিরকালের জন্যে থামিয়ে দিল। গুলির আওয়াজে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল। আনন্দ আর সুদীপ দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে লোকটা ওদের এই ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সে ভেতরে ঢুকেই আর্তনাদ করে উঠল। ততক্ষণে আনন্দরা করিডোরে চলে এসেছে। এই সময় সেই লোকটাকে রিভলভার বের করতে দেখল সুদীপ। ক্যামেরার ব্যাগ থেকে গ্রেনেড বের করে সে ছুঁড়ে দিতেই মনে হল বাড়িটা ভেঙে পড়বে। দরজার বাইরে এসে ওরা দেখল পুলিশটা রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে। আনন্দ তাকে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'গুলি আছে ভেতরে?'

লোকটা পুতুলের মত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'গুড। দৌড়ে ভেতরে যান, নইলে মারা পড়বেন। মন্ত্রী ডাকছে।' সুদীপ চেঁচিয়ে বলা মাত্র পুলিশটা রাইফেল নিয়ে ভেতরে ছুটল। ওরা ততক্ষণে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসেছে। জয়িতা সামনের দরজা দুটো সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল। আর তখনই চার-পাঁচজন লোক ছিটকে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। তারা

চিৎকার করছিল 'ডাকু ডাকু' বলে। সুদীপ তখন মরীয়া হয়ে গাড়ি ঘোরাল। আনন্দ দেখল ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ড্রাইভার তার গাড়িতে উঠছে। সে ওইটুকু সময়েই তিনটে গুলি ছুঁড়ল। তার লক্ষ্য ছিল গাড়ির চাকা নষ্ট করা। এই সময় পুলিশটা রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ল দরজায় দাঁড়িয়ে। ওপর থেকে ছোঁড়ার জন্যেই সম্ভবত গাড়ির ঠিক মাথায় গুলিটা লাগল।

যতটা সম্ভব স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল সুদীপ। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে আসার পর সে একটু ধাতস্থ হল। আনন্দ বলল, 'আস্তে চালা। আমাদের এই গাড়ির নাম্বার একশটা লোক নোট করেছে নিশ্চয়ই। তার ওপর জোরে চালালে পুলিশ এমনিতেই নজর করবে।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাড়ি ছেড়ে ট্যাকসি নিবি?'

'না। ট্যাকসি নিয়ে কোন লাভ হবে না। সোজা পার্ক সার্কাসের দিকে চল্। বাইপাস দিয়ে গিয়ে সল্ট লেক থেকে ভি আই পি ধর।'

আনন্দকে এই মুহূর্তে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তার চোখ জ্বলছিল, কণ্ঠস্বর অসম্ভব স্থির।

কল্যাণ আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ভেতরে?'

আনন্দ কল্যাণের দিকে চট করে তাকাল, 'লোক দুটোকে আমি সরাসরি গুলি করে মারলাম। দুটো ভণ্ড বদমাস, মানুষের শত্রু। জানিস, গুলি করতে আমার হাত একটু কাঁপেনি।'

'সেম টু মি।' সুদীপ হাসল, 'ছারপোকা মারতেও এর চেয়ে বেশি অস্বস্তি হয়।'

কল্যাণ জিভ দিয়ে একটা শব্দ করল, 'শুধু আমিই কিছু করতে পারছি না। শালা এই হাতটা—।'

জয়িতার গলা শোনা গেল, 'আমিও কিছু এখনও করতে পারিনি কল্যাণ। আমাকে বাদ দিচ্ছিস কেন?'

আনন্দ বলল, 'করার সময় এলেই তোরা করবি। কল্যাণ, তোদের এখন আমরা ওই রেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। এখন থেকে তোরা খুব শান্ত ভদ্রলোক। কোনরকম টেনশন রাখবি না। অথবা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু করবি না যাতে তোদের ওপর লোকের নজর পড়ে।'

কল্যাণ বিরক্ত হল, 'তুই শুধু আমাকে বলছিস কেন? আমার সঙ্গে জয়িতাও থাকছে!'

আনন্দ বলল, 'জয়িতার মাথা অনেক ঠাণ্ডা। তাছাড়া যে কোন পরিবেশে ও মানিয়ে নিতে পারে। কিছু মনে করিস না, যার যা প্রশংসা প্রাপ্য তা করছি। তোদের কাছে কোন অস্ত্র আছে?'

জয়িতা হাত বাড়িয়ে রিভলভার আর গ্রেনেড এগিয়ে দিল আনন্দর দিকে। তারপর বলল, 'শুধু জামাকাপড় আর ওষুধপত্র রইল।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর উইগটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?'

'না। ওটা বিশ্রী। দিনের বেলায় সবাই বুঝতে পারবে ওটা উইগ। আমি ভাবছি, এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং টাইমে পৌঁছে যখন ভেতরে ঢুকব তখন কল্যাণের থেকে আলাদা থাকব। যেন কেউ কাউকে চিনি না। একদম বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তবে কথা বলব।' জয়িতা জানাল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। সুদীপ, ওদের হাজার টাকা দিয়েছিস?'

সুদীপ বাইপাসের খোলা রাস্তায় তখন স্পীড বাড়াচ্ছিল। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

আনন্দ বলল, 'রেস্ট হাউসের বিল মিটিয়ে টাকাটা দুটো ভাগ করে দুজনের কাছে রেখে দিস। তোদের টিকিটের নামগুলোই রেস্ট হাউসে বলবি। জামসেদপুর থেকে আসছিস, দার্জিলিং যাবি।'

ওরা কেউ কথা বলছিল না। দূরে সল্ট লেকের আলোগুলো হীরের মত জ্বলছে। ডান হাতে স্টেডিয়ামটাকে রেখে শেষ পর্যন্ত ভি আই পি রোডে উঠে এসে গতি কমাল সুদীপ। একটা পুলিশ ভ্যান ঠিক মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত ভদ্রভাবে ওরা এয়ারপোর্টের দিকে বাঁক নিল। মিনিট দশেক বাদেই রেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সুদীপ। আনন্দ ইশারা করতে জয়িতা একটা হাত ওর কাঁধে ছুঁইয়ে বলল, 'গুড নাইট!'

সুদীপ বলল, 'আমি ওয়েট করছি, বুকিং পেলি কিনা,—ঠিক আছে, তিন মিনিটের মধ্যে না এলে বুঝব ঘর পেয়ে গেছিস।'

কল্যাণ আর জয়িতা পাশাপাশি হেঁটে গেল গেট পেরিয়ে মোরামের পথ বেয়ে। রেস্ট হাউসের

সাইনবোর্ডের নিচ দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। তিনের বদলে চার মিনিট অপেক্ষা করল সুদীপ। তারপর ইঞ্জিন চালু করল।

বোলপুর স্টেশনের গায়ে যখন ওরা গাড়ি থেকে নামল তখন সকাল আটটা। পথে দু'বার গাড়িটা গোলমাল করেছিল। এখন আর হাতের ছাপ মোছার কোন চেষ্টা করল না কেউ। ব্যাগগুলো নিয়ে সোজা স্টেশনে ঢুকে টিকিট কাটল নিউ জলপাইগুড়ির। পনেরো মিনিটের মধ্যেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এখানে আসবে। প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছিল সুদীপের। সারারাত বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে, অকারণে থামিয়ে নার্ভের ওপর খুব চাপ গেছে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবি?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'শোব। একটা জায়গা চাই।'

ওরা প্রায় কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রেনটা এল। ট্রেনে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সুদীপ। গাড়িটা খুব ভোরে হাওড়া থেকে ছাড়ে বলেই বোধহয় এত খালি। গদিওয়ালা একটা সিটে শুয়ে পড়ল সুদীপ। ব্যাগগুলো সিটের তলায় ঢুকিয়ে জানলার কাছে বসতেই ট্রেনটা ছাড়ল। আনন্দর খুব চিন্তা হচ্ছিল কল্যাণের জন্যে। যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে—! একবার এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলে মনে হয় ভয়ের কিছু থাকবে না। নিজেকে বোঝাল সে।

চা-ওয়ালা চা নিয়ে এসেছিল। সুদীপ নড়বে না জেনে এক ভাঁড় কিনে সামনে তাকাতেই সে দেখতে পেল উলটোদিকের ভদ্রলোক কাগজ ভাঁজ করে রেখে চোখ বন্ধ করলেন। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আপনার কাগজটা একটু দেখতে পারি?'

লোকটা মুখ নাচাতে সে কাগজটা টেনে নিল। আজ ভোরে হাওড়া স্টেশনে কিনেছেন ভদ্রলোক। প্রথম পাতায় বিশাল অক্ষরে লেখা, 'অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে মন্ত্রী নিহত। দেহরক্ষীরও মৃত্যু।' তারপর দারুণ চাঞ্চল্যকর বিবরণ ছাপা হয়েছে। 'সমস্ত রাজনৈতিক দল এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। অনুমান করা হচ্ছে মন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ এই কাজ করেছে। আততায়ীরা গ্রেনেড স্টেনগান ব্যবহার করেছে। তারা সংখ্যায় সাত-আটজন ছিল। গাড়ির যে নাম্বার পাওয়া গেছে তার মালিককে মধ্যরাত্রে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।' এর পাশে বক্স করে ছাপা হয়েছে, 'সম্প্রতি একটি কাগজে মন্ত্রী এবং তার দেহরক্ষীর নামে কিছু অভিযোগ ছাপা হয়েছিল। আততায়ীরা খবরের কাগজের রিপোর্টারের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। একথা অনুমান করা অন্যায় হবে না, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন মিল থাকতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে উক্ত এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।'

আনন্দ ধীরে ধীরে কাগজটা ভাঁজ করে ভদ্রলোকের পাশে রেখে দিল। এই ভদ্রলোক যদি নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠক হন তাহলে সহজেই তাদের চিনে ফেলতে পারেন। এখান থেকে সরে বসতে হবে এমন জায়গায় যেখানে বাঙালি ধারেকাছে নেই। সুদীপটাকে তুলতে হবে নিঃশব্দে।

॥ ২৬ ॥

আজ কলকাতার প্রতিটি খবরের কাগজের হেডলাইন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে একটি শব্দের হেরফেরে কোন ঘটনা সম্পর্কে কাগজের বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থেকে যেতে পারে। যেমন, 'নিজ বাসভবনে মন্ত্রী দেহরক্ষীসমেত নিহত।' 'দেহরক্ষী এবং মন্ত্রীকে গুলি করে হত্যা।' 'মন্ত্রী নিহত, সঙ্গে দেহরক্ষী।' 'নৃশংস হত্যাকাণ্ড, উগ্রপন্থী কর্তৃক মন্ত্রী নিহত।'

গেস্টহাউসে বসে ওরা কাগজগুলো দেখছিল। কাল রাত্রে জয়িতা এক সেকেন্ড ঘুমাতে পারেনি। এই গেস্টহাউসটাকে আপাতনিরীহ বলেই মনে হয়েছিল। এয়ারপোর্টে প্লেন ধরতে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে শহরে যাওয়ার আগে এখানে থেকে যাওয়ার কাজে বিমানযাত্রীরা এটাকে কাজে লাগায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়লে কিছু করার

থাকবে না। পুলিশের ভয় তো ছিলই, তার ওপরে সুদীপ-আনন্দের জন্যে চিন্তাও হচ্ছিল। কোন দরকার ছিল না বোলপুর পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরার। অবশ্য দার্জিলিং মেল বেরিয়ে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা বর্ধমানে দাঁড়ায় না। তবু এই ঝুঁকি নেওয়াটায় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। এই ঘরে টেলিফোন আছে। খুব ইচ্ছে করছিল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে। অন্তত 'বাবা আমি চলে যাচ্ছি অনেক দূরে, হিমালয়ের কোলে', এই কথাগুলো বলতে। কিন্তু পুলিশ যদি টেলিফোনও নজরে রাখে তাহলে—। হঠাৎই জয়িতার মনে হচ্ছিল সবকটা শেকড় আজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। যতই মাটি আলগা থাকুক না কেন এতকাল আজ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কল্যাণ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওর হাতের অসুবিধে এবং আরামদায়ক বিছানা ওকে ঘুমাতে সাহায্য করেছে। এতদিন একঘরে ওরা চারজন শুয়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমাতেও পেরেছে। এখন সত্যিই আর এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছিল। এই প্রথম একজন যুবকের সঙ্গে শুচ্ছে সে। হয়তো এক বিছানায় নয় কিন্তু সারাটা রাত ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে—জয়িতা ঘুমন্ত কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এই চিন্তাটার জন্যে লজ্জিত হল না। সে নিজে একটি যুবতী বয়সের রমণী, এই চিন্তাটা মাথায় এসে এক ধরনের ভাল লাগা তৈরি হল। অথচ ঘুম এল না। ঘরের গায়েই যে ব্যালকনিটা সেখানে বসলে ভি আই পি রোড দেখা যায়। জয়িতা সেই রাতটার অনেকখানি ব্যালকনিতে বসে রইল। রাত যত বাড়ছে তত ছুটন্ত গাড়ির সংখ্যা কমে আসতে লাগল। একসময় সব চুপচাপ। এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই কোন প্লেন নামছে না। একটা রাত কেমন করে নিঃসাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, চোখের সামনে দেখল জয়িতা।

প্রতিটি কাগজে হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ বের হয়েছে। বিশদ তো বটেই, এমন অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। তবে সর্বাধিক প্রচারিত কাগজটি মন্তব্য করেছে, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্যারাডাইস এবং বড়বাজারে যে দল কাজ করেছে তারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। মন্ত্রীর নামে বিভিন্ন সময় অনেক অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু তাঁকে তাঁর দল এবং সরকার সবসময় আড়াল করে রেখেছিল। দেহরক্ষী হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেই লোকটির নাম নানুভাই। ওই অঞ্চলের ব্যাপক স্মাগলিং হত নানুভাই-এর নেতৃত্বে। বস্তুত নানুভাই-এর নির্দেশেই ব্যালটবক্সে ভোট পড়ত, কারণ প্রতিটা পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি নির্ভর করত নানুভাই-এর ওপর। কলকাতায় কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার পেছনে নানুভাই-এর হাত ছিল বলে কারও কারও অনুমান। এইরকম একটি সমাজবিরোধী কিভাবে মন্ত্রীর দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচিত হল সেটাই বিস্ময়।' হত্যাকারীদের এই কাজের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ধিক্কার উঠেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল একসঙ্গে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁরা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছেন। ঘটনা শোনামাত্র মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে ছুটে যান। সহকর্মীর এই শোচনীয় মৃত্যুকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। রাত্রেই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে তিনি আই জি এবং সি পি-র সঙ্গে জরুরী বৈঠক করেন। প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার পরেও এতদিন হত্যাকরীরা ধরা না পড়ায় পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবী উঠেছে। এই ঘটনা মন্ত্রীসভায় সংকট সৃষ্টি করতে পারে। মন্ত্রীর এলাকায় যাতে কোন হাঙ্গামা না শুরু হয় তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

খবরগুলো পড়ার পর কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই দেখেছিস?'

জয়িতা সিগারেট ধরাল, 'কি?'

'কোন খবর বেরিয়েছে কিনা ওদের সম্পর্কে? যেভাবে এখান থেকে গেল ওরা!'

'না। কাল রাত্রে তোর ঘুম দেখে অবশ্য মনে হয়নি এত চিন্তা করেছিস।'

কল্যাণ কোন জবাব দিল না। একথা ওকে বোঝানো অসম্ভব, জ্ঞান হবার পর সে এত আরামে থাকেনি। এমন নরম বিছানা, ঝকঝকে টয়লেট, ভাল খাবার কোনদিন পায়নি। নিজেকে খুব সুখী সুখী মনে হয়েছে আজ সকাল পর্যন্ত। এই খবরের কাগজগুলো আসার পর থেকেই আবার উদ্বেগ, আবার—। কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল। যতই না ভাবতে ইচ্ছে করুক কিন্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে জয়িতা একটি মেয়ে। তাদেরই সমবয়সী। মেয়ে বলতে যে সব আকর্ষণীয় ব্যাপারগুলো চট করে চোখের সামনে ভাসে সেগুলো বাদ দিয়েই কিন্তু ওর অস্তিত্ব এবং তা সত্ত্বেও প্রমাণ করা যাবে না জয়িতা মেয়ে নয়। আর সে কাল গোটা রাত একটি মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে কাটাল অথচ মনে কোন প্রতিক্রিয়া

ঘটল না। নিজেকে বোঝাল কল্যাণ, ওকে দেখলে তার কেবল জয়িতা বলেই বোধ হয়, মেয়ে বলে কোন অনুভূতি আসে না। জয়িতা নিজেই যেন তার সমস্ত নারীত্বকে আড়াল করে বসে আছে। সে ভাবনাটাকে অন্যদিকে সরাতে চাইল। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'ধরা পড়লে তুই কি করবি জয়িতা?'

'বলব শহীদ করুন মশাই, সাত আট বছর ঘানি টানতে পারব না। ফালতু ব্যাপার।'

'তোরা সবাই কেমন সব ব্যাপার সহজ ভাবে নিতে পারিস।' কল্যাণ নিঃশ্বাস ফেলল, 'এই যে আজ আমরা কলকাতা ছেড়ে, পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কোনদিন এখানে ফিরব কিনা তাই জানি না—মনটা কেমন লাগছে, বুঝলি?'

কথাটা তারও, কিন্তু জয়িতা বলল, 'আহা রে, যাও না, মায়ের কাছে বসে ডুডু খাও।'

কল্যাণ মাথা ঝাঁকাল, 'তুই আর সুদীপ মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝিস না।'

'আনন্দ বোঝে?' জয়িতাকে হাসি থামাতে কষ্ট করতে হচ্ছিল।

হঠাৎ কল্যাণ চিৎকার করে উঠল, 'আমি এতদিন কত কষ্ট করে পড়াশুনা করলাম, ভাল রেজাল্ট করলাম, কি লাভ হল? তিনটে অ্যাকশান করে এখন কুকুরের মত পালাতে হচ্ছে। কেন? নিজেদের নষ্ট করে আমরা কার কি উপকার করলাম?'

জয়িতা উঠে দাঁড়াল, 'তুই চিৎকার করছিস কেন?'

'একশবার করব। তোদের কি? বড়লোকের বাড়িতে জন্মেছিস, তোরা এসব বুঝবি কেন? আমাকে টিউশনির পয়সায় চালাতে হয়েছে। আমি জানি কষ্ট কাকে বলে।'

কল্যাণের গলার স্বরে বাষ্প ছিল কিন্তু সেটা উঁচু পর্দায় ধরা ছিল। জয়িতা বলল, 'তুই আর একবার চেঁচা, আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। ইউ আর আসকিং ট্রাবলস্। তোর এইসব কথা কারও কানে গেলে পুলিশ এখানে পৌঁছে যাবে। বহুৎ ধুর পাবলিক তুই।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল। যদিও তার গলা এবার নিচুতে, 'এটাও তোর কথা নয়। সুদীপের ভাষা তুই বলছিস, দ্যাখ তোদের মধ্যে কি মিল।'

জয়িতার চোয়াল শক্ত হল, 'কল্যাণ, তুই কি বাগডোগরা যেতে রাজী হচ্ছিস না?'

কল্যাণ জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। ও তখনও বসেছিল ব্যালকনিতে। জয়িতা ঠিক করল ব্যাপারটা আনন্দর ওপরে ছেড়ে দেবে। সে ঘরে ঢুকে বলল, 'শোন, আমাদের একসঙ্গে বের হতে হবে। কারণ আমরা একসঙ্গে এখানে ঢুকেছি। তোর টিকিট নিয়ে তুই আলাদা ফ্লাই করবি। আমার সঙ্গে বাগডোগরাতে পৌঁছনো পর্যন্ত তোর কোন সম্পর্ক নেই।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না কল্যাণ। জয়িতা যখন তৈরি হবার জন্যে বাথরুমে ঢুকছে তখন সে বলল, 'আমি কখনও প্লেনে যাওয়া আসা করিনি।'

'এমন কোন হাতি ঘোড়া ব্যাপার নয়। ভেতরে ঢুকে সোজা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বাগডোগরা কাউন্টারে চলে যাবি। আই সি দুশো একুশ। টিকিট এন্ডর্স করিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে নিবি। সবাই যখন সিকিউরিটি চেকিং-এ যাবে তুইও যাবি। তারপর ফ্লাইট রেডি হলে প্লেনে উঠে বসবি। এত পরিশ্রম করেছিস সারা জীবন, এটুকু নিশ্চয়ই জলভাত।' জয়িতা বাথরুমে ঢুকে গেল। এবং তখন কল্যাণের নিজেকে খুবই পাতি বাঙালী বলে মনে হতে লাগল।

জয়িতা তার কথা রেখেছিল। কল্যাণের মনে পড়ল আনন্দর নির্দেশও এরকম ছিল। ওরা আলাদা বোর্ডিং কার্ড নিয়ে আলাদা বসেছে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। কল্যাণের চোখ চারপাশে ঘুরছিল। এসব জায়গায় নিশ্চয়ই পুলিশের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ করলে আর প্লেনে উঠতে হবে না। প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কেউ সঙ্গী হলে তার সঙ্গে কথা বলে বেশ সময় কাটানো যায়। কিন্তু বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার পর অনেক সময় চলে গেছে কিন্তু এখনও ডাক পড়ছে না। অনেক দূরে একটা রঙিন চেয়ারে বসে জয়িতা 'দেশ' পড়ছে। যেন কিছুই জানে না এমন ভঙ্গি। দূরে একজন লোক তার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। আতঙ্ক এতটা বাড়ছে যে কল্যাণ প্রথমবার প্লেনে উঠতে যাওয়ার উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিল না। সে দেখল লোকটা এবার জয়িতাকে লক্ষ্য করছে। কল্যাণের মনে হল জয়িতাকে একবার সাবধান করা উচিত। সেইসময় জয়িতা উঠল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাতড়াল। তারপর অলস ভঙ্গিতে কিছুটা হেঁটে

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলল। কল্যাণ দেখল, লোকটা চটপট উঠে একটা লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিল। জয়িতা এখন হেসে হেসে লোকটার সঙ্গে গল্প করছে। এবং এই গল্প করার ভঙ্গিটি ভারি মিষ্টি। একসঙ্গে ভয় এবং ঈর্ষায় আক্রান্ত হল কল্যাণ। জয়িতা যখন তাদের সঙ্গে কথা বলে তখন এই ভঙ্গিটা একদম থাকে না।

প্লেনে উঠে বসার প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে যাওয়ার পর কল্যাণ লক্ষ্য করল চারপাশে যারা বসে আছে তাদের প্রত্যেকের চেহারা ঠিকঠাক বড়লোকদের মত নয়। কেউ কেউ এমন সাধারণ যে ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানিয়ে যায় বেশি। অবশ্য পশ্চিমবাংলার এক শ্রেণীর মানুষ প্রচুর টাকা জমিয়েও নিজের পরিমণ্ডলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেন না অভ্যেসে। ওই যে সামনের লোকটা, এয়ার হোস্টেসের বাড়ানো থালা থেকে যেভাবে এক থাবা লজেন্স তুলে নিল তাতে লোকটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কল্যাণ দেখল বেশ কিছুটা দূরে জয়িতা সেই লোকটার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত গল্প করছে। এয়ারপোর্ট থেকেই ওর দিকে একবারও তাকায়নি মেয়েটা। এখন আর রাগ নেই কিন্তু এক ধরনের কষ্ট তৈরি হচ্ছে বুকের মধ্যে। মেয়েরা কি সহজে উপেক্ষা করতে পারে! শুধু উপেক্ষা করাই নয়, সেটা বুঝিয়ে দিতে পারার পটুত্বও তাঁদের অসাধারণ। অথচ এই মেয়েটি যদি বড়বাজারে গ্রেনেড না ছুঁড়ত তাহলে সুদীপের ভাষায় সে এতক্ষণে ছবি হয়ে যেত। কিন্তু সে-কারণে যে কৃতজ্ঞতা তা চাপা পড়ে যাচ্ছে ঈর্ষাপ্রসূত কষ্টে। কল্যাণ ব্যাপারটাকে ভোলার জন্যই জানলার দিকে তাকাল। মেঘের ওপর লঞ্চের মত ভেসে যাচ্ছে প্লেন। সাদা মেঘের শরীরে রোদ কত রকম রঙের নকশা বুনছে। নিচের পৃথিবীটা এখন আড়ালে। কল্যাণ আবার প্লেনের ভেতরটা দেখল। চারপাশে খুব স্বচ্ছন্দ মানুষজন। এখানে আর কাউকে পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি জয়িতার সঙ্গে গল্প করা লোকটা হঠাৎ খুব নিরীহ হয়ে গেছে। এখন মাথার ওপর সিগারেট নেভানো কিংবা বেল্ট বাঁধার নির্দেশ নেই। কল্যাণ আচমকা সিট থেকে উঠে পড়ল। যদিও এয়ার হোস্টেস ছাড়া কেউ প্যাসেজে হাঁটছে না তবু সে কাঁপা পায়ে জয়িতার কাছে চলে এল। তারপর কথা বলতে গিয়েও ঢোক গিলল। লোকটা জয়িতার হাতের রেখা বিচার করছে। যেন ভুল করে চলে এসেছে এমন ভঙ্গি করে সে আবার নিজের সিটে ফিরে এল। যে মেয়ে বোমা ছোঁড়ে সে হাতের রেখা গোনাতে চায়? কল্যাণের সব উলটো-পালটা হয়ে যাচ্ছিল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার মনে পড়ল কেউ না ধরিয়ে দিলে এক হাতে দেশলাই জ্বালাবার কায়দাটা সে রপ্ত করতে পারেনি এখনও। আর তখনই নো স্মোকিং নির্দেশটা জ্বলে উঠল। কল্যাণ স্বস্তি পেল। ওটা না জ্বললে তাকে চেষ্টা করতেই হত সিগারেট ধরাতে। তখন যদি হার হত সেটা বেশি লজ্জার। লজ্জাটা পেতে হল না।

দমদমের কাছে বাগডোগরাকে এয়ার পোর্ট বলে মনে হয় না। এমন কি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব হালকা। জয়িতাকে লক্ষ্য রেখে কল্যাণ প্লেন থেকে নেমে ছোট্ট বিল্ডিংটায় চলে এল। তার একটা হাত এখনও অকেজো, অন্যটায় মাল বইতে হবে। এখান থেকে শিলিগুড়ি কত দূর? এসব অঞ্চলে সে কখনও আসেনি। ঘড়িতে দুটো পনেরো। আনন্দদের ট্রেন নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছবে চারটের পর। ওদের ওপর নির্দেশ আছে সোজা সিনক্লেয়ার নামের একটা হোটেলে গিয়ে উঠতে। কিন্তু ওদের বলতে আর যাকে বোঝাচ্ছে তিনি তো এখনও চেনার ভান করছেন না। মালপত্র খালাস করে কাঁধে স্ট্র্যাপ ঝোলানো যেহেতু এক হাতে সম্ভব নয় তাই ভারী হলেও হাতেই নিল কল্যাণ। তারপরেই জানল এখান থেকে একটা বাস সোজা ওই হোটেলটাতেই নিয়ে যায়। অনুসরণ করে সেই বাসটায় উঠে বসল সে। মোটামুটি ভরতি হলে বাসটা যখন ছাড়ল তখন জয়িতা নেই। এবার উদ্বিগ্ন হল কল্যাণ। সে শুনেছে রাগ করলে মেয়েরা নাকি অন্ধ হয়ে যায়। তখন কোন যুক্তি বা সম্পর্কের কথা খেয়ালেই রাখে না। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতটা দেখতে পেল তার মধ্যে জয়িতার অস্তিত্ব নেই। গুম হয়ে বসে রইল সে। সুন্দর পিচের রাস্তা দিয়ে বাস ছুটছে। দু'পাশে এয়ারফোর্সের ক্যান্টনমেন্ট। সাইকেলে সৈনিকরা আসা যাওয়া করছে। হঠাৎ জয়িতাকে ছাপিয়ে কল্যাণের মাথায় অন্য চিন্তা প্রবল হল। এইসব তরুণ য়ারা এখানে য়ুনিফর্ম পরে সাইকেলে কর্তব্য করতে যাচ্ছে তারা কি শুধুই পেটের জন্য চাকরি করতে এসেছে না দেশের প্রতি ভালবাসাও কাজ করছে?

শিলিগুড়ি শহরে ঢোকার আগেই বাঁ দিকে হোটেলটা। সুন্দর সাজানো। দেখলেই বোঝা যায় দক্ষিণা কম হবে না। আনন্দরা যে টাকা দিয়েছিল তা ওরা ভাগ করে নিয়েছিল কিন্তু ভি. আই. পি. রোডের

গেস্ট হাউসের টাকা কল্যাণই মিটিয়েছিল। এখন পকেটে পড়ে রয়েছে সামান্য এবং এখানকার ভাড়াটাও অজানা। বাস থেকে নেমে ইতস্তত করল কল্যাণ। তারপর ব্যাগটাকে বয়ে রিসেপশনের দিকে এগোতেই জয়িতাকে দেখতে পেল। খুব সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের পাশে। ওকে দেখে যে কায়দায় 'হাই' বলে হাত তুলল তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে পারল না। যেন কতকাল পরে দেখা হয়েছে, সেই ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বলল, 'ওঃ, শেষ পর্যন্ত তোমাকে দেখলাম! আমি ভাবছিলাম যদি তুমি না আসো ওই ফ্লাইটে।' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রিসেপশনের লোকটিকে বলল, 'ওয়েল! হি ইজ হিয়ার।'

লোকটি তার শেখা হাসিটি হাসল। নিজেরা নয়, বেয়ারা তাদের ঘরে মালপত্র পৌঁছে দিলে জয়িতা বলল, 'বাঃ, তুই বেশ সাবালক হয়ে গেছিস তো!'

বেয়ারা চলে গিয়েছিল। কল্যাণ বলল, 'এভরিথিং হ্যাজ লিমিট জয়িতা। তুই আমাকে অকারণে এভাবে অপমান করতে পারিস না। আমি ওদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বলব।'

জয়িতা হাসল, 'কি বলবি? কলকাতা থেকে পালাতে হচ্ছে বলে তোর আফসোস হচ্ছিল! কেন এই অ্যাকশনে জড়িয়ে পড়লি! তাই নিয়ে আমি তোকে ঠাট্টা করেছিলাম। তুই এত জোরে চেঁচিয়েছিলি যে পুলিশ আসতে পারত। তারপর তোর সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করেছিলাম, এই তো?

কল্যাণ হতভম্ব হয়ে তাকাল। সে যে এতক্ষণ অভিমান এবং ঈর্ষা থেকে অসহায় হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্যেই এক ধরনের ক্রোধ বড় হয়ে উঠছিল আচমকা সেটা গুটিয়ে গেল। কোনরকমে সে বলতে পারল, 'জয়িতা, আমি তোকে খুব মিস করছিলাম।'

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, 'ঘণ্টাখানেক চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাক, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।' যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে এমন ভঙ্গি করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। নরম বিছানায় বসে কল্যাণের শরীরে হঠাৎ কাঁপুনি এল। সে কি খুব ভীরু? খুব মেরুদণ্ডহীন? জয়িতার ভাষায় নাবালক? মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের যাবতীয় দোষ তার মধ্যে? কেন কলকাতা থেকে পালাতে গিয়ে তার মনে হল যা করেছে তার কোন মানে হয় না মানে কি সত্যিই হয়? আর করবে বলে যখন নেমেছিল, রাজী হয়েছিল, তখন করার পর তাই নিয়ে আফসোস কেন এল মনের মধ্যে? সেটা কি কাপুরুষতার জন্যে? আর এখানেই আনন্দ-সুদীপ-জয়িতার থেকে সে পিছিয়ে! কি অভিযোগ করবে সে জয়িতার বিরুদ্ধে? গেস্ট হাউস থেকে বের হবার পর কথা বলেনি, না চেনার ভান করেছে, একা হোটেলে চলে এসেছে? কিন্তু হোটেলে তো এসেছে, আগে থেকে ঘর বুক করে রেখেছে! অভিযোগ টিকবে? সত্যি কি কারও বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করার কিছু আছে? যদি কাউকে অভিযুক্ত করতেই হয় তাহলে—! মুখ তুলল কল্যাণ। আর তখনই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। এই মুখ সে কখনও দ্যাখেনি।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে ওরা শুনতে পেল জলপাইগুড়ি থেকে যে ট্রেনটা এইমাত্র এসেছে সেটা শিলিগুড়ির জংশন স্টেশনে যাচ্ছে। শিলিগুড়িতে যেতে হলে মিনিবাস অথবা রিকশা ভরসা। এই ট্রেনটাকে সবসময় পাওয়া যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক সময়ে আসায় ছাড়ব-ছাড়ব ট্রেনটাকে দেখা যাচ্ছে। পুরোনো আমলের ইঞ্জিন, কামরা আরও খারাপ। তবে মিনিট কুড়ি পঁচিশের বেশি যাত্রা নয়, ওরা ওতেই উঠে বসল। সুদীপ এখন ফিট। সমস্ত ট্রেনে ওরা দুজন পাশাপাশি বসেনি। এখানেও বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে এক কামরায় বসল। এবং তখনই আলোচনা শুনতে পেল। রেডিওতে খবর হয়ে গেছে। বারংবার মন্ত্রীর মৃত্যুর খবরটা বলছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার জরুরী মিটিং বসেছে আজ দুবার। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে সতর্ক করেছেন, অবিলম্বে হত্যাকারীদের ধরার জন্যে। প্রধানমন্ত্রী নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এটা কোন সুগঠিত রাজনৈতিক দলের কাজ নয়। চারজন বিপথগামী তরুণ এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। তাঁর মতে বিকৃত রাজনৈতিক চিন্তার ফসল। এদের পেছনে কোন দল বা জনসাধারণের সমর্থন নেই। শুধুই ঘাতক ছাড়া কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। দুপুরের খবরে বলা হয়েছে ডায়মন্ডহারবার থেকে আনন্দ নামে একটি যুবকের মাকে পুলিশ আরও জেরা করার জন্যে লালবাজারে নিয়ে এসেছে। ওই মহিলার স্বামী নকশালপন্থী ছিলেন। পুলিশের অনুমান চারজনের ওই দলের নেতা হল আনন্দ। মহিলাকে তাঁর ছেলের হোস্টেলে যেতে দেখা গিয়েছে।

পুলিশের ধারণা হত্যাকারীরা এখনও শহরে আছে। তাদের সম্ভাব্য আস্তানা খুঁজে বের করা হচ্ছে। জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যারা ওই রকম তিনটে ঘটনা ঘটিয়েছে এবং দুটো ঘটনা ঘটাবার পরও শহর ছেড়ে যায়নি তাদের সম্পর্কে সামান্য সংবাদও পুলিশকে জানাতে হবে। এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনুমান করা হচ্ছে সব সকমের ভারী অস্ত্র এদের কাছে আছে।

আনন্দর মুখের কোন পরিবর্তন হল না। মাকে ওরা লালবাজারে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই অত্যাচার করবে। এখান থেকে সে তার কোন প্রতিকারই করতে পারবে না। একমাত্র ধরা দেওয়া ছাড়া। কলকাতায় থাকলেও অবস্থার কোন হেরফের হত না। আর এ ব্যাপারে সহানুভূতি দেখানো সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করবেন মা নিজে। যে মানুষটা সারাজীবন কারও সহানুভূতির তোয়াক্কা না করে একা সংগ্রাম করে গেল তাঁর এসবে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। তিনি স্বামীর কর্মকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, পুত্রের কাজের জন্যেও নিজেকে ছিবড়ে করতে হচ্ছে। কিন্তু আনন্দ নিজেকে অপরিবর্তিত রাখল। হঠাৎ সে শুনল সুদীপ তার পাশের লোককে বলছে, ‘এসব নকশালরা করছে না তো!’

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, ‘দূর! এসব করার হিম্মত ক’জনের আছে? পাবলিকলি বলা উচিত নয় কিন্তু ওদের কাজকে আমি সমর্থন করি। শালা, এদেশে আইনফাইন আন্দোলন করে কিছু হবে না। ওরা প্যারাডাইস পুড়িয়েছে ঠিক করেছে। বড়বাজারে বোমা ফেলার হিম্মত দেখিয়েছে জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস করে। কোন অন্যায় করেনি। নিজেদের স্বার্থে কিছু করেনি। আর মন্ত্রী-হত্যা?’ লোকটা সময় নিল একটু, ‘এই হত্যাকাণ্ড অবশ্য বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু মন্ত্রীমশাই সুবোধ বালক ছিলেন না।’

‘সুবোধ বালক কি মশাই! বহুৎ দু’নম্বরি লোকছিল! পার্টি কি করে ওকে এতদিন সহ্য করেছিল তাই বিস্ময়ের ব্যাপার! স্বনামে বেনামে যা সম্পত্তি করেছে, সাতপুরুষ খেয়ে যাবে।’

আর একজন বলল, ‘ওটা পার্টির ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনরকম রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়া ধরে ধরে মানুষ খুন করলেই হল? কি না, পাবলিকের উপকার করতে চান! রবিনহুড। এরা বিপ্লবের শত্রু।’

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন চিৎকার করে উঠল, ‘রাখুন মশাই বিপ্লব! ওই কথাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। এদেশে বিপ্লব করবে কে? আপনারা? টাটা বিড়লাকে আদর করে ব্যবসা করতে ডাকছেন, এক লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষকে গরিব বলছেন, এয়ারকন্ডিশনড অফিস না হলে পার্টির মিটিং করতে পারবেন না যাঁরা তাঁরাই বিপ্লব বিপ্লব করে চেঁচাবেন। লাস্ট লোক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, তাঁর পরে আর কেউ নেই। এ ছোকরাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, এরা প্রমাণ করছে এদের মেরুদণ্ড আছে। দেশটা কেন্নোয় ভরে যায়নি।’

তপ্ত আলোচনার মাঝখানে টাউন স্টেশন এল। সেখানে নেমে গেল বেশিরভাগ মানুষ। জংশন স্টেশনে এলে ওরা প্লাটফর্মে নামল। অযত্ন শব্দটা স্টেশনের সঙ্গে পোস্টারের মত সাঁটা। এমনকি টিকিট চেকার নেই টিকিট নেবার জন্যে। ওরা একটা তিন চাকার রিকশা নিল। সুদীপ প্রথম কথা বলল, ‘মাসিমাকে অ্যারেস্ট করেছে বোধ হয়।’

আনন্দ জবাব দিল, ‘শুনলাম। কালকের কাগজ দেখলে বোঝা যাবে।’

‘তোর কোন চিন্তা হচ্ছে না?’ সুদীপ আনন্দর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

‘হচ্ছে।’ একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল আনন্দ।

দিল্লি হোটেলে ওরা একটা ঘর নিল। মধ্যবিত্তদের হোটেল। খাতায় উলটোপালটা নামধাম লিখে ঘরে ঢুকে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘এখনই বের হবি?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘না। সন্ধ্যে হোক তারপর। ওরা দুজন ঠিকঠাক এলে হয়।’

সুদীপ বলল, ‘কল্যাণটাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। ওর মধ্যে টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত ভালমানুষী আছে যেটা ক্যামোফ্লেজ করবে। কিন্তু জয়িতার চেহারার বর্ণনা পেলে ওকে লোকেট করতে একটা হাবা কনস্টেবলেরও অসুবিধে হবে না।’

আনন্দ বলল, ‘চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ফ্রেস হয়ে নে, তোর সঙ্গে আলোচনা আছে।’

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘একবার ওদের হোটেলে টেলিফোন করবি?’

‘না। সন্ধ্যের পর গেলেই ভাল। তুই যাবি?’

‘আপত্তি নেই। তুই যাবি না?’

'দুজনে একসঙ্গে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। খোলাখুলি বলছি, ওরা যদি কলকাতায় ধরা পড়ে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে এই শহরে থাকাটাই বিপজ্জনক। চাপের মুখে কল্যাণ কতটা স্থির থাকবে বলা মুশকিল। আমিই ওদের হোটেলে উঠতে বলেছি, শেষ মুহূর্তে পুলিশ আমাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে পারে। এক্ষেত্রে তোর যদি যেতে আপত্তি থাকে তাহলে—।' আনন্দ কথাটা শেষ করল না।

'আগেই বলেছি আপত্তি নেই।' সুদীপ উঠে পড়ল। স্নান করা দরকার। সমস্ত শরীর বড় নোংরা হয়ে রয়েছে। গায়ে জল না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যের পর আনন্দ আর সুদীপ একসঙ্গে বের হল। আনন্দ গেল রকেট বাস স্টেশনের কাছে। কাল খুব ভোরে একটা জিপ ভাড়া করতে হবে। যদি অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া যায় তাহলেও ঘণ্টা সাড়ে তিন-চার লাগবে। সুদীপের সঙ্গে কথা হল যে কোন অবস্থাতেই ও রাত ন'টায় হোটেলে ফিরে আসবে। সময়টা অতিক্রান্ত হলে আনন্দ নিজের মত সিদ্ধান্ত নেবে। সুদীপ একটা রিকশা নিল। মনে হল এদিকটা যেহেতু শহরের প্রান্ত তাই ব্যাপক হারে জনবসতি গড়ে ওঠেনি। নেপালী-পাঞ্জাবী একটু বেশি চোখে পড়ছিল। শহর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই হোটেলটা দেখতে পেল সুদীপ। রিকশা ছেড়ে দিয়ে সে পায়ে পায়ে হোটেলে ঢুকতেই জয়িতাকে দেখতে পেল। এ মেয়ে জয়িতা না হয়ে যায় না। এখন রাত। বাতাসে গরম ভাবটা নেই। হোটেলের সামনেও লনে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই লনে চুপচাপ পায়চারি করছে জয়িতা। একা একা। সুদীপের বিরক্তি হল। মেয়েটা গর্দভ নাকি! এইভাবে লনে ঘুরে ঘুরে নিজেকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরছে!

সুদীপ জয়িতার কাছে এগোল না। সে দূর থেকে জয়িতাকে লক্ষ্য করতে লাগল। মাঝে মাঝে গাড়ি ঢুকছে এবং বেরুচ্ছে। হোটেলের বাইরেটায় আপাতত কোন চাঞ্চল্য নেই। বোধ হয় কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করায় জয়িতা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দার একটা চেয়ারে বসল। আর ঠিক তখনই ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ভাল স্বাস্থ্য, কাঁধদুটো বেশ চওড়া, সিগারেট খেতে খেতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অলস ভঙ্গিতে একবার জয়িতার দিকে তাকাল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সুদীপ লোকটার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল। দরজাটা আবার বন্ধ করে লোকটা ফিরে দাঁড়াল। সেখানে থেকেও জয়িতাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও আলোটায় তেমন তেজ নেই তবু বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু লোকটা যদি শুধু মেয়ে দেখবার বাসনায় দাঁড়ায় তাহলে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যে ধরনের নারী শরীরের দিকে একবার তাকালে পুরুষমানুষ মাছির মত আটকে যায় জয়িতা তা থেকে অনেক দূরে। ধীরে ধীরে লোকটা আবার হোটেলের সিঁড়ি ভাঙল। একটু ইতস্তত করে সোজা জয়িতার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা হাসল। জয়িতা যে একটু অবাক হয়েছে বোঝা গেল। লোকটা হেসে হেসে কথা বলছে। জয়িতা বারংবার মাথা নাড়ছে। হাসছে সেও। তারপর লোকটা চটপটে পায়ে ফিরে গেল তার গাড়ির কাছে। গাড়িটা যখন গেট পেরিয়ে সুদীপকে অন্ধকারে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন খুব কাছাকাছি স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এবং তৎক্ষণাৎ মনে হল এই লোকটা পুলিশ না হয়ে যায় না। ওই চোয়াল ওই শারীরিক গঠন পুলিশদেরই হয়। গাড়ির নম্বরটা দেখে কিছুই মনে হচ্ছে না। সুদীপ দেখল জয়িতা উঠে ভেতরদিকে এগোচ্ছে। সে আর দেরি করল না। যতটা সম্ভব দৌড়ে দূরত্ব কমিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়ল। রিসেপশনের লোকটা মাথা নিচু করে হিসাব করছিল। একটা দারোয়ান এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল। সুদীপ গতি কমিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গি করে হাঁটতে লাগল। জয়িতাকে দোতলার সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে। কেউ তাকে কিছু বলল না বোধ হয় তার সহজ অভিব্যক্তির জন্যেই। ডানদিকের একটা ঘরের দরজা খুলে একবার পেছন ফিরতেই জয়িতার মুখ উজ্জ্বল হল। সুদীপ ইশারায় তাকে ভেতরে ঢুকতে বললে জয়িতা মুখের হাসিটা মুছল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সুদীপ দেখল কল্যাণ শুয়ে আছে। ওকে দেখেই সে নিজের হাত বাঁচিয়ে উঠে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে?'

'ঠিক ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে বেঠিক শুরু হল। তুই একা একা লনে কি করছিলি?'

সুদীপের প্রশ্নটায় জয়িতার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'হাওয়া খাচ্ছিলাম।'

'ইউ হ্যাভ ইনভাইটেড বান্ধু। লোকটা তোকে কি জিজ্ঞাসা করছিল?'

'কোন্ লোকটা?'

'উঃ, একটু আগে যার সঙ্গে তুই কথা বলছিলি!'

'ওঃ! ভদ্রলোক বললেন আমাকে ওর খুব চেনা-চেনা লাগছে। আমি কি বাই এনি চান্স শিলং-এ থাকতাম! আমি না বলতে উনি বললেন, দুঃখিত আপনাদের চেহারায় ভীষণ মিল। তখন উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা জানতে পারি? আমি বললাম ইটস অ্যান ওল্ড ট্রিক। আপনি সোজাসুজি জানতে চাইলে পারতেন। শোনার পর চলে গেলেন। দ্যাটস্ অল।' জয়িতা দুটো হাত নেড়ে কথা শেষ করল।

সুদীপ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, 'প্যাক আপ। তোদের এখনই হোটেল ছাড়তে হবে। আমার বিশ্বাস লোকটা পুলিশ। তোকে দেখার পর ওর ভাবভঙ্গি দেখে আর যাই হোক কোন রোমিওকে আমার মনে পড়েনি। হি ইজ পুলিশম্যান। আই অ্যাম সিওর, আধঘণ্টার মধ্যে এখানে পুলিশ ফোর্স এসে যাবে। কুইক কুইক।'

কল্যাণ ততক্ষণে তার ব্যাগ তুলে নিয়েছে একহাতে, 'উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাইরে গেলেন হাওয়া খেতে। একেই বলে যেচে বাঁশ নেওয়া!'

'আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করিনি কল্যাণ। তোর কমপ্লেক্স থেকে এসব বলছিস।'

'ওঃ স্টপ ইট! বলছি সময় নেই।' সুদীপ জয়িতাকে থামাল, তারপর হাত লাগাল ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবার জন্যে। তৈরি হয়ে জয়িতা বলল, 'হোটেলকে কি বলব? হঠাৎ কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছি? আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা এখানে এসেছি।'

'আমরা কতক্ষণ হোটেলে থাকব সেটা আমাদের ইচ্ছে। একদিনের টাকা ওদের দিয়ে দে। লেটস গো। কল্যাণ তোর ব্যাগটা আমাকে দে।' সুদীপ হাত বাড়াল।

কল্যাণ আপত্তি করল, 'আমিই নিতে পারছিলাম।' সুদীপ আপত্তি শুনল না।

রিসেপশনের লোকটাকে জয়িতা সুন্দর বুঝিয়ে দিল। ওর ভাই খবর পেয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে। কিছুতেই হোটেলে থাকতে দিতে রাজি নয়। সুতরাং তাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। একদিনের ভাড়া মিটিয়ে দিল সে। কল্যাণ দেখল টাকাটা কম নয়। বাইরে বেরিয়ে সে বলল, 'তোর জন্যে ঝামেলা হল। বেশ আরামদায়ক ঘর ছিল।'

যেহেতু কেউ কোন কথা বলল না তাই শব্দগুলোকে বড্ড ফাঁকা শোনাল। ওরা বাইরে কোন রিকশা পেল না। অতএব হাঁটা ছাড়া কোন উপায় নেই। খানিক পরে দু'পাশে দোকান রেখে হাঁটছিল ওরা। এটাই একমাত্র সড়ক। সুদীপের খেয়াল হল এইভাবে হাঁটা ঠিক হচ্ছে না। পুলিশ নিশ্চয়ই এই পথেই হোটেলে আসবে। সেক্ষেত্রে সামনাসামনি পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া চারজন একসঙ্গে থাকাও উচিত নয়। নিজেদের হোটেলে এদের নিয়ে যেতে সাহস হল না ওর। পুলিশ হোটেলে গিয়ে জানতে পারবে এরা হোটেল ছেড়ে গেছে। আর সময় নষ্ট করবে না ওরা। সন্দেহটা সত্যি বোঝা মাত্র পুলিশ ব্যাপক তল্লাসি চালাবে। কোন হোটেল বাদ দেবে না। সেক্ষেত্রে আনন্দ এবং তারও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। সুদীপ চটপট সিদ্ধান্ত নিল, 'তোরা রাত্রের খাওয়া খেয়েছিস?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'না। এই সন্ধ্যেবেলায় কি কেউ রাতের খাওয়া খায়?'

বাঁ দিকে একটা চাইনিজ খাবারের দোকান নজরে পড়েছিল। সেটা দেখিয়ে সুদীপ বলল, 'তোরা ওখানে গিয়ে টিপিক্যাল খাবারের অর্ডার দিবি যাতে সার্ভ করতে বেশ সময় নেয়। আমি আর আনন্দ না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবি।'

ওরা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে সুদীপ পা বাড়াল। মিনিট পাঁচেক লাগল তার হোটেলে পৌঁছতে। আনন্দ তখনও ফেরেনি। হোটেলের ম্যানেজারকে সে সেই মিথ্যেটাই বলল যা জয়িতা ওর রিসেপশনে বলেছিল। টাকাপয়সা মিটিয়ে সে আবার রিকশটা নিয়ে শহরের দিকে যেতেই দেখতে পেল তিনটে পুলিশের গাড়ি হর্ন বাজাতে বাজাতে শহর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তিনটেতেই পুলিশ ভর্তি। আর সময় নেই। সুদীপের মনে হল ঈশ্বরটিশ্বর না থাকলেও ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার আছে।

রকেট বাস স্টেশনের সামনে বেজায় ভিড়। কলকাতার জন্যে রকেট বাস ছাড়ছে। সুদীপ কলকাতা শব্দটা পড়তে পারল। আর তখনই বুকের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া হল তার। এখানে আনন্দকে খুঁজে

পাওয়া মুশকিল হবে। দাঁড়িয়ে থাকা একটা জিপকে দেখে তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'দার্জিলিং যাবে কিনা।'

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, 'কাল সকাল সাতটায় যেতে পারে।' তারপর হেসে বলল, 'আপনি এখন যেতে চাইছেন আর একজন এসেছিল চারটের সময় যাবে বলে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আজ।'

প্রায় মিনিট পনেরো ঘোরার পর একটা মিষ্টির দোকানের সামনে আনন্দকে দেখতে পেল। একটি নেপালী ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সুদীপ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এনি প্রব্লেম?'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল, 'কেউ ভোরে যেতে রাজি হচ্ছে না। সকাল ছ'টায় বেরুতে হবে।'

'এখন কেউ যাবে?' সুদীপ প্রশ্ন করল।

'এখন? এখন কেন? গোলমাল হয়েছে?' সুদীপের দিকে তাকাল আনন্দ।

'পরে বলছি। আগে চেষ্টা কর এখন যদি কেউ যায়।'

নেপালী ছেলেটি কথা শুনছিল। সে বলল, 'এখন যদি দার্জিলিং যান তো বীরবাহাদুরের গাড়িতে যেতে পারেন। ওকে কাল ভোরে টাইগার হিলে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে হবে দার্জিলিং থেকে। কিন্তু সকাল ছ'টার আগে কেউ যাবে না।'

সুদীপ জবাব দিল, 'তুমি বীরবাহাদুরকে খবর দাও। ভোরে যেতে না পারলে আমরা এখনই যাব।' কথাটা শোনামাত্র ছেলেটা লাফিয়ে ছুটে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? ও এতক্ষণ আমাকে জপাচ্ছিল যাতে বীরবাহাদুরের গাড়িটা নিয়ে এখনই রওনা হই। রাত্রে পাহাড়ে ওঠায় রিস্ক অনেক বলে আমি রাজি হইনি। কল্যাণরা কি শিড়িগুড়িতে আসতে পারেনি?'

'পেরেছে।' সুদীপ মাথা নাড়ল। তারপর সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল। এখন পুলিশ হোটেলে ছুটেছে জেনে ওর চোয়াল শক্ত হল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণ আর জয়িতার মধ্যে কি নিয়ে লাগল?'

'কমপ্লেক্স। অন্তত জয়িতা বলেছে তাই।' সুদীপ কথা শেষ করা মাত্র একটা ল্যান্ডরোভার সামনে এসে দাঁড়াল। নেপালী ছেলেটা বলল, 'দোশো লাগেগা।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপ বলল, 'রাজি হয়ে যা।'

হোটেল থেকে মালপাত্র গাড়িতে তুলে নিয়ে ওরা সেই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়াতেই দেখল পুলিশের জিপগুলো শহরে ফিরে যাচ্ছে। সুদীপ গিয়েছিল ওদের ডেকে আনতে। বীরবাহাদুর নামের লোকটার চেহারা প্রায় পাখির মত। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত্রে পাহাড়ের রাস্তায় কোন ভয় নেই?'

বীরবাহাদুর বলল, 'ভয় আছে বলেই তো রাত্রে কেউ দার্জিলিং-এ যায় না। আমি না গেলে মালিক ফাঁসিয়ে দেবে বলেই যাচ্ছি। তবে আমি যতক্ষণ স্টিয়ারিং-এ আছি ততক্ষণ আপনাদের কোন ভয় নেই।'

নেপালী ছেলেটা ড্রাইভারের পেছনে বসে আছে। আনন্দ একটা কথা ভেবে আশ্বস্ত হল, শিলিগুড়িতে কেউ নেই যে জানাবে তারা আজ রাত্রে দার্জিলিঙ-এ যাচ্ছে। অবশ্য দার্জিলিঙ তাদের গন্তব্যস্থল নয়। ম্যাপ অনুযায়ী তাদের ঘুম থেকে ঘুরে যাওয়ার কথা। এই সময় সুদীপ ওদের নিয়ে ফিরে এল। গাড়িতে উঠে কল্যাণ প্রথম অভিযোগ করল, 'সবে খাবার সার্ভ করেছে এই সময় সুদীপটা টেনে আনল। পেটে এখন ছুঁচোয় ডন মারছে।'

সুদীপ হাসল, 'এখন চিকেন চাউমেন খেতে গেলে বাকি জীবন জেলের লপসি খেতে হত।'

রাত্রের অন্ধকারে শিলিগুড়ি থেকে ল্যান্ডরোভারটা ছুটে যাচ্ছিল শুকনার দিকে।

শুকনা পর্যন্ত গাড়ি ছুটেছিল জেট-এর গতিতে। রাস্তা ফাঁকা, দু'পাশে চা-বাগান, সন্ধ্যে পার হয়ে যাওয়ায় চারধারের নিঃসাড় নির্জনতা অনন্তে ছড়ানো। সুদীপ বসেছিল কল্যাণের সঙ্গে ড্রাইভারের পাশে, ওরা দুজন পেছনে। যেতে যেতে সুদীপ প্রথম মন্তব্য করল, 'ফ্যান্টাস্টিক!'

আনন্দ বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল। কোন দ্রুতগতির হেডলাইট এখনও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য যদি পুলিশ সামান্য আঁচ করতে পারে তাহলে অয়ারলেসে সামনের যে কোন পুলিশ স্টেশনকে জানিয়ে দিলেই হয়ে গেল। পথ একটাই। নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছাতে গেলে এই পথেই যেতে হবে। সে চাপা গলায় একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর হাওয়া খাওয়ার জন্যে হোটেলের বাইরে আসার কি দরকার ছিল! এই সব ছেলেমানুষী কি রকম বিপদ ডেকে আনে দ্যাখ?'

অন্ধকার ছিল বলে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবু জয়িতা আনন্দকে দেখার চেষ্টা করল, 'আই অ্যাম সরি। আসলে কল্যাণটা মাঝে মাঝে এমন বোর করে! স্টিল আই অ্যাম সবি।'

আনন্দ মুখ ঘোরাল, 'আমি জানি না সামনে কি আছে!'

কল্যাণ খোঁচাটা গায়ে মাখবে না বলে ঠিক করল, 'তুই রুটটা চেঞ্জ করতে পারিস না?'

আনন্দ জবাব দিল, 'পাহাড়ের সঙ্গে চালাকি করে কোন লাভ নেই।'

সুদীপ এবার বলল, 'আমার ওপর ছেড়ে দে।' তারপর হিন্দিতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়ি কি দার্জিলিং শহরেই?'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'আপনি বাংলায় বলুন, আমরা বাংলা বুঝতে পারি।'

একটু অস্বস্তি হল সুদীপের, তারপর বলল, 'সরি, আমি বুঝতে পারিনি।'

ড্রাইভার রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমার বাড়ি দার্জিলিং-এ।'

'এখন ওয়েদার কি রকম?'

'ঠিকই আছে। লাক থাকলে টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে পাবেন।'

'ড্রাইভারের সঙ্গী ছোকরাটা শিস দিচ্ছিল। আনন্দ ঘড়ি দেখল। শুকনা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর মনে হল পৃথিবীতে কোথাও মানুষ নেই। এক জমাট অন্ধকার চারপাশে দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে। সুদীপ ড্রাইভারের সঙ্গে আগবাড়িয়ে ভাব জমাতে গিয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে। ওদের একটু আগের সংলাপ লোকটা কতটা শুনেছে অথবা শুনে কি বুঝেছে তা কে জানে! কপালে যা আছে তা হবে। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার পথ নেই। অসঙ্গত কিছু করলে এই ড্রাইভারই হয়তো পুলিশকে জানিয়ে দেবে তাদের কথা।

ধীরে ধীরে গাড়ি ওপরে উঠছে। হঠাৎ বাঁদিকে তাকাতেই অজস্র আলোর মালা চোখে পড়ল। যেন হীরে জ্বলছে দূরে পৃথিবীর গায়ে। সুদীপ বেশ উত্তেজিত হয়ে আবার বলল, 'ফান্টাস্টিক! শিলিগুড়ি, না?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ।'

শুধু ওইটুকুই। চোখের আড়ালে চলে গেলে গাড়ির হেডলাইট ছাড়া কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই। এবং এই রাত্রে ড্রাইভার যে গাড়িতে স্বচ্ছন্দ হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তা ওদের মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু লোকটা প্রতিটি বাঁক নেওয়ার আগেও যেন গতি কমানোর চেষ্টা করছে না। আনন্দ বলল, 'বাঁক ঘোরার আগে হর্ন দেওয়ার নিয়ম নয়? ওপাশ থেকে যদি গাড়ি আসে তাহলে টের পাবে না।'

. 'দিনের নিয়ম রাত্রে চলে না।' ওপাশ থেকে খুব জরুরী, মানে আমাদের মত না হলে, গাড়ি নামবে না। আর কোন গাড়ি যদি আসত তাহলে বহুদূর থেকেই হেডলাইটের আলো দেখতে পেত। এখন তো গাড়ি চালানো আরাম। কোন রিস্ক নেই। একটু পরে যখন কুয়াশা নামবে তখনই ঝামেলা।' ড্রাইভারের

গলা এখন বেশ স্বাভাবিক।

তিনধারিয়াতেও যখন কেউ পথ আটকাল না তখন মনের চাপ কমল। এবার একটু ঠাণ্ডা লাগছে। ওরা প্রত্যেকেই ফুলস্লিভ পরে নিতে গিয়ে কল্যাণকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ল। ওর প্লাস্টার করা হাতে সোয়েটার ঢুকবে না। আনন্দ একটা চাদর জয়িতার দিকে এগিয়ে দিল, 'এটা দিয়ে ওকে ভাল করে মুড়ে দে।'

বিরক্ত হয়ে কল্যাণ বলল, 'এই ল্যাঠাটাকে সরাতে হবে এবার। আমার হাত ঠিক হয়ে গিয়েছে। কোন পেন যখন ফিল করি না, তখন অসুবিধে রেখে লাভ কি!'

কথাটার জবাবে কিছুই বলল না কেউ। জয়িতা চাদরটা খুলে বলল, 'একটু হাত আলগা কর।' চাদর মোড়া হয়ে গেলে কল্যাণ হাসল। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ কি হল?'

কল্যাণ বলল, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। শীতকালে মা এইভাবে আমাকে আলোয়ানে মুড়ে দিত। খুব বাচ্চা ছিলাম তখন।'

জয়িতা মন্তব্য করল, 'তোর শৈশবকাল তো এখনও চলছে।'

পৌনে দু'ঘণ্টায় কার্শিয়াং এসে গেল।

ড্রাইভার গাড়িটাকে পার্ক করে বলল, 'পনেরো মিনিটের জন্যে ডিনার ব্রেক। ইচ্ছে হলে খেয়ে আসতে পারেন।'

সুদীপ লাফিয়ে নামল। নেমে বলল, 'আঃ!'

আনন্দ বলল, 'সবার একসঙ্গে খেতে যাওয়া উচিত হবে না। ব্যাগগুলো রয়েছে। তোরা যা, খেয়ে আয়।'

জয়িতা বলল, 'সবার যাওয়ার কি দরকার! সুদীপ গিয়ে কিছু নিয়ে আসুক।'

মিনিট দুয়েক বাদে সুদীপ ঘুরে এসে বলল, 'হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাচ্ছে গাড়িতে। এখানে এত তাড়াতাড়ি সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় কে জানত!'

আনন্দ তাকিয়ে দেখে নিল চারপাশে। ড্রাইভার এবং ছোকরাটা ধারেকাছে নেই। সে বলল, 'আমরা দার্জিলিং-এ যাচ্ছি না।'

কল্যাণ প্রশ্ন করল, 'তাহলে রাত্রে থাকব কোথায়?'

'ঘুম-এ।' আনন্দ বলল, 'দার্জিলিং-এ যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে। বারবার কপাল পরিষ্কার নাও হতে পারে। সেখানকার হোটেলগুলোতে পুলিশ এর মধ্যে রুটিন ইনস্ট্রাকশন পাঠাতে পারে। তাছাড়া আমরা যেখানে যেতে চাইছি তার রুট ঘুম থেকেই। যদি এই জিপটা সুখিয়াপোখরি কিংবা মানেভঞ্জন পর্যন্ত পৌঁছে দিত!'

সুদীপ বলল, 'ড্রাইভারটাকে রিকোয়েস্ট করব?'

'কোন লাভ হবে না মনে হচ্ছে। লোকটা এত রাত্রে উলটো পথে যাবে না। আর ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওকে জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় আমরা কোথায় যাচ্ছি!'

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'ঘুম-এ নামবি কি বলে?'

আনন্দ বলল, 'সেটা কোন প্রব্লেম নয়। বলব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখে কাল দার্জিলিং-এ যাব। এখন দার্জিলিং-এ গিয়ে হোটেলে উঠতে না উঠতেই আবার বের হতে হবে। মিছিমিছি কষ্ট করে কি লাভ!'

'দ্যাখ!' জয়িতা ছোট্ট মন্তব্য করল।

কার্শিয়াং ছেড়ে যত ওপরে উঠছিল তত শীত বাড়ছে। তবু গাড়ির ইঞ্জিন চালু থাকায় একটা তাপ ছড়াচ্ছে। আনন্দ কথা শুরু করল, 'আপনি কাল ট্যুরিস্ট নিয়ে কখন বের হবেন দার্জিলিং থেকে?'

'তিনটে নাগাদ।' ড্রাইভার জবাব দিল।

'তাহলে ঘুমাবেন কখন? এখনই তো দশটা বেজে গেছে।'

'কি করব, ডিউটি করতে হবে। মালিককে কথা দেওয়া হয়েছে। নইলে এই রাত্রে শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরি?' ড্রাইভারের গলার স্বরে অখুশি ফুটে উঠল।

আনন্দ বলল, 'আমরা তো কাল টাইগার হিলে যাব। পরশু ফিরে আসছি। চার ঘণ্টা হোটেলে থেকে

কি হবে? তাছাড়া এগারোটার সময় হোটেলে পৌঁছে তিনটেতে গাড়ি পাব?'

ড্রাইভার বলল, 'এখন তো কোন ড্রাইভারকে পাবেন না। তবে তিনটের সময় ওয়েদার ভাল থাকলে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা কার্শিয়াং-এ থেকে গেলে ভাল করতেন। এখনই গাড়ি ঠিক করে রাখলে ওরা ভোরে আপনাদের ডেকে নিয়ে যেত।'

যেন সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে এমন একটা শব্দ করল আনন্দ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাদের এখন টাইগার হিলে পৌঁছে দেবেন? শুনেছি ওখানে নাকি ট্যুরিস্ট লজ আছে।'

'এখন? মাথা খারাপ। আমি আর কোথাও যেতে পারব না।' ড্রাইভার বেশ জোরে বলল।

এরপর অনেকক্ষণ কথা হল না। সুদীপের ঠাণ্ডাটা ভাল লাগছিল। আনন্দ একটু কুঁকড়ে ছিল। জয়িতাকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু কল্যাণের বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার খুব শীত করছে।

হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম-এ কোন হোটেল নেই?'

এবার ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'ঘুম-এ থাকলে আপনাদের সুবিধে হবে। এখান থেকে টাইগার হিল হেঁটেও যাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হল ঘুম-এ কোন হোটেল নেই। থাকবেন কোথায়? স্টেশনে থেকে যেতে পারেন যদি ঘর খোলাতে পারেন।' তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এক রাত্রের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দেবেন?'

'কেন?' আনন্দর মনে হল লোকটা সাহায্য করতে চাইছে।

'তাহলে আমার এক বন্ধুকে বলতে পারি একটা ঘর ছেড়ে দিতে। ওর ভাই কালিম্পং-এ গিয়েছে। ঘরটা খালি আছে। যদি এক বাতের জন্যে পঞ্চাশ পেয়ে যায় খারাপ কি? ওরও লাভ হল, আপনাদেরও উপকার হল!'

যেন স্বর্গ পাওয়ার সম্ভাবনা শুনল আনন্দ, 'দেখুন না, প্লিজ, বড় উপকার হয় তাহলে।'

ঘুম স্টেশন ছাড়িয়ে একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। এখন এখানকার কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে না। কল্যাণের মনে হচ্ছিল তার হাড়ের ভেতরে ঠাণ্ডা ঢুকে গেছে। সুদীপ বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে রেলওয়ে স্টেশন হল ঘুম।'

জয়িতা প্রতিবাদ করল, 'না।' কাগজে দেখেছি আর একটা স্টেশন হয়েছে কোথাও!'

কল্যাণ দাঁতে শব্দ করে বলল, 'তোদের এখনও তর্ক করার ইচ্ছে হচ্ছে! উঃ, কি ঠাণ্ডা রে বাবা! কলকাতায় এবকম ঠাণ্ডা তিনদিন পড়লে অর্ধেক পপুলেশন কমে যেত।'

সুদীপ বলল, 'এতেই এই! ওয়ালাং চাঙ্-এ গেলে তো খাবি খাবি!'

কল্যাণ উত্তর দিল না। কিন্তু ওয়ালাং চাঙ্ নামক জায়গাটায় তো সুদীপও কোনদিন যায়নি। কেউ চাক্ষুষ করেনি। আনন্দ বইপত্র ঘেঁটে ওটাকে আবিষ্কার করেছে। তাই আগে থেকে সেটা সম্পর্কে ভীত হয়ে লাভ কি!

একটু বাদে ড্রাইভার ফিরে এল আর একটা লোককে নিয়ে। লোকটা নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, 'এ হল আমার বন্ধু। ওর ঘর খালি আছে। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ঘরে আমরা চারজন থাকতে পারব?'

লোকটা হিন্দিতে বলল, 'গরিবের ঘর। দোতলায় বলে খাট নেই। ওখানে ঠাণ্ডা লাগবে না। কিন্তু হুজুরেরা কাল চলে যাবেন তো?'

সুদীপ বলল, 'কাল ভোরেই চলে যাব। শুধু রাতটা কাটাতে চাই।'

লোকটা বলল, 'তাহলে ঠিক আছে। আমার ভাই কাল দুপুরে ফিরবে। তার আগে ঘর খালি করে দিলে চলবে। টাকাটা আগে দিতে হবে কিন্তু।'

'কেন?'

'আমার এই বন্ধুর কাছে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা ওকে এখনই শোধ করে দেব। আর আমি যে টাকা নিচ্ছি তা কাউকে বলবেন না।'

ড্রাইভারকে চুক্তি মতন টাকা দিয়ে দিল সুদীপ। ঘরভাড়াও মিটিয়ে দিল। তারপর মালপত্র নামিয়ে

লোকটাকে অনুসরণ করল। মাটিতে নেমে কল্যাণ হিহি করে কাঁপতে লাগল। ওর চাদর পেছন দিকে খুলে গিয়েছিল। আনন্দ সেটাকে ঠিক করে দিল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে সুদীপ বলল, 'ড্রাইভারটা খুব চালু। এই সুযোগে টাকাটা আদায় করে নিল। ব্যাটাকে ঘুম অবধি ভাড়া দিলে হত।' সামনেই একটা কুকুর ডেকে উঠতে লোকটা শিস দিল।

দরজা খুলে লোকটা ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা কাঠের সিঁড়ি দেখা গেল। একজন মহিলা লণ্ঠন হাতে নিচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। এত ঠাণ্ডাতেও তাঁর পরনে উলের ব্লাউজ আর সায়ার ওপরে মোটা কাপড় জড়ানো। লোকটা তাদের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে এল। মাঝারি সাইজের ঘর। নিচে সতরঞ্চি পাতা। তবে সেটা পাতার ধরনে বোঝা যায় খানিক আগে সেখানে ছিল না। ঘরে একটা ছোট্ট ডিমলাইট জ্বলছে। লোকটা দাঁত বের করে হাসল, 'এই হল ঘর। অসুবিধে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু এর চেয়ে ভাল কিছু নেই। আমার ভাই স্টেশনে কাজ করে।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতেই হবে।'

জয়িতা বলল, 'আপনাদের টয়লেটটা কোথায়?'

লোকটা টয়লেট শব্দটা বুঝতে পারল না। আনন্দ ওকে সরল করা মাত্র সে নিচে নির্দেশ করল। তারপর মুখ বাড়িয়ে নেপালিতে কিছু বলতেই মহিলা সাড়া দিলেন। লোকটি বলল, 'ওর সঙ্গে যান, নিয়ে যাবে। আমার বউ।'

জয়িতা নেমে গেলে ওরা মালপত্র রেখে আরাম করে সতরঞ্চিতে বসল। ঘরটা কাঠের কিন্তু ঠাণ্ডা কম। লোকটা ওদের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ তারপর হাঁটুমুড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'টাইগার হিল যাওয়ার জন্যে কি জিপ দরকার?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। তবে বুঝতে পারছি না ভোর তিনটের সময় উঠে যেতে পারব কিনা। যদি সকাল ছটায় বের হই তাহলে কিছু দেখতে পাব?'

লোকটা হাসল, 'না। তবে টাইগার হিলের দিন গিয়েছে। এখন সবাই সান্দাকফুতে সানরাইজ দেখতে যায়। কিন্তু সাহেবরা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে কাল খুব ভোরে উঠে ওই জানালাটা খুলে দিতে পারেন। চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবেন মেঘ না থাকলে। সাহেবরা কি কিছু খাবেন?'

সুদীপ বলল, 'না ভাই, আমরা খেয়ে এসেছি। তোমার কাছে কম্বল আছে? নইলে আবার আমাদের ব্যাগ খুলতে হবে।' সে টেবিলের ওপরে রাখা কিছু শীতবস্ত্র দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি?'

'সাহেবরা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে করবেন।' লোকটা চোখ বন্ধ করল, 'সাহেবদের কি ড্রিঙ্কস্ করার ইচ্ছে আছে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমরা ড্রিঙ্ক করি না।'

'কিন্তু এই ঠাণ্ডায় ড্রিঙ্ক শরীর গরম করে দেয়। আমার বউ আজকাল কিছুতেই আমাকে ওসব খেতে দেয় না। আপনারা এসেছেন বলে একটা সুযোগ পাওয়া যেত।'

লোকটার ধান্দা বোঝা গেল এতক্ষণে। চেহারা দেখলে খুব সুস্থ মনে হয় না। এখন ধরা যাচ্ছে সেটা লিভারের কারণে। সুদীপ বলল, 'একটু ব্রান্ডি হলে মন্দ হত না। আমি দুটো বোতল এনেছি ইমার্জেন্সির জন্যে। এখন খুলব না।'

এবার লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেমসাব কোন্ সাহেবের বউ?'

এতক্ষণে লোকটার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইল আনন্দ। গায়ে পড়া স্বভাবটা আর ঢাকা নেই। সুদীপ বলল, 'ও কারও বউ না। আমরা বন্ধু।'

লোকটা হাসল লাল দাঁত দেখিয়ে, 'হিন্দি ফিল্মস্টাররা এরকম হয় শুনেছি।'

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে ফেলল সুদীপ। আর সেই সময় জয়িতা উঠে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছিস কেন?'

সুদীপ বলল, 'তিনটে ছেলে একটা মেয়ে বন্ধু হিসেবে বাইরে এলে নাকি হিন্দি ফিল্মস্টারের মত দেখায়। ঠিক আছে ভাই। আমরা একটু ঘুমবো এবার।'

লোকটার ওঠার ইচ্ছে ছিল না বোধহয়। কিন্তু নিচ থেকে মহিলার ডাক এলে সে উঠল। জয়িতা

সতরঞ্চিতে বসে বলল, 'হরিবল্ এক্সপেরিয়েন্স। মানুষ যে এত নোংরা টয়লেট ব্যবহার করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। খুব চেষ্টায় বমি করিনি। এখনও শরীর গুলোচ্ছে। নরক।'

সুদীপ বলল, 'আমার প্রয়োজন পড়লে আমি রাস্তায় চলে যাব।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল, 'ঈশ্বর তোদের শুধু সুবিধেই দেননি, চক্ষুলজ্জা বস্তুটিও দিতে ভুলে গেছেন। মেয়েদের তো হাজারটা অসুবিধে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।'

কল্যাণ চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ উঠে টেবিল থেকে একটা কম্বল এক হাতে তুলে নিয়ে শরীরে বিছিয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'বাইরে কেমন ঠাণ্ডা রে?'

'বাঘ পালাবে।' জয়িতা জবাব দিল।

'এ অঞ্চলে বাঘ আছে?' সুদীপ প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

'আমি আর বের হচ্ছি না।' কল্যাণ এতক্ষণে যেন উত্তাপ পেল।

আনন্দ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি আর একবার ডিটেলস সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই।'

তিনজোড়া চোখ এবার আনন্দর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল। আনন্দ বলল, 'কিছুদিন আমাদের গা-ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন তো হবেই ফাঁসি হওয়া বিচিত্র নয়। এতদূর পর্যন্ত পুলিশের নজর এড়িয়ে আমরা আসতে পারলাম এটা কম কথা নয় সুদীপ, দ্যাখ তো লোকটা এখনও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা!'

সুদীপ উঠল। তারপর নিঃশব্দে দরজায় গিয়ে নিচের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার ফিরে এল, 'বুঝতে পারছি না। সম্ভবত নেই। নিচটা অন্ধকার।'

'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

সুদীপ দরজাটা বন্ধ করে টেবিল থেকে আর একটা কম্বল তুলেই বলল, 'উরেব্বাস, কি দুর্গন্ধ! এই কল্যাণ, তুই ওটার তলায় শুয়ে আছিস কি করে? গন্ধ নেই?'

কল্যাণ বলল, 'আমার নাক বন্ধ। তাছাড়া ভিখিরির পছন্দ বলে কিছু থাকতে নেই।'

সুদীপ কম্বলটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিয়ে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল। আনন্দ বলল, 'কাল ভোরে আমরা এখান থেকে বের হব। ঘুম থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে—দাঁড়া।' আনন্দ ব্যাগ খুলে একটা ম্যাপ বের করল। ম্যাপটা মাঝখানে রেখে সে বলল, 'রাস্তাটা সুকিয়া পোকরি মানেভঞ্জন বলে দুটো জায়গা হয়ে চলে গেছে রিম্বিক রামাম। রামামে একটা হাইড্রো ইলেকট্রিকাল প্রজেক্ট হচ্ছে। এই অবধি বাস যায়। ফার্স্ট বাস আমরা ঘুম থেকে ধবতে পারি সকাল আটটায়। কিন্তু অতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব না। আমাদের একটা জিপ জোগাড় করতেই হবে। আমরা নামব মানেভঞ্জনে, যদি জিপ তার বেশি যেতে না চায়। আগে ওখান থেকেই ট্রেকাররা সান্দাকফু বেড়াতে যেত। এখন শুনছি জিপ পৌঁছে যাচ্ছে সান্দাকফু পর্যন্ত। কিন্তু তার পরে নয়। ফালুট যেতে হলে হেঁটে যেতে হয় সবাইকে। ম্যাপ বলছে ফালুটের কাছেই নেপাল বর্ডার। সেটা পার হলেই যে গ্রাম তার নাম চ্যাঙ্গথাপু। ওটা ফালুট থেকে মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে। অনেক সময় ট্যুরিস্টরা ওই গ্রামে বেড়াতে যায়। আমরা সেটা ছাড়িয়ে আরও ভেতরে ঢুকব। আপাতত আমার টার্গেট ওয়ালাংচুঙ। আরও সাড়ে ছয় কিলোমিটার ওপরে। পথ দুর্গম। কোন সভ্য মানুষ যায় না। উনিশশো সাতান্নতে একজন অস্ট্রেলিয়ান ট্রেক করে ওখানে পৌঁছেছিলেন।'

সুদীপ প্রশ্ন করল, 'পুলিশ স্টেশন?'

আনন্দ ম্যাপটা ভাল করে আর একবার দেখল। যতরকম খবর সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল সেগুলো বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে ম্যাপে লিখে রেখেছিল। দেখে টেখে সে বলল, 'সুখিয়া পোখরিতে আছে। মানেভঞ্জনে আছে কিনা জানি না। তারপর বিস্তৃত অঞ্চলে কোন থানা নেই। সেই ফালুটে একটা পুলিশ ক্যাম্প আছে। এই পুলিশরা মাঝে মাঝে চ্যাঙ্গথাপুতে বেড়াতে যেতে পারে কিন্তু তার ওপাশে কখনই নয়।'

জয়িতা ম্যাপটা দেখছিল, 'ফালুট কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। মজা হল হিমালয়ের এই দিকটা এত নিরীহ যে ভারত নেপাল কেউ বর্ডার

সিকিউরিটি ফোর্সকে এই অঞ্চলে নিয়মিত রাখেনি। যাতায়াতের পথ নেই, জনবসতি নেই, বছরে আট মাস বরফ পড়ে থাকে, অতএব আক্রমণেরও ভয় নেই। এইটে আমাদের সাহায্য করবে। এখন তোদের আমি শেষবার বলতে চাই, একবার আমরা ওদিকে পা বাড়ালে অনেক কষ্টকে ফেস করতে তৈরি থাকতে হবে। আমরা শুধু একটা নিরাপদ লুকোনোর জায়গা চাইছি। নেপাল পুলিশের চিহ্ন নেই ওখানে। ভারতীয় পুলিশ বর্ডার ক্রস করে ওখানে যাবে না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ওখানে বেঁচে থাকতে হবে। এইটেতে যার আপত্তি থাকে সে বলতে পারে।'

কল্যাণ চুপচাপ শুয়েছিল, 'আপত্তি থাকলে কি করা হবে?'

আনন্দ একটু থমকাল, 'সে থেকে যেতে পারে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়ার স্বাধীনতা তার থাকল। কিন্তু ধরা পড়ার পর আমাদের অস্তিত্ব জানাতে সে যেন কাল থেকে অন্তত পাঁচটা দিন সময় নেয়।'

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। কাঠের দেওয়ালে বাইরের বাতাস অদ্ভুত শব্দ তুলছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন আচমকা উধাও হয়ে গেল। প্রথমে কথা বলল জয়িতা, 'এসব কথা উঠছে কেন তাই আমি বুঝতে পারছি না। তোরা কি যেতে চাইছিস না?' প্রশ্নটা সে সুদীপের দিকে তাকিয়ে করল। সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাতে সে দৃষ্টিটা কল্যাণের দিকে ফেরাল।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কল্যাণ বলল, 'প্রশ্ন করা মানেই যদি আপত্তি জানানো হয় তাহলে আমি আর কি বলব। কথা হল, বলছিস ওখানে আটমাস বরফ পড়ে। আমরা তাহলে থাকব কোথায়?'

'দ্যাটস দ্য প্রব্লেম।' আনন্দ হাসল, 'হোটেল কিংবা ধর্মশালা নেই ওয়ালাংচুঙ্-এ। একটা ছোট গ্রাম আর তার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী যাদের সংখ্যা বেশি নয়। ওরা নিশ্চয়ই ঘর বেঁধে থাকে। আমি তেমন বিস্তারিত জানি না। তবে গিয়ে পড়লে কি আস্তানা জুটে যাবে না! ও নিয়ে আমি ভাবি না।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়ালাংচুঙ-এর উচ্চতা কত?'

'তেরো হাজার। মাপ দেখে সঠিক উচ্চতা জানাল আনন্দ।

শব্দদুটো শোনামাত্র তিনটে মুখ একসঙ্গে অবাক-হওয়া-আওয়াজ উচ্চারণ করল।

কল্যাণ শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়ল, 'আমরা অতদূরে পৌঁছাতে পারব তো?'

জয়িতা অবাক গলায় বলল, 'মানে?'

'পাহাড়ে ওঠার জন্যে ট্রেনিং দরকার, তা আমাদের নেই। তাছাড়া তেরো হাজার ফুট উঁচুতে যে ঠাণ্ডা তা সহ্য করার মত— '

'গরমজামা আমাদের আছে।' আনন্দ বলল, 'আমরা ক্লাইম্বিং-এ যাচ্ছি না। এটা জাস্ট ট্রেকিং। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাওয়া। উঁচু নিচু পথ পড়বে এই যা। সান্দাকফু-ফালুট পর্যন্ত মেয়েরা যাচ্ছে হেঁটে কোনরকম ট্রেনিং ছাড়া। ভয় পাওয়ার কিছু নেই কল্যাণ। আপাতত এছাড়া কোন উপায় নেই।'

'আমি ভয় পাচ্ছি তোকে কে বলল! বিস্তারিত জানতে চাওয়া মানে ভয় পাওয়া? তাহলে তো কোন কথাই বলা যাবে না।' সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চোখ বন্ধ করল।

আনন্দ ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করল, 'যাঃ, এগারোটা বেজে গেছে। রেডিও স্টেশন বন্ধ। আজ খবরটা শোনা হল না। জয়িতা, এখন থেকে তোর ওপর দায়িত্ব, প্রত্যেকটা নিউজ তুই শুনে আমাদের জানাবি। এবার শুয়ে পড় সবাই। কাল ভোরে দেখা যাক কপালে কি আছে!' আনন্দ ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল, 'এটা খুলতে ইচ্ছে করছে না। ওই কম্বলগুলোয় কি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ?'

'দারুণ।' সুদীপ শব্দটা উচ্চারণ করে নিজের ব্যাগে হাত দিল। রাত যত বাড়ছে ঘুম-এ হাওয়ারা প্রবল হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা আরও ঘন হয়ে চারপাশে ঘিরে ধরছে।

ঘুম থেকে টাইগার হিলে যাওয়ার শাট্‌ল জিপ পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু সুখিয়া পোখরি কিংবা মানেভঞ্জনের জিপ যোগাড় করতে ওদের সাতটা বেজে গেল। মানেভঞ্জন পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। সুদীপ ড্রাইভারকে রাজি করালেও আনন্দ খুশি হচ্ছিল না। মানেভঞ্জনের বাস পাওয়া যাবে আটটা নাগাদ। শুধু ওই অবধি পৌঁছে কি লাভ হবে!

বাস স্ট্যান্ড এলাকাটা এমন যে কোন ড্রাইভারকে অনুরোধ করলে আর পাঁচজনে তা জেনে নিতে

দেরি করে না। সেই সাতসকালে রীতিমত ভিড় জমে গেল তাদের ঘিরে। প্রত্যেকেই সাহায্য করতে চায়। কিন্তু সেই সঙ্গে দাম উঠছে।

বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুদীপের ঠিক করা জিপেই উঠল ওরা। এখন ঘুমে ঘন কুয়াশা। আকাশের গায়ে একটা ঘোলাটে পর্দা টাঙানো। নির্ঘাৎ আজ যারা টাইগার হিলে যাবে তারা আফসোস করবে। রোদের চিহ্ন নেই, সূর্য উঠেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই ড্রাইভারও একা নয়। তার সঙ্গী ছোকরাটা দেখতে হিন্দি ফিল্মের ভিলেনের মত। চালচলনও তাই। পোশাক দেখে অবাক হতে হয়। ভাড়াটে জিপ ড্রাইভারের হেলপার, কিন্তু পোশাক দেখলে তা মালুম হয় না।

ঘুম থেকে বের হবার মুখে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার বিনীত মুখে জানাল যে সকাল থেকে এক গ্লাসও চা খায়নি, সাহেবরা যদি খাওয়ান তো বড় ভাল হয়। আজ ঘুম ভাঙার পর তৈরি হবার সময় একটি আশাতীত ঘটনা ঘটেছিল। একটা থালায় চার গ্লাস ধূমায়িত চা নিয়ে প্রবেশ করেছিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল সবায়ের। মুহূর্তেই গতরাতের বিরক্তিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দাম নিতে চায়নি।

সুদীপ বলল, 'মন্দ হয় না আর এক গ্লাস পেলে। ঠিক আছে চা লাগাতে বল।'

ওরা দুজন নেমে গেলে আনন্দ বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সুখিয়া পোখরি পেরিয়ে যেতে পারি তত মঙ্গল। চায়ের জন্য খামোকা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'লোক দুটোকে হাত করতেই হবে। আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দে না। ভিড়ের মধ্যে কথা বলার সময় ও একবার চোখে ইশারা করেছে। মনে হয় অন্য কোন ধান্দা আছে। দেখা যাক।'

এই রকম ভোরবেলায় এমন স্যাঁতসেঁতে প্রকৃতি ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু জয়িতার মন্দ লাগছিল না। বিদেশী উপন্যাসের পটভূমিগুলো মনে পড়ছিল ওর। ঠাণ্ডা খুব কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো হালকা সোয়েটার পরে স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম করছে। কুয়াশায় ভিজে গেছে রাস্তা, বাড়ির চাল এমন কি আকাশটাও। হাতে গরম চায়ের গ্লাস পেয়ে বেশ আরাম লাগল ওর। এখন কল্যাণ আর জয়িতা সামনে বসেছে। ড্রাইভাবের সঙ্গী আনন্দদের সঙ্গে পেছনে। বের হবার আগে সুদীপ আর আনন্দ অনেক কসরৎ করে কল্যাণকে পুলওভার পরাতে পেরেছে। প্লাস্টার-করা হাতটাকে বাইরে রেখেছে সোয়েটারের। তাই সেই হাতাটা ঝুলঝুল করছে। কিন্তু এতে অনেক বেশি আরাম বোধ করছে কল্যাণ। প্রত্যেকের পায়ে পাহাড়ে ওঠার কেডস। বের হবার সময় কল্যাণ মন্তব্য করেছিল, 'ঠিকঠাক পোশাক থাকলে ঠাণ্ডা কোন ব্যাপারই নয়।'

সুদীপ হেসেছিল, 'এই তো বাঙালি জেগেছে, আর কোন ভয় নেই।'

রাস্তাটা চমৎকার। ঘুম পেছনে পড়ে রইল। এই সকালেও কুয়াশার মধ্যে যদিও মাঝেমাঝে ফগলাইট জ্বালতে হচ্ছে তবু প্রকৃতির চটপট পরিবর্তনটা চোখে পড়ছিল। গাছগুলোর চেহারা অনেক ঝকঝকে। পথের ধারে বেশ কিছু ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ জয়িতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দ্যাখ লেডি স্লিপার।'

কল্যাণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লেডি স্লিপার? মানে?'

'একটা ফুলের নাম। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ছবি দেখেছিলাম।'

কল্যাণ বুঝতে পারছিল না ঠিক কোন্ ফুলটা লেডি স্লিপার। তার মনে হল যতই ভাল নম্বর পাক না কেন জয়িতা তার থেকে অনেক বেশি জানে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সে কখনও হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি।

ড্রাইভার খুশীমুখে গাড়ি চালাচ্ছিল। এই রকম রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে সুখ আছে। বাঁকগুলো খুব আচমকা নয়। শিস থামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা সান্দাকফু হেঁটে যাবেন?'

সুদীপ উত্তর দিল, 'কি আর করা যাবে।'

ড্রাইভার বলল, 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত হেঁটে যেতে হত। ট্রেকিং-এর একটা আলাদা মজা আছে। এখন রাস্তা হয়ে যাওয়ায় সান্দাকফু পর্যন্ত বেশির ভাগ ট্যুরিস্ট জিপে যায়। সময় কম লাগে।'

'ফালুট?' সুদীপ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল।

'না। ফালুটে যাওয়ার গাড়ির রাস্তা হয়নি।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। গাড়ি মোটামুটি একই লেভেলে যাচ্ছে। এখনও পথে গাড়ি চলাচলের সময় হয়নি বোধ হয়। কারণ কাউকে সাইড দিতে হচ্ছে না, ওভারটেকের প্রশ্ন নেই। জয়িতা লক্ষ্য করল আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। বিরাট বিরাট পাহাড়গুলো নীল চাদর মুড়ি দিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে। ধ্যানগম্ভীর শব্দটার মানে বোঝা যায় ওদের দিকে তাকালে। সুদীপ পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এই গাড়ি বোধ হয় সান্দাকফু পর্যন্ত যেতে পারে না। খুব উঁচু?'

ড্রাইভার হাসল, ' কে বলেছে যেতে পারে না। আমি তো গত বুধবার ঘুরে এলাম। ছয়শ টাকা দিয়ে দেবেন, পৌঁছে দিচ্ছি!'

'ছ'শ?' কল্যাণ আঁতকে উঠল।

'ফেরার সময় খালি আসতে হবে। আপনারা তো ওখানে একদিন থেকে ফালুটে যাবেন। অতদিন তো থাকব না। তাছাড়া রাস্তা খুব খারাপ। টংলু থেকে বিকেভঞ্জন যাওয়ার পথটা দেখলে একথা বলবেন না।'

কল্যাণ তবু বলল, 'একটু কম করা যায় না?'

'ঠিক আছে, পঞ্চাশ কম দেবেন। তখন বাস স্ট্যান্ডে বলিনি কেন জানেন?' এই রেট শুনলে সবাই খেপে যেত। তাছাড়া বুধবারে গিয়েছি আবার আজ, অন্য ড্রাইভারকে কামাই কবার সুযোগ দেওয়াই নিয়ম।' ড্রাইভার হাসল।

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে। যা বললেন তাই হবে। কতক্ষণ লাগবে সান্দাকফু?'

ড্রাইভার দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা জনপদ দেখিয়ে বলল, 'ওই তো সুখিয়া পোখরি।'

॥ ২৮ ॥

সুখিয়া পোখরিতে জিপ থামেনি। থামল মানেভঞ্জন-এ।

ড্রাইভার বলল, 'সাহেবরা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এখান থেকেই চাল-ডাল কিনে নিতে পারেন। এর পরে আর দোকান নেই।'

মানেভঞ্জন একটি ছোট্ট জনপদ। রামানে হাইড্রো-ইলেকট্রিক তৈরি হবার পর থেকে এখানকার জনসংখ্যা বাড়ছে। ঠাণ্ডা ঘুম-এর থেকে কম। সুদীপ আর কল্যাণ ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কিনছিল। চাল আলু মশলা থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে সব। আনন্দ সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত সব নিচ্ছিস বইবে কে?'

সুদীপের মাথায় ব্যাপারটা ঢোকেনি। এখন একটু ফ্যাকাশে হয়ে বলল, 'এ সবই তো আমাদের লাগবে। কি করা যায়?'

আনন্দ বলল, 'যা নিয়েছিস তা শেয়ার করে ক্যারি করা যাবে। কিন্তু আর নয়।'

মানেভঞ্জন থেকেই যেহেতু পদযাত্রা শুরু হত এবং এখনও যারা পায়ে হেঁটে যেতে চায় তারা এখানেই নামে বাস থেকে তাই এক শ্রেণীর লোক ওদের পেছনে লাগল। খুব নিরীহ চেহারার মানুষগুলো বলল তারা পোর্টার। ফালুট পর্যন্ত মাল বয়ে নিয়ে যাবে। ডেইলি তিরিশ টাকা আর খাওয়া। সাহেবরা না হয় গাড়ির রাস্তা হওয়ায় সান্দাকফু পর্যন্ত গাড়িতে যাবেন কিন্তু ফালুট যেতে হলে তাদের সাহায্য নিতেই হবে। আর সাহেবরা যদি তাদের সাহায্য না নেন তাহলে এই অঞ্চলের শেরপারা না খেয়ে মরবে। শেরপা শব্দটি শুনে বেশ রোমাঞ্চিত হল সে। হিমালয়ের যে কোন পর্বতশীর্ষে ওঠার সময় অভিযাত্রীরা শেরপাদের সাহায্য নেন। তেনজিং নিজেও তো শেরপা। বিভিন্ন অভিযানের কাহিনীতে এদের কথা পড়ে পড়ে ওর কাছে শেরপারা নায়ক হয়ে গিয়েছে। সুদীপ লোকগুলোর দিকে তাকাল। এদের দেখতে তার চোখে নেপালি ছাড়া কিছু নয়। সে একটি মিষ্টি দেখতে কিশোরকে কাছে ডাকল, 'কি নাম তোমার?' প্রশ্নটা সুদীপ যতটা সম্ভব ভাল হিন্দীতে করার চেষ্টা করল।

ছেলেটি একগাল হেসে জানাল, 'ওয়াংদে।' বলে দু'বার মাথা ঝাঁকাল।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি শেরপা?'

'জী হজৌর।'

'শেরপা মানে কি?'

এবার ছেলেটি, যার নাম ওয়াংদে তার একটু পরিশ্রম হল। সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে সে শেষ পর্যন্ত জানাল, 'শের মানে এভারেস্টের ডান দিক আর পা হল মানুষ। শেরপা মানে এভারেস্টের ডানদিকে যেসব মানুষ থাকে তারা।'

আনন্দ চুপচাপ শুনছিল। এবার মন্তব্য করল, 'বাঃ! এই মানেটা আমি জানতামই না। তুই কি ওকে ফালুট পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাস? কিন্তু তারপর? ওকে কি বলে কাটাবি?'

'টাকা দিয়ে দিলে চলে আসবে। টাকার জন্যেই তো যাচ্ছে।' সুদীপ নিচু গলায় কথাগুলো বলে ওয়াংদের দিকে তাকাল, 'ঠিক হ্যায়। চল আমাদের সঙ্গে। এই মালপত্রগুলো ওই গাড়িতে রেখে এস।' ঘোষণা করা মাত্র ভিড়টা সরে গেল। ওয়াংদে তিনবার সেলাম করে মালপত্রগুলো নিয়ে ছুটল গাড়িটার দিকে।

সুদীপ বলল, 'ওইটুকুনি ছেলে এত মাল নিয়ে হাঁটতে পারবে?'

আনন্দ বলল, 'সেটা ও-ই বুঝবে। কিন্তু দ্যাখ, যেই তুই একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলি তৎক্ষণাৎ অন্যরা পেছন ছাড়ল। ডিসিপ্লিনটা কলকাতায় দেখবি না।'

সুদীপ একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, 'কলকাতায় আমরা কিছুই দেখি না। সবাই চোখ বন্ধ করে থাকি। একটা বাঙালি পাবি না যে আর একটা বাঙালির প্রশংসা করছে খোলামনে। ও কেন সুযোগ পাচ্ছে এই ঈর্ষায় সবার বুকে অ্যাসিড জমে যাচ্ছে।'

ওয়াংদে ফিরে এসে জানাল, 'সাহেবরা যদি টেন্ট নিতে চান তাহলে এখনই বলুন, এরপরে ট্যুরিস্টরা এলে আর টেন্ট পাওয়া যাবে না।'

'টেন্ট?' আনন্দ অবাক হল, 'এখানে টেন্ট পাওয়া যায়?'

'আগে যেত না। কিন্তু একজন মাড়োয়ারি দোকানদার টেন্ট ভাড়া দিচ্ছে আজকাল। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা। কাল বিকেলে টেন্ট জমা দিয়েছি।' ওয়াংদ জানাল।

'তুমি জমা দিয়েছ! কেন? তুমি কি কোথাও গিয়েছিলে?'

'হাঁ সাব। পাঁচ দিন আগে একটা ট্রেকিং পার্টির মাল নিয়ে গিয়েছিলাম। সান্দাকফুতে ভিড় না থাকলে টেন্টের দরকার হয় না কিন্তু ফালুটে প্রয়োজন হতে পারে।' সুদীপ হাঁ হয়ে গেল। এই কিশোর পাঁচদিন ধরে পাহাড় ভেঙে এসেই আবার পাড়ি দিতে চাইছে! শুধু টাকার জন্যে? সে জিজ্ঞাসা করল, 'টেন্ট কে বইবে?'

'আমি সাব।'

আনন্দর মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা শোষণের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সুদীপ জানাল ওরা সবাই ওয়াংদেকে সাহায্য করবে। ওরা মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের দোকানে এল। তেল নুন থেকে সবই এখানে পাওয়া যায়। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। প্রথমেই অনুযোগ করলেন, 'আপনারা আমার দোকান থেকে মাল কিনলেন না। আমি মানেভঞ্জনে সবচেয়ে সস্তায় দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, টেন্ট দুটো আছে। ডেইলি একশ টাকা। একদম মজবুত টেন্ট। টাঙানোর ঝামেলাও খুব বেশি নেই। তবে জমা রাখতে হবে পাঁচশো টাকা। ফিরে আসার সময় হিসেব করে ঠিক হবে ফেরত পাবেন না দিতে হবে।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ডিপোজিট নিচ্ছেন কেন? এ পথেই তো ফিরতে হবে।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বললেন, 'ফিরতে তো হবেই। কিন্তু টেন্ট ছিঁড়ে গেলে তো সারাই-এর খরচ দিতে হবে। ডিপোজিট না রাখলে আপনারা ফেরার সময় দিতে চান না।'

দুটো টেন্ট এমন কিছু ভারী নয়। দেখে মনে হল মজবুত। সুদীপ পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। টেন্টগুলোকে পেছনে তুলে দিয়ে ওয়াংদে বলল, 'সাহেবরা যদি আমাকে দশ মিনিট সময় দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'একবার বাড়িটা ঘুরে আসব। কম্বল আনতে হবে আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করব।'

সুদীপ ঘাড় নাড়তেই দৌড়ে উধাও হল ওয়াংদে। আনন্দ বলল, 'ওইটুকুনি ছেলে হলে কি হয় এর মধ্যে প্রেম করে বসে আছে।'

ড্রাইভার ফিরে আসছিল, সুদীপ চটপট জয়িতা-কল্যাণকে ওয়াংদের কথা বলে ফেলল। ড্রাইভার এসে জানাল, আর দেরি করা চলবে না। তাকে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরতে হবে ঘুম-এ। সুদীপ ওকে ওয়াংদের কথা বলে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল।

ওয়াংদে এল মিনিট পনেরো পরে দুটো কম্বল এবং তারই মত দেখতে একটি মেয়েকে পেছনে নিয়ে। মেয়েটির মুখ খুব বিমর্ষ। নিজেদের ভাষায় কথা বলে ওয়াংদে জিপের পেছনে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে সরল হাসল। জিপ চলতে শুরু করলে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম মেয়েটার?'

'দ্রিমিট। আমি চলে গেলে ও খুব একা হয়ে যায়।' ওয়াংদে বিষণ্ণ গলায় বলল।

সুদীপ হাসল, 'কি আর করা যাবে! তোমার যা কাজ!' প্রেমিকার সম্পর্কে কেউ এত সহজে কথা বলতে পারে শুনে ওর মজা লাগছিল।

'হাঁ সাব। ওর মা মারা যাওয়ার পর এই চলছে। ভাল ছেলেও পাচ্ছি না যে বিয়ে দেব।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল ওয়াংদে। আর চমকে উঠল ওরা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'দ্রিমিট তোমার কে হয় ওয়াংদে?'

ওয়াংদে তার কিশোর-হাসি হাসল, 'আমার মেয়ে হুজুর। সবাই বলে আমার মত দেখতে।'

অনেকক্ষণ ওরা কোন কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সুদীপ চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'আমরা শালা ছোটলোক!'

এই রাস্তা ধরে বেড়াতে বেড়াতে নরকেও চলে যাওয়া যায়। একটু একটু করে পাহাড়ে যদিও উঠছে জিপ কিন্তু কোথাও খুব খাড়াই নেই। কিছুক্ষণ ন্যাড়া ছিল চারধার এবার গাছ এল। রডোড্রেনডন আর ক্যামেলিয়ায় অপরূপা হয়ে গেল পৃথিবীটা। মানেভঞ্জন থেকে যত এগোচ্ছিল তত নির্জনতা চাপ বাঁধছিল। একটিও মানুষ নেই পথে। এখন রোদ নেই আবার ঘন ছায়াও নেই। সূর্য যেদিকে সেদিকে একটা ঘোলাটে মেঘ আটকে আছে কিন্তু বাকি আকাশটা ক্লিওপেট্রার চোখের মত নীল। এই অবধি ভেবে জয়িতা থামল। তারপর প্রশ্নটা ছুঁড়ল, 'আচ্ছা ক্লিওপেট্রার চোখের রঙ কি রকম ছিল?'

কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। চমকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার?'

'ক্লিয়োপেট্রার?' জয়িতা হাতড়াচ্ছিল কোথাও বর্ণনা পড়েছে কিনা। নীল তো ভেবে বসল।

'আমি দেখিনি। সী ওয়াজ ডেঞ্জারাস ওম্যান। ধরত ছিবড়ে করত আর ছুঁড়ে ফেলত। আমি দেখতে চাই না। কি করে যে এই পরিবেশে ওই নাম মনে পড়ে!'

জয়িতা কোন কথা বলল না। মেঘমা থেকে ডান দিকে টংলুর পথ। জিপ বাঁ দিকে গৈরাবাসের দিকে ঘুরল। মেঘমাতে মোটামুটি একটা বসতি আছে। যদিও মানুষ কত আছে তা বোঝা মুশকিল। কালিয়াপোকরি পর্যন্ত কোন অসুবিধে হল না। জায়গাটা সমৃদ্ধ। না হলে এত মানুষ এখানে থাকত না। লামার দোকানে ওরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল। কাঁচা পরোটা আর কাঁচা আলুর ঝোল। সুদীপ চেষ্টা করেও পারল না। জয়িতা চেষ্টাই করল না। আনন্দ একটা খেয়ে হাত গুটিয়ে নিল। কল্যাণ কোনমতে দুটো পেটে চালান করতে পারল। ওয়াংদে খেল ছটা। চা খেয়ে আনন্দ বলল, 'একটা রান্নার বই নিয়ে এলে ভাল হত।'

কালিয়াপোকরি থেকেই বিভীষিকা শুরু হল। যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে রাস্তাটা সোজা ওপরে উঠে গেছে। মালপত্র সমেত ওদের শরীর পেছনে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ শক্ত করে ব্যাগটা আঁকড়ে থাকল। জোরে আঘাত লাগলে জিপসমেত তাদের উড়ে যেতে হবে। সে মুখ ফেরাল। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে এক হাতে সিট আঁকড়ে ধরেছে। জয়িতার মুখ রক্তশূন্য। শুধু ওয়াংদে এখনও পা ঝুলিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। সুদীপের মুখ বাঁ দিকে ফেরানো বলে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আঁকড়ে ছিল সামনের রডটা। এদিকে ক্রমশ রাস্তাটা ছোট হয়ে আসছে। আনন্দর মনে হল এখন যদি ব্রেক ফেল করে কিংবা যদি চাকাটা সামান্য ওপাশে চলে যায় তাহলে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ড্রাইভারের দিকে তাকাল সে। লোকটার চোখ এখন রাস্তায় সতর্ক। একটু যেন টেনশন। লোকটার সঙ্গী বম্বের হিরো ঘুম ছাড়া ইস্তক কোন কথা বলেননি। এখন চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। একেই বোধ হয় কলজে হাতে করে পাড়ি দেওয়া বলে। এর চেয়ে হেঁটে গেলে

অনেক আরাম হত। মাঝে মাঝে পথের কারণে ড্রাইভার যখন ব্রেক কষছিল তখন সমস্ত শরীরে যে ঝাঁকুনি তাতে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসার উপক্রম। ক্রমশ আনন্দর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। একটা তৈলাক্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার পেটে অস্বস্তি শুরু হল। কোনরকমে মাথা তুলে তাকাতেই দেখল সামনের পাহাড়টা যেন আরও উঁচু আর রাস্তাটা তার গায়ে সিঁড়ির মত আটকানো। সে চোখ বন্ধ করতেই বমির শব্দ পেল। শব্দটা আসছে তার বাঁদিক থেকে। সুদীপের শরীর তারই দমকে বারংবার কাঁপছে। মুহূর্তে সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করল। ওই একটি বমির শব্দ যেন তোলপাড় শুরু করল তার নিজের শরীরে। পেট মুচড়ে কিছু ছুটে আসছিল গলায়। কোনরকমে ঢোঁক গিলে প্রথম ধাক্কাটা সামলাল সে। এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম হচ্ছে কপালে। যেন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে সমস্ত শরীরে। একটা ঢেঁকুর উঠল যাতে বিদিকিচ্ছিরি পরোটার গন্ধ। এবং তখন ওপাশে আরও দুটো গলায় বমির শব্দ উঠেছে। ড্রাইভার ওরকম বেঢপ জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাতে পারছিল না। আনন্দ প্রাণপ্রণে যুঝে যাচ্ছিল। সে বমি করবে না, কিছুতেই না। প্রতিটি ঢেউ সে ভেতরে ফেরত পাঠাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারছিল তার ইচ্ছের পায়ের তলার মাটি নরম হয়ে আসছে। টাগ অফ ওয়ারে হারবার মুহূর্তে যেমন বোঝা যায়। কল্যাণের আর্তনাদ মেশানো বমির শব্দটাই এই কাজ করল। আনন্দ আরও মনের জোর বাড়াচ্ছিল। না আমি বমি করব না। তার সমস্ত শরীরে এবার কুলকুল ঘাম। নাক জ্বালা করছে। পেটের মোচড় অসহ্য হয়ে উঠেছে। এবং তখন অপেক্ষাকৃত সমতল পেয়ে জিপ স্থির হল। সুদীপ লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর বলল, 'আঃ।' জয়িতা এবং কল্যাণ টলতে টলতে নেমে দাঁড়াল। জিপের পেছন থেকে একটা বালতি তুলে নিয়ে ওয়াংদে ছুটে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ড্রাইভার দাঁত বের করে হাসল, 'বাঙালিবাবুদের এরকম হয়েই থাকে। তবে আপনি খুব শক্ত আছেন।'

সেই মুহূর্তে উঠে আসা ঢেউটা ওই কথার জন্যেই বোধ হয় সামাল দিতে পারল আনন্দ। কল্যাণ মাটিতে বসে পড়েছিল। জয়িতা জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আনন্দ নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছিল। এই সময় ওয়াংদেকে আবার দেখা গেল। এক বালতি জল এনে জয়িতাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। ওরা তাই দিয়ে কোনরকমে মুখ ধুয়ে নিল। এবার ওয়াংদে এল তার কাছে, 'সাব, পানিসে মুখ সাফা করে নিন। ভাল লাগবে।' দেবদূতের মত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। আনন্দ জিপ থেকে নামল। সমস্ত শরীর যেন তরল পদার্থে ঠাসা হয়ে গেছে। সে হাত বাড়িয়ে জল নিল। ঘামের গায়ে কনকনে ঠাণ্ডা জল লাগামাত্র স্বর্গীয় আরাম হল। মুখ ঘাড় হাত ধুয়ে মনে হল এর চেয়ে তৃপ্তি আর কিছুতেই নেই। কিন্তু তাকে আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় করতে হল শরীরের সবকটা অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে। ধীরে ধীরে তৈলাক্ত অনুভূতি কিংবা পেট মোচড়ানো কমল, মনে হল শরীর জমাট বাঁধছে কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যেন খুব বড় লড়াই শেষ করে সে দাঁড়িয়েছে। আর তারপরেই আনন্দর উপলব্ধি হল সে জিতেছে। তার কয়েকটা ইন্দ্রিয়কে অন্তত সে বশ মানাতে পেরেছে। এই খুশি তার আত্মবিশ্বাস চট করে বাড়িয়ে দিল কয়েকগুণ। এবং তার ফলে দুর্বলতা কেটে যাচ্ছিল। সে জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। সেটা হ্যাঁ কি না তা ঠিক বোঝা গেল না। কল্যাণ খানিকটা দূরে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। সুদীপ বলল, 'হরিবল্! এরকম স্টিফ পাহাড়ে আমি কখনও উঠিনি। যে-কোন মুহূর্তেই অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কল্যাণ ঠিকই বলেছে, এর চেয়ে ট্রেকিং ভাল ছিল।'

কল্যাণ বলল, 'আমি আর জিপে উঠছি না। তোরা যা, আমি হেঁটে যাচ্ছি।'

ওয়াংদে বাংলা বোঝে বোঝা গেল। কারণ সে এই কথার পর বলল, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপর নিচে নামার পালা। তখন আর সাহেবদের কষ্ট হবে না।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'ভাল কথা। এই পাঁচ মিনিট আমরা হাঁটব।'

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পেছনে খাড়া পাহাড়। সামনে অতলান্ত খাদ। খাদের ওপাশে আকাশটা যেন ধনুকের মত নেমে গেছে। ড্রাইভার তাড়া লাগালেও ওদের ওঠার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। আর তখনই ওদের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য তৈরি হল। যে মেঘটা এতক্ষণ আকাশে ঝুলছিল সেটা উড়ে যেতে লাগল। পেঁজা পেঁজা হয়ে। এবং তার আড়াল থেকে রাজেন্দ্রাণীর মত বেরিয়ে এল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যের আলো তার শরীরে পড়ায় সোনায় রুপোয় মিশেল অহঙ্কারী সুন্দরীর মত পৃথিবীটাকে উপেক্ষা করে

দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা চারজন নির্বাক। যেন পৃথিবীর শেষ স্তব্ধতা যেখানে অনন্তর শান্তি মেশানো ওদের চারপাশে বলয় রচনা করল। কাঞ্চনজঙ্ঘার ডান দিকে যে খাঁজটা সেখানে রোদ মাখামাখি। কিন্তু তখনই ওয়াংদে বলে উঠল, 'আগে গেলে এর চেয়ে অনেক ভাল দেখা যাবে।' একটি বাক্য সবাইকে চেতনায় ফিরে আনতেই সুদীপ বলল, 'গ্রেসিয়াস! পাগল হয়ে যেতে হয়।'

জয়িতা বলল, 'মোর দ্যান দ্যাট। আমি ওর দিকে তাকিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি। গঠনে কিরকম অহঙ্কার তাই না?'

সুদীপ বলল, 'পৃথিবীর সুন্দরী মহিলাদের ধরে নিয়ে একে দেখাতে হয়, দ্যাখো রূপ কাকে বলে! আমি প্রেমে পড়ে গেলাম। এই প্রথম প্রেমে পড়া যায় এমন সুন্দরীর দর্শন পেলাম।'

জয়িতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'সুন্দরী! তোকে কে বলল কাঞ্চনজঙ্ঘা মেয়ে? পর্বত সবসময় পুরুষ।'

কল্যাণ উঠে দাঁড়াল, 'মেয়ে পুরুষ বুঝি না। কিন্তু "চিত্ত আমার হারালো"। যেতে ইচ্ছে করছে না এখান থেকে। এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আছে!'

ড্রাইভার আবার তাড়া দিল। মিনিট পাঁচেকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ওদের কাছে যেন ওষুধের মত কাজ করল। আনন্দর মনে হচ্ছে তার শরীরে আর কোন কষ্ট নেই। সব কিছু এখন তার নিয়ন্ত্রণে। এমন কি শেষপর্যন্ত কল্যাণও সম্ভবত কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রভাবেই গাড়িতে উঠে বসল। বিকেভঞ্জন পার হতেই কুয়াশা নেমে এল দল বেঁধে। সামনের পৃথিবীটা আড়ালে পড়ে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছিল মাঝেমাঝেই। শেষ পনেরো মিনিট আবার সেই যন্ত্রণা। আবার শারীরিক বিদ্রোহ। যেন ভাসতে ভাসতে ওরা একটা বিশাল মাঠের মত জায়গার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এল। ড্রাইভার বলল, 'আমরা সান্দাকফুতে এসে গেছি। ওই হল পি ডব্লু ডি বাংলো। এপাশে ডি আই ইয়ুথ হোস্টেল। আপনাদের কোথায় রিজাভের্শন আছে?'

আনন্দর কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। সুদীপ হঠাৎ খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, 'আমাদের কোথাও রিজার্ভেশন নেই।'

'তাহলে আপনাদের পি ডব্লু ডি বাংলোর পাশে নামিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গণেশ নামে একটা চৌকিদার আছে। দেখুন চেষ্টা করে যদি জায়গা পান।' ড্রাইভার কথা বলে একটা দারুণ দেখতে বাংলোর সামনে ওদের পৌঁছে দিল। সন্ধ্যের আগে ঘুম-এ পৌঁছাবার জন্যে যেন ভূতে তাড়া করছে ওটাকে। ওরা যখন কৌতূহল নিয়ে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে তখন আনন্দ শব্দ করল। এতক্ষণ শাসনে রাখা তরল পদার্থ এবার তীব্রগতিতে বেরিয়ে আসছে।

সুদীপ মন্তব্য করল, 'সাবাস! এতক্ষণ একটা ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছিলাম। একযাত্রায় পৃথক ফল হওয়া কি ভাল ব্রাদার!'

জয়িতা নিজের মনে বলল, 'এরই নাম সান্দাকফু। এখান থেকে একশ আশি ডিগ্রিতে হিমালয়কে দেখা যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সূর্যোদয় দেখার জায়গা।'

কল্যাণ বলল, 'তা তো হল কিন্তু এখানে লোকজন থাকে না নাকি? ঠাণ্ডাও জব্বর।' সত্যি ধারে কাছে কোন মানুষ দেখা যাচ্ছিল না। একটা হিম হিম ভাব সমস্ত জায়গাটার ওপর মশারির মত টাঙানো। দূরের বাড়ি থেকে একটা লোক বাইরে এসে দাঁড়াল এবার। আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া তার। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল সান্দাকফুর ওপর দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাড় কাঁপতে লাগল চারজনের। এখনও ব্যাগের বাকি শীতবস্ত্র বের হয়নি। আর এই ঠাণ্ডার কারণেই আনন্দ সুস্থ হয়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। এই সময় চিৎকার ভেসে এল নিচ থেকে। ওরা দেখল মুড়ি দেওয়া লোকটা হাত নেড়ে কিছু বলছে। ওদের ওখানে দাঁড়াতে বলে ওয়াংদে ছুটে গেল লোকটির কাছে। কথাবার্তা বলে আবার ফিরে এসে বলল, 'গণেশের অসুখ। বাংলোয় তালা দিয়ে সে কাল দার্জিলিং চলে গিয়েছে। আপনারা ইয়ুথ হোটেলে চলুন। ওটা এখন খালি আছে।'

কাঁপতে কাঁপতে ওয়াংদেকে অনুসরণ করে ওরা ইয়ুথ হোস্টেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে

থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এই আস্তানাটির অবস্থা খারাপ। কিন্তু খোলা আকাশের নিচে ঠাণ্ডায় দাঁড়ানোর চেয়ে সেটা ঢের ভাল। দরজা খোলাই ছিল। ওদের একটু দাঁড়াতে বলে ওয়াংদে একটা ঘর পরিষ্কার করল। দুটো তক্তাপোশ আছে ঘরে। দরজা বন্ধ করার পরও ঘরে হাওয়া ঢুকছে জানলার ফাঁক দিয়ে। কল্যাণ আরাম করে বসতেও পারছিল না ঠাণ্ডার চোটে। এর মধ্যে ওয়াংদে কোথা থেকে কিছু কাঠ ম্যানেজ করে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এবার ওরা চারজনেই আগুনের কাছে সরে এল। খানিকবাদে যেন ধাতস্থ হল সবাই। সুদীপ একটা আঙুল জয়িতার গালে রেখে বলল, 'তোর এখানটা নীল আর নাকটা লাল হয়ে গিয়েছে।'

জয়িতা বলল, 'ভাল করে ম্যাসেজ করে দে তো। বোধ হয় রক্ত জমে গেছে।'

সুদীপ জয়িতার মাথাটা এক হাতে ধরে আঙুলের ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাসেজ করার চেষ্টা করে বলল, 'দূর! আরও কালো হয়ে যাচ্ছে।' তারপর আগুনের ওপর হাত রেখে হাসল, 'তুই কি করে গ্রেনেড ছুঁড়েছিস ভেবে পাচ্ছি না!'

'কেন?' জয়িতা চটপট প্রশ্ন করল।

'তোর এত নরম চামড়া যে আমার আঙুল সিরসির করছিল।'

'যে হাত দোলনা ঠেলে সেই তো জগৎ শাসন করে।' কথাটা বলে হাসল জয়িতা। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু চা হলে খুব জমত, না?'

কল্যাণ বলল, 'আমার খিদে পাচ্ছে। কটা বাজে জানিস?'

সকলেই ঘড়ি দেখল। দুপুর আড়াইটেতে যে ছায়া ঘনিয়েছে বাইরে তাতে সময় ঠাওর করা অসম্ভব। আনন্দ উঠল। এইভাবে বসে থাকলে চলবে না। সে ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। ব্যবহার হয় কিন্তু যত্ন না থাকায় অত্যন্ত জীর্ণদশা। এখানেও হাওয়া ঢুকছে তবে দুটো তক্তাপোশ রয়েছে এ ঘরেও। তৃতীয় ঘরটিতে আগুন জ্বলছে। আনন্দ দেখল ওয়াংদে এর মধ্যেই উনুন জ্বালিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করছে। তাকে দেখে ওয়াংদে কিশোর হাসি হাসল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে জলের কি ব্যবস্থা?'

'পানি চাহিয়ে?' তৎপর হল ওয়াংদে।

'না না। আমি জিজ্ঞাসা করছি।' লোকটাকে আগুনের সামনে থেকে ওঠাতে খুব খারাপ লাগছিল। এ ঘরে এসে বেচারা কম্বলটাকেও খুলে রেখেছে। এখন একটা হাফহাতা সোয়েটার পরে কাজ করে যাচ্ছে আগুনের সামনে। ওয়াংদে জানাল, 'দশ মিনিট গেলেই একটা ঝোরা আছে, সারা বছর জল থাকে শুধু শীতের তিনটে মাস ছাড়া। আমি চা করেই আপনাদের বাথরুমে জল এনে দেব।'

সামান্য কটা টাকার জন্যে লোকটা এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পরিশ্রম করছে? মোটেই না। ইচ্ছে করলে ও অনেক রকম কায়দায় ফাঁকি দিতে পারত। তাদের উচিত এই লোকটাকে সাহায্য করা। কিন্তু হঠাৎ বিপরীত প্রাকৃতিক পরিবেশে নতুন এসে সক্রিয় হয়ে ওটা সম্ভব নয়। মানিয়ে নেওয়ার জন্যে সময় দরকার।

ঠাণ্ডা খুব তবু পেছন দিক দিয়ে আনন্দ বাইরে এল। এলোপাথারি হাওয়া বইছে। সামনের উপত্যকায় ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে কুয়াশারা। এই হাওয়া স্পর্শ করা মাত্র যেন রক্ত জমে যাচ্ছে। সান্দাকফুতে গোটা ছয়েক বাড়ি। আপাতত কোন মানুষ চোখে পড়ছে না। এর মধ্যেই অন্ধকার নামব নামব করছে। এখনই এখানে পুলিশের আসার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুলিশের আসতে হলে ওই রাস্তা ডিঙিয়ে আসতে হবে। সেটা খুব আরামের ব্যাপার নয়। একমাত্র যদি মিলিটারিদের পাঠায় তাহলে ওদের কাছে পাহাড় কোন বাধাই নয়। কিন্তু প্রথম কথা খবর পেতে হবে, দ্বিতীয়ত পুলিশ মিলিটারিদের সাহায্য চাইবে কিনা এটাও অজানা। আনন্দ আকাশের দিকে তাকাল। জমাট কালো মেঘ নেমে আসছে নিচে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর অন্ধকার হয়ে আসছিল। এর মধ্যে দুটো বালতি নিয়ে ওয়াংদে দৌড়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। যেভাবে ঘর ঝাঁট দেওয়া হয় সেইভাবে মেঘগুলো উপত্যকার আলো মুছছিল একটু একটু করে। এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আনন্দ মোহিত হয়ে গেল। এ রকম দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানো এক জন্মে বারংবার সম্ভব হয় না।

ঘরে চলে এসে সে একটু অবাক হল। সুদীপ চা করছে। ওকে দেখে বিব্রত গলায় বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। নামাতে না নামাতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তুই কখনও চা করেছিস?' আনন্দ অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করল।

'ইয়েস গুরু। তবে এই হাই অল্টিচুডে নয়। কাঠ কম আছে। ওয়াংদে গেছে জল আনতে প্রথমে। তারপর কাঠ। তুই চায়ের গ্লাসটা নে আর ওদের ডাক।' সুদীপ একটি গ্লাস এগিয়ে দিতে আনন্দ তার গায়ে উত্তাপ পেল। সাবধানে মুখে দিতে সে আবিষ্কার করল ওটা মোটেই গরম নয়। কয়েক পা এগিয়ে জয়িতাদের ডাকল আনন্দ। কল্যাণের গলা পাওয়া গেল। সে অনুরোধ করছে তার চা ওখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

আনন্দ বলল, 'না, যতক্ষণ কেউ অসুস্থ না হচ্ছে ততক্ষণ নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে কল্যাণ। এখানে এসে চা খা।'

কল্যাণ হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে জয়িতার পেছন পেছন এল, 'তোদের প্রাণে সামান্য দয়ামায়া নেই রে। হাতিমারা এই শীতে একটু আরাম করছিলাম তাও তোদের জ্বালায়—। এঃ, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রে!'

'এই খেতে হবে।' সুদীপ গম্ভীর মুখে বলল, 'যে দেশের যা নিয়ম।'

ওয়াংদে জল এনেছে। ডি আই বাংলোর দারোয়ানের কাছ থেকে কাঠও সংগ্রহ করেছে। তারপর খিচুড়ি আর ডিমভাজা রাঁধতে বসেছে। এসব করেছে পা টিপে টিপে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, যার একটা ফোঁটা গায়ে পড়লে পেরেক ফোটার যন্ত্রণা হয়। এখন কলকাতায় ফুটবল খেলা হচ্ছে কিন্তু এখানে মধ্যরাতের অন্ধকার।

এই সময় কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। বারো হাজার ফুট উচ্চতা বলেই সম্ভবত তার শব্দ কয়েকগুণ বেশি শোনাল। জয়িতা দুটো হাতে কান চাপা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই সমস্ত চরাচর ঝলসে দিয়ে গেল বিদ্যুৎ। আনন্দ কাচের জানলার পাশে চোখ রেখে বসেছিল। বারংবার একটা ছেঁড়া কাপড়ে তাকে কাচ মুছতে হচ্ছে। সে দেখল সমস্ত সান্দাকফু হঠাৎ এক্সরে প্লেটের ছবি হয়ে মিলিয়ে গেল। এবং তখনই শুরু হল ঝমঝমে বৃষ্টি। শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে বাতাসের। কাঠের জানলাগুলো যেন সহ্য করতে পারছে না তার দাপট। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে ফাঁক গলে। নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল বাকি তিনজনে। একটা তক্তাপোশে কল্যাণ আর সুদীপ দ্বিতীয়টায় জয়িতা। যাবতীয় শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে আনন্দ। এই বিকেলে শুতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

জয়িতা বলল 'বোধ হয় প্রকৃতি আই মিন হিমালয়, প্রটেস্ট করছে।'

'কিসের প্রটেস্ট?' কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা এসেছি বলে।' জয়িতা নিঃশ্বাস ফেলল, 'কেমন ভয় ভয় করছে।

'দূর!' সুদীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'হিমালয় আমাদের রাজকীয় ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বারো হাজার ফুট উঁচুতে এমন দারুণ ঝড়বৃষ্টি, লাইটনিং, ভাবা যায়!'

এই সময় ওয়াংদে এসে দাঁড়াল দরজায়। ওরা অবাক হয়ে দেখল ওয়াংদের শরীরে শীতবস্ত্র বলতে সেই হাফহাতা সোয়েটার। কিশোর-হাসিটি হাসল সে, 'আমার রান্না হয়ে গেছে, যদি সাহেবরা খেতে চান তো দিতে পারি।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'এই বিকেলে ডিনার? অসম্ভব। খিদে পেলে বলব।'

ওয়াংদে মাথা নেড়ে চলে গেল ভেতরে। ঘরে কোন আলো নেই, ফায়ারপ্লেসের আগুনে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই সম্বল। হঠাৎ সুদীপ উঠে বসল, 'আচ্ছা, তোদের কি মনে হল ওয়াংদে খুব নর্মাল কথা বলল?'

আনন্দ বলল, 'একটু যেন অন্যরকম। এত শীতে হাফ সোয়েটার পরলে যা হয়।'

যতটা সম্ভব পোশাক চাপিয়ে সুদীপ নিচে নামল। তারপর নিঃশব্দে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে আছে ওয়াংদে। ওকে দেখে সেই একই হাসি হাসল। এখন তার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। হাতে দিশি মদের বোতল। সুদীপ ওর সামনে উবু হয়ে বসতে ওয়াংদে বলল, 'এখানে এলে খেতে হয়। না হলে ভগবান খুব রাগ করে। আর তার রাগ হলে ঠাণ্ডাটাকে বহুৎ বেশি বাড়িয়ে দেয়। আর এটা পেটে যাওয়া মাত্র সান্দাকফুটা মানেভঞ্জন হয়ে যায়।' কথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে এখন।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি মদ ওটা?'

'ছাং। সাহেব যদি একটু মুখে দেন তাহলে আমার কথা সত্যি কিনা বুঝতে পারবেন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না না। ওসব আমি খেতে পারব না।'

ওয়াংদে হঠাৎ খুব রেগে গেল। তার মুখ লাল ছিল, এবার যেন ফুলে উঠল। সে জোরে জোরে শরীর দোলাল, 'তাহলে এখানে সাহেবের আসা উচিত হয়নি। সান্দাকফুতে এসে ছাং কাউকে খেতে দেখলে একটু খেতে হয়। না হলে ভগবান রাগ করবে।'

সুদীপ হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিতেই ওয়াংদের মুখে সরল হাসি ফিরে এল। গন্ধ নিল সুদীপ। নেহাৎই পচাই বলে মনে হচ্ছে। সে আর একবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু ওয়াংদে, আমি খেলে তোমার ভাগে কম পড়বে, তখন?'

'কোন অসুবিধে নেই। সাহেব টাকা দিলে আমি ডি আই বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে আরও বোতল নিয়ে আসব। ও বেশি দামে মদ বিক্রী করে।'

'এই বৃষ্টিতে তুমি যাবে কি করে?'

'চলে যাব। সাহেব চিন্তা করবেন না।' ওয়াংদের মাথা টলছিল এবার। কৌতূহল হচ্ছিল। সুদীপ বোতলটা মুখের ওপর তুলে এক ঢোঁক গিলল। বিদঘুটে গন্ধে গুলিয়ে উঠল শরীর। ওটা কোনমতে পেটে চালান করে দিতেই মনে হল গলা বুক জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এবং সমস্ত শরীরে একটা গরম হাওয়া পাক খেতে লাগল। বোতলটা এগিয়ে দিল সে ওয়াংদের দিকে। ঠোঁট মুছে বলল, 'তুমি এটা শেষ কর। তারপর না হয় আনানো যাবে।'

ঘরে ফিরে আসামাত্র জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে?'

সুদীপ হাসল, 'ওয়াংদে ছাং খেয়ে প্রায় আউট!'

আনন্দ জানতে চাইল, 'ছাং কি?'

'এক ধরনের মদ। ওর সম্মান রাখতে আমাকে এক ঢোঁক খেতে হল।'

'যাঃ! খেতে কি রকম রে?' জয়িতা প্রশ্ন করল।

'দারুণ। তবে অন্নপ্রাশনের ভাত দেখার চান্স আছে। এখনও আমার কান গরম হয়ে আছে। এই শীতে ওটা টনিকের কাজ করে।' সুদীপ কথা শেষ করা মাত্র আনন্দ দ্রুত কাচ মুছতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সর্বনাশ!'

'কি হল?' প্রশ্নটা তিনটে গলা থেকেই একসঙ্গে ছিটকে এল।

'একটা জিপ আসছে নিচ থেকে।' উত্তেজিত হল আনন্দ।

বৃষ্টির জন্যে ওরা বাইরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল না।

আনন্দ চিন্তিত মুখে জানাল, 'ভাল করে দেখা গেল না। তবে জিপটা যে ভাড়ার গাড়ি নয় এটা পরিষ্কার।'

॥ ২৯ ॥

ঘোড়ার নালের মত রাস্তাটায় বাঁক নিয়ে জিপটা দাঁড়াল পি ডবলু ডি বাংলোর সামনে। বৃষ্টির আড়াল ভেদ করে দৃষ্টি যাচ্ছিল না। বারংবার কাচ পরিষ্কার করেও আনন্দ আবছা দেখছিল। জিপটা দাঁড়িয়ে আছে অন্তত শ'খানেক গজ দূরে। কেউ নামছে না। হয়তো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি ওদের ইতস্তত করাচ্ছে।

সুদীপ আনন্দর পেছনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিসের গাড়ি বলে মনে হচ্ছে তোর? এখানকার পুলিশের গাড়ি কেমন তাও জানি না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি করব এখন?'

সুদীপ বলল, 'তৈরি হতে হবে। এতদূরে এসে আমরা ধরা দিতে পারি না। একটা জিপে পাহাড়ি

রাস্তায় আর কটা পুলিশ থাকতে পারে। আমরা চার্জ করব।'

জয়িতা লাফিয়ে নিচে নামল। তারপর আনন্দর বয়ে আনা ব্যাগটা সন্তর্পণে খুলতে লাগল। কল্যাণের চোয়াল শক্ত হল, 'আমাকে একটা গ্রেনেড দে, আমি বাঁ হাতে ছুঁড়তে পারব।'

কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। সুদীপ তার রিভলবারটা বের করল। এই মুহূর্তে ভেতরের শীত বাইরের ঠাণ্ডাটাকে যেন আচমকা সরিয়ে দিল। জানলা থেকে আর একবার চোখ সরিয়ে আনন্দ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। এখনও কেউ জিপ থেকে নামেনি। সংঘর্ষে গেলে কারও বুঝতে অসুবিধে হবে না আমরা এই অঞ্চলে এসেছি। ওরা আরও ফোর্স পাঠাবে। জায়গাটাকে ভাল করে চেনার আগেই আমাদের কোণঠাসা হতে হবে।'

কল্যাণ ফিসফিস করে বলল, 'তুই কি করতে চাইছিস?'

'সংঘর্ষের চেয়ে পালানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পালানো? এই রাত্রে? মানে রাত না হলেও অন্ধকার হয়ে এসেছে তো। তাছাড়া আবহাওয়া দেখতে পাচ্ছিস? এত ঠাণ্ডা বৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। বাইরে বের হলেই মরে যাব। অসম্ভব। এই বৃষ্টিতে কোথায় পালাব?' কল্যাণ আঁতকে উঠল।

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। তার একটা হাত বুকের ওপর দ্বিতীয়টা চিবুকে। কল্যাণের কথা শেষ হলে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পালিয়ে কি লাভ হবে আনন্দ? পুলিস তো বুঝে নেবে আমরা এই তল্লাটেই আছি। আমাদের যে মাল বইছে সে-ই তো বলবে। তাছাড়া আর একটা লোক এখানে আমাদের দেখেছে। ওরা বুঝবে আমরা একটু আগেই এখান থেকে পালিয়েছি। এই ওয়েদারে খুব বেশি দূরে আমরা যেতেও পারব না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ও ঠিকই বলছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা আপাতত আমাদের বাঁচাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস কিছু?'

আনন্দ খানিকক্ষণ দেখার চেষ্টা করল। ঝাপসা থেকে আরও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা। এখন তিন হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ছে না। ঠাণ্ডা বাড়ছে সেইসঙ্গে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'অসম্ভব। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সাদা সাদা কিছু পড়ছে। বোধহয় তুষার!'

'তুষার?' চিৎকার করে উঠল জয়িতা, 'রিয়েলি?' সে ছুটে এল কাঁচের জানলার কাছে। তারপর এক হাতে আনন্দকে ঠেলে সরিয়ে মুখটা নিয়ে গেল কাঁচের কাছে। অনেক চেষ্টা করেও সে বাইরের পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করতে পারল না। বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে ঘুরে দাঁড়াল, 'আমি তুষাব পড়া দেখব। এত গল্প পড়েছি যে আজ চোখে দেখতে না পেলে—ও!' ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল কল্যাণ, 'এদিকের দরজা খুলিস না!'

জয়িতা ওর দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। কল্যাণ বিড়বিড় করল, 'একেই শালা হু হু করে হাওয়া ঢুকছে তার ওপর উনি চলছেন সামনের দরজা খুলতে। প্রাণে যদি অত পুলক জাগে তো পেছনের দরজায় যাও।'

কাঁধ নাচাল জয়িতা। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পেছনের দিকে চলে এল। ভেজানো দরজাটা খুলতেই নাকে পোড়া গন্ধ এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। দরজাটা বন্ধ করে সে কয়েক পা এগোতে হিহি কাঁপুনি শরীর দখল করল। কিন্তু ততক্ষণে তার চোখ বিস্ফারিত। কড়াইতে খিচুড়ি শুকিয়ে পুড়ে প্রায় কয়লা হয়ে গেছে। এখন ওই পদার্থটি পৃথিবীর কোন প্রাণী মুখে তুলতে পারবে না। উনুনের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে ওয়াংদে। দেখলেই বোঝা যায় তার কোন হুঁশ নেই। মাথার পাশে দিশি মদের বোতলটা কাত হয়ে পড়ে, তাতে তলানিটুকুও নেই। জয়িতা একবার ভাবল ওকে ডাকবে। কিন্তু অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে তাতে কোন লাভ হবে না। সে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এগোল। এই দরজা থাকা না থাকা সমান। চিরুনির মত হাওয়া ঢুকছে ভেতরে। পেটে মদ এবং পাশে উনুন থাকায় লোকটার ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এখানে দাঁড়ানো অসম্ভব। জেদ চেপে গিয়েছিল যেন জয়িতার। বিদেশী অনেক উপন্যাসেই তুষার পড়ার কথা থাকে। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে পাহাড়, বরফ, সমুদ্র, মরুভূমি থাকা সত্ত্বেও লেখকরা শুধু শহর অথবা সমতলের গ্রাম নিয়েই ব্যস্ত। আর একটু চোখ তুলে কারও তাকানোর অবকাশ হয় না। অবশ্য জয়িতার বাংলা পড়া খুব বেশি নয়। কিন্তু বিদেশী

উপন্যাস তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল বাইরে। আর দরজা খুলেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, এতক্ষণ পাওয়া বৃষ্টির শব্দটা এখন শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু হাওয়ার দাপট বেড়েছে। সুঁচ লাগানো চাবুকের মত হাওয়া এসে আঘাত করল ওর মুখে। যন্ত্রণায় সে প্রায় লাফিয়ে ঘরে ফিরে এল। দরজাটা বন্ধ করতে করতে মনে হল হাত এবং মুখে কোন সাড়া নেই। টলতে টলতে সে উনুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল যেন। কাঠ শেষ হয়ে আসায় আগুন নেই কিন্তু উত্তাপ আছে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তার শরীরে রক্ত স্বাভাবিক হল। সে তাকিয়ে দেখল আর কাঠ আছে কিনা। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও চোখে পড়ল না। ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বন্ধুদের দিকে তাকাল, 'শুয়ে পড়। পুলিসের বাবার সাধ্য নেই এই অবস্থায় এখানে হেঁটে আসে। তবে আজ রাত্রে কারও ভাগ্যে খাওয়া জুটবে না। খিচুড়ি পোড়া কয়লা হয়ে গেছে আর আমাদের ঠাকুর মাল খেয়ে বেহুঁশ। লোকটাকে দেখে আয়, কি আরামে আছে এখন, ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা টেরই পাচ্ছে না।'

সুদীপ কথাটা শোনামাত্র উঠে দাঁড়াল, 'সেকি? সত্যি বলছিস?'

জয়িতা ওর দিকে একবার উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল! তারপর আনন্দকে বলল, 'একটা রাত না খেয়ে কাটালে কিছুই হবে না, কি বলিস!'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র সুদীপ বেরিয়ে গেল। তারপর ঠিক তীরের মত ছিটকে এল ঘরে, 'বাপস কি ঠাণ্ডা! এখন কি হবে! ও তো আজ রাত্রে উঠে দাঁড়াতেও পারবে না। আমি যদি তখন মদ খেতে নিষেধ করতাম!'

কল্যাণ বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। না খেলে ঘুমই আসবে না।'

সুদীপ হাসল, 'তুই বরং এক কাজ কর। ধরা দিলে পুলিশরা নিশ্চয়ই খাওয়াবে। ওদের কাছে নিশ্চয়ই খাবার-দাবার আছে।'

আনন্দ কোন কথা না বলে আবার জানলায় ফিরে গেল। একটু একটু করে আলো ফুটছে। তীব্র হাওয়া এভারেস্টের মাথা থেকে নেমে আসা মেঘগুলোকে দার্জিলিং-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটু আগে যে ঘন অন্ধকার নেমেছিল তা চটপট সরে যাচ্ছে। কিন্তু আর একটা বিস্ময়! সান্দাকফুর দৃশ্যমান অংশে সাদা তুষারের চাদর পড়ে আছে এখন। পেঁজা তুলোর মত তুষার পড়ছে এখানে। এবার জিপটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। ওর গায়েতেও সাদাটে ভাব। অনেকটা আলো ফোটার পব সান্দাকফু যেন ছবি হয়ে গেল। আনন্দ মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জয়িতা, তুই তুষার দেখতে পেয়েছিস?' হতাশ গলায় উত্তরটা জয়িতা জানাতেই সে ডাকল, 'চটপট চলে আয়।'

শুধু জয়িতা নয়, সুদীপের সঙ্গে কল্যাণ পর্যন্ত আনন্দর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন। সুদীপ বলল, 'গ্র্যান্ড! ভারতবর্ষে আছি বলে মনে হচ্ছে না।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'জিপটা থেকে কেউ নেমেছে?'

'এখনও নামেনি। এখন যেভাবে ওয়েদার ভাল হয়ে যাচ্ছে তাতে ওদের এখানে আসতে কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য এলে আমরা দেখতে পাব।' আনন্দ জানাল। জয়িতা কোন কথা বলছিল না। সে মুগ্ধ হয়ে তুষার পড়া দেখছিল। ঠিক তখনই জিপের সামনের দরজা খুলে গেল। একটা লোক লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল বাংলোর দিকে। লোকটার আপাদমস্তক মোড়া। আনন্দ নিচু গলায় ঘোষণা করল, 'লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার।'

লোকটা যে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে তা বোঝা গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে আবার ফিরে গেল জিপের কাছে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং জিপটাও নড়ল না। আনন্দ বলল, 'ওরা জানে না যে চৌকিদার এখানে নেই। নিশ্চয়ই ওরা এবার দরজাটার তালা ভাঙার চেষ্টা করবে। আমি শুধু ভাবছি কটা লোক আছে গাড়িটায়?' আর ঠিক তখনই জিপটা সামান্য ব্যাক করে এদিকে বাঁক নিল। দৃশ্যটা দেখা মাত্র ওরা উত্তেজিত হল। কল্যাণ ছুটে গিয়ে ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড তুলে নিল। আনন্দ ইশারায় ওকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করল। জিপটা এবার চোখের আড়ালে চলে গেল। ওপাশে ডি আই বাংলো রয়েছে। যদি পুলিশ হয় তাহলে ওখানে গেলে নির্ঘাত খুঁজে বের করবে তাদের হদিশ। আনন্দ ঠিক করল ইয়ুথ হোস্টেলের দরজার কাছে এসে জিপ থেকে পুলিশগুলো নামামাত্র চার্জ করবে। সিদ্ধান্তটা বন্ধুদের জানাল সে। গাড়ি থেকে নামার আগে পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ওরা যদি ডি আই বাংলোয়

থেকে যায় তো মন্দের ভাল।

'মন্দের ভাল' শব্দ দুটো পছন্দ হচ্ছিল না সুদীপের। কারণ ডি আই বাংলোর ওপাশে ঠিক কি হচ্ছে তা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে আপাতত যেটাকে ভাল মনে হচ্ছে আনন্দর সেটা একটা বিরাট মন্দের প্রস্তুতি। ওরা যদি ডি আই বাংলোতে গিয়ে খবরাখবর নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পায়ে হেঁটে এখানে আসে? নিজেকে ওই দলের অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে ভাবলে তো সে এই রকমই করত। গাড়ি নিয়ে কেউ সশস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করতে আসে না। সময় যাচ্ছে। এখন ক্রমশ ঠিকঠাক সন্ধ্যে এগিয়ে আসার কথা কিন্তু আলো আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সুদীপ আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। ব্যাগের ওপর রাখা কানঢাকা উইন্ড চিটারটা তুলে নিয়ে দ্রুত পরে ফেলতেই জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাইরে।' সুদীপ গ্রেনেড এবং রিভলবারটা সঙ্গে রাখল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।'

আনন্দর কিছু বলার আগেই কল্যাণের ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল, 'না! তুই যাবি না।'

সুদীপ অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। যদিও সে কোন শব্দ উচ্চারণ করল না কিন্তু মুখচোখে প্রশ্নটা স্পষ্ট। কল্যাণ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা চারজনেই একসঙ্গে এই ঘরে থাকব।'

'বাট হোয়াই?' সুদীপ অবাক শুধু কল্যাণের কথায় নয়, তার বলার ধরনেও।

'তাই কথা ছিল।' কল্যাণ চোখে চোখ রাখতে চাইছিল না।

'আমি বুঝতে পারছি না তুই কি বলতে চাইছিস! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?'

'আমি জানি না। কিন্তু পুলিশ অ্যাটাক করলে তুই সেটা পারিস বাইরে গেলে, আমরা পারব না। একসঙ্গে মুখোমুখি হওয়া ভাল।' কল্যাণ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। হঠাৎ মনে হল সান্দাকফুর শীতল অপরাহ্ণে যে ঠাণ্ডা বাতাস সমস্ত উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে তার থেকে বহুগুণ শীতলতম অনুভূতি ওই শব্দগুলো থেকে ছিটকে এল।

'ওঃ গড! ইউ ডোন্ট বিলিভ মি কল্যাণ।' সুদীপের গলা থেকে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। কল্যাণ কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ ভাল হাতটায় গ্রেনেড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'তোরা? তোদেরও কি একই ধারণা?' সুদীপ আনন্দর দিকে তাকাল। আনন্দ হাসল। তার চোখ কল্যাণের ওপর ঘোরাফেরা করছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে ওর কাছে এগিয়ে গেল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুই এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিস কেন?'

'নার্ভাস!' কল্যাণ কাঁধ ঝাঁকাল।

'অবশ্যই নার্ভাস। খুব ভয় পেলে মানুষ অনেক সময় নিজেকেও অবিশ্বাস করে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তুই সুদীপের সঙ্গে এই ধরনের—! দ্যাখ কল্যাণ, কেউ যদি পালাতে চায় তো তাকে আমরা ধরে রাখতে পারব না। আমি এখনও বলছি, ওয়েলকাম! সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। আমরা ধরে নেব যে-কটা বাধা আমরা পেরিয়েছি সে-কটাই তার নার্ভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সান্দাকফু ছাড়াবার পর আর কোন সুযোগ কেউ পাবে না। কল্যাণ, তুই যদি ফিরে যেতে চাস তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কথাটা শেষ করে আনন্দ ইঙ্গিত করল জয়িতাকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে।

কল্যাণের মুখ অন্যরকম হয়ে গেল, 'আমাকে চলে যেতে বলছিস কেন?' হাসল কল্যাণ, 'চলে আমি যাবই বা কোথায়! সবকটা দরজা তো জেলখানার দিকেই শেষ হয়েছে। আমি ভয় পাই না নিজের জন্যে আনন্দ, কিন্তু ওদের ওই ক্লাসটাকে আমি বিশ্বাস করি না।' এবার সোজাসুজি সুদীপের দিকে তাকাল কল্যাণ।

'আমাকে তুই বিশ্বাস করিস না?' সুদীপ তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিল না।

'তোকে নয়, যে ক্লাস থেকে তুই এসেছিস সেই ক্লাসটাকে।'

সুদীপ এগিয়ে এল কল্যাণের সামনে, 'এখানে আমি একাই আছি। অ্যান্ড লিশ্‌ন, আমি কোন ক্লাসের প্রতিনিধি হয়ে এখানে আসিনি। আর তাই যদি বলিস, বিখ্যাত সব মানুষ চিরকাল বলে গেছেন মধ্য বা নিম্নবিত্তরাই চিরকাল সুবিধেবাদী। তুই নিজে যে ক্লাস থেকে এসেছিস সেই ক্লাসটার কথা আগে চিন্তা কর। তুই সুবিধেবাদী নস?'

'আমি? হ্যাঁ, সুবিধে পেলে কে না ছাড়ে বল!'

সুদীপ ঝুঁকে কল্যাণের প্লাস্টার করা হাতটা খপ করে ধরল, 'আমাকে বিশ্বাস করার দরকার নেই, আনন্দকে করতে হবে। সেটাই ঠিক হয়েছিল কলকাতায়। নইলে আমি তোকে বিব্রত করব। ও কে।' সুদীপ সোজা হয়ে দাঁড়াল। কল্যাণের প্লাস্টারের রঙ এর মধ্যে বেশ নোংরা হয়ে গেছে। সুদীপ সেদিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ওটাকে আর বয়ে বেড়িয়ে কি লাভ! আনন্দ, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরছি। অবশ্য ততক্ষণ যদি বাইরে থাকা যায়! আমার মনে হয় ওরা জিপ নিয়ে আসবে না। সাবধানে থাকবি।'

গ্লাভস দুটো হাতে গলিয়ে ও পেছনের দরজা খুলে হাঁটতে হাঁটতে দেখল ওয়াংদে তখনও পড়ে আছে। লোকটার নেশা না ভাঙানোই ভাল। সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলতেই সোঁ সোঁ হাওয়ার অস্তিত্ব টের পেল। একটু সময় নিল সে। ঠাণ্ডাটা সইবার অবস্থায় এলে সে চটপট বাইরে বেরিয়ে এল। এই দিকটা সান্দাকফুর বাংলোগুলোর উলটো দিকে। ওপাশ থেকে কারও নজরে আসবে না। সুদীপ দৌড়ে যেতে গিয়ে পিছলে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল। জুতোর তলায় চকচকে বরফ ঝরা কাঁচের মত ছড়ানো। শ্যাওলা পড়া উঠোনের চেয়েও পিছল। একটু ঝুঁকে সে এক টুকরো বরফ তুলে নিল। এখনও পাতলা, ফিনফিনে। সে চারপাশে তাকাল। একটা পায়ে চলা পথ রয়েছে নিচে যাওয়ার। ওপাশে আর একটা চলে গেছে যেটা দিয়ে গেলেই সবার সামনে প্রকাশিত হতে হবে। প্রকাশিত শব্দটা নিয়ে খেলল সে মনে মনে। এখন হিমালয়ের সব মুখ ঘোমটার আড়ালে। এমন কি কাছাকাছি পাহাড়গুলোতেও গাঢ় কুয়াশা নেমে পড়েছে। হয়তো আরও কিছুক্ষণ পরে পায়ের তলার সব ঘাস বরফের আড়ালে চলে যাবে। এরকম একটা অপ্রকাশিত প্রকৃতিতে কল্যাণ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এমন ভাবে যে বুকের মধ্যে এখনও পাথরটা চেপে রয়েছে। জয়িতা ভাঙতে চায়নি, কিন্তু যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছিল তাতে সুদীপের মনে হয়েছে কল্যাণের হাতে মারাত্মক কিছু হয়নি। যা হয়েছে তা ভাল করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধলেই চলে যেত। হাড়ে একটু চাপ আর কয়েকটা লিগামেন্ট ছেঁড়ার জন্যে যদি কল্যাণ জোর করে ডাক্তারকে দিয়ে প্লাস্টার করিয়ে নেয় তাহলে অনেক সুবিধে। ডাক্তার কি বলেছিল তা রামানন্দ রায় এবং কল্যাণ ছাড়া কেউ জানে না। রামানন্দ মেয়েকে কতটা কি বলেছেন সেটা জয়িতা হয়তো ভদ্রতায় বলবে না। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল, কল্যাণও আর হাতের ব্যথার কথা বলল না, ব্যাপারটায় খটকা লাগে। তখন তো যে কোন মুহূর্তে পুলিশের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। হাতে প্লাস্টার থাকায় নিশ্চয়ই কল্যাণ খানিকটা সুবিধে পেত। তাছাড়া তারপর থেকে তো ওকে কোন ঝুঁকিতে যেতে হচ্ছে না। সুদীপ চোখ বন্ধ করল। সে কি খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে? হিমালয়ের এত ওপরে এসে এইরকম চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কি এক ধরনের নীচতা কাজ করে না?

যেন ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যেই সুদীপ একটা সিগারেট ধরাল। কল্যাণ যতক্ষণ সরাসরি বিপদ না ডেকে আনছে ততক্ষণ ওকে বন্ধু ভাবাই ভাল। কিন্তু এদিকে সময় বেশী নেই। বড় জোর মিনিট তিরিশের মধ্যেই অন্ধকার নেমে আসবে। সুদীপ হাঁটা শুরু করল। যতটা পারে ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করতে লাগল সে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর পি ডব্লু ডি বাংলোটা নজরে পড়ল। এখন অদ্ভুত মায়াবী এক আলো নেমেছে পৃথিবীতে। বিষণ্ণ শব্দটার শুরুতেও যদিও বিষ তবু তাতে জ্বালা থাকে না। এই আলোয় মন আরও বিষণ্ণ হয়ে যায়।

মিনিট তিনেক হাঁটার পর ও ডি আই বাংলোর সামনেটা দেখতে পেল। সবকটা দরজা বন্ধ। ওখানে কোন মানুষ আছে কিনা বোঝা অসম্ভব। সেটা অবশ্য ইয়ুথ হোস্টেলের দিকে তাকালেও মনে হবে। সতর্ক ভঙ্গিতে সে আরও একটু এগোতে বাংলোর পেছনদিকটা নজরে এল। জিপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে বাংলো। কেউ যদি খুঁটিয়ে না দেখে তাহলে সুদীপকে আবিষ্কার করতে পারবে না। অন্তত চল্লিশ গজ ফাঁকা জায়গা পার হলে একটা বড় পাথরের আড়াল পাওয়া যাবে। কিন্তু—। বাইরে যখন কেউ নেই তখন এই সুযোগটা নেওয়াই ভাল। সুদীপ দৌড়োল। দু-তিনবার পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে সে পৌঁছে গেল পাথরটার আড়ালে। এইটুকু দৌড়তেই নিঃশ্বাস দ্রুত হয়েছে। নাক মুখ দিয়ে বাষ্প বের হচ্ছে। শালা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব—মনে মনে আর একবার উচ্চারণ করল সে। তারপর একটু স্থির হয়ে বাংলোটার দিকে তাকাল। আর তখনই এপাশের দরজাটা

খুলে গেল। আপাদমস্তক ওভারকোটে মুড়ি দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে এল। লোকটার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বলে দেয় স্বাস্থ্য ভাল। হাঁটার ভঙ্গিতে হুকুম করার চরিত্র আছে। লোকটার পিছু পিছু আর একজন বেরিয়ে এল। এই লোকটাই ড্রাইভার। তার হাতে লোহার শিক গোছের কিছু। ওরা পি ডব্লু ডি বাংলোর দিকে হাঁটছিল। সুদীপ চোখ রাখল। খানিকটা ওপরে উঠে লোক দুটো সুন্দর বাংলোর দরজায় পৌঁছে গেল। ওরা তালা ভাঙছে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর লোকটা সফল হল। তারপর দুজনেই ভেতরে ঢুকে গেল। সুদীপ ডি আই বাংলোর দিকে তাকাল। কেউ আসছে না ওখান থেকে। এবার জিপের দিকে ভাল করে তাকাতে সে শক্ত হল। এটার গায়ে সরকারি লেবেল লাগানো। ড্রাইভারটা দৌড়ে দৌড়ে ফিরে আসছিল। ওর গায়ে শীতবস্ত্র আছে ঠিকই তবে অন্য লোকটির মত নয়। ড্রাইভারটা এসেই জিপের পেছনের দিকের ঢাকনা খুলে ফেলে গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। একভাবে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সুদীপ. আবিষ্কার করল তার গায়েও সাদাটে ভাব এসেছে। তুষার পড়ছে সমানে।

এই সময় ড্রাইভারের সঙ্গে সেই লোকটা বেরিয়ে এল যার সঙ্গে ওয়াংদে কথা বলেছিল। ওদের দুজনের হাতেই চেলাকাঠের বোঝা। সেগুলোকে জিপের পেছনে ওরা তুলে দিল দু'বারে। তারপর লোকটা ভেতরে চলে গেলে সুদীপ চমকিত হল। মেয়েদের পোশাক বুঝতে অসুবিধে হল না। মেয়ে দুটি লম্বা, শীতে অত্যন্ত কাবু বোঝা যাচ্ছিল। কোনরকমে দরজা থেকে বেরিয়ে এসে জিপে উঠে বসল। ড্রাইভার এবার গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজার গায়ে। মেয়ে দুটো মুরগীর মত ছটফটিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। জিনিসপত্র ভেতরে চালান করে দিয়ে ড্রাইভার বোধ হয় হুকুমমত গাড়ি নিয়ে ফিরে এল ডি আই বাংলোতে। অর্থাৎ যারা এসেছে তারা ডি আই বাংলোতে থাকতে চায়নি। সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল। বহুৎ বরাতজোর থাকায় তারা পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজা খোলা পায়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এরা পুলিশ নয়। অর্থাৎ আজকের রাতটা আরামে না হোক স্বস্তিতে কাটানো যাবে। এই সময় আর কোন মানুষের পক্ষে নীচ থেকে আসা সম্ভব নয়। সুদীপ এবার আড়াল ছাড়ল। তারপর খুব স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে চলে এল ডি আই বাংলোর দরজায়। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েকবার শব্দ করার পর ওয়াংদের পরিচিত লোকটা সেটা খুলল। কোন ভূমিকা না করে ভেতরে ঢুকল সুদীপ। মনে হচ্ছিল আর মিনিট পাঁচেক থাকলেই শরীর জমে যেত। লোকটাও সেটা বুঝতে পারল। দরজা ভেজিয়ে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে, 'বলুন!'

সুদীপ বোঝাবার চেষ্টা করল, 'আমরা আজ বিকেলেই এসেছি। ইয়ুথ হোস্টেলে আছি। কিন্তু ওয়াংদে, যে আমাদের সঙ্গে এসেছে সে নেশা করে পড়ে আছে। খাবার তৈরি করতে পারেনি। এখানে কি কিছু খাবার পাওয়া যাবে? আর আমাদের কিছু কাঠ চাই। ওখানে কাঠ নেই।'

লোকটা মন দিয়ে শুনল। একটা কালি পড়া হ্যারিকেন জ্বলছে বাংলোয় আর যারা আছে তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না। শীত মানুষকে চিরকালই নিস্তব্ধ করে দেয়। লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেবরা তো চারজন। আমি দশখানা রুটি আর সবজি দিতে পারি। কাঠ ও খাবারের জন্যে লাগবে কুড়ি টাকা আর দশ—তিরিশ টাকা, কাঠের জন্যে আরও দশ, মোট চল্লিশ। সাহেব রাজী?'

সুদীপ যেন মুক্তি পেল। দ্রুত ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু কতক্ষণ সময় লাগবে?'

লোকটা হাসল। ওর মুখে দিশি মদের গন্ধ বের হচ্ছিল ভুরভুর করে। ড্রাইভারটাও ধারে কাছে নেই। হাসি নিয়েই লোকটা বলল, 'শিলিগুড়ি থেকে পুলিশের সাহেব এসেছেন একটু আগে। ওঁরা খাবেন ভেবে আটা মেখেছিলাম। পরে শুনলাম সাহেবরা খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ওটাই আপনাদের জন্যে করে দেব। আধা ঘণ্টা টাইম চাইছি। সাহেব চলে যান আমি পৌঁছে দেব। সাহেবের কি মদ চাই? দিশি বিলিতি দুই আমার কাছে আছে।'

সুদীপ এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বিলিতি কি আছে?'

'রম। ছোট বোতল আশি টাকা। সাহেবের চাই?'

সুদীপ মাথা নাড়তেই লোকটা ভেতরে চলে গেল। এখানে টুরিস্টরা এলেই কি মদ খায়! ওর মনে হল মদ কিনে লোকটাকে পয়সা পাইয়ে দেওয়াটা ভালই হল। ও ওদের টুরিস্ট ভাববে। জিপটা তাহলে পুলিশ অফিসারের। সঙ্গে মহিলা রয়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই অন ডিউটিতে নেই। মদের বোতলটা নিয়ে সুদীপ বলল, 'তুমি যখন খাবার দিতে যাবে তখন এর টাকাটা নিয়ে নিও। অবশ্য আমাকে যদি বিশ্বাস কর।'

লোকটা হাসল, 'বিশ্বাস তো করতেই হয়। আমাকে টাকা না দিয়ে কেউই সান্দাকফু থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। গণেশের কাছে আমি তিনশো টাকা পাই, টাকা দিচ্ছিল না, অসুখ হয়ে গেল। সাহেবরা কি এখানে এই প্রথম এলেন?'

'হ্যাঁ। ওই বাংলোটা কি খুব ভাল? তোমাদের পুলিশ সাহেব ওখানে চলে গেলেন তাই বলছি।'

'ওটা ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে তৈরি হয়েছিল। যেসব সাহেব মেয়ে নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে আসেন তাঁরা সবাই চান ওই বাংলোয় থাকতে। ঠাণ্ডা ঢোকে না, ভাল ফায়ার প্লেস, নরম বিছানা—কত আরাম। এই সাহেব তালা ভেঙেও ঢুকে গেল সেই আরামের জন্যে।'

'সাহেবের সঙ্গে কারা এসেছেন?'

'এদের কি কোন পরিচয় থাকে সাহেব! কেউ ওদের পাঠিয়েছে, সাহেবকে আনন্দ দিতে। কারও কারও তো একজন মেয়ে পাশে থাকলে একা লাগে তাই দুজন এসেছে।' কথাগুলো বলে হঠাৎ যেন সচেতন হল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমি কিন্তু এসব কথার একটাও বলিনি। কোথাও আমার এইসব কথা বললে আমি অস্বীকার করব। এই জন্যেই মা বলত ভগবান চোখ দিয়েছে দেখবার জন্যে, কান দিয়েছে শোনার জন্যে, আর মুখ দিয়েছে খাবার জন্যে। কেন যে ভুলে যাই!' আফসোসের ভঙ্গিতে কয়েকবার মাথা নেড়ে লোকটা বলল, 'কথাটা যে কেন ভুলে যাই! ঠিক আছে, আমাকে দরজাটা বন্ধ করতে হবে। খাবার তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে!'

ইঙ্গিতটা বুঝেই বেরিয়ে এল সুদীপ। বাইরের আলো আরও মরে এসেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা। পৃথিবীর অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে দিনের চলে-যাওয়া এক পলক দেখল সুদীপ। এখন সেই তেজী বাতাসটা নেই। কিন্তু কাঁপুনি দেওয়া ঠাণ্ডা উঠে আসছে পৃথিবীর গভীর থেকে, আকাশের ছাদ গড়িয়ে। মদের বোতলটা হাতে নিয়ে দৌড়াল সুদীপ। এর মধ্যে পায়ের তলার তুষারগুলো বরফের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষ ধরন নেওয়ার পর আর পা পিছলে যাচ্ছে না। সে ক্রমশ উঠে এল পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজায়। পায়ের তলায় বরফ থাকলে কিভাবে দৌড়াতে হয় তার কায়দাটা আবিষ্কার করে সে আপ্লুত হল। তারপর সমস্ত উপত্যকার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ঢালু হয়ে নিচে গড়িয়ে যাওয়া সান্দাকফুকে এই বিশেষ জায়গা থেকে এখন অপরূপ দেখাচ্ছিল। রাত আসছে নিচ থেকে কালো পোশাকে ঢাকা ডাইনির মত হামাগুড়ি দিয়ে। মাথা নাড়ল সুদীপ। ঠিক হল না। রাতকে কোন বাঙালি কবি কালো খামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সান্দাকফু সেই খামের মধ্যে ঢুকে আছে।

রঙিন বাংলোটা পৃথিবীর সব নির্জনতা নিয়ে চুপচাপ। সুদীপ দরজাটার কাছ থেকে সরে এল। প্রতিটি জানলার ভেতরে ভারী পর্দা। তিনটে মানুষ ভেতরে আছে অথচ কোন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দও! প্রথম প্রথম সুদীপ সাবধান হবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তারপর মনে হল যে লোকটা এখানে মেয়েদের সঙ্গে আরাম করছে সে নিশ্চয়ই সতর্ক প্রহরী হবে না। বাড়িটার শরীর ধরে সুদীপ পেছনের দিকে চলে এল। মূল বাংলোর পেছনেই বোধ হয় চৌকিদার-এর থাকার জায়গা। সেটা মোটেই মজবুত নয়। কাঠের নড়বড়ে দরজাটায় একটা জোরে চাপ দিতেই খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। মাথা ঢুকিয়েও ফিরে আসতে গিয়ে থমকে গেল সুদীপ। মানুষীর গলা কানে আসছে। বোধ হয় কয়েকটা বন্ধ দরজা পার হয়ে আসায় গলার শব্দ প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার অবস্থায়। কিন্তু দুটো হাসি একত্রিত হওয়ায় তাকে চিনতে অসুবিধে হল না।

তিনবার আছাড় খেয়ে সুদীপ ইয়ুথ হোস্টেলের দরজায় যখন ফিরে এল তখন তার শরীর প্রায় নীরক্ত। বোধ হয় জানলা দিয়ে নিয়ত লক্ষ্য রাখায় আনন্দ দরজা খুলেছিল। ওর ওপর নির্ভর করে সুদীপ ঘরে ফিরে এল। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিবু নিবু, তবু তার ওপর হামলে পড়ল সুদীপ। জয়িতা ওর উইন্ডচিটারটা খুলে নিতে চাইছিল, 'এটা খোল। সাদা ভূত হয়ে গেছিস।' কোন রকমে সেটা থেকে মুক্ত হয়ে হাত এবং মুখে রক্ত ফিরে পাওয়ার পর সুদীপ দেখল আনন্দ মদের বোতলটা চোখের সামনে তুলে দেখছে। আগুনের পাশে বসে পড়ে সুদীপ হাসল, 'ওটা চৌকিদারের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে। লোকটার সঙ্গে ভাব জমছিল হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। শোন, কোন পুলিশ আমাদের সন্ধানে আসেনি। ওই গাড়িটা একজন শৌখিন পুলিশ অফিসারের। তিনি দুজন উর্বশীর সঙ্গে এই বাংলোয় এসেছেন আরাম করতে। সুতরাং কল্যাণ, তোর এবার শান্ত হওয়া উচিত।'

জয়িতা চাপা গলায় বলল, 'সুদীপ! ডোন্ট স্টার্ট দ্যাট। ও-কে!'

কথাটা শোনার পর সব থেকে স্বস্তিতে এসেছিল কল্যাণ। এবং সুদীপের খোঁটাটা সে গায়ে মাখল না। সে অনেকক্ষণ থেকে ট্রাঞ্জিস্টারে কান রাখছিল। এখনও কোন স্টেশন খোলেনি যার ভাষা সে চেনে। অদ্ভুত সব গলা আসছে কাঁটা ঘোরালে। হয়তো লাসা কিংবা পিকিং বা ওইরকম কোন রেডিও স্টেশন ধরা পড়ছে ওতে। সেটা দেখে কল্যাণকে আনন্দ বলল, 'তোকে বললাম কলকাতা এখান থেকে ধরা যাবে না। ব্যাটারি নষ্ট করছিস।'

কল্যাণ বোধ হয় ইতিমধ্যেই বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। ট্রাঞ্জিস্টারকে সরিয়ে বলল, 'তোদের খিদে পায়নি?'

জয়িতা বলল, 'পাচ্ছে, কিন্তু স্টকে হাত দেব কিনা ভাবছি।'

সুদীপ বলল, 'একটু ওয়েট কর। খাবার আসছে।'

'কোত্থেকে?' জয়িতা হাসল।

'হাসি নয়, তোদের জন্যে আর কত করব বল্! খাবার আসছে, কাঠ আসছে আগুন জ্বালার জন্যে। মোট একশ কুড়ি টাকা লাগবে। রেডি করে রাখ। লোকটাকে দরজা থেকে বিদায় করতে হবে।'

'চারজনের খাবারের দাম এখানে একশ কুড়ি?' প্রায় চিৎকার করে উঠল কল্যাণ।

'ওইটে সুদ্ধু।' মদের বোতলটা দেখাল সুদীপ, যে লোকটার সঙ্গে ওয়াংদে কথা বলেছিল সেই দিয়ে যাবে। মিনিট দশেক অপেক্ষা কর।'

জয়িতা ওর পাশে বসল, 'থ্যাঙ্কস। লোকটা অন্তত টাকার জন্যে আসবে, কি বল্? তুই কখনও মদ খেয়েছিস সুদীপ?'

'মদ!' হাসল সুদীপ, 'স্কুলের মেয়ের মত কথা বলিস না। একটু আগেও তো খেলাম।'

'ওঃ, ওই খাওয়ার কথা বলছি না। বেশ নেশা করার মতন খাওয়া, খেয়েছিস?'

'না। চান্স পাইনি বলব না, ইচ্ছে হয়নি।'

সুদীপ কথা শেষ করামাত্র আনন্দ বলল, 'কারও যদি খুব ঠাণ্ডা লাগে তাহলে অল্প খেয়ে দেখতে পারিস। নেশা করার কথা মাথা থেকে তাড়া।'

সুদীপ উঠল। ওয়াংদের রেখে দেওয়া জলের জাগ আর গেলাস নিল। মদের বোতলটা আনন্দ এগিয়ে দিতে সেটাকে একটু চেষ্টার পর খুলে ফেলল। তারপর গেলাসে ঢালতে গিয়ে থামল, 'ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি জানতে পারে চারটে ছেলেমেয়ে দেশের মানুষের যারা শত্রু, তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করার পর মদ খেয়েছে তাহলে তারা কি ভাববে?'

জয়িতা বলল, 'অর্ধেক মানুষ ছি ছি করবে আর অর্ধেক চুপ করে থাকবে।'

আনন্দ বলল, 'এখানে কোন দর্শক নেই। তোর শীত করলে তুই খাবি। দ্যাটস অল।'

সুদীপ ঘ্রাণ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, 'কুৎসিত গন্ধ। খেলেই বমি হয়ে যাবে। স্টিল আই অ্যাম ট্রাইং।'

জয়িতা বলল, 'যদি দু'নম্বরী মাল হয়! সান্দাকফুতে বিষাক্ত মদ খেয়ে উগ্রপন্থীর মৃত্যু—খবরের কাগজে হেডিং হবে।'

সুদীপ কোন কথা না বলে জল মিশিয়ে খানিকটা মুখে ঢালল। তারপর চোখ বন্ধ করে বলল, 'কান গরম হয়ে যাচ্ছে, বুক জ্বলে গেল। আঃ, বেশ আরাম লাগছে এখন। তোরা খেতে পারিস।'

কল্যাণ খেল না। সে কারণ দেখাল তার ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু তার চোখ তিনজনের ওপর ঘুরছিল। ও বুঝতে চাইছিল কেউ মাতাল হচ্ছে কিনা। এমন সময় জয়িতা বলল, 'দূর? আমার যে একটুও নেশা হচ্ছে না। মনে হল ওষুধ খেয়ে গা গরম করলাম।'

কল্যাণ খুব হতাশ হল। এবং তখন তার মনে হল একটু খেয়ে দেখলে হত! এখন আর চাওয়া যায় না। কেন যে মাঝে মাঝে স্রোত থেকে সরে দাঁড়াবার ভূত চাপে মাথায়—! তখনই দরজায় শব্দ হল। সুদীপ উঠে সোজা পায়ে দরজা খুলে ভেতরের ঘরে চলে গেল। তারপর চিৎকার করল, 'আনন্দ, টাকাটা নিয়ে আয়।'

শব্দটা শোনামাত্র টাকা বের করেছিল আনন্দ। মদ পেটে যাওয়ার পর সত্যি শীতটা উবে গেছে যেন। সে বেরিয়ে এসে ওয়াংদেকে একবার দেখল। তারপর দ্বিতীয় দরজার কাছে এসে টাকাটা এগিয়ে ধরল।

কাঠের বোঝা নামিয়ে খাবারের পাত্র হাত বদল করে লোকটা হাসল। একটাও কথা না বলে টাকাটা নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সকালের জন্যে কিছু কাঠ রেখে ওরা ফিরে এল ঘরে। ফায়ারপ্লেসে কাঠ গুঁজে ব্লোয়ারটা ব্যবহার করার পর আগুন জ্বলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উত্তাপ এবং আলো উজ্জ্বল হল। ঠিক গুনে গুনে দশখানা রুটি। আর সবজি বলতে যে বস্তুটি তাতে আর যাই থাক কোন স্বাদ নেই। ওরা দুটোর বেশি রুটি গিলতে পারল না। ফায়ারপ্লেসের আগুনের সামনে বসে দুটো করে রুটি হাতে নিয়ে একই পাত্র থেকে সবজি তুলে খাচ্ছিল ওরা। কোথাও কোন শব্দ ছিল না এতক্ষণ। শুধু কাঠ ফাটছিল আগুনে। আনন্দ বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে বল্ তো?'

ওরা কান পাতল। দূর থেকে একটা ডাক ভেসে আসছে। প্রথমে কুকুরের চিৎকার বলে মনে হচ্ছিল। তারপর কুকুরের সঙ্গে পার্থক্যটা ধরা পড়ল। ডাকগুলো কাছে এসে থমকে গেল। না, কুকুর নয়। আরও ভয়ঙ্কর কিছু। এইসব জায়গায় শেয়াল হায়েনার আসার কথা নয়। এত উঁচুতে এবং ঠাণ্ডায় আসবে কি করে ওরা? হঠাৎ সুদীপের মনে পড়ল তুষার-নেকড়ের কথা। ওরা সেই হিংস্র তুষার-নেকড়ে নয় তো? সে উঠে দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখতে গেল বাইরের ঘরে। দুটো দরজা দেখে ঘরে এসে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল এমন ভঙ্গিতে যে সঙ্গীরা চমকে উঠল। বিছানা থেকে ট্রাঞ্জিস্টারটা তুলে নিয়ে সে বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী শিলিগুড়ির সংবাদ পাঠকের গলা ভেসে এল. 'মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন কেন্দ্র যদি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে এরপরে তিনি জনসাধারণের সাহায্য চাইবেন।'

প্রতিদিন যেসব বস্তাপচা সংবাদ পরিবেশিত হয় বিভিন্ন নেতার সংলাপ হিসেবে আজকের সংবাদে তার ব্যতিক্রম কিছু ছিল না।

চারজন উগ্রপন্থী সম্পর্কে আকাশবাণী নীরব রইল। অবশ্য কল্যাণ ভাবছিল যদি আগে থাকে, তখন ট্রানজিস্টার খোলা হয়নি। এবং তখনই নখের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ বা কারা বাইরের দেওয়াল

॥ ৩০ ॥

পাখিরা যেমন শক্ত ফলের খোসায় নখের দাগ রেখে যায় তেমনি হয়তো ইয়ুথ হোস্টেলের একটা দেওয়ালে ক্রুদ্ধ প্রাণীদের আফসোস আঁকা হয়ে আছে। ওরা ভেবে পাচ্ছিল না এটা ঠিক কোন্ প্রাণী! রাত্রে চোখে দেখার উপায় ছিল না। চাপা গর্জনে ক্ষোভ গলছিল। এত ওপরে বাঘ আসতে পারে কিনা তা-ও ওরা বুঝতে পারেনি। সকাল যখন দশটা তখন থাবা বলে দিল আর যাই হোক প্রাণীগুলোর শরীর বিশাল নয়। ওয়াংদে পর্যন্ত যা বোঝাতে চাইল হিন্দী এবং নেপালিতে মিশিয়ে তাতে প্রাণীটির নাম আবিষ্কার করা মুশকিল হল। তবে ওয়াংদের মতে ব্যাপারটা কিছু ভয়াবহ নয়। মানুষের রক্তের গন্ধে ওদের উত্তেজনা হয় ঠিকই কিন্তু ধমক দিলে পালিয়েও যায়। সাহেবরা যদি কাল রাত্রে গলা তুলে ধমকাতেন তাহলে ওরা এত সাহস পেত না।

আজ সকালে ওয়াংদে তাদের ঘুম ভাঙিয়েছে চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে। আনন্দ বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। একটি সরল হাসি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করতে পারে তা ওয়াংদেকে না দেখলে বোধহয় কোনদিন জানা হত না। কাল রাত্রেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই নিয়ে খামোকা ঝামেলা করার কোন মানে হয় না। লোকটা বেশি মদ খেয়ে নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে, তাদের রাতের খাবার এবং জ্বালানী কাঠ এনে দেয়নি কিন্তু এখনও অনেকটা পথ সামনে পড়ে আছে। তবে আনন্দ তাকে সতর্ক করে দিল এরকম যেন আর না হয়।

সকাল দশটা অবশ্যই রওনা হবার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু কাল রাত্রে ওই প্রাণীগুলোর থেমে যাওয়া এবং রাত্রের আকাশবাণীর শেষ খবর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যখন ঘুম এল তখন প্রায় মৃতদেহের মত পড়েছিল ওরা। এই কদিনের প্রতিনিয়ত মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রম এবং

এখানকার শীতল আবহাওয়া ওদের সমস্ত সতর্কতা মুছে দিয়েছিল। এরকম ঘুম বোধহয় অনেককাল বাদে ওরা ঘুমিয়েছে। যদি ওয়াংদে না ডাকত তাহলে সকাল দশটাতেও রওনা হওয়া যেত না। তবু ওয়াংদে বলেছে যদি জোর পা চালানো যায় তাহলে ফালুটে পৌঁছবার আগে সন্ধ্যে নামবে না।

সকাল দশটাতেও আজ সান্দাকফু কুয়াশায় ঢাকা। সামনের পাহাড়গুলো অদৃশ্য, একফোঁটা রোদ নেই। ওপরের বাংলোগুলোর পাশ কাটিয়ে ওরা যখন নির্জনে চলে এল তখন কোন মানুষ চোখে পড়েনি। কিন্তু জিপটা এখনও আছে। সুদীপের খুব ইচ্ছে ছিল যাতে জিপের মালিক আর ফিরে যেতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা। কিন্তু আনন্দ আপত্তি করেছিল। এটা নিছকই ব্যক্তিহত্যা হবে। আর এই ঘটনাই পুলিশকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেবে তারা এখানে এসেছে। ওয়াংদেই সাক্ষী দেবে। গতরাত্রের শেষ খবরেও তাদের কথা কিছু বলেনি। তার মানে নিশ্চয়ই পুলিশ হাত গুটিয়ে নেয়নি। একজন মন্ত্রী মারা যাওয়ার পর ওরা তা করতেও পারে না। কিন্তু যেটা সত্যি সেটা হল তাদের নিয়ে কোন খবর তৈবি হচ্ছে না যা পরিবেশন করা যায়।

আকাশটা মাথার ওপর অনেকটা নেমে এসেছে, পায়ের তলার মাটি যেন অনেক উঁচুতে এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে। ওয়াংদে যাচ্ছে আগে আগে। তার পিঠে যে বোঝা সেটার দিকে তাকিয়ে কল্যাণের মনে হল সে মরে যেত এত উঁচুতে ওই ওজন বইতে হলে। ওয়াংদের ঠিক পেছনে ছিল সুদীপ, তারপর কল্যাণ। জয়িতা আর আনন্দ হাঁটছিল শেষে, পাশাপাশি। আনন্দ বলল, 'আমরা খুব লাকি যে আজ ফালুটে কোন ট্রেকার যাচ্ছে না।'

জয়িতা কোন কথা বলল না। যদিও চারপাশে গভীর কুয়াশা তবু তার খুব ভাল লাগছিল। গতকাল জিপে আসার সময় আর যাই হোক এইভাবে পাহাড়ের মধ্যে থাকা হয়নি। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগত কিন্তু এই বা খারাপ কি! স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যাওয়া! মাঝে মাঝে সামনের বন্ধুরা মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়। যদিও আনন্দের পরিকল্পনামত তারা ফিরে আসবে অবস্থা শান্ত হলেই, কিন্তু জয়িতার মনে হচ্ছিল এই পথে আর হাঁটা হবে না। হয়তো কোনকালেই কলকাতায় যাওয়া হবে না তাদের। অন্তত এই মুহূর্তে সেই কারণে তার কোন আফসোস নেই। কলকাতা তাকে কিছুই দেয়নি। ওর বয়সের নব্বুইভাগ মেয়েই কোন না কোন উপায়ে জীবনটাকে ভাল লাগায়। ঈশ্বর তাকে যে শরীর দিয়েছেন তা কোন পুরুষকে বোধহয় কোনদিন আকর্ষণ করবে না। কিন্তু উলটো দিকে কেন হল না কিছু? সমস্ত শারীরিক অর্থে যখন সে একজন মেয়ে, তখন কোন পুরুষকে তার প্রেমিক হিসেবে পেতে ইচ্ছে হয়নি কেন? মাঝে মাঝে তাই নিজেকেই খুব দুর্বোধ্য লাগে জয়িতার।

এখন এই আকাশের মধ্যে হেঁটে যাওয়া চমৎকার লাগছিল। কাল রাত্রের পরে শীতের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও অনাবৃত নেই। গ্লাভস পরার পর যে অস্বস্তিটা ছিল সেটাও এখন কেটে গেছে। জয়িতা সামনের দিকে তাকাল। কল্যাণ একা একা হাঁটছে। কাল রাত্রে ও সুদীপের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করল সেটা নিয়ে আর কথা হয়নি। কিন্তু সুদীপ নিশ্চয়ই সহজে ভুলতে পারবে না। সুদীপের ওপর কল্যাণের একটা চাপা ঈর্ষা ছিল বলে অনুমান করত জয়িতা। অথচ ব্যাপারটার কোন প্রমাণ ছিল না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট বলে সুদীপ এড়িয়ে যেত ওর অনেক কিছু। কিন্তু কাল কল্যাণের হঠাৎ কেন মনে হল সুদীপ পালিয়ে যেতে পারে? এত তাড়াতাড়ি যদি অবিশ্বাস ঢুকে যায় প্রত্যেকের মনে তাহলে বিপর্যয় আসতে বাধ্য। জয়িতা ভেবেছিল আনন্দ এই নিয়ে কথা বলবে। মাঝে মাঝে আনন্দটাও কেমন অচেনা হয়ে যায়। ও যেন ব্যাপারটা দ্যাখেইনি এমন ভাব করে আছে। কিন্তু আজ সকালেও তো কল্যাণ সুদীপের সঙ্গে সহজ গলায় কথা বলছে না। জয়িতা জোরে পা চালাল। রাস্তা সমতল নয়। মাঝে মাঝে ওপরে উঠতে রীতিমত হাঁপাতে হচ্ছে। জয়িতা কল্যাণের পাশে পৌঁছে হাসবার চেষ্টা করেই সামলে নিল। এখন তো মুখের বেশির ভাগ ঢাকা। হাসলে কেউ বুঝতেই পারবে না। কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। খানিকটা পথ পাশাপাশি হেঁটে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কেমন লাগছে?'

'মহাপ্রস্থানের পথে যাচ্ছি। তুই দ্রৌপদী, একজন পাণ্ডব মিসিং। আমি, নকুল না সহদেব বুঝতে পারছি না। কোনদিন বেঁচে ফিরে আসব ভেবেছিস? নেভার। এই পাহাড়েই আমাদের জমে মরতে হবে। এসব বললে তো তোরা আমাকে দলবিরোধী বলবি! যত দোষ তো আমার।' কল্যাণ কথা শেষ করে

মুখ ফেরাল। শেষ শব্দগুলো বেশ ভার মেশা ছিল।

জয়িতা ওর কনুই-এ্ হাত রাখল, 'তুই নিজেকে হঠাৎ আলাদা করে ভাবছিস কেন?'

'ভাবব না? চমৎকার! যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে আনন্দ সুদীপের পরামর্শ নিচ্ছে। অনেকসময় তো সুদীপ নিজেই আমাদের ওপর হুকুম চালাচ্ছে। আমি যে দলে আছি সেটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিচ্ছে না। যেন আমার কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। এসব তোর চোখে পড়ে না, না?'

'সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে তো মুশকিল হবে। ওরা তো আমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে না।'

'তোর কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

কল্যাণ জবাবটা.দিতে গিয়েও থমকে গেল। জয়িতা জানত ও কি বলতে পারে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও সে প্রকাশ করল না। জবাবটার জন্যে চাপও দিল না। পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ মানুষের মনই কল্যাণের মানসিকতায় গড়া। এখনও ট্রামে বাসে উঠলে তারা বলে থাকে, ভিড় বাসে কেন যে মেয়েছেলে ওঠে! মেয়েছেলে শব্দটা শুনলেই শরীর গুলিয়ে ওঠে। শব্দটার সমস্ত শরীর জুড়ে অপমান।

সান্দাকফুতে সন্ধ্যেবেলায় যে চকচকে তুষার পড়েছিল সকাল দশটায় তার হদিস ছিল না পায়ের তলায়। কিন্তু আড়াই কিলোমিটার হাঁটার পর ওরা বরফ পেয়ে গেল। এর মধ্যেই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল চারজনের। বড় পাথরের আড়াল দেখে ওয়াংদে স্টোভ জ্বালাল। কল্যাণ বেঞ্চির মত পড়ে থাকা একটা পাথরে ধপ করে বসে পড়তেই সুদীপ বলল, 'বসিস না। বইতে পড়েছি পাহাড়ে ট্রেকিং-এর সময় বসলে আরও বেশি ক্লান্তি লাগে।'

কল্যাণ কাঁধ নাচাল। তারপর জয়িতার দিকে তাকাল। এই তাকানো যে অর্থবহ তা বুঝতে অসুবিধে হল না জয়িতার। কিন্তু এসবে আমল না দিয়ে ও এগিয়ে গেল সামনে। এখন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। আঃ দারুণ! ছোটবেলা থেকে কত ইংরেজি বই-এ এইরকম হাঁটার কথা সে পড়ে আসছে। সাইবেরিয়ার কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্প থেকে একজন এর চেয়ে আরও ভয়াবহ বরফের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছিল একুশ দিন। সেই বর্ণনা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তার সামনে এখন যে কুয়াশায় ঢাকা বরফ পড়ে আছে তাকে দেখে অবশ্য খুব নিরীহ মনে হচ্ছে।

সে ফিরে আসতেই কল্যাণ বলল, 'এখান থেকে সাপ্লাই পেলে কলকাতায় সস্তায় আইসক্রিম বিক্রি করা যেত। প্রাকৃতিক আইস উইদ ক্রিম।'

সুদীপ শুনে বলল, 'তোর কলকাতায় একটা ঘাসের দোকান খোলা উচিত ছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের গলা চড়ল, 'আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি না। কেউ গায়ে পড়ে আমাকে জ্ঞান দিলে আমি কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করব না।'

সুদীপ অত্যন্ত অবাক গলায় বলল, 'হোয়াটস্ দিস! আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারব না?'

'না। তোর ঠাট্টা, তোর হুকুম, এসব আমি মানতে বাধ্য নই।'

'ও। সারাটা পথ কিন্তু তোর বোঝা আমিই বয়ে এলাম। ঠিক আছে, তোর যখন কোন কম্‌প্লেক্স কাজ করছে তখন আর কিছুই বলব না। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই কমপ্লেক্সটা কি?'

কল্যাণ কোন জবাব দিল না। সুদীপ এগিয়ে গেল ওর কাছে, 'কল্যাণ, আমার প্রশ্নের জবাব দে।'

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আনন্দ এবং কাছাকাছি জয়িতা ওদের দেখছিল। চট করে যে উত্তেজনাটা তৈরি হয়েছে তার জন্যে জয়িতা ভীত হয়ে পড়ল। সে আনন্দর দিকে তাকাতে আনন্দ নিষেধ করল ইঙ্গিতে কিছু না বলতে। কল্যাণ একপাশে মাথা ঘুরিয়ে বসে আছে। সুদীপ কিছুক্ষণ ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর ডান হাত আলতো করে কল্যাণের কাঁধে রেখে বলল, 'সরি। তোকে যদি হার্ট করে থাকি তাহলে দুঃখিত।' বলে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। জয়িতা লক্ষ্য করল কল্যাণ তার বসার ভঙ্গি পালটাল না।

এইসময় ওয়াংদে ওদের চা দিয়ে গেল। ধোঁয়া উঠছে অথচ চুমুক দেবার পর মনে হল ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। নিজের মগে চুমুক দিয়ে ওয়াংদে বলল, 'আজ যদি ফালুটে পৌঁছাতে হয় তাহলে আর একটু জোরে পা চালাতে হবে। মনে হচ্ছে আজ রোদ উঠবে না এবং সন্ধ্যে নামবে আগেই।' ও কথাগুলো বলল আনন্দকে। লোকটা নিজেই বুঝে নিয়েছে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ঘড়িতে যখন তিনটে তখন জয়িতার মনে হল আর এক পা-ও হাঁটতে পারবে না। ছেলেরা কেউ কিছু বলছিল না বটে কিন্তু একমাত্র সুদীপ ছাড়া বাকী দুজনও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। এমন নয় ওরা সমস্তটা পথে বরফ পেয়েছে। কিন্তু চড়াই উৎরাই ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর আর বাতাস নেই, থাই থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা ওঠানামা করছে। ওয়াংদে আর সুদীপ এগিয়ে গিয়েছিল। কুয়াশায় ওদের দেখা যাচ্ছে না। আনন্দ চিৎকার করতে সুদীপের নাম পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু ওপাশ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আনন্দ কল্যাণকে বলল, 'আমার গলায় লাগছে, তুই ডাক।'

কল্যাণের অবস্থা তখন বেশ কাহিল। নাকের ডগায় কোন সাড় নেই। দাঁড়িয়ে থাকতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল। জয়িতা মুখের কাছে আনন্দর অনুকরণে দুটো হাত নিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু কল্যাণকে এড়িয়ে হাত নেড়ে আনন্দ তাকে নিষেধ করল। কল্যাণ চিৎকার করল সামনের ঘন নীল কুয়াশার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সুদীপের নাম ধরে নয়। ওয়াংদের সাড়া পাওয়া গেল বেশ দূর থেকে। জয়িতা অবাক চোখে কল্যাণের দিকে তাকাল। এই সময়েও মানুষ কি করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা বিস্ময়েরই ব্যাপার। আর মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর কুয়াশার আড়াল ভেদ করে ওয়াংদে বেরিয়ে এল, লোকটাকে একটুও ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে না। ওর পিঠের বোঝা যেন কিছুই নয়। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে ফালুট পৌঁছাতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে?' সে বুঝে গিয়েছিল দূরত্ব সময় দিয়ে মাপলে তবু এদের কাছ থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

ওয়াংদে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'এইভাবে হাঁটলে আরও এক ঘণ্টা। কিন্তু মনে হচ্ছে ফালুটে যাওয়া আজ সম্ভব হবে না।'

কথাগুলো একই সঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত করল আনন্দকে। নিজেদের অক্ষমতার কথা সে কিভাবে ওয়াংদেকে বলবে তাই ভাবছিল, কিন্তু ওয়াংদে সেটাই সহজ করে দিল। বরং সে একটু কৌতূহলী হবার ভান করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? মাত্র তো এক ঘণ্টার পথ বলছ!'

কল্যাণ এই সময় বলল, 'অসম্ভব। ইম্পসিবল। আমার পক্ষে আর এক পা-ও হাঁটা সম্ভব নয়। যদি যেতে চাস তো আমাকে ফেলে রেখে তোরা চলে যা।'

ওয়াংদে বলল, 'আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মনে হচ্ছে অন্ধকার নেমে আসবে আজ। সাহেবরা খুব খারাপ সময় পছন্দ করেছেন এখানে আসার জন্যে। তাও যদি আমরা সকাল আটটার মধ্যে বের হতে পারতাম তাহলে এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম। তাছাড়া ওই সাহেব আজকে আর যেতে পারবেন না।'

'কোন্ সাহেব?' ওয়াংদের কথাটা ধরতে পারল না আনন্দ।

'যে সাহেব আমার সঙ্গে হাঁটছিলেন। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন। জোর কপাল নইলে—খাদে চলে যেত শরীর। পায়ে চোট লেগেছে। আমি এতক্ষণ সাহেবের পা ম্যাসেজ করছিলাম।'

আনন্দ দেখল কল্যাণ এগিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে। সুদীপের খবরটায় যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল সেটা আচমকা থিতিয়ে গেল। জয়িতাও কল্যাণের পেছনে হাঁটছিল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আর চলা সম্ভব নয় অথচ খবরটা শোনামাত্র শরীরের ক্লান্তি চাপা পড়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জয়িতা সতর্ক করার জন্যে বলল, 'কল্যাণ, বাঁ দিক ঘেঁষে হাঁট।'

কল্যাণ কি বলল বোঝা গেল না। কিন্তু জয়িতা চিৎকার শুনতে পেল ওর। সুদীপের নাম ধরে তিনবার ডাকল কল্যাণ। অনেকগুলো সুদীপ ছড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে পাহাড়ে পাহাড়ে। সেটা মিলিয়ে গেলে সুদীপের গলা পাওয়া গেল। সেটা লক্ষ্য করে খানিকটা খাড়াই পথ ভাঙার পর ওরা সুদীপকে দেখতে পেল। রাস্তার পাশে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওর দুটো পা সামনের দিকে ছড়ানো। কল্যাণ বাকি অংশটুকু কোন রকমে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'খাদটা কেমন দেখা হল না। পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু পড়লাম না।' সুদীপ হাসল।

'ইয়ার্কি রাখ তো! কোথায় লেগেছে তোর?' কল্যাণ ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল।

'গোড়ালিতে। সিরিয়াস কিছু নয়। ভাঙলে তো মালুম হত।'

'তোকে আমি বিশ্বাস করি না। নিজেকে নিয়েও তুই ঠাট্টা করতে পারিস। উঠে দাঁড়া।'

'কেন?'

'আমি দেখতে চাই তোর পা কতটা জখম।'

'তুই দেখতে চাস? থ্যাঙ্কস। আমি বলছি তো গোড়ালিটাই একটু মচকেছে। ব্যান্ডেজ বাঁধলে ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় আমি পা বের করতে পারব না। নো, নেভার।'

জয়িতা ওদের কথা শুনছিল। কল্যাণের এই উত্তাপ ওকে চমৎকৃত করছিল। কোন্ কল্যাণ সত্য এইটেই অবশ্য তার মাথায় ঢুকছিল না। কল্যাণ তার এক হাতে ততক্ষণে সুদীপকে দাঁড় করিয়েছে। ডান পায়ের ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়েছে সুদীপ কল্যাণকে ধরে। বাঁ পা সে তুলে রেখেছে খানিকটা ওপরে। তারপর ধীরে ধীরে পায়ের পাতা মাটিতে রেখে চাপ দিল। ওর মুখের দিকে তাকাল জয়িতা অভ্যেসে। চোখ এবং নাক ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোড়ালি মাটিতে রাখতে গিয়েই সরিয়ে নিল সুদীপ। শব্দ করে হাসল, 'ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে। লিডার কোথায়?'

আনন্দ আর ওয়াংদে এসে পড়ল তখনই। আনন্দ সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'পড়লি কি করে?'

'পেছল ছিল, বুঝতে পারিনি। গোড়ালিটাকে একটু রেস্ট দেওয়া দরকার।' সুদীপ পায়ের পাতা নামাল।

'ব্যথা আছে?'

'চাপ দিলে লাগছে।'

আনন্দ ওয়াংদেকে বলল, 'কি করা যায়? আমাদের এখানেই থাকতে হবে, তাঁবু কোথায় টাঙাবে?' ওয়াংদে মুখ ঘুরিয়ে যেন পাহাড়টাকে জরিপ করল। তারপর বোঝাগুলো নামিয়ে দ্রুতপায়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

জয়িতা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তাঁবু ফেলে থাকা যাবে? রাত্রে তো আরও ঠাণ্ডা বাড়বে।'

সুদীপ হাসল, 'লাস্ট নাইট টুগেদার।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এনিওয়ে আমি চাইছিলাম না ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে থাকতে। ওখানেও আমাদের টেন্ট ফেলতেই হত। আর সেটা ওয়াংদের কাছে যুক্তিপূর্ণ বলে নিশ্চয়ই মনে হত না। সুদীপের পায়ে চোট না লাগলেও এখানে থাকার জন্যে ওয়াংদেকে বলতেই হত।'

ঠিক তখনই ওয়াংদে ফিরে এল প্রসন্ন মুখে। এসে জানাল পাশেই একটা চমৎকার থাকার ব্যবস্থা আছে। সাহেবরা ধীরে ধীরে উঠে গেলে সে মালপত্র নিয়ে যাবে। সকাল থেকে হাঁটার পথে ওরা দুটো গ্রামের পাশ কাটিয়ে এসেছে বটে কিন্তু এই নির্জন জায়গায় মনুষ্যবসতি আছে বলে কল্পনা করা যায় না। খবরটা কল্যাণকে খুশী করল। আর জয়িতা লক্ষ্য করল প্রাথমিক যে উত্তেজনা এবং উদ্বেগ কল্যাণকে সুদীপের কাছে ছুটিয়ে এনেছিল সেটা কেটে যাওয়ার পর ও আবার আগের মত শীতল হয়ে গিয়েছে সুদীপ সম্পর্কে।

জয়িতার কাঁধে হাত রেখে সুদীপ ওদের পেছন পেছন হাঁটছিল একটা পা আধা-ঝুলিয়ে, শুধু আঙুলের ডগায় যতটা ভার রাখা যায়। এতে ওর কষ্ট হচ্ছিল বেশ, গতিও কমে যাচ্ছিল। হঠাৎ সুদীপ বলল, 'তুই কাছে আসার পর যেন শরীরটা চাঙ্গা হয়ে গেল।'

'মানে?' সুদীপের ভর রাখার জন্যেই জয়িতা তাকে প্রায় জড়িয়ে চলছিল।

'মানুষের শরীরের উত্তাপ বোধহয় সবার সেরা। তোর মনে হচ্ছে না?'

সুদীপের এই প্রশ্নটার কোন উত্তর দিতে পারল না জয়িতা। হঠাৎ ওর মনে হল এই মুহূর্তেও সে সুদীপের কাছে একটি মানুষমাত্র। মানুষী নয়। এবং কি আশ্চর্য, সে নিজেও তো মোটেই উত্তপ্ত হচ্ছে না!

ঠিক গুহা বলা চলে না, পাহাড়ের শরীরের কিছুটা অংশ ভেতরে ঢুকে থাকায় মাথার ওপর বেশ ছাদ হয়ে আছে, দু'পাশে চমৎকার দেওয়াল। ওয়াংদে এটাকে আবিষ্কার করেছিল এর আগেই। অন্য শেরপাদের মুখ থেকে খবর পেয়ে আরও একবার সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্যে কয়েকজন ট্রেকারকে এখানে নিয়ে এসেছিল। মাথার ওপর জল পড়বে না, তিনদিক থেকে হু হু হাওয়া ছোবল মারবে না, এরকম জায়গায় এর চেয়ে আর কি কাম্য হতে পারে? শেষ পনেরো ফুট উঠতে সুদীপের কষ্ট হয়েছে বেশ। ওয়াংদেও হাত লাগিয়েছিল।

দিনের আলো নিবে গেছে বেশ কিছুটা আগেই। এর মধ্যে কিছুটা কায়দা করা হয়েছে বয়ে আনা

তাঁবু দুটো দিয়ে। একটা‍ত পাথরের ওপর বিছিয়ে বসেছে ওরা গা ছড়িয়ে। অন্যটা দিয়ে আনন্দ আর ওয়াংদে অনেক চেষ্টার পর সামনের খোলা দিকটা ঢাকতে পেরেছে। এখনও হাওয়া ওই দিক দিয়ে বইছে না, তেমন জোর বইলে ওটা কতক্ষণ থাকবে বলা মুশকিল। কিন্তু এর ফলেই জায়গাটা বেশ ঘর ঘর হয়ে গিয়েছে। এন্টা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ থাকলেও খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ানোর চাইতে হাজারগুণ ভাল।

সমস্ত পাহাড় জুড়ে গাছ আছে, সুতরাং কাঠের অভাব নেই। কিন্তু ভিজে ভিজে সেই কাঠ আগুনকে আর তোয়াক্কা করছে না। আনন্দ তাদের আস্তানার বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়ংদের উদ্যম লক্ষ্য করছিল। অনেক চেষ্টার পর বেচারা কিছু কাঠ থেকে ধোঁয়া বের করতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু দু'পাশে দুটো পাথর রেখে সে অন্য কেটে আনা কাঠগুলোকে সেঁকে নিচ্ছে যেমন করে এখনও শিককাবাব বানায়। সেই প্রবচন, যেখানেই ধোঁয়া সেখানেই আগুন এক্ষেত্রে সত্যি কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু লোকটার উদ্যম দেখে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছিল আনন্দ। এতটা পথ হেঁটে এসেছে বোঝা কাঁধে চাপিয়ে, সবচেয়ে পরিশ্রান্ত হবার কথা ওরই। অথচ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এখনও যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে বিন্দুমাত্র আলস্য নেই।

'কি তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেল, না?'

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দেখল জয়িতা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটা এমনিতেই রোগা, এখন যেন আরও রোগা দেখাচ্ছে অত গরম জামাকাপড়েও সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। আনন্দ ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আসলে আমরা তো এই রকম পরিবেশে ঠিক অভ্যস্ত নই, তাই।'

'অভ্যস্ত হয়ে যাব ঠিক। ওয়াংদে কাঠ সেঁকছে এখনও?'

'গোটা রাত পড়ে আছে সামনে। ভেতরে কিরকম ঠাণ্ডা এখন?'

'একই রকম। শুধু হাওয়াটাই নেই।' জয়িতা উত্তর দিয়ে চারপাশে তাকাল। শুধু কাঠ জ্বালানোর ছাড়া কোন শব্দ নেই. এমন নিস্তব্ধ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় করে। জয়িতার মনে হচ্ছিল বড় রকমের কিছু হবে বলেই এখন এই থম্ ধরা ভাব।

ওরা ভেতরে চলে এল। মোমবাতিটা স্থির হয়ে জ্বলছে পাথরের ওপরে। আর তাকে ঘিরে কিলবিল করছে অদ্ভুত সব পোকা। বোধহয় জীবনে প্রথমবার আলো দেখে বেরিয়ে এসেছে ফাটল থেকে। কল্যাণ তার বিছানায় সেঁধিয়ে পড়ে ছিল চুপচাপ। সুদীপ জুতো খুলে ফেলেছে। খুব সন্তর্পণে মোজা খোলার চেষ্টা করছিল, জয়িতা এগিয়ে গেল, 'তুই থাম, আমি খুলছি।'

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল পা এগিয়ে দিয়ে, 'সেবা পেতে আমার কোন আপত্তি নেই। কখনও পাইনি তো. তবে দেখিস খগেনবাবুর ছেলে করে দিস না।'

'খগেনবাবুর ছেলে?' জয়িতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেই কল্যাণ সশব্দে হেসে উঠল। সেটা সংক্রামিত হল আনন্দতেও। জয়িতা খেপে গিয়ে বলল, 'তুই আগে রহস্যটা পরিষ্কার কর, না হলে আমি হাত দেব না।'

কল্যাণ বলল, ওঃ মাঝে মাঝে সুদীপটা—। শোন, লোকে বলে বাপের নাম খগেন করে দিস না। আর ও বলল খগেনবাবুর ছেলে করে দিস না। অর্থাৎ এমন ব্যথা দিস না যা ওকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। কথাটা অন্যভাবে শুনলাম বলে হাসি পেল।'

'বাট হোয়াই খগেনবাবু? তার নামটা কেন ব্যবহার করা হয়?' জয়িতা ঠোঁট কামড়াল।

'তা আমি জানি না ভাই। চিরকাল শুনে এসেছি ওই নাম। হয়তো লোকটা খুব গবেট ছিল।'

সুদীপ বলল, 'কিংবা অত্যন্ত শয়তান।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'এটা কোন জোকই নয় যে অমন হাসতে হবে। আর তুই তো তোর বাবার নাম ভুলতেই চাইছিলি সুদীপ। বেশ ফুলেছে।'

শেষ দুটো শব্দ জয়িতা বলেছিল মোজা সরিয়ে। কিন্তু তার আগের কথাগুলো সুদীপকে মোটেই আহত করল না। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে বসে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দূর! কিছুই হয়নি। আমরা তো ব্যান্ডেজ এনেছি?'

আনন্দ চটপট ওদের ওষুধের বাক্সটা খুলে ওপর থেকে ব্যান্ডেজ তুলে ছুঁড়ে দিল জয়িতাকে। যতটা সম্ভব ভাঙার কাছাকাছি ব্যান্ডেজ বাঁধল জয়িতা। আর তখনই তাঁবুর একটা দিক সন্তর্পণে সরিয়ে আগুন

হাতে ঢুকল ওয়াংদে। এর মধ্যেই সে কাঠে আগুন ধরাতে পেরেছে। আস্তানার মুখের দিকে একটা ধার ঘেঁষে তিনটে ছোট পাথরের খাঁজে সে জ্বলন্ত কাঠ রেখে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর আবার বেরিয়ে গেল বাইরে।

এখন বেশ আলো হয়ে গেছে ভেতরে। জয়িতা কাঠের কাছে এসে উবু হয়ে বসল। আনন্দ চাপা গলায় বলল, 'এই লোকটা এত করছে অথচ ওকে তো কালই কাটাতে হবে। কি বলে কাটাই সেটাই এখন ভাবতে হবে।'

কল্যাণ বলল, 'কেন? কাটাবি কেন? ও না থাকলে এখানে আমরা মরে যাব।'

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলল, 'ও থাকলেই আমাদের মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা আনন্দকে বোঝার চেষ্টা করছিল। আনন্দ হাসল, 'কথাটা বোধহয় খুব উলটো শোনাচ্ছে কিন্তু ভেবে দ্যাখ ওয়াংদেকে না কাটালে আমরা এখান থেকে যেতে পারব না। ও যাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে তারা সবাই বেরিয়ে আবার মানেভঞ্জনে ফিরে যায়। চারজন বাঙালি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থেকে যেতে চাইছে—ব্যাপারটা ওয়াংদের মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। সেটা খুব স্বাভাবিকও। ফলে ও ফিরে গিয়ে গল্পটাকে ছড়িয়ে দেবে দার্জিলিং পর্যন্ত। ব্যস, আর দেখতে হবে না। এখানে আমরা একসঙ্গে প্রকৃতি আর পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না।'

কল্যাণ চুপচাপ শুনছিল, 'তাহলে?'

আনন্দ বলল, 'ওয়াংদেকে ভুল বুঝিয়ে কাটাতে হবে। কিভাবে কাটাব সেটাই—।'

'আগে ভেবে আসা উচিত ছিল। আমরা মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় এসেছি।' কল্যাণ বলল।

'মোটেই নয়। ম্যাপ বলছে আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে গেলেই নেপাল বর্ডার। বর্ডার পার হলেই গ্রাম। সেখানে ভারতীয় পুলিশের কোন এক্তিয়ার নেই। আর পুলিশ বলতে তো ওই ফালুটের ক্যাম্পের কয়েকজন। আমরা যদি আরও ভেতরে ঢুকে যাই তা হলে ভারতীয় পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যাব। অতএব জায়গা নির্বাচনে ভুল করিনি।' আনন্দ প্রতিবাদ করল। ঠিক তখন আবার ওয়াংদে ঢুকল ভেতরে। ওর হাতে চায়ের মগ। প্রত্যেকের হাতে সেগুলোকে ধরিয়ে দিয়ে সে আবার বেরিয়ে গেল।

সুদীপ চুপচাপ শুনছিল পা ছড়িয়ে। চায়ের মগ হাতে নিয়ে বলল, 'আর একেই বলে আরাম!'

জয়িতার মাথায় কিছুক্ষণ থেকেই একটা মতলব ঘুরছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'দুটো ব্যাপার করা যেতে পারে। কাল সকালে উঠে ওয়াংদের সঙ্গে একটা ঝগড়া এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে ও নিজেই রেগেমেগে আমাদের ছেড়ে চলে যায়।'

সুদীপ বলল, 'খুব সহজ হবে না। ও যদি কল্যাণ হত, তাই করতো। কিন্তু যার মুখে হাসি খোদাই হয়ে আছে সে ঝগড়া করলেও হাসবে।'

কল্যাণ এবার আনন্দর দিকে তাকাল, 'শুনলি? এর মধ্যে আমি আসছি কি করে?'

আনন্দ সত্যিই বিরক্ত গলায় বলল, 'আঃ সুদীপ! হ্যাঁ, জয়িতা তোর দ্বিতীয় ব্যাপারটা কি?'

জয়িতা কাঁধ নাচাল, 'সোজা ব্যাপার। আমরা ওয়াংদেকে বলব ফালুটে যাওয়ার আগে একটা নেপালি গ্রাম দেখতে চাই। ওটা যদি ওর রুটের বাইরে হয় তা হলে চাইলে এক্সট্রা টাকা দেব। ও থাকলে সুবিধে এই যে পথ চিনতে সহজ হবে। বর্ডার পার হয়ে আমরা ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব। ও ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। পুলিশ তো ওখানে পৌঁছাতে পারবে না।'

কল্যাণ বলল, 'চমৎকার। এটাই খুব ভাল প্ল্যান।'

আনন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে বলল, 'পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে ওয়াংদে কিভাবে রি-অ্যাক্ট করে তার ওপরে। পুলিশ হয় তো ওখানে যেতে পারবে না আইনত কিন্তু আমরাও তো আর কলকাতায় ফিরতে পারব না। ওরা তো সমসময় লক্ষ্য রাখবে আমরা কখন ফিরি। রাস্তা তো একটাই।'

চা হয়েছিল বাইরে, কিন্তু এবার ওয়াংদে ভেতরে উনুন জ্বালাল। আজকের মেনুও খিচুড়ি। বোধহয় ওয়াংদে খিচুড়ি বানাতে স্পেশালিস্ট। ঠাণ্ডার দাঁত আরও ধারালো হচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠে আসছে রাজ্যের পোকামাকড়। মোমবাতিটা ছোট হয়ে এলেও কাঠের আগুনের আলো আছে পর্যাপ্ত। আনন্দ ঘড়ি দেখল। কলকাতায় এখন সন্ধ্যে হব হব, অথচ এখানে মনে হচ্ছে মধ্যরাত। ওয়াংদে চাপা সুরে গান শুরু করল। নেপালী শব্দ কিন্তু সুরে হিন্দী ফিল্মের অবদান আছে। জয়িতা ওর পাশে বসে বলল, 'তুমি তো

খুব সুন্দর গান করো।' সঙ্গে সঙ্গে ওয়াংদে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল, 'মিঠো মিঠো ইয়াদ কিসকো, ঘড়ি ঘড়ি দিলমে আয়ো, ইন্দ্রানীকো ইয়ো রাত মা—।' গেয়েই আচমকা চুপ করে হাসতে লাগল। আর তখনই দূরে কোথাও সেই জান্তব ডাকটা শুরু হল। গতরাত্রে ওরা এই ডাক শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওয়াংদে। তার মুখ চোখ উত্তেজিত। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে সে পাঁজা করে কাঠ এনে ফেলতে লাগল ভেতরে। জিনিসপত্র যা ছিল সব নিয়ে এল এক এক করে।

আনন্দ ওর উত্তেজনা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

ওয়াংদে বলল, 'ওদের ধমক দিলে ভয় পায় ঠিকই কিন্তু কেউ কেউ তো না-ও পেতে পারে। মুশকিল হল, সারারাত জেগে বসে থাকতে হবে। ওরা দিন না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না। আগুন জ্বেলে রাখতে হবে সারারাত।'

কল্যাণ জানতে চাইল জন্তুগুলো মানুষ খায় কিনা?

ওয়াংদে বলল, 'যে কোন জন্তুর চেয়ে মানুষের মাংসই তো সবচেয়ে খেতে ভাল।'

ডাকগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওয়াংদে তাঁবু দিয়ে তৈরি দরজার দু'পাশে কাঠ জ্বালল। এই আগুন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওদের সাহস হবে না। লোকটা সকালবেলায় খুব তাচ্ছিল্য করেছিল বটে কিন্তু এখন মোটেই তা মনে হচ্ছে না।

খিচুড়ি ফুটছে। তার গন্ধেই আরাম এবং ঘুম আসছিল। আর সেসব ছাপিয়ে আচমকা ভয় ওদের গ্রাস করল। ডাকটা এবার খুব কাছাকাছি। হয়তো মুখ বার করলেই মুখোমুখি হতে হবে।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়াংদে, ওদের সংখ্যা কত?'

ওয়াংদে বলল, 'এক ডজন, দুই ডজনও হতে পারে।'

ওরা ঠিক করল ভয় পাওয়া নয়, ভয় দেখাতে হবে। সুদীপ উঠতে চাইছিল কিন্তু আনন্দ বাধা দিল। রিভলভারটা ঠিক করে ও জয়িতাকে বলল টর্চ নিতে।

তাঁবুর একটা পাশ সরিয়ে আনন্দ মাথা বের করতেই জন্তুগুলোকে দেখতে পেল। বাইরে ওয়াংদে যে আগুন জ্বেলেছিল তা নিবিয়ে আসেনি। যদিও তেজ নেই বললেই চলে তবু তারই আলোয় ওদের দেখা যাচ্ছিল। বেশ কিছুটা তফাতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বসে আছে বেশ কয়েকটা। ওদের দেখতে নেকড়ের মত কিন্তু আরও বীভৎস চেহারা। আনন্দকে দেখে যেটা উঠে দাঁড়াল তার দাঁতগুলো ওই আধা-অন্ধকারেও চকচক করছে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ শুরু হল। যেন সামনেই শিকার দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়েছে ওরা। আনন্দ একেবারে সামনেরটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। টপ করে জন্তুটা পড়ে গেল মাটিতে। আর শব্দটা হাজারগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। চকিতে আর যারা ছিল তারা উধাও হয়ে গেল অন্ধকারে। জয়িতা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আলো জ্বালব?'

আনন্দ বলল, 'না থাক। মনে হচ্ছে ধারে কাছে নেই।'

তাঁবুটাকে আবার ঠিকঠাক করে ওরা ভেতরে আসতেই কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'দেখলি?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে নেকড়ে। বিগ সাইজ। একটা মরেছে। কিছুক্ষণ বিরক্ত করার সাহস পাবে না। আমাদের একসঙ্গে ঘুমালে চলবে না। ঘণ্টাতিনেক সবাইকে পাহারা দিতে হবে। জয়িতা সুদীপ আমি কল্যাণ। ঠিক আছে।'

হঠাৎ প্রত্যেকের নজরে পড়ল ওয়াংদে আতঙ্কিত চোখে আনন্দর রিভলভারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখে হাসি নেই। চোখাচোখি হতে মুখ নামিয়ে নিল ওয়াংদে। ওরাও এ নিয়ে আর কথা বলল না। বোঝাই যাচ্ছিল জন্তুটাকে মারা ওয়াংদে পছন্দ করেনি।

ভোরবেলায় পাহারায় ছিল কল্যাণ। আনন্দ যখন ওকে উঠিয়ে শুতে যায় তখন বাইরে একমাত্র বাতাসের ছাড়া কোন শব্দ নেই। কাঠের আগুন নিবে এসেছিল। কিন্তু কাঠকয়লার দপদপানি উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ঠিক তার পাশেই শুয়েছিল ওয়াংদে। বাঁ হাতে রিভলভার ধরে বসে বসে ঢুলছিল কল্যাণ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল ওয়াংদে নেই। সে চারপাশে চোখ বোলাল। প্রথমে ভাবল ওয়াংদে হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছে। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সে উঠল। ধীরে ধীরে তাঁবুর মুখ সরিয়ে দেখল অন্ধকার পাতলা হয়ে গিয়েছে। ওয়াংদের কোন চিহ্ন নেই। রিভলভার রেখে সে টর্চ জ্বালল। কোন

প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, এমন কি আনন্দ যে জন্তুটাকে মেরেছিল তাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ নার্ভাস হয়ে সে সঙ্গীদের ঘুম ভাঙাল।

জয়িতাই আবিষ্কার করল ওয়াংদে চুপচাপ চলে গিয়েছে। কারণ তার সঙ্গে যে পুঁটলিটা এনেছিল সেটা নেই। ওরা ভেবে পাচ্ছিল না লোকটা কেন না বলে চলে গেল। গতরাত্রে আনন্দ গুলি করার পর থেকে লোকটা একটাও কথা বলেনি। খিচুড়ি রান্না করে সবাইকে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। ওরা অনুমান করেছিল জন্তুটাকে গুলি করার সঙ্গে ওর এই মন খারাপ জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই কারণেই যে না বলে চলে যাবে তা অনুমানে ছিল না।

আলো ফুটলে আনন্দ আর জয়িতা তাঁবু সরিয়ে বেরিয়ে এল। সারারাতের জমা হিম এখন সর্বত্র। যেখানে জন্তুটা পড়েছিল সেখানে এখনও চাপ রক্ত। আর একটু এগোতে খানিকটা রক্তমাখা হাড় দেখতে পেল ওরা, অর্থাৎ মৃত সঙ্গীকে সাবাড় করেছে ওরা। জয়িতা কয়েকবার ওয়াংদের নাম ধরে ডাকল। লোকটা কি মানেভঞ্জনে ফিরে যাবে একা একা শুধু জন্তুটাকে মারা হয়েছে এই অপরাধে? তারপরেই মনে হল ও তো ফালুটেও যেতে পারে। এই রাস্তায় কেউ বন্দুক নিয়ে আসে না। ওদের চালচলন দেখে কি সন্দেহ হয়েছে ওয়াংদের? ও কি ফালুটের পুলিশফাঁড়িতে গিয়েছে খবর দিতে?

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা তৈরি হয়ে নিল। সুদীপের পায়ের ফোলা এখন কম। ভাঙেনি। তাতে সে নিশ্চিত। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় জুতোয় পা ঢোকানো সম্ভব হলে দেখা গেল সে গোড়ালি উঁচু করে চলতে পারছে। ওয়াংদে যে মাল বইছিল তা যতটা পারে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল ওরা। আপাতত যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে তা ফেলে যেতে হল। জয়িতা লক্ষ্য করল কল্যাণ তার ডান হাত কাজে লাগাচ্ছে। এখন যেন প্লাস্টারটাই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর ওরা দূরে কিছু বসতি দেখতে পেল। ওটাই যে ফালুট তাতে সন্দেহ নেই। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। ওরা আর একটু এগোতেই বাঁ দিকে একটা পায়ে চলা পথ পেয়ে গেল। ফালুটকে এড়াতে ওরা সেই পথ ধরল। বোঝা পিঠে নিয়ে ওদের হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। রাস্তাটা সরু এবং পাহাড়ের শরীর ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে। সুদীপ বারে বারে পিছিয়ে পড়ছিল। প্রায় ঘণ্টাতিনেক যাওয়ার পর যখন আবার কুয়াশা নেমে এল হু হু করে তখন ওরা একটা কাতরানি শুনতে পেল। পথের পাশের একটা পাথরের আড়ালে লোকটা শুয়ে আছে। বেশ বয়স্ক। দেহাতি নেপালি কিংবা লেপচা। ওদের দেখে অবাক হয়ে তাকাল।

আনন্দ তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটা উত্তর দিতে পারল না। শুধু ইঙ্গিতে দূরের পাহাড় দেখাল। জয়িতা আবিষ্কার করল লোকটার শরীর বেজায় গরম। অর্থাৎ জ্বর ওকে কাবু করেছে এবং একটি বিশাল গলগণ্ড রয়েছে ওর। ওরা দুজনে কোনমতে লোকটাকে তুলে ধরল। এই সকালে লোকটা এখানে কি করে এল বুঝতে পারছিল না ওরা। লোকটা ওদের কোন কথাই বুঝতে পারছে না মনে হল। কিন্তু আনন্দ আর জয়িতা যখন ওর দুটো হাত কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করল তখন ও যেন কৃতজ্ঞ হল। বারবার সামনের দিকে পথনির্দেশ করতে লাগল উত্তেজিত হয়ে।

সুদীপ যেন নিজের মনে বলল, 'ওর না আমাদের, কপালটা কার ভাল বুঝতে পারছি না।'

॥ ৩১ ॥

মাঝরাতের পর আকাশে যদি কালো মেঘ না জমে, যদি হাওয়ারা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় ভারী কুয়াশাদের তাহলে রাত ফুরোবার আগেই আলোর নাটক শুরু হয়ে যায় সামনে। তাপল্যাঙ যেন প্রসারিত হাতের তালুর মত। মাইলের ব্যবধান আছে কিন্তু সেই আলো বিভ্রান্তি আনে দূরত্ব সম্পর্কে। প্রথমে কালোয় নীলে মিশেল আকাশটার বুকে ফুটে ওঠে একটা আলোর বিন্দু। সেখানে নজর যেতে না যেতে তার রঙ হয় টকটকে লাল। একচোখো ডাইনির মত খানিক স্থির থেকে হঠাৎ সেটা সঙ্গী তৈরি করে নেয় ... কিছুটা দূরে। তারপর দুই থেকে তিন এমনি করে সংখ্যা বাড়ে। আর সেইসঙ্গে রঙের চেহারা বদলে যায়. লাল ক্রমশ হালকা হতে শুরু করে। তখনও অন্ধকারের

পর্দাটা টাঙানো। যা ছিল বিন্দুতে সীমাবদ্ধ তা গড়িয়ে পড়ে তালুতে। লাল, পাতলা নীল একসময় কাঁচা সোনায় পরিণত হয়। সেই মুহূর্তে অন্ধকার উধাও। একশ আশি ডিগ্রিতে সূর্যদেব প্রকাশিত হবার মুহূর্তে বিন্দুগুলো এক একটা চুড়ো হয়ে যায়। মাকালু, এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নেৎসে, নুপটসে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অহংকার প্রায় পাশাপাশি উদ্ধত অথচ সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে তাকালে মায়ালুরা পর্যন্ত পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে যায়। চুড়োর বরফগুলো তাদের চেহারা পালটে ফেলে খুব অল্প সময়ে। যেন এক রঙে বেশিক্ষণ সাজা ওদের ধাতে নেই। বিয়ের কনের সাজ খুলে ফেলে ক্রমশ সাদাটে একটা চাদর ওদের গায়ে জড়িয়ে নেয়। রোদ ওঠে আর তারই সঙ্গে ধেয়ে আসে কুয়াশারা এবং সাদা মেঘ, ওই চুড়োর গায়ে লেগে না থাকলে যারা নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। ক্রমশ এই মেঘেদের আড়ালে আবডালে হঠাৎ উঁকি মারা ছাড়া মাকালু এভারেস্টের আর কিছু করার থাকে না। সঙ্গী হয় অন্য চূড়াগুলোও। পৃথিবীর দৃষ্টিতে কতটা কু আছে তা ঈশ্বর জানেন, মেঘগুলো যেন সবসময় ওদের আড়ালে রাখতে ব্যস্ত থাকে।

ফালুট থেকে চ্যাঙথাপু মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। ভারতবর্ষের সীমা পেরিয়ে এইটেই নেপালের প্রথম গ্রাম। ম্যাপ একথা বলছে বটে কিন্তু দুই সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ সেখানে নেই। যা কিছু ভারতীয় তা যেন ফালুটেই শেষ হয়ে গেছে। আর তিন কিলোমিটার বলতে যে স্বল্প দূরত্ব মনে আসে সেটা অতিক্রম করার সময় শরীরের কষ্টে তিরিশ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যারা অভ্যস্ত তাদের দক্ষতা ধর্তব্যে আনা হচ্ছে না। চ্যাঙথাপু থেকে আরও সাড়ে ছয় কিলোমিটার উত্তরে ওয়ালাং চাঙ। ওয়ালাং চাঙে যাবে বলেই ওরা পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পৌঁছে গেল তাপল্যাঙে। যে গ্রামে বিদেশী এসেছিল কবে কেউ সঠিক মনে করতে পারে না। হিমালয়ের ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর তাপল্যাঙে দাঁড়ানো এক ব্যাপার। সান্দাকফু থেকে যে সূর্যোদয় দেখা তাতে সব আছে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দেখলে যেন হিমালয়ের নিঃশ্বাস ঘাড়ে এসে লাগে। ওরা যখন এখানে পৌঁছেছিল তখন বরফ ছিল না। বছরের তিনমাস এখানকার মাটিতে হাওয়া, কপাল থাকলে রোদ লাগে। সেই তিনমাসে রডোডেনড্রন আর ক্যালেনিয়া নিচ থেকে তেরো হাজার ফুট ওপরে ফুলের উৎসব বসায়। ডুঙডুঙ আর গুন্ড্রুক শাকের চাষ শুরু হয় যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে। গুন্ড্রুক রোদে শুকিয়ে রাখা হয় বাকি নয় মাসের জন্যে। যা কিছু চাষবাস তা তো এই সময়েই সেরে নিতে হবে। তাপল্যাঙ এবং একই চরিত্রের গ্রামগুলোর মানুষ তাই খেটে নেয় এই তিনমাসে। প্রসারিত হাতের তালুর মত এই গ্রামের জমিতে চাষের মাটি বড় কম। অকৃপণ প্রকৃতির শক্ত মুঠো খুলে খুলে পরিবারভিত্তিক যে স্বল্প জমি তাই বারো মাসের খিদে মেটায়। গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে কিছু জঙ্গল। আর তারপরেই তুষারের পাকাপাকি চাতাল যার শেষ কোথায় কেউ জানে না এখানে। তিন মাসের প্রায় শেষপর্বে ওরা এসে হাজির হয়েছিল এখানে।

ওয়ালাং চাঙে আসতে গেলে চ্যাঙথাপু ডিঙোতেই হয়। সেটাই নিয়ম। কিন্তু পাহাড় যেমন পথ দেয়, পথ কেড়েও নেয়। মানুষটির হুঁশ আসছিল আর যাচ্ছিল। খুব দ্রুত এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ আনন্দর মনে ওয়াংদে সম্পর্কে ভীতি ছিল। লোকটা যে বিশ্বস্ত তা না ভাবার কোন কারণ নেই। অথচ চুপচাপ ভোরের অন্ধকারে যেভাবে মিলিয়ে গেল তার সঙ্গে ওর চরিত্র মিলছে না। গতরাত্রে জন্তুগুলোকে গুলি করে মারা ওর কোন কারণে পছন্দ হয়নি। এখানে যারা বেড়াতে আসে তারা সঙ্গে বন্দুক আনেও না। আনন্দর অস্পষ্ট ধারণা এই দুটোই ওকে ভীত করেছে। হয়তো জন্তুটাকে মেরে ওর কোন সংস্কারে আঘাত দেওয়া হয়েছে। আর এর পরিণতিতে ওয়াংদে যদি ফালুটের পুলিস ফাঁড়িতে গিয়ে জানায় বন্দুকধারীরা এই অঞ্চলে এসেছে তাহলে একটা কৌতূহল তৈরি হবেই। অতএব যতটা দ্রুত এই অঞ্চল ছাড়ানো যায় তত মঙ্গল। কিন্তু এই অসুস্থ মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে কত দ্রুত চলা সম্ভব। ওরা চাইছিল যে কোন একটা লোকালয়ে পৌঁছে যেতে। সুদীপের পক্ষে বেশিক্ষণ একনাগাড়ে হাঁটাটাও বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ঠিক তখনই উঠে আসতে লাগল কুয়াশারা সোঁ সোঁ করে। হিমালয়ের খাদগুলোর রহস্য নিয়ে ওরা সমস্ত পৃথিবী আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনহাত দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরমধ্যে জয়িতা একবার হোঁচট খেল। আনন্দর প্রথমে মনে হয়েছিল আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু ওয়াংদের আতঙ্কটা যেহেতু তাড়া করে আসছিল তাই সে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিল। আর এই করতে গিয়েই ওরা পথ ভুল করল। লোকটা হাঁটছে

ঘোরের মধ্যে। আনন্দ তাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিল গ্রামের পথ কোন্ দিকে? সে কথা বুঝে কিংবা না বুঝে ঘাড় নেড়েছিল। বিড়বিড় করে কিছু বলেও ছিল। এবং এই করতে গিয়ে ওরা একসময় চ্যাঙথাপুর পথ ছেড়ে আরও ডান দিকে সরে এসেছিল। পথ বলে এতক্ষণ যেটাকে মনে হচ্ছিল সেটা ইয়াকের যাওয়া আসার পথ তা ওদের বোঝা সম্ভব হয়নি। প্রায় ঘণ্টাতিনেক যাওয়ার পর প্রথম জয়িতা বসে পড়ল। এই সময়ে ওদের অনেকটা উঁচুতে উঠতে হয়েছে। পিঠের বোঝা, হাতে ওজন এবং এই লোকটিকে প্রায় টেনে আনার ধকল ওদের প্রায় ছিবড়ে করে ফেলেছিল। তখনও চোখের সামনে মানুষের বসতির চিহ্ন নেই। খাড়া পাহাড়, পায়ের তলায় স্যাঁতসেঁতে পাথুরে জমি আর লেডি স্লিপার এবং কুইন ভিক্টোরিয়ার সমারোহ যা এখন ঘোলাটে কুয়াশার ওড়না জড়িয়ে রয়েছে—এছাড়া আর কোন কিছু চোখে পড়ছে না।

আনন্দ ততক্ষণে ভুলটা ধরতে পেরেছিল। কিন্তু কিভাবে সেটা সংশোধন করা যায় তা তার জানা ছিল না। চ্যাঙথাপু পৌঁছাতে এত সময় লাগার কথা নয়। তিন কিলোমিটার পথ যত ধীরেই তারা আসুক আসা যাওয়ার পথ যখন একটা রয়েছে তখন মানুষের অস্তিত্বের কিছু নমুনা তো পাওয়া যাবেই। রাস্তা যত খাড়াই হোক সেসব কিছুই নজরে আসছে না। লোকটা এখন উবু হয়ে বসে আছে। কল্যাণ তাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করছে তার গ্রাম কোথায়? লোকটা মাঝে মাঝে চোখ খুলছে আর সেটা বন্ধ করছে। কোন কথা বলার ইচ্ছে বা শক্তি তার নেই। কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। আনন্দর কাছে এগিয়ে বলল, 'এ ব্যাটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। অনেক মানবতা এতক্ষণ দেখিয়েছি, আর নয়। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'চ্যাঙথাপু। তিন কিলোমিটার রাস্তা।' আনন্দ ওর পথ হারাবার আশঙ্কাটা বলতে গিয়েও পারল না। ইচ্ছেশক্তির শেষটুকু নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। খারাপ কথা শোনানোর কোন মানে হয় না। বরং পথ খুঁজতে হবে।

কল্যাণ বলল, 'তিন? মনে হচ্ছে তিনশো কিলোমিটার হেঁটেছি।'

সুদীপ মন্তব্য করল, 'পাহাড়ে শুনেছি এইরকম মনে হয়।'

পড়ে যাওয়ার পর জয়িতা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সে এবার বলল, 'আমার মনে হয় দুজন যদি এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে কাছাকাছি মানুষ আছে কিনা তাহলে ভাল হয়। এই মালপত্র নিয়ে আর হাঁটতে পারছি না। তাছাড়া ওই লোকটাও আর পারবে বলে মনে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ একমত হল, 'জয়িতা ঠিকই বলেছে। এখানে এই পাহাড়ের আড়ালে ওরা তিনজন অপেক্ষা করুক। আনন্দ চল্ আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

আনন্দরও মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা ভাল। কিন্তু কল্যাণ আচমকা এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠল কিভাবে তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ওদের বিশ্রাম করতে দিয়ে সে কল্যাণকে নিয়ে এগোল। খানিকটা হেঁটে কল্যাণ বলল, 'এত ওপরে উঠেছি তবু পায়ের তলায় বরফ দেখছি না কেন বল্ তো? অথচ সান্দাকফুতে কাল সন্ধেবেলায় বরফ পড়েছিল।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ওগুলো বরফ নয়। বৃষ্টির পরে পাতলা তুষার পড়েছিল। এখানে এখন আর বৃষ্টিকে ডাকিস না। তোর ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'না। এই হাতটাতে তো একটুও না। যদি সমস্ত শরীরে প্লাস্টার করে আসতাম—।' হাসল কল্যাণ। হাঁটার সময় কল্যাণ যতটা সম্ভব লক্ষ্য রাখছিল পথের ওপর। এখানকার পাহাড়ের চেহারা সর্বত্র এক। কোন রাস্তার নিশানা নেই। সুদীপের কাছে ফিরে আসাটা গোলমেলে হয়ে যেতে পারে। মিনিট তিরিশেক পাহাড় ভাঙার পর পথ ফুরিয়ে গেল। সামনে খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে। এইটে অতিক্রম করা তাদের সাধ্যে কুলোবে না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চ্যাঙথাপু?'

'বুঝতে পারছি না। পথ নিশ্চয়ই একটা আছে।' আনন্দ অসহায়ের মত চারপাশে তাকাল।

'সত্যি বল্ তো, চ্যাঙথাপু বলে কোন জায়গা আছে কিনা?'

'মিথ্যে কথা বলে আমার কি লাভ। ম্যাপে ওই জায়গাটার নাম আমি পড়েছি।'

ওরা আরও ডানদিক ধরে এগিয়ে গেল। ঘড়িতে সময় চলছে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। অসম্ভব দুর্বল মনে হচ্ছিল নিজেদের। মাথার ওপর সূর্য আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। সামনের পাহাড়ের প্রাচীর

যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তে চলে গিয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টার পর ওরা পাহাড়টাকে দু-টুকরো অবস্থায় দেখল। যেন ইংরেজি ভি অক্ষরের মত কেউ পাহাড়ের অনেকটা তুলে নিয়েছে। কল্যাণ সেদিকে এগোচ্ছিল। পাথরের ওপর পা রাখতে ভরসা হচ্ছিল না। বোঝাই যায় এইখানে অনেককাল মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ফলে স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা পাথরগুলোর ওপর জেঁকে বসে আছে। সে কল্যাণকে নিষেধ করল। যদি চ্যাঙথাপুর লোকজন এই পথে যাওয়া আসা করত তাহলে এমনটা হত না, অর্থাৎ এইটে যাওয়ার পথই নয়।

ঠিক সেই সময় একটা পাথরের শব্দ কানে এল ওদের। যেন পাহাড় থেকে কোথাও পাথরটা গড়িয়ে পড়ল। এখন হাওয়া নেই। সাপের মত কুয়াশারা বুকে হেঁটে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন পাখি ডাকছে না, ভেজা গাছগুলোয় পোকামাকড়ও ডাকছে না। শব্দটা যেটা পাথর গড়ানো বলে মনে হল, সেটা খুব কাছে না হলেও ওদের কানে এল। কিন্তু দুজনেই প্রথমে ওটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি করবি? আমার মনে হয় আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত। চ্যাঙথাপুর রাস্তা এদিকে নয়।'

ফালুটের পুলিশ-ফাঁড়ির কথা মনে থাকা সত্ত্বেও এর বিকল্প প্রস্তাব আনন্দর মাথায় এল না। দেখাই যাচ্ছে এগোনোর পথ বন্ধ। সে বিড়বিড় করে বলল, পথ ভুল করেছি। আর তখনই পায়ের শব্দ কানে এল। খুব দ্রুত যেন দৌড়ে গেল কেউ। সে চট করে ঘুরে দাঁড়াল। কল্যাণ চমকে বলল, 'কোন জন্তু মনে হচ্ছে। আওয়াজটা এদিকেই হল মনে হচ্ছে।'

আনন্দরও তাই ধারণা। হিমালয়ের এই অঞ্চলে ঠিক কি কি জন্তু থাকতে পারে সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে বাঘ যে থাকবে না এটা বোঝা যায়। এত ঠাণ্ডা আর বরফে ওদের থাকতে ভাল লাগবে না। কিন্তু পায়ের শব্দটা স্পষ্ট কানে বাজছে। হঠাৎ কল্যাণ নিচু হয়ে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গাছপালা লক্ষ্য করে। এবং তখনই তিনটে মানুষ বেরিয়ে এল যেন আকাশ ফুঁড়ে। আফ্রিকার অভিযানের ওপর তোলা সিনেমাগুলোতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। এই লোকগুলোও যেন অনেকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল। পাথর ছোঁড়ামাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনজনের শরীরে শক্তি আছে, শীতবস্ত্র যা আছে তাতে বোধ হয় ওদেরই চলে যায় কিন্তু প্রত্যেকের বাঁ হাতে একটি ধারালো এবং বাঁকা ছুরি। তিনজনেই ওদের দিকে দৃষ্টি রেখেছে অনড়ভাবে। আনন্দরাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই তিনটে মানুষ যে নেপালি নয় অথচ হিমালয়ের বাসিন্দা তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এদের চোখ-মুখ বেশ হিংস্র দেখাচ্ছে, ধরে থাকা ছুরির হাতে শিরাগুলো টানটান। কল্যাণ দৃশ্যটা দেখামাত্র অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। সে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল এরকম আরও মানুষ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে কি না। সেই সময় তিনজনের একজন চিৎকার করে উঠল যার একটা শব্দও ওরা বুঝতে পারল না। এদের গলার স্বর বোধ হয় জড়ানো এবং জান্তব ধ্বনি মেশানো। আনন্দ কথা বলল। যতটা সম্ভব সহজ ভঙ্গিতে সে হিন্দীতে বলল, 'তোমরা কারা? এভাবে ছুরি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছ কেন?'

লোক তিনটে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ওদের একজন সেই একই ভাষায় মুখ বিকৃত করে আকাশে ছুরি নাচিয়ে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ বলল হিন্দীতে, 'আমি তোমাদের কোন কথা বুঝতে পারছি না।'

তিনজন আবার নিজেদের মধ্যে কিছু বলল চাপা গলায়। তারপর একজন একটা পাথর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়ার ভঙ্গি করে নেপালিতে বলল, 'তোমরা এটা ছুঁড়েছ। তোমরা আমাদের মারতে চেয়েছ। তোমাদের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য খারাপ।'

আনন্দ শব্দগুলোর অর্ধেক বুঝতে পারল। এরা নেপালি নয়। এবং নেপালি ভাষা ব্যবহার করছে যাতে আনন্দরা বুঝতে পারে। সে মাথা নাড়ল, 'আমরা জানতাম না ওখানে মানুষ আছে। আমরা তোমাদের শত্রু নই যে মারতে চাইব। আমরা ভেবেছিলাম কোন জন্তুজানোয়ার ওখানে আছে।'

সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ধান্দাটা কি? এখানে এসেছ কেন? এদিকে কোন মানুষ আসে না। নিশ্চয়ই তোমরা ভাল মানুষ নও।'

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমরা কি এখানে থাক?'

'আমরা একজনকে খুঁজছি। সেই লোকটা আমাদের গ্রামের সর্বনাশ করে পালিয়েছে। কাল থেকে

সমস্ত গ্রাম তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমরা যে পথে এসেছিলে সেই পথে ফিরে যাবে। নইলে—।'

হুমকিটা গায়ে মাখল না আনন্দ। এদের বোঝানো যায় তিনটে ছুরিকে একমুহূর্তেই স্তব্ধ করার মত ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু বন্দুক দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। লোকগুলো ওদের ফিরে যাওয়ার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'আমরা যে লোকটা বয়ে নিয়ে আসছি এরা তার খোঁজ করছে না তো?'

খটকা লাগল আনন্দর। লোকটা বাইরে থেকে আসছে, না ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। সে হিন্দীতে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের সঙ্গে আসবে?'

'কেন?' লোকটা বোধ হয় এবার নিচু গলায় সঙ্গী দুজনকে প্রস্তাবটা নিজের ভাষায় বোঝাল।

'আমরা একটা লোককে পেয়েছি। সে খুব অসুস্থ। প্রায় ফালুটের কাছাকাছি মাটিতে পড়েছিল লোকটা। আমরা ওকে যত্ন করে নিয়ে এসেছি। তোমরা এসে দেখতে পার ঠিক ওকেই খুঁজছ কিনা।' আনন্দ কথাগুলো বলে কল্যাণকে ইঙ্গিতে হাঁটতে বলল। ওরা যে পেছনে আসবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এগোচ্ছিল আনন্দ। খানিকটা দূর নামার পর কল্যাণ প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা আসছে। পেছন থেকে ছুরি মারবে না তো?'

'ছুরি কেন মারবে?' আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল না।

'কি জানি বাবা! দেখতে যেমন, এখানে ক্যানিবালরা থাকে কিনা ঈশ্বর জানেন!'

কল্যাণের কথা শেষ হওয়ামাত্র অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল আনন্দ। এভাবে সে কোনদিন প্রাণ খুলে হাসেনি। হাসিটা যেন পেটের ভেতর থেকে ছিটকে উঠছিল। কল্যাণ এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারল না। এবং তিনজন অনুসরণকারী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওই শব্দ যেহেতু পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তাই আনন্দ কোনমতে নিজেকে সংবরণ করামাত্র নিচ থেকে সুদীপের চিৎকার ভেসে এল। বোধ হয় সে কারণ জিজ্ঞাসা করছে। আনন্দ বলল, 'তোর মাথায় এটা কি করে ঢুকল?'

'তাই বলে এইরকম হাসার কোন মানে হয় না।' কল্যাণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।

কয়েক পা হাঁটার পর আনন্দর মনে হল পেছনে পদশব্দ নেই। সে মুখ ফিরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কল্যাণও সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'কি ব্যাপার?'

আনন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। লোক তিনটে সুদীপের গলা শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে। ওরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছে প্রকাশ্যে যেতে। সে কল্যাণকে কথা না বলে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। আশেপাশে যে শব্দ হচ্ছে তাতে একথা স্পষ্ট অনুসরণকারীরা ফিরে যায়নি। শুধু তারা বোধ হয় প্রকাশ্যে আসার ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

অনেকটা সময় লাগল ওদের সুদীপের কাছে পৌঁছাতে। সুদীপ দাঁড়িয়েছিল। জয়িতা একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। সেই লোকটা শুয়ে রয়েছে চোখ বন্ধ করে। খুব দ্রুত আনন্দ সুদীপকে ঘটনাটা বলল। ওরা লোকটির চারপাশে চলে আসতেই মাথার ওপরে শব্দ হল। আনন্দ সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'তোমরা কি এই লোকটিকেই খুঁজছ?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর ওপরের পাথরের গায়ে একটা শরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, 'হ্যাঁ। লোকটাকে খুঁজে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তোমরা চলে যাও।'

'কিন্তু আমাদের আপাতত যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা তোমাদের গ্রামে যেতে চাই।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। এই লোকটাকে আমি খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি, এবার তোমরা তোমাদের ধান্দায় যাও, ওকে নিয়ে আমরা গ্রামে ফিরে যাবো।'

'তোমাদের গ্রামের নাম ওয়ালাং চাঙ?'

'না। সেটা আমাদের গ্রাম থেকে চারঘণ্টার পথ। তোমরা এখান থেকে ওয়ালাং চাঙে যেতে পারবে না। যে পথ দিয়ে এসেছিলে সেদিকেই ফিরে যাও। এই লোকটা বেঁচে আছে তো?'

সুদীপ জবাব দিল, 'আছে। আমি ওকে ওষুধ দিয়েছি।'

আনন্দ বলল, 'আমাদের এই সঙ্গীরা হাঁটতে পারছে না। ওর পায়ে লেগেছে। তোমরা আমাদের আজকের রাতটা তোমাদের গ্রামে থাকতে দেবে?'

'তোমরা কারা জানি না। অপরিচিত মানুষকে গ্রামে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই।'

'আমরা খারাপ মানুষ নই। তাহলে এই অসুস্থ মানুষটাকে কষ্ট করে বয়ে আনতাম না। তাছাড়া আমরা চারজনই পুরুষ নই। একজন মহিলাও আমাদের মধ্যে আছে।'

লোকটা যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'মহিলা আছে তো কি হয়েছে। তাজ্জব ব্যপার!'

জয়িতা কথাটা বুঝতে পেরে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, 'সাবাস! তুইও শেষ পর্যন্ত আমাকে ক্যাপিটাল করে সিমপ্যাথি পেতে চাইছিলি। কিন্তু ওদের কাছে ছেলেমেয়েদের কোন প্রভেদ নেই। তাই তো চাই।' কথা শেষ করে সে উঠে এগিয়ে গেল। সেই পড়ে যাওয়ার সময় সম্ভবত চোট পেয়েছিল জয়িতা কারণ হাঁটার সময় বোঝা গেল সে খোঁড়াচ্ছে। একেবারে পাথরটার সামনে পৌঁছে সে লোকটাকে বলল, 'আমরা ফিরে যেতে পারব না। আজকের রাতটা তোমাদের গ্রামে আমরা থাকতে চাই। সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই, তোমরা আমাদের মরে যেতে বল? কি রকম মানুষ তোমরা?'

ওর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে লোকটা চট করে জবাব দিতে পারল না। সে ধীরে ধীরে আড়ালে ফিরে গেল। সুদীপ বলল, 'সমানে হুকুম করে যাচ্ছে লোকটা একটা ছুরি হাতে নিয়ে। এটা সহ্য করা যায় না। দেব নাকি ঠাণ্ডা করে?'

আনন্দ দ্রুত বলে উঠল, 'না। কক্ষনো না। সহ্য কর। মনে হয় আখেরে কাজ দেবে।'

সুদীপ বলল, 'কিন্তু এই অসুস্থ মানুষটাকে বয়ে এনে ধরিয়ে দেব? অন্যায় হবে না?'

আনন্দ জবাব দিল, 'ও যদি সত্যি অপরাধী হয় তাহলে অন্যায় কিসের? নিশ্চয়ই একটা বিচার করবে ওরা। এখানে থাকলে তো রাত নামলেই মরে যাবে। তাতে ওর কি ভাল হবে?'

লোকটা আবার উদয় হল, 'তোমরা ওর কাছ থেকে সরে দাঁড়াও। যে জিনিসটার খোঁজ করছি তা যদি ওর সঙ্গে থাকে তাহলে তোমাদের আমরা গ্রামে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা যদি বেইমানি কর তাহলে কাউকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।'

আনন্দ ইঙ্গিত করতেই সবাই লোকটাকে ছেড়ে সরে এল। এত যে কথাবার্তা চলছে তা লোকটার কানে ঢুকলই না। প্রায় মৃতদেহের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে লোকটা। ওরা বেশ কিছুটা দূরত্বে চলে আসা মাত্র দুটো মানুষ লাফিয়ে নামল ওপাশের পাহাড় থেকে। প্রথম লোকটি তখনও ওপরে দাঁড়িয়ে। দুটো লোক সন্তর্পণে কাছে এসে মানুষটিকে দেখল। তারপরই একজন প্রচণ্ড ঘৃণায় এক দলা থুতু ছড়িয়ে দিল লোকটার মুখে। দ্বিতীয়জন তখন ওর জামাকাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছে। তন্নতন্ন করে খুঁজছে সে। তারপর নিরাশ হয়ে মুখ তুলে পাথরের ওপর দাঁড়ানো লোকটাকে কিছু বলল। লোকটা এবার ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা ওর কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়েছ?'

আনন্দ মাথা নেড়ে না বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জয়িতা তাকে থামিয়ে দিল হাত তুলে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি খুঁজছ ওর কাছে?'

'একটা কালো পাথরের মূর্তি। আমাদের দেবতা। যেদিন থেকে আমাদের গ্রাম জন্মেছিল সেদিন থেকেই ওই দেবতা আমাদের সঙ্গে আছেন। এই লোকটা চ্যাঙথাপুতে যায় প্রায়ই। সেখান থেকে মতলব নিয়ে এসে ওর নোংরা হাত দিয়ে আমাদের দেবতাকে চুরি করে পালিয়েছিল। তবে ও চ্যাঙথাপুতে যায়নি। কিন্তু সেই মূর্তি আমাদের চাই।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'একটু আগে আমি ওর কাছে একটা পুঁটলি পেয়েছি। তাতে মূর্তিটা আছে কি না আমি খুলে দেখিনি।' সে এগিয়ে গেল শায়িত মানুষটির মাথার দিকে। সঙ্গে মানুষটির পাশে দাঁড়ানো লোকদুটো ছুরি দুটো শক্ত করে তুলে ধরল। সেদিকে নজর না দিয়ে জয়িতা পৌঁছে গেল যে পাথরটায় সে বসেছিল একটু আগে তার পাশে। তারপর পাথরের খাঁজ থেকে একটা নোংরা পুঁটলি বের করে চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে সেটা খুলতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল ইঞ্চি-দশেকের একটা পাথরের মূর্তি। তেলচুকচুকে কালো পাথরের মূর্তিটি নিখুঁত শিল্পকর্ম নয় এবং কোন্ দেবতার তা অবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। মূর্তিটিকে দেখামাত্র ওপরে দাঁড়ানো লোকটি দু'হাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ দুটো অনেকটা ঝুঁকে প্রণাম জানিয়ে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল জয়িতা, 'না। এই মূর্তি আমি তোমাদের হাতে দেব না। তোমরা যে সত্যি কথা বলছ তার কোন প্রমাণ নেই। ওই লোকটা দোষী কিনা তাও আমরা জানি না। এটা যখন

দেবমূর্তি তখন নিশ্চয়ই এর পুরোহিত আছে। আমি তোমাদের গ্রামে পৌঁছে সেই পুরোহিতের হাতে একে তুলে দেব।'

ওপরে দাঁড়ানো লোকটা চিৎকার করল, 'আমি মিথ্যে কথা বলছি? দিয়ে দাও মূর্তি নইলে এখনই তোমার শরীর থেকে রক্ত বের হবে।'

ঠিক তখনই সুদীপ রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিল। শব্দটা মেঘগর্জনের চেয়েও জোরালো ঠেকল। ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ভয় পেয়ে বসে পড়ল। এগিয়ে আসা লোকদুটো ভয় পেয়ে পেছনে লাফ দিতেই অসুস্থ মানুষটির ওপর গড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ মানুষটি গোঁ গোঁ করে উঠে বসার চেষ্টা করল। সুদীপ চিৎকার করল, 'তোমরা এতক্ষণ আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে। কিন্তু এরকম অস্ত্র আমাদের অনেক আছে। আমি তোমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়িনি। শোন, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না। ও যা বলছে সেটাই ঠিক। তোমাদের কথা সত্যি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ওই মূর্তি আমরা দেব না।'

ওপরের এবং নিচের লোকগুলো যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বন্দুকের গল্প ওরা শুনেছে কিন্তু আওয়াজ এই প্রথম কানে ঢুকল ওদের। কি করবে ওরা বুঝতে পারছিল না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আনন্দ এগিয়ে গেল, 'শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক চাই। তোমরা আমাদের বন্ধু বলে মনে কর। আমি কথা দিচ্ছি গ্রামে পৌঁছেই মূর্তিটাকে আমরা দিয়ে দেব। আজকের রাতটা কাটিয়ে যদি তোমরা চাও তাহলে কাল সকালে আমরা কোথাও চলে যাব। কোন ক্ষতি তোমাদের করা হবে না। এখন এই লোকটাকে নিয়ে তোমরা গ্রামে ফিরে চল।'

ওপরের লোকটা বোধ হয় পরিস্থিতি বুঝতে পারল। সে নির্দেশ দিতেই একজন ওপাশের জঙ্গলে ঢুকে দ্রুত হাতে একটা শক্ত গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল। তারপর ওই ডালের সঙ্গে অসুস্থ মানুষটাকে বেঁধে নিয়ে দুজনে ডালটাকে কাঁধে তুলে নিল। আনন্দর মনে পড়ল ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামে এভাবে মৃতদেহ ঝুলিয়ে আনতে দেখেছে সে। ওরা নিজেদের জিনিসপত্র আবার তুলে নিচ্ছিল। জয়িতা আবার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে নিজের ব্যাগের দিকে এগোতে ওপরের লোকটা চিৎকার করে নিষেধ করল। খানিকটা ঘুরে নিচে নেমে এসে সে জয়িতার জিনিসপত্র অবলীলায় কাঁধে তুলে নিল। বোঝা গেল দেবমূর্তি জয়িতার সঙ্গে থাকায় এইগুলোর বোঝা সে নিজে নিল। কল্যাণ সেটা লক্ষ্য করে নিজের বোঝার একটা ছোট অংশ লোকটার দিকে এগিয়ে ধরল। একটু রুষ্ট চোখে দেখলেও শেষ পর্যন্ত সে কল্যাণকে হতাশ করল না।

সম্ভবত অসুস্থ মানুষটিকে নিয়ে চলার কারণেই ওরা গতি বাড়াচ্ছিল না। ফলে জয়িতার হাঁটতে সুবিধে হচ্ছিল। প্রথমে যাচ্ছে লোকদুটো, মাঝখানে ওরা, শেষে তৃতীয় লোকটি বোঝা নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে।

আনন্দ লক্ষ্য করল ওরা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে না। যদিও সর্বত্র পাহাড়ের পাঁচিল তবু ওরা আরও ডানদিক ধরে উঠছে। সে খানিকটা পিছিয়ে এসে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বল ভাই তোমার নাম কি?'

'পালদেম।' লোকটা মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল।

'আমরা ওয়ালাং চাঙে যাব ভেবেছিলাম। তোমাদের গ্রামের নাম কি?'

'তাপল্যাঙ।'

'যে দেবতার মূর্তি আমরা দেখলাম সেটা কার? দেবতার নাম কি?'

পালদেম জবাব দিল না। যেন সে কথা বলতে চাইছে না। আনন্দ আর জেদাজেদি করল না। ওরা সামনে উঠে যাচ্ছিল। কোন পথ নেই। অথচ এরা কি অনায়াসে পথ করে নিচ্ছে। সারাদিন অভুক্ত থাকায় শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সুদীপ মোটামুটি তাল রাখছে কিন্তু জয়িতা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। আর তখনই হাওয়া বইতে শুরু করল। সেই হাওয়ার টানে ঝাঁক বেঁধে কুয়াশারা উঠে আসছিল ওপরে। গরম পোশাক থাকা সত্ত্বেও যেন হাড়ে কাঁপুনি লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে এতক্ষণের বেড়ে ওঠা ক্লান্তিটা যেন চাপা পড়ল। কল্যাণ বলল, 'জয়িতা, তুই মাঝখানে থাক। এই কুয়াশার আড়ালে তোর কাছ থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিয়ে ওরা পালাতে পারে।'

কল্যাণের কথার উত্তরে কেউ কথা বলল না। এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও প্রত্যেকের বুক থেকে গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল দ্রুত। আরও মিনিট পনেরো চলার পর ওরা উপত্যকাটা দেখতে পেল। এবং তখনই পালদেমের গলা শুনতে পেল, 'আমরা এসে গেছি। ওই বাঁকটা পার হলেই আমাদের গ্রাম।'

হঠাৎ যেন নতুন রক্ত বইতে শুরু করল শিরায়। উদ্যমটা এসে গেল পদক্ষেপে। মিনিট পাঁচেকের পর ওরা গ্রামটাকে দেখতে পেল। যে পাহাড়টাকে ওপাশে অভেদ্য বলে মনে হয়েছিল তারই খাঁজে ওরা দাঁড়িয়ে দেখল নেহাতই গ্রাম, পাহাড়ি ঘরবাড়ি। পাহাড়ের গায়ে টুকরো জমিতে চাষ হয়েছে। বাড়িঘরগুলোয় স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্নমাত্র নেই। গ্রামের শেষেই বরফের পাহাড়। তার সাদাটে দেওয়াল এখানে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট।

ওরা নিচে নামতে না নামতে কিছু মানুষ বেরিয়ে এল উপত্যকায়। সঙ্গে সঙ্গে পালদেম চিৎকার করে কিছু বলল। সেই চিৎকারটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। যারা ক্ষেতে ফসল কাটছিল, যারা অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, তারা ছুটে আসতে লাগল এদিকে। একটা পাগলামির লক্ষণ ফুটে উঠল জনতার আচরণে। ওরা ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই গ্রামে শ'তিনেকের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আনন্দ পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা ওইভাবে ছুটে আসছে কেন?'

'দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বলে খুশি হয়েছে সবাই।'

'কিন্তু ওই খুশীর চাপে আমরা মরে যাব। তুমি এগিয়ে গিয়ে ওদের থামাও।'

জিনিসপত্র রেখে পালদেম ঢালু পথ বেয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল। প্রায় উন্মত্ত জনতা এবার আচমকা চুপ করে গেল। আনন্দ সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। তারপরে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে পুরোহিত কে আছে?'

কথাটার অর্থ কারও বোধগম্য হল না। অনেক চেষ্টার পর পালদেম মানে ধরতে পেরে চিৎকার করল, 'কাহুন, কাহুন!'

তারপরেই ভিড় ঠেলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। তাঁর পরনে লামাদের পোশাক। আনন্দ ইঙ্গিত করতেই জয়িতা ধীরে ধীরে তাঁর সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে মূর্তিটি বের করে এগিয়ে ধরল। পরিতৃপ্ত মুখে শ্রদ্ধাসহকারে কাহুন সেটিকে গ্রহণ করতেই জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

ওরা সেই দিনের শেষ প্রহরে প্রথম পা দিয়েছিল তাপল্যাঙে।

॥ ৩২ ॥

দেবতার মূর্তি নিয়ে কাহুন গেলেন মন্দিরে। পাহাড়ের গায়ে অনেকটা আধা-গুহার চেহারার মন্দির। এই বিকেলে তার ভেতরে ঘন ছায়া থাকায় সবটাই দৃশ্যমান নয়। তাপল্যাঙের মানুষ এখন খুশীতে ডগমগ। কেউ লাফাচ্ছে কেউ অকারণে চিৎকার করছে। ওরা চারজন দেখল এরই ফাঁকে সেই অসুস্থ লোকটিকে চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। লোকটা ওই মূর্তি চুরি করে যখন পালিয়েছিল তখন বিচারে শাস্তি যা হবে তা কল্পনা করতে অসুবিধে হল না।

এখন চোখের সামনে যে মানুষগুলো হইচই করছে তাদের পিছন থেকে দেখলে নেপালি বলে কিছুতেই মনে হবে না। ওরা বাঙালিদের থেকেও লম্বা। মুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ স্পষ্ট। অনেকটা তিব্বতীদের সঙ্গে সিকিমিজ চেহারা মিশলে এই রকম চেহারা হয়। অথচ ওরা নেপালির কাছাকাছি ভাষায় কথা বলে। মানুষগুলো অবশ্যই দরিদ্র, এদের পোশাকে অবশ্যই সেটা স্পষ্ট। পাহাড়ি মানুষের একটা মজবুত শারীরিক গঠন থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল নিয়মিত আহারের সংস্থান হয় না। অথচ দেবতার মূর্তি পাওয়ার পর থেকেই এদের উচ্ছ্বাস দেখার মত। সেখানে কোন আড়ষ্টতা নেই। এই সময় ওরা লক্ষ্য করল কিছু কিছু মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। বিস্মিত চোখ মেলে তারা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, কাছে আসছে না কেউ। ক্রমশ ভিড়টা এদিকে বাড়তে লাগল। আনন্দরা পা ছড়িয়ে বসেছিল। অত্যন্ত ক্লান্তিতে বোধহয় খিদেও চলে যায়। আনন্দ এবার গ্রামের মোড়লকে আশা

করছিল। সেই লোকটা এসে নিশ্চয়ই খুব জেরা করবে। করুক। কিন্তু এখন তাদের একটা আশ্রয় চাই। চোখের সামনে ছড়ানো পাহাড়ের গায়ে যে কাঠের বাড়িগুলো সেখানে কি খালি ঘর আছে? কারণ মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী যে বাসস্থান আশা করা যায় তা চোখে পড়ছে না। আনন্দ একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখল। কাছাকাছি হতে পালদেমকে চেনা গেল।

পালদেম বলল, 'অন্ধকার নেমে এলে অসুবিধে হবে। তোমরা আজ যেখানে থাকবে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি চল। এখানে অন্ধকার নেমে এলে কেউ ঘরের বাইরে যায় না। তোমরাও নিয়মটা মেনো।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'নিয়মটা হয়েছে কেন? অন্ধকারে বাইরে কি হয়?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'কি হয় আমরা জানি না। তবে আমাদের বাপঠাকুর্দারা যেত না, আমরাও যাই না।'

পালদেম আরও জানাল মালপত্র ওরা এখানেই রেখে যাক, গ্রামের লোক পৌঁছে দেবে। কথাটা ওদের খুশী করলেও আনন্দ বিশেষ ব্যাগটা সঙ্গে নিল। কারণ যারা বহন করবে তারা যদি সচেতন না থাকে তাহলে বিস্ফোরণ অসম্ভব নয়। ওরা পালদেমের পেছনে হাঁটছিল। গ্রামবাসীরা কাছে আসছে না। বেশ দূরত্ব রেখে ওরা অনুসরণ করছিল। হাঁটতে হাঁটতে পালদেম বলল, 'এই গ্রামে কখনও বিদেশীদের রাত কাটাতে দেওয়া হয়নি। যেহেতু তোমরা আমাদের উপকার করেছ নিজেদের অজান্তে হলেও, আর একজন মেয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে তাই তোমাদের থাকতে দিচ্ছি আমরা। কিন্তু কাল সকালেই চলে যাবে তোমরা। ওয়ালাং চাঙে যাওয়ার পথ আমি তোমাদের চিনিয়ে দেব।'

ওরা কিছুটা ঢালুতে নেমে আবার উঠতে লাগল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এই গ্রামের প্রধান কে? তুমি?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'এখানে কোন প্রধান ট্রধান নেই। আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি আছে, আমরা সেইমত চলি। কেউ যদি সেই নিয়ম না মানতে চায় তাহলে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। আসলে আমরা খুব গরীব মানুষ। গরীব মানুষদের আবার প্রধান থাকে নাকি!'

গ্রামের ঠিক শেষ সীমায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ওদের নিয়ে এল পালদেম। পাহাড়ের গায়ে কাঠ গুঁজে এটিকে তৈরি করা হয়েছিল। অবশ্য বাড়ি বলতে যা বোঝায় তার ধারেকাছে নয় আস্তানাটা। কাঠের মেঝে ভেঙে গেছে। দেওয়ালটায় অনেকখানি ফাঁক। তবে ছাদটা সম্ভবত অটুট আছে। কোন আসবাব নেই, কিন্তু একটা বোঁটকা গন্ধ সমস্ত ঘরে চেপে বসে আছে। সুদীপ দেখেশুনে বলল, 'এখানে থাকার চেয়ে তাঁবু টাঙিয়ে থাকা ঢের ভাল। কি গন্ধ, বাপরে বাপ!'

আনন্দ বলল, 'বাইরে তাঁবুতে শুলে ঠাণ্ডা সহ্য হবে না। একবার জোরে বাতাস বইতে শুরু করলেই টের পাবি। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। এখানেই কোনমতে কাজ চালাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল এখানে কোন বাথরুম বা ল্যাট্রিন নেই। স্নান করার প্রশ্নও ওঠে না এই ঠাণ্ডায়। কিন্তু ও দুটোর জন্যে—।'

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছিল তখন ওদের মালপত্র পৌঁছে গেল। দুটো লোক অবলীলায় ওইসব ওজন বয়ে নিয়ে এল অথচ তাদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। কল্যাণ পালদেমকে বলল, 'এখানে জল পাওয়া যাবে কোথায়? আমরা বাঙালিরা খুব জল খাই।'

পালদেম কল্যাণকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। সেখান থেকেই দেখা যায় একটা ছোট জলের ধারা নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের শরীর বেয়ে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘরে কে থাকত?'

'কেউ না। গ্রামের কারও অসুখ হলে এই ঘরে এসে থাকে। আবার বিয়ের পর যতদিন নতুন ঘর তৈরি না করতে পারে ততদিন এই ঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়। তোমরা অতিথি বলে এই ঘরে থাকতে দেওয়া হল। ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমার বাড়ি থেকে তোমাদের খাবার দিয়ে যাবে। আমরা খুব গরীব। ভাল খাবার দিতে পারব না। সত্যি বলতে কি, তোমাদের এক বেলা খাওয়াচ্ছি বলে আমাদের একজনের চার বেলার খাওয়া কমে যাবে।' পালদেম যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। তখনও অন্তত জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে বসে এই বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। পালদেম তাদের চিৎকার করে কিছু বললেও কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

কল্যাণ পালদেমকে ডাকল, 'শোন, তোমাদের খাবার কমে যাবে না। আমরা তোমাকে টাকা দিচ্ছি।'

'টাকা? এখানে টাকা দিয়ে কি হবে? টাকা দিয়ে জিনিস পাওয়া যায় চ্যাঙথাপুতে। সেখানে যেতে

গেলে অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া অতিথিদের কাছ থেকে টাকা নিলে লোকে আমায় বলবেটা কি। ও হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে কি তোম্বা কিংবা ছাং আছে? যদি দরকার হয় তাহলে সেটা পাঠিয়ে দিতে পারি।'

পালদেম প্রস্তাবটা জানাতে সুদীপ বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ, ওগুলো দিলে তো খুব ভালই হয়।'

পালদেম চলে গেলেও দর্শকরা নড়ল না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'জিনিস দুটো কি রে?'

'মদ। একদম দিশি মতে তৈরি।' সুদীপ নিচে নামল। ওপাশে খুব দ্রুত কুয়াশা আসছে। হিমালয়ের কোন চূড়ো দেখা যাচ্ছে না। যেন ভালুকের মত সন্ধ্যা নেমে আসছে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ চিৎকার করল, 'এই মদ খাবি? হাই অলটিচুডে ড্রিঙ্ক করলে হার্ট অ্যাটাকড্ হয়, জানিস না?'

'তাহলে এরা কেউ বেঁচে থাকত না।' কথাটা বলে কাছে যেতে বাচ্চাগুলো উঠে দাঁড়াল। ওদের সঙ্গে যে দুজন বয়স্ক রয়েছে তাদের দিকে তাকাতে গলগণ্ড দেখতে পেল সুদীপ। বেশি বয়স্কজনের গলায় ফুটবলের মত ঝুলে আছে। দ্বিতীয়জনের বোধ হয় সবে শুরু হয়েছে। বাচ্চাগুলোর প্রত্যেকের পা খালি। এবং সেগুলো ফেটে এমনভাবে শক্ত হয়ে গেছে যে দেখলে শিউরে উঠতে হয়। তারপরেই সুদীপের চোখ পড়ল মেয়েটার ওপরে। মুখের একপাশ থেকে বিশ্রী ঘা প্রায় গলা পর্যন্ত নেমেছে। মাঝে মাঝে রস গড়াচ্ছে তা থেকে। অথচ মেয়েটির মুখের গড়ন খুব মিষ্টি। অন্য পাশটায় তাকালে মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু মুখ ফেরালেই বীভৎস ক্ষত মেয়েটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। অথচ মেয়েটি এমন সরল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে ওই ক্ষতের কষ্ট ওকে পীড়া দিচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে আঙুল তুলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মুখে ওটা কি হয়েছে?'

ব্যবধান বড় জোর বারো ফুটের, প্রশ্নটা শোনামাত্র মেয়েটির চোখের কৌতূহল উড়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে অন্য বাচ্চাদের হাসির শব্দ কানে এল। সুদীপ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন হয়েছে ওটা?' এবার মেয়েটি এমনভাবে মুখ ফেরাল যাতে ক্ষত না দেখা যায়। একটি বাচ্চা নেপালিতে বলে উঠল তড়বড় করে। সুদীপ কথাগুলোর পুরোটা বুঝতে না পারলেও অনুমান করল বাচ্চাটা ক্ষত সম্পর্কেই বলছে এবং সেই বলার মধ্যে বেশ ঠাট্টা মেশানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাচ্চারাও হেসে উঠল শব্দ করে। মেয়েটি কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর চিৎকার করে বাচ্চাগুলোকে ধমক দেবার চেষ্টা করল। বাচ্চারা হঠাৎ তাকে ঘিরে নাচতে লাগল ছড়া কাটতে কাটতে। মেয়েটি যখন কেঁদে ফেলেছে তখন সুদীপ মর্মোদ্ধার করল। বাচ্চারা বলছে, পাহাড় থেকে ভালুক এসে ওর মুখে চুমু খেয়েছে।'

সুদীপ এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেয়েটার হাত ধরে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এস।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বেঁকেচুরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। সেটায় সক্ষম হতে না পেরে সে মাটিতে বসে পড়ে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করল। দৃশ্যটা দেখে অন্য বাচ্চারা ঠাট্টা বন্ধ রেখে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুদীপের জেদ চেপে গিয়েছিল। নিজের পায়ের ব্যথা সামলে সে মেয়েটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু মেয়েটা প্রায় শুয়ে পড়ার ভঙ্গি করতে তা সম্ভব হচ্ছিল না। এই চিৎকার চেঁচামেচিতে আনন্দরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। জয়িতা নেমে এল কাছে, 'ওকে ধরেছিস কেন? কি করেছে ও? ছেড়ে দে সুদীপ ওকে। ইস, ওর মুখে কি হয়েছে?'

পুরুষের পোশাকে মেয়েলি গলা শুনে মেয়েটি এক মুহূর্ত স্থির হল। তখনও তার হাত সুদীপের মুঠোয় ধরা। সুদীপ বলল, 'এরকম বীভৎস ঘা কোথাও দেখেছিস? এখনই ওষুধ না পড়লে মেয়েটা মরে যাবে।'

'তা ঠিক, কিন্তু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুই ওষুধ দিবি ধরে বেঁধে!' জয়িতা খেপে গেল, 'আমরা এখানে একটা রাত কাটাতে এসেছি, ওদের জন্যে আমাদের না ভাবলেও চলবে।'

ঠিক তখনই একটি মহিলার পিছু পিছু আরও কয়েকজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সবাই চিৎকার করছে। ওদের ভঙ্গি দেখে সুদীপ হাত ছেড়ে দেওয়ামাত্র মেয়েটি ছিটকে সরে গিয়ে দৌড়তে লাগল। মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে মহিলা তার দলবল নিয়ে ছুটে এল। ওরা চিৎকার করে যে দ্রুত কথা বলছে তা যে গালাগালি এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। পারলে মহিলা যেন সুদীপকে মেরেই ফেলে। জয়িতা ওকে আটকাবার চেষ্টা করছিল। আনন্দ সুদীপকে বলল, 'চটপট ঘরে চলে যা। ব্যাপারটার অন্যরকম মানে হয়েছে ওদের কাছে।'

আরও লোক ছুটে আসছে দেখে কল্যাণ বারান্দায় ডেকে আনল সুদীপকে। নবাগতদের মধ্যে পালদেমকেও দেখা গেল। সে উত্তেজিত মহিলার কাছে অভিযোগ শুনে আনন্দর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই লোকটা এতটুকু বাচ্চার হাত ধরে টানছিল কেন? ও তো এখনও বাচ্চা, মেয়েও হয়নি। তোমাদের সঙ্গেই তো একজন মেয়ে আছে তাহলে এই মতলব হল কেন?'

আনন্দ পালদেমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করল। এখন সব চিৎকার থেমে গেছে। জমে ওঠা জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে একটা বিহিতের জন্যে। আনন্দ লক্ষ্য করল পালদেমের মুখের চেহারা পালটে গেছে। অপমানিত এবং নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে তাকে এখন। উত্তেজিত পালদেম বলল, 'তোমাদের কাছে বন্দুক আছে বলে ভেবেছ যা ইচ্ছে করবে? ওই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাওনি? ঘা-টা গলা ছাড়িয়ে গেলেই ও মারা যাবে। এর আগে ওই অসুখে তিনজন মরে গেছে। এসব দেখেও তোমাদের ইচ্ছে হল?'

জয়িতা এগিয়ে এল পালদেমের সামনে, 'তোমরা ওকে ভুল বুঝেছ! মেয়েটা ওরকম বীভৎস ঘা-এ কষ্ট পাচ্ছে দেখেই আমাদের বন্ধু ওকে ডেকেছিল ওষুধ দেওয়ার জন্যে। ওইটুকুনি বাচ্চার অন্য কোন ক্ষতি করার মত মতলব ওর নেই। ওষুধ দিলে যদি মেয়েটার উপকার হয় তাহলে ও মারা যাবে না। এখানে আমাদের কথা আর কে বুঝতে পারে জানি না, কিন্তু ওই বাচ্চাটা ভয় পেয়ে না বুঝে চিৎকার করেছে। আমি তো একটা মেয়ে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো।'

'ওষুধ? বাজে কথা! যারা প্রাণ-হত্যা করার জন্যে বন্দুক রাখে তাদের কাছে ওষুধ থাকবে কেন? এসব এখন তোমরা বানিয়ে বলছ। তোমরা, শহরের লোকরা অত্যন্ত ধান্দাবাজ।'

এবার আনন্দ কথা বলল, 'তুমি আমাদের যা ইচ্ছে ভাবতে পার। কিন্তু আমাদের কাছে যে ওষুধ আছে তা দিলে ওই মেয়েটি ভাল হয়ে উঠতে পারে। আজেবাজে কথা না বলে তুমি ওর মাকে জিজ্ঞাসা কর যে আমাদের ওষুধ দিতে দেবে কিনা !'

আনন্দর গলার স্বরে এমন একটা কর্তৃত্ব ছিল যে পালদেম কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর সে মহিলার কাছে এগিয়ে গেল। মহিলা তখন মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। পালদেম তাকে সব কথা বলে চুপ করে দাঁড়াল। মহিলা প্রথমে দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। আনন্দ সুদীপকে বলল ওষুধের বাক্সটা বারান্দায় নিয়ে আসতে। পালদেম এবার আনন্দর কাছে এসে বলল, 'ওর মা রাজী হচ্ছে না। বলছে ওষুধ লাগালে ওর মেয়ে আজ রাত্রেই মরে যাবে।'

আনন্দ বলল, 'কি অদ্ভুত কথাটা! তুমি তো বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। ওকে বল, ওষুধ না লাগালে তো মেয়েটা আর বেশিদিন বাঁচবে না। আমরা ওর শত্রু নই ও কথা বল। প্রথমে যে ধারণা তৈরি হয়েছে সেটাই মনে থেকে যাবে।'

পালদেম বলল, 'তাও আমি বলেছি। ও বলল আজ রাত্রে মরার চেয়ে যে কদিন বেঁচে থাকে সে কদিনই তো লাভ। তোমরা ওর হাত ধরে টেনে ভাল করোনি। এখন কেউ বিশ্বাস করছে না তোমাদের অন্য কোন মতলব ছিল না। মেয়েটিকে ওর বাবার মত ছাড়া ওষুধ দিতে মা পাঠাবে না।'

'ওর বাবা কোথায়? তাকে ডাকো।' আনন্দর মনে হল এ ব্যাপারে একটি পুরুষকে বোঝানো ঢের সহজ। মেয়েটির ঘা-এ ওষুধ না দিতে পারলে ওদের ধারণা পালটাবে না। তার ফলে আর কোন সাহায্য এই গ্রামে পাওয়া অসম্ভব হবে।

পালদেম বলল, 'আপনাদের কি দরকার গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করার! এখানে যাতে রাত কাটিয়ে চলে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

এই সময় মহিলা চিৎকার করে কিছু বলতে আরম্ভ করল। আনন্দ দেখল একটি কিশোর গম্ভীর মুখে এগিয়ে আসছে এবং মহিলা তার উদ্দেশ্যেই কথা বলছে। কিশোর কোমরে হাত দিয়ে ওদের কথা শুনল। তারপর চট করে ঘুরে আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর তার গলায় আওয়াজ উঠল। বোঝা যাচ্ছিল সে পালদেমকে গালাগালি করছে। বোধহয় আক্রান্ত হতেই পালদেম আত্মরক্ষার জন্যে পালটা গলা তুলল। কিছুক্ষণ এইরকম চলার পর পালদেম বলল, 'ওরা কেউ তোমাদের কথা বিশ্বাস করছে না। কিভাবে ওই মেয়েটির মুখের ঘা সারাতে চাইছ তোমরা? ওর শরীরে হাত না দিয়ে যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে—।'

'আমরা ওর শরীরে হাত দেব না।' আনন্দ চটপট ওকে থামিয়ে বলল, 'ওর ভাইকে বল কাছে নিয়ে আসতে।'

পালদেম বলল, 'কাকে ভাই বলছ? ছেলেটি মেয়েটার বাবা। না জেনে কোন কথা বলতে যেও না।' তারপর সে চিৎকার করে কিশোরের উদ্দেশ্যে কিছু বলল। আনন্দ এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

জয়িতা এগিয়ে এল পালদেমের কাছে, 'কি যা-তা বলছ! ওইটুকু ছেলে ওই মেয়ের বাবা? ওরা তো নির্ঘাৎ ভাইবোন!'

পালদেম এবার হাসল, 'দেখাচ্ছে বটে তাই কিন্তু এটাই সত্যি। ওরা মা মেয়ে আর এই ছেলেটা হল মেয়েটির মায়ের স্বামী। আমাদের কাছে বাপ্যারটা অবাক হওয়ার নয়। যে দেশের যা নিয়ম।'

জয়িতার মুখে কথা নেই। সে কোন বিশ্বাসেই কাছাকাছি আসতে পারছে না। মহিলার বয়স যদি পঁয়ত্রিশও হয় ছেলেটা যে ষোল পার হয়নি তাতে সে নিঃসন্দেহ। অবশ্য পাহাড়ি ছেলেদের বয়স চট করে ধরা মুশকিল কিন্তু এক্ষেত্রে ওকে যুবক ভাবাই যাচ্ছে না।

দেখা গেল পালদেমের কথা শুনে মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খানিক এগিয়ে এসে বসেছে। আনন্দ জয়িতাকে নির্দেশ দিতে সে এগিয়ে গেল। জয়িতা কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পেও না। আমরা তোমার উপকার করতে চাই।' কিন্তু খুব একটা প্রতিক্রিয়া হল না। শুধু মহিলার মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। জয়িতা দেখল ক্ষত বেশ পুরোনো এবং তা চামড়ার নিচেও বিস্তৃত হয়েছে বলে তার বোধ হল। আনন্দর কথায় সুদীপ স্টোভ জ্বেলেছে। এই গ্রামে আসামাত্র যে কাণ্ডটা ঘটল তার আতঙ্ক এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। মনে হচ্ছিল লোকগুলো তাকে মেরেও ফেলতে পারে। অথচ সে মেয়েটার অবস্থা দেখে—। পাশের ঘরটা থেকে আনা জল গরম করতে গিয়ে তার এবার আরাম লাগছিল। এই ঠাণ্ডায় স্টোভের আগুন খুব আরামদায়ক।

গরম জল হয়ে গেলে জয়িতা খানিকটা তুলো তাতে ভিজিয়ে মেয়েটির মাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে। এখন সমস্ত গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে দেখছে কাণ্ডটা। পালদেম আরও বিশদ করে বলার পর মহিলা গরম জলে ভেজানো তুলোটা নিয়ে মেয়েটার ক্ষতের ওপর চেপে ধরতে সে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল মহিলা। দেখা গেল মেয়েটির তুলোয় চাপা জায়গাটা সাদা হয়ে গেছে। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। মেয়েটি আর কিছুতেই রাজী হচ্ছে না তার মাকে কাজ করতে দিতে। জয়িতা গ্লাভস খুলল। তারপর মেয়েটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'আমাকে হাত দিতে দাও। যদি একটুও ব্যথা লাগে তাহলে তুমি চলে যেও।' মেয়েটি তীব্র দৃষ্টিতে জয়িতাকে দেখছিল। জয়িতা ওর মাথার প্রায় জট পাকানো চুলে হাত বুলিয়ে দিল। পালদেম জয়িতার কথাটা অনুবাদ করে দিলে মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হল। এবার জয়িতা আবার গরম তুলো তুলে খুব আলতো করে ক্ষতের ওপর বোলাতে লাগল। মেয়েটি কাঠ হয়ে বসেছিল যন্ত্রণার আশঙ্কায়, কিন্তু গরম জলের সংস্পর্শে এবং জয়িতার সতর্ক আঙুল তাকে একটু একটু করে আরাম দিচ্ছিল। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কিন্তু বারংবার তুলো সেখানে ডোবাতে তার রঙ পালটে গেছে। অন্তত সোয়া ইঞ্চি ময়লা পুরু হয়ে আটকে ছিল বিরাট ক্ষতের ওপর। গরম জলে ধোওয়া হয়ে গেলে ক্ষতের চেহারা পালটে গেল। কালো হলদেতে মেশা ক্ষতের বদলে এখন পুরোটা লাল দগদগে হয়ে গেল। জয়িতা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাধারণ ঘা, না রে? পাস বেশি নেই। কি ওষুধ দেব?'

আনন্দ একটা টিউব এগিয়ে দিল বাক্স থেকে। এই মলম ঘা শুকিয়ে দেওয়ার কাজ খুব দ্রুত করে। কিন্তু আনন্দ অবাক হচ্ছিল জয়িতাকে দেখে। ওরকম ক্ষতে কি অবলীলায় হাত দিচ্ছে জয়িতা! মেয়েটা যেন ঘেন্না শব্দটার সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়। একটু একটু করে মলমটা মেয়েটার ক্ষতের সর্বাঙ্গে ভাল করে লাগিয়ে দিল জয়িতা। মেয়েটি এখনও চুপ করে বসে আছে চোখ বন্ধ করে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ব্যান্ডেজ করতে তো অসুবিধে হবে। অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে।'

সুদীপ জয়িতার কাজ দেখছিল, 'ব্যান্ডেজের দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে দে যেন ধুলো না লাগায়।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, খোলা রাখবি না। আলতো করে ব্যান্ডেজ কর। ব্যাপারটা ওদের চোখের আড়ালে রাখা দরকার। ওর চিকিৎসা হচ্ছে এমন মানসিক স্বস্তি দেওয়া দরকার।'

জয়িতা জমাট তুলো ক্ষতের ওপর বিছিয়ে তার ওপরে ব্যান্ডেজ করতে লাগল। গলায় অসুবিধে হল না কিন্তু বিপাক হল মুখের কাছে এসে। শেষ পর্যন্ত মুখের অনেকটাই ঢাকা পড়ল। এবার দর্শকদের মধ্যে হাসি শুরু হল। মেয়েটিকে এখন চেনা যাচ্ছে না এইটেই আলোচ্য বিষয়। রমণী মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে সে মাথা নেড়ে না বলল। আনন্দ এবার দুটো ক্যাপসুল দিল পালদেমের হাতে।

মেয়েটিকে অনেক জোরজবরদস্তি করে একটা তখনই খাইয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয়টি আগামী ভোরে ঘুম থেকে উঠে খাওয়াতে বলল কিছু খাবার খাওয়ার পর। তার ভয় হচ্ছিল যার পেটে কোনদিন ওষুধ পড়েনি তার কি প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে। তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও ডোজ কমিয়ে দিল সে। পালদেম মারফৎ মেয়েটিকে বারংবার সতর্ক করে দেওয়া হল কোন অবস্থাতেই ব্যান্ডেজে হাত না দেয়। যেন ওটা খুলে ফেললেই মেয়েটি মরে যাবে। ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পর মহিলাকে খুব অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। মা হিসেবে বোধহয় সে বুঝতে পারছিল যা করা হল তাতে তার মেয়ের উপকারই হবে। ভিড় এখন মেয়েটিকে ঘিরে। সবাই ওর ব্যান্ডেজে আঙুল ছোঁয়াতে চাইছে আর সে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল কয়েকজন বৃদ্ধ এবং মাতব্বর ব্যক্তিকে নিয়ে কাহুন এগিয়ে আসছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাহুন মেয়েটির মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাতে সে গড়গড় করে বলতে লাগল। কাহুনের মুখে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অনেকগুলো ভাঁজ ফুটে উঠল। তিনি ঝুঁকে মেয়েটির সঙ্গে কথা বললেন। মেয়েটি বারংবার মাথা নাড়তে আরম্ভ করল। তারপর কাহুন পালদেমকে প্রশ্ন করল জড়ানো গলায়। পালদেম সেটা আনন্দকে শোনাল, 'কাহুন জিজ্ঞাসা করছেন, কেন মেয়েটির মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে? এটা কি কোন মন্ত্রের কারণে?'

জয়িতা হেসে ফেলতে আনন্দ তাকে হাত তুলে থামাল। তারপর বলল, 'ওতে তাড়াতাড়ি অসুখ সারে।'

পালদেম সেটা জানিয়ে দিতে কাহুন আবার প্রশ্ন করলেন। সেটা পালদেম জানাল, 'কাহুন জিজ্ঞাসা করছেন তোমাদের সঙ্গে আসা এই লোকটির হাতেও কি এইরকম ঘা হয়েছে?'

কল্যাণ চুপচাপ শুনছিল। প্রশ্নটা শোনামাত্র তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'যাঃ শালা!'

আনন্দ কল্যাণের ব্যাপারটা বলল। কাহুন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর কিছু একটা ঘোষণা করে সদলে ফিরে গেলেন। পালদেম বলল, 'কাহুন হুকুম দিয়েছেন যতক্ষণ না মেয়েটির মুখ থেকে ওটা না খোলা হচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের এই গ্রামে থাকতে হবে। মেয়েটার কিছু হলে তোমরা দায়ী হবে। তখন তোমাদের নিয়ে কি করা হবে তা পরে চিন্তা করবে গ্রামের মানুষ।'

আনন্দর মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, 'কাহুনের আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু তুমি বলেছিলে এই গ্রামে কোন মোড়ল নেই। মোড়লকে তোমরা কি বল?'

'পালা। না নেই। কাহুন পালা নয়। কিন্তু কাহুন আমাদের ধর্ম বাঁচিয়ে রাখেন। তাই আমাদের জীবন সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা আমরা শুনি। তোমরা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করো না। সেরকম হলে তোমাদের বিপদ হবে আর আমিও ছাড়া পাব না। তোমাদের সঙ্গে যে বন্দুক আছে তা আমি গ্রামের লোকদের বলে দিয়েছি।' পালদেম চলে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কোন মানুষ আর এখানে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এইসময় হাওয়া শুরু হল। সান্দাকফুতে যে বাতাস ওরা পেয়েছিল তার থেকে অনেক ধারালো, এত গরমজামা প্রায় ভেদ করে ফেলছে। ওরা চটপট ঘরে ফিরে এল। মোমবাতি জ্বেলে আনন্দ আর সুদীপ প্রথমে হাত লাগাল ফাঁকগুলো ঢাকতে। মোটামুটি ভদ্রস্থ করার পরও ঘর থেকে গন্ধটা দূর হল না। সুদীপ আবার স্টোভ জ্বেলেছে। চায়ের জল গরম করার সময় ওরা স্টোভটাকে ঘিরে বসল। কল্যাণ বলল, 'অতিরিক্ত স্মার্ট হলে কি হয় তার প্রমাণ আজ সুদীপ দিল। আর একটু হলে গণধোলাই-এ প্রাণ বেরিয়ে যেত।'

সুদীপ কিছু বলতে গিয়েও বলল না। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেরোসিন তেল কতটা আছে?'

সুদীপ বলল, 'আর একবার ভরা যাবে।' ওকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

আনন্দ বলল, 'সুদীপ কাজটা না করলে কাল সকালে ওরা আমাদের চলে যেতে বাধ্য করতো। এখন ভাগ্যগুণে ক'দিন সময় পাওয়া গেল। মেয়েটার ব্যান্ডেজ তাড়াতাড়ি খোলা যাবে না।'

কল্যাণ আঁতকে উঠল, 'তুই এখানেই থেকে যাবি নাকি? আমাদের তো ওয়ালাং চাঙে যাওয়ার কথা।'

আনন্দ উত্তর দিল, 'ওয়ালাং চাও যে ফুল ছড়ানো হবে তা তোকে কে বলল? যে কোন নতুন গ্রামে গেলে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয় থাকতে গেলে। এটা এখানে শুরু হয়েছে।'

কল্যাণ বলল, 'শুরু হয়েছে? ওরা প্রথমে আমাদের মারতে এল, তারপর শাসিয়ে গেল। আর তুই বলছিস—?'

'ঠিকই বলছি। এই গ্রামটার নাম আমি ম্যাপে দেখিনি। আমাদের পক্ষে এখানে থাকাটাই সুবিধেজনক। এর আগে কোন বিদেশী এখানে রাত কাটায়নি। খুব কম মানুষের চ্যাঙথাপু পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত আছে। আমাদের খবর ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগবে, আর পৌঁছালেও তারা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে আসবে বলে মনে হয় না। আমরা বিদেশী রাষ্ট্রে রয়েছি এখন।' সুদীপের বাড়ানো চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে চুমুক দিল আনন্দ। দিয়ে বলল, 'আঃ, অমৃত।'

কল্যাণ চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল, 'চিনি লাগবে।'

ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটাল। চা বিস্কুট খাওয়ার পর খিদেটা যেন আরও চাগিয়ে উঠেছে। স্টোভ নিবিয়ে ফেলার পর ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে গেল। কাঠের দেওয়ালে বাতাসের শব্দ হচ্ছে। কান পাতলে মনে হয় যেন বুনো মোষ তেড়ে আসছে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল আচমকা, 'আমরা কবে ফিরে যাচ্ছি?'

আনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়!'

কল্যাণ বলল, 'কলকাতায়। আমরা চিরকাল এখানে থাকতে আসিনি।'

আনন্দ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'যাব, তবে এখনই নয়।'

কল্যাণ বলল, 'এখানে থাকলে আমাদের পুলিশের ভয় থাকবে না, জেলে যেতে হবে না। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় থাকলে তো মরেই যেতে হবে। পুলিশ যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা চুপচাপ কলকাতায় ওসব না করে থেকে যেতে পারতাম।'

আনন্দ বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ কল্যাণ। তুই জয়িতার কাছে আফসোস করেছিলি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিস বলে। আমরা সবাই জানতাম যা করেছি তা করে দেশের অবস্থা পালটানো যায় না। কিন্তু আমরা নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ যদি আমাদের কাজকর্মে থ্রিলারের আনন্দ পায় সেটা আমাদেরই অক্ষমতা। কিন্তু এসব আমরা জেনেশুনেই করেছিলাম। তোকে কেউ জোর করেনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে না। কলকাতাকে একটু শান্ত হতে দে। ধরা পড়লে আমাদের তো কিছুই করার থাকবে না। ধর যদি কলকাতায় ধরা পড়তাম তাহলে আজ বিকেলে এই মেয়েটির চিকিৎসা হত না। এভাবে সমস্যা বাড়িয়ে দিস না।'

কল্যাণ এসব কথা শোনার পরও খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল না। সে ঠাট্টার গলায় বলল, 'অসুখে সেবা করাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে ওসব করার কি দরকার ছিল, মাদার টেরেসার সঙ্গে কাজ করলেই তো হত।'

হঠাৎ জয়িতা প্রশ্ন করল, 'তুই তো খুব বড় বড় কথা বলছিস। আজই যদি আমরা কলকাতায় ফিরে গিয়ে কোন অ্যাকশান করি এবং সেটা করতে গিয়ে আমাদের একজন মারা যায় এবং সেই সম্মানে তোকে সম্মানিত করি তাহলে তুই রাজী আছিস?'

কল্যাণ বলল, 'আমাকে কেন?'

জয়িতা বলল, 'দেন্ স্টপ ইট। খামোকা মেজাজ নষ্ট করে দিচ্ছিস। সুদীপ ভাত রাঁধবি? হেভি খিদে পেয়ে গেছে।'

বিকেলের ঘটনাটার পর সুদীপ খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। এখন বলল, 'নো প্রব্লেম।'

আনন্দ মনে করিয়ে দিল, 'পালদেম খাবার দিয়ে যাবে বলেছে।'

জয়িতা বলল, 'তাহলে ওয়েট কর। আচ্ছা, এরা কি খায়? সোর্স অফ ইনকাম কি?'

আনন্দ বলল, 'চাষ হয় দেখলাম। পাহাড়ে আর কত ফসলই বা হবে? গ্রামের বাইরে যায় না। বোঝাই যাচ্ছে অবস্থা খুব খারাপ। এখানকার জঙ্গলে ফলটলও হয় বলে মনে হয় না। মুরগী আর ছাগল দেখেছি। আমি জানি না এরা কিভাবে বেঁচে আছে!'

ওই সময় পালদেম এল। একটা পাত্রেই খাবার এনেছে সে। বোঝা যাচ্ছে ঠাণ্ডায় তারও কাঁপুনি আসছিল। জয়িতা খাবার নিয়ে তাকাল। মারাত্মক দেখতে কয়েকটা রুটি আর তরকারি। তরকারিটা কিসের তা বুঝতে পারল না সে। কোন কথা না বলে পালদেম চলে গেলে ওরা খাবার নিয়ে বসল।

আলু বলে যা মনে হয়েছিল তা যে আলু নয় মুখে দিয়েই মালুম হল। এত কুৎসিত স্বাদ ওরা কখনও পায়নি। রুটি ছিঁড়তেই কষ্ট হচ্ছিল এবং তাতে মোটামোটা দানা রয়েছে। জয়িতা লক্ষ্য করল মন্তব্য করতে করতে সবাই খাবারটা শেষ করল। করে কল্যাণ বলল, 'এই খেলে আর বাঁচব না।'

আনন্দ বলল, 'কাল থেকে নিজেরাই চেষ্টা করব।'

হাওয়ার তেজ আরও বাড়ছিল। এখন ঝড়ের মত শোনাচ্ছে। শীত থেকে বাঁচার জন্যে ওরা ব্যাগের ভেতরে ঢুকে গেল। জয়িতা এবার ট্র্যানজিস্টারটা বের করল। মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে সে স্টেশন ধরার চেষ্টা করছিল। তিব্বত না চীন বোঝা যাচ্ছে না। হংকং কিনা তাই বা কে জানে। কোন ভারতীয় স্টেশন সে ধরতে পারছিল না। শুধু একটার পর একটা দুর্বোধ্য ভাষার গান বেজে যাচ্ছিল। এবং হঠাৎই সে বাংলা শব্দ শুনতে পেল। বাংলা শব্দ কিন্তু বলার ধরন অন্যরকম। কলকাতা কিংবা ঢাকা নয়। তারপরেই কানে এল বি বি সি-র সংবাদপাঠকের পরিচয়। আন্তর্জাতিক খবর দেওয়ার সময় স্টেশনটা হঠাৎ উবে গেল। নিজেদের ।া শোনার সুযোগ নেই বলে সে রেডিওটা অফ করল। এই সময় কল্যাণ বলল, 'আনন্দ, কাল আমার হাতের গয়নাটা খুলে দিবি?'

আনন্দ বলল, 'দেব।'

আর তখনই ঝড়ের শব্দের সঙ্গে আর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার মিশে গেল। যেন দূরে এভারেস্টের গায়ে কেউ কাঁদছে থেমে থেমে। সেটা কান্না না আর্তনাদ তা টের পাওয়ার উপায় নেই অবশ্য, কিন্তু সেই অপ্রাকৃত শব্দ ওদের নিঃসাড় করে দিল।

॥ ৩৩ ॥

প্রথম চোখ মেলল জয়িতা। কয়েকমুহূর্ত একটু অগোছালো, কোন কিছুই যেন ঠিক মাথায় আসছে না, তারপর খেয়াল হল। বাতাসের শব্দ নেই কিন্তু মনে হচ্ছে তার নাক অসাড় হয়ে গেছে। ওটা আছে এমন অনুভূতিও নেই। একদম চাপা দিয়ে শোওয়ার অভ্যেস নেই, দম বন্ধ হয়ে আসে বেশিক্ষণ থাকলে। কল্যাণটা কি আরামে ঘুমাচ্ছে। বাকি দুজনেরও জেগে থাকার কোন লক্ষণ নেই। অথচ এখন, জয়িতা ঘড়ি দেখল, সকাল আটটা বাজে। এ ঘরে এখনও আবছায়া। কাল সারারাত মড়ার মত ঘুমিয়েও ক্লান্তি জড়িয়ে আছে। জয়িতার ঘুম ভাঙার কারণটা তাকে ঘেরা-উত্তাপের বাইরে আনল। ঘরের ভেতরই প্রচণ্ড কাঁপুনি লাগছে, বাইরে গেলে কি হবে। অথচ বাইরে যেতে হবেই। ছেলেদের যে সুবিধেগুলো তারা ঈশ্বরের হাত দিয়ে করিয়ে নিয়েছে সেখানেই তাদের হার।

আপাদমস্তক ঢেকে বাইরে আসতেই সিঁটিয়ে দাঁড়াল সে। এখন হাওয়া নেই। রোদও নেই। মাটিতে ভিজে শিশির যেন জমে আছে। ওপাশের হিমালয় সাদা বরফের চূড়ো নিয়ে যেন সন্ন্যাসীর মত চুপচাপ। সাদা দাড়ির মত কিছু খুচরো মেঘ চূড়োর গায়ে গায়ে ঝুলছে। চট করে যেন সব শীত উধাও। জয়িতার আফসোস হচ্ছিল। কতবার শোনা সেই গল্পটা মনে পড়তেই রাগ হল নিজের ওপর। সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল না কেন? সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে থেকে আকাশের সাজগোজ দেখতে দেখতে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঈশ্বর দর্শনের আরাম তাকে কালকে পেতেই হবে।

সে মুখ ফেরাল। কোথায় মুরগী ডাকছে কিন্তু এছাড়া কোন প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। তাপল্যাঙের মানুষরা এখনও ঘরের বাইরে বের হয়নি। ছোট ছোট ঘরগুলো কাঠ এবং গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি। শীতকালে নিশ্চয়ই প্রচুর বরফ পড়ে, বর্ষায় বৃষ্টি হয়, পাহাড় বলে ঝড়ও ওঠে কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ঘরগুলো কি করে টিকে থাকে? যদিও গ্রামটা একটা পাহাড়ের আড়াল নিয়ে তৈরি তবু ঘরগুলোর দিকে তাকালে তো আস্থা রাখা যায় না। জয়িতা প্রায় দৌড়ে ঘরের পেছনে চলে এল। ওপাশে সেই ঝরনা থেকে জল পড়ছে। কোনরকমে একটা আড়াল তৈরি করে নিয়ে সে ভারমুক্ত হয়। এবং তারপরেই সে অস্বস্তিটা টের পেল। মাসের একটি বিশেষ সময়ে এই অস্বস্তিটা শুরু হয়। দিন-দুয়েক থাকে যন্ত্রণাটা। তিনদিন ক্রমাগত রক্তপাতের পর যন্ত্রণাটা কমে আসে। জয়িতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আচমকা সে তিন বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে সরে এল। এসব কথা কেবল মেয়েদেরই।

তার প্রথম অভিজ্ঞতার পর সীতা রায় এমনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যেন এটা অত্যন্ত গোপন ব্যাপার। ছেলেদের দৃষ্টি এবং কর্ণের সীমানায় আনা উচিত নয়। যদিও সীতা রায় মুখে বলেননি তবু ভঙ্গিতে মনে হয়েছে এটা মেয়েদের ওপর অর্পিত অপরাধ। রামানন্দ রায়কেও বলার প্রয়োজন নেই, শোভনও নয়। যতই সে সমস্ত সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে পারুক ওই বয়সে ঢোকানো মায়ের মানসিকতা বোধ হয় এ জন্মে ত্যাগ করা সম্ভব হবে না। অথচ এখানে কোন আড়াল নেই। একই ঘরে তিনজন পুরুষের সঙ্গে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। মুখ ফুটে না বললে, নিজেরই বিপদ। এবং সেটা বলা মানে স্বীকার করে নেওয়া আমি তোমাদের থেকে আলাদা, যথার্থই মেয়ে। পৃথিবীর নিয়মটাই প্রকৃতি অনুকরণ করেছে এক্ষেত্রে। যাদের সুবিধে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে কোন কৃপণতা নেই কিন্তু যাদের মধ্যে বাধা তাদের আপাদমস্তক বেড়ি পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

অন্তত দুদিন নিশ্চিন্ত, অবশ্য ঠাণ্ডার জন্যে যদি নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে। ঘরের দিকে ফিরে আসতে আসতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ছেলেদের যেটাকে সুবিধে বলে ভাবা হয়ে থাকে, সেটা তারা সহজ করে নিয়েছে বলেই তো। কাল রাত্রে ঠাণ্ডায় ওরা বাইরে আসেনি। দরজা থেকেই অন্ধকারে শরীরের ভার কমিয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল প্রত্যক্ষ চোখের আড়ালে, কিন্তু ঘটনাটা বোধের মধ্যে ঘটলেও ওইটুকু আব্রুর কারণেই ওরা সহজ ছিল। এই সুবিধে যদি ওরা আদায় করে নিতে পারে তাহলে শুধু মেয়ে বলেই সে সঙ্কোচ করে নিজেকে কষ্ট দেবে? ওরা যা করছে তার কোন্‌টা সে কম করছে? পরিশ্রম বুদ্ধি এবং শিক্ষায় সে তো পিছিয়ে নেই! নারী-স্বাধীনতার ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর। তথাকথিত আরোপিত নারীত্বমুক্তিই মেয়েদের কাম্য হওয়া উচিত। বিশেষ এই কষ্টের দিনগুলোর জন্যে সে দায়ী নয়। উপায় নেই বলে তাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু এটা তার লজ্জা হবে কেন? সে পরিষ্কার বলতে পারে আমি অসুস্থ, তোমরা আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও। জয়িতার মনে হল আমাদের অধিক সমস্যা বলতে না পারার জন্যে বেড়ে তীব্র এবং ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু একবার বলতে পারলে সেটার আর কোন ওজন থাকে না। মায়ের শেখানো বুলি এবার ঝেড়ে ফেলতেই হবে।

'তোর কি হয়েছে?' প্রশ্নটা শুনে জয়িতা চোখ তুলে তাকাল। সুদীপের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না পোশাকের প্রাবল্যে কিন্তু চেহারার আদলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

জয়িতা পালটা প্রশ্ন করল, 'কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কেন? আমার চেয়ে আমার ব্যাপারটা দেখছি তুই বেশি বুঝতে পারছিস।'

সুদীপ বলল, 'যাঃ বাবা! তাহলে তো নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। মুখ গোমড়া করে মাথা নামিয়ে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস দেখে মনে হল তোর শরীর খারাপ, তাই প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু চেপে যাচ্ছিস। তোর ওপর কল্যাণটার ইনফ্লুয়েন্স পড়ছে এবার। কমপ্লেক্স ঝেড়ে ফেল জয়।'

'আমার কোন কমপ্লেক্স নেই। কল্যাণকে তুই পছন্দ করিস না এই কথাটা বার বার বোঝাস কেন?' জয়িতা উঠে এল।

'ওই নাকিকান্না আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। জেনেশুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রতি পায়ে নাকিকান্না কাঁদছে। আমাদের উচিত ছিল ওকে কলকাতায় রেখে আসা। তুই লক্ষ্য করিস ও মনে মনে আমাকে ঈর্ষা করে।' সুদীপ বলতে বলতে নেমে গেল নিচে। তারপর জয়িতা এবং বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অবলীলায় ভারমুক্ত হল। সেদিকে তাকিয়ে জয়িতার জেদটা আরও বাড়ল। সম্ভ্রম, সঙ্কোচ, ভদ্রতা, আড়াল, মেয়েলি জগৎ, শালীনতা শব্দগুলো ছেলেরাই তৈরি করে নিজেদের সুবিধে মতন কোন এককালে মেয়েদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর মেয়েরা তার বোঝা টেনে চলেছে। আসলে মেয়েদের শত্রু হল মেয়েরাই। নিজেদের কাঁচের বাসন করে রেখেই তাদের তৃপ্তি। অন্তত আমাদের দেশের মেয়েদের বটেই। ফাঁপা বেলুনের মত সম্ভ্রম শব্দটাকে আঁকড়ে ধরে বড় হচ্ছে মরে যাচ্ছে। অথচ প্রতি পায়ে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যে অসম্মান তার কথা ধর্তব্যে আনছে না। একটি নারী তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বামীত্বের লাইসেন্স পাওয়া পুরুষটির দ্বারা ধর্ষিতা হলে সম্ভ্রমহানি হয়েছে বলে এদেশে মনে করে না, কিন্তু শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেও যাবে অথচ কোন অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে কারও বাড়িতে নক করে বলবে না, আপনার টয়লেট ব্যবহার করতে চাই। ওটাতে সম্ভ্রম থাকবে না বলে শৈশবে তাকে

বোঝানো হয়েছে এবং সেই বোঝা সে টেনে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের এসব সংস্কার যতটা না তাদের নিজেদের জন্যে তার চেয়ে বহুগুণ ছেলেদের খুশী করতে।

'সূর্য উঠে গেছে, না?' সুদীপ কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোর জন্যে বসে থাকবে?' জয়িতা সহজ হতে চাইল।

খোঁচাটা গায়ে মাখল না সুদীপ। চারপাশে নজর বুলিয়ে বলল, 'জায়গাটা দারুণ, না রে?'

'কাল আর একটু হলে তোর এই দারুণ বেরিয়ে যেত!'

'ছাড়! আমি বাচ্চা মেয়েটার উপকার করতে গেলাম আর তার বদলে—! মানুষ কত সহজে ভুল বোঝে। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। এই লোকগুলো এখানে বেঁচে আছে কি করে?'

সুদীপের প্রশ্ন শুনে জয়িতা আবার বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। এখানে ফসল ফলানোটাই কঠিন ব্যাপার। যা ফলে তাতে সারা বছর চলে না। মুরগী, পাহাড়ী ছাগল আর ভেড়া আছে। তাই খেয়ে ফেললে তো হয়ে গেল। জঙ্গলে ফল হয় বলেও মনে হয় না। কোনরকম ব্যবসাবাণিজ্য কেউ করে না, শহর তো দূরের কথা। চ্যাঙথাপুতেও যাওয়া আসা নেই। তাহলে?—সুদীপ বলল, 'এই লোকগুলো বেশিদিন বাঁচবে না। কাল যে মেয়েটাকে আমরা ওষুধ দিলাম তার মায়ের স্বামীকে দেখেছিস? ভাবা যায়? মহিলাটি বিধবা হবার পর স্বেচ্ছায় একটি কিশোরকে বিয়ে করেছিল একথা অনুমান করা যায়। ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে।' সুদীপ হাসল।

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'জেনে তোর কি লাভ?'

মাথা নেড়ে কৌতুকের গলায় সুদীপ বলল, 'এই গ্রামে মনে হচ্ছে পুরুষদের ডিম্যান্ড আছে।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল, 'মেয়েটার ঘা না শুকোলে ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।'

এই সময় আনন্দর গলা ভেসে এল, 'সুদীপ, জয়িতা তাড়াতাড়ি ভিতরে আয়।'

ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল আনন্দ বিভ্রান্তের মত চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

আনন্দ ওদের দিকে তাকাল, 'ব্যাগটা নেই। অথচ কাল বিকেলে ওইখানে রেখেছিলাম।'

কোন্ ব্যাগটার কথা আনন্দ বলছে বুঝতে অসুবিধে হল না। সুদীপ জিনিসগুলো উলটে-পালটে দেখল। তারপর বলল, 'আশ্চর্য! কে নেবে এখান থেকে!'

কল্যাণ তখনও ঘুমোচ্ছে। সুদীপ চট করে যেখানে শুয়েছিল তার কাছে পৌঁছে হাতড়াল, 'আরে আমার রিভলভারটাও নেই। অদ্ভুত কাণ্ড।'

আনন্দ বলল, 'আমারটাও পাচ্ছি না। যে গ্রেনেড এবং গুলির বাক্স নিয়ে গিয়েছে সে আমাদেরগুলো বাদ দেয়নি। একটা লোকের মুখই মনে পড়ছে। পালদেম।'

'ও কেন নেবে? এসব ব্যবহার করতে ও জানে না। তাছাড়া আমার জামাকাপড় এবং টাকার ব্যাগটায় হাত দেয়নি। শুধু বেছে বেছে আর্মস নিয়ে গেল?' সুদীপ হতভম্ব।

'ও প্রথম থেকেই ভয় পেয়েছিল আমাদের হাতে ওসব দেখে। ওগুলো থাকলে আমাদের কবজা করা যাবে না ও জেনেছিল। এখন কি করা যায়!' আনন্দকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

সুদীপ বলল, 'কিছু করার নেই। যে নিয়েছে সে চাইলে ফেরত দেবে না। মুশকিল হল, পুলিশ এলে আমাদের আর লড়াই করার উপায় থাকল না। কি ঘুম ঘুমিয়েছি, একটুও টের পেলাম না। ওটাকে ডাক তো। এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে সহ্য করতে পারছি না।'

এই সময় চোখ মেলল কল্যাণ, 'কটা বাজে রে? খুব খিদে পেয়েছে।'

আনন্দ বলল, 'ওঠ। কাল রাত্রে এই ঘরে চোর এসেছিল। আমাদের রিভলভার, গুলি, গ্রেনেড নিয়ে গেছে। তোর ব্যাগে যে রিভলভারটা রাখতে দিয়েছিলাম সেটা আছে কিনা দ্যাখ।'

কল্যাণ তড়াক করে উঠে বসে ব্যাগ হাতড়াল। নিজের বিছানা দেখল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, 'নেই।'

সুদীপ বলল, 'এবার পেট ভরে খাও সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করছে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর আনন্দ বলল, 'এ নিয়ে ভেবে আর কি হবে? আমরা এমন ভাব

দেখাব যেন কিছুই হয়নি। কেউ চুরি করেছে বলে জানি না। এই ঘটনায় আমরা বিন্দুমাত্র নার্ভাস হইনি। তাহলেই চোর অবাক হবে। ভাববে কিছু আমাদের কাছে এখনও রয়ে গেছে। ওরা অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। শুধু ভয় হচ্ছে গ্রেনেডগুলো না ফাটিয়ে বসে।'

ওরা যখন কথা বলছিল তখন জয়িতা ধীরে ধীরে হাত নিজের কোমরের ওপর নিয়ে এল। সে আঙুলের চাপ দিতেই শক্ত হল। কোমরের কাছে রিভলভারটা রয়ে গেছে। আনন্দ তাকে দেওয়ার পরই সে কোমরে রেখেছিল। চোর বোধহয় মেয়ে বলে তার কোমরে হাত দিতে সাহস পায়নি। সে রিভলভারটার আদল আঙুলে অনুভব করে হাত সরিয়ে নিল। থাক, তার কাছে যে একটা অস্ত্র বেঁচে আছে সেটা এখন বলার দরকার নেই। এবং হঠাৎই তার মনে হল এই মুহূর্তে সে তার তিন পুরুষবন্ধুর চেয়ে অনেকটা বেশি সুবিধেজনক অবস্থায় আছে।

চা খেয়ে ওরা চারজনে বাইরে বেরিয়ে এল। একটু আগে আকাশ যেটুকু পরিষ্কার ছিল এখন আর তা নেই। দলে দলে কুয়াশা উঠে আসছে নিচের খাদ থেকে। ওরা চারজন নিচে নেমে আসছিল। দুটো পাহাড়ের কোলে এই গ্রাম। বস্তুত হাওয়া যেদিক দিয়ে তেজী হয়ে আসে সেদিকটাই পাহাড় আটকে রেখেছে। আনন্দ বলল, 'চল্, গ্রামটাকে ভাল করে দেখে আসি। ওরা চুরি করুক আর যাই করুক গত রাত্রে এখানেই আশ্রয় পেয়েছি আমরা, খাবারও দিয়েছে। এখান থেকে চলে যেতে হলে চট করে কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে জানি না।'

কল্যাণ বলল, 'কেন, ওয়ালাঙচুঙে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল!'

আনন্দ জানাল, 'উপায় না থাকলে সেখানেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাই আমাদের পক্ষে বেশি নিরাপদের।'

এখন গ্রাম জেগেছে। বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা ঘর এবং ক্ষেতের সংলগ্ন কাজে নেমে পড়েছিল। তারা এখন ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে হঠাৎ সুদীপের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ল। এই ঠাণ্ডাতেও ওদের পা খালি, মাথা এবং মুখে কোন আবরণ নেই। গায়ের রঙ টকটকে লাল হবার উপক্রম। এই মেয়েদুটোর গলগণ্ড নেই। সুদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়ে দুটো হেসে যাচ্ছে সমানে আর সেইসঙ্গে সম্ভবত মন্তব্য ছুঁড়ছে। হঠাৎ ওপাশ থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ ধমকে ওঠায় ওরা চুপ করল। কিন্তু সুদীপের মনে হল নিঃশব্দে ওরা হাসছে। চারজনের মধ্যে ওকে বেছে নেওয়ার কারণটা সে অনুমান করতে পারল। সে ওই বালিকার হাত ধরে টেনেছিল এই গল্পটাই বোধ হয় ওকে হাস্যকর করেছে এদের কাছে। কিন্তু শুধুই কি হাস্যকর? ভাষা অবোধ্য হলেও মেয়েদের ভঙ্গিতে যে নিজস্ব ভাষা থাকে তা পৃথিবীর সব দেশেই এক। সেটা যে অন্য কথা বলছে।

কল্যাণ ডাকল, 'কি হচ্ছে কি? আর একটা ঝামেলা বাধাবে দেখছি।'

সুদীপ হাসল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গী হয়ে বলল, 'মাথা খারাপ, আমি ঝামেলার ধারে কাছে নেই।'

ক্রমশ ওদের পেছনে একটি দুটি করে বাচ্চা জমে গেল। কাটা তরমুজের মত গাল, নোংরা পোশাক এবং সমস্ত শরীরে অভাব খোদাই হয়ে আছে ওদের অথচ ঠোঁটে হাসি নিয়ে পেছন পেছন ঘুরতে উৎসাহের অভাব নেই। আনন্দ বলল, 'এককালে সাহেবরা কলকাতার গলিতে হাঁটলে এই দৃশ্য দেখা যেত। মানুষগুলো কিভাবে বেঁচে আছে দেখেছিস?'

'মিনি ভারতবর্ষ। আর অবাক হওয়ার কিছু নেই। খোঁজ নিলে দেখবি এখানেও একজন জোতদার বা ধর্মযাজক আছেন যিনি শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ওই কাহুন না কি বলে সে-ই হয়তো তাই।'

সুদীপ বলতে বলতে থেমে গেল। কয়েকজন যুবক ওপরে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর নজর রাখছে। হয়তো এতক্ষণ লক্ষ করেনি কিন্তু তাদের ঘর থেকে বের হবার পরই ওরা পাহারা দিয়ে চলেছে। সুদীপ বন্ধুদের কিছু বলল না। তার ধারণা ভুল হলে আর একটা রসিকতার সামনে দাঁড়াতে হবে।

পুরো গ্রামটা ঘুরতে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। অবশ্য পাহাড়ের অন্য ভাঁজে ঘর-বাড়ি থাকলে সেটা অজানা থাকল। জায়গা বেশি নয় কিন্তু বারংবার চড়াই ভেঙে ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। খোলা একটা জমি পেয়ে ওরা চারজন বসে পড়ল। বাচ্চাগুলো খানিক দূরত্ব রেখে থেমে গিয়ে ওদের

লক্ষ করছে। মাথার ওপর কুয়াশা ঝুলছে। রোদ নেই এক ফোঁটা। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোদের কি খিদে পায় না? আমার নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। কলকাতাতেও এমন খিদে পেত না।'

জয়িতা বলল, 'তুই এক কাজ কর। আমাদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে যে খাবার আছে তাই দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে ফেল। আমরা আসছি। ইচ্ছে করলে ভাতও রাঁধতে পারিস। খুব সোজা।'

সবাই ভেবেছিল কল্যাণ প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। তারপর দিক ঠিক করে হাঁটতে লাগল। বসে থাকা বাচ্চারা কল্যাণকে চলে যেতে দেখে কেউ কেউ পিছু নিল। কল্যাণ খানিকটা হেঁটে বাচ্চাগুলোকে ধমকাল, 'কি চাই? আমরা কি আজব চীজ? ভাগ!'

তার গলায় যে ঝাঁঝ ছিল তাতে বাচ্চারা থমকাল কিন্তু সরল না। দুবার পথ গোলানোর পর শেষ পর্যন্ত সে আস্তানাটায় পৌঁছাতে পারল। পৌঁছে দেখল পালদেম আর একটি কিশোর সেখানে বসে আছে। পালদেমকে দেখেই কল্যাণের মেজাজ বিগড়ে গেল। এই লোকটাই ওদের অস্ত্র চুরি করেছে। পালদেম মুখোমুখি হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি গ্রাম দেখতে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিছু একটা করতে হবে তো। তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করব!'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে তোমাকে জানাচ্ছি কাল রাত্রে তোমাদের ওইসব বাজে জিনিসগুলো আমি নিয়ে গেছি। ওগুলো তোমাদের সঙ্গে থাকলেই অযথা ভয় দেখাবে। যেদিন তোমরা এই গ্রাম ছেড়ে যাবে সেদিন সব ফেরত পাবে। এখানে তো আর ওসবের দরকার হচ্ছে না।'

পালদেম যে সোজাসুজি স্বীকার করবে তা কল্যাণের অনুমানে ছিল না। সে এটা শোনার পর আর কি বলতে পারে! ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে সে চাল আর আলু বের করল। হঠাৎ তার মনে হল স্টোভ ধরালে তেল শেষ হয়ে যাবে। পাথরের মধ্যে কাঠ জ্বেলে উনুন তৈরি করলে কেমন হয়! সে আবার বাইরে আসতে পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বন্ধুরা কি এখনই ফিরবে?'

'হ্যাঁ। কোন দরকার থাকলে আমাকে বলতে পার।' নিজেকে বেশ গুরুত্ব দিতে চাইল কল্যাণ।

'ওর মেয়ে কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি। ওই ঘা হওয়ার পর এমন কখনও হয়নি। আমরা সবাই খুব ভয় পাচ্ছি। যদি মেয়েটির কিছু হয় তাহলে তোমরা মারা পড়বে। কেন ঘুমোয়নি?'

পালদেম বেশ কড়া গলায় প্রশ্ন করতে কল্যাণ একটু থিতিয়ে গেল। মেয়েটা ঘুমোয়নি? মারা গেলেই হয়ে গেল আর কি! সে কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। আনন্দ এসব বোঝে। এখন মেয়েটা কি করছে?'

'এখন ঘুমাচ্ছে মড়ার মত। ওর মা তাই খোঁজ করতে পাঠিয়েছে। সকালে কি যেটা খেতে দিয়েছ তা খাওয়াবে? ভেবেচিন্তে বলো।'

পালদেম প্রশ্ন করতে কল্যাণ মুখ তুলে তাকাতে ওদের আসতে দেখল। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু আসছে, ওকে আসতে দাও, যা বলার ওই বলবে।'

দূর থেকে আনন্দ পালদেমকে কল্যাণের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে স্থির করেছিল চুরির ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবে না। কাছাকাছি এসে সুদীপ হাত তুলল, 'আরে পালদেম, কি খবর? তোমাকেই খুঁজছি। কাল রাত্রে চিৎকার করে কে কাঁদছিল বল তো? বাপরে বাপ!'

পালদেমের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কল্যাণকে ইশারা করল ব্যাপারটা জানাতে। আনন্দ লক্ষ করল আজ ওর ব্যবহারে বেশ কর্তৃত্ব এসে গেছে। কল্যাণ তাদের জানাল ব্যাপারটা। আনন্দ একটু চিন্তা করে বলল, 'এখন যখন ঘুমোচ্ছে তখন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেটা দিয়েছে তা এবার অর্ধেক করে খাইয়ে দাও। তোমরা মিছিমিছি চিন্তা করছ, মেয়েটা ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু কান্নাটা কিসের?'

পালদেম বলল, 'ওটা পাহাড়ের দানোর। মাঝে মাঝেই গ্রামের কাছে এসে ওইভাবে কাঁদে। আর যখনই দানোটা এমন করে তখনই গ্রামের কেউ না কেউ মরে যায়। কাহুন আজ পুজো শুরু করেছে তাই।'

জয়িতা বিস্মিত, 'দানো? দৈত্য? তোমাদের ওই পাহাড়ে বরফের মধ্যে দৈত্য থাকে? পাগল!'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ শক্ত হয়ে গেল পালদেমের, 'যা জানো না তা নিয়ে ঠাট্টা করো না। তুমি মেয়েছেলে বলে আমি কিছু বললাম না, এরা কেউ পাগল বললে আমি ছাড়তাম না।'

সুদীপ ঠাট্টা করল, 'মেয়েছেলে? মেয়েছেলেদের তুমি পাত্তা দাও না?'

'না। মেয়েছেলেকে আমরা বিছানা আর বাচ্চা তৈরির ক্ষেত হিসেবে ব্যবহার করি। আমাদের এখানকার নিয়ম হল চাষের জমি পাহাড় থেকে ছিনিয়ে নাও, বরফের জন্য মকাই, কোদো জমিয়ে রাখ আর পেট ভরে ছাং খেয়ে মেয়েছেলের কাছ থেকে আনন্দ পাও।' পালদেম হাসল লাল দাঁত বের করে।

আনন্দ জয়িতার মুখ দেখে বুঝতে পারছিল ও এখনই রাগে ফেটে পড়বে। সে হাত বাড়িয়ে জয়িতাকে স্পর্শ করল, 'রাগ করে কোন লাভ নেই। ও এখন যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে। এখানকার সত্যিটাও আমরা জানি না। কিন্তু পালদেম, তোমাদের ওই দৈত্যটাকে কেউ চোখে দেখেছে?'

'অনেকবার। ওর মুখ কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু শরীর দেখেছে অনেকেই। তবে যারা দেখেছে তাদের শরীরে রোগ ঢুকে যায়। আমাদের এখানে অনেকের গলায় যে অসুখ সেটা ওর জন্যে। ও কাঁদলে সেই কান্না আমাদের গলা ফুলিয়ে দেয়। কাল তোমরা এলে আর ও কাঁদল। আমরা মেয়েটার জন্যে ভয় পাচ্ছি তাই।' পালদেমকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। মনে হল ও পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই কথা বলছে।

'কিন্তু দৈত্যটাকে দেখতে কেমন?' কল্যাণ বেশ কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'গায়ে বড় বড় লোম, বিশাল চেহারা। কখনও চার হাত পায়ে কখনও দুই পায়ে হাঁটে। সব সময় বরফের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ঝড় বৃষ্টি ঠাণ্ডাতেই ওদের আরাম হয়। আমি ওর পায়ের ছাপ দেখেছি—এত বড় বড়! মাঝে মাঝে ওরা সবচেয়ে উঁচু বরফের পাহাড়ের ওপরেও উঠে যায়।'

'কি করে বুঝলে?'

'পাহাড়ের চূড়োটা কালো হয়ে যায় আর পৃথিবী তখন কাঁপতে থাকে থর থর করে।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল সুদীপ। বলল, 'তোমরা পাহাড়ি ভাল্লুককে দেখেছ!'

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল পালদেমের মুখে, 'আমাকে ভালু চেনাতে এসো না। এই দানোদের তিনজন মাঝে মাঝে এখানে আসে। যখন চলে যায় তখন খুব জোরে শিস বাজায়। কাল ওরা শিস দেয়নি, মানে এখনও এই এলাকাতেই আছে।'

কল্যাণ বলল, 'ইয়েতি। ওটা নিশ্চয়ই ইয়েতি।'

সুদীপ ধমকালো, 'ভাগ। ইয়েতি বলে কিছু নেই। হিলারি সমস্ত হিমালয় চষেছেন একটা ইয়েতির সন্ধানে। কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি শুধু পায়ের ছাপ ছাড়া। ওটা পরে পাহাড়ি ভাল্লুকের বলে মনে করা হয়েছে। ফালতু সংস্কার। কিন্তু পালদেম, আমরা তোমাদের ওই দানোকে মেরে ফেলতে পারতাম যদি তোমরা কাল আমাদের অস্ত্র চুরি না করতে।'

সুদীপ আচমকা এই প্রসঙ্গে আসায় আনন্দ আর জয়িতা পালদেমের প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল। পালদেম মাথা নাড়ল, 'তোমরা যাতে এখানে কোন খুনোখুনি না করতে পার তাই এই কাজ করতে হয়েছে। দানো আমাদের সঙ্গে বহু যুগ থেকে আছে।'

এতক্ষণ কিশোর চুপচাপ শুনছিল। সে কিছু বলতেই পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অত অস্ত্র নিয়ে? তোমাদের মতলব ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে!'

আনন্দ বলল, 'আমরা খারাপ লোক নই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের বয়স বেশি নয়?'

'তাতে কিছু এসে যায় না। তোমরা কি ডাকাতি করে পালিয়ে এসেছ?' পালদেমের চোখে সন্দেহ।

'না, আমরা ডাকাত নই। তোমাদের কোন ক্ষতি আমরা করব না।'

'ঠিক আছে। মেয়েটার কি হয় তা আগে দেখা যাক।'

পালদেম কিশোরকে ইশারা করতেই সে রওনা হচ্ছিল, জয়িতা তাকে থামাল, 'দাঁড়াও। বিছানা হওয়া ছাড়াও মেয়েদের অনেক কাজ থাকে। ওকে বল আমি ওর সঙ্গে যাব মেয়েটাকে দেখতে।'

পালদেম বেশ বিস্মিত, 'তুমি ওর বাড়িতে যাবে?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমাদের কি আমার সম্পর্কেও ভয় আছে? ও কেন রাত্রে ঘুমায়নি দেখতে চাই।'

জয়িতা কথা শেষ করে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ফার্স্টএইডের ব্যাগটা নিয়ে নেমে এল, 'ওকে বলে দাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।'

খানিকটা ইতস্তত করে পালদেম ছেলেটাকে কথাগুলো জানাতে সে অবাক হয়ে জয়িতাকে দেখল। আনন্দ বলল, 'কেন যাচ্ছিস বুঝতে পারছি কিন্তু সাবধানে থাকিস। বেশি দেরি করিস না।'

জয়িতা কোন কথা না বলে ছেলেটিকে অনুসরণ করল। পালদেমের কথাগুলো শোনার পর থেকেই

তার শরীর ঘিনঘিন করছিল। সেই মুহূর্তে ইচ্ছা হয়েছিল লোকটাকে গুলি করে মারে। তার কাছে যে আর একটা রিভলভার আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু পালদেমকে মেরে ফেললে এই গ্রামে বাস করা যাবে না। আর একটা রিভলভার কতক্ষণ পুরো গ্রামটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে! সমস্ত যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে কি কৌশলে যুদ্ধ করা হচ্ছে তার ওপরে। এর বদলা সে নেবেই। জয়িতা তার সামনে হেঁটে যাওয়া ছেলেটাকে লক্ষ্য করল। বেশ বিভ্রান্ত হয়ে ও হাঁটছে। ওর শরীরের গড়ন বলে দিচ্ছে কিছুতেই কুড়ির কাছে পৌঁছাতে পারে না। অথচ ও ওই বালিকার বাপ এবং শেষ-যুবতীর স্বামী। কি করে সম্ভব? এখানে কি মেয়েদের চেয়ে ছেলে কম? সে অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক করে পেছনে তাকাল। তাদের আস্তানা বা বন্ধুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জয়িতা হিন্দীতে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে ভাই, তোমার নাম কি?'

ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল। ওর পরিষ্কার সরল মুখে হাসি ফুটল। তারপর দুবার নিচু গলায় সে উচ্চারণ কবল, বাই, বাই! জয়িতা বুঝল ও ভাই শব্দটাকে ধরতে পেরেছে। পথ চলতে ওয়াংদের কাছে শেখা শব্দ ব্যবহার করল সে, 'তিমরো নাম?'

'দুগদুপ।' নিজের বুকে হাত রেখে ছেলেটি বলল, 'মেরো নাম।' এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হল না জয়িতার। তার মনে হল কান খাড়া করে শুনলে আর ওরা যদি একটু ধীরে কথা বলে তাহলে অনেক কথাই বোঝা যেতে পারে।

ক্রমশ ওরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারপাশে কৌতূহলী মেয়েপুরুষের ভিড়। এমন হতশ্রী চেহারা সত্ত্বেও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো ওরা আঁকড়ে আছে। পেছন পেছন মেয়েরা আসছে আর দুগদুপকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। দুগদুপ যেন হঠাৎ নিজেকে বেশ ক্ষমতাবান মনে করেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা নিচু দরজার সামনে উপস্থিত হল। ততক্ষণে গতকালের সেই রমণীটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখেমুখে বিস্ময়। দুগদুপ তাকে জড়িয়ে কিছু বলল। জয়িতা সেই শব্দাবলীর মধ্যে শুধু পালদেমের নামটাই বুঝতে পারল। রমণীটি মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে ভেতরে যেতে ইশারা করতে জয়িতা নিচু হয়ে পা বাড়াল। ঘরটা মাঝারি। কাঠ বাঁশ আর বড় খুঁটি দিয়ে শক্ত করে তৈরি। ঘরটির মাঝখানে একটা পার্টিশন। মেয়েটি শুয়ে আছে পার্টিশনের এপাশে একটা মাচার ওপরে। ওর শরীরের তলায় গরম বস্ত্র এবং বিছানা হিসেবে যা ব্যবহার করা হচ্ছে তার চেহারা দেখে আঁতকে উঠল জয়িতা। মেয়েটা তার ওপরে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ঘরে আরও মেয়ে বাচ্চা ঢুকেছিল। সেদিকে খেয়াল না করে জয়িতা মেয়েটার কপালে হাত রাখল। যদিও খুবই সামান্য ব্যান্ডেজের বাইরে খোলা রয়েছে কিন্তু তাতে কোন উত্তাপ পেল না সে। অর্থাৎ মেয়েটার জ্বর আসেনি, শরীরে কোন অ্যালার্জি বের হয়নি। যদিও ওর হাতে পায়ে চর্মরোগের চিহ্ন ছড়িয়ে। সে দেখল ব্যান্ডেজের অনেকখানি ভিজে গেছে। ঘা-এর রস গড়িয়ে ভিজিয়েছে ব্যান্ডেজ। অথচ গতকাল যখন ওকে দেখেছিল তখন কোন রস গড়াচ্ছিল না। গতরাতে ওর না ঘুমানোর কারণ সে বুঝতে পারল। ময়লায় শক্ত হয়ে জমে থাকা আচ্ছাদনটা সরে যাওয়ায় ঘা নরম হয়ে রস গড়াচ্ছে। এটা অবশ্যই ভাল লক্ষণ। কিন্তু আজ আবার ব্যান্ডেজ পালটে ওষুধ লাগানো দরকার। কিন্তু কাল ওরা বলে গেছে যে ব্যান্ডেজ খুললে যদি দেখা যায় ওটা বেড়ে গেছে তাহলে—! নরম ঘাকে ওদের বেড়ে যাওয়া বলেই মনে হবে। হোক, তবু যা করা উচিত তা করবে বলে ঠিক করল জয়িতা। কিন্তু মেয়েটার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। সে ইশারায় রমণীটিকে বলল ভিড় সরিয়ে দিতে। জয়িতা যেভাবে মেয়েটিকে পরীক্ষা করছিল তাতে নিশ্চয়ই আন্তরিকতা দেখতে পেয়েছিল রমণীটি। তাই সে এবারে চিৎকার করে ঘরের সবাইকে বের করে দিয়ে কিশোরটিকে কিছু নির্দেশ দিল। জয়িতা দেখল কিশোর-স্বামী বাইরে পাহারায় থাকল।

চিৎকার চেঁচামেচিতে মেয়েটির ঘুম ভাঙলেও সে কিছু শব্দ বিড় বিড় করে পাশ ফিরে আবার শুলো। রমণীটি ছুটে এল তার কাছে। উদ্বিগ্ন হয়ে দেখল। তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল। জয়িতা হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কোন ভয় নেই।' রমণীটি সেটা বুঝতে পারল না। জয়িতা হিন্দীতে ডর শব্দটা উচ্চারণ করে হাতের ইশারায় বাকিটা বোঝাল। এবার ইশারায় কথা বলা শুরু হল। দেখা গেল অসুবিধে হচ্ছে, বারংবার বিভিন্ন কায়দায় বোঝাতে হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ বুঝতে পারছে। এই ঘরটা দুগদুপের দাদার। সে মারা গেছে এক বছর আগে। গ্রামের নিয়ম মেনে ছোটভাইকে

বিয়ে করতে হয়েছে রমণীকে। পাশের খোপে তারা শোয়। রমণী তিনবার ক্ষেতি শব্দটা উচ্চারণ করার পর জয়িতা বুঝতে পারল জমি যাতে ভাগ না হয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা।

সে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে এবং ইশারায়, 'ছেলের বয়সী একটা ছোকরাকে স্বামী হিসেবে তোমার কেমন লাগছে?'

রমণী হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর চটপট জামা সরিয়ে কাঁধের কাছটা জয়িতার সামনে আনল। নগ্ন সাদা চামড়ায় দাঁতের দাগ স্পষ্ট। মেয়েটি খুব গর্বের সঙ্গে সেখানে আঙুল বুলিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল শব্দ করে।

জয়িতা হতভম্ব হয়ে বাইরে দাঁড়ানো দুগদুপের দিকে তাকাল। ওই সরল নির্দোষ কিশোরকে ওই ভূমিকায় সে কল্পনাও করতে পারছিল না। আর এই সময় মেয়েটি চোখ মেলে উঠে বসতেই জয়িতা এগিয়ে গেল। মেয়েটির হাত দুটো হাতে জড়িয়ে ধরতেই সে লজ্জা পেয়ে হাসল। জয়িতা এবার ওর কপালে হাত বোলাল। স্নেহ বড় সংক্রামক, মেয়েটি আক্রান্ত হল।

॥ ৩৪ ॥

যতটা সাহস এবং উৎসাহ নিয়ে জয়িতা মেয়েটিকে দেখতে এসেছিল, ব্যান্ডেজ খোলার পর সেটা দূর হয়ে শরীর গোলানো অনুভূতি তৈরি হল। তার মনে হচ্ছিল বমি হয়ে যাবে। অত্যন্ত ভেপসে গিয়েছে ঘা, ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও আজ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। গতকাল কিন্তু গন্ধটা এমন ছিল না অথবা থাকলেও পাওয়া যায়নি। এখন আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, গলা। দাঁতে দাঁত চেপে ঘা পরিষ্কার করতে লাগল জয়িতা। মেয়েটির মা উদ্বিগ্ন মুখে পাশে দাঁড়িয়ে। আঙুলে তুলো নিয়ে ঘা স্পর্শ করার সময় প্রথমে যে অস্বস্তিটা প্রবল হয়েছিল ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গেল। নতুন করে মলম বুলিয়ে আবার ব্যান্ডেজ করল জয়িতা। পুরোনোটাকে কোনরকমে মুড়ে নিয়ে সে মেয়েটির মাকে ওষুধ খাওয়াতে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল বাইরে।

ঘরের বাইরে তখনও ভিড়। সবাই জয়িতার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে। সে বেরিয়ে আসামাত্র কয়েকজন ঢুকে গেল ভেতরে। জয়িতা আর দাঁড়াল না। হন হন করে সে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে যখন একদম একা, পাহাড়ের একটা রাস্তার শেষে দাঁড়িয়ে, তখন ব্যান্ডেজটার কথা খেয়াল হল। সেটাকে খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতেই পেট গুলিয়ে উঠল। হাঁটু মুড়ে বসে জয়িতা বমি করতে লাগল। এই ঠাণ্ডাতেও কপালে ঘাম জমছিল। শরীরে সেই তৈলাক্ত অনুভূতি।

মিনিট পাঁচেক পরে যখন বমিটা বন্ধ হল তখন শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জয়িতা একটা বড় পাথরের ওপরে শরীর এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পড়ে রইল সে। এবং তখনই তার মনে হল এই পৃথিবীতে সে এখন একা। একটিও মানুষের কাছে কিছু আশা করার নেই। যখন সে কলেজে পড়ত, কলকাতায় ব্যস্ত থাকত তখন এই চিন্তাটা এমন ভাবে তাকে পীড়িত করেনি। সীতা রায় অনেক দূরের মানুষ, রামানন্দ রায়ের জন্যে হঠাৎ তার কান্না পেয়ে গেল। এই কান্না ঠিক রামানন্দ রায় না নিজের জন্যে তা সে জানে না। সচেতন মানুষ হিসেবে রামানন্দ রায়কে অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে, ঘেন্না করারও। কিন্তু কন্যা হিসেবে হঠাৎ সে রামানন্দ রায়ের অভাব বোধ করতে লাগল। হয়তো রুটিন তবু ওই যে দিনে একবার এসে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এভরিথিং অল রাইট, সেইটে করার আর কেউ রইল না। জয়িতার মনে হচ্ছিল, একটি মানুষ জীবনে সব কিছু পেতে পারে তার ক্ষমতা দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে কিন্তু একটু স্নেহ না পেলে তার বড় জিনিস হারিয়ে যায়। রামানন্দ রায় কি তাকে খুব স্নেহ করতেন? সেই সময় সে কোন গুরুত্ব দেয়নি, বরং ধান্দা বলেই মনে হয়েছে। আজকে কেউ তাকে এসে ওই গলাতেও কথা বলবে না। চোখ খুলে ঘোলাটে আকাশটাকে দেখতে দেখতে ক্রমশ এইসব চিন্তার বাইরে বেরিয়ে এল জয়িতা। গম্ভীর মেজাজের মেঘগুলো যেন নাকের ডগায় ঝুলছে। এখানে ওই আকাশটা কত কাছে। যেন হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়। চুপচাপ শুয়ে রইল জয়িতা।

ট্রান্জিস্টারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কল্যাণ। উনুন তৈরি করা হয়েছে পাথর সাজিয়ে, তাতে কাঠ

জ্বলছে। যতটা না আগুন তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া। সুদীপ মত পালটে খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা রান্নার বই কিনে আনলে হত। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। জয়িতা তা থেকে অনেক বড় হয়েও রান্নার র জানে না। আজকালকার মেয়েদের কাছে তুই কোন কিছু আশা করতে পারিস না।'

আনন্দ কথাগুলো শুনে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। কয়েকটা নেহাতই বাচ্চা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জুলজুল চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। আনন্দ লক্ষ্য করল ওদের দৃষ্টি উনুনটার দিকে। চোখেমুখে ক্ষুধা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই গ্রামের মানুষগুলোর বেশির ভাগই সারা বছর আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে। হয়তো কোন কোন দিন খেতেই পায় না। কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে ওরা এমন অভ্যস্ত যে খুব একটা মাথা ঘামায় বলেও মনে হচ্ছে না। কোন সরকারি সাহায্য এখানে পৌঁছয় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ কিছু জিনিস নিয়ে পাহাড়ি পথ ভেঙে যে টাকা রোজগার করতে যায় না এমন হতে পারে না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে যে পোশাক আছে তা তাহলে এল কোত্থেকে? পালদেমকে প্রশ্নটা করেছিল সে। পালদেম বলেছে প্রত্যেক বছর দুটো লোক খচ্চরের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে এই গ্রামে আসে। তারা টাকা নেয় না কিন্তু সেগুলোর বিনিময়ে জিনিসপত্রই নিয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা পোশাক, নুন, চিনি এবং চাল কিনে থাকে এইভাবে। ব্যাপারটা হয়তো ঘটে থাকে কিন্তু নিজের প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম থেকে বেরিয়ে যোগাযোগ করবে না এ অসম্ভব। যে লোকটা ওদের দেবতার মূর্তি চুরি করে পালাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই এই গ্রামের লোক। তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, পালদেম কিন্তু কিছুই বলতে চায়নি। পৃথিবীর কিছু মানুষ একটি দুর্গম পাহাড়ি গ্রামে প্রায় জন্তুর মত জীবনযাপন করছে এবং তা নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার কোন দায় নেই। চুপচাপ ভাবতে ভাবতে আনন্দর মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা চলকে উঠল। সে বন্ধুদের দিকে উত্তেজিত হয়ে তাকাল। কল্যাণ এখনও কানে ট্রাঞ্জিস্টার চেপে স্টেশন ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুদীপ উনুনে বসানো পাত্রটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দ উঠে বাচ্চাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা সরে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আনন্দ বন্ধুর মত হাসতে চেষ্টা করল। বাচ্চাগুলো সেই হাসি ফিরিয়ে দিল না। আরও তিন পা এগিয়ে গিয়ে হাত মুখ তুলে খাবার ভঙ্গি করেই দূরের জ্বলন্ত উনুনটাকে ইঙ্গিতে দেখাল। বাচ্চাগুলো খানিকটা থতমত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এবার কারও কারও মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুজন একসঙ্গে মাথা নেড়ে জানাল তারা খেতে সম্মত। আনন্দ হাত তুলে তাদের আশ্বস্ত করল। তারপর ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি?'

আনন্দ বলল, 'আরও সাত আট জনের জন্যে খিচুড়ি করতে হবে। দেখে মনে হল ওরা ক্ষুধার্ত।'

কল্যাণ ট্রানজিস্টারটা বন্ধ করে বলল, 'মাথা খারাপ নাকি! যা স্টক আছে তা আমাদেরই বেশি দিন কুলোবে না, তার ওপর দানছত্র করলে এখনই না খেয়ে মরতে হবে।'

আনন্দ হেসে বলল, 'যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন কি খেয়ে থাকবি?'

কল্যাণ উত্তর দিল না প্রথমে। তারপর চুপচাপ উঠে ঢুকে গেল ঘরে।

সুদীপ বলল, 'অত খিচুড়ি একসঙ্গে রান্না করার জায়গা নেই। একটু খিচুড়ি একবার খাইয়ে ওদের ভালবাসা পাওয়া যাবে বলে তোর মনে হচ্ছে? ইমপসিব্‌ল। মেয়েটার কিছু হলে আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা।'

'জানি না। তবে একদল ক্ষুধার্ত ছেলের সামনে বসে খেতে পারব না আমি।'

'একদল? তুই ভেবেছিস ওই কটি ছেলেই ক্ষুধার্ত? খবর পেলে সমস্ত গ্রাম চলে আসবে খেতে।'

'খাবে। আমাদের সঙ্গে যা আছে তাই ওদের খেতে দেব।' আনন্দ নির্লিপ্ত মুখে উত্তর দিল।

সুদীপ উঠে দাঁড়াল, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'মাথা আমার ভালই আছে সুদীপ। আমি এই লোকগুলোর সঙ্গে একটু ভাব করতে চাই।'

'হোয়াট ফর? এরা আমাদের কোন উপকারে আসবে না। দেখলি না, পালদেম কি কাণ্ডটা করল!'

আনন্দ আকাশের দিকে তাকাল। তার মাথায় যে চিন্তাটা এসেছে সেটাকে গুছিয়ে বলার মত সে কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। বলতে গেলেই নিজের কাছে কেমন খেলো মনে হচ্ছে। ওরা এর মধ্যে একটা মতলবের গন্ধ খুঁজে পেতে পারে আর সেই মতলবটাকে সমর্থন করবে এমন ভাববার কোন কারণ নেই।

খিচুড়ি হয়ে গিয়েছিল। সুদীপ তাড়াতাড়ি পাত্রটাকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। আনন্দ দেখল বাচ্চাগুলো আরও কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। ওদের প্রত্যেকের মুখে আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। ঠিক তখনই ড্রাম বাজার শব্দ কানে এল। সে অবাক হয়ে দেখল বাচ্চাগুলো পলকে পিছন ফিরে ছুটতে লাগল উলটো দিকে। আনন্দ দূরেও কিছু লোককে ছুটে যেতে দেখল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল সমস্ত গ্রামে ড্রামের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শব্দ শুনেই সুদীপ বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আওয়াজ রে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পারছি না। সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে ওই পাশে যাচ্ছে।'

সুদীপ ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'মেয়েটা মরে গেল না তো! জয়িতা কোথায়? মেয়েটা মরে গেলে আর দেখতে হচ্ছে না। এদিকে তো কেউ নেই, পালাবি?'

আনন্দ বলল, 'জয়িতাকে ফেলে পালাতে পারব না। আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়? তার চেয়ে চল্ দেখে আসি ব্যাপারটা। কল্যাণকে ডাক।'

কল্যাণ পিছনেই ছিল। সে গলা তুলে বলল, 'আমি আগ বাড়িয়ে ধরা দিতে পারব না। জ্বলন্ত উনুনে এসে পড়লাম কড়াই এড়াতে গিয়ে। পুলিশকে বলতে পারতাম, আইনের আশ্রয় নিতে পারতাম কিন্তু এখানে সেসব—। পালাতে হলে পালা, আমি রাজী আছি।' শেষ কথাগুলো সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশকে কি বলতিস? আমার হাত ভাঙা ছিল, আমি একটাও খুন করিনি, গুলিও ছুঁড়িনি। অতএব আমি অপরাধী নই, এই তো? চল, আনন্দ, যা হবার হবে, ব্যাপারটা দেখেই আসা যাক।' সুদীপ নেমে হাঁটতে লাগল।

কল্যাণ খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চিৎকার করল, 'তোরা ঘুরে আয়, আমি এইসব পাহারা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করিস।'

সুদীপ যেতে যেতে বলল, 'আমি কল্যাণকে বিশ্বাস করি না, ও আমাদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে।'

আনন্দ হাসল, 'কার কাছে? এখানে নিজেরাই যদি নিজেদের গলায় ফাঁস পরাই তাহলে অন্য কথা।'

ড্রামের আওয়াজ বাড়ছিল। যত এগোচ্ছে তত জায়গাটা জনমানবশূন্য ঠেকছে। ছেলেবুড়ো সবাই দৌড়চ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ওরা মন্দিরটার কাছে পৌঁছে গেল। সমস্ত গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। কাহুন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা চিৎকার করে যেন সমর্থন জানাল। এবার ওরা লোকটাকে দেখল। দুটো হাত পিছু মোড়া করে বাঁধা। এর পর আগে কাহুন হেঁটে যাচ্ছে, পিছনে দুটো লোক হাতবাঁধা লোকটিকে নিয়ে। পালদেমও ওই দলে রয়েছে।

সুদীপ ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের জন্যে নয়, মূর্তি চুরি করা লোকটাকে বোধ হয় শাস্তি দেবে আজ। কি শাস্তি দিতে পারে?'

আনন্দ কোন কথা বলল না। একটা গোল ড্রাম ধরে রেখেছে দুটো লোক, আর তার মাঝখানে তালে তালে পিটিয়ে যাচ্ছে মিছিলের একটি লোক। ওরা সোজা পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠছিল। আনন্দ সুদীপকে ইশারা করল বাঁ দিকে সরে আসতে। আড়ালে আড়ালে খানিকটা দূরে যাওয়ামাত্র জয়িতাকে দেখতে পেল সুদীপ। একটা বড় পাথরের ওপরে জয়িতা বসে চারপাশে তাকাচ্ছে। ওদের দেখে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের আওয়াজ হচ্ছে রে?'

সুদীপ বলল, 'শাস্তির। তুই এখানে কি করছিলি?'

জয়িতা কাঁধ নাচাল। যেন সেটাই উত্তর হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার শাস্তি?'

আনন্দ বলল, 'মূর্তিচোর লোকটার। ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়োতে। এদিক দিয়ে গেলে মনে হয় আড়াল থেকে দেখা যাবে।'

একেবারে চূড়োয় ওঠার পর ড্রামের আওয়াজ থামল। গ্রামের সমস্ত মানুষ এখন চুপচাপ। কাহুন চারপাশে তাকিয়ে পালদেমের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেই সে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করল।

সুদীপ বলল, 'যে করেই হোক এদের ভাষাটা তাড়াতাড়ি শিখতে হবে। পালদেমটা মনে হচ্ছে, নেতা।'

জয়িতা বলল, 'এখানে সবাই রাজা। মনে হচ্ছে লোকটাকে মেরে ফেলবে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'দূর! একটা মূর্তি চুরির জন্যে ওরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে নাকি!'

পালদেম বক্তৃতা চালাচ্ছিল।

জয়িতা বলল, 'অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষকে নরকেও নিয়ে যেতে পারে। ওরা লোকটাকে যদি মেরে ফেলতে চায় তাহলে কি আমরা বাধা দেব?'

সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল, 'ইমপসিব্‌ল। খালি হাতে কিছু করতে যাওয়া বোকামি হবে।'

বক্তৃতা শেষ করে পালদেম চিৎকার করে কাউকে ডাকতেই একটি যুবতীকে দেখা গেল এগিয়ে যেতে। যুবতী সুগঠনা, দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে সে রূপসী এবং সেই বিষয়ে সে বিশেষ সচেতন। পালদেমের সামনে গিয়ে যুবতী মাথা নিচু করে দাঁড়াতে কাহুন তাকে প্রশ্ন করল একটার পর একটা। যুবতী যেই উত্তর দিচ্ছে অমনি মূর্তিচোর চিৎকার করে যেন প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু তার চিৎকার ডুবে যাচ্ছে জনতার চিৎকারে। বেশ কিছুক্ষণ এই চলার পর পালদেম কাহুনকে ইশারা করল। আনন্দ চোখের পলক ফেলার আগেই দেখল ওরা লোকটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। সামান্য শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ পেল না লোকটা, শরীরটা যেন পাক খেতে খেতে নেমে যেতে লাগল নিচে। কয়েক হাজার ফুট তলায় পাথরের ওপরে যখন আছড়ে পড়বে তখন এই গ্রামের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ওরা তিনজন স্তব্ধ হয়ে দেখল গ্রামবাসীরা নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন কেউ কোন কথা বলছে না। অনেকটা শোক মিছিলের মতো দেখাচ্ছে, শুধু অদ্ভুত আওয়াজ বের হচ্ছে ড্রাম থেকে। অনেকটা বিজয়া দশমীর ঢাকের বোলের মত।

জয়িতা বলতে পারল শেষ পর্যন্ত, 'কি নৃশংস!'

সুদীপ বলল, 'কোন বিচার হল না, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেল না লোকটা, পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেলা হল। জানতে হবে সিদ্ধান্তটা কে নিল!'

জয়িতা বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ! ফিরে চল্‌।' তারপর নামতে নামতে বলল, 'আমরা যখন নানুভাই আর মন্ত্রীকে খুন করি তখনও নিশ্চয়ই কেউ কেউ বলেছে কি নৃশংস! আমরাও অবশ্য বিচার ব্যবস্থার সুযোগ দিইনি ওদের!'

সুদীপ ক্ষেপে গেল, 'কার সঙ্গে কার তুলনা করছিস! ডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স অফ কল্যাণ! যারা বিচার ব্যবস্থাকে কবজা করে রেখেছে ক্ষমতার জোরে, যারা ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করবে সেই পুলিশ পারচেজড যেখানে ওদের সুযোগ নিতে দেওয়া মানে সসম্মানে বেরিয়ে আসতে বলা। আজ অবধি কটা কমিশনে বা ক্রিমিনাল কেসে অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলতে পারিস? খোদ পুলিশের এক কর্তা মারা গেল কনস্টেবল সমেত অথচ অপরাধী ধরা পড়ল না। যাকে সাজানো হল সে মারা গেল লকআপে। সঞ্জীব তীর্থঙ্করের কেসটা ভাব? এখানে তো তেমন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নেই।'

'রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নেই, সমাজব্যবস্থার কথা জানলি কি করে?'

'মনে হয়। নইলে লোকটার বউ ওর বিরুদ্ধে অন্তত কথা বলত না। বউটাকে দেখে তোর দুঃখী মনে হয়েছে? শালা, মেয়েছেলে—।'

সুদীপকে শেষ করতে দিল না জয়িতা, 'নো মোর, তোর ওপর কল্যাণের প্রভাব কম নয়।'

ওরা নিচে নেমে হাঁটতে লাগল আস্তানার দিকে। আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার ঘা কেমন দেখলি? কোন উন্নতি হয়নি?'

জয়িতা বিশদ বলল। আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, গুড সাইন।'

আস্তানায় এসে ওরা দেখল কল্যাণ নেই। কিন্তু সেই বাচ্চা কটা দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ বলল, 'আনন্দ, তুই কি ফ্যাচাং বাঁধালি বল্‌ তো! ওরা তোকে দেখে আপনজনের মত হাসছে।'

আনন্দ জয়িতাকে বলল, 'আমি ওদের খাওয়াব বলেছিলাম। ওরা ক্ষুধার্ত।'

জয়িতা বলল, 'আমিও। আমাকে কে খাওয়াবে?'

আনন্দ হেসে ফেলল, 'সবাই মিলে খাওয়ানো যাক সবাইকে।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে, আমি আবার উনুন ধরাচ্ছি কিন্তু তুই বাচ্চাগুলোকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাওয়া। নইলে মেম্বার বেড়ে যাবে পিলপিল করে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের জন্যে যেটা রাঁধলি সেটা দিয়ে দিতে বলছিস?'

কাঁধ ঝাঁকাল সুদীপ, 'কি আর করা যাবে!' তারপর জয়িতাকে বলল, 'আগের খিচুড়িটা খুব ধূর হয়েছিল। এক্সপেরিয়েন্স মেকস এ ম্যান এফিসিয়েন্ট। এবার দারুণ রাঁধব। তুমি পটের বিবি হয়ে বসে থাকবে তা চলবে না, এসো হাত লাগাও।'

জয়িতা হেসে ফেলল, 'একটা মানুষের মৃত্যু দেখেও তুই ঠাট্টা করছিস। পটের বিবিরা শুনেছি খুব সুন্দরী হয়। যেমন পটেশ্বরী বউঠান। আমি খুব গর্বিত বোধ করছি।'

আনন্দ বাচ্চাগুলোকে দেখছিল। সুদীপ যাকে ধূর রান্না বলেছে তাই ওরা খাচ্ছে পরম তৃপ্তি নিয়ে। ঘরের মধ্যে সসপ্যানটাকে মাঝখানে রেখে ওরা কয়েক সেকেন্ডে শেষ করে ফেলল খিচুড়ি। কিন্তু ওই পরিমাণে ওদের কিছুই হয়নি বোঝা গেল। তবু প্রতিটি মুখেই এখন খুশীর ছাপ। আনন্দ এবার ইঙ্গিত করল পাত্রটাকে ধুয়ে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন ওটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাকিরা আর কিছু করার নেই বুঝতে পেরে একে একে উঠে দাঁড়াল। আনন্দ চেষ্টা চালাচ্ছিল ওদের সঙ্গে কথা বলার। বাচ্চাগুলো লজ্জা পাচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে হাসছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওদের দুই সঙ্গী পাত্র নিয়ে ফিরে এলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তথাকথিত সামাজিক চেহারার যে পরিবর্তন অধিকাংশ মানুষ মনে মনে কামনা করেন অথচ অংশ নেন না সক্রিয়ভাবে ওরা সেখানে আঁচড় কাটতে চেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা আঁচড়ও ছিল না। একটা মধুচক্রের মারফত মুনাফাখোরকে ধ্বংস, জাল ওষুধের কারবার বন্ধ করা অথবা অসৎ মন্ত্রীকে খুন করলে অত বড় দেশের কোন উপকার করা হয় না। তার ধারণা ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়ে যত তীব্র ছিল বেরিয়ে এসে সেটাই এখন পানসে ঠেকছে। যে দেশের প্রতিটি মানুষকে বাঁচতে হয় কোন না কোন ভাবে অসৎ হয়ে অথবা অসৎ ছায়ার সঙ্গে তাল রেখে সেখানে ওই ঘটনা কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যদি সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত সাময়িক। হয়তো এতদিনে আরও দশটা জাল ওষুধের কারখানা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষমাত্রই চাইবে অন্যের ওপর দিয়ে ঝড়টা যাক, আমি যেন নিরাপদে থাকি। তা ছাড়া দেশের সিস্টেমটাই এমনভাবে তৈরি যে কয়েকটা রাজনৈতিক দল, কিছু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যা করবে মিলেমিশে তাই মেনে নেবে সাধারণ মানুষ। এই মেলামেশাটাও যদিও আপাতচোখে দেখা যায় না, ফলে কৃত্রিম রেষারেষি ছড়িয়ে দেওয়া যায় সহজেই। ব্যক্তিহত্যা অথবা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে ধ্বংসের মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ থাকতে পারে কিন্তু তা করে গণজাগরণ সম্ভব নয়। বস্তুত ভারতবর্ষে সেই ঘটনাটি আদৌ যাতে না ঘটে তার জন্যে ডান এবং বামপন্থীরা সুচতুর চেষ্টা চালিয়ে বেশ স্থিতাবস্থায় এসে গেছে। এই ভাবনা যদি সত্যি হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হবে কল্যাণের। সে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে এখন করণীয় কি? সে কেন আগে থেকে খতিয়ে দ্যাখেনি? আনন্দ ছটফট করছিল। তিন-তিনটে ঘটনা ঘটার পর ওরা হিমালয়ে বসে আছে। দেশে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার খানিকটা আন্দাজ নিয়েই এসেছিল কিন্তু সেটা এখন কোন্ অবস্থায় আছে তা জানা যাচ্ছে না। তবে পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, ধরা পড়লে খুনের দায়ে খুন হতে হবে এবং অধিকাংশ মানুষ সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। যদি অন্তত্তপক্ষে একশজন লোক—।

এই সময় সুদীপ ডাকল, 'আনন্দ একবার বাইরে আয়।'

আনন্দ দরজায় এসে দৃশ্যটা দেখল। কল্যাণ দৌড়ে দৌড়ে পাহাড় থেকে নামছে আর তার পিছনে ও পাশে কয়েকজন যুবক। যেভাবে জন্তুকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ওরা কল্যাণকে সেইভাবেই নিয়ে আসছে। আস্তানার কাছে পৌঁছে কল্যাণ ধপ করে বসে পড়ল। আনন্দ ছুটে গেল কাছে, 'কি হয়েছে?' কল্যাণ কোন কথা বলতে পারল না। সে হাঁপাচ্ছে, এই শীতেও তার শরীর ঘামে ভেজা।

এই সময় পালদেমকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। পিছু ধাওয়া করে আসা যুবকদের কাছে ঘটনাটা শুনে পালদেম এগিয়ে এসে কল্যাণকে দেখল, তারপর আনন্দকে প্রশ্ন করল, 'ওকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছিলে? আমি বলেছিলাম এই গ্রাম ছেড়ে তোমাদের না যেতে, তোমরা শুনলে না!'

আনন্দ কল্যাণের দিকে তাকাল। সে চোখ বন্ধ করে তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। আনন্দ বলল, 'ওকে আমরা কোথাও পাঠাইনি। মনে হয় ও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল।'

'না।' পালদেম প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ও আমাদের শত্রুপক্ষের গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের

লোক ওকে দেখামাত্রই দৌড়তে আরম্ভ করে। অপরাধী ছাড়া কেউ পালাবার চেষ্টা করে না। তোমাদের বলে দিচ্ছি এই ঘটনাটা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে।'

আনন্দ এবারে অবাক। কল্যাণ পালাচ্ছিল? কাউকে কিছু না বলে? কিন্তু ওর সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। সে পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তোমাদের শত্রুপক্ষ আছে?'

'আছে। মাঝে মাঝেই ওরা আমাদের ওপর হামলা করে।'

'কেন?'

পালদেম প্রশ্নটা শুনে এবার হাসল, 'ওদের যখন খাবার দরকার হয় অথবা মেয়ের প্রয়োজন হয় তখন চলে আসে। শত্রুতা কয়েক পুরুষ ধরেই চলছে। মেয়েটা কি ভাল হয়ে যাবে?'

শেষ প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন জয়িতার উদ্দেশে।

ওরা নির্বাক হয়ে বসে ছিল। উত্তরে জয়িতা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

পালদেম বলল, 'তাহলে তোমাদের মঙ্গল। শোন, আর কদিনের মধ্যে জোর বৃষ্টি হবে। তারপর বরফ পড়বে এখানে। একবার বরফ পড়া শুরু হলে আর পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করা অসম্ভব। তোমরা তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে সারিয়ে তোল।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমরা চেষ্টা করছি। আমি কথা দিচ্ছি এখান থেকে কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। যদি কেউ করে তাহলে সে নিজের দায়িত্বে করবে। আর একটা কথা, তোমাদের বেশির ভাগ মানুষের গলাতে যে রোগ হয়েছে তার ওষুধ আমাদের কাছে আছে। যদি চাও আমরা দিতে পারি।'

পালদেমের মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল, 'এসব বলে তুমি সুবিধে চাইছ? আমার ছেলে দুদিন ধরে শুয়ে আছে। তাকে তুমি সারিয়ে দিতে পারবে কালকের মধ্যে?'

আনন্দের বুকে কাঁপুনি এল, কিন্তু সে ঝুঁকি নিতে রাজী হল, 'কি হয়েছে তোমার ছেলের?'

'কথা বলছে না, সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম আর মাঝে মাঝে শরীর কাঁপছে।'

বর্ণনা শুনে আনন্দর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। গ্রামে তাদের পাশের বাড়ির শিশুটির একই উপসর্গ হয়েছিল। প্রায় কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল তখন। ডাক্তার এসে বলেছিলেন ওটাকে তড়কা বলে। তিনি শরীর থেকে সমস্ত গরম কাপড় খুলে ফেলে মিনিট দশেক ধরে জল ঢালতে বলেন। তাতে শিশুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে জ্বর এবং খিঁচুনি না হবার ওষুধ দিলে সে ভাল হয়ে ওঠে। পালদেমের ছেলের একই অসুখ হয়েছে কিনা সে বুঝতে পারল না। তা ছাড়া শিশুর জন্যে যে ওষুধের প্রয়োজন তা তাদের সঙ্গে নেই। খিঁচুনি বন্ধের ওষুধ আনার কথা, ভাবারও কোন কারণ ছিল না। সঙ্গে জ্বরের ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছেলের বয়স কত?'

'পাঁচ।'

আনন্দ ভেতরে ঢুকে ওষুধের বাক্স খুলল। এই সময় জয়িতার গলা পেল সে, 'তুই যাবি?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। একটা চান্স নেওয়া যাক। ওয়ান-থার্ড ট্যাবলেট দিলে কাজ হবে বোধ হয়।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণ কি পালাতে চেয়েছিল?'

আনন্দ বলল, 'ওটা ওকেই জিজ্ঞাসা কর। কেন যে এমন বোকামি করে।' সে ওষুধ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জয়িতা বলল, 'আমি তোর সঙ্গে যাব?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। সুদীপ আর কল্যাণ অন্তত এই মুহূর্তে একা থাকুক আমি চাই না।'

পালদেমের পাশে হাঁটছিল আনন্দ। সেই সময় টিপটিপ বৃষ্টি নামল। আনন্দ বলল, 'তোমরা শেষ পর্যন্ত লোকটাকে মেরে ফেললে? অন্য শাস্তি দেওয়া যেত না?'

'সবাই চাইল। ওর বউ পর্যন্ত বলল এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চায় না।'

আনন্দ রমণীটিকে মনে করল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের ছেলেমেয়ে নেই?'

'না। আমাদের গ্রামে ছেলেমেয়ের সংখ্যা এমনিতেই কম। লোকটার কোন ভাইও নেই যাতে বউটা বিয়ে করতে পারে। এখন ওকে নিয়ে আবার সমস্যা দেখা দেবে।' পালদেম বলল।

'আবার কেন?'

'এর আগে মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আমাদের শত্রুরা। অনেকে বলে ওরও নাকি

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। এসো।'

পালদেমের ঘরে নিচু হয়ে ঢুকল আনন্দ। দুজন রমণী ছেলেটির পাশে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। পালদেম ঢুকেই তাদের ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল ওরা। পালদেম বলল, 'এই আমার ছেলে। ওকে দেখে যদি মনে কর সারাতে পারবে তাহলেই হাত দাও। নইলে ফিরে যেতে পার।'

আনন্দ দেখল বাচ্চাটাকে অনেক কিছু চাপা দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার কাঁপছে। মুখ টকটকে লাল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুখ হলে তোমরা কি কর?'

পালদেম বলল, 'কাছন এসে মন্ত্রপড়া শেকড় দিয়ে যায়। এবার তাতে কমেনি। তা ছাড়া ওর শরীরে পাহাড়ের দানোটা এসে ঢোকার পর থেকে আমি আর কাছনকে ডাকিনি।'

'পাহাড়ের দানো?' হতভম্ব হয়ে গেল আনন্দ।

'নইলে ওর শরীর অমন করবে কেন? গ্রামের লোকজন যদি জানতে পারে তাহলে দানোটাকে মারবার জন্যে ছেলেটাকেই পুঁতে দেবে মাটিতে।'

চাপা সরিয়ে ছেলেটার নগ্ন শরীরে হাত দিতে অবাক হয়ে গেল আনন্দ। প্রচণ্ড উত্তাপ, ঠিক কতটা জ্বর বোঝা যাচ্ছে না। তবে চারের কম তো নয়ই। ঘাড় শক্ত। চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে তার কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হল সঙ্গে অন্তত কিছু ওষুধ আছে, এদের তো তাও নেই। ডায়মন্ডহারবারের গ্রামের শিশুটিরও ঘাড় এমন শক্ত ছিল। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় যদি জল ঢাললে নিমোনিয়া হয়ে যায়? হলে হবে, কিন্তু এ ছাড়া তো সে কোন রাস্তা জানে না। পালদেমকে দিয়ে জল আনিয়ে সে নিজের হাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তাই দিয়ে ছেলেটির শরীরে জল বোলাতে শুরু করল। মিনিট দশেক পরে ওর মনে হল ছেলেটার ঘাড় নরম হচ্ছে, একটু একটু করে খিঁচুনি কমছে, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা চোখ মেলল একবার, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। আনন্দ বুঝল ওর আরাম হচ্ছে। শরীরটা পরিষ্কার করে মুছিয়ে দিয়ে ও ট্যাবলেট তিন টুকরো করল। টুকরোটা গুঁড়ো করে নিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেলেটার মুখে জোর করে ঢেলে দিল সে। ঘরের তিনটে মানুষ চুপচাপ তার কাজ দেখছিল।

পালদেম বলল, 'দানোটা বোধ হয় ওর শরীর থেকে বেরিয়েছে, না?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'তুমি আমার বন্ধুদের বল খেয়ে নিতে। আমাকে এখানে বসে থাকতে হবে, নইলে তোমার দানো আবার ফিরে আসতে পারে।'

পালদেম বলল, 'আমি তোমার খাবার এখানে এনে দিচ্ছি। তুমি উঠো না।'

আনন্দ বাচ্চাটার কপালে হাত রাখল। জ্বর সামান্য কমেছে বলে মনে হল। সে একমনে প্রার্থনা করছিল ওষুধটা যেন জাল না হয়, যেন কাজ দেয়।

॥ ৩৫ ॥

ঠায় সাত ঘণ্টা এক জায়গায় চুপচাপ বসে রইল আনন্দ।

তার চোখের সামনে একটু একটু করে বাচ্চাটা সহজ হচ্ছে, জল এবং ওষুধ যে কাজ করছে তা জানার পর থেকেই এক ধরনের উত্তেজনা যেন নেশার মত পেয়ে বসেছিল তাকে। পরে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। শরীরের লক্ষণ বিচার করে অসুখের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা তা চিকিৎসকদের জন্যে করে গেছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক বুঝে নিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়। মানব শরীরের জটিল জগতের গোলমেলে জায়গাটায় ঠিক ওষুধ পড়লেও যে সব সময় প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হবে এমন ভাবার কারণ নেই। কারণ সব মানুষই এক নিয়মে চলে না। যদি ওষুধে চমৎকার কাজ করে তাহলে সেই মুহূর্তে চিকিৎসক প্রায় ঈশ্বরের সমতুল্য হয়ে যান রোগীর চোখে। আর সাফল্যের আনন্দ তাঁকেও উৎসাহিত করে। কিন্তু যদি ওষুধ মাথা ঠোকে তাহলে তাঁর অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। হাতড়াতে হাতড়াতে কোনরকমে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে তখন। অর্থাৎ মানুষের শরীরের কর্মকাণ্ড চোখের আড়ালে রেখেও প্রখর অনুমান শক্তির সাহায্যে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে একটা দেশের অসুখ সারাবারও চেষ্টা চলেছে। কিন্তু মুশকিল হল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুমান ভুল হয়ে

যাওয়ায় ওষুধ কোন কাজেই লাগে না। বিশেষজ্ঞরা মানুষের মুক্তির যেসব ফর্মুলা তৈরি করে দিয়েছেন তাও ওই শরীরের মতই দেশে দেশে একইভাবে কাজে লাগে না। সেদিন যেভাবে বাচ্চাটার ঘাড় নরম হয়েছিল, একটু একটু করে জ্বর কমেছিল এবং সাত ঘণ্টার পরে সহজ হয়ে হেসেছিল সেইভাবে যদি একটা দেশকে সুস্থ করা যেত!

পালদেম ওর হাত চেপে ধরল। ওর মুখ চোখে কৃতজ্ঞতা। পালদেমের স্ত্রী একটা পোড়াটে মোটা রুটি আর জল এনে সামনে রাখল। খবরটা চারপাশে ছড়িয়েছে। এর আগে পালদেম আস্তানা থেকে আনন্দর অংশের খিচুড়ি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেটা ছোঁয়া হয়নি। এখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করল সে। কাল রাত্রের রুটির অভিজ্ঞতায় ওই ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যাওয়া খিচুড়ি অনেক শ্রেয়। কিন্তু পালদেমের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে রুটি তুলে নিল। সত্যিই অখাদ্য কিন্তু বালির অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চাটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আনন্দ পালদেমের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দিনের চিহ্ন কোথাও নেই। পালদেমদের ঘরে দিনরাত এখন কাঠের আগুন জ্বলছে। কেরোসিনের ব্যবহার এই গ্রামে নেই। কিন্তু লাঠির গায়ে এক ধরনের ছাল শক্ত করে জড়িয়ে সেটাকে মশালের মত ব্যবহার করা হয়।

কনকনে ঠাণ্ডায় আনন্দ আর পালদেম হাঁটছিল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'সেই মেয়েটা কেমন আছে এখন?'

পালদেম জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই মারা যায়নি। তাহলে জানতে পারতাম।'

আনন্দ বলল, 'পালদেম, আমরা যদি এখানে কিছুদিন থাকি তাহলে তোমাদের আপত্তি হবে?'

কথাটা শুনে পালদেম অবাক হয়ে বলল, 'এখানে থাকতে যাবে কেন? এখানে খুব কষ্ট!'

'জানি। কষ্ট পৃথিবীর সব জায়গায় আছে তবে এক এক রকম। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের কাছ থেকে তোমাদের কোন বিপদ আসবে না।'

আনন্দর কথায় কোন জবাব দিল না পালদেম। চুপচাপ তাকে আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল, 'আমার ছেলের জন্যে তুমি যা করেছ তা আমি মনে রাখব।' তারপর চলে গেল।

দরজায় শব্দ করতে সুদীপ সেটা খুলল, 'কেমন আছে?'

'ভাল। কিছু খেতে দিবি? আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' আনন্দ ভেতরে এসে নিজের বিছানায় সেঁধিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করল। সে ঢোকার সময় দেখেছিল এই ঘরেও ওই মশাল জ্বলছে। জয়িতা নেই। কল্যাণ শুয়ে আছে। সুদীপ এসে ডাকতেই আনন্দ চোখ খুলে চমকে উঠল, 'এ কিরে!''

তার সামনে খানিকটা শক্ত খিচুড়ি আর একটা মুরগীর ঠ্যাং, সম্ভবত পোড়ানো। সুদীপ বলল, 'স্মোকড চিকেন। পালদেমের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল মুরগীটা। একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে গেছে গুরু কিন্তু টেস্ট দারুণ। বাপের জন্মে এমন রাঁধব কে ভেবেছিল!'

খাবার শেষ করে তৃপ্ত আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'জয়িতা কোথায়?'

'ও সেই মেয়েটার কাছে গিয়েছে। তোরা দুজন যা আরম্ভ করেছিস!'

'কিন্তু ওখান থেকে এত রাত্রে একা ফিরবে কি করে?'

'বিকেলে আমি গিয়েছিলাম খবর নিতে। বলল, রাত হয়ে গেলে ওখানেই থেকে যাবে। মেয়েটার ঘা আমি দেখেছি। কিস্যু করার নেই। কেন যে ছাই আগ বাড়িয়ে উপকার করতে গেলাম।' সুদীপ ট্রানজিস্টার বের করল।

আনন্দ দেখল কল্যাণ চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে আছে। সকালে ও পালাতে চেয়েছিল। রাগের বদলে ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল আনন্দর। কিন্তু এখন কিছু বলতে যাওয়া মানে সেটা খুব বানানো শোনাবে। হয়তো সেটা ওর ভালও লাগবে না। ঠিক তখনই কিছু বিচিত্র শব্দ বের করার পর অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলায় খবর শুরু হল, 'জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি একযোগে ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারকে আজ হিথরো এয়ারপোর্টে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তাঁর সরকার ব্যাপারটি নজরে রেখেছেন। আমাদের নয়াদিল্লিস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের সংসদে ঘোষণা করেছেন, যে কোন বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে তার সরকার কঠোর হাতে দমান করবেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, গোর্খাল্যাণ্ডের দাবী মানার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে ঘটে যাওয়া

কয়েকটি ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে চারজন বিপথগামী তরুণকে দায়ী করেছেন। এরা এখন ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছে বলে তাঁর কাছে খবর আছে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবার আসুন আপনাদের নিয়ে যাই লন্ডনের বইমেলায়। শব্দটাকে কমিয়ে দিয়ে সুদীপ চিৎকার করল, 'শুনেছিস?'

আনন্দ নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ স্টেশন রে?'

'ভয়েস অফ আমেরিকা অথবা বি বি সি। হ্যাঁ, বি বি সি।'

'যাক, আমরা তাহলে আন্তর্জাতিক সংবাদ হয়ে গেলাম।' আনন্দ আবার চোখ বন্ধ করল।

'তাতে কোন্ স্বর্গ পাওয়া গেল!' আচমকা কল্যাণ কথাগুলো বলে উঠতেই দুজন ওর দিকে মুখ ফেরাল। কল্যাণ বলল, 'ওরা এখন টের পেয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। এটা এমন একটা জায়গা যে পালিয়ে বাঁচার রাস্তা খোলা নেই। এখন ওরা আমাদের গলা টিপে মারবে। উঃ!'

অদ্ভুত শোনাচ্ছিল ওর গলা। আনন্দ উঠে বসল, 'ওরা এখনও জানে না আমরা কোথায় আছি।'

'সেই আনন্দেই থাক। ওয়াংদে নিশ্চয়ই ফিরে গিয়ে সব বলে দিয়েছে। আমি এখন কি করি?'

সুদীপ এবার কথা বলল, 'কাল পালদেমকে বলব তোকে ফালুটের পথে পৌঁছে দেবে।'

'তা তো বলবিই। আমাকে মেরে ফেলতে তোরা চাইবিই।'

'কেন?' আনন্দ বিস্মিত হল। তাদের কেউ এইরকম কথা বলছে ভাবতে পারছে না সে।

'আমি তোদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছি না। আমি ওষুধপত্র জানি না, কোন ফালতু কাজ করতে চাইছি না, আমার জন্যে তোদের খাবার নষ্ট হচ্ছে। সুদীপ আর জয়িতা অবস্থাপন্ন, তুই মধ্যবিত্ত আর আমি বিত্তহীন। আমাকে তোরা পাত্তা দিবি কেন?' শেষের দিকে কল্যাণের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। যেন আর একটু হলেই তার পক্ষে কেঁদে ফেলা অসম্ভব নয়।

সুদীপ বলল, 'তুই মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছিস কল্যাণ। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু ভাবছে না। আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি, আমরা কেউ কারও শত্রু নই। তুই ঘুমিয়ে পড়।'

আনন্দ কোন কথা বলছিল না। তার মনে পড়ল হোস্টেলের একটি ছেলের কথা। ও এসেছিল রায়গঞ্জ থেকে। খুবই গরীব। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কলেজ ছাড়া কোথাও যেত না। দুবেলা হোস্টেলের খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার সামর্থ্য বোধ হয় ছিল না। কিন্তু সব সময় মনে করত অন্যান্য ছেলেরা বোধ হয় তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। মনে মনে ব্যাপারটা বানিয়ে নিয়ে সে ক্রমশ এমন কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করল যে বেচারার পড়াশুনাটাও হল না। এই ছেলেটার সঙ্গে কল্যাণের কথাবার্তা মিলে যাচ্ছে। অক্ষমতা মানুষকে অভিমান দেয় কিন্তু অভিমান কি সব সময় আত্মহননে সাহায্য করে? কিভাবে কল্যাণকে সাহায্য করা যায়?

এই সময় বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়ছিল। ওরা আর কেউ কথা বলছিল না।

আনন্দরই ঘুম ভাঙল প্রথমে। মশালটা নিবে গেছে। ঘর অন্ধকার। শুধু মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ কানে আসছে না। অর্থাৎ বৃষ্টি থেমে গেছে। এই ঠাণ্ডায় শরীর বাইরে বের করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু তলপেটের চাপ বাড়ায় আনন্দকে বেরুতে হল। হাতড়ে হাতড়ে সে দরজার কাছে পৌঁছে গেল। সেটা খুলতেই মনে হল সমস্ত শরীর জমে যাবে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সে ভারমুক্ত হল। তারপর ছুটে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ বিস্ফারিত।

সূর্য উঠছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। সমস্ত চরাচরে অন্ধকারের পাতলা মশারি এখনও টাঙানো। কিন্তু পর্বতশৃঙ্গের (এই শব্দটি ছাড়া আনন্দর ওই মুহূর্তে অন্য কিছু মনে হল না) ওপর সূর্যের আলো পড়েছে। সূর্যটাকে কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শৃঙ্গগুলোয় আলোর খেলা চলেছে মারাত্মকভাবে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই অনেক আগে। এখন শেষ মুহূর্ত, একটু বাদে তিনি প্রকাশিত হবেন। শৃঙ্গগুলো লক্ষ্য করল আনন্দ। ছ্যামলাঙ্গ, বারুণৎসে, নাপট্‌সে, লোৎসে, মাকালু, ছোমালঙ্গ এবং সবার পেছনে মহান উদ্ধত এভারেস্ট। সমস্ত রেঞ্জটা সাদা কমলায় মাখামাখি। আনন্দ চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকল। ওদের উঠতে যত সময় লাগছে তত আলোর রঙ পালটাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সুদীপ এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বলল, 'আঃ!'

আনন্দ দেখল কল্যাণ আসেনি। সে দ্রুত ভেতরে ঢুকল। কল্যাণ জেগেছে কিন্তু এখনও চুপচাপ শুয়ে

আছে। আনন্দ ওর হাত ধরল, 'উঠে পড়। কি দারুণ সূর্যোদয় হচ্ছে!'

'তাতে আমার কি?' নির্লিপ্ত গলায় বলল কল্যাণ।

'সেটা না দেখলে বুঝবি না। আমি তোকে হুকুম করছি উঠতে।'

যেন বাধ্য হল কল্যাণ। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যের মুখ দেখা যেতেই কল্যাণ আচমকা শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সুদীপ এবং আনন্দ চমকে উঠল। নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে চাইছিল কল্যাণ। তারপর যেন একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলল, 'কি অদ্ভুত সুন্দর, না!'

ওরা কেউ জবাব দিল না। যতক্ষণ শৃঙ্গগুলো সাদা না হয়ে যায় ততক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সুদীপ আনন্দকে বলল, 'আমাদের একবার জয়িতার খোঁজ নেওয়া উচিত।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কল্যাণ, তুই সুদীপের সঙ্গে গিয়ে দেখে আয়। আমি চা করছি।'

ওরা চলে গেলে আনন্দ কাঠের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। যতই ঠাণ্ডা বাড়ুক সেটাকে শরীর ঠিক সইয়ে নিতে পারে সময় পেলে। এবং তখনই আনন্দর নজরে পড়ল কাছাকাছি সব উঁচু জায়গা সাদাটে হয়ে গেছে, এমনকি ঘাসের ওপরেও কুচি কুচি বরফ। অর্থাৎ কাল রাত্রের বৃষ্টির পরে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। শীত আসছে। ক্রমশ সমস্ত চরাচর সাদা বরফে ঢেকে যাবে। সময় বেশি নেই, যা করবার এখনই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে, সেটাই প্রশ্ন।

আর তখনই তার নজরে পড়ল দুটো মানুষ এগিয়ে আসছে। ও'দেব হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। একটু কাছাকাছি হতে সে বুঝল দুজনের একজন নারী, পুরুষটিকে সে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। আনন্দ অপেক্ষা করল। হাত দশেক দূরে পৌঁছে ওরা দাঁড়াল। পুরুষটি সোজা হতে পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা বেশ অসুস্থ। নারীটি হাত নেড়ে আনন্দর দিকে তাকিয়ে অনর্গল কিছু বলে পুরষটিকে দেখাল। ওদের পায়ের তলায় ঘাসে কুচি কুচি বরফ অথচ পুরুষটি সেখানেই বসতে চাইছে দেখে আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল বারান্দায় উঠে আসতে। ওরা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বসে পড়ল। এবার আনন্দ বুঝল দুজনেরই বেশ বয়স হয়েছে। সমস্ত শরীর ছেঁড়া গরম কাপড়ের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধ মাথা গুঁজে বসে আছে। মাঝে মাঝে তার শরীর কেঁপে উঠছে। বৃদ্ধা দু'হাত তুলে আনন্দকে অনুনয় করছিল। ভাষা বুঝতে না পারলেও বক্তব্য জানতে অসুবিধে হল না। ফাঁপরে পড়ল আনন্দ। বৃদ্ধের কি হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। বা বুঝলেও কোন্ ওষুধ দেওয়া উচিত এবং তা সঙ্গে নাও থাকতে পারে। সে হাঁটুমুড়ে বসে বৃদ্ধের কপালে হাত রাখল। না, জ্বর নেই কিন্তু শরীর কাঁপছে। এবং তখনই তার গলগণ্ডটি নজরে এল। ওই কারণেই শরীর অসুস্থ কিনা কে জানে? পেটের যন্ত্রণাও হতে পারে, কারণ মাঝে মাঝেই বৃদ্ধের মুখ কুঁচকে যাচ্ছিল। বারংবার কানে ঘষার পর অচেনা শব্দও চেনা হয়ে যায়। আনন্দ বৃদ্ধাকে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধকে শুইয়ে দিতে। তারপর ঘরে ঢুকে ওষুধের বাক্সটার দিকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। নিজেকে ভীষণ নির্বোধ মনে হচ্ছিল। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে যদি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়? চিকিৎসার এক্তিয়ার একমাত্র চিকিৎসকের। কিন্তু এক্ষেত্রে সে কি করতে পারে? বোঝাই যাচ্ছে পালদেমের ছেলের সুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে এরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আনন্দ একটা অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট এনে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে খাইতে দিতে বলল। এমন কি তাকে ট্যাবলেটটাকে কাগজমুক্ত করে জলের ব্যবহারের কথাও বলতে হল।

ওদের ওখানে রেখে সে ভিতরে ঢুকল। কেরোসিন পোড়াতে আর সাহস হচ্ছে না। সে আবার বাইরে বেরিয়ে এসে উনুনটার সামনে কেটলি রাখল। কাঠ নেই। আশেপাশে তাকাল আনন্দ। সুদীপ গতকাল কোথায় কাঠ পেয়েছিল? এই সময় বৃদ্ধা বারান্দা থেকে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। পৃথিবীর সর্বত্র বোধ হয় স্নেহের হাসি একরকম হয়। বৃদ্ধা হাত নেড়ে যা বলল, তার মানেটা বোধ হয় এই রকম, তুমি সরে যাও, যা করার আমিই করছি। কৃতজ্ঞ আনন্দ উঠে এল ওপরে। বৃদ্ধ চুপচাপ শুয়ে আছে। তার চোখ খোলা কিন্তু শরীর কাঁপছে না আগের মত। নিজেকে একটি প্রতারক বলে মনে হচ্ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র না জেনে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করার ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে। হয়তো যা দরকার তার বিপরীত ওষুধ বৃদ্ধকে দেওয়া হল। ও মারা গেলে এখন তাকেই নিমিত্তের ভাগী হতে হবে। সে বৃদ্ধের পাশে বসল। তারপর কপালে হাত রাখল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটল। অজস্র

শিরা ওঠা কাঁপা হাতে বৃদ্ধ আনন্দর হাত ধরল। কে বলে শুধু যৌবনেই উত্তাপ থাকে!

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক বাড়তে লাগল। এখন আকাশ পরিষ্কার। রোদ আছে কিন্তু তার তেজ নেই। ওদের আস্তানার সামনে এখন অন্তত সত্তরজন মানুষ। প্রত্যেকেই অসুস্থ। প্রত্যেকেই ওষুধ চায়। অথচ কেউ কথা বলছে না। এই রকম মূক অসুস্থ মানুষদের মুখোমুখি হয়ে ওরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। জয়িতাকে নিয়ে সুদীপরা ফিরে এসেছিল এর আগে। মেয়েটির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। জয়িতার ধারণা ঘা ওর পাঁজরার ভেতরে চলে গেছে। বড় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই মেয়েটিকে বাঁচানো মুশকিল। ওরা যে ওষুধ দিচ্ছে তাতে ওপরে ওপরে কাজ হচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এই বিকট ঘা নিয়ে মেয়েটি কি করে এতদিন হেঁটে চলে বেড়াতো? সুদীপের যুক্তি হল ওটা অনেকটা ক্যানসারের মত। বেশ আছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, যেই বায়োপসি করা হল, খোঁচানো হল, অমনি দুদ্দাড় করে বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রোগী বিছানায়, যন্ত্রণার শুরু।

ওরা চা খেয়েছে। বৃদ্ধাকেও দিয়েছে। বৃদ্ধ এখন ঘুমাচ্ছে। বৃদ্ধা মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছে তাকে। তার মুখের উদ্বেগ এখন অনেক কমে গেছে। আনন্দর আনা আটা হাতে মেখে সে তালি দিয়ে দিয়ে রুটির আকারে নিয়ে গিয়ে উনুনের ওপর ফেলে দিচ্ছে শেঁকার জন্যে। আর এই সব কাজ বৃদ্ধা করছে আনন্দিত হয়েই। তার পাশে আরও কয়েকটি মেয়ে ভিড় করেছে। তারা অবশ্য সুদীপদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্যসহযোগে হাসছিল। সেই হাসি উঁচুতে উঠলে বৃদ্ধার গলায় ধমক বাজছিল। কিন্তু চারজনের লক্ষ্য ওদিকে ছিল না। এতগুলো মানুষ অসুস্থ হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে অথচ—।

আনন্দ পালদেমকে বলল, 'আমাদের কাছে এত ওষুধ নেই, কি করি বল তো? তাছাড়া প্রত্যেকের এক এক রকম রোগ। সব রোগের কি ওষুধ হবে তাও আমরা জানি না।'

পালদেম বলল, 'আমি ওদের দুবার বলেছি কিন্তু কেউ কথা শুনতে চাইল না। এদের ধারণা তোমরা দেবদূতের মত এখানে এসেছ এবং ওদের সারিয়ে তুলতে পার।'

'মিথ্যে কথা। আমরা চিকিৎসার কিছুই জানি না।' অকপটে বলল আনন্দ।

পালদেম হাসল, 'একথা কেউ শুনবে না। তোমরা আমার ছেলেকে সারিয়েছ।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কিন্তু আমাদের বন্ধু বলছে মেয়েটিকে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হবে না।'

পালদেম চুপ করে গেল। ওর মুখ খুব শক্ত দেখাচ্ছিল। আনন্দ বলল, 'ওর কিছু হলে তো তোমরা আমাদের ছাড়বে না। কেন আর বিপদ বাড়াব বল!'

পালদেম সময় নিল কথা বলতে, 'মেয়েটার মা বলেছে, তোমাদের বন্ধু যা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু মেয়েটার মরণ ঘা হয়েছে। এদের কি বলবে এখন?'

আনন্দ চুপচাপ লোকগুলোকে দেখল। জয়িতা বলল, 'ফালতু এক্সপেরিমেন্ট করে ওদের বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই। লেট দেম সাফার ইন দেয়ার ওন ওয়ে।'

হঠাৎ দ্বিতীয় একটা পথ দেখতে পেল আনন্দ। সে পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কেউ ফালুট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে আমাদের?'

'ফালুট! ফালুটে আমরা কেউ কখনও যাইনি। কেন?'

'রাস্তাটা তো চেনো। তোমরা আমাদের ওই পর্যন্ত পৌঁছে দিলে আমরা চেষ্টা করব দার্জিলিং যেতে। দার্জিলিং-এর কোন ভাল ডাক্তারকে যদি প্রত্যেকটা লোকের অসুখের বর্ণনা দেওয়া যায় তিনি নিশ্চয়ই কোন্ ওষুধ দরকার বলে দেবেন। সেগুলো কিনে ফালুটে ফিরে এলে তোমাদের লোক আবার পথ চিনিয়ে এখানে আসবে। এ কাজের জন্যে বড় জোর সাতদিন সময় লাগতে পারে। কিন্তু লোকগুলোর অসুখে ঠিকঠাক ওষুধ পড়বে।'

আনন্দ উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে পালদেম ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকাল, 'তোমরা কজন যাবে?'

আনন্দ বলল, 'একজন।' সে প্রশ্নটায় সন্দেহের গন্ধ সহজেই পেল।

মাথা নাড়ল পালদেম, 'ঠিক আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল চারজন। চারটে কাগজে আলাদা করে প্রতিটি মানুষকে পালদেমের

সাহায্যে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কি কষ্ট হচ্ছে, রোগের উপসর্গ কি, ব্যথা কোথায়, জ্বর আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগল সব জেনে নিতে। পালদেম তাদের বলে দিল সাতদিন পরে ওষুধ পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ গুঞ্জনের পর তারা ঢালু পথ বেয়ে চলে গেল যে যার ঘরে। এই সময় বৃদ্ধা এসে দাঁড়াল আনন্দর সামনে। বৃদ্ধর দিকে হাত বাড়িয়ে সে অভিমানের সুরে কিছু বলে আনন্দর হাতের কাগজটি দেখাল। হেসে ফেলল আনন্দ। তারপর পালদেমের সাহায্যে বৃদ্ধকেও জেরা করে করে উত্তরগুলো লিখে নিতে বৃদ্ধা খুশী হল।

আজ পালদেম এবং বৃদ্ধা ওদের সঙ্গে খেল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পালদেম বলল, 'সামনের চাঁদের পর এখানে রোজ বরফ পড়বে। তখনই হবে মুশকিল।'

'মুশকিল কেন?' জয়িতা প্রশ্ন করল।

'প্রত্যেক বছর এই সময় ব্যাপারী আসে খচ্চর নিয়ে। এ বছর এখনও এল না ওরা। ওদের কাছেই শীতের জন্যে জিনিসপত্র পাই আমরা।' পালদেম উঠে দাঁড়াল, 'তোমাদের মধ্যে কে যাবে বাইরে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমি।'

'তাহলে এখনই রওনা হও। আমি একটি ছেলেকে দিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। সে অল্প অল্প হিন্দী বলতে পারে। আমার ছেলের অসুখ না হলে আমি নিজেই যেতাম।'

'এখন রওনা হলে ফালুটে পৌঁছাবার অনেক আগেই রাত নামবে না?'

'নামুক। পাহাড়ে রাত কাটানোর জায়গা পাবে। দেরি করে কি লাভ!' পালদেম যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, 'আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে ওকে নিয়ে আসছি।'

সুদীপ এবার কথা বলল, 'দার্জিলিং-এ যাচ্ছিস, কতটা রাস্তা হাঁটতে হবে খেয়ালে আছে?'

'এছাড়া কোন উপায় নেই।' আনন্দ উঠে কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিল। সেই সঙ্গে টেন্টটাও। নিয়ে বলল, 'মানেভঞ্জনের মারোয়াড়ি দোকানদারটা তো আমাকে ছিঁড়ে খাবে টেন্টের জন্যে। দুটোই নিয়ে নিই, কি বল্?'

সুদীপ বলল, 'দুটো টেন্টের দাম আর কত হবে! ওগুলো আমাদের কখন লাগবে ঠিক নেই। তুই বরং দাম দিয়ে দিস।'

সুদীপ আর জয়িতা আর একটা লিস্ট তৈরি করল। যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিস ফেরার সময় আনতে বলল। সুদীপ আনন্দর হাতে পনেরো হাজার টাকা দিল, 'টাকাটা সাবধানে নিয়ে যাবি। একা যাচ্ছিস, সঙ্গে অস্ত্র নেই।'

কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ ওদের লক্ষ্য করছিল। এবার উঠে দাঁড়াল, 'আনন্দ, তোর যাওয়ার দরকার নেই, আমি দার্জিলিং-এ যাব।'

তিনজনেই চমকে উঠল, আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই যাবি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু কি? আমি কোন কাজ করতে পারি না? যা করার তোরাই করবি? চমৎকার! এতটা অপদার্থ ভাবার কোন কারণ নেই। আমিই যাচ্ছি।' কল্যাণ উঠে নিজের জিনিস গুছিয়ে নিল।

সুদীপ বলল, 'কিন্তু কল্যাণ—।'

'না সুদীপ, আমি পালাব না। পালিয়ে যাবই বা কোথায়? এখানকার অসুস্থ মানুষদের জন্যে কিছু করতে পারলে আমার ভাল লাগবে।' সে নিজের হাতটা তুলে ধরল, 'এটা কেটে দে।'

কল্যাণের হাতের প্ল্যাস্টার এখন কালো হয়ে যেন চামড়ার সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের নজরেও পড়ত না আলাদা করে। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে সেটাকে কাটতে অনেক সময় লাগল। নীরক্ত সাদা হাত বেরিয়ে এলে কল্যাণ সেটা ঘুরিয়ে দেখল। কোন কোন জায়গায় ঘা-এর মত হয়ে গেছে। প্ল্যাস্টারটা তুলে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ওটার মধ্যে ছারপোকার বাসা হয়ে গিয়েছে।'

এই সময় পালদেম একটা অল্পবয়সী ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল। বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি যতটা সম্ভব তার সেরা সাজ পরে এসেছে। তার পিঠে একটা কিছু দড়ি দিয়ে বাঁধা। আনন্দ শেষবার চেষ্টা করল, 'কল্যাণ, এখনও ভেবে দ্যাখ।'

'ভাবনার কিছু নেই। তোরা তো আমাকে একটাও বোমা ছুঁড়তে দিলি না। মানুষ না মারতে পারি মানুষ বাঁচাবার কাজে লাগি। আমি সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসব, টাকাটা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাব না, কথা দিচ্ছি—।' কল্যাণকে খুব সিরিয়াস, খুব স্থির মনে হচ্ছিল।

জয়িতা এবার কাছে এগিয়ে এল, 'কল্যাণ, তোর নেচার আমি জানি, তুই এই কষ্ট সহ্য করতে পারবি না। ওটা তোর কাজ নয়।'

'ভাগ।' কল্যাণ জিনিসপত্র তুলে নিচ্ছিল।

জয়িতা বলল, 'তাছাড়া পুলিশ আমাদের জন্যে ওয়েট করছে। ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছিস? তুই একটু চিন্তা করে দ্যাখ।'

'ও! আনন্দ গেলে পুলিশ জামাই আদরে দার্জিলিং-এ খেতে দেবে, না? আসলে তোরা আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিস! আমি তো কথা দিয়েছি, বিশ্বাস কর না!'

অতএব আনন্দ কল্যাণকে সুদীপের টাকাটা দিয়ে দিল। লিস্টগুলোও সে নিয়ে নিল। পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যাচ্ছ না কেন?'

আনন্দ বলল, 'আমাদের এই বন্ধু যাচ্ছে বলে। ছেলেটাকে বলে দাও যেন সন্ধ্যের মধ্যে একটা ভাল আস্তানা খুঁজে নেয়। ও যদি দার্জিলিং পর্যন্ত যায় তাহলে ভাল হয়।'

'না, আমরা কেউ বড় শহরে যাই না। সান্দাকফুর কাছে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছেলেটা অপেক্ষা করবে সাতদিন। আমরা পাহাড়ের মানুষ ঠিক থেকে যেতে পারি পাহাড়ে। তোমার বন্ধুকে বলে দাও যেন সাতদিনের মধ্যে ওই জায়গায় ফিরে আসে।'

নতুন করে বলার কিছু ছিল না। কিছু চাল ডাল আলু সঙ্গে নিল কল্যাণ। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঢালু পথে নামল। ওরাও সঙ্গ নিল। খানিকটা দূরে যাওয়ার পর দেখল গ্রামের অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। ছেলেটির মা এসে গায়ে হাতে হাত বুলিয়ে খানিকটা কথা বলে নিল। জয়িতার মনে হল সবাই জানে কল্যাণ কেন যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চাইছে ওরা নিরাপদে ফিরে আসুক। এই সময় কাহুনকে দেখা গেল দুজন শিষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে। ওদের দাঁড় করিয়ে দু-মিনিট মালা ঘুরিয়ে মন্ত্রপাঠ করে কাহুন সশিষ্য নীরবে ফিরে গেল।

ওরা এগিয়ে চলল সেই জায়গা পর্যন্ত যেখানে এসে প্রথম দিন ওরা গ্রামটাকে দেখতে পেয়েছিল। জয়িতার কেবলই মনে হচ্ছিল কল্যাণের সঙ্গে তার এই শেষ দেখা। শেষ পর্যন্ত সবাই যখন দাঁড়িয়ে পড়ল তখন ওরা দল ছেড়ে এগোল। হঠাৎ জয়িতা একা দৌড়ে কল্যাণের কাছে পৌঁছাল, 'সাবধানে যাস।'

'তুই ভাল থাকিস জয়ী।' কল্যাণ ওর গালে আঙুল রাখল এক মুহূর্ত। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল পাহাড় ভেঙে। কয়েক পলকের মধ্যে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলে জয়িতা আবিষ্কার করল তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল কল্যাণকে রিভলভারটা দিয়ে দিলে হত। কিন্তু সেই সময় একটা উল্লাসের চিৎকার উঠল জনতার মধ্যে।

জনতার থেকে আলাদা একা দাঁড়িয়ে জয়িতা দেখল দূরে সাদা পাহাড়ের পটভূমিতে কয়েকটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। বিন্দুগুলো গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

মানুষগুলো নেমে যাচ্ছে নিচে তাড়াহুড়ো করে। এই গ্রামে যাওয়া আসার পথ তাহলে দুটো। একটা দিয়ে তারা এসেছিল, কল্যাণরাও গেল। দ্বিতীয়টি ওই বিন্দুগুলো ব্যবহার করছে। এখন অবশ্য আর ঠিক বিন্দু নেই। কয়েকটা জন্তু এবং মানুষ যে গ্রামে আসছে বোঝা যাচ্ছিল। আনন্দ চিৎকার করে জয়িতাকে ডাকল, 'এই জয়, চটপট চলে আয়।'

যেদিকে মানুষের দল এগোচ্ছে তার বিপরীত দিকে যাচ্ছিল সুদীপ আর আনন্দ। নেমে আসতে কখনই অসুবিধে হয় না যদি ব্যালেন্স ঠিক রাখা যায়। জয়িতা ওদের ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছিস? কারা আসছে বল্ তো?'

আনন্দ হাঁটছিল এখন। জনতাকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। বলল, 'কেউ না কেউ আসছে, তবে যেই আসুক আমাদের দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবে। এমনও হতে পারে নেপাল সরকারের অনুমতি নিয়ে পুলিশ আসছে আমাদের উদ্দেশ্যে। তাই যতক্ষণ ব্যাপারটা না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ আড়ালে থাকাই উচিত।' ওরা গ্রামের মধ্যে হাঁটছিল।

সুদীপ বলল, 'পুলিশ দেখে এত আনন্দিত পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ হয়নি বলেই জানি। আমার মনে হচ্ছে এরা সেই লোক যারা শীতের আগে এখানে ব্যবসা করতে আসে।'

আনন্দ বলল, 'তাই। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে তো ক্ষতি নেই।'

এই সময় জয়িতার আবার মনে হল আনন্দ কি ভাবে সতর্ক হবে? কোন অস্ত্র সঙ্গে নেই যে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করতে পারবে। একমাত্র তার কাছেই—কিন্তু না, এখনও কিছু বলার দরকার নেই।

আস্তানায় পৌঁছে জয়িতার আবার কল্যাণের কথা মনে পড়ল। আজ ও থাকবে না। দলের সবচেয়ে ভীতু, আশ্রয়খোঁজা দুর্বলচিত্তের ছেলে সবচেয়ে সাহসী হবার জন্যে বেরিয়ে গেল। মানুষ কখনও কখনও এমন বিপরীত আচরণ করে থাকে বলেই তাকে দুর্বোধ্য বলা হয়। কিন্তু জয়িতারও সংশয় আছে কল্যাণ শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ পৌঁছাতে পারবে কিনা। ও যদি ঘুম থেকে কলকাতায় ফিরে যায় তাহলেও যেমন অবাক হওয়ার কিছু নেই, তেমনি মাথা গরম করে মানেভঞ্জনে কোন নাটক করে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই কষ্ট ও সইবে? একা?

সুদীপ বলল, 'আমি আজ মাল খাব, তোদের কারও আপত্তি আছে?'

আনন্দ অবাক হল, 'মাল! মাল কোথায় পাবি?'

সুদীপ হাসল, 'স্টকে আছে। তোরা ভুলে গেছিস।'

জয়িতা মুখ ফেরাল, 'হঠাৎ এত মধুর বাসনা?'

সুদীপ চোখ বড় করল, 'যাচ্চলে! তুই বাংলা বলছিস? কি হল মাইরি! খাবি?'

জয়িতা উত্তর দিল না। সে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে বসে থাকলে আমরা নিরাপদ? কে এল দেখা দরকার। আমি যাচ্ছি, তুই আসবি?'

সুদীপ বলল, 'দেখাদেখিতে আমি নেই, তোরা ঘুরে আয়।'

যতটা সম্ভব আড়াল রেখে ওরা এগোচ্ছিল। আনন্দ বলল, 'জয়ী, আমরা যেন কেমন অলস হয়ে যাচ্ছি। কাজ না করলে যা হয়। সুদীপ কেন মদ খাবে না তার যুক্তি তো আমি পেলাম না।'

তিনটে লোক আর ছটা খচ্চর। জন্তুগুলো মালপত্রের আড়ালে পড়ে গেছে প্রায়। তিনজনের মুখে হাসি। ওদের দেখলে সিকিমিজ কিংবা টিবেটিয়ান বলেই মনে হবে। কারণ নেপালীরা অত লম্বা হয় না, নাকের গড়ন মোটেই চ্যাপটা নয়। গ্রামবাসীরা ওদের স্বাগত জানাচ্ছিল। যে মানুষটির বয়স হয়েছে তাকেই নেতা বলে ভাবতে অসুবিধে হল না। ছোট্ট যে মাঠটি এই গ্রামের মাঝখানে সেখানে চলে এল লোক তিনটে। বৃদ্ধ সবাইকে কুশল জিজ্ঞাসা করছে হাত নেড়ে। অন্তত সেইরকম মনে হল এদের কাণ্ড দেখে। আনন্দ জয়িতাকে বলল, 'গ্রামে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। কে বলবে একটু আগে লোকগুলো ওষুধের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু এই তিনটে লোক আসছে কোত্থেকে?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'দার্জিলিং থেকে। নইলে জিনিসপত্র পাবে কোথায়? সামনে যাবি?'

আনন্দ বলল, 'না। আর একটু অপেক্ষা করা যাক।' এই সময় দেখা গেল কাহুন আসছে তার সাকরেদদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ আর তার দুই সঙ্গী নতজানু হয়ে কাহুনকে শ্রদ্ধা জানাল। ব্যাপারটা কাহুনের খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল মুখ দেখে। এই সময় বৃদ্ধ উঠে গিয়ে বোঁচকা খুলে একটা ঠোঙা খুলে চাল মুঠোয় নিয়ে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক সোৎসাহে সাধুবাদ দিয়ে উঠল যেন।

কয়েকটা কথা বলার পর কাহুন ফিরে গেল। আনন্দ বলল, 'যাক, লোকগুলো পাসপোর্ট পেয়ে গেল। সর্বত্র ঘুষ দেবার এই প্রথাটি রয়েছে। এখন যত ইচ্ছে ব্যবসা করতে পারবে।'

জয়িতা বলল, 'গ্রামে ঢোকার সময় আমাদেরও ভেট দেওয়া বোধহয় উচিত ছিল। যে দেশের যা নিয়ম। আমাদের মেজাজ সব জায়গায় চলবে কেন?'

এই সময় আগন্তুকরা বিশ্রাম শেষ করে কাজ শুরু করল। খচ্চরগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে খুলতে লাগল ওরা। তারপর মোটামুটি দোকান সাজিয়ে ফেলল। একটা জায়গায় প্রচুর জামা প্যান্ট শাড়ি থেকে শুরু করে গরম চাদর কোট সোয়েটার স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আর একটা জায়গায় চাল ডাল নুন থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু রয়েছে। কেনাবেচা শুরু হয়ে গেল। একটা ছাগল দিয়ে শার্ট-প্যান্ট আর শাড়ি পেল একজন। শার্ট-প্যান্টকে খুব নতুন বলে মনে হল না এবং শাড়িটিও বেশ সাধারণ। বিনিময় প্রথায় প্রচণ্ড লাভ করছে ব্যবসায়ীরা। এই দুর্গম অঞ্চলে জিনিসপত্রগুলো অনেক কষ্ট করে ওরা নিয়ে এসেছে এটাই যদি একমাত্র যুক্তি হয় তাহলে ওরা যা ইচ্ছে চাইতেই পারে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায় তা দেখবার জন্য ওরা অপেক্ষা করবে বলে স্থির করল।

হাঁটাব সময় শরীরের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই ঠাণ্ডা কমে যায়। কিন্তু কল্যাণ গরম জামা খোলার কথা চিন্তা করছিল না। প্রাথমিক উদ্যমের পর তার হাঁটার গতি কমে এসেছিল। এখন চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। ঘন কুয়াশারা দলবেঁধে আসা যাওয়া করছে। তার সঙ্গী বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছিল। চড়াই ভাঙতে যেখানে তার জিভ বেরিয়ে আসার উপক্রম সেখানে ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে হেসেছে। ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। ও যে কতটা হিন্দি বোঝে তা ইতিমধ্যে জেনে গেছে কল্যাণ। একটা কথা চারবার বললে তবে যদি ও সেটা আন্দাজ করতে পারে। লক্ষ্যহীন হাঁটায় কোন তাড়াহুড়ো থাকে না? কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হচ্ছে অনেকটা পথ সামনে পড়ে আছে। ফালুটের রাস্তা পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই, কিন্তু তারপরে প্রতি মুহূর্তে পুলিশের চোখ এড়াতে হবে। অবশ্য ওই রাস্তায় পুলিশের থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষের পুলিশের দায় পড়েনি ওই পাণ্ডববর্জিত পথে বারো তেরো হাজার ফুট পায়ে হেঁটে উঠে এসে টহল দেবে।

মুশকিল হল ও যখন বিশ্রামের জন্যে কোথাও বসতে চাইছে তখনই ছেলেটা বিরক্ত হচ্ছে। অনর্গল নিজের ভাষায় কিছু বলে আকাশে হাত তুলে সম্ভবত সূর্য দেখাচ্ছে। একটি শব্দ ওর ঠোঁটে লেগেই আছে, 'জলদি।'

কেন জলদি তা কল্যাণ জানে। ছেলেটা চাইছে অন্ধকার হবার আগেই এমন কোথাও পৌঁছাতে যেখানে রাতের আস্তানা আছে। কিন্তু পাহাড় ভাঙতে যে ইতিমধ্যে তার পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে সেটা প্রকাশ করা যায় না। ওর মনে হল সুদীপরা আরাম করে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তাটাকে বাতিল করল। তাকে দার্জিলিং-এ পৌঁছাতেই হবে। একটি ভাল ডাক্তারের সঙ্গে বসে প্রেসক্রাইব করাতেই হবে। তারপর ওসুধগুলো গ্রামে পৌঁছে দিতেই হবে। এবং এটা না করলে সে বন্ধুদের—না, এটা করার পর সে এমন ভাব করবে যেন কিছুই করেনি। জ্ঞান হবার পর সে জেনেছে অন্য ছেলেমেয়েরা তাদের বাবামায়ের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় তা সে পায়নি। তাকে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করতে হয়েছে। এবং সেটা করতে গিয়ে এতকালের সব চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। অন্যের জন্যে কোন ভাল কাজ করার কথা মাথায় আসেনি অথবা সুযোগও পাওয়া যায়নি। এই প্রথম একা সম্পূর্ণ একা সে ওইরকম একটা কাজ করতে যাচ্ছে। কাজটা শেষ করতেই হবে। অবশ্য এটাও যদি নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতা হয় তাহলেও সে খুশি।

এই পথেই ওরা এসেছিল কিন্তু এখন পথটাকে সে মোটেই চিনতে পারছে না। যদি এই ছেলেটা সঙ্গে না থাকে তাহলে তার পক্ষে গ্রামে ফেরাও অসম্ভব। এবার ছেলেটা ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তার অর্থ,

আপনি যদি এইভাবে হাঁটেন তাহলে আর কখনও ফিরে আসতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অতএব কল্যাণ আবার পা চালাল। তার মনে পড়ল আসার সময় গুহার বাইরে হিংস্র জন্তুদের অস্তিত্ব ছিল। একটাকে গুলি করে মারাও হয়েছিল। এখন তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। তাছাড়া রাত্রে এখানে যে জন্তুর কান্না শুনতে পাওয়া যায় তার দর্শন পাওয়াও অসম্ভব নয়। ছেলেটাকে জোরপায়ে সে অনুসরণ শুরু করল। এখন শুধু অন্ধের মত হেঁটে যাওয়া।

চুপচাপ তিন পেগ ব্র্যান্ডি খেয়ে মেজাজী লাগছিল বেশ। বিলিতি ছবিতে সুদীপ দেখেছে কেউ জল দিয়ে মদ খায় না। তাপল্যাঙে যে ঠাণ্ডা বিলেতে নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি নয়। অতএব সুদীপ বিলিতি কায়দা অনুসরণ করেছিল। ফলে খুব দ্রুত তার মাথায় বিপরীত ঢেউ বইতে শুরু করল। ব্রান্ডির বোতলটা হাতে নিয়ে সে দরজায় এসে দাঁড়াল। সে খুশি হল এই ভেবে যে তার হুঁশ আছে। নইলে ওইটুকু আসতে যে তিনবার পা টলেছে তা টের পেত না। মাতালদের কোন জ্ঞান থাকে না। তিন পেগ ব্রান্ডি খেলে কেউ মাতাল হয় না। অবশ্য সে তো আন্দাজে ঢেলেছে। এই গ্লাসের কতটায় এক পেগ হয় তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন কিন্তু তার যে মনে হচ্ছে তিন পেগ সেটাই যথেষ্ট। আনন্দরা কোথায়? সে চোখ মেলে সামনের উপত্যকায় কাউকে দেখতে পেল না। আবছা মনে পড়ল কেউ এসেছিল এই গ্রামে। তারা কারা? যদি পুলিশ হয় তাহলে এখানে বসে থাকা উচিত নয় এই বোধটুকু মাথায় ঢুকে গেল।

কিন্তু সেইসঙ্গে সুদীপের মনে দুঃখ এল। সে মদ খেয়েছে বলে আনন্দরা তাকে ত্যাগ করে গেল? সে নেশা করে না জেনেও? এত কনজারভেটিভ হবে কেন ওরা? দেশের জন্যে যারা কাজ করে তাদের কেন সন্ন্যাসী হতে হবে? জয়িতাটাও কেন আনন্দর সঙ্গে চলে গেল? দুঃখটা ভারী হয়ে উঠতেই সুদীপের বুক থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তার মনে হল আপাতত কোথাও লুকিয়ে থাকা দরকার।

সুদীপ ধীরে ধীরে নামতে চাইছিল কিন্তু তার পা দ্রুত চলছিল। ঠিক কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না কিন্তু সে গ্রামের উলটো দিকে নেমে যাচ্ছিল। একটা গায়ে চলা পথ পেয়ে সে খুশি হল। তার ডান হাতে এখনও বোতলটা সযত্নে ধরা যদিও সে ও ব্যাপারে সচেতন ছিল না। একসময় খেয়াল হতে সে মুখ ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু আস্তানাটা চোখে পড়ল না। কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে সে খুব সাবধানে এগোচ্ছিল। এবং তখনই জলের শব্দ কানে এল। তার মনে হল সে ভুল শুনছে। এখানে নদী কোথায় যে জলের শব্দ হবে! তিন পেগ ব্র্যান্ডি খেয়েই শেষ পর্যন্ত নেশা হয়ে গেল? অথচ শব্দটা কানে লেগেই আছে। সুদীপ খুব সন্তর্পণে এগোল। এবং গাছপালা ও পাথরের আড়াল শেষ হলে সে জল দেখতে পেল। প্রথমে তার মনে হল এটা মরীচিকা। তারপরেই খেয়াল হল মরীচিকা শুধু মরুভূমিতে দেখা যায়। অতএব ওই যে হাত পনেরো চওড়া তীব্র জলের ধারা নিচে নেমে যাচ্ছে সেটা সত্যি। তার ঝরনা শব্দটা মনে পড়ায় খুশি হল। পাহাড়ি ঝরনার ধারে বসে সুরা হাতে জীবন কাটিয়ে দেবার কথাটা কে যেন বলেছিল? কোন কবি? তার এখানে আসা উচিত। এইখানে।

একটা পাথরে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল সুদীপ। আর তখনই তার মনে পড়ল কল্যাণের মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটা কমে গেল সুদীপের। দার্জিলিং-এ যেতে প্রচণ্ড কষ্ট হবে কল্যাণের। এখন আর জিপ নেই। টানা সাড়ে তিনদিন হাঁটলে তবে দার্জিলিং। অথচ সাতদিনে ফিরে আসবে বলে গেছে। ইম্পসিবল। তোর যাওয়ার কি দরকার ছিল? না, আমি মানুষ মারতে পারিনি বলে মানুষ বাঁচাতে চাই। এটা একদম লোয়ার মিডলক্লাস সেন্টিমেন্ট। হিরো হবার জন্যে একেবারে হেদিয়ে মরছিল শালা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্যাণ ইজ কল্যাণ। ও সঙ্গে থাকলে মাঝে মাঝেই অস্বস্তি আসে, দূরে চলে যাওয়ায় এখন মোটেই স্বস্তি হচ্ছে না। আচ্ছা, কল্যাণ যদি আর না ফিরে আসে? সুদীপের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এবং সেইসঙ্গে তার মনে হল কান্নাটা প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহলে নেশা হয়ে গেছে প্রমাণিত হবে। কিন্তু ওই পালদেম লোকটাকে টাইট দেওয়া দরকার। চুরি করে সমস্ত মাল নিয়ে গিয়েও কেমন দাঁত কেলিয়ে বারংবার আসছে। মালগুলো ফেরত না পেলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। সুদীপ আর একবার বোতলের মুখ খুলল। তারপর বিলিতি ছবির হিরোর মত খানিকটা গলায় ঢালল। এখন আর বুক জ্বলছে না। তবে চোখের সামনে নদীটা মাঝে মাঝেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হল একটু শুয়ে পড়লে কেমন হয়? মাথাটা বড় হালকা লাগছে। সে কোনরকমে পাথরের ওপর শরীর বিছিয়ে দিতেই

আরাম বোধ করল। চোখ বন্ধ করতেই হুট করে চলে গেল কলকাতায়। কেউ একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সন্তর্পণে। তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এবার মুখটা সামান্য ঝুঁকল। সুদীপ হেসে বলল, 'মা, তুমি কেমন আছ?'

যে এসেছিল সে তার ভাষা বুঝতে পারল না। কিন্তু যখন দেখল সুদীপ আর চেতনায় নেই তখন লোভীর মত খপ করে বোতলটা তুলে নিল হাতে। তার লাল গালে আরও রক্ত জমল প্রথম ঢোক পেটে যাওয়ামাত্র।

ব্যাপারীরা আজ রাত্রে এই গ্রামেই থেকে যাবে, ওদের দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। প্রাথমিক কেনাবেচা শেষ হবার পর গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জিনিসপত্র দেখার জন্যে। প্রত্যেকের ইচ্ছে কিছু না কিছু কেনার। প্রয়োজন যে রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে যা দিতে হবে তা দেওয়ার সঙ্গতি সবার নেই। আনন্দরা অনেকক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। পালদেম দাঁড়িয়ে আছে দূরে। সে একটা ছোট জামা কিনেছে মুরগীর বিনিময়ে। সুতীর জামাটার দাম সাত/আট টাকার বেশি হবে না। আনন্দ এবং জয়িতা ঠিক করল ওরা কখনই ওই লোকগুলোর সামনে যাবে না। এরা নিশ্চয়ই কাল চলে যাবে এখান থেকে।

আনন্দ আড়াল থেকে সরে এসে রাস্তায় দাঁড়াতেই একটি বাচ্চাকে দেখতে পেল। ওই হট্টগোলের মধ্যে বাচ্চাটা যাচ্ছে না কিন্তু তার যে যাওয়ার এবং জিনিস কেনার খুব ইচ্ছে তা স্পষ্ট। সে আনন্দকে দেখামাত্র প্রথমে শঙ্কিত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। আনন্দ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর দূরে দাঁড়ানো পালদেমকে দেখিয়ে ডেকে আনতে ইশারা করল। এটা বুঝতে বাচ্চাটার সময় লাগল কিছুটা এবং তারপর দৌড়ে চলে গেল পালদেমের কাছে। আনন্দ দেখল পালদেম বাচ্চাটার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে এদিকে তাকাল। ওখান থেকে সম্ভবত লক্ষ্য করা সহজ ছিল না তাদের অস্তিত্ব। পালদেম উঠে এলে আড়াল দূর হতেই বলল, 'ও তোমরা! কি ব্যাপার?'

আনন্দ বলল, 'এদের কথাই তুমি বলেছিলে বুঝতে পারছি। একটা মুরগি দিয়ে ওই জামা কিনলে? তোমাকে তো ওরা ঠকিয়ে দিল!'

'কি করব! ওরা বলছে জিনিসপত্রের দাম নাকি কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আমার যে ছেলের অসুখ সে বায়না ধরেছে একটা জামার। অথচ কত কিছুর দরকার ছিল, দাম শুনে—।' পালদেম নিঃশ্বাস ফেলল। ওকে খুব করুণ দেখাচ্ছিল, 'দেখি, যাওয়ার সময় যদি দাম কম করে!'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে পার না?'

'টাকা? টাকা কোথায় পাব?'

'কোন্ টাকা এখানে চলে? নেপাল না ভারতের?'

'সব টাকাই এখানে চলে। চ্যাংথাপু ওয়ালাংচাঙে ইন্ডিয়ান টাকাই সবাই নেয়।'

কথাটা শুনে আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা মালপত্র কোথায় কেনে? দার্জিলিং-এ?'

পালদেম বলল, 'না। বর্ডার থেকে কিনে ওরা সব কিছু এনে জমা করে চ্যাঙথাপুতে। তারপর গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতে যায়।'

'ধর, যদি ওদের সব জিনিস বিক্রি হয়ে যায় তাহলে কি আজ ওরা ফিরে যাবে?'

প্রশ্নটা শুনে পালদেম আকাশের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। শুধু শুধু এখানে বসে ওরা কি করবে!'

আনন্দ বলল, 'আমরা এখানে আছি ওরা জেনেছে?'

'না।' পালদেম দ্রুত মাথা নাড়ল।

'বেশ, তাহলে তুমি মিনিট দশেক পরে আমাদের ওখানে চলে এস। দরকারি কাজ আছে।' আনন্দ কথা শেষ করে জয়িতার সঙ্গে পেছন ফিরল।

খানিকটা যাওয়ার পর জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে তোর মাথায় কোন মতলব এসেছে, কি ব্যাপার?'

আনন্দ বলল, 'টাকাটা এখনও সুদীপের, তাই ওর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার। শোন, আমার ইচ্ছে ওই মুরগি ছাগলগুলো ওদের কাছ থেকে প্রথমে কিনে নিই। একটা মুরগির দাম দশ টাকা পড়বে এখানে। ছাগলের দাম জানি না। পালদেমকে বলব ব্যবসায়ীরা বিনিময়ে যা যা পেয়েছে তা খুব দরাদরি করে সব কিনে নিতে। তারপর বাকি যা মাল থাকবে সেগুলো টাকা দিয়ে কিনবে পালদেম। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা শুধু টাকা নিয়ে এখান থেকে ফেরত যাবে, জিনিসগুলো নিয়ে নয়।'

জয়িতা বোঝবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু তা থেকে দুটো সমস্যা তৈরি হবে। প্রথমত, ব্যবসায়ীরা খুব অবাক হবে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায় আছে। কখনও গ্রামের লোক টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কেনে না। ওরা যা এনেছে তার দাম কয়েক হাজার তো হবেই। এত টাকা এই গ্রামের মানুষ কোথায় পেল নিশ্চয়ই জানতে চাইবে ওরা, তাই না?'

আনন্দ বলল, 'জানতে নিশ্চয়ই চাইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়াটা তো এদের ইচ্ছেয়।'

জয়িতা হাসল 'দ্বিতীয় সমস্যা হবে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। আমাদের টাকায় ওগুলো কিনে নেওয়ার পর মুরগি ছাগল এলাচের মালিক কে হবে? ব্যবসায়ীরা যা বিক্রি করতে পারেনি সেই মালপত্র কে ব্যবহার করবে?'

আনন্দ সরল গলায় বলল, 'গ্রামবাসীরা। মুরগি ছাগল কেউ ফেরত পাবে না। ওগুলো এই গ্রামের পশু হিসেবে থাকবে, কোন ব্যক্তিগত মালিকানায় নয়। আর যারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সঙ্গতির অভাবে কিনতে পারেনি তাদের মধ্যে জিনিসগুলো বিলি করে দেওয়া হবে।'

জয়িতা চমকে তাকাল, 'তোর কথায় অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছি আনন্দ।'

আনন্দ এবার উত্তেজিত হল, 'হ্যাঁ। আমি তোর, তোদের সাহায্য চাই। এই গ্রামটার সঙ্গে সভ্য জগতের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। লোকগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কম। দারিদ্রসীমার অনেক নিচে বাস করে। ধর্ম আছে কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা নাগপাশের মত নয়। সবচেয়ে চমৎকার ব্যাপার এদের কেউ শোষণ করছে না, এরা শোষিত হচ্ছে নিজেদের অজ্ঞতার দ্বারাই। অর্থাৎ কেউ হয়তো এদের শোষণ করে কিছু পাওয়া যাবে না জেনেই থাবা বাড়ায়নি। কাহুন নিশ্চয়ই গ্রামের প্রধান তবে তাকে আমার জোতদার বলেও মনে হচ্ছে না। লোকগুলো স্রেফ অভ্যেসে সংস্কার আঁকড়ে ধরে এই গ্রামে পড়ে আছে আধমরা হয়ে। সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ রাজনীতির নোংরা বাতাস পর্যন্ত এদের মানুষ বলে গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃত অর্থে এরাই মাটির ডেলার মত। আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করতে ভালবাসি এবং ভারতবর্ষের মাটিতে যা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না সেই স্বপ্ন এদের নিয়ে দেখতে অসুবিধে নেই। আমার বিশ্বাস, বছর দশেকের মধ্যে এই গ্রামের মানুষদের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পূর্ণ অধিকার দেওয়া সম্ভব। একটা কিছু কাজ করতে চেয়েছিলাম জয়িতা, আর না, এই কাজটাই করি।'

জয়িতা মুখ তুলে তাকাল, 'আমি তৈরি। কিন্তু আমরা কিভাবে তা করব? আজ সমস্ত জিনিস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ওদের লোভ বাড়িয়ে দেওয়া হবে না? ওরা ভাববে আমরা ওদের চিকিৎসার টাকা দেব, জিনিসপত্রের দাম দিয়ে দেব, একটা মামার বাড়ি মার্কা ব্যাপার পেয়ে আরও অলস হয়ে যাবে না?'

আনন্দ বলল, 'অলস হতে দেব না আমরা। কিন্তু এই বরফ পড়ার সময়টা আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ যোগাড় করতে হবে। এই এক বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে দেবে সামনের বছরে। এখনও ওরা আমাদের সন্দেহ করছে, বিশ্বাস উৎপাদন করতে সব সময়ই সময় লাগে।'

আস্তানায় এসে ওরা সুদীপকে পেল না। কিন্তু নাকে মদের গন্ধ এল। বোঝা গেল সুদীপ ওই ঘরে বসে মদ খেয়েছে। ব্যাপারটা আনন্দকে উষ্ণ করছিল কিন্তু জয়িতা তাকে বলল, 'এগুলো এড়িয়ে যা। সব সময় একটা ছেলে বিশেষ করে সুদীপের মত ছেলে একই নিয়মে চলবে তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া তুই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিস এখানে আসার পর থেকেই ওর কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে আগেকার ছটফটে বেপরোয়া ভাবটা ছিল না বললেই চলে। এখানে একদম চুপচাপ বসে থাকাটাও ওর কাছে শাস্তির মত। একটু ব্র্যান্ডি খেলে দোষ কি।'

আনন্দ বলল, 'তুই ওর হয়ে এত কৈফিয়ৎ দিচ্ছিস কেন? আমি নিশ্চয়ই ওর সমস্যা বুঝতে পারছি।

তবু সব কিছু যদি একটা সীমার মধ্যে থাকে তাহলেই ভাল।'

অনেক খরচ হয়েছে কিন্তু এখনও যা সুদীপের কাছে রয়ে গেছে তা পর্যাপ্ত বলে মনে হল ওদের। আজকের ঘটনার পর এই টাকা সাবধানে রাখতে হবে। সেদিন পালদেমের নজরে এটা পড়েনি কিংবা হয়তো পড়লেও নেয়নি। তাই যদি হয় লোকটাকে সৎ বলে মনে করতেই হবে। আনন্দরা সুদীপের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সুদীপের পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত জয়িতা গুনে গুনে হাজার পাঁচেক টাকা বের করল।

কিছুক্ষণ বাদেই পালদেম হাজির হল। প্রস্তাব শুনে সে প্রথমে হতভম্ব। এত টাকা যে এদের কাছে আছে এবং সেটা এইভাবে খরচ হবে তা বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। অবাক গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'এতে তোমাদের কি লাভ?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'তোমার ছেলেকে সারিয়ে আনন্দর কি লাভ হয়েছে?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র পালদেম কেঁদে ফেলল। ওকে বোঝাতে কিছুটা সময় লাগল। ওকে এও বলে দেওয়া হল আগে বিক্রিত মুরগি ছাগল কিনে নেবে দর করে। তারপরে অবিক্রিত জিনিসগুলো। যদি ওই লোকগুলো আরও জিনিস বরফ পড়ার আগে এই গ্রামে নিয়ে আসতে চায় তো আনতে বলবে। কোত্থেকে টাকা পেয়েছ তা জানাবে না পালদেম। আর কিনে নেওয়া মুরগি ছাগল আপাতত তার বাড়িতেই রেখে দেবে।

ব্যবসায়ীরা এমন অবাক বোধ হয় কখনও হয়নি। ওরা ইচ্ছে করেই মুরগি ছাগলের দাম কমিয়ে বলেছিল কেনার সময়। সেই টাকায় এখন বিক্রি করতে বাধ্য হল। ওরা বারংবার জিজ্ঞাসা করছিল কোথায় পালদেম টাকা পেল। প্রশ্নটা গ্রামবাসীদেরও। কিন্তু পালদেম সুন্দর অভিনয় করল। ব্যবসায়ীরা টাকা নিয়ে যত শীগ্‌গির সম্ভব আবার জিনিস নিয়ে আসবে বলে গ্রাম ছাড়ল।

আনন্দরা আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখছিল। হঠাৎ ওরা লক্ষ্য করল সেই বাচ্চাটা যেন ওদের কিছু বলতে চেষ্টা করছে। ওরা তাকাতেই বাচ্চাটা বিপরীত দিকে দৌড়োতে লাগল ইশারা করে। কিছু একটা ঘটেছে এই অনুমানে ওরা ক্রমশ ঢালু পথ দিয়ে বাচ্চাটার পেছন পেছন চলে এল ঝরনাটার কাছে। সেখানেও আরও কয়েকটা বাচ্চা হি হি করে হাসছে। সুদীপ চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে। আর তার পায়ের ওপর মাথা রেখে বেহুঁশ একটি যুবতী। ওদের পাশেই বোতলটা যাতে এক ফোঁটা মদ নেই। আনন্দ যুবতীটিকে চিনতে পারল; যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এ তার স্ত্রী। বাচ্চাগুলো এদের দুজনকে ঘিরে হাততালি দিয়ে নাচছে তখন।

॥ ৩৭ ॥

সুদীপের মাথায় ব্যাপারটা কিছুতেই ঢুকছিল না। সে মদ খেয়েছিল ঠিক, মদ খেয়ে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়েও ছিল কিন্তু ওই মেয়েটা কি করে তার পায়ের ওপর এসে পড়েছিল? কখন ঘটেছিল ব্যাপারটা? মদের বোতলটা মেয়েটা পেল কি করে? সেই সঙ্গে তার খুব আফসোসও হচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই পুরো বোতল খেতে পারে না। ওটায় যা ছিল তা মেয়েটা যদি শেষ করে না দিত তাহলে আর এক দিন—। এই পর্যন্ত ভাবার পর সুদীপের মনে হয়েছিল মদ ততক্ষণই খাওয়া উচিত যতক্ষণ জ্ঞান ঠিক থাকে। তাহলে শীতবোধ থাকে না, বরং এক ধরনের মজা পাওয়া যায়।

বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে। এখনও মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। এটাকেই বোধ হয় হ্যাংওভার বলে। সে দেখল জয়িতা আর একটা বাচ্চা—মুরগিগুলোকে খাওয়াচ্ছে। শুধু মুরগি নয়, ছাগলও আছে। এদের চেহারা সমতলের মত নয়। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সে জয়িতার দিকে তাকাল। আজ সকালে ঝড় বইয়ে দিয়েছে জয়িতা। অবনী তালুকদার তাকে ওইভাবে শাসন করার সাহস পায়নি কখনও। মেয়েরা গালাগালি ব্যবহার না করেও কি করে কলজেচেরা শব্দ ছুঁড়তে পারে কে জানে? গতকাল যদি এই গ্রামের মানুষ তাকে পুঁতে ফেলত তাহলে কিছু বলার ছিল না। সে নাকি এই

মানুষগুলোর কাছে তাদের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। যারা দেশের বস্তাপচা সিস্টেমের প্রতিবাদ করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল তাদের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে একটা মেয়েকে নিয়ে, ভাবা যায়? যেহেতু তাদের পোশাক ঠিক ছিল এবং মদ খাওয়া নিয়ে এদের কোন নাক কোঁচকানো ব্যাপার নেই তাই এযাত্রায় রক্ষে পেয়েছে সুদীপ। কিন্তু মেয়েটা যদি কল্যাণ ফেরার আগেই মারা যায় তো এসবই ওরা ব্যবহার করবে। জয়িতা সমানে বকে গিয়েছিল। মানুষের রুচি এত নিচে নেমে যায় কি করে? যেখানে ওরা চেষ্টা করছে একটা কিছু করার সেখানে সে মদ খাওয়া পছন্দ করল? ওই মেয়েটাকে জুটিয়ে? এই সুদীপকে তো সে কখনও জানত না। মেয়েদের সম্পর্কে এই দুর্বলতা তার মনে লুকিয়ে ছিল? এই শব্দবর্ষণ চুপচাপ শুনে গিয়েছিল সুদীপ। সে লক্ষ্য করেছিল আনন্দ তাকে কোন কথা বলেনি। একটু আগে পালদেমের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অল্প কথায় জানিয়ে গিয়েছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কি ভাবে সমস্ত জিনিসপত্র ওরা কিনে নিয়েছে। এই ছাগল মুরগি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র এখন তাদের সম্পত্তি যা এই গ্রামের মানুষদের কাজে লাগবে।

এখন সকাল। কিন্তু রোদ ওঠেনি। তবে শীত বাড়ছে। পা ছড়িয়ে বসেছিল সুদীপ। সকালে ওর ভাগ্যে চা জুটেছে। একনাগাড়ে কথা শুনিয়েও জয়িতা তাকে চা খাইয়েছে। সে দেখল জয়িতা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে। অথচ দুজন দুজনের ভাষা স্পষ্ট বুঝছে না কিন্তু বলার চেষ্টায় খামতি নেই। জয়িতাকে মেয়ে বলে কোনদিনই মনে হয়নি তার। এখানে আসার পর কারোরই তো স্নান করা হয়নি। ফলে জয়িতার চেহারায় মেয়েদের বাকি কোমলতাটুকুও উধাও। ও শালা তো উলটোপালটা বলবেই। যেন বিবেকের কাজ করে মাঝে মাঝে। পৃথিবীতে যারা বিপ্লবের জন্যে জীবন দিয়েছে তারা কি কখনও মদ খায়নি? হ্যাঁ, মদ খেয়ে হুঁশ হারানোটা অবশ্য অন্যায় হয়ে গিয়েছে কিন্তু মদ খাওয়াটা যে অন্যায় এটা সে মানতে পারে না। এবং তখনই তার মেয়েটার কথা মনে পড়ল। সে মেয়েটাকে দ্যাখেনি। তাকে যখন ওরা এখানে তুলে এনেছিল তখন তার জ্ঞান ছিল না। সে নিশ্চিত যে জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটা তার কাছে আসেনি। তাজ্জব ব্যাপার! জয়িতাকে বোঝানো যাবে না যে মেয়েটা নিশ্চয়ই তক্কে তক্কে ছিল। সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে দেখে বোতলটা হাতিয়েছিল। কিন্তু একেবারে তার গায়ের ওপরে পড়বে কে ভেবেছে? আচ্ছা, মেয়েটাকে দেখতে কেমন? খুব হিম্মতওয়ালী বলে মনে হচ্ছে। সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে দেখতে। গ্রামের লোকেরা নিশ্চয়ই মেয়েটাকে কোন শাস্তি দেয়নি। দিলে জয়িতা বলত। সে ইচ্ছেটা চেপে বাখতে পারল না। বসে বসেই ডাকল, 'এই জয়িতা, শোন!'

জয়িতা একটু থমকে গেল। তারপর আবার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

সুদীপ বিরক্ত হল, 'কি রে, শুনতে পাচ্ছিস না?'

জয়িতা আবার কথা থামাল, 'আগে তোর খোঁয়াড়ি ভাঙুক তারপর কথা বলিস।'

'আমি এখন ঠিক হয়ে গিয়েছি। ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারছিস না?'

'কি বলতে চাইছিস?'

'মেয়েটা কেমন দেখতে রে?'

'মানে?' জয়িতার গলার স্বর চড়ায় উঠল। ওর চোখ ছোট হয়ে এল।

'বাঃ, একটা মেয়ে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে রইল আর আমি তাকে দেখব না?'

'পালদেমকে জিজ্ঞাসা কর, ও তোকে চিনিয়ে দেবে। সুদীপ, তুই কি চাস?'

'কি চাস মানে?'

'তুই এখানে প্যারাডাইসের বিকল্প জীবন খুঁজছিস?'

সুদীপ কোন উত্তর দিল না। সে উঠে নিচে নেমে এল। মাথার ভেতরটা এখনও দপদপ করছে। আর এক কাপ চা পেলে হত। কিন্তু নিজে বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে না। সে কোমরে হাত রেখে জন্তুগুলোকে দেখল। মালিকানা বদল হয়েছে কিন্তু ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক আমরা আমাদের মত আছি এমন ভাব। গতকালই খুঁটি পুঁতে কিছুটা জায়গা ঘিরে ওদের আটকে রেখেছে আনন্দ। মাথার উপরে খুবই পলকা ছাউনি। মুরগিগুলোর জন্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা। সারারাত এই ঠাণ্ডায় কাটিয়েও ওরা মরে যায়নি। আজ একটাকে কাটলে কিরকম হয়? এই সময় বুক চিতিয়ে বসা একটা মুরগি কোঁক কোঁক করে ডেকে উঠতেই বাচ্চা মেয়েটা চঞ্চল হল। তারপর চটপট ঘেরার মধ্যে

ঢুকে যেতেই মুরগিটা অত্যন্ত আপত্তি জানিয়ে সরে দাঁড়াল। খপ করে মাটি থেকে একটা ডিম তুলে ছুটে ফিরে এল মেয়েটা। এনে হাত খুলে জয়িতাকে দেখাল। জয়িতা হাতে তুলে ডিমটাকে দেখল। সুদীপ এই প্রথম চোখের সামনে মুরগির ডিমপাড়া দেখল। সে খুব সিরিয়াস গলায় বলল, 'ডিমটা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বল্। তাহলে আমরা আর একটা মুরগি পাব।'

কথাটা শুনে জয়িতা বাচ্চাটার কাঁধে হাত বুলিয়ে ডিমটা ফিরিয়ে দিয়ে ইশারায় জানাল সে ওটা নিয়ে যেতে পারে।

সুদীপ হাঁটছিল। ওই মুহূর্তেই সে জয়িতার সামনে থেকে সরে এসেছে। এখন যা বলবে জয়িতা ঠিক তার উলটোটা করবে। একা একা হাঁটতে তার রোক চেপে যাচ্ছিল। সে কোন অন্যায় করেনি। খামোখা এরা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ ঢালু পথ বেয়ে সেই ঝরনার কাছে পৌঁছে গেল। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে তার আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল। সে এই ঝরনা দেখেছিল। মেয়েটা তাহলে এখানেই কোথাও লুকিয়েছিল। সে ভাল করে তাকাল। একটা মেয়ে কেন খামোখা এখানে লুকিয়ে থাকতে যাবে? হয়তো কোন কাজে সে এখানে এসেছিল। আজও যদি কোন কাজ, সেই কাজটাই পড়ে যায়! কোন ভিত্তি নেই কিন্তু সুদীপের মনে হল অপেক্ষা করলে মেয়েটার দেখা পাওয়া যাবে। সে পাথরটার আড়ালে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠিক পায়ের সামনে দিয়ে স্রোত নামছে নিচে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে জল ছিটকে উঠছে ওপরে। সুদীপ হাত বাড়িয়ে জল স্পর্শ করল। যতটা ঠাণ্ডা বলে ভেবেছিল ততটা নয়। সে মুখে চোখে ঘাড়ে জল বোলাতে বেশ আরাম লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল একইভাবে। শুধু জলের শব্দ, কোন পাখির গলাও নেই। ঠাণ্ডায় বোধহয় পাখিরাও ডাকে না। আর এই নিস্তব্ধতায় সুদীপের চোখ বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সেই সময় যেন পাতা মাড়ানোর অথবা মানুষের কথা বলার আওয়াজ তার কানে প্রবেশ করল। খুব চাপা গলায় কেউ কথা বলছে। যেন সতর্ক করে দিচ্ছে একে অন্যকে। সুদীপ চোখ খুলে চারপাশে তাকাল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কাছাকাছি মানুষ আছে। সুদীপ আরও কিছুক্ষণ স্থির বসে রইল। যারা কথা বলছে তারা নিশ্চয়ই সামনে আসবে।

কিন্তু তারপরেই সব চুপচাপ। একমাত্র জলের শব্দ কানে। সুদীপ উঠল। পাথরের আড়ালে আড়ালে কিছুটা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। একটা লোক ঝরনার ওপাশে নিজেকে যতটা সম্ভব লুকিয়ে রেখে ওপরদিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ দেখার পর মুখ ফিরিয়ে নিচে কাউকে কিছু বলল। তারপর আবার মুখ তুলতেই সুদীপের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

একটু হতভম্ব ভাব, তারপরেই ঝট করে আড়ালে চলে গেল মূর্তিটা। এবং সেইসঙ্গে দ্রুত পায়ের আওয়াজ ওপাশের পাহাড়ে মিলিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি খুব সন্দেহজনক। চেহারাতেও বিশেষত্ব আছে। সরু দুটো গোঁফ মুখের দু'পাশে অনেকটা ঝুলে আছে। সুদীপের ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে অনুসরণ করে। কিন্তু ঝরনাটা পার হবার কথা চিন্তা করে সে থমকে গেল। তাছাড়া ওই লোকটা একা ছিল না। একা একা পাগল কিংবা প্রেমে পড়া মহিলা ছাড়া কেউ কথা বলে না। এই অবস্থায় ঝরনা পার হতে পারলেও অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিন্তু ওরা কারা? এই গ্রামের কেউ লুকিয়ে দেখবে কেন? তাকে দেখামাত্র পালাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া এই ক'দিনে গ্রামের যত মানুষ দেখেছে তাদের কারও অমন ছুঁচলো ঝোলা গোঁফ চোখে পড়েনি। ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক।

সুদীপ ধীরে ধীরে গ্রামে উঠে এল। এখন হেঁটে গেলে গ্রামের মানুষ আগের মত অবাক হয়ে তাকায় না। কিন্তু তাদের দেখার মধ্যে যে কৌতূহল নেই তাও বলা যায় না। সুদীপকে দেখে বাচ্চা ছেলে আঙুল তুলে দূরের একটা বাড়ি দেখাল। খানিকটা যেতেই সে আনন্দ আর পালদেমকে দেখতে পেল। আনন্দর মুখ গম্ভীর। পালদেমও অন্যদিকে তাকিয়ে। এই সময় কাহুন ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পালদেমকে কিছু বলতেই সে মাথা নাড়ল নিঃশব্দে। সুদীপ সামনে দাঁড়াতেই আনন্দ মুখ তুলে ওকে দেখল, 'মেয়েটাকে আর বাঁচানো গেল না। মনে হচ্ছে লাস্ট স্টেজ। আমি খুব ভুল করেছি।'

'কি ভুল?' সুদীপ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'ওকে প্রথম দিনেই এদের দিয়ে দার্জিলিং-এ পাঠানো উচিত ছিল। এই ক'দিনে তো পৌঁছে যেত।

হসপিটাল ট্রিটমেন্ট পেলে হয়তো বেঁচে যেত।'

'ওরা দার্জিলিঙে যেত না। এই গ্রামে মৃত্যু নিশ্চয়ই নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু যারা কখনই গ্রামের বাইরে যায়নি তাদের দার্জিলিঙে অসুস্থকে নিয়ে যাওয়া সংস্কারে আটকাবে।' কথাটা বলে সুদীপ দরজার দিকে তাকাল। সেখানে মোটামুটি ছোট ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল মেয়েটির মা। এবার তার চোখ পড়ল সুদীপেব ওপর। পড়ামাত্র তার চোখ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাশে রাখা একটা মোটা ডাল তুলে তীব্র চিৎকার করে সে ছুটে এল সামনে। কিছু বোঝার আগে সে আঘাত করল সুদীপকে। একটা হাত তুলে কোনরকমে ডালটা ধরলেও সুদীপের মনে হল তার আঙুলগুলো বোধহয় ভেঙে গেল। পাগলের মত মহিলা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খালিহাতে সুদীপের ওপর। সেইসঙ্গে চিৎকার আর কান্না চলছিল। পালদেমরা ওকে জোর করে সরিয়ে না নিলে কি হত বলা যায় না। কারণ সুদীপ এতটা হকচকিয়ে গিয়েছিল যে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শোক থেকে জন্ম নেওয়া ক্রোধ মহিলার শরীরে হাতির শক্তি এনে দিয়েছিল। সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল আশেপাশের বেশির ভাগ মানুষের সহানুভূতি রমণীটি পাচ্ছে। অতএব পালটা আঘাত করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে। রমণীটিকে ওরা যখন খানিকটা দূরে নিয়ে গেল তখন তার বিলাপ শুরু হল। ভাষা বুঝতে না পারলেও মেয়েটির চলে যাওয়ার সম্ভাবনার জন্যে তাকে দায়ী করা হচ্ছে অনুমান করল সে। এখন রাগ করে কোন লাভ নেই। সুদীপ নিজের মুখে হাত দিল। প্রচণ্ড জ্বলছে। এবং সেইসঙ্গে সে কয়েক ফোঁটা রক্ত আঙুলে উঠে আসতে দেখল। এবার পালদেম এগিয়ে এল, 'মেয়েটা হয়তো এমনিতেই মরত কিন্তু বেঁচে থাকত। তবে যতক্ষণ না ওর প্রাণ বের হচ্ছে ততক্ষণ কিছু করার নেই। কাহুন এখন প্রার্থনা করবেন ওর জন্যে।'

কিন্তু সুদীপের মনে হল পালদেম বলছে এখন নিজেদের জন্যে প্রার্থনা কর। মেয়েটি মরে গেলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে যে হুমকি দেওয়া হয়েছে তা এখনও প্রত্যাহার করেনি ওরা। সে আনন্দর দিকে তাকাল। আনন্দ কোন কথা বলছে না। তাকে যে আক্রমণ করল রমণীটি তা দেখেও আনন্দ এক চুলও নড়েনি।

এই সময় কাহুনের দুই শিষ্য ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাত্রা শুরু করল। কাহুনের পিছু পিছু সমবেত জনতা উঠে যাচ্ছিল মন্দিরের দিকে। সুদীপ অবাক হয়ে দেখল আনন্দ ওদের সঙ্গ নিয়েছে। গম্ভীর মুখে পালদেমের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমশ ভিড় সরে গেল। সুদীপ দেখল রমণীটি তখন ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। সে কিছু না ভেবে এগিয়ে গিয়ে হিন্দিতে বলার চেষ্টা করল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, আমি আপনার মেয়ের উপকার করতে চেয়েছিলাম।'

রমণীটি চোখ তুলল। যেন সে সুদীপকে দেখল না, দেখতে পেল না। তারপর আবার মুখ নামিয়ে নিল। সুদীপ আর দাঁড়াল না। নিজেকে হঠাৎ খুব ফালতু বলে মনে হচ্ছিল তার।

দার্জিলিং শহরের বাসস্ট্যান্ডে যখন কল্যাণ নামল তখন তাকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারত পুরো হিমালয়টা হেঁটে এসেছে। রিম্বিকের নিচে বাসে ওঠার পর থেকে সে ঘুমিয়েছে আর এই ঘুম তার ঘোর আরও বাড়িয়েছে। তাপল্যাঙ থেকে ফালুট, ফালুট থেকে সান্দাকফু হয়ে বিকেভঞ্জন পর্যন্ত হেঁটে আসার সময় অনেকবার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল ওর। কুঁচকি পর্যন্ত পা ফুলে ঢোল, শরীরে আর রক্ত নেই, দুটো রাত পাহাড়ের খাঁজে হিমে জমে থাকা। তারপর বিকেভঞ্জন থেকে ঢালু পাহাড়ী জঙ্গল দিয়ে একা একা প্রায় গড়িয়ে রিম্বিকে চলে আসা। যা হিসেব ছিল তার চেয়ে একটা দিন বেশি লাগল কিন্তু কল্যাণের মনে হল সে ছিবড়ে হয়ে গিয়েছে।

নিচুমানের একটা হোটেলে পেটভর্তি ভাত খেয়ে সে সারা দুপুর ঘুমল। বিকেলে যখন তার হুঁশ ফিরল তখন সমস্ত শরীরে বেদনা। বিছানা ছাড়ার বিন্দুমাত্র বাসনা হচ্ছিল না। কল্যাণের মনে হল এইভাবেই যদি সারাজীবন শুয়ে থাকা যেত। ছেলেটা যেমন বলা হয়েছিল, সান্দাকফুর কাছেই রয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ওই রকম একটা জায়গায় কি করে একটা মানুষ কাটাতে পারে তা তখন খেয়াল হয়নি, এখন মনে হল তাকে যদি কয়েক লক্ষ টাকাও দেওয়া হয় সে থাকত না। ওরকম বীভৎস ঠাণ্ডা সে কখনও কল্পনা করেনি। তাই ওকে ছেড়ে আসার সময় সে আনন্দর নির্দেশ অমান্য করেছে। টেন্ট এবং

খাবারদাবারের সবটাই দিয়ে এসেছে ছেলেটাকে। ছেলেটা কৃতজ্ঞ হয়েছে কিন্তু সে নিজে বেঁচেছে। যেখানে নিজের শরীরের ওজনই শত্রুতা করছিল সেখানে ওই বোঝা বইবার কোন ক্ষমতা আর অবশিষ্ট ছিল না। অনেকগুলো আতঙ্ক ছিল অবশ্য কিন্তু তখন মনে হয়েছিল ছেলেটাকে না দিয়ে দিলে মাঝপথে তাকেই ওসব ফেলে যেতে হত। সান্দাকফু থেকে রিম্বিকে পৌঁছতে পুরো দিন লেগে গিয়েছিল। ওই সময় কিছুই খায়নি সে খাবার না থাকায়। যদি পথ ভুল হত, যদি রিম্বিকের ইয়ুথ হোস্টেলে জায়গা না পাওয়া যেত তাহলে আর দার্জিলিং-এ জীবনে পৌঁছানো যেত না। দু'নম্বর ঝামেলা ছিল মানেভঞ্জনের সেই ব্যবসায়ীকে নিয়ে যে তাদের টেন্ট ভাড়া দিয়েছিল। ওয়াংদের কাছে খবর পেয়ে লোকটা নিশ্চয়ই ওৎ পেতে আছে। ফালুটের রাস্তায় ওঠার পর থেকেই সে অবশ্য আশঙ্কা করেছিল যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় পুলিশকে দেখতে পাবে। ওরকম নির্জন সরু পাহাড়ি পথে পুলিশের সামনে পড়লে দুটো হাত আকাশে তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ কিছুই হল না। একটা লোকও তাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। রিম্বিকের ফরেস্ট অফিসার তাকে ট্রেকার বলেই ভেবেছেন এবং মিনিবাসটা যখন মানেভঞ্জনে থামল তখন পেছনের সিটে বসে কল্যাণ চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে বসেছিল। অনেক লোক নামল উঠল, ব্যবসায়ী গাড়িতে তল্লাস করতে উঠেছিল কিনা জানা নেই কিন্তু কেউ তাকে টেনে নামায়নি।

আজ হোটেলের ঠাণ্ডা জলেই স্নান করেছে কল্যাণ এবং তখন নিজেকে দেখে সে আঁতকে উঠেছে। সমস্ত শরীরে গুঁড়ি গুঁড়ি অ্যালার্জি, পায়ে ফোস্কা, চুলে এত আঠা যে আঙুল পর্যন্ত ভাল করে ঢুকছে না। কম্বলের তলায় শুয়ে কল্যাণের মনে হল এখন পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ আরাম করছে, প্রত্যেকে সামান্য সুখের জন্যে একটুও স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয় যেখানে সেখানে মূর্খের মত এইভাবে কষ্ট যন্ত্রণা সংগ্রহ করার কোন মানে হয় না। এবং তখনই তার মনে হল সে নিজে মূর্খদের সেরা। কি দরকার ছিল ডাঁট দেখিয়ে আগ বাড়িয়ে দার্জিলিং-এ আসার জেদ ধরার? আনন্দ আসছিল, আসত। আর এসে হাড়ে হাড়ে বুঝত। নিজেকে হিরো প্রমাণ করতে গিয়ে এখন মাশুল দিতে হচ্ছে। মাশুলই, না হলে এখন বিছানা ছাড়তে এত কষ্ট হবে কেন? তাছাড়া শরীরের ব্যথার সঙ্গে মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

কল্যাণ চোখ বন্ধ করতেই সুদীপকে দেখতে পেল। ওখানে একটাই কষ্ট, খাবারের। কিন্তু ওছাড়া সুদীপ নিশ্চয়ই বেশ আরামে আছে। আচ্ছা, জয়িতাটা শেষ মুহূর্তে অমন ছুটে এল কেন? জয়িতার ভাব বেশি সুদীপের সঙ্গে। কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল তাকে যেন কিছু বলতে চেয়েছিল। সাত দিন—সাত দিনে ফিরতে বলা হয়েছে তাকে। অসম্ভব। এবং ফেরার কথা মনে হতেই সে স্থির হয়ে গেল। ওই পথে অত ঠাণ্ডায় এবং সভ্যতাবর্জিত পর্বতে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বিছানার এই আরাম ছেড়ে? কেন? কল্যাণের মনে তীব্র অনিচ্ছা জন্মাল। সাতদিনের চারটে দিন শেষ হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো যাবে না। এমনও হতে পারে সেই মেয়েটি মারা গেছে, সাত দিনের মধ্যে সে ওষুধ নিয়ে না ফেরায়। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী ওদের মেরে ফেলেছে। আর এই অবস্থায় সে যদি ফিরে যায় তাহলে জ্বলন্ত কড়াই-এ পা বাড়ানো। জেনেশুনে কেউ ফাঁদে পড়ে!

আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকার পরে কল্যাণ আবিষ্কার করল তার ঘুম আসছে না। অথচ ক্লান্তি চেপে বসেছে সমস্ত শরীরে। যতক্ষণ হেঁটেছে ততক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, এখন আরাম পাওয়ামাত্র সবকিছু বিকল হতে বসেছে। নিজের জন্যেই কিছু ওষুধ দরকার। কোনমতে উঠে বসল সে।

বাস থেকে নেমে দালালের সঙ্গে এই হোটেলে আসার সময় থানার সামনে দিয়ে আসতে হয়েছিল। কয়েকটা অস্ত্রধারী সেপাই দাঁড়িয়েও ছিল সেখানে। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি তাকে। এখন কি দার্জিলিং শহরে তাদের খোঁজ চলছে না? একটা খবরের কাগজ পেলে হত। আসবার সময় পথে একটা ওষুধের দোকান চোখে পড়েছিল। কোনরকমে পোশাক পরে দরজায় তালা দিয়ে কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে বের হল কল্যাণ। অনেকদিন বাদে চটি পরায় মনে হচ্ছে ফুলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের ফোসকাগুলো অবশ্য জানান দিচ্ছে। সে বাইরের ঘরে আসতে একটা গলা শুনতে পেল, 'খুব ঘুম হল ভাস্করবাবু।' সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। এবার ডাকটা জোরে এল, 'ও ভাস্করবাবু!'

এবং তখনই কল্যাণের মনে পড়ল হোটেলেব খাতায় সে ওই নামটা লিখিয়েছে। অতএব ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে হাসতে হল, 'ওহো বলুন।'

'কি ভাবছিলেন মশাই?' ম্যানেজার চশমার ফাঁকে তাকালেন।

'না, শরীরটা খারাপ। একটা কিছু ওষুধ কিনব বলে বেরিয়েছি।'
'দার্জিলিং-এ এসে শরীর খারাপ করে ফেললেন! খুব হেঁটেছেন?'
'অ্যাঁ!' কল্যাণ চমকে উঠল।
'আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি ট্রেক করে এলেন। কোন্‌দিকে? সান্দাকফু?'
'হ্যাঁ।' কল্যাণ আর কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।
'ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন কেন? আমার এখানে চুরিচামারি হয় না মশাই।'
'কাঁধে ব্যাগ বওয়া আমার অনেকদিনের অভ্যেস।'

'অ। কিন্তু অমন আলপটকা ওষুধ খাচ্ছেন কেন? একজন ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রাইব করিয়ে নিন। আজকাল সবাই যেন ডাক্তার হয়ে গেছে। বিদেশবিভুঁই-এ বড় অসুখ বাধানোর কোন মানে আছে? সোজা বেরিয়ে হলুদ একটা বাড়ি দেখতে পাবেন। সেটা ছাড়িয়ে ডান হাতে হরেকৃষ্ণ ডাক্তারের চেম্বার। আমার কথা বলবেন, যত্ন করে দেখবে।'

অতএব কল্যাণ বেরিয়ে এল, এখনও দার্জিলিং-এ সন্ধ্যে হয়নি। রাস্তায় কিছু পর্যটকের আনাগোনা। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কল্যাণের। কিন্তু পা বাড়িয়ে ক্রমশ ভাল লাগা শুরু হল। জিপের হেলপার চিৎকার করে আগামী কাল টাইগার হিলে যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে। দার্জিলিং-এর ওপরে মেঘ নেই, ফলে পাহাড়গুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। শহরটাকে ছবির মত মনে হচ্ছে। সে এই প্রথম দার্লিলিং-এ এল। শহরটাকে ঘুরে দেখার লোভ হচ্ছিল তার। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে। আর কিছু না হোক প্রচুর টাকা আছে তার কাছে। আচ্ছা, এখন যদি কোন বাস ধরে সোজা নিউ জলপাইগুড়িতে চলে যাওয়া যায়! তার পরে ট্রেন ধরে কলকাতা। যাওয়ামাত্র কি তাকে অ্যারেস্ট করবে? কলকাতার বদলে যদি কানপুরে যাওয়া যায়? সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে বেশ কিছুদিন সময় পাওয়া যাবে একটা চাকরি খুঁজে পাওয়ার। কথাটা মাথায় আসামাত্র স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। জীবন মানে যদি এই তাহলে তো সেটা কলকাতায় বসেই পাওয়া যেত। কোন প্রয়োজন ছিল না এত ঝামেলা তৈরি করার।

হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ কল্যাণের মনে একটা জেদ চেপে বসছিল। কিছুই হবে না তার। কেউ তাকে ধরবে না। পুলিশ জানে তারা নেপালে আশ্রয় নিয়েছে। এবং তখনই তার জয়িতার মুখ মনে পড়ল। সে আনন্দকে থামিয়ে দায়িত্বটা নেবার পর জয়িতার ঠোঁটে কি হাসি ফুটেছিল? সুদীপ নিশ্চয়ই ভাবছে এই সুযোগে কল্যাণ হাওয়া হয়ে যাবে। না। যাই হোক না কেন, ওষুধগুলো নিয়ে তাপল্যাঙে ফিরে যেতেই হবে। এবং এই যাওয়াটা তাকে চিরকাল বাকি তিনজনের থেকে আলাদা প্রতিপন্ন করবে। তবে যাওয়ার সময় আর হাঁটা নয়। সান্দাকফু পর্যন্ত একটা জিপ ভাড়া করবে সে। জিপ ছাড়া মালপত্র বইবার প্রশ্ন ওঠে না।

হঠাৎ কল্যাণের খেয়াল হল ম্যানেজারের নির্দেশিত হলুদ বাড়িটা সে ছাড়িয়ে এসেছে। সে আর একটু এগোল। রাস্তাটা এখান থেকে খাড়াই উঠেছে। কিন্তু উঁচুতে উঠতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না তার। সে আর একটু হাঁটামাত্র নিরিবিলি জায়গায় চলে এল। ক্রমশ আলো নিভে আসছে। এখানকার শীতকে আর শীত বলে মনেই হচ্ছে না। এপাশে কোন দোকানপাট নেই। দু'ধারে বাগানওলা বাড়ি। এবং একটি বাড়ির নেমপ্লেটে ডাক্তারের নাম দেখতে পেল। ডক্টর এস. কে. দস্তিদার। এই লোকটা কিসের ডাক্তার? কল্যাণ থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। পর্দা ঢাকা দরজার ওপাশে আলো জ্বলছে। কল্যাণ ডাকল, 'ডাক্তারবাবু!'

ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'কে? ভেতরে আসতে পারেন।'

পর্দা সরিয়ে কল্যাণ দেখল একজন বৃদ্ধ সাহেবী প্যাটার্নের মানুষ টেবিলে বসে সানডে পড়ছিলেন। চোখ তুলে ইঙ্গিত করলেন বসতে। চেয়ার টেনে কল্যাণ বসে বলল, 'আমি এই শহরে নতুন। অসুস্থবোধ করছি, নেমপ্লেটটা দেখে এলাম।'

'অ। আমি তো রিটায়ার করেছি। আজকাল প্র্যাকটিস করি না। তবে নিজে থেকে কেউ এলে—। বলুন কি প্রব্লেম? আমার ফি কিন্তু বত্রিশ টাকা।'

কল্যাণ তার অসুবিধের কথা জানাল। ডাক্তার নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, 'অতিরিক্ত পরিশ্রম

থেকে এমনটা হয়েছে। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। তবে আপনাকে সাজেস্ট করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে যেতে।' বৃদ্ধ ডাক্তার প্যাড টেনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম?'

'ভাস্কর দস্তিদার।'

'অ্যাঁ। বাঃ, আপনিও দস্তিদার!' ওষুধের নাম লিখে ডাক্তার বললেন, 'আপনি আমাকে বরং পঁচিশ দিন। সেম টাইটেল!'

কল্যাণ প্রেসক্রিপশনটা দেখল। তারপরে সেটাকে ভাঁজ করে পকেটে পুরে ব্যাগ খুলল, 'আপনাকে আমি আর একটু বিরক্ত করব।'

'কি ব্যাপার?'

'আমি একটা গ্রাম থেকে আসছি। সেখানকার মানুষ খুব অসুস্থ। আমি তাদের অসুস্থতার বিবরণ লিখে এনেছি। এক এক জন সম্পর্কে শুনে আপনি নাম্বার দিয়ে প্রেসক্রাইব করে যান। সেইমত ওষুধ কিনে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'হোয়াট ডু য়ু মিন? আমি রোগী দেখলাম না আর প্রেসক্রাইব করব?'

'হ্যাঁ। কারণ ওদের ওষুধ দরকার।'

'ক'জন রোগী?'

'অনেক । নিন, শুরু করছি।'

'পার পেশেন্ট বত্রিশ করে লাগবে।'

'এই যে পঁচিশে ঠিক হল।'

'সেটা আপনার জন্যে। তাছাড়া আমি সব ডিটেলস না জেনে—।'

'যেটুকু জানছেন তাতেই লিখতে হবে।' কল্যাণের চোয়াল শক্ত হল, 'কেউ কথা না শুনলে আমার খুন চেপে যায়।'

ডাক্তার বিড়বিড় করলেন, 'এ কি অন্যায় জুলুম! কলকাতার সেই চারটে ছেলে-মেয়ে কি আপনাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?'

এবার হেসে ফেলল কল্যাণ, 'না। কাদের কথা বলছেন আমি জানি না। কিন্তু আপনার প্রেসক্রিপশন আমার দরকার।' সে রোগবৃত্তান্ত শুরু করল।

॥ ৩৮ ॥

কল্যাণ যখন ডাক্তারের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল তখন দার্জিলিং-এ চমৎকার সন্ধ্যে নেমে গেছে। দরজা পার হওয়ামাত্র ঝুপ করে আলো নিবে গেল গোটা শহরের আর হিম বাতাসের সঙ্গে একটা কালো আলখাল্লা নেমে এল শহরটার শরীরে। এবং এই অন্ধকারটা তাকে স্বস্তি দিল। জীবনে সম্ভবত এই প্রথমবার সে অন্ধকারকে স্বাগত জানাল।

অনেকটা সময় কেটেছে বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে। একটার পর একটা অসুখের বর্ণনা, যার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলো একরকম, পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে পড়েছিল সে নিজেই, অতএব ডাক্তারের তো কথাই নেই। ভদ্রলোক বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন এই অসুখগুলো যাদের তাদের সে কোথায় পেল? এগুলো তো মূলত পাহাড়ি মানুষের অসুখ। তিনি নিজে কখনও চিকিৎসা করেননি কিন্তু জানেন যে খুব উঁচুতে যেসব পাহাড়ি গ্রাম আছে সেখানে এই ধরনের রোগ হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে কল্যাণের যোগাযোগ থাকার সম্ভবনা কম। ওষুধের নামগুলো লেখার সময় তিনি মাঝে মাঝে নেপালী শব্দ উচ্চারণ করেছেন ইচ্ছে করেই। ভদ্রলোক স্পষ্ট বুঝে গেছেন যে কল্যাণ নেপালী জানে না। এটা জানার পর থেকেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই থমকে গেছেন, প্রশ্নও করেছেন। কিন্তু কল্যাণের উত্তরের মধ্যে এমন একটা জেদ ছিল যে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে শেষ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। পকেট থেকে টাকা বের করে ওঁর দাবী মতন দক্ষিণা মিটিয়ে দিয়েছিল কল্যাণ। ভদ্রলোক

বোধহয় এটাও আশা করেননি। কিন্তু কৌতূহলী মানুষমাত্রই বিপজ্জনক। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণের মনে হল আনন্দর সমস্ত পরিকল্পনায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। একজন ডাক্তারের কাছে এতগুলো অসুখের ওষুধ চাওয়ার কথা ওর মাথায় না আসলে সন্দেহ জন্মাত না। ও যেমন বলেছে সে তেমনই করেছে। দার্জিলিং শহরে ঘুরে ঘুরে ডাক্তার খুঁজে বের করে সাত-আটটা করে অসুখের প্রেসক্রিপশন নেওয়ার কথা অবশ্য তার নিজের মাথাতেও আসেনি আর এলে সেটা কতটা সম্ভব হত, তাতেও সন্দেহ আছে। অতএব এই পরিকল্পনাটা নিয়ে আনন্দ ভুল করেছে। তাছাড়া এই ডাক্তারও একটা ভুল ধরিয়ে দিল। ওষুধগুলো পেটে পড়ামাত্র রোগীরা সেরে যাবে, এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কোন কোন রোগীর অন্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেই সময় হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে নতুন ওষুধ দেওয়া সম্ভব হবে না। এতে রোগীর অন্য বিপত্তি ঘটতে পারে। কোন কোন অসুখ দীর্ঘদিনের এবং তার চিকিৎসাও সময়সাপেক্ষ। ডাক্তার নিয়মিত তাকে না দেখলে প্রথম ওষুধে তেমন কাজ হবে বলে মনে হয় না। অতএব আনন্দর এই পরিকল্পনাতেও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। কল্যাণের মনে হল অনেক কিছু তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। স্পষ্ট প্রতিবাদ করে ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হত। কিন্তু তাহলে অন্য দুজন তাকে পাতি মধ্যবিত্ত বলত। পাতি মধ্যবিত্তরাই নাকি প্রতি পদে পদে বাগড়া দিয়ে থাকে। এখন অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। ওকে যেমন করেই হোক ওষুধ নিয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু যে ব্যাপারটা তাকে চিন্তিত করছে সেটা হল ডাক্তার সম্ভবত এতক্ষণে তার সম্পর্কে একটা তথ্য জেনে গিয়েছেন। একেবারে শেষদিকে ডাক্তারের যে দুজন আত্মীয় আত্মীয়া ভেতরে ঢুকেছিল তাদের একজন তার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠেছিল। ব্যাপারটা যদি ঠিক হয় তাহলে কথাই নেই। ডাক্তার এতক্ষণে পুলিশকে জানাবে তার হদিশ। মেয়েটি কি প্রেসিডেন্সিতে পড়ে? নিশ্চয়ই কলেজের সমস্ত মেয়ে এবং ছেলে তাদের ঘটনা জেনে গিয়েছে! এই মেয়েটি যদি ওখানকার ছাত্রী হয় তাহলে ওরও না জানার কথা নয়। অতএব তাকে সতর্ক হতে হবে। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা মোড়ের কাছে চলে এল। এখন সামনে অদ্ভুত দৃশ্য। সমস্ত পাহাড় জুড়ে জমাট অন্ধকারে টিমটিমে হ্যারিকেনের প্রায় অদৃশ্য আলো ভৌতিক মেজাজ এনেছিল। আচমকা আবার আলো জ্বলে উঠতেই মনে হল ধাপে ধাপে ঝকমকিয়ে চুমকি বসানো শাড়ি ছড়িয়ে পড়ল চৌদিকে। কল্যাণ চারপাশে তাকাল। রাস্তায় লোকজন কম। দোকানপাট এখনও অবশ্য খোলা। চটপট কোন দোকান থেকে ওষুধ নিতে হবে। তারপরই মত পালটে সে স্থির করল একটা নয় একাধিক দোকান থেকে ওষুধ নেবে যাতে দোকানদারের সন্দেহ না হয়। ওষুধ ছাড়া বন্ধুদের ফরমায়েশও আছে। সেগুলোও নেওয়া দরকার। দার্জিলিং-এ পৌঁছানোর পর যে ভয়টা সঙ্গে ছিল সেটা এখন আরও জোরদার। ম্যালের রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে সে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে জনা দশেক রোগীর জন্যে ওষুধের অর্ডার দিতেই কাউন্টারে বসা লোকটি হাঁ করে তাকে দেখল। লোকটি নেপালী। জিজ্ঞাসা করল, 'এত ওষুধ আপনি একসঙ্গে নেবেন?' প্রশ্নটা হিন্দীতে। উত্তরটা ঘাড় নেড়ে জানাল কল্যাণ। দাম মেটানোর পর সে বুঝতে পারল হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আপাতত সম্ভব কিন্তু সত্তরজনের হলে নয়। সে একটা বড় চটের থলে কিনে ওষুধগুলো সেটায় ফেলে সুদীপের সিগারেট কিনল। তিনটে দোকান থেকে ওষুধ নেওয়ার পর দেখা গেল আরও সমান ওষুধ তাকে কিনতে হবে। এতক্ষণে ঝাঁপ বন্ধ হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ঘুরে কিনতে গেলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া দার্জিলিং-এর আর কোথায় ওষুধের দোকান আছে তা কে জানে। আগামীকাল দিনের বেলা এই শহরে থাকার ঝুঁকি নিতে চায় না সে। ক্রমশ ভয়টা আতঙ্কের চেহারা নিয়ে যেন তাকে তাড়া করছিল। লাডেন লা রোডের বাঁকে সে একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়াল। এখন দোকানে ভিড় নেই। কাউন্টারে একজন প্রৌঢ়া মহিলা। তিনি কিছু লিখছেন। সাইনবোর্ড এবং মহিলাকে দেখে সে নিঃসন্দেহ হল ইনি বাঙালী। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে কল্যাণ ভেতরে ঢুকতেই মহিলা চোখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন!'

কল্যাণ ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে কাউন্টারে হাত রাখল, 'আমার অনেক ওষুধ চাই এবং এখনই!'

ভদ্রমহিলার চোখে বিস্ময় ফুটল। কিন্তু সেই অবস্থায় হাত বাড়ালেন, 'প্রেসক্রিপশন!' ডাক্তারের লেখা কাগজটা এর মধ্যে কয়েক টুকরো হয়েছে। বাকিটা কল্যাণ এগিয়ে দিতে মহিলা কল্যাণের মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর সেটা নিয়ে র‍্যাক থেকে ওষুধ নামাতে লাগলেন। কল্যাণ চুপচাপ

দেখছিল। ভদ্রমহিলার মুখ দেখে এখন বোঝা যাচ্ছে না ওঁর মতলবটা কি। দোকানটা ফাঁকা কিন্তু বেশ বড়। সঙ্গে যদি একটা গ্রেনেড অথবা রিভালভার থাকত তাহলে জোর পেত সে। এইভাবে চোখে সন্দেহ ফুটিয়েও আর প্রশ্ন না করে উনি ওষুধ নামাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি? সে সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছিল। ওপাশেই একটা টেলিফোন আছে। সেটার দিকে নজর যেতেই আচমকা এমন বেজে উঠল যে হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এল কল্যাণের। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে রিসিভারটা তুলে বললেন, 'ইয়েস।'

কল্যাণ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ফোনটা যদি পুলিশের হয়? যদি থানা থেকে সতর্ক বার্তা পাঠানো হয়? ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ হুঁ হ্যাঁ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার ওষুধ নামাতে শুরু করলে কল্যাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মিলিয়ে মিলিয়ে ক্যাশমেমো লিখে টাকার অঙ্কটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রমহিলা। কল্যাণ চটপট সেটা বের করে কাউন্টারে রাখতে গুনে নিয়ে ব্যালেন্সটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর ওষুধগুলো কাউণ্টারে রেখে গালে হাত রেখে দাঁড়ালেন। কল্যাণ চটের থলিতে ওষধগুলো চালান করল। এই শীতেও তার মুখে ঘাম জমেছে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতজন মানুষ অসুস্থ?'

'অনেক। সত্তরজনের ওষুধ নিচ্ছি।' বলে সে দোকান থেকে নামতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা তাকে ডাকলেন, 'আপনি দার্জিলিং-এ কোথায় উঠেছেন?'

'উঠেছি মানে? আমি তো এখানেই থাকি।'

'না থাকেন না। এই শহরের সবাইকে আমি চিনি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'কিছু না। মনে হচ্ছে পাহাড়ি মানুষদের উপকার করতে যাচ্ছেন। একটু আগে থানা থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এরকম কেউ এলে তাকে আটকে রাখতে। যাদের জন্যে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন তারা যেন ওষুধটা পায়।'

কল্যাণের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে কোনরকমে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ এমন সহযোগিতা করলেন কেন? মানে, করার তো কোন কারণ ছিল না।'

'না। সত্তরজনের মধ্যে দশজনও যদি ওই ওষুধে সুস্থ হয় তাদের জীবনের দাম আপনার চেয়ে দশগুণ বেশি, তাই না? আপনি যেখানে উঠেছেন সেখানে না ফিরলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। আচ্ছা—!' কথাটা সেখানেই শেষ করে ভদ্রমহিলা ভেতরদিকে ফিরলেন। কল্যাণ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেমন একটা ঘোর লাগল তার। এই মহিলা কি স্বাভাবিক আচরণ করলেন? কথাটা মাথায় আসতেই তার হাসি পেল। সে নিজেই কি স্বাভাবিক আচরণ করছে? সম্বিৎ ফিরতেই সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। ব্যাগটা বেশ ভারী হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু তার তো হোটেলে ফেরা দরকার। নিজস্ব জিনিসপত্র সবই পড়ে আছে সেখানে। দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই কয়েকশ হোটেল আছে। তাদের সবাইকে সতর্ক করা বা গিয়ে হদিশ নেওয়ার সময় কি পেয়েছে পুলিশ? কিন্তু ভদ্রমহিলার কথাগুলো কানে সেঁটে আছে এখনও। না, আর কোন ঝুঁকি নেবে না সে। এই ওষুধগুলো যাদের জন্যে তাদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।

কিন্তু হোটেলে না ফিরলে আজকের রাত সে কোথায় কাটাবে? দার্জিলিং-এ আকাশের তলায় শুলে আর ওষুধগুলো পৌঁছাতে হবে না। নতুন কোন হোটেলেও ওঠা এখন সোজা থানায় যাওয়ার সমান হবে। স্টেশনের সামনে পৌঁছে খুব অসহায় বোধ করছিল কল্যাণ। কি করবে সে বুঝতে পারছিল না। তার একবার মনে হল যা হবার হোক, হোটেলেই ফিরে যাবে। সেখানে তার জিনিসপত্রের মধ্যে শীতবস্ত্রও রয়েছে যেগুলো শরীরে না থাকলে সান্দাকফু পার হওয়া অসম্ভব। ঠিক সেই সময় একটা পুলিশের জিপ বেশ জোরে সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত পাল্টাল।

জিপ ভাড়া করে যদি দার্জিলিং ছাড়তে হয় তাহলে বাজারের দিকে যেতেই হবে। সেখানেও যে পুলিশ ওৎ পেতে নেই তা কে বলতে পারে! তাছাড়া এত রাত্রে কোন ড্রাইভার যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ আছে। কল্যাণের মনে হল যদি ঘুম পর্যন্ত যাওয়া যেত তাহলে অনেকটা স্বস্তি হত। এই মুহূর্তে দার্জিলিং শহরটা এড়ানোই প্রয়োজন। ঘুম থেকে দার্জিলিং কত মাইল? সে আর কিছু না ভেবে স্টেশনটাকে ডান দিকে রেখে হাঁটতে লাগল। শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছাতেই তার পায়ে ব্যথা শুরু হল। শরীরটা ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে খিদে। এই অবস্থায় তার

পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। কল্যাণ পিছন ফিরে শহরটাকে দেখল। সে হেরে যাচ্ছে। অসম্ভব। তাকে প্রমাণ করতে হবে সুদীপ বা আনন্দর চেয়ে তার ক্ষমতা মোটেই কম নয়! কল্যাণ আবার হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে ওপর থেকে গাড়ি নামছে নিচের দিকে, নিচ থেকেও উঠছে। অর্থাৎ রাত্রেও গাড়ি চালানো বন্ধ হয় না। গাড়ির আলো দেখামাত্র সে পথ থেকে সরে কোন একটা আড়াল বেছে নিচ্ছে। ক্রমশ তার শরীর আরও ভারী হয়ে এল। কল্যাণ আর পারল না। তার মনে হচ্ছিল একটু ঘুমিয়ে নিলে সে ঠিক হয়ে যাবে। এই সময় সে একটা শুকনো ঝরনার পাশে চালা দেখতে পেল। সম্ভবত রাস্তা সারাই-এর কাজের সময় শ্রমিকরা এই চালা করেছিল আচমকা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চারটে খুঁটির ওপর ওই আচ্ছাদনের তলায় পৌঁছাতে বেশ কয়েকটা পাথর তাকে ডিঙিয়ে যেতে হল। ঘোরের মধ্যেই সেটুকু পেরিয়ে বড় পাথরের ওপর শরীরটাকে ছেড়ে দিল সে। আর তখনই চেতনা উধাও।

কালিয়াপোকরিতে যখন সে ট্রেকার থেকে নামল তখন বিকেল। সুকিয়াপোকরি থেকে কালিয়াপোকরি পর্যন্ত এই ট্রেকারগুলো যাত্রী নিয়ে যাওয়া আসা করে মাঝে মাঝে। ভোরেবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে নিজেকে বেশ হালকা বোধ করেছিল প্রথমে। খিদে ছাড়া অন্য অনুভূতি ছিল না। তার ওষুধের ব্যাগ এবং টাকাগুলোও কেউ নিয়ে যায়নি। অতএব কল্যাণ আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। এবং তার পরেই টের পেল বুকে লাগছে। একটু রোদ উঠতেই কাশি শুরু হল। তারপর শীত-শীত ভাবটা আসতে মনে হয়েছিল ঠাণ্ডার জন্যে এমন মনে হচ্ছে। সকাল হতে ওই পথে প্রচুর গাড়ি চলছিল। কল্যাণকে মাঝে মাঝেই সেই কারণে লুকিয়ে পড়তে হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল তার ঠাণ্ডা লেগেছে। এবং সেই ঠাণ্ডা তার শরীরে জ্বর আনতে পারে। কেনা ওষুধ থেকে হাতড়ে হাতড়ে সে একটা ওই ধরনের ট্যাবলেট বের করে ঝরনার জল মুখে পোরার পর একটু স্বস্তি হল। সে যখন সুকিয়াপোকরি-দার্জিলিং বাসটা দেখতে পেল তখন রোদ বেশ চড়েছে। সুকিয়াপোকরিতে বেশ বড় একটা বাজার আছে। সেখানে বাস থেকে নেমে সে পেটভরে পুরি তরকারি খেয়ে নিল। পেটে খাবার পড়ার পর তার স্বস্তি হল এবং বেশ ঘুম পাচ্ছিল। সেই সময় কালিয়াপোকরির ট্রেকারটা পেয়ে যেতে সে তার এককোণে উঠে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পুরো রাস্তাটা কিভাবে এসেছে তা সে জানে না। কালিয়াপোকরিতে যখন পৌঁছাল তখন সূর্য নেই, সময় তিনটে। আকাশে মেঘ। ট্রেকারটা থেকে নেমে সে যখন চারপাশে তাকাচ্ছে তখন একটা সিড়িঙ্গে মত লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন? সান্দাকফু?'

উত্তরটা পেয়ে গিয়ে কল্যাণ মাথা নেড়েছিল। লোকটা হিন্দীতে কথা বলছিল। সে বলল, 'এখন যদি হাঁটতে শুরু করেন তাহলে সান্দাকফু পৌঁছাতে পারবেন না। একটু পরেই রাত হবে। বৃষ্টি নামবে। এখানে যদি থাকতে চান তো আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। কুড়ি টাকা দিতে হবে। সকালে উঠে রওনা হয়ে যেতে পারেন।'

কল্যাণের মনে হল যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল। লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা কাঠের বাড়ির কাছে চলে এল। লোকটা ঘরের দরজা খুলে তাকে বিশ্রাম করতে বলে বেরিয়ে গেল রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করতে। কল্যাণের মনে হচ্ছিল এবার শুয়ে পড়লেই হয়। এই বাড়িতে দুটো ঘর। আর কোন লোকজন নেই। সে উঠে ভেজানো দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠল, দেওয়ালে দুটো খাকি শার্ট প্যান্ট ঝুলছে। পাশেই একটা টুপি। মুহূর্তে সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই লোকটা নির্ঘাৎ পুলিশ। কালিয়াপোকরিতে নিশ্চয়ই পুলিশের চৌকি আছে। সে দ্রুত বাইরের ঘরে ফিরে এসে ব্যাগটা তুলে নিল। তারপর চুপচাপ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। লোকটাকে কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না। কুড়িটা টাকা রোজগারের লোভে কেউ একজন অচেনা মানুষকে খোলা বাড়িতে রেখে বেরিয়ে যায় না। কল্যাণ নিঃসন্দেহ লোকটা পুলিশ এবং তাকে সন্দেহ করেছে। এখন তার যে চেহারা হয়েছে তাতে চট করে চেনা মুশকিল। কিন্তু ওই ট্রেকার থেকে সে-ই একমাত্র প্যাসেঞ্জার নেমেছে যে বাঙালী। যারা সান্দাকফু বেড়াতে যায় তাদের কাছে যেসব জিনিসপত্র থাকে তাও তার কাছে নেই! একটা বড় থলি হাতে গাড়ি থেকে নেমে ইতস্তত করতে দেখে লোকটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নিয়েছে। তার মানে তাদের সম্পর্কে খবর এ অঞ্চলেও এসে গিয়েছে।

একটু একটু করে কল্যাণ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোক এই পথ ধরে হাঁটছে। এরা যাবে দিকেভঞ্জন।

শীত বাড়ছে। এর আগের বার যাওয়ার সময় দিকেভঞ্জনে কয়েকটা ঘরবাড়ি সে দেখেছিল। ওই অবধি পৌঁছাতেই রাত হয়ে যাবে। আর এখানে খোলা আকাশের তলায় রাত মানে নিশ্চিত মৃত্যু। দ্রুত পা চালাচ্ছিল কল্যাণ। সুকিয়াপোকরির খাওয়া আর গাড়িতে বসে পুরোটা পথ ঘুমিয়ে শরীর এখন অনেকটা তাজা। যদিও বুকে সর্দির ভাবটা বেশ জমাট। এটা জ্বালাবে। লামার বাড়ির সামনে দিয়ে সে কালিয়াপোকরি ছাড়িয়ে নির্জন পাহাড়ে নেমে পড়ল। অদ্ভুত আলো ছড়ানো পাহাড়ে, গাছেদের বুকে। পৃথিবীটা আচমকা অলৌকিক সুন্দরী হয়ে উঠেছে সেই আলো মেখে। কল্যাণের মন ভরে গেল সেদিকে তাকিয়ে। তার হাঁটার উৎসাহ বাড়ল। এবং সেই কারণেই সে গলা খুলে রবীন্দ্রনাথের একটা গান প্রায় নিজের সুরে গাইতে লাগল চেঁচিয়ে। আশেপাশে যারা হাঁটছে তারা খুশির চোখে তাকাল। যে মানুষ গান গায় তার সম্পর্কে লোকে চট করে খারাপ ধারণা করতে চায় না।

ঠিক ঘণ্টাখানেক চলার পর নিচ থেকে চিৎকারটা ভেসে এল। এখন আলো প্রায় নিবে এসেছে। দিকেভঞ্জন চোখের সামনে। ঘন কুয়াশা পাক খাচ্ছে পথের ওপর। চিৎকার শুনে পিছন ফিরল কল্যাণ। গোটা ছয়েক লোককে কয়েকশ ফুট নিচুতে দেখা যাচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব দ্রুত ওপরে আসতে। এবং চকিতে এতদূরে দাঁড়িয়েও কল্যাণের নজরে এল মানুষগুলোর পরনে খাকি পোশাক এবং হাতে বন্দুক। ওরা অত নিচে থেকেও নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পেয়েছে নইলে চিৎকার করে থামতে বলত না। কল্যাণ এবার মরীয়া হল। সঙ্গীরা দেখল গান বন্ধ করে সে ঝোলা নিয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছে। এখনও ওরা অনেকটা নিচে আছে। পাহাড়ি পথ ঘুরে আসতে যে সময় লাগবে তাতে সে দূরত্ব বাড়াবার সুযোগ পাবে। কিন্তু সে যখন কুয়াশার জঙ্গলে পড়ে গেল তখন অন্ধ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনটা পথ কোন্‌টা নয় তা ঠাওর করা অসম্ভব। শীত এখন হাড়ে, কাঁপুনিটা দুটো কারণেই হতে পারে।

দিকেভঞ্জনে পৌঁছে মনে হল কলজেটা বুক থেকে বেরিয়ে আসবে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বোঝাটা সঙ্গে না থাকলে আরও দ্রুত যাওয়া যেত। কিন্তু এখন এটাই তার সম্মান। কল্যাণ পিছনদিকে তাকাল। এখন অন্ধকার মাটিতে এবং সেই সঙ্গে চাপ কুয়াশা। যারা আসছে তারাও তাকে চট করে খুঁজে পাবে না। কিন্তু দিকেভঞ্জনে থাকা চলবে না। সামান্য ওই কয়টা ঘরবাড়ি, যেই তাকে আশ্রয় দিক ওদের পক্ষে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। টলতে টলতে কল্যাণ আবার হাঁটতে লাগল। কুয়াশা কিংবা অন্ধকারে তার কোন খেয়াল নেই। পায়ের তলার পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। হাঁটলে শরীরে উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু পথ এবার এমন খাড়াই যে তাকে বারংবার দম নিতে হচ্ছিল। এখন আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। ক্রমশ সে অনেকটা ওপরে উঠে এল। আর তখনই সর্বাঙ্গে একটা তৈলাক্ত অনুভূতি। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। একটা পাথরের গায়ে ধপ করে বসে পড়ল সে ঝোলাটাকে পাশে রেখে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত এখন তীব্র যন্ত্রণা। কল্যাণ চোখ বন্ধ করল।

কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিল সে জানে না। হঠাৎ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সে উঠে বসল। আর তখনই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। দৃষ্টি এখনও তার পরিষ্কার নয়। কিন্তু মনে হল আশেপাশে কোথাও কুয়াশা নেই। সমস্ত আকাশটা চকমকে জ্যোৎস্নায় নিকানো। আর তারই উপচানো আলোয় পাহাড় বনানী মাখামাখি। দেখতে দেখতে বুকের ভেতর একটা আনন্দ জন্ম নিল যা তার হৃৎপিণ্ডের গায়ে নরম আদর ছড়িয়ে দিল। এবং তখনই নিচে চিৎকারটা শুনতে পেল সে। অর্থাৎ অনুসরণকারীরা হাল ছাড়েনি। যে সময়টা কল্যাণ পেল সেটা দিকেভঞ্জনের বাড়ি-বাড়িতে তল্লাশ চালানোর জন্যেই।

কল্যাণ উঠল। না, সে ধরা দেবে না। ওষুধগুলো তাকে পৌঁছে দিতেই হবে। শরীর টলছে কিন্তু সে এগোল। মুশকিল হল পথটা যেন আকাশে উঠে গেছে। আর একটু এগোলে সোজা চাঁদের ঘরে পৌঁছানো যাবে। একটা পা ফেলার পর এখন অন্য পা-কে টেনে আনতে হচ্ছে এগোতে। চিৎকারটা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তার মানে এই নয় অনুসরণকারীরা ফিরে গিয়েছে। কল্যাণ পিছন ফিরে তাকাল। এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় যে কেউ দূর থেকে মানুষ চিহ্নিত করতে পারবে। কুয়াশারা এখন নিচে নেমে গিয়েছে। তার সামনে আর আড়াল বলে কিছু নেই। যেটুকু সামর্থ্য ছিল তা উজাড় করে কল্যাণ যখন অপেক্ষাকৃত সমতলে উঠে এল তখন ওর অপুষ্ট শরীর আর তার রোগা হাড়গুলো কাঁপছে। এবং সেই সময় সে লোকগুলোকে দেখতে পেল। শিকার দেখতে পেয়ে ওরা এবার হইচই করতে করতে এগোচ্ছে। সামনের খোলা মাঠ জ্যোৎস্নায় ভাসছে। দূরে কয়েকটা বাড়ি। ওঃ, কল্যাণ চিনতে পারল, এই হল সান্দাকফু।

আর তারপরেই তার মনে পড়ল। তাপল্যাঙ থেকে যে ছেলেটা তার সঙ্গী হয়েছিল সে অপেক্ষা করে আছে একটু এগোলেই। ওর কাছে পৌঁছে গেলে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে। আর কিছু না হোক এই ওষুধগুলো ওর হাতে তুলে দেওয়া যাবে। ভাবনটা মাথায় আসামাত্র শরীরে উদ্যম ফিরে এল। মুহূর্তে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। ঘোড়ার নালের মত রাস্তার শেষে পৌঁছানো মাত্র সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকগুলো এবার ওপরে উঠে এসেছে। দূরত্ব এখন কয়েক মিনিটের। সমস্ত সান্দাকফু আজ নিশ্চুপ। কোনরকমে ওপরে রাস্তায় উঠে আসামাত্র গুলির আওয়াজ হল।

থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্যে কল্যাণ। এবং তারপরেই শরীরে অলৌকিক শক্তি ভর করল। পিছনের মানুষগুলো হিন্দীতে চিৎকার করছে, যদি সে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে গুলি শরীরে বিঁধবে। কিন্তু সেসব কথা ওর কানে যাচ্ছিল না। নিচে পড়ে রইল সান্দাকফু। এখন সে ফালুটের রাস্তায়। এই মুহূর্তে তার শরীরে কোন শীত বোধ নেই, কোন ক্লান্তির কষ্ট নেই, একটা তীব্র জেদ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর তখনই সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল গুলির আওয়াজে। কাঁধে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করার আগেই সে ছিটকে পড়ল মাটির ওপরে। হাত থেকে ঝোলাটা পড়ে গেল মাটিতে। চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণাটার সঙ্গে লড়ল কল্যাণ। এক হাতে কাঁধটা চেপে ধরতেই গরম স্রোত তার কনুই-এ নেমে এল। দ্বিতীয় গুলিটার শব্দ কানে আসতেই সে পেছনে ফিরে চাইল। যারা গুলি করেছে তারা কাছাকাছি এসেও সামনে আসছে না। কল্যাণ হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা আঁকড়ে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে সে যখন আরও কিছুটা পথ এগিয়েছে তখনই গলাটা শুনতে পেল। মুখ ফেরাতে সে অস্পষ্ট সেই ছেলেটার মুখ দেখতে পেল। ছেলেটা নেমে এসেছে পাশের পাহাড় থেকে। ওকে দেখামাত্র আছড়ে পড়ল কল্যাণ। ছেলেটা তাকে দু'হাতে টানছিল। কিন্তু কল্যাণ সামান্য শক্তি পাচ্ছিল না ওর ডাকে সাড়া দেবার। সে কোনরকমে ঝোলাটাকে দেখিয়ে বলতে পারল, 'নিয়ে যাও ওষুধ। ওদের বলো আমি পেরেছি। জলদি ভাগো।' আর কথাটা উচ্চারণ শেষ করামাত্র এক দমক উঠল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল রক্ত। কল্যাণ সেই জ্যোৎস্নায় নিজের শরীরের রক্ত দেখল। লাল,—কি লাল। পৃথিবীর সব মানুষের রক্ত কি লাল? ওই যে যারা তাকে গুলি করেছে তাদেরও? সে চোখ তুলল আকাশে। এখন যেন কিছুই ভাবতে পারছে না সে। চাঁদটাকে অসম্ভব বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু সে পেরেছে। ওষুধগুলোকে পৌঁছে দিতে পেরেছে। কিন্তু ছেলেটা দাঁড়িয়ে নেই তো! ঘাড় ঘুড়িয়ে সে ঝোলা বা ছেলেটিকে না দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। ক্রমশ তার মুখ একটা তৃপ্ত মানুষের হয়ে গেল। আমি পেরেছি। সুদীপ, তোদের মত মানুষ মারতে পারিনি কিন্তু বাঁচাবার রসদ আনতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার রক্ত বেরিয়ে আসতে সে সচেতন হল। ওরা কেউ ওপরে উঠে আসছে না কেন? ওরা কি তাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে চায়? নাকি ভয় পাচ্ছে যদি তার কাছে অস্ত্র থাকে? চিন্তাগুলো ছন্নছাড়া হয়ে আসা যাওয়া করছিল। পাথরে ঠেস দিয়ে বসতে আরাম হল। তারপর সে চিৎকার করে উঠল, 'কইরে শালা আয়, এগিয়ে আয়, আমাকে মেরে ফ্যাল।' শেষের দিকে তার গলা জড়িয়ে গেল এবং কোন শব্দ বের হল না। হঠাৎ জয়িতার মুখ ভেসে উঠল কল্যাণের সামনে। সে মুখ তুলে চাঁদটাকে দেখতে পেল, হঠাৎ সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'জয়ী, আমি ভীতু নই। জয়ী, আমি আমি—।' সেইসময় আবার গুলির শব্দ হল।

কল্যাণ করুণার চোখে নিচের দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধ চেপে উঠে দাঁড়াল। সে সোজা হতে পারছে না। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। টলতে টলতে সে চলে এল পাহাড়ের বিপরীত দিকে যেখানে অতলান্ত খাদ। কল্যাণ চোখ তুলল। আহা, চাঁদের মুখটা অত দ্রুত পালটে যাচ্ছে কেন? ক্রমশ সেটা ক্ষয়াটে, রক্তশূন্য মায়ের মুখ হয়ে গেল। কল্যাণ তার বাঁহাত আকাশে বোলাল। মা—চাঁদটা তার মা হয়ে যাচ্ছে। যে মাকে সে কখনই নিজের করে পায়নি, এখন সেই মা তার সামনে। কি করুণ দেখাচ্ছে। কল্যাণ হেসে ফেলল, মা, আমি পেরেছি। জয়ীকে বলে দিও। আর তখনই তার শরীরটা আকাশে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। তীব্র শব্দ পাহাড় কাঁপাল। বুকের খাঁচাটা যেন চুরমার। কল্যাণ শেষবার দেখতে পেল অনেকগুলো শরীর ছুটে আসছে সোল্লাসে। সে শেষবার মাকে দেখবার জন্যেই সম্ভবত চাঁদের দিকে মুখ ফেরাতে যেতেই শরীরটা গড়িয়ে পড়ল খাদে। ছুটে আসা মানুষগুলো দেখল অসাড় শরীরটা শূন্যে ভেসে নিচের অতল খাদে নেমে যাচ্ছে। আর চন্দ্রদেব তার শরীরটাকে আলোকিত করার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

গত রাত হাওয়ার রাত ছিল। পালদেম বলেছিল বরফ পড়ার আগে হিমালয় হাওয়াদের পাঠায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বীভৎস আওয়াজ। রাগী জন্তুর গোঙানি। অথচ বৃষ্টি নেই। আকাশ ঘোলাটে। সেখানে চাপ মেঘও নেই। কিন্তু একটি নখ লক্ষ্য হয়েছে। শীত বাড়ছে হু হু করে। কাঠের ঘরে নিরাপদ বিছানায় শুয়েও মনে হচ্ছিল উত্তাপ চাই।

আনন্দ চুপচাপ পড়েছিল। দ্বিতীয়বার ব্যাপারীরা ঘুরে গেল এই গ্রাম থেকে।ওরা অবশ্য তাদের হদিশ পায়নি। কিন্তু তাপল্যাঙের মানুষ কি করে এত টাকা হাতে পেল তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে। পালদেম শেখানো উত্তর বলেছে, চারজনের এক অভিযাত্রীদল এই গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাই দিয়েই কেনাকাটা করছে ওরা। উত্তরটা ওরা কতটা বিশ্বাস করেছে সেটা বোঝা যায়নি। কিন্তু প্রচুর জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো রাখা হয়েছে গ্রামের আর একটি খালি ঘরে। সেইসঙ্গে আছে গৃহপালিত সেইসব জন্তু যা গ্রামবাসীরা ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করেছিল। আজ বিকেলে বন্ধুদের কাছে আনন্দ তার পরিকল্পনা খুলে বলেছে। জয়িতা উৎসাহিত হয়েছে। একটা অবহেলিত, বলা যায় সভ্যতার ছোঁয়াচবর্জিত গ্রামের মানুষদের একত্রিত করে বাঁচার পথ খুঁজে দেওয়া মানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মানে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া। সারা বছর এরা হয় আধপেটা, নয় অভুক্ত থাকে। সবচেয়ে আগে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেটা সম্মিলিতভাবে। কেউ কম বা বেশি নয়। রান্না হবে একত্রে। এর ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা নিকট সম্পর্ক তৈরি হবে। এ বছরের ব্যবস্থা না হয় সুদীপের আনা টাকায় হয়ে যেতে পারে কোনরকমে, কিন্তু আগামী বছর থেকে নিজেদের জন্যে প্রতিটি মানুষকে কাজ করতে হবে। চাষের ব্যবস্থায় আধুনিক সাহায্য নিতে হবে, ডেয়ারি এবং পোলট্রি ফার্ম পুরো গ্রামের জন্যে তৈরি করতে হবে। আর সেই সব জিনিস দার্জিলিং না হোক গৈরাবাস অথবা মানেভঞ্জনের বাজারে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে দরকারী জিনিস আনতে হবে। এদের নিজস্ব লেখ্যভাষা আছে কিনা জানতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দী এবং ইংরেজী শিখতে হবে। অর্থাৎ সুস্থভাবে বাঁচতে হলে একা কিছু করা যাবে না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটতে হবে। এই বোধ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। অবশ্য এর জন্যে বিশ্বাস অর্জন করা দরকার। বিদেশী বিভাষী মানুষকে চট করে কেউ বিশ্বাস করে না। তবু এখন যেন ওরা তাদের সঙ্গে অনেক সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। ওই যে মেয়েটি যে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গিয়েও কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও মরে যায়নি তার জন্যে কেউ দায়ী করছে না এখনও। মরে গেলে কি হবে তা কে বলতে পারে। যাই হোক, এই গ্রাম ছাড়ার আপাতত কোন ইচ্ছে তার নেই। প্রথম কথা, পুলিশের রাইফেল এত দূরে পৌঁছাবে এমন সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, আকৈশোর যে বাসনা ছিল তা সম্ভব হবে এমন সম্ভাবনা নেই। বাবাও যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন তা একাত্তরেই মুখথুবড়ে পড়েছে। সে ভেবেছিল দেশের যারা শত্রু তাদের আঘাত করার শিক্ষা জনসাধারণকে দিলে তারা উদ্দীপ্ত হবে এগিয়ে আসতে। মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের মানুষ ভেতরে ভেতরে সমস্ত সিস্টেমটার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে বঞ্চিত হওয়ায় রুষ্ট হয়ে উঠেছে, শুধু তার প্রকাশের দরজা খুলে দিতে পারলেই লাভাস্রোত বইবে। কিন্তু কলকাতায় থাকাকালীন তার কোন প্রতিক্রিয়া সে দেখতে পায়নি। অবশ্য ওরা চলে আসার পর কিছু হয়েছে কিনা তা জানা নেই। হলে অন্তত বি বি সি-র খবরে তার কথা শোনা যেত। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে সে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে: কিন্তু বিখ্যাত গ্রন্থগুলো পড়ে তার তো মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের হঠাতে বিপ্লব দরকার। বিপ্লবের পরে মানুষকে তার অধিকারের জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লব উদ্দেশ্য নয়, ওই নয়া সমাজ ব্যবস্থাই আসল লক্ষ্য। সেই কাজ তো এখানেও শুরু করা যেতে পারে। এখানে তাদের চোখে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। কাহুনকে কোনভাবেই, এমন কি সামান্য

জোতদার বলেও ভাবা যাচ্ছে না। এদের শত্রু অজ্ঞতা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে অশিক্ষার ফসল দারিদ্র্য। কিন্তু এদের পক্ষে সবচেয়ে যে মূল্যবান সম্পদ তা হল রাজনীতির ধোঁয়াটে বিষ এখনও চেপে বসেনি। সামান্য পিছিয়ে নিয়ে গেলে পৃথিবীর আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় এদের পৌঁছে দেওয়া যায়। অতএব এই মাটির ডেলাগুলো নিয়ে স্বপ্নের মূর্তি তৈরি করা যায়। বাধা যা আসবে তা ওদের অজ্ঞতা থেকে। এর মধ্যে আনন্দ কয়েকটি শব্দ শিখে ফেলেছে। এ ব্যাপারে জয়িতা তার থেকে এগিয়ে আছে। ও এখন ভাঙা ভাঙা বাক্য বলতে পারে। ভুল করে কিন্তু সেই ভুলটা ওদের মজা দেয়। নিরাপদ বিছানায় শুয়ে আনন্দ এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। কল্যাণটা ফিরে এলেই এরা ওদের অনেক কাছে এসে যাবে।

নিরাপদ বিছানায় শুয়ে জয়িতারও ঘুম আসছিল না। হাওয়া বইছে কিংবা বেড়ে যাওয়া ঠাণ্ডার জন্যে নয় ওর শরীর এবং মনে অস্বস্তি কাজ করছিল। সময় এসে গিয়েছে। কলকাতায় থাকতে এই ব্যাপারটা কোন গুরুত্বই পেত না। সে স্থির করে নিল যে প্রয়োজনে বন্ধুদের বলবে। এই কদিনে তাপল্যাঙের মানুষদের সঙ্গে মিশে সে অনেক কিছু জেনেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। এই পাহাড়ি মানুষরা সুদীপ আনন্দর সঙ্গে দূরত্ব রেখেছে, তার সঙ্গে রাখেনি। বোধহয় মেয়েরা খুব চট করেই বিশ্বাস কিংবা আস্থাযোগ্য হতে পারে। জয়িতা কৌতূহলী হয়েছিল এখানকার মেয়েরা তাদের ওই সমস্যার সমাধান কিভাবে করে তা জানতে। জানার পর শিউরে উঠেছিল। অল্পবয়েসীরা সেই কয়দিন প্রায় ঘরের বাইরে যায় না। স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে সবার আড়ালে থেকে যায়। কার লেখা মনে নেই, জয়িতা পড়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরাও এক সময় ওই একই জীবনযাপন করত। ওই কদিন বিছানায় শুতো না, মাথায় তেল দিত না। তারও আগে ঘর ছেড়ে বের হত না। নিজেদের অশুচি মনে করত। এখনও পুজোপার্বণে বাংলাদেশের মেয়েরা যোগ দিতে চায় না। এ হীনমন্যতা বোধ কি কারণে তা কেউ ভাবেনি। যেন প্রকাশ্যে বললে সেটা অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যাবে। দিন পালটেছে কলকাতায়। এখানকার বয়স্কা মেয়েরা যেভাবে নিজেদের সামলায় তা আদৌ অস্বাস্থ্যকর নয়। বোধহয় সেই কারণেই এদের অসুখবিসুখ অনিবার্য ঘটনা। সে নিজে না হয় কিছুদিন সামলে নিতে পারবে। কল্যাণ যখন গেল তখন তাকেও বিজ্ঞাপিত সাহায্য আনতে বলতে পারত কিন্তু তাই বা কদিন সাহায্যে আসত? একটা উপায় বের করতেই হবে।

ওদিকে সুদীপের নাক ডাকছে। আনন্দ চুপচাপ। সুদীপটাকে জয়িতা আজকাল ঠিক বুঝতে পারছে না। সারাক্ষণ এত কি ভাবে? গ্রামের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার প্রবণতা ওর মধ্যে। কিন্তু এখনও এখানকার ভাষা শেখার ইচ্ছে ওর নেই। গ্রামটা ছোট। মানুষগুলো সরল। আর যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে জয়িতার সেটা হল পুরুষরা মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখে না। বরং বলা যায় মেয়ে পুরুষ সমানতালে কাজ করে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে। শুধু বিবাহের বেলায় তাদের পরিবারের নির্দেশ মানতেই হয়। অথচ বিবাহের আগে যে যৌনাভ্যাস নেই এমন নয়। সেটা সবাই জানেও কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না যতক্ষণ না সন্তানসম্ভবা হচ্ছে কেউ। কিন্তু এখানকার মেয়েদের মধ্যে নানা ব্যাপারে যে সংস্কার তা মূলত অজ্ঞতা থেকেই। এদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হলে ওই অজ্ঞতা আগে দূর করতে হবে। দ্বিতীয়ত শারীরিক কারণে এদের অনেকেই সন্তানসম্ভবা হতে পারছে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গলগণ্ড রোগের ব্যাপক শিকার হচ্ছে। এইটে বাদ দিয়েও তাপল্যাঙকে মিনি ভারতবর্ষ ভাবা যায় না। কিন্তু তাপল্যাঙের মানুষগুলো যারা এখনও আধাআদিম যুগে বাস করছে তাদের জীবন বিপ্লব পরবর্তী স্বপ্নের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার অবাধ সুযোগ রয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনযাত্রা পালটে যাওয়ার সে স্বপ্ন নকশালরা দেখেছিল, সি পি এম মুখে বললেও কাজে যার উলটো করেছে, চে গুয়েভারা অথবা মাও কিংবা হো চি মিন যে স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজ এখানে করা সম্ভব। কয়েক কোটি না হোক কয়েকশ মানুষকে জীবনের স্বাদ এবং স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়ে স্বনির্ভর করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থপূর্ণ হবে। এই ব্যাপারে সে একমত আনন্দের সঙ্গে' জয়িতা চোখ বন্ধ করতেই কল্যাণের মুখটা দেখতে পেল। কল্যাণের ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। ঝুঁকিটা অবশ্য কাউকে না কাউকে নিতেই হত। কিন্তু কল্যাণ যদি ধরা পড়ে যায়? পুলিশ যদি কল্যাণের পরিচয় জানতে পারে তা হলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। জয়িতা জানে কল্যাণ বাঁচতে বড় ভালবাসে। এবং আর একটা জিনিস ইদানীং সে কল্যাণের মধ্যে লক্ষ্য করছিল। তার সঙ্গে ব্যবহারে যেন পরিবর্তন

এসেছিল। কিরকম চোখে মাঝে মাঝে তাকাত কল্যাণ। এবং তখনই তার মনে হত সে যে মেয়ে এটা কল্যাণের দৃষ্টিতে এসেছে। ভাল লাগত না, অস্বস্তি বাড়ত। কিন্তু ওইটুকু ছাড়া আর কোন প্রিটেনশন বা বুজরুকি কল্যাণের ছিল না। বরং বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু সামলে নেবার ক্ষমতার অভাব বড্ড চোখে পড়ত। সেই কল্যাণ দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। কিন্তু পৌঁছবার পর কতটা বোকামি করল তার ওপর নির্ভর করছে ওর ফিরে আসা। সুদীপটা তো প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, 'ও শালা ফিরবে না। ঠিক হাওয়া হয়ে যাবে।' সুদীপ কল্যাণকে, ঠিক কল্যাণ নয়, ওই ক্লাসটাকেই অবিশ্বাস করে।

হঠাৎ আনন্দ কথা বলল, 'জয়ী, জেগে আছিস?'

জয়িতা নড়ল না। বলল, 'হুঁ।'

আনন্দ বলল, 'আজ রাত্রে মেয়েটা মরে যাবে। তারপর কি হবে কে জানে?'

জয়িতা বলল, 'আমি কল্যাণের কথা ভাবছি।'

আনন্দ বলল, 'কল্যাণ পালাবে না। ও আসবেই। কাল নয় পরশু। কিন্তু জানিস, আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাক্তার হত তা হলে এখানে আরও ভাল কাজ করতে পারতাম।'

জয়িতা প্রশ্ন করল, 'কল্যাণ ফিরবেই এই বিশ্বাস হল কেন তোর?'

আনন্দর হাসি শোনা গেল অন্ধকারে, 'মধ্যবিত্ত বলে। মধ্যবিত্তরা সব সময় পালায়। কিন্তু বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেলে সেটা মরে না যাওয়া অবধি হাতছাড়া করে না।'

ঠিক সেই সময় চিৎকারটা উঠল। যেন কেউ প্রচণ্ড আহত হয়ে কাঁদছে। কান্নাটা গোঙানি বললে কম বলা হয়, কারণ কোন মানুষ অত জোরে গোঙাতে পারে না। এখানে আসার পর আজ দ্বিতীয় রাত ওই গোঙানিটা হচ্ছে। আনন্দ উঠে বসল। বাতাসের দাপট ছাপিয়ে কান্নার শব্দ হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'মানুষের নয়, অসম্ভব। এটাই পালদেমের দানো।'

জয়িতা বলল, 'বাইরে বেরিয়ে দেখবি? হেভি ঠাণ্ডা কিন্তু।'

'দেখব? ইম্পসিবল। পালদেম যাই বলুক এ দানব নয়। দানব বলে কিছু নেই। হিলারী সাহেব পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেও কোন জন্তুর হদিশ পাননি। এরা যাই বলুক তার পেছনে কোন সত্যি নেই। আনন্দ উঠে শীতবস্ত্র জড়িয়ে নিচ্ছিল। জয়িতা ওকে অনুসরণ করল। কান্নাটা এখনও একটানা চলছে। ঘরে মোমবাতি জ্বালাল আনন্দ। শিখাটা কাঁপছে। এই সময় সুদীপ মুখ তুলল, 'কি ব্যাপার? চললি কোথায়?'

আনন্দ বলল, 'একবার দেখব বস্তুটি কি। এত জোরালো গলা কার?'

সুদীপ আবার শুয়ে পড়ল, 'নেই কাজ তো খই বাছ!'

ওরা আর কথা বাড়াল না। দরজা থরথর করছিল। কোনমতে সেটা খুলে বাইরে দাঁড়াতে একসঙ্গে ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার চাপ পড়ল শরীরে। বাইরে ঘন অন্ধকার নয়, একটা পাতলা আলো আঁধারে মিশে অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছে। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু তার আড়ালে চাঁদও রয়েছে এটা বোঝা যায়। ওরা দুজনই কাঁপছিল। কান্নাটা ভেসে আসছে উত্তরের পাহাড় থেকে। কিছুক্ষণ একটানার পর কিছুক্ষণ যেন জিরিয়ে নিচ্ছিল। সমস্ত তাপল্যাঙ এখন চুপচাপ। কোন প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা ঢালু জমি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। আনন্দ বলল, 'দৌড়ো। দৌড়লে ঠাণ্ডা কম লাগবে।' ওরা উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই পায়ের তলায় বরফ পেল। এর মধ্যে এখানে বরফ পড়তে শুরু করেছে। আর দৌড়োনো যাচ্ছে না। এর পরেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে বরফ ছিলই, এখন তা নেমে এসেছে অনেক নিচে। আর এখানে আসার পরই চিৎকার অথবা কান্না থেমে গেল। ওরা যত এগিয়ে এসেছিল তত স্পষ্ট হচ্ছিল কোন মানুষ নয়, এ আওয়াজ কোন জন্তুর গলা থেকে বের হচ্ছে। সম্ভবত জন্তুটি ওদের দেখতে পেয়েছিল এবং সে কারণেই চুপ করেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ বলল, 'নাঃ, ফিরে যাই চল্।'

জয়িতা বিরক্ত হল, 'এগ্গি কেন? যেন তোর জন্যে চিড়িয়াখানার খাঁচায় বসে থাকবে ইয়েতি।'

ওরা চুপচাপ এগিয়ে আসছিল। শরীরের যেসব অংশ বাইরে বেরিয়ে আছে সেখানে কোন সাড় নেই। এখন আর কোন আওয়াজ আসছে না উত্তরের পাহাড় থেকে। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ। ওরা যখন মাঝামাঝি তখন আনন্দ হাত বাড়িয়ে জয়িতাকে থামতে বলল। গোটা আটেক লোক ওপাশের পাহাড়

থেকে নেমে আসছে নিঃশব্দে। ওদের লক্ষ্য অবশ্যই গ্রাম এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওদের চলাফেরা দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন গোপন মতলব হাসিল করতে ওরা এসেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাথরটা হাওয়ার দাপট সামলাচ্ছে। একেই পাতলা অন্ধকার তার ওপর ওরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে চট করে আগন্তুকদের দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। আনন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, 'লোকগুলো কারা বুঝতে পারছি না।'

জয়িতা বলল, 'আর একটু লক্ষ্য করা যাক।'

আটজনের দলটা গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশ থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। কুকুরটাকে শান্ত হবার সময় দিল। তারপর দলটা দুটো ভাগে দু পাশ দিয়ে এগোতে লাগল। একটা ভাগ চলল কাঞ্চনের মন্দিরের দিকে আর একটা গ্রামের ভেতরে। ওরা যখন আর দৃষ্টির সীমায় রইল না তখন আনন্দ বলল, 'মনে হচ্ছে পাশের গ্রামের মানুষ। পালদেম এদের কথাই বলছিল। এরা তাপল্যাঙের কোন ক্ষতি করতে এসেছে। গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দিতে হবে। চল্।'

জয়িতা বলল, 'দাঁড়া। তাড়াহুড়ো করিস না। আগে দেখা যাক ওরা কি করে।'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'না। তারপর সামলানো যাবে না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'যাবে। আমার কাছে রিভলভার আছে।'

আনন্দ এই পরিবেশেও হতভম্ব হয়ে গেল, 'এতদিন বলিসনি কেন?'

জয়িতা বলল, 'বলার কোন কারণ ঘটেনি তাই । এবার এগিয়ে চল্।'

হাঁটা শুরু করতে আনন্দ ওর দিকে বারংবার তাকাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তোরটা পালদেম নিয়ে যেতে পারেনি ?'

জয়িতা বলল, 'পারলে আমার কাছে থাকত কি করে!'

ঠিক এই সময় একই সঙ্গে দু জায়গায় চিৎকার শুরু হল। মন্দিরের চিৎকার থেমে গেল আচমকা। আর গ্রামের ভেতর থেকে দুটো মানুষ একটা শরীরকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মন্দির থেকেও চারটে লোক নেমে এল। সেই চিৎকার চেঁচামেচি এবার সমস্ত তাপল্যাঙে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম আচমকা ভেঙে যাওয়ায় হাওয়ার দাপট এবং শীতের প্রাব্যল্যে মানুষগুলো সচল হবার অনেক আগেই আটটা লোক কাজ সেরে দূরত্ব বাড়িয়েছিল। কি ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে যখন বোঝাবুঝির পালা চলেছে তখন কয়েকজন তেড়ে আসছিল লোকগুলোকে ধরতে। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, সশস্ত্র হানাদারদের সামনে এসে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। ঠিক তখন পাহাড়ের ওপাশে যে পথ দিয়ে হানাদাররা ঢুকেছিল সেখানে ঢাক জাতীয় বাজনা বেজে উঠল। বোঝা গেল হানাদাররা একা নয়, তাদের মদত দেবার জন্যে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। নিজেদের লোক কাজ হাসিল করে ফিরে আসছে দেখে তারা যে উল্লসিত সেটা চিৎকারে বোঝা গেল। আনন্দ বলল, 'আমরা পালদেমদের সাহায্য করব জয়ী। ওদের কোন দামী জিনিস চুরি যাচ্ছে। তুই আমাকে রিভালভারটা দে। গুলি আছে তো ওতে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর ছুটে গেল খোলা জায়গায় যে পথ দিয়ে আটটা লোক এখন এক হয়ে ছুটে আসছে। প্রথম যে লোকটা ওদের লক্ষ্য করল সে চিৎকার করে উঠতেই দলের বাকিরা এইদিকে তাকাল। ওরা কাউকে কাঁধে ঝুলিয়ে আনছিল। একজনের দুটো হাত বুকের ওপর। বাকি পাঁচজন অস্ত্র ঘুরিয়ে এদের পাহারা দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। এই সময় দূর থেকে সুদীপের চিৎকার ভেসে এল, 'জয়ী, সরে যা।'

জয়িতা একবার মুখ ঘুরিয়েই ফিরিয়ে নিল। সুদীপ তাদের আস্তানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ চিৎকার করল সেই সময়ে। তার গলার স্বরে হানাদারেরা এবার থমকাল। ওদের হাতের অস্ত্র বলতে যা দেখা গেল তা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ব্যবহার করা হত। দুটি নিরীহ মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে মনে করায় ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে তেড়ে এল সেই অস্ত্র উঁচিয়ে। জয়িতা তখন শূন্যে গুলি ছুঁড়ল।

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা বহুগুণ বেড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো থমকে গেল। পেছনে পাহাড়ের উল্লাসও থেমে গেল। ততক্ষণে সুদীপ ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জয়িতার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু জয়িতা তাকে হাত নেড়ে

নিষেধ করল। হানাদাররা সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে উলটো পথ ধরার চেষ্টা করছিল কিন্তু জয়িতা দ্বিতীয়বার গুলি করতে তারা থেমে গেল। গুলিটা লেগেছে সামনে দাঁড়ানো হানাদারটির পায়ের কাছে মাটিতে। কিছুটা মাটি তার ফলে ছিটকে উঠেছে। ওরা ব্যাপারটা বোঝার পর যেন পাথর হয়ে গেল।

জয়িতা যে উত্তেজিত এবং অত্যন্ত নার্ভাস তা তার গলার স্বরে বোঝা গেল, 'পালদেমকে ডাক।' তার হাত সামনে প্রসারিত. কালো রিভলভারটা সামান্য কাঁপছে সেই হাতে। দু-দুবার শব্দ হওয়ার পর হানাদাররা এখন পাথরের মত চুপচাপ। সম্ভবত এ জীবনে তারা এমন শব্দ শোনেনি। দুই থেকে তিনে দাঁড়ানো অন্য চেহারার মানুষরা যে শব্দ করছে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় ওরা কি করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু হানাদার নয়, দূরে দাঁড়ানো তাপল্যাঙের মানুষরাও শব্দ শোনার পর বোবা হয়ে গিয়েছিল। এই কদিন যাদের তারা সাধারণ চোখে দেখেছে, প্রতিদিন লক্ষ্য রেখেছে যাতে না পালিয়ে যায় তাদের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে যে অন্ধ ছিল তা স্পষ্ট হওয়ায় তারাও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় সুদীপ চিৎকার, করল 'পা-ল-দে-ম।' তার সঙ্গে গলা মেলাল আনন্দ। আর এই চিৎকারটা হওয়ামাত্র যার দুটো হাত বুকের ওপর সে আচমকা দৌড়তে শুরু করল। জয়িতা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু তার হাত কাঁপছে। গুলি সম্ভবত সাত হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। মরীয়া হয়ে সে দ্বিতীয়বার গুলি করা মাত্র লোকটা আছাড় খেয়ে পড়ল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। শুধু গুলির শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কানে সেঁটে আছে। এবার জয়িতা নিজেই চিৎকার করল, 'পা-ল-দে-ম!'

তারপরে সেই মূর্তিটাকে পেছনের ভিড় ছেড়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। খুব ভীরু পায়ে আসছে পালদেম। যেন তার আসার মোটেই ইচ্ছে নেই। হানাদারদের দলটাকে অনেকটা এড়িয়ে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জয়িতা তাকে বলল, 'লোকগুলোকে মাটিতে বসে পড়তে বল্।' পালদেম সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গলা তুলে হুকুমটা জানিয়ে দিতেই পাঁচজন পুতুলের মত মাটিতে বসে পড়ল। তাদের ভূতগ্রস্তর মত দেখাচ্ছিল। কাঁধে মানুষ নিয়ে যে লোক দুটো দাঁড়িয়েছিল তারা সময় নিল। যাকে ওরা কাঁধে তুলেছিল তার মুখ বাঁধা। কিন্তু হাত পা খোলা। তা সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করেনি। মাটিতে নামিয়ে দেওয়ার পর মেয়েটি সোজা হয়ে বসল খানিকটা তফাতে। সাতজন লোক তখন বসে দূরে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখছে। সম্ভবত শব্দের ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আরও কাহিল হয়ে পড়েছে তারা। জয়িতা পালদেমের সামনে এগিয়ে গেল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। এরা এই গ্রামে কি করতে এসেছিল?'

পালদেম বলল, 'ওরা আমাদের দেবতার মূর্তি চুরি করেছে। ওই যে লোকটা মাটিতে পড়ে আছে ওর কাছে আছে মূর্তি। আর এরা ওই মেয়েটাকে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

'পাশের পাহাড়ে ওদের গ্রাম। আমাদের শত্রু। বহু বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া। আমাদের দেবতার ওপর ওদের খুব লোভ। আমাদের মেয়েদের ওপরেও। আমরা ফসল তুললে ওরা হানা দেয়। সাধারণত ওরা এসব করে বরফ পড়লে। এবার ওরা আগেই সাহস দেখাল।' কথা বলতে বলতে এতক্ষণে পালদেমকে উত্তেজিত দেখাল।

জয়িতা বলল, 'তুমি কি চাও আমরা তোমাদের ওদের হাত থেকে বাঁচাই?'

'হ্যাঁ। আমি গ্রামের লোকদের বলছি ওদের বেঁধে ফেলতে।'

'না। তুমি আমাদের বন্ধু বলে ভাবতে পারোনি। অথচ তোমাদের আবার বলছি, আমরা বন্ধু বলেই মনে করি। তুমি চোরের মত আমাদের সমস্ত অস্ত্র চুরি করেছিলে কিন্তু এটা পারোনি। আর পারোনি বলেই আজ তোমাদের দেবতা এবং গ্রামের মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম। আমি চাই এখনই তুমি আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত দেবে। যাও, চটপট কাজ করো।'

পালদেম হাঁ হয়ে তাকিয়েছিল।

জয়িতা চিৎকার করল, 'তোমার একার বোকামির জন্যে গ্রামের সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমি চাই না। এই ছোট্ট অস্ত্র দিয়ে আমরা বেশিক্ষণ লড়তে পারব না। আমি যা বলছি তা প্রত্যেকের ভালোর জন্যই বলছি। সুদীপ ওর সঙ্গে যা।'

সুদীপ এগিয়ে যেতেই পালদেমকে নড়তেই হল। ওরা যাচ্ছে ঝরনার দিকে।

দৃশ্যটা এখন এই রকম। লোকগুলো এবং মেয়েটি বসে আছে নির্বাক হয়ে। গ্রামের মানুষগুলো দূরে দাঁড়িয়ে। পেছনে উল্লাস নেই। হাওয়া বইছে। কিন্তু শীত যে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তা কারও খেয়ালে নেই। আনন্দ এগিয়ে গেল দূরে পড়ে থাকা লোকটার কাছে । পাশে দাঁড়িয়েই সে বুঝতে পারল লোকটা মরেনি। ওর শরীর কাঁপছে। এমন কি রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে লোকটাকে টেনে তুলতেই কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। গুলি তার গায়ে লাগেনি কিন্তু ভয়ে লোকটা কুঁকড়ে উঠেছে। ওর দুটো হাতে দেবতার সেই মূর্তিটা। সন্তর্পণে সেটি তুলে নিয়ে আনন্দ চিৎকার করল, 'কাহুন কাহুন!'

জনতার মাঝখান থেকে কাহুন তাঁর শিষ্যসমেত বেরিয়ে এলেন। তাঁকেও খুব নার্ভাস মনে হচ্ছিল। আনন্দ তাঁর হাতে মূর্তি দিতে তিনি আশীর্বাদ করলেন। গ্রামের মানুষরা তখন খুশীতে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ কাহুনকে বোঝাতে পারল এই লোকগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে, এখনই। কাহুন সেই নির্দেশটা দেওয়ামাত্র কাজ শেষ হয়ে গেল।

আনন্দ এগিয়ে এল জয়িতার কাছে, 'দু-দুটো গুলি ছুঁড়েছিস কিন্তু একটাও গায়ে লাগেনি। প্লিজ একথা বলিস না যে তুই ইচ্ছে করে গুলি গায়ে লাগাসনি।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল, 'গুলি ছোঁড়ায় আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু এই লোকগুলোকে তুই বাঁধতে বললি কেন? এদের শাস্তি দিলে দুই গ্রামের শত্রুতা কোনদিন মিটবে না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছিস, তাহলে কি করা যায়?'

সেইসময় সুদীপ আর পালদেম ফিরে এল। সুদীপের হাতে একটা বড় টুকরি। কাছে এসে বলল, 'মালগুলো ঠিক আছে কিনা কে জানে! পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল। মেয়েটা কে? ওকে বেঁধেছে কেন? ও তো এই গ্রামের মেয়ে।'

পালদেম মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ তার পাশে গিয়ে বলল, 'ভুল বুঝো না, আমরা কোন শত্রুতা করব না। কিন্তু এগুলো তোমাদের উপকারেই লাগবে।'

পালদেম মাথা নাড়ল কিন্তু সহজ হল না। জয়িতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটিকে বেঁধেছ কেন? ওকে তো এরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ওকে ওই গ্রাম চায়। কিন্তু আমরা ওখানে মেয়ে দেব না। ওকে ওরা মুখ বেঁধেছিল কিন্তু হাত পা বাঁধেনি। তবু ওরা যখন নিয়ে আসছিল তখন ও কোন প্রতিবাদ করেনি। দোষ আছে ওর। ওর শাস্তি ভয়ানক।'

'ভয়ানক কেন?'

'ও বেইমানি করেছে। ওর স্বামী নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। স্বভাব মন্দ। ও অন্য গ্রামে গেলে ওর জমি নিয়ে যাবে, এ হতে পারে না।'

'কেন? গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে করবে না?'

'না। কেউ যেচে নিজের সর্বনাশ করতে চায় না।'

জয়িতা বলল, 'ঠিক আছে, এখন কোন শাস্তি দিও না। এই দলের মধ্যে কে নেতা তা ওদের জিজ্ঞাসা করো তো!'

পালদেম বলল, 'ওই যে ডানদিকের সবচেয়ে বড় চেহারার লোকটা ওই নেতা।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি তোমাদের ভাষায় কথা বলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত গোঁয়ার।'

জয়িতা এগিয়ে গেল লোকটার সামনে। লোকটা মাথা নামিয়ে বসেছিল। জয়িতা সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকাল। লোকটার বয়স তিরিশের নিচে। স্বাস্থ্য যে কোনো পাহাড়িদের চেয়ে ভাল। নাক বেশ উঁচু। চোয়াল শক্ত হল লোকটার। চোখাচোখি হতেই চোখের দৃষ্টি পালটাল। লোকটা সত্যিই গোঁয়ার।

জয়িতা তার অল্প জানা শব্দ ব্যবহার করল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। পালদেম, এর বাঁধন খুলে দাও। তুমি আমার সঙ্গে এদিকে এস।'

বন্ধুদের উপেক্ষা করে সে সোজা আস্তানার দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল পালদেম বাঁধন খুলে দেবার পরও লোকটা নড়ছে না। সে আস্তানার সিঁড়িতে

বসে তাকাল। মেঘ সরছে। ঢলে পড়া চাঁদের শরীর থেকে একটু একটু করে জ্যোৎস্না বের হচ্ছে। দূরের লোকগুলোকে ঝাপসা দেখাচ্ছে এখান থেকে। এবং সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি সুগঠিত মানুষ ধীরে পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

লোকটি সামনে এসে দুটো পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়াল। তার ভঙ্গিতে এখনও স্বাভাবিকতা আসেনি কিন্তু ধীরে ধীরে যে সে স্বভাব ফিরে পাচ্ছে তা বোঝা যায়। লোকটা অবশ্যই জেদী। ওর তাকানো, শরীর দেখলে এমনি সময় কথা বলতে সাহস পেত না জয়িতা। কিন্তু এখন ক্ষমতার চাবি তার হাতে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

লোকটার ঠোঁট একবার কুঁচকে উঠল। তারপর চোখ না সরিয়ে জবাব দিল, 'রোলেন।'

জয়িতা একটু অবাক হল। নামটার মধ্যে বিদেশী গন্ধ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখানে চুরিডাকাতি করতে এসেছ কেন?'

রোলেন কোন জবাব দিল না। বুনো শুয়োরের মত মাটিতে পা ঘষল।

জয়িতা সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'তাপল্যাঙের দেবতাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'এরা গতবার আমাদের ফসল লুঠ করে নিয়ে এসেছিল। ওই দেবতাই ওদের সৌভাগ্যের প্রতীক।'

'তোমরা দুই গ্রামের মানুষ একই ভাষায় কথা বল, পাশাপাশি থাকো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কি? তোমরা কেউই আরামে থাকো না।' জয়িতার নিজের কাছেই কথাগুলো জ্ঞান-জ্ঞান শোনাল।

রোলেন হাসল। ছোট চোখ গোল মুখ সত্ত্বেও হাসিটা বেশ মোলায়েম। বলল, 'ওরা এখন বড়লোক। টাকা দিয়ে খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিস কেনে। তোমরা ওদের বড়লোক করে দিয়েছ। বরফ পড়লে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়।'

জয়িতা বুঝলো এরা সব খবর রাখে। অথচ দুই গ্রামের মধ্যে মুখ দেখাদেখি সম্পর্ক নেই। সে বলল, 'আমাদের কাছে তাপল্যাঙের মানুষও যা তোমরাও তাই। আমরা চাই পাহাড়ের মানুষ সুখে থাকুক। তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবে?'

'কি অনুরোধ?'

'এখন কিছুদিন তোমরা এই গ্রামে হামলা করো না। তোমাদের মোড়ল কে?'

'কাহুনের কথা আমরা শুনি।'

'বেশ, তোমাদের কাহুনকে আমাদের কথা বল। আমরা তোমাদের গ্রামেও যেতে পারি। এই গ্রামের মানুষ যেসব সুবিধে পাবে তোমরাও তাই পাবে। শুধু তার বদলে আমাদের কথা শুনতে হবে, রাজী?'

রোলেন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমরা ভেবে দেখব।'

'ওই মেয়েটাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ওর শরীরে ভাল বাচ্চা হবে। ওর স্বামীর বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রামে স্বাস্থ্যবান মানুষ আছে। তা ছাড়া গ্রামে বাচ্চারও অভাব।'

'তোমাদের সঙ্গে যেতে ওর ইচ্ছে আছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কিন্তু ওকে নিয়ে গেলে ওর জমিও তো তোমরা দাবী করবে!'

'তা তো করবই।'

'আপাতত ওকে এখানে রেখে যাও। তোমরা সবাই যেতে পারো এখন। কিন্তু মনে রেখো এখানে আর হামলা নয়। আমরা তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না। তোমরা তোমাদের গ্রামে ফিরে যাও।'

জয়িতার কথাগুলো লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাদের শাস্তি দেবে না?'

'না। ওরা ফসল চুরি করেছিল বলেই তোমরা এসেছিলে, শোধবোধ হয়ে গেছে।'

লোকটা একবার আকাশে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল সঙ্গীদের দিকে। সঙ্গীরা কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠল। জয়িতার নির্দেশে পালদেম ওদের বন্ধন-মুক্ত করে দিলে ওরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি বসেছিল চুপচাপ। জয়িতা তাকে বলল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না, আমি ঘরে যাব না।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'জানি না। গ্রামের কোন পুরুষ আমাকে নেবে না। ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তোমরা বাধা দিলে কেন? আমি এখন কি করব!' কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

জয়িতা ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তুমি একজন মানুষ। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।'

ছিটকে সরে গেল মেয়েটি। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি একটা মেয়ে। জীবনে যদি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ না পেলাম তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি।'

॥ ৪০ ॥

জয়িতা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তার মনে হল সে বোধ হয় সব কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছে না। কোন মেয়ে প্রকাশ্যে এই রকম আকাঙ্ক্ষা নির্লজ্জ ভঙ্গিতে জানাতে পারে? আনন্দ এবং সুদীপ এগিয়ে এসেছিল। গ্রামের লোকেরাও ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এখন। বন্দীদের ছেড়ে দেওয়াতে ওদের মুখে স্পষ্টতই অসন্তোষ। কিন্তু এখন এই যুবতীকে নিয়ে কি করা যায় সেটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি বলছে রে? ওরা কি ওকে অসম্মান করেছে?'

জয়িতা কোন উত্তর দিল না। ওর শরীর ঘিন ঘিন করছিল। মেয়েটাকে তার হঠাৎ খুব কুৎসিত বলে মনে হল। যেন একটা আকাঙ্ক্ষা ওর সমস্ত সৌন্দর্যের ওপর কাদা ছড়িয়ে দিয়েছে। সে কোনরকমে জিজ্ঞাসা করতে পারল, 'তোমার এমন কথা বলতে লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা করবে কেন? আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি? আমি কি তোমার মত মেয়ে হয়েও ছেলে সেজে থাকি?' প্রশ্নটা স্বাভাবিক গলায় নয়।

ওর তীব্র কণ্ঠ যেন সমস্ত চরাচরে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেটা কানে যাওয়ামাত্র জয়িতার শরীরে যেন হিমালয়ের বাতাস ঢুকে পড়ল। তার কাঁপুনি এল। কোনরকমে পালদেমের দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারল, 'একে তোমরা বোঝাও।'

তারপর যেন শীতলতা অতিক্রম করতেই সে জোরে জোরে পা চালাল। সুদীপ এবং আনন্দ তো বটেই, গ্রামের তাবৎ মানুষ অবাক হয়ে ওর যাওয়াটা দেখল। এই যাওয়াটা যে স্বাভাবিক নয় তা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট কিন্তু কারণটা নিয়ে কেউ একমত হতে পারত না। আনন্দ দেখল জয়িতা তাদের আস্তানার ভেতরে ঢুকে গেল। সে পালদেমকে বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার তোমরা শুয়ে পড়।'

পালদেম এগিয়ে গেল গ্রামবাসীদের কাছে। ওরা নিচু গলায় কথা বলল কিছুটা সময়। তারপর পালদেম ফিরে এসে বলল, 'ওদের ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করা হয়নি। আমাদের ভয় হচ্ছে ওরা আবার আক্রমণ করতে পারে চোরের মত। এখন আর সামনা-সামনি আসবে না তোমাদের জন্যে। তাছাড়া ওরা আমাদের দেবতাকে নোংরা হাতে স্পর্শ করেছে। এই অন্যায়ের জন্যেও ওদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।'

আনন্দ বলল, শাস্তি দিলে অপরাধ আরও বেড়ে যেত। তোমরা নিশ্চয়ই চাও শান্তিতে বসবাস করতে। ওরা যদি আবার আক্রমণ করে তাহলে আমরা কোন দয়া দেখাব না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখো তোমরা।'

পালদেম তার গ্রামবাসীদের এই কথা জানালে তারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরতে লাগল। এখন আকাশে চমৎকার জ্যোৎস্না। ও-পাশে পাহাড়ের গায়ে যেন রুপোর ঢল নেমেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল। দেখা গেল সমস্ত মানুষ চলে যাওয়ার পরেও মেয়েটি মাটি থেকে ওঠেনি। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে চুপচাপ বসে আছে। সুদীপ তাকে ডাকল, 'এই যে, তুমি এখানে বসে আছ কেন?'

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গিতে এক ধরনের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত জেদ প্রকট

হচ্ছিল। সুদীপ চিৎকার করে পালদেমকে ডাকল। পালদেম ফিরে যাচ্ছিল। বন্দী-মুক্তির কারণে সে যে সন্তুষ্ট নয় তা বোঝা যাচ্ছিল। ডাক শুনে সে পেছন ফিরে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করেই বলল, 'এই মেয়েটা যে এখানে একা পড়ে রইল।'

পালদেম নিরাসক্ত গলায় বলল, 'তাতে আমার কি?'

হঠাৎ মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'আমার কি, আমার কি!'

সুদীপ চাপা গলায় আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাগল হয়ে গেল নাকি?' তারপর পালদেমকে ইশারায় ডাকল। নিতান্ত বাধ্য হয়েই পালদেম ফিরে এল। সুদীপ বলল, 'একে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

পালদেম বলল, 'কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামের লোকের ধারণা ওর প্রশ্রয় না পেলে ওরা এখানে আসত না।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ধারণা, প্রমাণ তো নেই।'

'প্রমাণ আছে। ওকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তখন একটুও চিৎকার করেনি সাহায্যের জন্যে। তারপরেও ওর হুঁশ হয়নি জো-কে অপমান করেছে।' পালদেম জানাল।

'জো!' সুদীপ অবাক হল, 'জো কে?'

'যে আমাদের সম্মান বাঁচাল। তোমাদের বন্ধু।'

সুদীপ এবার হো হো করে হেসে উঠল, 'বাঃ, সুন্দর নাম দিয়েছ তো! জয়িতা থেকে জো!'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু পালদেম, এভাবে পড়ে থাকলে তো ও মরে যাবে ঠাণ্ডায়। তোমরা ওকে অন্য গ্রামে যেতেও দেবে না, আবার গ্রামেও জায়গা দিতে চাইছ না, এটা কি রকম ব্যাপার?'

হঠাৎ পালদেম বলল, 'এটাই এই গ্রামের নিয়ম। ও থাকবে নিজের মত। যতদিন গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে না করছে ততদিন ও কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। অবশ্য যেহেতু ও একবার সংসার করেছে তাই বিয়ে না করেও কেউ যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলে একই কথা হবে। এসব ও জানে। তাই নিজে থেকে ফিরে যাচ্ছে না ঘরে। আমি চলি।'

ওকে চলে যেতে দেখে আনন্দ মন্তব্য করল, 'ভাগ্যিস বলেনি এটা আমাদের গ্রামের ব্যাপার, তোমরা নাক গলিও না।'

সুদীপ বলল, 'এখন আর বলবে না। মালপত্তর হাতছাড়া হয়ে গেছে তো। কিন্তু একে নিয়ে কি করা যায়?'

আনন্দ কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়াল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না। আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই গ্রামে যেতে চাও?'

মেয়েটা এবার মুখ তুলে তাকাল। এখন তার চোখে জল। ঠোঁট কাঁপছে। কোনরকমে বলল, 'ওরাও আর আমাকে নেবে না। আমি মরে যেতে চাই। আমার কেউ নেই, কেউ নেই।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে মরবে?'

মেয়েটা হাত তুলে দূরের পাহাড় দেখাল, 'ওই ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ব।'

সুদীপ বলল, 'ওটা কালকে করলে হয় না? আজকের রাতটা একটু ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।'

মেয়েটা এবার উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ, না? ঠিক আছে, আমি মরে দেখাচ্ছি।' কথা শেষ করেই মেয়েটা পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল।

'আনন্দ উত্তেজিত হল, 'সর্বনাশ, ও সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সুদীপ, ইনস্যানিটি গ্রো করেছে। ওকে থামা। কেন যে ইয়ার্কি করিস।'

সুদীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার সে-ও ছুটল। খানিকটা উঁচু পথ ভাঙতেই তার হাঁফ ধরে গেল। কিন্তু এই নির্জন হিম-জ্যোৎস্না রাত্রে একটি মেয়ে পৃথিবীতে আর থাকতে চাইছে না শুধু তার রসিকতার কারণে এই বোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা কোনদিকে তাকাচ্ছে না। সুদীপ ক্রমশ দূরত্বটা কমিয়ে আনছিল। এই পথের শেষেই খাদ। সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মেয়েটির হাত ধরল। স্পর্শ পাওয়ামাত্র তীব্র চিৎকার করে মেয়েটি ঝটকা মারল নিজেকে

ছাড়িয়ে নিতে। সুদীপ প্রথমে টালমাটাল হল। মেয়েটির শরীরে ভাল শক্তি আছে। ওর নখের আঘাতে তার মুখ জ্বলছে। মুহূর্তের জন্যে আলগা হয়েছিল মেয়েটি। এবং সেই সুযোগে আবার ছুটতে চাইল। আক্রমণ, বিশেষত নখের জ্বালায় মাথায় আগুন জ্বলে গেল সুদীপের। সে প্রচণ্ড জোরে মেয়েটিকে আঘাত করল। মেয়েটি টলে গেল, তারপর হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পাথরের ওপরে যেখান থেকে খাদের দূরত্ব খুব বেশি নয়। চাঁদের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে সুদীপ নিজের মুখে হাত বোলাচ্ছিল। তার গালের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরা এখনও বন্ধ হয়নি। শালা, মেয়েটার উপকার করতে গিয়ে এই হল! নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। সেই সময় আনন্দর গলা কানে এল, 'মেরে ফেললি নাকি? অত জোরে মারতে আছে?'

'জ্ঞান দিস না। দ্যাখ, আমার মুখের কি অবস্থা করেছে! নেকড়ে মাইরি, পাহাড়ি নেকড়ে!' সুদীপ ঝাঁঝিয়ে উঠল।

আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকাতে জ্যোৎস্নায় রক্ত দেখল। সে একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'চটপট ঘরে গিয়ে ডেটল লাগা। মানুষের নখের বিষ তার ওপর।' সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। ঝুঁকে দেখল ওর নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু চেতনা নেই। আঘাত বোধ হয় বেকায়দায় হয়ে গেছে। এখন যদি মেয়েটার কিছু হয় তাহলে গ্রামবাসীরা উলটে তাদের দায়ী করবে। সুদীপটা এখানে আসার পর থেকে ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় একটার পর একটা ঝামেলা বাধাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দ উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এটা কি করলি? এত জোরে কাউকে মারতে আছে? এ মেয়েটা মরে গেলে কি হবে?'

'ও তো মরতেই যাচ্ছিল।' সুদীপ এগিয়ে এল কাছে, 'ঠিক আছে, তুই যা, আমি দেখছি।'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। সে আর দাঁড়াল না। আর একটা নতুন ঝামেলা আসছে কিন্তু তার কিছু করার নেই। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসিস। রাত শেষ হতে চলল।'

সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটার মাথার পাশে একটা পাথরে বসল। এখন তার আরও বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আনন্দর চলে যাওয়া দেখল। একটু ঝুঁকে সে মেয়েটার গালে চড় মারতে লাগল আলতো করে, 'অ্যাই অ্যাই মেয়েটা, উঠে পড়।' বেশ খানিকটা চেঁচামেচির পর চোখ মেলল মেয়েটা। দৃষ্টি স্বচ্ছ হতেই সে আতঙ্কিত হতে গিয়ে অবাক হল। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আঙুল তুলে সে সুদীপের মুখটাকে দেখতে চাইল। সুদীপ ঠোঁট ওল্টাল, 'এ তোমারই দান খুকী। এবার ঘরে যাও।'

বাংলায় বলার জন্যেই সম্ভবত মেয়েটা কিছু বুঝতে পারল না। সুদীপ এবার তাকে হাত ধরে দাঁড় করাল। উঠে দাঁড়িয়েই মেয়েটা আবার কান্না শুরু করল। একটু নার্ভাস গলায় সুদীপ তাকে বলল, 'শোন, আত্মহত্যা করা খুব কাজের ব্যাপার নয়। কার জন্যে নিজেকে মারছ? পৃথিবীটা কি ভাল, একে ছেড়ে যেতে হয়! ওই দ্যাখ, মাথার ওপর কি সুন্দর চাঁদ! তুমি একে আর দেখতে পাবে মরে গেলে? অবশ্য এখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আর খাদে ঝাঁপ দিতে হবে না, এমনিতেই পৃথিবী ছাড়তে হবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। চল।' এসব কথাই সুদীপ বলছিল হিন্দীতেও নয়, কিন্তু মেয়েটা যেন তার অর্থ বুঝতে খুব চেষ্টা করছিল। এবং তাব হাতের ইঙ্গিত বুঝে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুদীপ ওর কাঁধ ধরে টানতে মেয়েটা সম্মোহিতের মত হাঁটতে লাগল। পুরোটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। গ্রামের ভেতর ঢুকে সুদীপ ভাঙা শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঘরটা কোথায়?' মেয়েটা এবার চারপাশে তাকাল। তারপর একটা খোলা দরজা আঙুল তুলে দেখাল। সেই দরজার কাছে ওকে পৌঁছে নিয়ে সুদীপ ফিরল। যেন হঠাৎ বিরাট একটা বোঝা তার মাথা থেকে নেমে গেল। অত্যন্ত হালকা পায়ে সে চাঁদ মাথায় নিয়ে হাঁটতে চোখ তুলল ওপরে। তারপর স্মৃতি থেকে শব্দ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল, 'এইখানে/পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে/ এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে। তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই/ তাদের হৃদয়ে কোন সভাপতি নেই;/ শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের/ কংগ্রেসের মত কোন আশা হতাশার কোলাহল নেই।'

আস্তানায় ফিরে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আনন্দ প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'তোদের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব জয়িতা।' একজন দার্জিলিং-এ গেল তো গেলই। আর একজন এমনভাবে মেয়েটাকে মেরেছে যে মরে গেলে আর দেখতে হবে না। তারপরে তুই-ও!'

'আমি কি?' জয়িতার গলা তীক্ষ্ণ, 'আমি তোর কি অসুবিধে ঘটালাম?'

'এই ঠাণ্ডায় তুই আমাকে বাইরে যেতে বললি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতে নিজেই যাচ্ছিস। ব্যাপারটা কি তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করছিস না। হঠাৎ যে কি খামখেয়ালিপনা শুরু হল সবার!'

'তুই অযথা উলটাপালটা ভাবছিস।'

'অযথা? ও। তোর যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন থাকে সেটা বলতে পারতিস। প্রশ্ন করলে যা হোক জবাব দিতে কি হয়? উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং হেয়ার। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক চাই না।'

'ঠিক আছে। আমি নিজে কিভাবে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তুই ভুলে গেছিস আমি একটা মেয়ে। আই অ্যাম হ্যাভিং মাই পিরিওড্। এই ঘরে সবার সামনে—!' জয়িতার গলাটা থেমে গেল।

'যাচ্চলে! এটা নিয়ে এত ভাবনা করার কি আছে! এতক্ষণ বলতে কি হচ্ছিল! তোরা না এখনও এইট্টিন সেঞ্চুরিতে থেকে গেলি। এটা অন্তত তোর কাছে আশা করিনি।'

'তুই এমন গলায় বলছিস যেন আমার হাত কেটে গেছে!'

'তার বেশি কি! শোন, ওই ব্যাগটা এখানে আনার পর খোলা হয়নি। ওটা তোর প্রয়োজনে লাগবে। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'কি আছে ওতে?'

'তোর প্রয়োজনীয় জিনিস।'

'মাই গড! তুই এসব এনেছিস? কখন আনলি?'

আনন্দর গলা শোনা গেল না। কিন্তু দরজা খোলার শব্দ হল। জয়িতার চিৎকার কানে এল, 'আনন্দ, তুই খুব ভাল, খুব। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।'

আনন্দকে দেখা গেল, 'থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না। ছেলে বলেই ভেবে এসেছিস এতদিন, বন্ধু বলে নিতে পারিসনি!' তারপরেই আনন্দ সুদীপকে দেখতে পেল। সুদীপ চুপচাপ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েছিস?'

সুদীপ নীরবে ঘাড় নাড়ল। আনন্দ এগিয়ে এল, 'এই নে, আচ্ছা দাঁড়া, মুখ তোল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।' সুদীপ দেখল আনন্দর হাতে ডেটল আর তুলো। সে ঠোঁট কামড়াল। হঠাৎ তার শরীর সমস্ত জলকণা বুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। প্রাণপণে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করছিল সে। আনন্দ ডেটলে ভেজানো তুলো মুখে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছিস! এত জ্বলছে?'

সুদীপ কোন কথা বলল না। অনেক কষ্টে সে নিজেকে অতিক্রম করতে পারল। তারপর ছাউনির তলায় পা ভাঁজ করে বসল। আনন্দ বসতে বসতে বলল, 'যা ঠাণ্ডা, আমার স্কিন-ডিজিজ না হয়ে যায়। নাক-টাক সবার ফেটে গেছে।'

সুদীপ কিছু বলল না। ওর কথা বলতে খুব ভয় হচ্ছিল। জ্যোৎস্না ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে। চাঁদের যেন আর সে তেজ নেই। সুদীপ লক্ষ্য করল আনন্দ জয়িতার ব্যাপারটা বলল না। একই বয়সী, অথচ এই মুহূর্তে সুদীপের মনে হল আনন্দ অনেক এগিয়ে আছে। সে এইভাবে কথা বলতে পারত না জয়িতার সঙ্গে।

আনন্দ বলল, 'আর ক'দিনের মধ্যে বরফ পড়বে। আমরা তো কেউ কখনও বরফের মধ্যে থাকিনি। বই-পড়া বিদ্যেগুলো কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু এ বছর খুব দেরি হয়ে গেলেও, এর মধ্যে বুঝলি, যতটা পারি গুছিয়ে নিতে হবে যাতে লোকগুলো বরফের সময় কিছুটা আরাম পায়।' সে যেন কিছু ভাবছিল, 'সুদীপ, কাল তুই একটা কাজ করিস। এই গ্রামে ঠিক কটা পরিবার আর পরিবার পিছু মানুষের সংখ্যা কাউন্ট করে নিস। সেই বুঝে আমাদের একটা হিসাব করতে হবে। এই গ্রামটার চেহারা একদিন পালটে দিতে হবে সুদীপ। প্রত্যেকটা মানুষ যেন বুঝতে পারে সে জন্মেছে শুধু মরে যাওয়ার জন্যে নয়।'

আনন্দর স্বরে উত্তেজনা ছিল। সুদীপ ওর দিকে তাকাল। আনন্দর বাবা নকশাল রাজনীতি করতেন। আনন্দ একদিন বলেছিল ওর প্রপিতামহ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের শরিক ছিলেন, জেলও খেটেছেন। ওর রক্তে অনেক বিশ্বাস অবিশ্বাস মেল্যামেশি হয়ে নিজস্ব চেহারা তৈরি করে নিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষের চেহারা ফেরানোর কথা অনেকেই ভাবে। কিন্তু সেটা ভাবনার পর্যায়ে থেকে যায়

বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাঁচার তাগিদে যারা আঁতাত করে তাদের ওরা গালাগাল দিয়ে থাকে। তত্ত্বের বাঁধা পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সংশোধনবাদের গালাগালি কপালে জোটে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে বিপ্লবটাকে দেখিয়ে দেয় না। নিজের নিজের নিরাপদ বৃত্তে বাস করে কম্যুনিজমের তত্ত্বটাকে কপচে যাওয়ার মধ্যে একটা বিপ্লবী চরিত্র প্রকাশ করাই এদের একমাত্র মুক্তি। এই সব চিন্তা শুধু রোবট তৈরি করায় বিশ্বাসী, মানুষ সৃষ্টিতে নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আনন্দ তারপর তারা অবশ্যই ব্যতিক্রম। এই দেশে ব্যক্তি হত্যা বা অস্ত্র ব্যবহার করে কখনও বিপ্লব আসবে না। বিপ্লব আসতে পারে ভালবাসা যদি প্লাবনের মত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। একটা গ্রাম, একেকটা গ্রাম, সেই গ্রামগুলোর সমষ্টি একটা জেলা, সেই জেলাগুলোর সমষ্টি, একটা প্রদেশ এবং প্রদেশগুলো একত্রিত হয়ে গেলে পুরো একটা দেশ যখন একসঙ্গে হাত মেলাবে তখনই বিপ্লব। এই গ্রামে কোন মধ্যবিত্ত নেই। উচ্চবিত্ত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অনেক মানুষ আছে এইখানে। 'স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে/এরা তবু মৃত নয়।' জীবনানন্দের লাইনগুলো গুন-গুন করল সে আনমনে।

সেটা কানে যাওয়ামাত্র আনন্দ মুখ ফেরাল, 'বাঃ, একটা পদ্য বল্ তো।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। কবিতার কথা মনে হলেই উলটোপালটা লাইন মাথায় আসছে। তুই বল্।'

আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর দরাজ হল, "তোমাকে দেখার মত চোখ নেই তবু/গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি/আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।/কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ/বহুদিন থেকে শান্তি নেই—" কে আসছে?'

শেষ শব্দ দুটো যেন কবিতারই মনে হয়েছিল সুদীপের। চোখ তুলতে দেখল মাঠ ভেঙে উঠে আসছে কেউ। এত রাত্রে, বলা যায় রাত শেষের রাত্রে, ওই রকম ক্লান্ত পায়ে কে আসে? সুদীপ বলল, 'বুঝতে পারছি না!'

পেছন থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল, 'থামলি কেন আনন্দ?'

ওরা মুখ ফিরিয়ে দেখল, জয়িতা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। মৃত জ্যোৎস্নায় তাকে যেন অশরীরী বলে মনে হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'কেউ আসছে, কল্যাণ নয় তো!''

সুদীপ বলল, 'দূর! ওই হাঁটা ছেলেদের হতেই পারে না।'

জয়িতা টিপ্পুনি কাটল, 'আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা-বিশেষজ্ঞ আছে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'বাংলাও বলতে পারিস না? ওই শব্দটার মানেও জানিস না।'

এই সময় মেয়েটিকে ওরা দেখতে পেল। সুদীপ বলে উঠল, 'একি রে! এ যে আবার ফিরে এল!'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কেসটা দ্যাখ তো!'

জয়িতা এগিয়ে এল বারান্দার কোণায়। মেয়েটি ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি ও ঘরে একা থাকতে পারব না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? তোর সঙ্গে কে থাকত এতদিন?'

মেয়েটা উত্তর দিল না কথাটার। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সঙ্গে এতদিন কে ছিল বললি না, কিন্তু কেন থাকতে পারবি না সেটা বল্!'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয়! কেন ভয় করছে? তুই তো বেশ ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিলি না!'

'সেই জন্যেই তো ভয় করছে। গেলামও না, আবার গ্রামের কোন পুরুষও আমার কাছে এখন ঘেঁষবে না। এই সুযোগে দানোটা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। দানো যে মেয়ের ওপর—।'

'দানোটা কে?'

'পাহাড়ে রাত হলে কেঁদে কেঁদে ডাকে, শোননি তোমরা?'

'তাহলে তুই কি চাস?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। এখানে।'

হঠাৎ জয়িতার গলা শীতল হল, 'না। তোমার এখানে থাকা চলবে না। ঠিক আছে, তোমার যদি ওখানে একা শুতে ভয় করে তাহলে আমি থাকব তোমার সঙ্গে। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তার ভয়ে

তোমার দানোর বাবাও কাছে আসবে না।' তারপর আনন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যদি ওর ঘরে থাকি তোদের আপত্তি আছে?'

'উইদ প্লেজার।' সুদীপ বলল, 'এতে তোর প্রাইভেসিও থাকবে। কিন্তু মেয়েটা মনে হচ্ছে আমার প্রেমে পড়েছে। কেমন ঘুরে ঘুরে আমার দিকে তাকাচ্ছে দ্যাখ!'

জয়িতা কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সুদীপ মেয়েটাকে বলল, 'তুমি আমায় কি করেছ দ্যাখো! গ্রামের অন্য কেউ হলে তোমাকে মেরেই ফেলত।'

মেয়েটা ঝকমকিয়ে হাসল, 'গ্রামের কেউ হলে আমাকে বাঁচাতেই যেত না।'

এই সময় জয়িতা তার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল, 'আনন্দ, সুদীপটাকে বারণ কর। ও বেড়ালটাকে মাছ দেখাচ্ছে। মানুষকে প্রভোক করা একই অপরাধ।'

ঠিক তখনই চিৎকার উঠল। কান্নাটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে সেই নারীকণ্ঠের বিলাপ শুনছিল। ক্রমশ সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের ঘরে কণ্ঠ পরিষ্কার হল। এই সময় সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বলে উঠল, 'যাঃ, মরে গেল!'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র বিছানা ফেলে রেখে জয়িতা দৌড়তে লাগল। আনন্দ একবার ঘরের দিকে তাকাল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কে মরেছে রে?'

আনন্দ বলল, 'মনে হচ্ছে সেই বাচ্চা মেয়েটা। তুই এখানে থাক। ঘরে মালপত্রগুলো আছে। তাছাড়া ওরা এখন তোকে দেখুক তা আমি চাই না।' বলেই সে ছুটল। সুদীপ খুব নার্ভাস হয়ে গেল।

এখন অবশ্য তাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ওই মেয়েটা যদি মরে যায় তাহলে গ্রামের মানুষরা ছেড়ে দেবে না বলে শাসিয়ে রেখেছে। তার মনে হল অস্ত্রগুলো হাতের কাছে রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপরেই সে মন পালটাল। সে বাচ্চা মেয়েটার কোন ক্ষতি করেনি। উপকার করতে গিয়ে যদি লোকে ভুল বোঝে তো তার কিছু করার নেই। দেখাই যাক কি হয়! সে দেখল মেয়েটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গেলে না?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না।'

মেয়েটি হাসল, 'না গিয়ে ভালই করেছ। ওরা তোমাকে দেখলেই ক্ষেপে যেত। বউটার তো আর বাচ্চা হবে না। পনেরো বছরের স্বামী এতদিন ছেলের মতন ছিল।'

'তুমি যাও না।' সুদীপ মেয়েটিকে এড়াতে চাইল এবার।

'না বাবা। আমি মৃত্যু দেখতে পারি না। ভীষণ ভয় লাগে।' মেয়েটি উদাস গলায় বলল।

'ভয় লাগে অথচ নিজে তো মরতে যাচ্ছিলে।' সুদীপ খিঁচিয়ে উঠল।

মেয়েটি কিছু মনে করল না। সুদীপের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

জয়িতা দেখল বেশ ভিড় জমে গেছে এর মধ্যে। মেয়েটির মা পাগলের মত মাথা ঠুকছে। বোঝা গেল একটু আগেই ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। জয়িতাদের দেখে ভিড় আলগা হল। ওরা সেই পথে ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। মেয়েটির কিশোর স্বামী মাথা নেড়ে জানাল মরে গেছে। এবার মহিলার নজর পড়ল ওদের দিকে। জয়িতা ভেবেছিল সে নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড করবে। কিন্তু কিছুই না করে আশ্চর্যজনকভাবে কান্নাটা থামিয়ে দিল। জয়িতা এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। এখন কিছুই করার নেই। আনন্দ বাইরে বেরিয়ে এল। তার মনে হল উপস্থিত জনতা তাকে লক্ষ্য করছে। পালদেম ধারেকাছে নেই। সম্ভবত ও কোন অপ্রিয় ব্যাপারের মুখোমুখি হতে চায় না। কাউকে ডেকে নিজেদের অপরাধহীনতার কথা বোঝানোর চেষ্টা করাও বৃথা। সে ঠিক করল পরিস্থিতি যেমন হবে তেমন করা যাবে। ভেতর থেকে আর কান্না ভেসে আসছে না। হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল চারপাশ। আজ তাপল্যাঙের মানুষ ঘুমোতে পারছে না। আগুন জ্বলে উঠেছে চার-পাঁচ জায়গায়। সেগুলো ঘিরে বসে আছে সবাই। অন্ধকারে কোন মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেলে ভোরের জন্যে জেগে বসে থাকতে হয়। কারণ চোখ বন্ধ করলেই মৃতরা ডাক দিতে পারে সঙ্গী হওয়ার জন্যে।

এই সময় কাহুনকে আবার নেমে আসতে দেখল আনন্দ। গম্ভীরমুখে দুজন অনুচরকে নিয়ে কাহুন এগিয়ে যাচ্ছেন ঘরের দিকে যেখানে মৃত মেয়েটি শুয়ে রয়েছে। আনন্দর সামনে দিয়ে তিনি যখন

যাচ্ছিলেন তখন সে নীরবে মাথা নাড়ল। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না কাহুনের মধ্যে। এবার পালদেমকে দেখা গেল। কোন একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে সে নিশ্চয়ই বসেছিল, কাহুনকে দেখে এগিয়ে এল। দুজনে চাপাগলায় কিছু বলল। তারপর দুজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মুহূর্তের জন্যে আনন্দর মনে হল এই অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ওরা লাফিয়ে পড়তে পারে তাদের ওপরে। এবং কাহুন যদি নির্দেশ দেন ধর্মের নামে তাহলে তো কথাই নেই। বন্দুকের সঙ্গেও হয়তো খালি হাতে লড়ে যেতে চাইবে। অতএব এখান থেকে আপাতত আস্তানায় সরে যাওয়াই উচিত। রাতের অন্ধকারে মানুষের মুখ যতই অচেনা হয়ে যাক দিনের আলোয় তার মোকাবিলা করা সহজ। সে চিৎকার করে জয়িতাকে ডাকল। এবং তার এই চেঁচিয়ে কথা বলায় গ্রামবাসীরা তো চমকে তাকালই, তার নিজের কানেও অত্যন্ত কর্কশ ঠেকল।

জয়িতা বেরিয়ে এল বিস্মিত মুখে। চারপাশে তাকিয়ে আনন্দকে লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুত দূরত্বটা কমিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরকম অসভ্যের মত চিৎকার করছিস কেন?'

আনন্দ বলল, 'আই অ্যাম সরি। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের এখানে থাকাটা উচিত হবে না।'

'কেন? তোকে কেউ কিছু বলেছে?' জয়িতা যেন তখনও বিরক্ত।

'না। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। পালদেম তো সামনেই আসেনি। ওরা বলেছিল মেয়েটা মরে গেলে আমাদের ছাড়বে না। আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।' আনন্দ চারপাশে তাকাল।

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'ওরা আমাদের ভয় করছে। আমাদের হাতের অস্ত্রের শক্তি ওরা বুঝেছে। উপায় ছিল না, কিন্তু এভাবে ভয় বাড়াতে আরম্ভ করলে আমাদের কখনই ওরা বিশ্বাস করতে পারবে না। এই গ্রামে আমরা চিরকালই বিদেশী হয়ে থাকব। ওরা ভয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছে না।'

'তোর সঙ্গে বলছে? তোরই হাতে রিভলভার ছিল।' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রথমে করেনি। কিন্তু মেয়েটার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই যেই আমার চোখে জল এসে গেল তখন আবার কাঁদতে শুরু করেছে।'

'মহিলা তোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল?' জয়িতার কথা অবিশ্বাস্য ঠেকল আনন্দর কাছে।

'শোক বড় বিচিত্র অনুভূতি। ধরাবাঁধা ব্যাখ্যায় তাকে ধরা যায় না। মেয়েটির শেষকৃত্য হবে সূর্য ওঠার মুহূর্তে। সেই অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নেব। তুই সুদীপকে ডাক।' কথাটা শেষ করে জয়িতা আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার নিজেকে একজন টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বলে মনে হল। অতিক্রম করতে চায় সে কিন্তু এক একটা শেকড় এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে—। কাকে দোষ দেবে সে এ জন্যে? এখানে আসার পর জয়িতা যতটা সহজ এবং খোলা মনে এগোচ্ছে ততটা সে কেন পারছে না? আনন্দ হাঁটতে শুরু করল। শিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত করে। একটু একটু করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাই তো আসল কথা।

আস্তানায় ফিরে সুদীপকে সে বাইরে দেখতে পেল না। আনন্দ একটু বিস্মিত হল। তারপর ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে মুখ বাড়াল, 'সুদীপ?'

সুদীপের গলা ভেসে এল, 'বল্।'

'ও তুই শুয়ে পড়েছিস! ওঠ।'

'আবার উঠতে হবে কেন? সারাটা রাত এভাবে জেগে থাকা যায়?'

'মেয়েটাকে সূর্যোদয়ের সময় সৎকার করা হবে। আমাদের তিনজনের সেখানে থাকা উচিত।'

'আমাকে দেখলে ওরা খেপে যাবে না?'

'যেতে পারে, আবার নাও পারে।'

'তাহলে?'

'রিস্ক নিতে হবে।'

'আমি সঙ্গে মাল নিয়ে যাব।'

'না। সেটা আরও শত্রুতা বাড়াবে। মেয়েটা কোথায়?'

'ও-পাশে শুয়ে আছে।'

'অ্যাঁ, এই ঘরে?'

'তাছাড়া ঠাণ্ডায় যাবে কোথায়? ও একটু বেশি বকে, কিন্তু মনটা ভাল।'

'এর মধ্যে মনের খবর নিয়ে ফেলেছিস!'

'বাজে বকিস না। প্রেমট্রেম আমার দ্বারা হবে না।' সুদীপ উঠে একটা মোমবাতি জ্বালাল, 'মোমবাতির স্টক শেষ হয়ে আসছে।'

'অনেক কিছুই শেষ হয়ে আসছে।'

'আনন্দ, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদির দলের স্বার্থের ক্ষতি না করে তাহলে তোদের কিছু বলার নেই। শুধু উটকো মন্তব্য করিস না।' সুদীপ আবার পোশাক চড়িয়ে নিচ্ছিল।

আনন্দ দেখল মেয়েটা খানিকটা দূরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। এই ঠাণ্ডায় কোন মানুষ ওইভাবে শুয়ে থাকতে পারে বিছানা ছাড়া? সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, 'ওঠো।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে তুলছিস কেন?'

'এই ঘরে ওকে একা রেখে যেতে পারি না।'

মেয়েটি থতমত হয়ে উঠে বসল। সুদীপ তাকে ইশারায় ডাকল বেরিয়ে আসতে। কোন প্রতিবাদ না করে মেয়েটি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আনন্দ লক্ষ্য করল মেয়েটি সুদীপের পেছন পেছন হাঁটছে। ব্যাপারটা তার ভাল লাগল না কিন্তু কোন মন্তব্য করল না সে।

ভোর হতে আর দেরি নেই। আকাশে স্বর্গীয় রঙের খেলা শুরু হয়েছে। পাহাড়ের চূড়োয় বরফ আরও নিচে নেমে এসেছে। এই সময় ওরা চিৎকারটা শুনতে পেল। ওপাশের পাহাড় থেকে চিৎকার করতে করতে মানুষটা নেমে আসছে। আনন্দরা তখন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। দৌড়তে দৌড়তে মানুষটা কাছে আসতে প্রথমে চিনতে পারেনি আনন্দ। ছেলেটা একটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে পালদেম ছুটে এল তার কাছে। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। প্রায় সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। আগুনের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা চলল কিছুক্ষণ। কেউ যেন একটা পাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল। একটু ধাতস্থ হয়ে ছেলেটা কথা বলতে শুরু করল জড়িয়ে জড়িয়ে। খানিকটা শোনার পর পালদেম চমকে আনন্দের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটির এক হাতে তখনও বিরাট ঝোলাটা ধরা। পালদেম সেটাকে ছাড়িয়ে নিল আস্তে আস্তে। পালদেমের দৃষ্টি অনুসরণ করে আনন্দ কাছে যাওয়ামাত্র ছেলেটি আচমকা কাঁদল।

পালদেম মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'তোমাদের বন্ধুকে পুলিশ মেরে ফেলেছে।'

বুকের মধ্যে ধক্ করে লাগল আনন্দর। তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। কল্যাণ নেই? কল্যাণ! সে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

পেছন থেকে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? পালদেম কি বলল?'

পালদেম বলল, 'তোমাদের বন্ধু আমাদের বন্ধু। না হলে সে আমাদের জন্যে ওষুধ আনতে যেত না। ওষুধ এনে এই ছেলেটির হাতে পৌঁছে দিতে পারত না।'

হঠাৎ ছুটে এল সুদীপ ছেলেটির সামনে। দু'হাতে তাকে খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? কল্যাণের কি হয়েছে?'

ছেলেটি কোন কথা বলতে পারল না। কোনরকমে ঝোলাটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল। সুদীপ সেখানে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেল। রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। সে পাগলের মত ঝোলা খুলতেই প্রচুর ওষুধ এবং সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল। সব কিছুই রক্তের ছোঁয়ামাখা। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। গ্রামের মানুষগুলো পাথরের মত মাথা নিচু করে চারপাশে দাঁড়িয়ে। আনন্দ কোন কথা বলতে পারছে না। তার চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সে কল্যাণের মুখটাকেই কল্পনা করতে পারছিল না। এই সময় জয়িতার গলা পাওয়া গেল, 'পালদেম, কাহুন বলছেন আর দেরি করা যাবে না।'

পালদেম তার দিকে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'জয়ী, কল্যাণ মরে গেছে। আমি —আমি ওকে—।'

জয়িতার মুখ অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ঈশ্বরীর মত মনে হচ্ছিল। সে আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর

গ্রামের মানুষদের বলল, 'আমাদের এক বন্ধুর কথা তোমরা শুনলে। এসো, এই সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাচ্চা মেয়েটির শরীর সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের বন্ধুর আত্মাকেও নিয়ে যাই। ও তোমাদের জন্যে একটা কাজ করতে গিয়েছিল। তোমাদের আপত্তি আছে?'

সবাই মাথা নাড়ল, 'না। না। না।' শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল হিমালয় পর্যন্ত।

হঠাৎ সুদীপ বিড় বিড় করল, 'জয়ী, তুই মানুষ?'

'হ্যাঁ, মানুষ।' জয়িতা কান্নাটা সামলালো, 'কল্যাণ এখানে আমাদের পায়ের তলায় মাটি দিয়ে গেল। শহীদের জন্যে কাঁদব কেন? আমি গর্বিত।'

॥ ৪১ ॥

এখন দুপুর। কিন্তু আকাশে সূর্য আছে কিনা চোখ তুললে বোঝা যাচ্ছে না। হাওয়া বইছে। তার দাঁতের ধার আরও তীব্র। পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ যেন হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামছে। সুদীপ বাইরে বেরিয়ে এসে চুপচাপ বসেছিল। শিস বাজছে বাতাসে। গাছের মাথাগুলোর ঝুঁটি যেন নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। খোলা চোখে বসে থেকেও অবশ্য সুদীপ কিছুই দেখছিল না। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে, মাথায় টিপটিপানি। শুধু ওই ক্লান্তির জন্যেই সম্ভবত ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছিল ও। এখন বুকের মধ্যে যে চাপ তাতে ঘুম কোন উপকার করেছিল বলে মনে হচ্ছে না। ধারেকাছে আনন্দ নেই। জয়িতাও।

সুদীপ চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মুখটা ভেসে উঠল। কালিয়াপোকরি থেকে কল্যাণ ছুটে এসেছিল সান্দাকফু ছাড়িয়ে সেই পর্যন্ত যেখানে ছেলেটি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। যে ছেলে প্রতিমুহূর্তে সন্দেহ প্রকাশ করত, সাহস দেখানো যার স্বভাবে ছিল না, সে—! সুদীপ মাথা ঝাঁকাল। একমাত্র ওর সঙ্গে কল্যাণের লাগত। কল্যাণকে সে কি পছন্দ করত? কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? মৃত্যুভয় ওরই বেশি ছিল। সবসময় দু'রকম মানসিকতায় দুলত কল্যাণ। শেষবেলায় একলা জিতে গেল। চোখ বন্ধ অবস্থায় সুদীপ কল্যাণের চলে যাওয়াটা দেখল। জয়িতার গালে আঙুল ছুঁইয়ে কেমন চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিল কল্যাণ।

আশ্চর্যের ব্যাপার জয়িতা কাঁদেনি। জয়িতাকে কাঁদতে দ্যাখেনি সুদীপ। কাল রাত্রে একসময় আনন্দ ডুকরে উঠেছিল। উঠেই চুপ করে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সেই শব্দটা সুদীপকে খুব শাস্তি দিয়েছিল।

একটা মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে কোন কিছুই আটকে থাকে না। কেউ একুশ বছর বয়সে পুলিশের গুলিতে মারা যায় কেউ সত্তরে রোগে মারা পড়ে। যদ্দিন প্রাণ তদ্দিন সব চোখের সামনে, যেই শরীরটা গেল অমনি অস্তিত্বের বিলোপ। কারও কারও স্মৃতি কিছু বছর, কয়েক বছর অথবা শতাব্দী মনে রাখে মানুষ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষকে তিনমাসেই বিস্মরিত হয় মানুষ, যারা থেকে গেল। হেসে ফেলল সুদীপ। কেউ থাকে না। যাওয়ার জন্যে অপ্রস্তুত থাকে। মা এখন কোথায়? একটাই তো জীবন আর তার সময়টাও বড় অল্প অথচ মানুষ ভাবার সময় কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেকে ছড়িয়ে ভাবে। কল্যাণ তবু যাওয়ার আগে কিছু ওষুধ পৌঁছে দিয়ে গেল। তার পরে যে মানুষগুলো যাবেই তাদের থাকার সময়টা যাতে একটু স্বস্তিতে কাটে তারই ব্যবস্থা করে গেল। এইটুকুই বা ক'জন করতে পারে! সাবাস কল্যাণ। এই প্রথম আমি তোর কাছে হারলাম। সুদীপ যেন নিজের অস্বস্তি ঢাকতেই উঠে দাঁড়াল। তারপর কনকনে জলে মুখ এবং হাত ভেজালো। এরমধ্যেই মুখের চামড়া ফেটেছে। চুলে আঠালো ভাব। হাতের দিকে তাকালে বোঝা যায় চর্মরোগ হতে বেশি দেরি নেই। কেমন ঘিনঘিনে ভাব চলে এল। সুদীপ ঠিক করল সে স্নান করবে। যতই ঠাণ্ডা হোক, সমস্ত শরীরে জল ঢালবে। সে চলে এল আস্তানার ভিতরে। দুটো সাবান ছিল। অনেক হাতড়ে হাতড়ে তার একটাকে বের করল। দ্বিতীয় সেট জামা প্যান্ট বের করল সে। অনেক দিন এগুলো শরীরে সেঁটে রয়েছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হচ্ছে। অভ্যেসে কি না করতে পারে মানুষ।

প্রথমে ভেবেছিল জল গরম করে নেবে। তার পরেই আর একটা জেদ বড় হল। কোন দরকার নেই, যতই ঠাণ্ডা হোক ঝরনার জলেই স্নান করবে সে। গরম জামা প্যান্ট আর সাবান তোয়ালে নিয়ে সুদীপ হেঁটে এল ঝরনার পাশে। এখানে এখন কোন মানুষ নেই। অদ্ভুত আদুরে ভঙ্গিতে জলেরা বয়ে যাচ্ছে। জলের শরীরে ছায়া জমলে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখায়। একটু বেঁকে যেখানে জল গর্তের মধ্যে পড়েছে সেইখানে অকস্মাৎ উদোম হয়ে নেমে পড়ল সুদীপ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে তীব্র কনকনানি, যেন হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত অসাড়। কাঁপুনি আসছিল বেদম, তবু মাথা ডোবাল সুদীপ। শরীর বড় বিচিত্র। সে শীতলতা থেকেও উত্তাপ আহরণ করতে জানে। ধীরে ধীরে আরাম পেল সে। সমস্ত শরীরে কালো দাগ জন্মেছে বিন্দু বিন্দু করে। সাবান ঘষে তৃপ্ত হল। তারপর হাত বাড়িয়ে ময়লা জামা প্যান্ট জলে টেনে এনে তাদের একটা সুরাহা করল। কিন্তু জল থেকে উঠতেই সমস্ত গায়ে কদম ফুটল, সুদীপের মনে হল সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার জামা প্যান্ট এবং গরম জামা প্যান্টে নিজেকে মুড়ে নিয়েও সে দাঁতের বাজনা থামাতে পারছে না। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতেই সে লাফাতে লাগল। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র উপকার হল না। এবং তখনই তার হাঁচি শুরু হল। নাক দিয়ে জল গড়িয়ে আসতেই সুদীপের খেয়াল হল তার নিউমোনিয়া হতে পারে। এই পাহাড়ে একবার ওই অসুখ করলে আর দেখতে হবে না। শুধু রোগে ভুগে মরে যাওয়া—সে দৌড়োতে লাগল। আস্তানায় পৌঁছে সে চটপট কয়েকটা ট্যাবলেট পেটে চালান করে দিল। কিন্তু এই দৌড়াবার সুবাদেই শরীর থেকে শীতভাবটা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ বেশ ঝরঝরে লাগল নিজেকে। ভেজা জামাপ্যান্টগুলো বারান্দায় ছড়িয়ে দিয়ে সুদীপ নেমে এল। অনেকদিন বাদে শরীর হালকা লাগছে। ঘুম থেকে ওঠার পর যে চিন্তাগুলো জেঁকে বসেছিল তারা এখন সরে দাঁড়িয়েছে। সুদীপ দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগল বড় বড় পা ফেলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের। শুধু ওরা নয়, গ্রামের বেশ কিছু মানুষ সঙ্গে রয়েছে। যারা ঠিক সঙ্গী হয়নি তারা দূর থেকে লক্ষ্য করছে। গাছের লম্বা লম্বা শক্ত ডাল কাটছে কেউ কেউ। অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা চালাঘর তৈরি হচ্ছে। খুঁটিগুলো গোল করে পুঁতে মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচুতে সেই ডাল বিছিয়ে মাচা তৈরি করে তার ওপর ছাউনি ফেলা হবে। সুদীপ কাছে পৌঁছাবার আগে জয়িতা দুটি মেয়ের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। সে কাছে পৌঁছতে আনন্দ বলল, 'তুই একবার চেক করবি?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

'যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাদের কি কি রি-অ্যাকশন হচ্ছে। অবশ্য খারাপ কিছু হলেও আমাদের হাত বন্ধ। ভাল হচ্ছে কিনা তাই দ্যাখ।' তারপর গলা পালটে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি রে, তুই স্নান করেছিস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আর সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'দেখিস অসুখ বাঁধিয়ে না বসিস। আমি রোলেন আর জনা ছয়েক লোককে জোর করে পাঠালাম চ্যাঙথাপুতে চাল ডাল কিনে আনতে। পুরো স্টকটা এখানে থাকবে।'

'ওরা যেতে চাইল?'

'পালদেম না রাজী করালে যেত না।'

'জয়িতা কোথায় গেল?'

'ও মেয়েদের সঙ্গে বসছে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড।' কথা শেষ করে আনন্দ অন্যদের সঙ্গে আবার হাত লাগাল। সুদীপ কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকাল। এখন এই কাজের সময়ে আনন্দর মনে নিশ্চয়ই কল্যাণের কোন অস্তিত্ব নেই। সে শুধু সময়গুলো নষ্ট করেছে গুমরে থেকে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কেইবা দিনের জন্যে হা-হুতাশ করে। কাছে দাঁড়ানো একটি বৃদ্ধকে সে কোনমতে বোঝাতে পারল কি করতে চায়। বৃদ্ধটি সোৎসাহে তাকে নিয়ে গেল প্রথম বাড়িটায়। কোন গৃহপালিত পশু নেই, দরজা হাট করে খোলা। বৃদ্ধটির চেঁচামেচিতে যে বৃদ্ধা সমস্ত শরীরে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে, তার চোখে ইতিমধ্যে ছায়া নেমেছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর এখন কেমন লাগছে?'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধা। বিড় বিড় করে কিছু বলল। বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে তার মুখের কাছে কান রাখল। তারপর ফিরে বলল, 'ওর খুব খিদে পাচ্ছে বলছে।'

'খায়নি কেন?' প্রশ্নটা করামাত্র সুদীপের খেয়াল হল সে নিজেও আজ কিছু খায়নি।

বৃদ্ধ বলল, 'জঙ্গলে যেতে পারিনি। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

সুদীপের মনে হল সঙ্গে কাগজ কলম আনা দরকার ছিল। প্রত্যেকের বৃত্তান্ত আলাদা করে তার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে ওর মনে হল এখানেও তিনটে শ্রেণী রয়েছে। একদল সারাবছর মোটামুটি খেতে পায়। তাদের চাষের জমিতে যে ফসল ফলে তাতে কুলিয়ে যায়। এদের গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যাও কম নয়। খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে নেয় এরা। দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে প্রায় আধপেটা খেয়ে। সারা দিনে শুধু সন্ধ্যেবেলায় এদের খাওয়া। আর একদল যাদের সংখ্যাই বেশি, বছরের বেশির ভাগ সময় তারা নির্ভর করে থাকে আশেপাশের জঙ্গলের ওপর। সেই জঙ্গলে এক ধরনের উদ্ভিদ এদের প্রাণধারণে সাহায্য করে। শাকপাতা ছাড়া শেকড়ও এদের কাছে উপাদেয় খাদ্য। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই চর্মরোগের প্রাবল্য বেশি। এদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় অপুষ্টি কাকে বলে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশি কুঁড়ে এবং ঝিমোতে ভালবাসে। যে মানুষগুলোকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাদের সত্তরভাগই এখন ভাল আছে অথবা অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এদের কাছে গিয়ে আপ্লুত হল সুদীপ। দু'হাত ধরে মানুষগুলো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। একটি পরিবার পোড়া রুটি এবং শাকসেদ্ধ না খাইয়ে ছাড়বে না। এখন আর সুদীপের বমি পায় না। সে পা মুড়ে বসে খাবারটা খেল। এই পরিবারে প্রৌঢ় প্রৌঢ়া এবং একটি রোগগ্রস্ত সন্তান। তাকেই ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গী বৃদ্ধ জানাল এই প্রৌঢ়ের হাতে যে মদ তৈরি হয় তেমন গ্রামের আর কেউ তৈরি করতে পারে না। প্রৌঢ় যেন লজ্জিত হল। দু'হাত নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না না, কথাটা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, আমার বাবার হাত ছিল খুব ভাল। তার মদ ঠাণ্ডা হলে যে গন্ধ ছড়াত তাতে মৌমাছিও ছুটে আসত। আমি তার কিছুই নিতে পারিনি। আমার বাবার ছেলে হিসেবে ছেলেবেলায় কোনদিন অসুখে ভুগিনি আর আমার ছেলেকে দ্যাখো!' কিন্তু ওষুধ পেটে পড়ার পর ছেলেটার উপকার হয়েছে। জীবনে ওষুধ বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর। পাতার রস বা শেকড়বাটা খেয়ে এসেছে এতদিন। প্রৌঢ় বলল, 'তা সবাই যখন বলছে তখন আপনি আমার হাতের সেবা গ্রহণ করুন।' মাচার তলা থেকে প্রৌঢ় একটা মোটা বাঁশের চোঙা টেনে নিয়ে এল। এ তল্লাটে বাঁশগাছ চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারছিল না সুদীপ। কিন্তু চোঙাটাকে যেভাবে কেটেকুটে ঠিকঠাক করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে অনেক যত্ন রয়েছে। মদ ঢালা হল ছোট ছোট আরও কয়েকটা চোঙায়। সেগুলোকে বিয়ারের জাগের মত দেখতে। বৃদ্ধ বোধ হয় এরই আশায় ছিল এতক্ষণ, এবার পুলকিত হল। রুটি তরকারি খাওয়ার পর সুদীপের পেট ঠাণ্ডা হয়েছিল। সেদিন মদ খাওয়া নিয়ে বন্ধুরা তেমন কিছু বলেনি কিন্তু আনন্দ বা জয়িতা যে খুশি হয়নি তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘরে বসে ওদের অপমান করা অন্যায় হবে। পানীয়টি রঙিন কিন্তু বড় তরল। সুদীপ চোঙাটি ধরল। তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে। কলকাতার ছেলেরা ঘাটশিলায় বেড়াতে গেলে মহুয়া খায় শখে, তার চেয়ে বেশি কি হবে? গন্ধটার মধ্যেই অবশ্য ঝিমঝিমে ভাব আছে। সে সতর্ক হয়ে চুমুক দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল জিভ প্রায় অসাড় এবং কণ্ঠনালীতে সূর্য গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। সে চোখ বন্ধ করল। বুক থেকে নামামাত্র সমস্ত শরীর অসাড়। প্রৌঢ় বলল, 'আস্তে আস্তে খেতে হয় এই জিনিস। এই গ্রাম কেন, আশেপাশের কেউই এই জিনিস তৈরি করতে জানে না। অবশ্য বিলিতি মদের কাছে এটা কিছু নয়!'

সুদীপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে মনে হল জিভটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। বিলিতি মদের তুলনায় এ জিনিস হাজারগুণ জোরালো তাই বোঝবার জন্যে সে সময় নিল। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে সাড় ফিরে আসতে লাগল। সুদীপ ঠিক করল আর খাবে না। কিন্তু পানীয়টির জোরালো গন্ধ তাকে এমন টানছিল যে দ্বিতীয়বার চুমুক না দিয়ে পারল না। এবার সাড় ফিরে আসতে আরও কম সময় লাগল। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল একটার পর একটা ঢেউ যেন শরীরে পুরে পুরে নিচ্ছে। আর ঢেউগুলো পা থেকে এখন গলা পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে। তার মাথাটা পরিষ্কার আছে কিন্তু অদ্ভুত এক সুখানুভূতি সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বৃদ্ধ সেখানেই শুয়ে পড়েছে। যেন হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্যে সে খুব দ্রুত খাচ্ছিল। প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীর খুব খারাপ লাগছে না তো?'

সুদীপ বলল, 'না।' শব্দটা তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে কানে পৌঁছাল না।

প্রৌঢ় বলল, 'এখন শুধু মাথা ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখুন, ব্যস। দেখবেন, পৃথিবীটা আপনার হুকুমে চলবে।'

সুদীপ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। পা টলছে। চোখের সামনে সব কিছুই আঁকাবাঁকা। একেই কি মাতাল হওয়া বলে? দূর! মাতাল হলে সে এসব টের পাচ্ছে কি করে? তার মাথা তো পরিষ্কার আছে। সে কথাটা মনে পড়তেই যতটা সম্ভব আকাশের দিকে মাথা রাখল। সে টিপসি হয়েছে। নেহাতই টিপসি। হাসল সুদীপ। তবে এই অবস্থায় আনন্দর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। সে ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে লাগল। এবং তখনই তার মনে হল এখন সবে ভোর হচ্ছে। আকাশের গায়ে অন্ধকার সেঁটে আছে এখনও। কয়েক মুহূর্ত বাদেই ভুল ভাঙল। সে এসেছিল দিনের বেলায়। তাহলে এখন ভোর হবে কি করে? নিশ্চয়ই দিনটা ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যে হচ্ছে! কিন্তু আনন্দ রাগ করবে কেন? সে তার কাজ ঠিকমত করেছে। কাজের শেষে যদি একটু ফূর্তি করা হয় তাহলে অন্যায় হবে কেন? চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র মিলিয়ে গেল। কি ব্যাপার? কোন কিছুই বেশিক্ষণ মাথায় আটক থাকছে না কেন? সুদীপ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে চাইল তার নিজের কোন দুঃখ আছে কিনা। সেরকম কিছু মনে পড়া দূরে থাক, কোন কষ্টদায়ক ঘটনার কথাই মনে পড়ল না। সমস্ত শরীরে শুধু ভাললাগা অনুভূতি ঢেউ হয়ে দুলছে। এইসময় পেছন থেকে একটা চিৎকার শুনে অনেক কষ্টে সে আকাশের দিকে মাথা রেখে পেছন ফিরল। একটা লোক ভেঙেচুরে তার কাছে আসছে এগিয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা মারামারি করতে আসছে। কাছাকাছি হতে সে বৃদ্ধকে চিনতে পারল। এখন বৃদ্ধ কিছুতেই সোজা হতে পারছে না। দু'হাত বাড়িয়ে যেন সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে আসছে।

সুদীপ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে ধরল। একটা অবলম্বন পেয়ে বৃদ্ধ যেন কৃতার্থ হয়ে অনেক কষ্টে শরীর সোজা করল। তারপর হঠাৎই কাঁদতে লাগল। সুদীপ বেদম ঘাবড়ে গেল। সে বৃদ্ধকে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল কাঁদবার কারণ কি? কিন্তু তার কথাগুলো যে বেঁকেচুরে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ প্রশ্নটার উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে জানাল, 'তুই কবে মরে যাবি?'

সুদীপ বলল, 'ও, এই ব্যাপার!' সে এবার মনে করতে চেষ্টা করল কবে মরে যাবে। তারপর ভেবে টেবে না পেয়ে জানাল, সে মরবে না।

বৃদ্ধ বারংবার মাথা নাড়তে লাগল তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে, 'না। তুই, তোরা মরে যাবি। মরে যাবি বলেই তোরা স্বর্গ থেকে আমাদের গ্রামে এসেছিস। তোরা মানুষ না। তোরা ভগবানের ছেলেমেয়ে, আমাদের বাঁচাতে এসেছিস!'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'দূর! বাজে কথা। তবে আমি মরব না।'

'মরবি। আমাদের উপকার করতে এসেছিস বলেই মরে যাবি।' বৃদ্ধ আবার কান্না শুরু করল, 'তোদের একজন যেমন আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে গেল।'

কথাটা মাথায় ঢুকতে সময় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপের শরীরে একটা সিরসিরানি জন্ম নিল। কল্যাণটা মরে গেছে। পুলিশ ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কল্যাণ যদি মরতে পারে তাহলে সে মরবে না কেন? কিন্তু—। সুদীপ হঠাৎ বেশ জোরে সরিয়ে দিল বৃদ্ধকে। পড়ে যেতে যেতে বৃদ্ধ কোনরকমে বসে পড়তে পারল। সুদীপ আর দাঁড়াল না। অন্ধকার নেমে আসা গ্রামের পথে বৃদ্ধ তখনও কেঁদে চলেছে। পথটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সামনে আশেপাশে অনেক মানুষ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। বুকের মধ্যে একটা কষ্টবোধ কিন্তু ঠিক কি কারণে কষ্টটা এল তা সুদীপের এখন খেয়ালে নেই। হঠাৎ তার কানে চিৎকার চেঁচামেচি পৌঁছাল। দুজন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঝগড়া করছে। সুদীপ মুখ তুলে চারপাশে তাকাল। তারপর আওয়াজটা যেদিক থেকে ভেসে আসছিল সেদিকে চলল। কয়েকজন মানুষ চুপচাপ ঝগড়া দেখছিল। তারা সুদীপকে দেখামাত্র বেশ সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। নিজের ওপর কোনরকম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, সুদীপ টলতে টলতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটা ছুটে এল। ইনিয়ে বিনিয়ে অনর্গল কিছু বলে যাচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি এসে দাঁড়াল সামনে। সে যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তা বোঝা যাচ্ছিল। সুদীপ একটু একটু করে চিনতে পারল ওদের। এই অসমবয়সী স্বামী-স্ত্রীটির কন্যাবিয়োগ হয়েছে ক'দিন আগে। হঠাৎ এক ধরনের অপরাধ বোধ চেপে বসল তাকে। সে যদি মেয়েটার উপকার করতে না যেত—।

তার মনে হল এদের ঝগড়া থামিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। একটা হাত উপরে তুলে সে কোনরকমে বলতে পারল, 'চুপ চুপ। কেউ কথা বলবে না, আমি ঝগড়া থামিয়ে দেব।'

ছেলেটা বলল, 'আমি কিছুতেই এই ঘরে ওর সঙ্গে থাকব না। কিছুতেই না।'

মহিলা বলল, 'কত বড় অস্পার্দা। এইটুকু থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি আর তোমরা সবাই দ্যাখো, মুখে মুখে তর্ক করছে। আমি কাহুনের কাছে যাব।'

সুদীপ বলল, 'অ্যাই চোপ। আমি যখন বিচার করছি তখন তুমি ওকে বকবে না।'

আশেপাশে দাঁড়ানো মানুষদের কেউ কেউ বলল, 'আহা, চুপ করো না, একটু শুনতে দাও।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ঠিক। আমরা কেউ শুনি না, সবাই শুধু বলে যাই।' তারপর ছেলেটার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রব্লেমটা কি?' ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারল না দেখে সে বিরক্ত হল। বিড় বিড় করে বলল, 'এর চান্স গেল।' সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বকছ কেন?'

মহিলাটি উত্তর দিল, 'কেন বকব না। আমি ওর স্ত্রী, কাহুন আমাদের বিয়ে দিয়েছে। অথচ মেয়েটা মরে যাওয়ার পর থেকে ও আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে চাইছে না। ও বলুক আমার অপরাধটা কি? আমি কি ওকে রেঁধে খাওয়াই না? আমি কি চাষ করি না? আমি কি শুভ্রকে রেখে দিইনি বরফের জন্যে?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিকে, 'ও যা বলছে তা সত্যি?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সুদীপ এবার হাসল, 'তাহলে বাবা তোমার অন্যায় হয়েছে। বিচার শেষ, যে তোমার সেবা করবে তার কথা তোমাকে শুনতে হবে। কি, আমি ঠিক বললাম কিনা?'

একজন লোক বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন তবে ওর কথাটাও অন্যায্য নয়।'

'কি কথা? এই, তোমার কি কথা আছে?' সুদীপ বিরক্ত হল।

ছেলেটা উত্তর দিল না। লোকটা বলল, 'ও বলছে বউ-এর সঙ্গে এখন শুতে পারবে না। শুলে ওর শরীর খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ঘুম পায় দুর্বল লাগে। আর ভাল করে শুতে পারে না বলে ওর বউ নাকি ওকে খুব গালাগালি দেয়। এইটে অবশ্য খুব ন্যায্য কথা।'

সুদীপের মাথায় সমস্যাটা ঢুকল না। সে ছেলেটার দিকে তাকাল। ছেলেটা বলল, 'আমি তো বলেছি বড় হয়ে গেলে শোব।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চাপা গলায় শব্দ করল, 'ইশ! উনি বড় হতে হতে আমি বুড়ি হয়ে যাব না? তার বেলায়? আসলে এ ছোঁড়ার অন্য বাচ্চা মেয়ের ওপর নজর আছে। তোমরাই বল, এতদিন আমি কিছু জোর করিনি। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে আমি চাইতেই পারি, পারি না?' অনেকেই মাথা নাড়ল।

এই সময় একটা লোক এসে ঘোষণা করল, 'কাহুন বলেছে ছেলেটাকে তার বউ-এর সঙ্গেই শুতে হবে। তবে যদি এতে তার আপত্তি থাকে তাহলে পালার কাছে দুজনে যেতে পারে। পালা যা বলবে তাই করতে হবে।'

এই গ্রামে একজন পালা আছে। কিন্তু তার ভূমিকা খুব জোরালো নয়। পালার ওপর দায়িত্ব গ্রামের মানুষের দেখাশোনা করার। অনেকটা মোড়লের আদল। পালদেম হল সম্পর্কে বর্তমান পালার ভাইপো। এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি পালা হলেও এখন চোখে কম দ্যাখে, কানে কম শোনে। কাহুনের উপদেশ কানে যাওয়ামাত্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল সুদীপ। এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল ওই কথাগুলো তাকে ছোট করতে বলা। সে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, 'ও! আমি তাহলে তোমাদের মধ্যে নেই। যা ইচ্ছে করো।'

দু-তিনজন তাকে বোঝাতে গেল কিন্তু সেসব কথা কানেই তুলল না সুদীপ। তার পা থেকে বুক পর্যন্ত অনেকগুলো ঢেউ পরপর দুলছিল, এখন তারা ছিটকে উঠছে ওপরে। যেন ফেনা ছুঁড়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। দ্রুত অনেকটা একা চলে এসে সে মুখথুবড়ে পড়ল অন্ধকারে। পড়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় আনন্দ এবং জয়িতা পালদেমের সঙ্গে কথা বলছিল। এই গ্রামের যা চাষযোগ্য জমি তা রয়েছে বিভিন্ন পরিবারের দখলে। এ ব্যাপারে মালিকানার কোন কাগজপত্র নেই, কাউকেই খাজনা দিতে হয় না। কয়েক পুরুষ ধরে সবাই জেনে এসেছে কোন্‌টা কার জমি। অভাবের তাড়নায় কোন কোন

পরিবার নিজস্ব জমির কিছুটা আর একজনকে বিক্রি করেছে কখনও। না হলে এখন কারও জমি বেশি কারও কম হবে কি করে। ইয়াক আছে একমাত্র কাছনের দখলে। মুশকিল হল ইয়াকদের বংশ লোপ পেতে চলেছে। পরপর পাঁচটি ইয়াকসন্তান পুরুষ হয়েছে। মকাই, কোদো, ডুং ডুং, গুন্ড্রুক ছাড়া এক ধরনের আতপ চালের চাষ হয় যা থেকে চমৎকার শেলরুটি তৈরি করে নেয় ওরা। এই আতপের ফলন নির্ভর করে বর্ষার ওপর। এ বছর বীজধান যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও মাটি থেকে গাছগুলো যেন মাথাচাড়া দিতেই চায়নি। না, কোনরকম সারের ব্যবহার এই গ্রামের মানুষ জানে না। যে জমি ফসল কমিয়ে দেয় সেই জমির ওপর ঈশ্বরের দয়া নেই মনে করে একটা চাষ বন্ধ রাখে।

পালদেম বলল, 'তোমরা যা বলছ তা তাপল্যাঙের সবাই মানবে বলে মনে হয় না। অন্তত যারা সারাবছর মোটামুটি খেতে পারে তারা কেন অন্যের সঙ্গে নিজেরটা ভাগ করবে?'

আনন্দ বলল, 'আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব এ থেকে তারা কি উপকার পাবে। আচ্ছা, আমাদের এখানে কি তেমন কোন মানুষ আছেন যিনি প্রতিবাদ করতে পারেন?'

নতুন তৈরি তিনটে মাচার একটায় ওরা বসেছিল। মাটির তিন হাত ওপরে কাঠ বিছিয়ে সমান্তরাল মেঝে করে নেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরেও ছাউনি, চারপাশের দেওয়ালগুলো এখনও ছিদ্রহীন হয়নি। রাতের বাতাস হু হু করে ঢুকে মাঝখানে জ্বেলে রাখা মশালের আগুন কাঁপিয়ে যাচ্ছে সমানে। বৃদ্ধ পালা এখানে এসে দু'হাত চোখের ওপর আড়াল করে দেখে টেখে বলেছিল, 'ছেলেবেলায় আমাদের সুদকেরিঘর এরকম ছিল। তবে আরও ছোট। শুধু যার বাচ্চা হত সে আর বাচ্চার মাইলিআমা যেতে পারত সে ঘরে। তারপর আলোচনা শুরু হতেই সেই যে পালা দু'চোখ বন্ধ করে ঝিমোতে লাগল এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আনন্দর প্রশ্নটা শোনার পর কয়েকজনের মুখে অস্বস্তি দেখা গেল। পালদেমের ভেনা বসেছিল খানিকটা তফাতে। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় সবসময় কোন মতলব ভাঁজছে। পালদেম তাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ভেনা, তুমিই কিছু বল। তোমার জমির ফসল অন্য লোককে খেতে দেবে?'

'কেন দেব?' সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার বাপ ঠাকুর্দা আমার জন্যে জমি রেখে গেছে আর আমি পাঁচ ভূতে সেটা বিলিয়ে দেব? তোমার বহিনীকে জিজ্ঞাসা করো সে রাজি কিনা! এই সাথীরা হয়তো লোক খারাপ নয়। কিন্তু আমার তাউজি, জাহান, আমা কিছুতেই রাজি হবে না।'

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'পালদেমের বহিনীকে তুমি বিয়ে করেছ?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমি ওর ভেনা।'

'তাহলে তোমার বউয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মেয়েটা খুব ভাল।'

'যে কেউ তার ইচ্ছেমত ভাল হতে পারে তাতে আমার কথার কোন হেরফের হবে না।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, প্রথমে দেখা যাক গ্রামের কটা পরিবার নিজের মত থাকতে চায়?'

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মতলবটা কি? গ্রামের লোকগুলোকে নিয়ে কি করতে চাও?'

পালদেম জবাব দিল, 'ভেনা, এইভাবে কথা বল না। ওরা চাইছে এই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ যেন না-খেয়ে না থাকে। তাই দশটা পরিবার এক জায়গায় এই রকম এক একটা ঘরে ওঠা বসা করবে। তাদের খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে হবে। সেই দশটা পরিবার যাতে ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করতে পারে তার জন্যে সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের নতুন সাথীরা বুদ্ধি দেবে, আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে যাতে সবাই সুখে থাকে।'

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, 'তাতে সাথীদের কি লাভ? ওরা কেন এসব করবে?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এবং একসময় সব জোড়া চোখ এসে পড়ল আনন্দ আর জয়িতার ওপরে। জয়িতা হাসল, 'ভেনা, মানুষ কি সবসময় নিজের লাভের জন্যেই সব কাজ করে? আমা তার বাচ্চাকে বড় করে কোন্ লাভের জন্যে?'

ভেনা ঠোঁট ওলটাল, 'যাতে সে বুড়ি হলে খাবার পায় তাই।'

'ও। বুড়ো বাউকে যে তোমরা যত্ন করো কিসের আশায়! সে তো তোমাদের জমি দিয়ে এখন ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কি লাভ তোমাদের তাকে সেবা করে?'

'এটা একটা কথা হল? বাউ হল আমার আত্মীয়।'

'ঠিক। আমরা যদি মনে করি পৃথিবীর কষ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষরা আমাদের আত্মীয় তাহলে তাদের জন্যে যখন কিছু করব তখন মনে হবে নিজের জন্যেই করছি।' জয়িতা হাসল।

হঠাৎ হাসি উঠল। যে হাসছে সে হেসেই থেমে গেল। সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখল লা-ছিরিঙ গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ হাসির কি হল লা-ছিরিঙ?'

'হাসির কথা হলে হাসব না?' লা-ছিরিঙ শান্ত গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে এইরকম কথা না বললেই নয় যা আমরা বুঝতে পারি না? পৃথিবীর কষ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষ! ধ্যুৎ! তারা কারা? কোথায় থাকে? যাদের আমরা দেখিনি তাদের গল্প শুনে কি শিক্ষা হবে? তার চেয়ে আমাদের কথা বল। আমরা খেতে পাই না, পরতে পাই না। আমাদের কষ্টটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।'

অনেকেই মাথা নাড়ল, 'ঠিক ঠিক, লা-ছিরিঙ ঠিক বলছে।'

পালদেম লা-ছিরিঙকে চোখের কোণায় দেখল। না খেতে পেলেও স্বাস্থ্য ভাল। একটু বেশি কথা বলে। এর আগে দু'বার ওর সঙ্গে পালদেমের লেগেছিল। তরুণদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ছোকরা। কিন্তু এই মুহূর্তে ছোকরা মিথ্যে বলেনি কিছু। জয়িতা বলল, 'তুমি পুরো ঠিক বলোনি। তোমার কষ্ট দূর হতে পারে যখন তুমি জানবে তোমার মত কষ্ট পাওয়া মানুষ কি করে তাদের সুখের সন্ধান পেয়েছে। সেটা জানলেই পথটা তোমার সামনে খুলে যাবে।'

আনন্দ বাধা দিল, 'এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনার জন্য থাক। ভেনা, আমাদের কোন লাভের উদ্দেশ্য নেই। ভারতবর্ষের পুলিশ আমাদের খুঁজছে। সে-দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করছে। অনেকে অনেক রকম ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্যেই সফল হয়নি। আমরা দেশের মানুষকে নাড়া দিতে চেয়েছিলাম বলে পুলিশ আমাদের খুঁজছে।'

হঠাৎ আনন্দকে থামিয়ে দিয়ে লা-ছিরিঙ বলে উঠল, 'লোকগুলো যখন অল্প তখন তাদের খুন করে সমস্যাটা মিটিয়ে নিলেই হয়।'.

জয়িতা চট করে ছেলেটির দিকে তাকাল। আনন্দ বলল, 'তাদের শক্তি অনেক। আমরা সেই চেষ্টাই করেছিলাম। তবে যারা আসল শক্তিমান তাদের ছুঁতে পারিনি। এখন বুঝেছি এই রকম দু-তিনটে খুন করে সমস্যার সমাধান হবে না। যদি অভাবী মানুষেরা নিজেদের অভাব দূর করতে একসঙ্গে এগিয়ে না আসে তাহলে এদের খুন করেও কোন লাভ হবে না। যেকথা বলছিলাম, পুলিশ আমাদের ধরতে এখানেও আসতে পারে। আমরা তোমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, তোমাদের অবস্থা ভারতবর্ষের অনেক মানুষের মতই। কিন্তু এখানে সেই অর্থে কোন শোষক নেই। তোমাদের ক্ষতি করছে তোমাদেরই অজ্ঞতা। শিক্ষিতদের শত্রু অনৈক্য। সেটা তোমাদের মধ্যেও হয়তো আছে। আমরা চেয়েছি তোমাদের এই গ্রামটার চেহারা পালটে দেব যাতে কেউ কখনও অভুক্ত না থাকে, অজ্ঞতায় না মরে। আর এই দৃষ্টান্ত যদি আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই পাহাড়ে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। সেইটেই আমাদের লাভ ভেনা।'

ভেনা মাথা নাড়ল, 'এসব ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি আমার জমির ফসলের ভাগ কাউকে দেব না, ব্যস।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আর ক'জন ভেনার মত একই চিন্তা করছ?'

খানিকটা গুঞ্জন উঠল। শেষ পর্যন্ত এক এক করে জনা ছয়েক মানুষ ভেনাকে সমর্থন করল। অর্থাৎ সাতটি পরিবার একাই চলতে চায়। আনন্দ পালদেমকে বলল, 'গ্রামের সবাই তো এখানে আসেনি। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে মতামত নাও। যারা আমাদের সঙ্গে আসতে না চাইবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যদি কখনও তারা বুঝতে পারে যে এতে ক্ষতি হবে না তাহলে নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমরা প্রত্যেক সন্ধ্যায় এইরকম আলোচনা করব। বরফ পড়ার আগেই অনেক কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সবাই যখন বেরিয়ে আসছে তখন পালদেম বলল, 'আমার ছেলে তো একদম ভাল হয়ে গেছে। তোমরা আমার ঘরে রুটি খাবে?'

আনন্দ বলল, 'বাঁচালে। এখন আবার চালেডালে ফোটাতে হত।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ কোথায় রে?'

আনন্দ উত্তর দিল, 'জানি না। দুপুরে ওকে বলেছিলাম যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাদের চেক করতে। তারপর আর দেখা পাইনি।'

জয়িতা বলল, 'তুই একবার আস্তানাটা ঘুরে আয়। বোধ হয় ওখানেই আছে। আমি আমার নতুন ঘর থেকে এখনই আসছি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তাহলে ওখানেই পাকাপাকি থাকবি ঠিক করলি?'

জয়িতা বলল, 'পাকাপাকি কিনা জানি না। তবে ওই মেয়েটার জন্যে আমার ওখানে থাকা দরকার।'

পালদেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা দুজন দু'দিকে হাঁটতে শুরু করল। জয়িতা গ্রামের মেয়েদের কথা ভাবছিল। সারাটা দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে অদ্ভুত নাড়া খেয়েছে সে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে পুরুষের সম্পত্তি বলে জাহির করতে ভালবাসে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ। ঠেলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়িতা। ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মেয়েটির গলা, 'এত খেয়েছ কেন? এত খেলে পুরুষমানুষের সব শক্তি দানো কেড়ে নেয়। আরে আরে, এই তুমি উঠছ কেন?'

॥ ৪২ ॥

চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। চোখের সামনে কোন দৃশ্য নেই। ঘরের কোণে তিন পাথরের মধ্যে যেটা জ্বলছিল সেটা শেষ পর্যায়ে। অন্ধকারকে ঘোলাটে করে দেওয়া ছাড়া তার কোন ভূমিকা নেই। শব্দগুলো কিন্তু থামছিল না। একজন বেপরোয়া, অন্যজন সমানে তাকে শান্ত করে চলেছে। জয়িতা যে দরজায় তাও খেয়াল নেই দুজনের।

মাচার ওপর সুদীপকে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েটা। জয়িতা আরও একটু এগোল। সুদীপ গোঙাচ্ছে। তার দুটো হাত যে দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছে এখন, নইলে ও মেয়েটির শরীরে অমন নেতিয়ে পড়ে থাকত না। মেয়েটি তার দিকে পেছন ফিরে বসে। হঠাৎ জয়িতার মনে হল এই সুদীপকে সে চেনে না। সুদীপের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চট করে জয়িতার কালীঘাটের পটে আঁকা ছবিব কথা মনে পড়ল। বাবু বেশ্যাবাড়িতে যাবেনই, সতীসাধ্বী স্ত্রী মাতাল স্বামীকে দু'হাতে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন। এখনই যেন সুদীপ উঠে লাথি মেরে ফিটনে চেপে বউবাজারে রাত কাটাতে যাবে। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল জয়িতা। সে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হচ্ছে?'

মেয়েটি মুখ ফেরাল, ফিরিয়ে হাসল, 'ও তুমি! দ্যাখো না, বেচারা মাতাল হয়ে গিয়েছে!'

জয়িতা এবার সোজা সুদীপের পাশে এসে দাঁড়াল, 'সু-দী-প!'

সুদীপের মাথাটা নড়ল। যেন আবছা সে বুঝতে পারল। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'কল্যাণ?'

'তোর লজ্জা করছে না? ছিঃ সুদীপ ছিঃ! তুই এখানে এসেছিস মদ খেয়ে মাতলামি করতে?'

সুদীপ উঠতে গেল। তার দুটো হাত শক্তি সংগ্রহের জন্যে মেয়েটির শরীর এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে রাগে জয়িতার শরীর রি রি করে উঠল। সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা সেখানে নেই। জয়িতা আর দাঁড়াতে পারল না।

অন্ধকারে সমস্ত মাঠটা সে ডিঙিয়ে এল, কিভাবে এল তা সে নিজেই জানে না। চোখের সামনে সুদীপের ভঙ্গিটা যেন সেঁটে আছে। নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সঙ্গে সে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচিত। সুদীপ যা করছে তা সে ইচ্ছায় করছে না। কিন্তু-কিন্তু...

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই আনন্দ চমকে তাকাল। জয়িতার দিকে তাকিয়েই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন?'

দরজাটা বন্ধ করে সুদীপের বিছানায় বসে পড়ল জয়িতা। এই মুহূর্তে তার কোন কথা বলতে ইচ্ছে

করছিল না। আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ কোথায়?'

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর বলল, 'আছে, ভালই আছে।'

'ভাল আছে মানে? কি হয়েছে বল্ তো? সুদীপ তোকে অপমান করল নাকি? গেল কোথায় সে?'

'ও মেয়েটির ঘরে আছে।'

'তোর ঘরে বল্।'

'আমার ঘর আর হল কোথায়!'

'ওখানে কি করছে ও?'

'মাতাল অবস্থায় সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে কি করছে তা দেখার জন্য তুই আমাকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে বলবি না। আমি ভাবতে পারছি না, বিশ্বাস কর।' মুখ ফেরাল জয়িতা।

আনন্দ চুপ করে গেল। সে জয়িতার মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ জয়িতা চিৎকার করে উঠল, 'আনন্দ, আমরা এসব করবার জন্যে এখানে আসিনি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু সুদীপ মদ পেল কোথায়? ওর সঙ্গে তো মদ নেই। মেয়েটি খাইয়েছে?'

কাঁধ নাচাল জয়িতা, 'হতে পারে। যারা মদ খায় তাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি আমার বাবা-মাকে কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি এই কারণে।'

হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে?'

জয়িতা অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আস্ক দেম। আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল আনন্দ, 'তুই বোধ হয় বেশি উত্তেজিত হচ্ছিস।'

'তুই হাসছিস আনন্দ! আমার উত্তেজনাকে তোর বেশি বলে মনে হচ্ছে!' জয়িতা যেন আনন্দকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, 'আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম সুদীপ মাতাল। মেয়েটি ওকে জড়িয়ে ধরে উঠতে নিষেধ করছে। আমার গলা শুনে সুদীপ মেয়েটিকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল—এর পরে আমি উত্তেজিত হব না?'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও তুই জানিস না ওদের সম্পর্কটা কি? মেয়েটি ওকে মদ খাইয়েছিল কিনা অথবা ওরা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কিনা, তাও তো কল্পনায় দেখছিস? অতএব সুদীপের কষ্টের কথা না বলে অযথা উত্তেজিত হয়ে মাথা গরম করার কোন মানে আছে?'

'আমি এ সব সহ্য করতে পারি না। অসম্ভব।' মাথা নাড়ল জয়িতা।

'কেন?'

'বিকজ আই ডোন্ট লাইক ইট। শুধু শরীরের জন্যে দুটো নারীপুরুষ একত্রিত হলে ঘেন্না ছাড়া আর কিছু জন্ম নেয় না। আমাকে বোঝাতে আসিস না।'

আনন্দ হাসল, 'তোর প্রকাশটা বড় বেশি উগ্র হয়ে যাচ্ছে জয়িতা!'

জয়িতা সপাটে মুখ ফেরাল, 'কি বলতে চাইছিস?'

আনন্দ বলল, 'এই মহিলাটির স্বামী মৃত, তাকেই সুদীপের পাশে বেহুঁশ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, একেই পাশের গ্রামের মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে একটা সমঝোতা করে তুই একসঙ্গে আছিস—গ্রামের লোকজন কেউ ওর ব্যাপারে চিন্তিত নয়। সুদীপ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে। ওর আচরণ যদি আমাদের কাজের কোন ক্ষতি না করে তা হলে কিছু বলার নেই। এটা ওর ব্যাপার, ওদের ব্যাপার।'

মাথা নাড়ল জয়িতা, 'তোর এই মহাপুরুষের মত কথাবার্তা আমি টলারেট করতে পারি না। আমরা এখানে এসে যদি এসব করি তা হলে কলকাতা কি দোষ করেছিল? কেন আমরা প্যারাডাইস পোড়াতে গিয়েছিলাম? কল্যাণের জীবন দেওয়াটা কি নিরর্থক?'

'না, মোটেই না। কিন্তু পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীরা কি ব্যক্তিজীবনে প্রেম ভালবাসার মর্যাদা দিতেন না? লেনিন কি রোবট ছিলেন?'

'চমৎকার। এই ঘটনাকে কি তুই প্রেম ভালাবাসা বলছিস? সুদীপের স্ট্যাটাস, ওর মানসিকতা, শিক্ষার সঙ্গে মেয়েটির কয়েক লক্ষ মাইলের ফারাক। এমন কি ওরা পরস্পরের ভাষাও বোঝে না।'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভালবাসার একটা নিজস্ব ভাষা আছে।'

'র‍্যাবিশ।'

'বেশ। অনেকক্ষণ থেকে তোকে যে কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটাই বলি। প্রেমহীন শারীরিক সম্পর্ক যদি ওদের হয়ে থাকে তাহলে আমি সেটা সমর্থন করি না। কিন্তু লক্ষ্য করে দ্যাখ, ব্যাপারটা আমাকে যতটা না ভাবাচ্ছে, তোকে তার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত করছে। কেন?'

'কেন মানে? আমার রুচিতে লাগছে বলে।'

'তাই কি?'

'তুই কি বলতে চাইছিস?'

'তুই সুদীপের বন্ধু। মেয়ে হিসেবে তুই আরও বেশি কাছাকাছি। ব্যাপারাটা তোর ইগোতে ঘা দিয়েছে।'

'মোটেই না। তুই কি মনে করিস আমি সুদীপের সঙ্গে—!'

'আমি কিছুই মনে করি না। ছেলে প্রেমে পড়লে বাবা যতটা না চটে মা তার চেয়ে বেশি খেপে যায়। কেন? অনেকটা সেইরকমই ধর। মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছিস। ছেড়ে দে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, পালদেমের ওখানে চল্।' আনন্দ বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হল।

জয়িতা বলল, 'তুই কিন্তু আমাকে আজ অপমান করলি আনন্দ।'

'মোটেই না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি সুদীপের ব্যাপারটা তোর আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়।'

আনন্দ ওর হাত ধরল। জয়িতা কিছু বলল না। কিন্তু দৃশ্যটা যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে নোংরামির প্রতিবাদ করার জন্যে ওরা এতদূরে আসতে বাধ্য হল সেই নোংরামিই সুদীপের মধ্যে এসেছে। এবং সেই মুহূর্তে মেয়েটিকে কি ভীষণ অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। জয়িতা নিজের ভাবনাটা ঘোরাতে চাইল। আনন্দর ইঙ্গিত যদি সত্যি হয়? না, সে তো জ্ঞানত সুদীপকে ভালবাসেনি। তাহলে?

বাইরে বেরোতেই ঝাপটা লাগল হাওয়ার। এবং খোলা আকাশের নিচে পা দিতেই যেন কুচি কুচি পাথরের টুকরো শরীরে বিঁধতে লাগল। জয়িতা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই আনন্দ বলল, 'মুখ নিচু করে দৌড়ো। মনে হচ্ছে বরফ পড়ছে।'

বরফ পড়ছে। অথচ আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। যেন হিমালয়ের কোল থেকে আঁজলা করে বরফ তুলে বাতাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাপল্যাঙের ওপরে। ওরা টলতে টলতে দৌড়তে লাগল। শীত এখন সর্বাঙ্গে। এবং এই পরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থা জয়িতার মন থেকে সুদীপ সংক্রান্ত ভাবনাটাকে চাপা দিয়ে দিল। তার গাল জ্বলছিল।

পালদেমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মনে হল এযাত্রায় বাঁচা গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে ওরা বসে আছে। যথেষ্ট উত্তাপ এখানে। আনন্দ আগুনের শরীরে প্রায় নিজের শরীর ঠেকিয়ে বলল, 'বাইরে কি বরফ পড়ছে!'

পালদেম বলল, 'ঠিক বরফ নয়। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে মাটি চকচকে কাঁচের তলায় ঢাকা পড়ে আছে। রোদ উঠলেই অবশ্য গলে যাবে। কিন্তু এটা হয় বরফ পড়ার ঠিক আগে। তুমি কখনও বরফ পড়া দ্যাখোনি, না?'

প্রশ্নটা জয়িতার দিকে তাকিয়ে। জয়িতা মাথা নেড়ে না বলল। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল পালদেমের বউ। কোন মানুষ বরফ পড়া দ্যাখেনি এটা যেন তার বিশ্বাসে আসছে না। এমন কি ওদের ছেলেটাও হাসি হাসি মুখ করে আছে, হয়তো কিছু না বুঝেই।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল 'সাতদিন সময় পাওয়া যাবে?'

'তা যেতে পারে। কিন্তু বরফ পড়া মানে ঘরে বসে থাকা তো নয়। আমরা তো এই করেই বছরের পর বছর বেঁচে আছি।' পালদমে আগুনটা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল।

আনন্দ বলল, 'কিন্তু আমি চাইছি যারা বয়স্ক, অশক্ত বা শিশু তাদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে রাখতে। শেষ পর্যন্ত তোমার ভেনার সঙ্গে গ্রামের কটা পরিবার যোগ দিতে পারে বলে মনে হয়?'

'অন্তত দশ-বারোটা তো বটেই। তবে যাদের জমি বেশি নেই কিংবা থাকলেও চলে না তারা এসে তোমাদের প্রশংসা করেছে এইরকম একটা রাস্তা ভাবতে পারার জন্যে।'

'কিন্তু ওই দশ-বারোটা পরিবারের হাতেই কি বেশির ভাগ জমি?'

'অনেকটা। কিন্তু ওদের জমি চাষ করে দিই তো আমরা। এবার যদি আমরা আমাদের জমি বা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে ওরা বিপদে পড়বে।' পালদেম হাসল, 'তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। ওরা তোমাদের ভয় পাচ্ছে।'

'ভয়? কেন?' আনন্দ অবাক হল। কারও আচরণে তার একথা মনে আসেনি।

'তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে যার ভয়ে পাশের গ্রামের মানুষরা পালিয়েছে।'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। এই জিনিসটা সে কখনই চায় না। সে বলল, 'যারা মনে করে আমরা ভয় দেখিয়ে তাদের দলে টানব তারা ভুল করছে। তুমি ওদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও।'

জয়িতা বলল, 'পালদেমকে দিয়ে না বলিয়ে আমরাই যদি ওদের সঙ্গে কথা বলি তাহলে ভাল হয়।'

আনন্দ আপত্তি করল, 'না। সে ক্ষেত্রেও ওরা ভাবতে পারে আমরা প্রকারান্তরে ভয় দেখাচ্ছি।'

আলোচনা চলছিল। পরিবারগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করে এক একটা কমিউনিটি কিচেন গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি কিচেনের জন্যে বরফের সময়টা মেপে খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা করা হবে। যারা বরফের সময়ে নিজের ঘরে থাকতে চায় তারা থাকবে কিন্তু বাকিদের জন্যে যে বিশেষ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে আগুন এবং অন্যান্য সুবিধে যাতে থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও কাঠ জঙ্গল থেকে এনে চেরাই করে রোদে শুকিয়ে তৈরি করে রাখা হবে। এইসঙ্গে যুবকদের নিয়ে একটা দল তৈরি করা হবে যাদের ওপর দায়িত্ব থাকবে বরফের সময় যে কোন বিপদের মোকাবিলা করার। ভালুক এবং নেকড়ে ছাড়া কোন পশুর দেখা সে সময় পাওয়া যায় না। এই গ্রামের মানুষ তাই শিকার করে পেট ভরায়। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আনন্দ এই শিকার বন্ধ করতে চাইল না। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামের মানুষদের আয় বাড়াবার জন্যে ডেয়ারি, পোলট্রি, জঙ্গল থেকে এলাচ সংগ্রহ করে জমানো থেকে শুরু করে চাষযোগ্য জমিগুলোর অবস্থার উন্নতি করিয়ে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা পালদেমের কাছেও অভিনব। একটা আঙুল যেটা ধরতে পারে না, একটা হাত সেটা স্বচ্ছন্দে পারে। কিন্তু কাহুনকে কোনভাবে বিব্রত করতে চাইল না আনন্দ। এই মানুষটি যখন প্রচলিত অর্থে শোষক নয় তখন তাঁর প্রতি গ্রামের মানুষদের বংশানুক্রমে যে শ্রদ্ধা রয়েছে সেখানে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় হবে। কাহুন যতক্ষণ নির্লিপ্ত ততক্ষণ তাঁকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা যখন খাওয়া শেষ করল তখনই বাইরে শব্দ হল। পালদেম দরজাটা খুলতেই ছেলেগুলোকে দেখতে পেল। তারা প্রত্যেকে ভারী ভারী বস্তাগুলো পিঠে করে এই কুচি বরফের মধ্যে পাহাড় ভেঙে এইমাত্র এল। আনন্দ ওদের ঘরের ভেতব ডাকল এবং জয়িতা লক্ষ্য করল এটা পালদেম পছন্দ করল না। বোঝাগুলো নামিয়ে ছেলেগুলো আগুনের সামনে বসতে পেরে যেন বেঁচে গেল। পালদেম দাঁড়িয়েছিল আনন্দর পাশে। আনন্দ চাপা গলায় বলল, 'মনে রেখো ওরা তোমার কথায় এতদূর গিয়েছে। আর ওরা যা বয়ে নিয়ে এসেছে তা গোটা গ্রামের উপকারে লাগবে।'

পালদেম একই গলায় বলল, 'কিন্তু আমার বউ ব্যাপারটা মানতে পারছে না।'

'ওকে বুঝিয়ে বলো পরে।' আনন্দ আড়চোখে পালদেমের বউকে দেখল। হঠাৎ বাচ্চাকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত সে।

আগুন পেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হবার পর ওরা পালদেমকে গল্প শোনাচ্ছিল। দোকানদার ওদের কাছে অত টাকা দেখে কিরকম ঘাবড়ে গিয়েছিল। এর আগে খচ্চরওয়ালারাও নাকি বলেছে এখন তাপল্যাঙের মানুষের কাছে প্রচুর টাকা এসেছে। ওরা সবাই উৎসটা জানতে চাইছিল। কিন্তু ওরা যে গল্প বলেছে তা হল একজন ডাকাত তাপল্যাঙের কাছে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল, এইসব টাকা তার কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে। কথাগুলো কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও যারা করেনি তারা অন্য কিছু খুঁজেও পায়নি। কিন্তু ওখানে থাকতেই ওরা একটা কথা শুনতে পেয়েছিল যার জন্যে দোকানদার তাদের গল্পটাকেই সমর্থন করেছিল। একটা পুলিশবাহিনী নাকি চ্যাঙথাপুর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই আসছে সেই ডাকাতটির সন্ধানে। কিন্তু চ্যাঙথাপু থেকে যারা ওয়ালাংচাঙে এসেছে তারা শুনেছে যে একটা ডাকাত নয়, অনেক ডাকাত এই তল্লাটে লুকিয়ে আছে। আর তাপল্যাঙের লোকজন যে টাকা পেয়ে গেছে এ খবরও খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে পুলিশেরা জানতে পেরেছে। কথাটা শোনামাত্র ওরা রওনা হয়ে পড়েছিল। ওদের বিশ্বাস পুলিশ এলে দোকানদারও তাদের কথা বলবে।

আনন্দর চোয়াল শক্ত হল। এই পুলিশ দল নিশ্চয়ই ফালুটের ফাঁড়ি থেকে আসছে না। যাই হোক, ভারতীয় পুলিশের কাছে এখন খবরটা চাপা নেই। তারা মরীয়া হয়ে ওদের ধরবার জন্য বাহিনী পাঠাচ্ছে এখানে। কল্যাণের মৃত্যু বোধহয় ওদের টনক নড়িয়েছে। কিন্তু আর যাই হোক এই তল্লাটে পুলিশরাও তাদেরই মত নবাগত। এক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে ধরা দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। এবং যারা এতদূরে তাদের ধরতে আসছে তারা নিশ্চয়ই জেলে বসিয়ে খাবার খাওয়াবে না। আর সেভাবে জীবন কাটাবার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল।

আনন্দ জয়িতাকে ডাকল, 'চল, উই মাস্ট বি রেডি।'

জয়িতা ভাবছিল, ওর গলার স্বর শুনে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে?'

'ওরা কখন এই গ্রামে পৌঁছাবে জানি না। কিন্তু তার আগে আমাদের সতর্ক হতে হবে যাতে আচমকা ধরা না পড়ি। সুদীপটাকে তুলতে হবে। এই সময় মাল খেয়ে আউট হয়ে পড়ে রইল।' আনন্দকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

মাথা নাড়ল জয়িতা, 'না, আমরা যুদ্ধ করব না।'

'সেকি!' আনন্দ হতভম্ব, 'তুই ধরা দিতে চাইছিস?'

'না।' জয়িতা বলল, 'আমি কিছুই করতে চাইছি না। আমার মনে হয় ওদের মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। সরাসরি মোকাবিলা করা মানে, অসম যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ওরা অমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবে। তৃতীয়ত, এযাত্রায় যদি আমরা জিতেও যাই তবু পরিত্রাণ পাব না। ওরা আরও বড় বাহিনী নিয়ে ফিরে আসবে। একটা সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আনাড়ি হাতে লড়াই করা মানে আত্মহত্যা করা। মরে গেলে তাপল্যাঙের মানুষের জন্যে যা করতে চাইছি তা তুই করবি কি করে?'

কথাগুলো হচ্ছিল বাংলায় যা পালদেমের বোঝার কথা নয়। কিন্তু সে মন দিয়ে শুনছিল। জয়িতা থামতে সে বলল, 'আমাদের এই গ্রামে পুলিশ কখনও আসেনি। এরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আর দেরি নেই তাদের এখানে আসতে। তোমাদের একটা কথা বলি, গ্রামের কোন মানুষই চাইবে না এখানে লড়াই হোক। তোমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চেও না। তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে গ্রামের মানুষের যে ক্ষতি হবে না তা কে বলতে পারে! তাছাড়া লড়াই-য়ে এক পক্ষকে হারতেই হয়। তোমরা হারলে এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা ঠিক হল সব বেঠিক হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও। আমি পালার সঙ্গে কথা বলে দু'তিনজনকে নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় আনন্দ ছেলেগুলোকে বলল বস্তাগুলো কোথায় রাখতে হবে। এখন পায়ের তলায় কুচি বরফ জমাট হতে চলেছে। হাওয়া বইছে। তবে সেই হাওয়ায় বরফ ভেসে আসছে না বলে কষ্টটা কম হচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ, তারপর জয়িতাকে বলল, 'তুই আস্তানায় যা, আমি সুদীপকে দেখে আসি। ওকে যে করেই হোক তুলতে হবে।'

জয়িতা বলল, 'তুই একা পারবি না।' সে আর কথা না বাড়িয়ে মেয়েটির ঘরের দিকে রওনা হল। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। দাঁতে দাঁতে একনাগাড়ে শব্দ বাজছে।

আনন্দ দরজাটা ঠেলতে কোন মানবিক আওয়াজ শুনতে পেল না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'সুদীপ।'

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়িতা ভেতরে ঢুকে পড়ল। আনন্দ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় অন্ধকারে জয়িতার গলা শোনা গেল, 'ওরা এ ঘরে নেই।'

'সেকি রে?' আনন্দ অবাক। একটা পরিপূর্ণ মাতাল এমন অবস্থায় বাইরে যাবে কেন?

জয়িতা ফিরে এল, 'আমি বুঝতে পারছি না। সুদীপের কোন হুঁশ ছিল না নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিন্তু কোথায় ওর খোঁজ করি বল্ তো? পালদেমের সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

ওরা চুপচাপ প্রায় ছুটে আসছিল। জয়িতা রহস্যটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। ওর মনে এতক্ষণ যে অস্বস্তিটা নখ বসাচ্ছিল আচমকা সেটা জরাগ্রস্ত হয়ে ভয়ে রূপান্তরিত হল। যদি পাশের গ্রামের মানুষরা এমন রাতের সুযোগে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে আসে এবং সুদীপকে খুন করে কোথাও ফেলে যায়? অসম্ভব নয়। কারণ সেই ঘটনার পর ওরা বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ওই সময় মাথা গরম না করলে এই ঘটনাটা ঘটত না। সুদীপ যাই করুক, এমন সোজা মনের ছেলে সে দ্যাখেনি। সোজা কিন্তু

বেহিসাবী। আর শেষটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত।

আস্তানার বারান্দায় উঠে আনন্দ বিস্মিত। ভেতরে আগুন জ্বলছে। এবং সেই সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠে অবোধ্য ভাষায় সুর খেলা করে যাচ্ছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের সিনেমার একটি হিট গান যা কিনা ঠিক এই রকম মেলোডিয়াস। সে ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেলতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। মেয়েটি আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে গান গাইছে। আর তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুদীপ। আগুনটাকে ওরাই জ্বালিয়েছে। কথা না বুঝলেও সুর মানুষের মনে ভাষা তৈরি করতে পারে যদি তা আন্তরিক হয়। সুখ এবং দুঃখের প্রান্তে এমন একটা অনুভূতি আছে যার প্রকাশ একটাই সুরে সম্ভব। এই গান শুনে আনন্দ বুঝতে পারছিল না মেয়েটি দুঃখী না সুখী!

জয়িতা এগিয়ে যেতেই মেয়েটি গান থামিয়ে চমকে মুখ তুলল। তারপর সরল হাসল। আনন্দ দেখল, জয়িতার মুখে আগুনের আভা লেগেছে। সে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কখন এসেছ এখানে?'

মেয়েটির একটা হাত সুদীপের বুকের ওপরে তখনও। সেই অবস্থায় বলল, 'অনেকক্ষণ।' তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি চলে আসার পর ও আর আমার ঘরে থাকতে চাইল না।'

হঠাৎ জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওর কাছে ঠিক কি চাও?'

'আমি?' মেয়েটি মাথা নিচু করল এবার, তারপর চুপ করে বসে রইল।

জয়িতা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'না, চুপ করে থাকলে চলবে না। তুমি সুদীপ—। আমি জানতে চাই সুদীপ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে কিনা? আর তাই করে থাকলে সেটা তোমার প্রশ্রয়েই হয়েছে। ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হবে!'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা এখন যে গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না তা সে বুঝতে পারল। জয়িতা জানতে চাইছে সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে কিনা। কোন মেয়েকে এরকম প্রশ্ন সরাসরি করা যে অস্বস্তিকর তা এই মুহূর্তে জয়িতাও ভুলে গিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুদীপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে ঝাঁকাতেই সুদীপ চোখ মেলল। চোখ দুটো এখন টকটকে লাল। প্রথমে মনে হল সুদীপ চিনতে পারছে না। মেয়েটি বলল, 'ওকে ঘুমাতে দাও। ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ও এখানে কিভাবে এল? মনে হচ্ছে হেঁটে আসেনি।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'আমি নিয়ে এসেছি।'

জয়িতা মেয়েটাকে ভাল করে দেখল আবার। সুদীপকে বয়ে নিয়ে আসার শক্তি ও ধরে?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি হাসল, 'ও বলেছে এখন থেকে আমরা বন্ধু।'

আনন্দ উঠে এল জয়িতার কাছে। তারপর নিচু গলায় বাংলায় বলল, মাথা গরম করিস না। মনে হচ্ছে মেয়েটা ইনোসেন্ট। তবে পালদেমরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছি না।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। এমনিতেই এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অন্যদের মত তার ঠোঁটেও এখন ফাটল এবং সামান্য ক্ষতের চিহ্ন তবু এই বিকৃতিটা ধরা পড়ল। জয়িতা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'মানুষ কেন মদ খায় যদি এই অবস্থা হয়!'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। আনন্দ গলা তুলে আসতে বললে পালদেমরা এল। ওরা দুজন, পালদেম আর লা-ছিরিঙ। মেয়েটিকে দেখে পালদেমের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের দেখামাত্র মেয়েটি আগুনের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পালদেম আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি এখন এই ঘরেই থাকে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। আমাদের এই বন্ধু অসুস্থ, তাই ওকে নিয়ে এসেছে।'

লা-ছিরিঙ বলল, 'ওর খুব নেশা হয়ে গিয়েছে।'

পালদেম মেয়েটিকে দেখল, 'ওর সামনে তোমরা কথা বলতে চাও? আমি ওকে বিশ্বাস করি না, যতদিন ও আবার বিয়ে না করে।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে করার সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি সম্পর্ক?'

পালদেম উত্তর দিল, 'আমাদের এখানে নিয়ম প্রত্যেক যুবতী মেয়ের স্বামী থাকবে। স্বামী হল তার

চরিত্রের চারপাশে বেড়ার মতন। না হলে পাপের ঢুকতে দেরি হয় না।'

'বাজে কথা।' জয়িতা চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে তো তোমরা আমাকেও বিশ্বাস করো না।'

'তুমি বাইরে থেকে এসেছ। আমাদের নিয়ম তোমার ক্ষেত্রে খাটে না।'

'এসব তোমরা নিজেদের সুবিধেমত তৈরি করে নিয়েছ। একটা মেয়েকে বা পুরুষকে বিশ্বাস করা যায় তার কাজের মধ্যে দিয়ে।' জয়িতা শক্ত গলায় জানাল।

'বেশ। ওর কাজই কি বিশ্বাসের যোগ্য? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করত। বাচ্চা হয়নি বলে স্বামীকে দোষ দিত। মানলাম লোকটা খারাপ ছিল। কিন্তু হাজার হোক স্বামী। সে মরে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ও অন্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল। কেন?'

'তোমরা ওকে একঘরে করে রেখেছিলে তাই।'

'তোমাদের এই বন্ধুর সঙ্গে ওর এত ভাব, ওর মতলব কি তা জানো?'

'জানি না। জানতেও চাই না। যতক্ষণ না ওর কাজের জন্যে গ্রামের অন্য মানুষগুলোর ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের নাক গলাবার কোন মানে হয় না।' জয়িতা কথা শেষ করতে আনন্দ ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকাল। এতক্ষণ জয়িতা মেয়েটিকে সহ্য করতে পারছিল না। অথচ এখন ওরই হয়ে সমানে লড়ে যাচ্ছে। তারপরেই খেয়াল হল, জয়িতা সমর্থন করছে একটি কোণঠাসা মেয়েকে। বিশেষ এই মেয়েটিকে নয়। সে বলল, 'এসব কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।'

লা-ছিরিঙ জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোমাদের ধরতে পুলিশ আসছে? আমি কখনও পুলিশ দেখিনি। ওরা কি খুব নিষ্ঠুর?'

জয়িতা ছেলেটির দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এই সারল্যের কি জবাব দেবে সে?

পালদেম আবার মেয়েটিকে দেখল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'পুলিশ এই গ্রামে হামলা করলে আমরা বিপদে পড়ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের সাহায্য করছি তোমরা আমাদের ভাল চাইছ। এখানে পুলিশ বেশিদিন থাকতে পারবে না। বরফ পড়ার আগেই ওরা চলে যেতে বাধ্য হবে। ততদিন তোমরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে। লা-ছিরিঙ তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে বাইরের লোক কখনই পথ চিনিয়ে না দিলে পৌঁছাতে পারবে না। দিনের বেলায় এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ গ্রামের সব মানুষই যে মুখ বন্ধ করে থাকবে এমন না-ও হতে পারে। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কথা আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু বলব তোমরা চলে গেছ। অস্বীকার করে যে লাভ হবে না তা বুঝতেই পারছ। তোমাদের আপত্তি আছে?'

আনন্দ বলল, 'না। কিন্তু যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকব সেখানে থাকা যাবে তো?'

'কষ্ট হবে। তবে একটা চমৎকার গুহা আছে উত্তরের পাহাড়ে। সেখানে আগুন জ্বালালেও কেউ টের পাবে না। শুধু পাহাড়ি ভালুকের আর দানোর ভয় ছাড়া কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। ওদের আমরা সামলে নেব।' আনন্দ বলল।

অতএব স্থির হল ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়া হবে। এই ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে তার কিছুটা পালদেমের কাছে রেখে বাকিগুলো ওরা সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যাবে লা-ছিরিঙ। আনন্দ আর জয়িতা ছড়ানো সংসার গোছাতে লাগল। পালদেম জানাল পুলিশ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ামাত্র সে খবর পাঠাবে ফিরে আসতে। আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দিল গ্রামের মানুষদের নিয়ে তাকে কি কি করতে হবে। পালদেম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত জিনিস গোছানো শেষ হলে হঠাৎ জয়িতা ডুকরে কেঁদে উঠে সামলে নেবার চেষ্টা করল প্রাণপণে।

আনন্দ দেখল জয়িতা কল্যাণের পড়ে থাকা জিনিসগুলোর ওপর হাত রেখেছে।

রোবট দ্যাখেনি জয়িতা স্বচক্ষে তবে যা বর্ণনা পড়েছে তার সঙ্গে এই মুহূর্তের সুদীপের কোন তফাৎ নেই। ও হাঁটছে যে ভঙ্গিতে সেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অনেক সাধ্য-সাধনার পরও যখন সুদীপের চেতনা পরিষ্কার হল না তখন লা-ছিরিঙ একটা গাছের পাতা এনেছিল। ওই শেষ রাতের ঠাণ্ডায় শরীরে তেমন শীতবস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও ওরা যেভাবে চলাফেরা করে সেটা অভ্যেসের ফসল হতে পারে কিন্তু গাছপালা হাতড়ে পাতা খুঁজে আনা কম কথা নয়। সুদীপের মুখের ভেতর পাতাটা পুরে দিয়ে চোয়ালে দুহাতের চাপ দিয়ে সেটাকে নাড়াতে বাধ্য হয়েছিল লা-ছিরিঙ। পাতার রস পেটে যাওয়া মাত্র বমি হয়েছিল সুদীপের। সেই বমির রঙ দেখে চমকে উঠেছিল ওরা। কোন মানুষ এমন ঘন কালো রঙের বমি করতে পারে ওরা জানত না। বোধ হয় শরীরের অস্বস্তিটা সামান্য কমতেই আরও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সুদীপ। বোঝা যাচ্ছিল এখন ওর ঘুম দরকার। কিন্তু তাপল্যাঙে ঘুমিয়ে থাকার ঝুঁকি ওই সময় নেওয়া আর মৃত্যুকে ডেকে আনা একই ব্যাপার। আনন্দ সুদীপের মাথাটা দু'হাতে তুলে প্রায় আর্তনাদ করেছিল, 'সুদীপ, উই আর ইন ট্রাবল. পালাতে হবে এখনই।' সুদীপ চোখ তুলেছিল। হয়তো কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। কারণ সে উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল। জয়িতা তার অন্যদিকটা ধরে তোলার চেষ্টা করার পর সে কাটা গাছের মত টলমল করতে লাগল। ওর নিজস্ব শক্তির এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

সেই সময় মেয়েটি এগিয়ে এল। কোন কথা না বলে সুদীপের শরীরটা নিজের পিঠে তুলে নিল সে। জয়িতা হতবাক। সুদীপ বেশ স্বাস্থ্যবান অথচ মেয়েটি অবলীলায় তুলে নিল ওকে। সে শুনল লা-ছিরিঙ বিড় বিড় করে কিছু বলল। সেটা প্রশংসার না নিন্দের তা অবশ্য বোঝা গেল না।

ওরা যাত্রা শুরু করেছিল শুকতারা চোখে রেখে। বের হবার আগে সমস্ত ঘরটা জরিপ করে নিয়েছিল যাতে ওদের কোন স্মৃতিচিহ্ন না থাকে। লা-ছিরিঙ আর জয়িতা সামনে, সুদীপকে নিয়ে মেয়েটি মাঝখানে আর শেষে আনন্দ। ওরা যখন তাপল্যাঙ থেকে বেরিয়ে এল তখন কোন মানুষ জেগে নেই। এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত আর চিৎকার করছে না। আলো জ্বলছে না কোথাও। আর ঠাণ্ডা এখন হায়েনার দাঁতের চেয়েও ধারালো। আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারল ওর নাকের ডগা ফাটছে। ইতিমধ্যে যা ফেটেছিল তাতেই ভয় হচ্ছিল রস না গড়ায়। সেখানে হাওয়া লাগায় এখন আরও জ্বালা করছে।

ওরা যাচ্ছিল আরও উত্তরে। পায়ের তলায় এখন রীতিমত কাঁচ-বরফ। চাপে মচমচিয়ে ভাঙছে। ওরা এখন নামছে ঢালুতে। ফলে বেশি শক্তি খরচ হচ্ছে না। আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। ওর মাথাটা মেয়েটির কাঁধের ওপর এতক্ষণ নেতিয়ে ছিল। এই পাহাড়ি পথে অতটা ওজন নিয়ে মেয়েটা ঝুঁকে হেঁটে যাচ্ছে। কেন? কি দরকার এত কষ্ট করার? ওর মনে হল জয়িতা যে রেগে গিয়েছিল তার পেছনে এই কারণটা ছিল। মেয়েটি মানসিকভাবে সুদীপের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। যতদূর মনে পড়ে কোন মনস্তাত্ত্বিক লেখেননি শুধু শরীরের প্রয়োজনে বা আপাত ভাল লাগায় কোন পুরুষ আর একজনের জন্যে এত কষ্ট করে না। সুদীপকে বাঁচাবার তাগিদ আছে মেয়েটার। আর এইভাবে জড়িয়ে পড়াটা জয়িতার পছন্দ নয়।

লা-ছিরিঙ আর জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল চড়াই-এর মুখে এসে। ভোর হচ্ছে। যদিও সূর্যোদেবের কোন হদিশ নেই কিন্তু মাকালুর চুড়োটা রঙ পালটাচ্ছে। ওপাশে চ্যামল্যাঙের মাথায় সিঁদুর জমল। লোৎসেকে দেখা গেল তার পরেই। যেন হাতের মুঠোয় ওরা। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা সাদা মেঘের থাবা লুকিয়ে ফেলল এভারেস্টকে। জাগব জাগব করেও বেচারার জাগা হল না। এই সময় মেয়েটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল সুদীপকে। খানিকটা টলমল করে সে স্থির হল। জয়িতা মালপত্র নামিয়ে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল তার কাছে, 'কেমন লাগছে এখন? বেটার ফিল করছিস?' সুদীপ কথা বলতে গেল কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো শুধু নড়ল। শেষপর্যন্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক পুতুলের মত।

লা-ছিরিঙ তাড়া লাগাল, 'জলদি চল। এই পাহাড়টা ভাল করে আলো ফোটার আগেই পেরিয়ে যেতে হবে।'

আনন্দ মুখ তুলে পাহাড়টা দেখল। খুব উঁচু নয়, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে গেলে ঘাড়ব্যথা হয়ে যায়। সে বলল, 'ওকে নিয়ে এতটা উঁচু পেরোব কি করে?'

লা-ছিরিঙ বলল, 'ওকে যে বয়ে এনেছে এতটা সেই নিয়ে যাবে। চল চল। সোজা উঠতে হবে না, ভেতরে ভেতরে রাস্তা আছে। গ্রাম থেকে এই জায়গাটা চেষ্টা করলে দেখা যায়।' সে জিনিসপত্র আবার তুলে নিল। ওরা হাঁটা শুরু করতেই কাণ্ডটা ঘটল। লা-ছিরিঙকে অনুসরণ করে সুদীপ হাঁটতে লাগল। প্রথম দিকে সে টালমাটাল হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে উঠল। পুতুল কিংবা রোবটের মত দেখতে লাগছিল ওকে তখন। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই সে পড়ে যাবে। শরীর বাঁক নিচ্ছে না। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। তার দুটো হাত শরীরের দু'পাশে শক্ত হয়ে ঝুলছে। ওর দিকে তাকালেই মনে হয় পৃথিবীর কোন কিছুর সম্পর্কেই সে ভাবছে না। শুধু তার হেঁটে যাওয়া, সে তাই হাঁটছে। মেয়েটি ঠিক ওর পেছনে। বোধ হয় সতর্ক নজর রাখছে ও সুদীপের ওপর। জয়িতার খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। এই সুদীপের সঙ্গে পরিচিত ছটফটে সুদীপের কোন মিল নেই। আর এটাই অত্যন্ত অস্বস্তির। চলতে চলতে লা-ছিরিঙও সুদীপকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এবার সে জয়িতাকে বলল, 'তোমাদের এ বন্ধু খুব তাড়াতাড়ি ভাল হবে না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠতেও অসুবিধে হবে?'

জয়িতা উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'কি জন্যে তোমার মনে হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি ভাল হবে না।'

'আমি যে পাতাটা খাইয়েছিলাম সেটা পেটে গেলে নেশা কেটে যেতে বাধ্য। ওর উপকার হয়েছে, কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?' জয়িতার মনে হচ্ছিল লা-ছিরিঙ অকারণে রহস্য তৈরি করতে চাইছে।

'আমাদের একটা পাহাড়ি মদ আছে। অল্প খেলে ঠিক আছে। বেশি খেলে সেটা মাথার মধ্যে চলে যায়। যতদিন সেটা মাথার মধ্যে থাকে ততদিন কোন কিছু চিন্তা করার শক্তি থাকে না। মদের দানো এসে তার মাথায় বসে থাকে। অনেকেই তখন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু তোমার বন্ধু যখন বিড়বিড় করছে না তখন পাগল হবে না। যার যা হবার তা তো হবেই। এই নিয়ে চিন্তা করার কি আছে!' লা-ছিরিঙ হাসল।

মনে মনে শিউরে উঠল জয়িতা। এ রকম কেস সে শুনেছে। তবে তা তো ড্রাগসের কল্যাণে হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না, হাত পা কাঁপে। কিন্তু মস্তিষ্ক অসাড় হওয়ার ফলে পুতুলের মত চালচলনের কথা তো শোনেনি। ওর মনে হল লা-ছিরিঙ ঠিক বলছে না। অবশ্য ওর বানিয়ে বলেই বা কি লাভ। ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল জয়িতার। ওদের সঙ্গে এখনও প্রচুর ওষুধ আছে। কিন্তু এই রোগের উপশম করার কোন ওষুধ নেই। বুকের ভেতরটা কেমন কাঁপছিল জয়িতার। সে আবার লা-ছিরিঙের দিকে তাকাল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন। চোখাচোখি হতেই সরল হাসল ছেলেটা। জয়িতা এবার হাঁপাতে লাগল। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পিঠের এবং হাতের বোঝা এখন আরও ভারী বোধ হচ্ছে। দম নেবার জন্যে জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়তেই লা-ছিরিঙ বলল, 'সকাল হয়ে গেছে, আমাদের এখনও একঘণ্টা হাঁটতে হবে।'

এই পথে মানুষ যাতায়াত করে না। জন্তু-জানোয়ারের কথা বলা যাচ্ছে না কিন্তু গৃহপালিত পশু চোখে পড়ছে না। সরু পথটা এখন খাড়াই। নিচের বন্ধুদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। লা-ছিরিঙ আবার বলল, 'তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমার কাঁধে কিছু জিনিস দিতে পার।'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর আবার চলা শুরু করল। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলতে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল সামনেই বরফ। প্রথম সূর্যের আলো এখনও পড়েনি কিন্তু তার আভায় নীলাভ হয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিটা চট করে কমে গেল। সব কিছু ভুলে গেল জয়িতা। বরফে পা রাখামাত্র গোড়ালি সামান্য বসে যাচ্ছিল এবং খানিক বাদেই আশপাশের কোথাও আর পাহাড় কিংবা পাথর দেখা গেল না। সর্বত্র সাদা তুষার ছড়ানো।

তাপল্যাঙে আসার পর অনিয়মিত আহার, মারাত্মক ঠাণ্ডা এবং উদ্বেগ জয়িতার শরীরে বিস্তর ছাপ ফেলেছে। সে কখনই স্বাস্থ্যবতী ছিল না কিন্তু দুর্বলতার কারণে নিজেকে আরও রোগা মনে হচ্ছে ইদানীং। তার মুখের খোলা চামড়ায় শীতের ছাপ হাঁসের পায়ের মত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিজেকে একটি বিশেষ আদর্শে নিবেদিত মনে করায় প্রতিনিয়ত বাঁচার শক্তি খুঁজে পেত। ব্যক্তিগত ভাল লাগা বা নিজের জন্যে আলাদা করে কিছু চিন্তা করা আর হয়ে উঠত না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে হিমালয়ের তুষারধবল প্রান্তরে যেই প্রথম সূর্যের কচি আলো পড়ল তখনই সে তড়িতাহত হয়ে গেল। চোখের

সামনে এক অপরূপ দৃশ্য যার বর্ণনা মানুষের মাথায় চট করে আসে না। সোনালি-সাদায় মেশামেশি বরফের ওপর দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। আজন্ম কলকাতায় মানুষ জয়িতার বরফ সম্পর্কে যা কিছু ধারণা বই এবং চলচ্চিত্র থেকে। এক ধরনের রোমান্টিক মানসিক-অভিযান চলত তার সেই সব দৃশ্য দেখা বা পড়ার সময়। আজ তার চোখের সামনে বাস্তব বরফ, এই বরফ ক্যাপ্টেন কুককে মেরে ফেলেছিল। এই সময় লা-ছিরিঙ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সিগারেট খাবে?'

বিহ্বল মুখ ফেরাল জয়িতা। লা-ছিরিঙকে দেখে মনে হল যেন আকাশ থেকে ঈশ্বরপুত্র নেমে এলেন। কোন মলিনতা নেই ওর হাসিতে। ঠিক এই সময় নিজেদের খুব ছোট সংকীর্ণ বলে বোধ হল তার। কলকাতায় প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি নারী অনুক্ষণ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। শহরসভ্যতা যে মেকী মানসিকতা তৈরি করে দেয় জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের মুহূর্তে তার থেকে মুক্তি পর্যন্ত নেই। ব্যতিক্রম যারা হতে চায়, যারা মানুষের সঠিক জায়গার খোঁজ দিতে বদ্ধপরিকর তাদের হয় পাগল নয় রাজনৈতিক মতলববাজ করে চিহ্নিত করে দেয় পেশাদারী রাজনৈতিক দলগুলো। আর লক্ষ লক্ষ মূর্খ সেই সব বাণী গপগপিয়ে গেলে। সৌন্দর্যের আর এক নাম যে সারল্য এটা শহরের মানুষ আজ বিস্মরিত।

'এই সিগারেট শরীর গরম করে।' লা-ছিরিঙের হাতে পাকানো সিগারেট। বরং বিড়ি বলাই ভাল। সিগারেট শব্দটা ও শিখল কখন কিভাবে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না জয়িতা। হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। তারপরে একটা কাণ্ড দেখল। পকেট থেকে দুটো চ্যাপটা পাথর বের করল লা-ছিরিঙ। চটজলদি সে-দুটো ঘষে আগুনের ফুলকি বের করছিল সে। সেই ফুলকি কয়েকবারের চেষ্টায় বিড়ির মুখে ঠিক লাগিয়ে নিল। গলার শিরা ফুলিয়ে টানতেই তা থেকে ধোঁয়া বের হল। চোখ বন্ধ করে প্রথম আরামটা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল লা-ছিরিঙ। জয়িতা তার হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে নিজেরটা ধরাল। একটা তিত্‌কুটে স্বাদ। সকালে কিছু পেটে না পড়া এবং রাত্রি-জাগরণের অবসাদে শরীর এই বিড়ির ধোঁয়া নিচ্ছিল না। কিন্তু জোর করে কয়েকটা টান দেবার পর আর এক ধরনের মাদক[illegible] শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। উষ্ণ হল শরীর। সে হাসল। দোকানের বিড়ি-সিগারেটের সঙ্গে এই হাতে পাকানো সিগারেটের পার্থক্য হল ওইটেই। সেই সঙ্গে একটা নেশা ধরানো গন্ধ। হয়তো যে গাছের পাতা থেকে এটি বানানো তা-ই নেশার কাজে ব্যবহৃত হয়। হোক, কিন্তু এই মুহূর্তে তার শরীর বেশ তরতাজা লাগছে। সে লা-ছিরিঙকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

লা-ছিরিঙ ওদের যে গুহাটার সামনে নিয়ে এল সেখানে পৌছতে হলে পৃথিবীর সেরা পুলিশদের তাপল্যাঙের মানুষদের সাহায্য লাগবে যারা জায়গাটা জানে। গুহার মুখে পৌছবার পর লা-ছিরিঙ ওদের একপাশে সরে দাঁড়াতে বলল। তারপর জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দলা দলা বরফ তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল গুহার ভেতরে চিৎকার করে। সেই চিৎকার অনেকগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। তারপরেই মা-ভালুকটাকে দেখা গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। হিমালয়ের ভালুকের গল্প পড়েছিল জয়িতা। চোখের সামনে দেখে তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। লা-ছিরিঙ শুধু কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে মাত্র, কিন্তু তার হাতের লাঠি, যাতে মালপত্র বেঁধেছিল আসার সময় এখন সমানে ঘুরছে আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত আক্রমণাত্মক শব্দ বের করছে মুখ থেকে। ভালুকটা কয়েকবার দাঁত বের করে এই স্পর্ধার প্রতি তার প্রতিবাদ জানাল। বাচ্চা দুটো মায়ের শরীর ঘেঁষে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় মা এবং বাচ্চারা ওপাশে নেমে গেল। এবার লা-ছিরিঙ শান্ত হল। সে জয়িতাকে বলল, 'এই গুহাটাই সবচেয়ে ভাল। এখানে দানো ঢুকবে না।'

'কেন?' জয়িতার পুরো ব্যাপারটা এখন মজাদার লাগছিল।

'যেখানে ভালুক থাকে সেখানে দানো আসে না। দুজন দুজনের খুব শত্রু।' সে এবার নির্ভয়ে চলে গেল গুহার ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে গুহাটা বেশ বাসযোগ্য হয়ে গেল। নিচে একটা টেন্ট পাতা হল। তার ওপর জিনিসপত্র বিছিয়ে আনন্দ আর লা-ছিরিঙ দ্বিতীয় টেন্টটা দিয়ে গুহার মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগল। ভেতরে বরফ নেই কিন্তু ভালুকের বোঁটকা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। গুহাটা বেশ বড়, শেষদিকে আলো ঢুকছে না। এবং সবচেয়ে আরামের যেটা তা হল এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম।

আনন্দরা যখন গুহার মুখটায় পর্দার মত আড়াল ঝোলাতে পারল তখন বাতাসের পথ বন্ধ হল কিন্তু অন্ধকার বাড়ল।

এবার জয়িতা তাকাল সুদীপের দিকে। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সে। এই খাড়াই পথটা ওকে বয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েটা। এখন দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুগেড়ে বসে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। ও না থাকলে সুদীপকে এখানে নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল। জয়িতা সুদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীপের চোখের মণি স্থির। কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে সুদীপের গালে হাত রাখল, 'সুদীপ!'

কোন সাড়া এল না সুদীপের কাছ থেকে। জয়িতার বুকের কান্নাটা গলায় উঠে আসছিল। সে আবার ওর চোখের কাছে আঙুল নিয়ে গেল। এবার চোখের পাতা বন্ধ হল। হঠাৎ আবেগে শরীর কাঁপানোয় জয়িতা দু'হাতে সুদীপকে জড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখল। এতটা পথ আসার সময় সে মেয়েটির কাছ থেকে যা জেনেছে তাতে সুদীপের মস্তিষ্কের অসাড়তা খুব অল্পে দূর হবে বলে মনে হয় না। কল্যাণটা চলে গেল, সুদীপ যদি এভাবে অকেজো হয়ে যায় তাহলে রইল তারা দুজন। কাজের পরিধি বিরাট অথচ মানুষ কম। পালদেমকে বোঝালে বুঝতে পারে কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার ক্ষমতা ওর নেই। সুদীপকে যে ভঙ্গিতে জয়িতা জড়িয়ে ধরেছে তা স্বাভাবিক সময়ে হত না। কল্যাণের একটা ধারণা ছিল জয়িতা সুদীপকেই বেশি পছন্দ করে। এমন কি ওর সঙ্গে সুদীপের প্রণয়-সম্পর্ক খুঁজে বার করতেও চেষ্টা করত। এসব ভাবনা কখনও আনন্দর মাথায় আসেনি। কিন্তু এখন ওই ভঙ্গি চোখের সামনে দেখে আনন্দর বারংবার কল্যাণের কথা মনে পড়ছিল। কল্যাণ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারত না।

ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল। ওরা কেউ পর্দাটার দিকে নজর দেয়নি। প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন সুদীপ জয়িতার ওপরে। এমন সময় ঠিক ঘাড়ের পেছনে জান্তব চিৎকার আর মেয়েটির আর্তনাদ একই সঙ্গে শোনা গেল। চকিতে কয়েক পা সরে এসে আনন্দ দেখল মা ভালুকটা বীভৎস দাঁত বের করে মেয়েটিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আনন্দর মস্তিষ্ক এবং হাত একসঙ্গে কাজ করল। রিভলবারটা বের করে সজাগ রেখেছিল সে গুহার মুখে ভালুকটাকে দেখার পর। সেইটাই কাজে লাগল। শব্দটা ভয়ঙ্কর ভাবে গুহাটাকে কাঁপাল। প্রথম গুলিটা ভালুকটার প্রথম পায়ে লাগতেই সে আহত হয়ে মেয়েটার কাছ থেকে সরে এল। খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েও মেয়েটি যেন নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। আহত ভালুকটা এবার পেছনের দুই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লা-ছিরিঙের উদ্দেশ্যে এগোতেই দ্বিতীয় গুলিটা সরাসরি বুকে লাগল। একটা পাহাড়ের মত কাঁপতে কাঁপতে ভালুকটা লুটিয়ে পড়ল গুহার মুখে। পড়ার সময় টেন্টটাকে ছিঁড়ে নিয়ে এল শরীরের নিচে। শব্দটা এখন বহুগুণ। যেন সমস্ত পাহাড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আনন্দ চিৎকার করে সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল। পর্দাটা তো ছিলই না, ভালুকটার শরীর ডিঙিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। আনন্দ যার ভয় পেয়েছিল তা হল না। বিদেশী সিনেমায় দেখেছিল এই ধরনের শব্দ আলগা পাথর বা বরফ নড়িয়ে ধস নামায়। কিন্তু এখানকার পাহাড় শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও ঠিকঠাক আছে। ধাতস্থ হবার পর জয়িতার খেয়াল হল সুদীপ বের হয়নি। এবং তখনই মেয়েটা ছুটে গেল ভেতরে। কান্নাটা শুনতে পেল সবাই। সুদীপ কাঁদছে। জয়িতা ওদের বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে নিজে এগিয়ে গেল।

গুহার মধ্যে যেখানে সুদীপ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে এখন। আর সেই অবস্থায় ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। মেয়েটি এখন তার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে। এই কান্না তাকেও অবাক করেছে। কিন্তু সে কোন কথা বলছে না, স্পর্শও না। জয়িতার সমস্ত শরীরে কদম ফুটল। সুদীপ কাঁদছে যখন তখন ওর অসাড় হওয়া মস্তিষ্ক এখন কাজ করছে। তার মানে ও আবাব স্বাভাবিক হতে চলেছে। হয়তো ওই তীব্র শব্দ ওর চেতনা স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল, 'সুদীপ, অ্যাই সুদীপ, কি হয়েছে তোর?'

সুদীপের কান্নাটা অকস্মাৎ থামল। তারপর সেই অবস্থায় চুপচাপ বসে রইল। জয়িতা এবার আনন্দর গলা শুনল, 'ওকে এখন ডিস্টার্ব করিস না জয়ী। বরং ও যদি ঘুমাতে পারে তাহলে ভাল হয়—'সুদীপ, তুই কি ঘুমাবি? বিছানা ঠিক করে দেব?'

সুদীপ কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গিরও পরিবর্তন হল না। মেয়েটি তখনও পুতুলের মত

দাঁড়িয়ে। আনন্দ দেখল লা-ছিরিঙ প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভালুকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার একার শক্তিতে সেটা অসম্ভব। ভালুকটার দিকে তাকালে বোঝা যায় এর বয়স বেশি নয়। লা-ছিরিঙ তার নিজস্ব ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু বলতেই মেয়েটি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেল। ওই জানোয়ারটার শরীরে হাত দিতে জয়িতার ঘেন্না করছিল। তাছাড়া সুদীপের ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। ও যদি চেতনা ফিরে পেয়ে থাকে তাহলে এখনো সাড়া দিচ্ছে না কেন?

সুদীপের বিছানাটা বের করে সে একপাশে বিছিয়ে দিয়ে সুদীপকে ডাকল, 'সুদীপ আয়।' মাথা নাড়ল সুদীপ। মুখে কিছু বলল না। ভঙ্গিও পালটাল না। আর এতেই খুশী হল জয়িতা। অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ও। অর্থাৎ স্বাভাবিক হবে একসময়। বুকের ভেতর জমে থাকা পাহাড়টা যেন আচমকা সরে গেল জয়িতার। সে দেখল ভালকুটাকে ওরা অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। লা-ছিরিঙ কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে চিৎ-করা ভালুকের বুকের চামড়া কাটতে লাগল। এখন গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। জয়িতা চোখ বন্ধ করল। তার শরীর গোলাতে ল্যাগল। সারারাত জেগে, ভোরে এই পরিশ্রম করে এখন সমস্ত শরীরে বমি-ভাব ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ খুব অসুস্থ মনে হল নিজেকে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনরকমে বাইরে এসে ভালুকটার বিপরীতে গিয়ে পেটে হাত রেখে বমি করল। শুধু তেতো জল ছাড়া আর কিছু বের হল না। ওরা সবাই ভালুকটাকে নিয়ে ব্যস্ত এখন। দমক আসছে জয়িতার কিন্তু মুখ থেকে কিছুই বের হচ্ছে না। এবং এখানে আসার পর সম্ভবত এই প্রথম তার হিমবাতাস ভাল লাগল। মুখের খোলা ফাটা জায়গাতেও তার স্পর্শ অনেক রমণীয় মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরটা ঠিক করে নিতে চেষ্টা করছিল। বমি-ভাবটা কমে এলে সে চোখ মেলল। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। তার ওপর কচি কলাপাতার মত রোদের চাদর বিছানো। সুন্দর যেন সুন্দরতর হয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জয়িতা। এবং হঠাৎ তার মনে হল কিছু একটা নড়ছে ওপাশের বরফের ঢিপির গায়ে। জিনিসটা কি সঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন প্রাণী রয়েছে আশেপাশে। এই জায়গা খুব নিরাপদের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। জন্তুটা ঠিক কি প্রকৃতির তা দেখার জন্যে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। জয়িতা গুহার পাশে পাথরের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে বসতে গিয়ে দেখল সেটা অসম্ভব। অতএব বাধ্য হয়ে সেখানেই বসে পড়ল।

অন্তত সতেরো হাজার ফুট উঁচুতে ওরা এখন। তাপল্যাঙে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা অনেকটা সহ্যের মধ্যে এসে গেছে। কলকাতায় বসে এই পরিবেশে থাকার কথা কল্পনাতেই আসত না। জয়িতার হঠাৎ মনে পড়ল সে অনেককাল নিজের মুখ দ্যাখেনি। আয়নার কথা মনেই ছিল না তার। কতকাল স্নান করা হয়নি এবং সেটা হয়নি বলে অসুবিধে যে খুব হচ্ছে তাও নয়। অথচ কলকাতায় স্নান না করে একটা দিন কাটানোর কথা সে কল্পনা করতে পারত না।

জয়িতা চোখ তুলল। চ্যামলাঙ, বারুনৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোমোলাঙ এখন চোখের সামনে। দু-একটা পেঁজা মেঘ ছাড়া কোন আড়াল নেই। এত সুন্দর তবু সুন্দর শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুক কাঁপে। একেই কি ভয়ঙ্কর সুন্দর বলে? কে জানে! পৃথিবীর কোথাও কোনও অশান্তি নেই, শুধু স্থির হয়ে থাকা, সময় মুঠোয় নিয়ে বসে থাকা। শুধু অনন্ত নিঃসঙ্গতায় হৃদয় ধুয়ে নেওয়া।

আনন্দর ডাকে চমক ভাঙল। পেছন থেকে আনন্দ বলল, 'কিরে, ধ্যান শুরু করে দিলি? উঠে আয়, চা হয়ে গেছে।' চা শব্দটা শোনামাত্র শরীরে একটা আরাম এল যেন। জয়িতা কৃতজ্ঞ চোখে আনন্দকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে ফিরে গেছে। সে উঠে এল।

গুহার সামনে ভালুকটার অস্তিত্ব নেই। শুধু তার বিশাল চামড়াটা পরিষ্কার করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গুহার মুখেই চাপ চাপ মাংসের স্তূপ ঠিক করছে লা-ছিরিঙ। ওকে দেখে সরল হাসল সে, 'পুরো গ্রামের মানুষ একবেলা এটা খেতে পারবে।'

'তোমরা ভালুকের মাংস খাও?' হতভম্ব হয়ে গেল জয়িতা।

'কেন নয়? ভালুকের মাংস পাওয়া কত কষ্টের তা তো জানো না।'

'খেতে কেমন?'

'চমৎকার। তুমি কখনও খাওনি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল জয়িতা। লা-ছিরিঙ বলল, 'আজ খেয়ে দেখো, মজা লাগবে।'

জয়িতা মনে মনে বলল, রক্ষা কর। তারপর গুহাতে ঢুকতেই মেয়েটা এক পাত্র চা এগিয়ে দিল। জিভে সেটা ঠেকাতে মনে হল এর নাম অমৃত। সে চেঁচিয়ে আনন্দকে বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কয়েকটা বিস্কুট এখনও পড়ে আছে, খাবি?'

'না থাক।'

'থাক কেন? ওটা তো শেষ হবেই।' আনন্দ ওর হাতে বিস্কুট ধরিয়ে দিল। তারপর চাপাগলায় বলল, 'সুদীপ চা খাচ্ছে, যদিও এখনও নর্মাল হয়নি। ওকে বুঝতে দিস না যে আমরা চিন্তিত।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপ এখন গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার চোখ খোলা কিন্তু কোনদিকেই দৃষ্টি নেই। চায়ের পাত্র পাশে রয়েছে। সেখানেই ওর হাত। মেয়েটি গুহার এক কোণে মাংসগুলো রাখছিল। জয়িতা চট করে আনন্দর দিকে তাকাল, 'ভালুকের মাংস কে খাবে?'

আনন্দ বলল, 'বেশির ভাগটাই গ্রামের মানুষের কাছে দফায় দফায় নিয়ে যাবে লা-ছিরিঙ। কিছুটা আমাদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

'ইস্! তুই ওই মাংস খাবি?'

'খেতে খারাপ লাগলে খাব না। আগে থেকে নাক সিঁটকোবার কি আছে! আমরা অনেকদিন মাংস খাইনি। মুখের স্বাদ পালটাবার জন্যে একটা চেষ্টা করা দরকাব, বুঝলি!' আনন্দ চা শেষ করল।

'অসম্ভব! আমার দ্বারা হবে না। আমি ওই মাংস খেতে পারব না।' জয়িতা তীব্র প্রতিবাদ করল। ওর গলার স্বর এতটা জোরে উঠেছিল যে আনন্দ লক্ষ্য করল সুদীপের মুখ এপাশে ফিরল। যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

চা শেষ করে লা-ছিরিঙ স্তূপ করে রাখা মাংসের কয়েকটা থেকে দুটো ঘাড়ে তুলে নিল। লাঠির দুটো প্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া বাঁকের মত দেখাচ্ছিল। সে জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি কোন খবব থাকে তাহলে আজই ফিরে আসব নইলে আগামীকাল। তোমরা কেউ নিচে নেমো না।'

আনন্দ বলল, 'পালদেমকে বলবে জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা যেন আজ বন্ধ না হয়। ঘব তৈরির কাজ যেমন চলছিল তেমন চলবে।'

ওর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আনন্দর মনে হল ওই ওজন কাঁধে নিয়ে তাব পক্ষে তিন পা হাঁটা অসম্ভব ছিল। এখনও যে মাংস পড়ে আছে তা নিয়ে যেতে ওকে দুবার নিচে নামতে হবে। মেয়েটা এখন বরফ দু'হাতে তুলে সেই পড়ে থাকা মাংস চাপা দিচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় পচনের কোন আশঙ্কাই নেই। হয়তো জন্তুদের চোখ যাতে ওগুলোর ওপরে না পড়ে তার জন্যেই বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে।

কিছু কাঠ দরকার। রাত্রে নিশ্চয়ই এখানে ঠাণ্ডা বাড়বে। তাছাড়া স্টোভের শেষ তলানিটুকু আর নষ্ট করা উচিত হবে না। রান্না এবং উত্তাপ দুটোই কাঠে করতে হবে। জলের প্রশ্ন নেই। বরফ গলিয়ে সেটা পেতে হবে। বড় একটা দা সঙ্গে নিয়ে আনন্দ হাঁটতে লাগল। বরফ ভেদ করে যে গাছ এখানে ছড়িয়ে আছে সেগুলো বেশ ভেজা এবং পাতাও নেই বললেই চলে। জায়গাটা এমন যে লুকোবার কোন উপায় নেই। অবশ্য বিপদ আসতে পারে একমাত্র নিচে থেকে। আর সেটা এলে নিশ্চয়ই গ্রামের মানুষ আগেভাগে জানাবে। মাথার ওপর যদি হেলিকপ্টার আসে তাহলে গুহার ভেতরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। একটু নিচের দিকে এসে আনন্দ একটা ঝাঁকড়া গোছের গাছ দেখতে পেল। এর শরীরে এখনও পাতা আছে তবে বরফে মাখামাখি হয়ে আছে গাছটা। আনন্দ ডাল কাটতে শুরু করল। গাছটা খুব বেশি লম্বা নয়। তাছাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে বলেই অনেকটা নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। নির্জন পাহাড়ে গাছ কাটার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ কয়েকটা ডাল কাটার পরেও আনন্দর মনে হচ্ছিল এটা দুদিনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আজ আবহাওয়া পরিষ্কার আছে এখনও, কিন্তু কতক্ষণ থাকবে তা ঈশ্বর জানেন। অন্তত দু'দিনের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে পড়ছিল কিন্তু তার জেদ কমছিল না। যখন তার মনে হল অনেক হয়েছে তখনই ভাবনা শুরু হল। এত কে ওপরে বয়ে নিয়ে যাবে! গাছ কাটতে কাটতেই অনেকটা শক্তি খরচ হয়ে গেছে। সে জিরোতে সময় নিল। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। জঙ্গল দেওয়ালের কাজ করছে।

এই সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আনন্দ। আর দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল। মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে পাঠাল তোমাকে?'

মেয়েটি হাসল, 'শব্দ শুনে চলে এলাম। কিন্তু এই শব্দ তো গ্রাম থেকেও শোনা যাবে!'

কথাটা মাথায় আসেনি আনন্দর। সে অবিশ্বাসে তাকাল নিচের দিকে। গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে। অবশ্য শব্দের গতির কথা সে জানে তবে—।

মেয়েটি বলল, 'ওটা আমাকে দাও, কিভাবে কাটতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

খানিকটা কাত করে দা চালাল মেয়েটি। শব্দটা মৃদু হয়ে গেল কিন্তু কাজ হচ্ছিল বেশি। আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আর কাটার দরকার নেই। এখন এগুলো নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর হবে।'

মেয়েটি বলল, 'ডালগুলো টুকরো করে বাঁধতে হবে।'

সেই কাজেই লেগে গেল সে। হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এত কষ্ট করছ কেন?'

মেয়েটি হাত না থামিয়ে জবাব দিল, 'আর কিছু করার নেই বলে।'

চারপাশে রক্তের গন্ধ। অতবড় একটা জন্তু মরে গিয়েও বাতাসে নিজের অস্তিত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে। জয়িতা গুহার ভেতরে ঢুকল। সুদীপ বসে আছে একা। মেয়েটা একটু আগেই বেরিয়ে গেল। জয়িতা সুদীপের সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সিগারেট খাবি?'

সুদীপ তাকাল। তার বুক কেঁপে একটা নিঃশ্বাস বের হল। জয়িতার কষ্টটা ফিরে এল। তার মনে হচ্ছিল সে কিছুতেই আর সুদীপের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি কষ্ট হচ্ছে রে সুদীপ?'

সুদীপ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার পর জড়ানো গলায় কিছু বলতে চাইল। কথাগুলো স্পষ্ট নয়। জয়িতা দেখল কাঁপা পায়ে সুদীপ এগিয়ে যাচ্ছে বাইরে। ওর ইচ্ছে করছিল জড়িয়ে ধরতে। আর ইচ্ছেটা হওয়ামাত্র সে ছুটে গেল সামনে। দু'হাতে সুদীপকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'কথা বল্। টেল মি এনিথিং, এনি ড্যাম ওয়ার্ড!'

সুদীপ হাঁপাচ্ছিল। ওর শীতে ফাটা মুখ করুণ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ জয়িতা স্থির হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সুদীপের গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সু-দী-প!'

সুদীপ বলল, 'ঠিক – ঠিক আ-ছি!'

জয়িতা দুটো হাত সরিয়ে নিয়ে দেখল সুদীপের ঠোঁটে হাসি এল কি এল না। মুক্ত হয়ে সে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর বরফের ওপর দুটো পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। জয়িতা চুপচাপ গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুদীপকে দেখতে লাগল। ওর সমস্ত চেতনায় একটা সুখ ছড়িয়ে পড়ছিল, সুদীপ কথা বলেছে, যেভাবেই হোক বলেছে।

আর তখনই সে চমকে উঠল। দুটো নাদুসনুদুস ভালুকের বাচ্চা গুড়গুড় করে এগিয়ে আসছে সুদীপের কাছে। এরাই মায়ের সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভয় পেলেও সে বুঝতে পারল বাচ্চা দুটো এত শিশু যে ওদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। বরং ওদের ভাবভঙ্গি এবং হাঁটা দেখে মজা লাগছিল তার। বাচ্চা দুটো খানিকটা দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। তারা সুদীপকে লক্ষ্য করছিল। কুঁই কুঁই শব্দ করে নিজেরা সম্ভবত সুদীপ সম্পর্কে কিছু বলাবলি করে নিল। তারপর দ্বিধাভরে এগিয়ে গেল সুদীপের পাশে। সুদীপের গায়ের কাছে এসে ওরা স্থির হতে জয়িতা সবিস্ময়ে দেখল পরম আদরের দুটো হাত ওদের গায়ে স্পর্শ রাখল। আর বাচ্চা দুটো যেন আশ্রয় পেয়ে সুদীপের শরীরে মুখ গুঁজল।

দুপুর না গড়াতেই এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। চাপ কুয়াশা, মেঘ আর কনকনে ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু জয়িতার মনে হল গুহার ভেতর যে আরাম তা তাদের আস্তানায় ছিল না। এখানে অন্তত চোরা হাওয়ার কামড় নেই। তাঁবুটা পায়ের তলায় বিছিয়ে রাখা সত্ত্বেও স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা উঠছেই। কিন্তু আগুন জ্বলার পর চমৎকার ওম ছড়িয়েছে গুহাতে। ভালুকটার নির্বাচন সঠিক ছিল। ওকে উৎখাত না করলে এই গুহার দখল পাওয়া যেত না। পৃথিবীর নিয়মই এই রকম।

জয়িতা মেয়েটিকে দেখছিল। লা-ছিরিঙ কিংবা পালদেম ওর সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়। অথচ রোলেন বলেছিল ও নাকি বাচ্চা তৈরি করবার পক্ষে উপযুক্ত। এখনও এই মানুষেরা মেয়েদের একটি বিশেষ প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করে। পালদেমরা কেন সেই সম্মান একে দিচ্ছে না সেটা অবোধ্য। তার মনে পড়ল লা-ছিরিঙ অত্যন্ত বাধ্য না হলে ওর সঙ্গে কথা বলেনি। এখন মেয়েটি পাথরের উনুনে মাংস সেদ্ধ করছে। ভালুকের মাংস। মাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে সুদীপের দিকে। সুদীপ তার বিছানায় পা ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে। এবং তার শরীরে মুখ ডোবানো ভালুকের বাচ্চা দুটোর দেহ তিরতিরিয়ে কাঁপছে। আনন্দ চোখ বন্ধ করে শুয়ে। এই গুহায় কেউ কোন কথা বলছে না এখন। জয়িতা উঠল। সে উঠতেই আনন্দ চোখ মেলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মাংসের গন্ধটা অসহ্য মনে হচ্ছে।'

'অনভ্যাস।' আনন্দ এমন গলায় কথা বলল যেন ওই মাংস সে দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছে।

আড়াল সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জয়িতা। এবং চোখের সামনে বরফ পড়া দেখল। কুয়াশাগুলো উধাও। ঝুরঝুর বরফ মাটিতে জমা হচ্ছে। বস্তুত মাটি বলে কিছুই আর চোখে পড়ছে না। ঠাণ্ডাটা যেন সামান্য কমেছে। তার খুব মজা লাগছিল। মাথার ওপর পাথরের আড়াল। সেটা ছেড়ে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। সাহসও হচ্ছিল না।

লা-ছিরিঙ আজ ফেরেনি। তাপল্যাঁঙে পুলিশবাহিনী পৌঁছেছে কিনা কে জানে! কিন্তু এটা তাদের জানা উচিত ছিল। যারা তাপল্যাঙ পর্যন্ত আসবে তারা জানবেই ওখানে তারা ছিল। শোনার পর হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। আর যদি সত্যি সত্যি হদিশ পেয়ে যায় তাহলে তাদের পালাবার পথ থাকবে না। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল ওর। রাত হয়ে গেলে এখান থেকে বের হওয়া আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার হবে। জয়িতা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যদি লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে পৌঁছানো যায় তাহলে রাত্রের আগে এখানে ফেরা যাবে না। এবং এই সময় সে একটি তীব্র শিস শুনল।

চমকে চারপাশে তাকাল। তুষারপাতের জন্যেই বেশিদূর দৃষ্টি যাচ্ছে না। কিন্তু ওই শিস যেদিক থেকে ভেসে এল সেইদিকটা লক্ষ্য করল সে। তার আগেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল। কুকুরটাকে সঙ্কেত করাব জন্যেই সম্ভবত শিস বেজেছিল। কুকুরের ডাকটা এখন স্পষ্ট, খুবই কাছাকাছি। পুলিশ কি শিকারী কুকুব নিয়ে উঠে আসছে? এই সময় তার পেছনে শব্দ হতেই সে আনন্দকে দেখতে পেল। চিন্তিত মুখে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল 'কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম, না?'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি না. এখানে কুকুর আসবে কোত্থেকে? পুলিশ নয়তো?'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র আনন্দ ভেতরে চলে গেল তার পরেই ফিরে এল রিভলভার নিয়ে। চাপা গলায় বলল. 'শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কবব। আমরা অনেক বেটার জায়গায় আছি।'

ওরা প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। যতটুকু দেখা যাচ্ছে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। যেই আসুক তাকে প্রথমে ওই খোলা জায়গায় পা রাখতে হবে।

কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন-তাব স্বর বদলে গেল। এখন ওই ডাকে উত্তেজনা। এবং তার পরেই ওরা উত্তেজিত কুকুরটাকে দেখতে পেল। ওপর থেকে নেমে এল খোলা জায়গাটায়, ওর

মুখ গুহার দিকে ফেরানো, অনর্গল ডেকে চলল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। জয়িতা রিভলভারে হাত রেখেছিল। কুকুরটার দাঁত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয়বার শিসটা শুনতে পেল। শিস শোনার পর আবার ওপরে ছুটে গেল কুকুরটা। আনন্দ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওপর থেকে নামছে কি করে? পুলিশ এলে তো নিচ থেকে আসার কথা।'

এবং তখনই প্রথমে কুকুর তার পর ওর মালিককে দেখতে পেল ওরা। ছেঁড়া গরমজামায় যতটা সম্ভব শরীর ঢেকে লোকটা ধীরে ধীরে খোলা জায়গায় এসে ক্লান্ত ভঙ্গিতে গুহার দিকে তাকাল। কুকুরের গলা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে। লোকটা টলছিল। এবার মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল। ও আর একটু এগোলেই জয়িতাদের দেখতে পাবে। ওর হাতে একটা লাঠি আর ছোটপাত্র। পাত্রটিকে সে অত্যন্ত যত্নে আঁকড়ে আছে। সে আবার শিস দিতে কুকুরটা সোৎসাহে তেড়ে এল গুহার দিকে। একদম মুখোমুখি হয়ে ও জয়িতাদের দেখতে পেল। পেয়েই ছুটে গেল মালিকের কাছে। তার আচরণে আচমকা পরিবর্তন এসে গেছে যেন বুঝতে পারল লোকটা। সে লাঠিতে ভর করে কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটা। আনন্দর মনে হল লোকটা অসুস্থ। যে কোন মুহূর্তেই বরফের ওপর গড়িয়ে পড়তে পারে। সে পা বাড়াল। কুকুরটার চিৎকার বেড়ে গেল তাই দেখে। মুখোমুখি হয়ে আনন্দ বলল, 'প্রথমে ওটাকে চুপ করতে বল। এখানে কুকুর ডাকুক আমরা চাই না।'

লোকটা অন্য ধরনের শব্দ করল জিভে। সেটা শুনে কুকুরটা যন্ত্রের মত থেমে গেল। এবার আনন্দ লোকটার দিকে স্পষ্ট তাকাল। সমস্ত শরীরে সাদা তুষার লেপটে রয়েছে। ঠোঁট নাক এখন একদম সাদা। এই অবস্থায় ও কি করে হেঁটে আসছে?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?'

লোকটা হাত নেড়ে নিচের দিকটা দেখাল। ও নাড়ল লাঠি ধরা হাতটা। পাত্রটিকে সে ওই অবস্থায় সামান্য নাড়াচ্ছিল না। আনন্দ বুঝল এ তাপল্যাঙের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ওর যা অবস্থা এখন যদি হাঁটা শুরু করে তাহলে তাপল্যাঙে পৌঁছাতে পারবে না। শেষ শক্তিটুকুও এখন ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে। 'তুমি যদি আগুনের পাশে বসতে চাও তাহলে গুহায় আসতে পার।' হাত বাড়িয়ে দেখাল আনন্দ।

লোকটার ঠোঁট কাঁপল। চোখ বড় হল। তারপর কোন রকমে উচ্চারণ করল, 'ভালু!'

শব্দটা বুঝল আনন্দ, 'ভালু নেই। আমরা মেরে ফেলেছি।'

ওইটুকু পথ আসতে লোকটার অনেক সময় লাগল। গুহার মধ্যে ঢুকে আগুন দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হল। নিজের শরীর আগুনের পাশে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেও কিন্তু সে হাতের পাত্রটি সম্পর্কে সচেতন ছিল। কুকুরটা মালিকের সঙ্গে গুহায় ঢুকেই গলা খুলে চিৎকার শুরু করল। জয়িতা দেখল সুদীপের শরীরের মধ্যে ভালুকবাচ্চা দুটো মিশে যেতে চাইছে কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে। কুকুরটার লক্ষ্য ওরাই। এক একবার তেড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে সে মালিকের কাছে। আনন্দ লোকটাকে বলল, 'ওকে সামলাও।'

লোকটা আবার শব্দ করল। কুকুরটা এবার আগুনের কাছে ফিরে এসে জিভ বের করে লোভী চোখে বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটাকে দেখামাত্র মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে বিস্ময়। সেটা লক্ষ্য করে জয়িতা ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের গ্রামের মানুষ?'

ঘাল নাড়ল মেয়েটা, 'না। ব্লোলেনদের গ্রামে থাকে। ও বেঁচে আছে?'

'কেন, ওর কি হয়েছিল?' এবারের প্রশ্নটা আনন্দের।

'ওর পায়ের দিকে তাকাও, দ্যাখো ওর পায়ের অবস্থা।' মেয়েটা যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায়। জয়িতা চমকে উঠল। এই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে কিন্তু লোকটার পায়ে কোন জুতো নেই। আঙুলগুলো বেঁকে বেঁকে ফুলে দুটো পা এখন গোল হয়ে গিয়েছে। অনেকটা হাতির পায়ের আকার নিয়েছে ওদুটো। মাঝে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পায়ের এই অবস্থা কি করে হল?'

লোকটা তখন সমস্ত শরীরে উত্তাপ নিচ্ছে। যেন মরুভূমির মাঝখানে পথ হারানো মানুষের সামনে জল ধরে দেওয়া হয়েছে। ওর চোখ বোজা ছিল। আনন্দর প্রশ্ন যেন কানেই ঢুকল না। মেয়েটা এবার

চিৎকার করে নিজস্ব ভাষায় জড়ানো গলায় কিছু বলতেই লোকটা চমকে চোখ মেলল। মেয়েটাকে যেন সে এখানে দেখবে ভাবতে পারেনি। একগাল হেসে সে জড়ানো গলায় উত্তর দিল। মেয়েটি এবার জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও পেরেছে, ও পেরেছে!'

'কি পেরেছে ও?'

মেয়েটি বলল, 'ডান দিকের যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে জল এনে যদি কোন অসুস্থ মানুষের মুখে বুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার অসুখ সেরে যাবেই। ওর মা বাঁচবে না বলে ও সেই জল আনতে বেরিয়েছিল। এর আগে অনেকেই প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্যে ওখানে গিয়েছে জল আনতে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একজন ফিরেছিল, কিন্তু অন্তত দশজনের পর ওকে আমি ফিরতে দেখলাম। ও ভগবানের দেখা পেয়েছে।' কথাগুলো বলার সময় মেয়েটির মুখে একটা উজ্জ্বল আলো খেলা করে যাচ্ছিল।

লোকটা হাসল। তারপর সস্নেহে নিজের পায়ের ওপর হাত বোলাল। বোঝা যাচ্ছে, ওখানে কোন সাড় নেই ওর। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই পাহাড়ের ওপর উঠেছিলে?'

পরম তৃপ্তিতে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর উঁচু করে পাত্রটা দেখাল। আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। এদিকে পাহাড়গুলোর সবচেয়ে নিচু শৃঙ্গ অন্তত সতেরো হাজার ফুট। সেই অবধি কোনরকম আধুনিক হাতিয়ার ছাড়া একটা লোক নগ্ন পায়ে হেঁটে উঠতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারছিল না। বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ওর পা বেঁকে গেছে। এবং এ জীবনে আর সে নিজের পা ফিরে পাবে না। ওর হাতের আঙুলগুলোও স্বাভাবিক নয়, নাকের ডগায় বেশ বড় ঘা। জয়িতা চাপা গলায় বলে উঠল, 'অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। ও চেষ্টা করতে পারে কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না।'

আনন্দ বলল, 'সত্যি অবিশ্বাস্য কিন্তু এরা মিথ্যে কথা বলে না। অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে কি শক্তি দেয় তার গল্প পড়িসনি? খোঁড়া পাহাড় ডিঙোয়!'

'কিন্তু ওই বরফ গলিয়ে মুখে মাখালে কারও অসুখ সারবে? তাহলে তো প্রতি বছর এভারেস্ট ক্লাইম্বাররা ফিরে এসে হাজার হাজার মানুষকে সারিয়ে তুলতে পারত। ওঃ, ধর্ম মানুষকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করে দ্যাখ।' জয়িতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

'যা হোক, এক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই। শুধু বিস্মিত হওয়া ছাড়া।' আনন্দ বলল।

লোকটা ততক্ষণে সেদ্ধ হয়ে আসা মাংসের দিকে নজর দিয়েছে। ইঙ্গিতে সেটা দেখাচ্ছেও। মেয়েটা খানিকটা তুলে একটা ডিসে এগিয়ে ধরতেই কুকুরটাও চিৎকার করে উঠল। ওর দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে লোকটা মাংস গিলতে লাগল প্রাণপণে। মেয়েটা উঠে খানিকটা কাঁচা মাংস কুকুরটার সামনে রাখতে সেও একই ভঙ্গিতে খেতে শুরু করল। একটু অপরাধীর ভঙ্গিতে মেয়েটি বলল, 'আমি না হয় আজ মাংস খাব না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'যারা ওপরের পাহাড় থেকে জল নিয়ে ফিরে আসে কাহুন পর্যন্ত তাকে সম্মান দেখায়। আমি আমার ভাগটা ওকে দিয়ে দিলাম।' মেয়েটি জানাল।

'থাক, তোমাকে আর স্যাক্রিফাইস করতে হবে না।' জয়িতা মন্তব্য করল।

বোধ হয় অভুক্ত ছিল লোকটা। কারণ দ্বিতীয়বার নেওয়ার পরও যেন তার চাহিদা কমছিল না।

কিন্তু সে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝুঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর পাত্রটি সযত্নে বুকের কাছে নিয়ে এসে কুকুরটাকে শিস দিয়ে ডাকল।

আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

লোকটা হাত বাড়িয়ে নিচের দিকটা দেখাল। ওর মুখ এখন প্রায় স্বাভাবিক, শুধু নাকের কাটা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আনন্দ চমকে উঠল, 'এখন তো বাইরে অন্ধকার, তুমি গ্রামে পৌঁছাবার আগেই মরে যেতে পার।'

লোকটা চটপট মাথা নাড়ল। তারপর পাত্রটা দেখিয়ে বলল, 'ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।' ওর গলার স্বর জড়ানো কিন্তু শব্দগুলো বুঝতে পারল ওরা।

আনন্দ এবার মেয়েটিকে বলল, 'ওকে পাগলামি করতে নিষেধ কর। এতক্ষণ যা করেছে করেছে,

এই রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যেন ও গ্রামে ফিরে যায়।'

মেয়েটি খানিক ইতস্তত করে লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই লোকটি মাথা নাড়ল, 'আমার মা মরে গেছে কিনা জানি না। কিন্তু মনে হয় এই জল যখন আনতে পেরেছি তখন ভগবান নিশ্চয়ই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা রাত দেরি করলে ভগবান ওকে নিয়ে নিতে পারে। আমি যাচ্ছি।'

হঠাৎ মেয়েটা তাকে ডাকল। লোকটা মুখ ফেরাতে গলায় অনেক আকুতি নিয়ে বলল, 'আমাকে একটু জল দেবে? এই একটুখানি!'

লোকটি সজোরে মাথা নাড়ল, 'না। এই জল কেউ চাইতে পারে না।'

'আমি জানি, তবু তুমি দয়া কর। ওখান থেকে একটুখানি দিলে তোমার মায়ের জন্যে কম পড়বে না।'

মেয়েটি প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলছিল এবার।

হঠাৎ লোকটির খেয়াল হল যেন, 'তুমি এখানে কেন? এরা কারা?'

'এরা আমাদের বন্ধু। এদের খুব শক্তি। বিরাট ভালুক মেরেছে যার মাংস তুমি খেলে। ওই যে, তাকিয়ে দ্যাখো, ওর জন্যে একটু জল দাও। নাহলে ও কখনও ভাল হবে না।' মেয়েটি হাত উঁচু করল।

লোকটা সুদীপের দিকে তাকাল। কিন্তু তার সামান্যও দয়া হল না। সে আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উধাও। মেয়েটা তখন দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল। জয়িতা তাকে ধমক দিল, 'সুদীপের জন্যে জল চাইবার কি দরকার ছিল?'

'নইলে ও বাঁচবে না, ভাল হবে না। কেউ কি কখনও শুনেছে ভালুকবাচ্চা মানুষের শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে! ওর মধ্যে দানোটা বোবা হয়ে ঢুকে পড়েছে। ভগবানের দয়া ছাড়া সেটা বের হবে না।'

মেয়েটা হতাশ গলায় কথাগুলো বলল।

আনন্দ জয়িতাকে ইশারা করল চুপ করতে। তারপর বাংলায় বলল, 'ওর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি আমাদের কোন ক্ষতি না করে তাহলে এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু লক্ষ্য কর, ও সুদীপ সম্পর্কে সত্যি ইন্টারেস্টেড। শুনেছি ভালবাসাবাসি না হলে মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে এতখানি সচেতন হয় না।'

জয়িতা সুদীপ, মেয়েটি এবং সবশেষে আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে তুইও ন্যাকাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াস কি করে তা বুঝি না।'

লা-ছিরিঙ মাংস নিয়ে আসার পর গ্রামের মানুষ বেশ খুশি। ভালুকের মাংস অনেকদিন তারা খায়নি। তার পরেই প্রশ্ন উঠল ভালুকটা কত বড় ছিল? আরও মাংস পাহাড়ে আছে জানার পর সেটা আনবার জন্যে একটা দল তৈরি হয়ে গেল। লা-ছিরিঙ প্রথমে রাজী হয়েছিল, তার পর তার মনে পড়ল এরা গেলে গুহার মানুষদের অস্তিত্ব জেনে যাবে। সে অনেক বুঝিয়ে ওদের আটকাতে পারল। গুহার সামনেই মাংস আছে এই সংবাদটা জানাল না। লোভ মানুষকে সব সময় বিপথগামী করে। সে আড়ালে ডেকে নিয়ে পালদেমকে সব বৃত্তান্ত জানাল। অত বড় একটা ভালুককে যারা মেরে ফেলতে পারে অনায়াসে তারা কেন পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। তবে একথা ঠিক, ওরা এই গ্রামের উপকার করতে চায়। যতদিন ওরা সেটা করবে ততদিন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার কোন কারণ নেই। পালদেম লা-ছিরিঙকে উপদেশ দিয়েছিল সেদিনই পাহাড়ে ফিরে না যেতে। কারণ উৎসাহী গ্রামবাসী তাকে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ওই চারজনের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে পারছিল না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে লা-ছিরিঙকে নিয়ে কাহুনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কাহুন তখন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। পালদেম এবং লা-ছিরিঙ তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসল। কাহুন চোখ নামালেন। পালদেম বলল, 'আমরা বিদেশীদের সাহায্য করছি। কিন্তু কতখানি সাহায্য করা উচিত?'

কাহুন বললেন, 'যতক্ষণ ওরা আমাদের শত্রুতা না করছে। দু-দুবার আমদের দেবতা ওদের সাহায্যে ফিরে এসেছেন। আমরা এই ঋণ নিশ্চয়ই শোধ করব।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু ওদের কাজকর্ম অনেকের পছন্দ হচ্ছে না। বরফের সময় যাতে সবাই ভাল থাকে তার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আমরা এভাবে কখনও ভাবিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের কথা শুনলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

'কোন ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কথা শুনব।' কাহুন কথাগুলো বলে মুখ ফেরালেন, 'এই অসময়ে মনে হচ্ছে আরও কিছু বিদেশী আসছে। বিদেশী মানেই যে সন্দেহজনক মানুষ এই ধারণা অবশ্য এখন আমাদের ঠিক ততটা নেই। তোমরা যাও, ওদের অভ্যর্থনা কর।'

ওরা দুজনেই সোজা উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল। যে পথে ব্যাপারীরা আসে সেই পথেই ঘোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্তত গোটা দশেক ঘোড়া। কোন পদাতিক নেই। ওদের চলার গতি আছে। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই ওদের দেখতে পেয়েছে। বিন্দুর চেয়ে সামান্য বড় এখন। কিন্তু তাতেই গ্রামে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। অনেকেই ভাবল ব্যাপারীরা এবার দলে ভারী হয়ে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু পালদেম চাপা গলায় বলে উঠল, 'পুলিশ! ওরা বোধহয় পুলিশ!'

লা-ছিরিঙ দেখার চেষ্টা করছিল, 'আমরা কি করব এখন?'

কাহুন বললেন, 'যতক্ষণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছি ততক্ষণ আমরা ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব।'

এখন ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দলে দুজন বিদেশী, তারাই আগে আগে আসছে। পেছনের মানুষেরা যে পাহাড়ের তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। গ্রামের মুখে পৌঁছে ওরা সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে গতি রোধ করল। গ্রামবাসীরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে আগন্তুকরা ব্যাপারী নয়। কি করা উচিত ওরা যেন বুঝতে পারছিল না। মন্দিরের চত্বর অনেকটা উঁচুতে বলে পালদেমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওদের। অশ্বারোহীদের একজন চিৎকার করে বলল, 'এই গ্রামের পালা কোথায়?'

গ্রামবাসীরা ঠেলাঠেলি করে বৃদ্ধকে এগিয়ে দিল সামনে। পাহাড়ের একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই গ্রামের পালা? তুমি বল, এই গ্রামে কোন বিদেশী আছে কিনা!'

পালা জড়ানো গলায় কিছু বলতে তাকে ধমকে উঠল লোকটা, 'ভাল করে কথা বল।'

পালা এবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। প্রত্যেকের শরীরে একই রকমের পোশাক। প্রতিটি ঘোড়ার শরীরে অস্ত্র বাঁধা। বিদেশী জিজ্ঞাসা করল, 'তারা কোথায়?'

পালা হাত বাড়িয়ে একটা দিক নির্দেশ করতে লোকটা বলল, 'তুমি আমাদের পথ দেখাও।'

পালার পক্ষে দ্রুত হাঁটা এখন অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছিল এই লোকগুলো সুবিধের নয়। এই সময় পাহাড়ী অশ্বারোহী চিৎকার করে বলল, 'আমরা পুলিশ। তোমাদের এখানে তিনজন ডাকাত লুকিয়ে আছে। এরা খুব খারাপ লোক। অনেক মানুষ খুন করে এখানে এসেছে তোমাদের খুন করবে বলে। এদেব কাছে অস্ত্র আছে। এদের ধরিয়ে দিলে তোমরা নিজেদের উপকার করবে।' কথাগুলো বলে লোকটা প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাকাল।

গ্রামবাসীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেউ নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল না। পালা যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন অশ্বারোহীরা এগোতে লাগল। আর তখনই একজন গ্রামবাসী চাপা গলায় বলে উঠল, 'মানুষ যারা খুন করে তাদের চেহারা ওরকম হয় না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ওরা খামোকা মিথ্যে বলবে কেন? এখানে আসতেও তো কষ্ট হয়েছে?'

এখন অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে ওরা এগোচ্ছে। তাই দেখে লা-ছিরিঙের হাসি পেয়ে গেল। ওরা যদি জানতে পারে যাদের খোঁজে এসেছে তারা এখন গুহায় আছে এবং সেখানে পৌঁছাতে হলে পায়ে হেঁটে উঠতে হয় তাহলে কি করবে?

আস্তানাটা ঘিরে ফেলল ওরা। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল ওর ভেতরে কেউ নেই। বিদেশী অফিসার পালার কাঁধ চেপে ধরল। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল লোকটাকে, 'মিথ্যে কথা বললি কেন? কোথায় ওরা?'

পালা থর থর করে কাঁপছিল, 'আমি জানি না। আমি জানি না।'

'তুই এই গ্রামের মোড়ল আর তুই জানিস না? সত্যি কথা বল্ নইলে মেরেই ফেলব।'

পালার কাঁধে সম্ভবত যন্ত্রণা হচ্ছিল, 'আমি জানি না।' বলতে বলতে সে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে সজোরে আঘাত করল লোকটা। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল পালা। লা-ছিরিঙের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই তার হাত মুঠোয় নিল পালদেম, 'চুপ করে থাক। মাথা গরম করিস না।'

এই সময় ভেতর থেকে দুজন বেরিয়ে এল, 'ওরা এখানে ছিল স্যার। এখানে অনেক জিনিস পড়ে আছে যা এই এলাকার মানুষ ব্যবহার করে না। এই খালি ব্র্যান্ডির বোতলটা দেখুন আর সিগারেটের প্যাকেট, ইনট্যাক্ট।'

অফিসার পড়ে থাকা পালার শরীরটার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে ভীত গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিলেন। পালদেম আশঙ্কিত হয়ে দেখল লোকটা তার ভেনা। অফিসার ভেনাকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কবে এখান থেকে গিয়েছে?'

ভেনার গলার স্বর কাঁপল, 'বোধ হয় আজই। কারণ কাল রাত্রেও ওরা এখানে ছিল।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।'

'শোন, আমি সত্যি কথা জানতে চাই। তোমাদের মুখ দেখতে এতটা পথ আমি কষ্ট করে আসিনি। যে করেই হোক ওই তিনটে লোককে আমরা চাই।'

ভেনা তো বটেই, গ্রামবাসীরাও কোন উত্তর দিল না। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা এখানে কি করত? তোমাদের সঙ্গে কথা বলত?'

ভেনা অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'না।'

অফিসার তার মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল, 'তাহলে অত টাকা কে দিল? তোমরা দুটো গল্প চালু করেছ। অভিযাত্রীরা তোমাদের দিয়ে গিয়েছে আর এখানে একটা মরে যাওয়া ডাকাতের কাছে তোমরা টাকা পেয়েছ। এবার সত্যি কথা বল।'

ভেনা এক পা সরে গেল, 'আমি জানি না। যা কিছু ব্যাপার সব পালদেম জানে।'

'পালদেম! পালদেম কে? ডাকো তাকে।'

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পালদেম নিজের নামটা মুখে মুখে সজোরে উচ্চারিত হতে শুনল। সে খানিকটা অসহায়ের মত নিচের দিকে তাকাল। তারপর লা-ছিরিঙকে বলল, 'আমার যদি কিছু হয় তাহলে ওদের খবর দিস। তুই কখনও সামনে যাস না। আমি যাচ্ছি।'

পালদেমকে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে পালদেম মাথা দোলাল।

'ওরা কোথায়?' দাঁতে দাঁত ঘষলেন অফিসার।

'জানি না। সকালে উঠে দেখেছি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'কেন?'

'ওদের একজন মরে গেছে জানতে পেরে কাল থেকে নিজেরা পরামর্শ করছিল।'

'কি করে জানল? এখান থেকে অনেক দূরে ঘটনাটা ঘটেছে।'

'আমি সেটা বলতে পারব না।'

'কত টাকা ও দিয়েছে তোমাকে?'

'অনেক। তাই দিয়ে আমরা ব্যাপারীদের কাছ থেকে শীতের জন্য জিনিসপত্র কিনেছি।'

'কোথায় যেতে পারে ওরা?'

পালদেম চারপাশে তাকাল। তার পর কল্যাণ যে পথে গিয়েছিল সেই পথটা দেখাল, 'ওই দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে ফালুটে যাওয়ার।'

অফিসার নির্দেশ দিতেই ছয়জন অশ্বারোহী সমস্ত গ্রামটার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। একটু বাদেই চিৎকার চেঁচামেচি উঠল। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পালদেম আর ভেনাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা লণ্ডভণ্ড করে তল্লাশ শেষ করে অশ্বারোহীরা ফিরে এসে বলল, 'ওরা এখন গ্রামের মধ্যেই নেই। কিন্তু এখানে বেশ জমিয়ে বসেছিল ওরা। কয়েকটা এমন ধরনের বড় ঘর বানানো হয়েছে যা এই পাহাড়ের কোন গ্রামে নেই।'

বিরক্ত অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘর কেন?' প্রশ্নটা পালদেমের উদ্দেশ্যে।

'যাতে বরফের সময় এখানে বুড়োদের কষ্ট না হয়।' ভেনা উত্তরটা দিল।

অফিসার পালদেমের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি জানো ওরা কোথায় আছে।'

'আমি জানি না।'

বলামাত্র রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওর মুখে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ চেপে ধরল পালদেম। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল এখন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাতে গড়িয়ে পড়ছিল। অফিসার তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'ওকে সঙ্গে নিয়ে চল। তাই দেখে যদি গ্রামের লোক হদিশ না বলে দেয় তাহলে ওকে আর বেঁচে এখানে ফিরতে হবে না।' একজন পাহাড়ি অশ্বারোহী পালদেমের কোমরে দড়ি বেঁধে দিল। পালদেম অসহায়ের মত ওপরে চারপাশে তাকাচ্ছে। দূরে দাড়ানো ভীত গ্রামবাসী, পাশে মুখ নিচু করে থাকা তার ভেনা এবং ওপরে দাঁড়ানো কান্থনকে সে চুপচাপ দেখল।

অফিসারের নির্দেশে একজন অশ্বারোহী চিৎকার করে জানাল, 'তোমরা যদি না জানাও ওরা কোথায় আছে তাহলে এই লোকটাকে আমরা মেরে ফেলব।'

কোন সাড়া এল না। অফিসার আবার নির্দেশ দিতেই লোকটি জানতে চাইল, 'এর বউ কোথায়?'

এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে পালদেমের বউ বেরিয়ে এল।

লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বামী মরে যাবে তুমি চাও?'

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'কেন তোমরা ওর ওপর অত্যাচার করছ?'

'কারণ তোমরা বলছ না যাদের আমরা চাই তারা কোথায়?'

পালদেমের বউ বলল, 'আমি জানি না। আর জানলেও বলতাম না।'

অফিসার এবার হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'তোমার স্বামীর জীবন বাঁচাবে না?'

'যারা আমার ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাদের সঙ্গে বেইমানি করব না।'

পালদেমের বউ-এর কথা শেষ হওয়ামাত্র গ্রামবাসীদের মুখে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। অফিসার চমকে তাকালেন। এই প্রথম গ্রামের মানুষেরা অসন্তোষ জানাচ্ছে। অবশ্য তিনি ভীত হলেন না। এতগুলো মানুষকে খালিহাতে কবজা করার মত অস্ত্র তার সঙ্গে আছে। কিন্তু এই গ্রামের কাছাকাছি উগ্রপন্থীরা আছে জানা সত্ত্বেও তিনি খালিহাতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলেন না।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার পর অফিসার ঠিক করলেন পালদেমকে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে না।

আবার এই বিচ্ছিরি গ্রামে রাত কাটানো ওদের পছন্দ হচ্ছিল না। পালদেমকে নিয়ে গেলে আজ না হোক কাল এরা খবর পৌঁছে দেবেই।

অশ্বারোহীরা ফিরে যাচ্ছিল। পেছনে কোমরে দড়ি বাঁধা পালদেম টলতে টলতে উঠছিল। আর তার পেছনে গ্রামবাসীরা। তাদের গলায় কান্না। গ্রামের সীমা ছাড়ানোর পরই মেঘগুলো নেমে আসতে লাগল দ্রুত। মুহূর্তে সমস্ত চরাচর অন্ধকার হয়ে গেল। অশ্বারোহীরা তাদের গতি বাড়াবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে এল তাদের সামনে। ঘোড়াগুলো চিৎকার শুরু করল। পাথরটা আঘাত করল ডানদিকের একটা ঘোড়ার শরীরে। আহত হয়ে মুখথুবড়ে পড়ল সেটা। মেঘ এবং অন্ধকারে অশ্বারোহীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অফিসার কয়েকবার ফাঁকায় গুলি চালালেন। এবার একটার পর একটা পাথর পড়তে লাগল। আরও দুটো ঘোড়া আহত হল তাতে। পালদেম দড়িবাঁধা অবস্থায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পাথর গড়াবার পর থেকে নিচের গ্রামবাসীরা আর উঠছে না। আহত ঘোড়াদের আরোহীরা তখন নিচে দাঁড়িয়ে। তাদের একজন ছুটে গেল সামনে। তার পরেই ফিরে এসে চিৎকার করল, 'স্যার, ওকে ছেড়ে দিন। নইলে আমরা এখান থেকে বের হতে পারব না।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কারা?'

লোকটি জবাব দিল, 'দেখতে পাচ্ছি না। তবে সমস্ত পাহাড় জুড়ে পাথর আছে, ঠেলে দিলেই হল। একজনের পোশাক দেখতে পেয়েছি। সে উগ্রপন্থী নয়।'

অফিসার দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তাঁর হুকুমে পালদেমের কোমর থেকে দড়ি খুলে দেওয়া হল।

অফিসার চিৎকার করলেন, 'ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া যাবে?'

একজন উত্তর দিল, 'চেষ্টা করতে পারি স্যার।'

'তাহলে এই ঘটনাটার কথা ভুলে যাও। সবাই জানবে আমরা উগ্রপন্থীদের হদিস পাইনি। ওদের বল আমরা বন্দী নিয়ে যাচ্ছি না।'

কথাটা জানানো হতেই পাথর গড়ানো বন্ধ হল। আহত ঘোড়াগুলোকে কোনমতে হাঁটিয়ে দলটা যখন অদৃশ্য হল তখন চারধার চুপচাপ। অন্ধকার আরও ঘনাচ্ছে। হতভম্ব পালদেম তখনও দাঁড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপরে একটি শরীর অস্পষ্ট দেখা গেল। তার পর তার গলার চিৎকার ভেসে এল, 'মেয়ে বন্দুকবাজকে বলো আমরা তার ঋণ শোধ করলাম।'

পালদেম কথা বলতে পারছিল না। এবার তার পেছনে লা ছিরিঙের গলা শোনা গেল, 'লোকটা কে বুঝতে পারছ?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'হু. বোলেন।'

॥ ৪৫ ॥

সারারাত ঘুমোতে পারেনি জয়িতা। না, শীত কিংবা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ নয়, স্রেফ ভালুকবাচ্চাদের কুঁইকুঁই ডাক কানের পর্দা থেকে অস্বস্তিটা মুছতে দিচ্ছিল না। প্রথম দিকে আনন্দ ওই ডাকটা থামাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ও দুটোর খিদে পেয়েছে এবং তরল কিছু না পেলে ওদের ক্ষুধার্ত থাকতেই হবে। এখন পর্যন্ত চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়নি।

দ্বিতীয়ত, গুহায় আগুন জ্বলছিল, উত্তাপ ছিল। যে যার নিজের নিরাপদ বিছানায় শুয়েও পড়েছিল, শুধু মেয়েটির শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সে প্রথম দিকে আগুনের পাশে বসেছিল। পায়ের তলায় বিছানো তাঁবুর কাপড় এর মধ্যেই স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। মনে মনে ওর জন্যে একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছিল জয়িতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে ঠাণ্ডার সঙ্গে ওদের লড়বার ক্ষমতা আছে। মাঝরাতের পর যখন হাওয়ারা পাহাড় কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, গুম গুম শব্দ হচ্ছে চার ধারে, নিভে আসা আগুনের শরীরেও যেন হিম ঢুকে পড়েছে তখন সে চমকে উঠেছিল। মেয়েটি শুয়ে আছে সুদীপের শরীর ঘেঁষে। নিরাপদ বিছানায় ঢুকে থাকায় সুদীপের শরীরে ঠাণ্ডা কম লাগছে এবং তাকে জড়িয়ে কিছুটা উত্তাপ নেওয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ভালুকের বাচ্চাদুটো সম্ভবত স্থানচ্যুত অথবা খিদের কারণে সুদীপের আশ্রয় ছেড়ে কাঁপা পায়ে ঘুরছে গুহার মধ্যে। নিবন্ত আগুনের কাছে পৌঁছে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকছে।

মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল জয়িতা। কোন সঙ্কোচ অথবা আড় নেই। ক্রমশ ওর দুটো হাত সুদীপকে জড়িয়ে ধরল। যেন এই করলেই সে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে এমন মনে হচ্ছিল। খানিক তাকিয়ে জয়িতা মুখ ফিরিয়ে নিল। সে দ্বিতীয় অস্বস্তির অস্তিত্ব টের পেল। এবার কানে নয়।

অথচ সুদীপের কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে আছে শিশুর মতন। যদিও মেয়েটিকে ঠিক মা বলে মনে হচ্ছে না। সুদীপের মুখ অবশ্য জয়িতা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। নরনারীর আলিঙ্গন মানেই যে অবধারিত যৌনতা এমন ভাবার কারণটা দূর হতে সময় লাগল। দুটো শরীর পরস্পরের উত্তাপ নিয়ে বেঁচে থাকার যে চেষ্টা করছে সেটাকে সে কি বলবে? কিন্তু তার মনে হচ্ছিল মেয়েটি অনেক সহজ। এতদিন সুদীপকে জেনেও সে কোন হিমের রাতে এইভাবে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারত না। অথচ মেয়েটি সামান্য পরিচয়ে যৌনতাহীন আলিঙ্গনের তাপ নিতে পারছে। ঘুম এল না জয়িতার। এবং তখনই তার মনে হল মেয়েটি আনন্দর দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করেনি। তার যা কিছু করার সুদীপকে নিয়েই করছে। এই মুহূর্তে সুদীপ জড়তাক্রান্ত। শুধু শারীরিক প্রয়োজন হলে মেয়েটি আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করত। মেয়েটি অবশ্যই সুদীপের সম্পর্কে দুর্বল হয়েছে। একেই কি ভালবাসা বলে? বুকের ভেতর জমে ওঠা অস্বস্তিটা এবার টনটনানির পর্যায়ে চলে গেল।

সকালে রোদ উঠল না, সূর্যের হদিস নেই। গুহার বাইরে মুখ বের করে আতঙ্কিত হল ওরা। একটা ময়লা আলো নেতিয়ে রয়েছে বরফের ওপরে। কাল সারারাত প্রচুর তুষারপাত হয়েছে এখানে। যে

গাছগুলোর ন্যাড়া ডাল গতকাল দেখা গিয়েছিল সেগুলো এখন সাদায় সাদা। বীভৎস আকাশটা নেমে এসেছে যেন মাথার ওপরে। আর থম ধরে আছে চৌদিক।

শরীরের বাড়তি ভার কমিয়ে ফেলতে যেদিকে আনন্দ গেল তার বিপরীতে পা ফেলল জয়িতা। একটু আগেই সুদীপকে নিয়ে মেয়েটি বেরিয়েছিল। ওদের দিকে পিছন ফিরেছিল সুদীপ, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি মেয়েটি ওর প্যান্টের বোতাম খুলে জলবিয়োগ করতে সাহায্য করেছে। আজ সকালে কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মাথায় আসেনি। যেমন করে একজন নার্স তাঁর ভূমিকা পালন করেন সেইভাবে মেয়েটি কর্তব্য করছে বলে মনে হয়েছিল। সুদীপের হয়ে গেলে মেয়েটি ওর পাশেই বরফের ওপর বসে পড়ে ভারমুক্ত হল। এটাই জয়িতার নার্ভে ধাক্কা মারল। গতকালও মেয়েটি একটা আব্রু রেখেছিল। আজ সেটিও বর্জিত হয়েছে। অথবা এখন ওই ভালুকছানা এবং সুদীপের মধ্যে তার কাছে কোন ফারাক নেই। কিন্তু ও জানত পিছনে গুহার মুখে আনন্দ এবং জয়িতা দাঁড়িয়ে আছে। ও যখন সুদীপকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল তখন মুখে কোন অন্যায়বোধ নেই। অনেকটা আড়ালে এসে জয়িতা চারপাশে তাকাল। পাহাড়ের চূড়োগুলো এখন দেখা যাচ্ছে না। ঘোলাটে হয়ে আছে সব কিছু। নিজেকে মুক্ত করার মুহূর্তে তার মনে হল মেয়েটির ওপর রাগ করার কোন মানে হয় না। এই মুহূর্তে সে ধরে নিয়েছে কোন মানুষ আশেপাশে নেই। একটি পুরুষ যা পারে একটি মেয়ের পক্ষে তা শোভনীয় নয় তাই আজন্ম জেনে এসেছে। সেই কারণেই নির্জন জায়গা বেছে নেওয়া। কিন্তু এটাও তো এক ধরনের দুর্বলতার প্রকাশ। মেয়েটি ধরে নিয়েছে সে কোন অন্যায় কাজ করছে না, কোন অশালীন দৃশ্য তৈরি হলে যে দেখছে সে-ই তৈরি করে নিচ্ছে তখন তার বাধা কোথায়? ছেলেদের বেলায় যা স্বাভাবিক তা মেয়েদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু হবে কেন? এ সবই মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে রক্তে মেশা সংস্কার। এই মেয়েটি অন্তত অনেক স্বাভাবিক। জয়িতা চারপাশে তাকাল। একটা রাত কেটে গেল গুহার মধ্যে চারপাশে বরফ রেখে। আর এখানেও সে বয়ে চলেছে কলকাতার মানসিকতা।

হঠাৎ বাঁ দিকে মুখ ফেরাতেই সে চমকে উঠল। যেন বিশাল বরফের ঢেউ পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামছে নিচে। জয়িতা দৌড়তে লাগল আতঙ্কিত হয়ে। তার মনে হচ্ছিল সমস্ত পাহাড় এখন গলছে। আর তখনই হাওয়া উঠল। সে যখন গুহায় পৌঁছল তখন আকাশে ধুন্ধুমার কাণ্ড। ঘনঘন বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মত বরফ মেশানো বাতাস আছড়ে পড়ছে গুহার বাইরে। ওদের তাঁবুর কাপড় দিয়ে বানানো গুহার আড়ালটা থরথরিয়ে কাঁপছে। যেহেতু পাহাড় আড়াল করে আছে এবং বাতাসের মুখ এদিকে নয় তাই ওটা এখনও টিকে আছে কোনমতে। ভেতরে ঢুকে জয়িতা দেখল, আনন্দ জল গরম করছে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাইরে প্রলয় হচ্ছে।'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোর চেহারাটা যা হয়েছ না, একদম শ্বেত ভালুক!'

জয়িতা নিজের দিকে তাকাল একবার তারপর চিৎকার করে বলল, 'বোকার মত কথা বলিস না। আমরা যে কোন মুহূর্তে বরফচাপা পড়তে পারি। মনে হচ্ছে পাহাড়টা নেমে আসছে।'

আনন্দ বলল, 'কিছু করার নেই। বাইরে বের হলে যখন মৃত্যু অনিবার্য তখন এখানে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের এবার চায়ের নেশাটাও ছাড়তে হবে, পাতা ফুরিয়ে আসছে।'

শরীরের ওপর জমে-যাওয়া বরফগুলো ঝেড়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এরকম ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছিস?'

'কী করব?' চা ঢালল আনন্দ, 'মেয়েটা বলল গ্রামে বরফ পড়ার ঠিক আগে নাকি প্রতি বছর এই রকম কাণ্ড হয়। এর পরে ব্লিজার্ড বইবে। তুই ভাবতে পারিস, বাঙালির ছেলে ব্লিজার্ডের মুখোমুখি হচ্ছে?'

'বাইরে বের হলে থ্রিলটা টের পাবি।'

'সেই জন্যেই ভেতরে বসে আছি। নে, চা খা। ব্রেকফাস্ট কাম লাঞ্চ, মাংস।'

চায়ে চুমুক দিতে বিস্বাদ হল মুখ। চিনি কম আর কষা হয়েছে পদার্থটা। কিন্তু তবু গরম পানীয় বলে কথা, জয়িতা নিজেই একটা আরাম বানিয়ে নিচ্ছিল। প্রত্যেককে চা দেওয়ার পর আনন্দ ভালকুছানা দুটোকে নিয়ে পড়ল। একদম নেতিয়ে পড়েছিল ওরা, গরম চা মুখে পড়তে প্রথমে প্রতিবাদ, তার পরে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। জয়িতা বাচ্চাদুটোকে দেখছিল। পেটভরে খাওয়ার পর ওদের মুখে চমৎকার

আরাম। দুজন দুজনের শরীরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল এবার। আনন্দ বলল, 'পশুর সঙ্গে মানুষের এখানেই প্রভেদ। মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট হবার মনটা হারিয়ে ফেলেছে।'

দুপুরের পর থেকেই আকাশ পরিষ্কার। এমন কি মোলায়েম একটা আলো ফুটল পৃথিবীতে। দেখা গেল বরফ জমেছে প্রচুর। ন্যাড়া গাছগুলোর অনেককেই আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশে ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। এমন কি চোখ মেলতেই মাকালু ঝকমকিয়ে উঠল। কিন্তু যে পথে ওরা এসেছিল এবং যে পথে লা-ছিরিঙ ফিরে গিয়েছিল সেই পথটাই নেই। আনন্দ বলল, 'যাক, এযাত্রায় বাঁচা গেল। মনে হয় লা-ছিরিঙ খবর নিয়ে আসতে পারে এবার।'

জয়িতার কথাটা ভাল লাগল না। বলল, 'ওর জন্যে অপেক্ষা না করে আমরা যদি নেমে যাই তাহলে সন্ধ্যের আগে গ্রামে পৌঁছতে পারব। গ্রামে ঢুকেই বুঝতে পারব পুলিশ এসেছে কিনা।'

'যখন বুঝবি তখন কিছু করার থাকবে না হয়তো। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।'

'তুই ক্রমশ কেমন ভীতু হয়ে যাচ্ছিস।' জয়িতা বিরক্ত গলায় বলল।

আনন্দ চোখ তুলে তাকাল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমরা চারজন এখানে এসেছিলাম। একজন পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। আর একজন বেঁচে থেকেও অকেজো। এই অবস্থায় আর একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আমরা তো জলে পড়ে নেই।'

আনন্দ খুব একটা ভুল বলছে না। কিন্তু জয়িতার মনে হল এরকম কথা সেই সব মানুষেরাই বলে থাকে যারা উদ্যম হারিয়ে ফেলে। সে বলল, 'কিন্তু এইভাবে আটকে থেকে আমরা কি করতে পারি! পুলিশ গ্রামে এসে আমাদের কথা জানতেই পারবে। বলা যায় না, হয়তো এর জন্যে আমাদের কাছাকাছি মানুষদের ওপর ওরা অত্যাচার করতে পারে। আমার মনে হয় যতদূর সম্ভব নেমে গিয়ে একটু হদিশ নেওয়া যাক। বিপদ বুঝলে ফিরে আসব।'

আনন্দ এবার দোনমনা করল, 'এত বরফের মধ্যে সুদীপকে নিয়ে নামা যাবে?'

'সুদীপ ওই মেয়েটার সঙ্গে এখানেই থাক। যদি ফিরে আসি তো ভাল, নইলে লা-ছিরিঙ নিশ্চয়ই ওকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মেয়েটি তো ওকে যত্ন করছে বেশ।'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। গতরাত্রে মেয়েটির ব্যবহার তারও চোখে পড়েছে। সুদীপের যা অবস্থা তাতে মেয়েটির এই ব্যবহার তার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হল জয়িতা বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক সহ্য করতে পারছে না। ও বুঝতে পারছিল না মেয়েরা কেন এত অসহনীয় হয়ে ওঠে একটি পুরুষকে ঘিরে? বিশেষ করে যার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই এমন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ে ঘনিষ্ঠ হলেও সেই দৃশ্যের কাছাকাছি থাকাটা তাদের কাছে কেন অস্বস্তির হয়? শেষবার সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, 'কিন্তু আমরা চলে গেলে ভালুকটালুকও তো আসতে পারে। গুহাটার কথা নিশ্চয়ই পাহাড়ি জন্তুদের জানার কথা।'

এইটে মাথায় আসেনি। জয়িতা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর সোজা গুহায় ফিরে গেল। সুদীপ বসে আছে। আর মেয়েটি গুনগুন করে গান শোনাচ্ছে। জয়িতাকে দেখে মেয়েটি থেমে গেল। সে সরাসরি সুদীপের দিকে চলে এল, 'কেমন আছিস সুদীপ?'

সুদীপের চোখের পাতা পড়ল। জয়িতার মনে হল ওর মাথায় একটা কিছু এসেছে নইলে মুখ অমন উজ্জ্বল হত না। ঠোঁট ফাঁক হল সুদীপের। তারপর অনেক কষ্টে কিছু বলল। কিন্তু সেই শব্দগুলো বোধগম্য হল না জয়িতার। সে মেয়েটির দিকে ফিরল, 'আমরা একবার গ্রামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। যদি পৌঁছতে না পারি, তাহলে ফিরে আসব। পারলে ওরা আসবে তোমাদের নিয়ে যেতে। ঠিক আছে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। কতটা সে বুঝতে পারল তা অনুমানে এল না। জয়িতা শেষ প্রশ্নটা উচ্চারণ করল, 'কিন্তু কোন জন্তু-জানোয়ার এলে কি করবে তোমরা?'

মেয়েটি এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর উঠে সুদীপের বিছানার নিচু থেকে একটা লাঠি বের করে সামনে রাখল। জয়িতা বুঝল কিছু করার নেই। ওর হাতে রিভলবার দিয়ে যাওয়া যায় না। এই তুষারঝড়ের পর কোন পাহাড়ি জন্তুর আবির্ভাব হবে বলে মনে হয় না, হলে ওই লাঠি যে কোন কাজেই লাগবে না তা এই মেয়েটি কি জানে না!

জয়িতা আবার বাইরে বেরিয়ে এল। আনন্দর সঙ্গে ভালুকছানা দুটো এবার খেলা করছে। ব্যাপারটা

চোখে পড়ামাত্র চিড়বিড়িয়ে উঠল মন, 'এটা কি খেলার সময়?'

ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দ চিৎকার করল, 'কি ঠিক করলি?'

'আমি একাই যাব।' জয়িতা শক্ত গলায় বলল।

'আর ইউ ম্যাড?' আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'ভেবেচিন্তেই বলছি। লা-ছিরিঙ আর পালদেমকে আমাদের সাহায্য করার জন্য পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে, সে ক্ষেত্রে কে খবর দেবে আমাদের?'

'কোন্ পুলিশ? ইন্ডিয়ান পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করতে পারে না।'

'এই নির্জন পাহাড়ে আইন কতটা সক্রিয় আমার সন্দেহ আছে। নেপালী পুলিশ সঙ্গে থাকতে পারে।'

আনন্দ এক মুহূর্ত কিছু ভাবল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, যা। আমি সুদীপকে এইভাবে ছেড়ে যেতে পারছি না।'

বেশ সাহস নিয়ে নামা শুরু করল জয়িতা। মাঝে মাঝেই হাঁটু ডুবে যাচ্ছে নরম বরফে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আনন্দ অথবা গুহা চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন নির্জন সাদা পাহাড়ে সে একা। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমনকি একটি পাখিও কোথাও ডাকছে না। খুব সাবধানে জয়িতা কমলারঙের রোদ গায়ে মেখে পা ফেলছিল। পাথর এবং তার খাঁজগুলো এখন বরফের আড়ালে। সামান্য অসাবধানতা যে বিপদ ডেকে আনবে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ নামবার পর সে হাঁপাতে লাগল। এমন একটা বরফশূন্য জায়গা নেই যেখানে বসে জিরোতে পারে। যে পথ দিয়ে ওরা উঠে এসেছিল সে পথ উধাও। হাতে পায়ে যাচাই করে জয়িতা নামছিল। এখন তাকে পথ করে নিতে হবে। এবং তখনই তার পতন হল। যে বরফকে তার শক্ত মনে হয়েছিল তা তাকে টেনে নিয়ে গেল অনেকটা নিচে। কোনরকমে দুটো হাতে ভর রেখে নিজেকে সামলাল সে। থরথর করে কাঁপছে বুক। আর একটু ওপাশে পড়লেই এই জীবনে উঠে দাঁড়াতে হত না। যেখানে পড়েছিল সেই বরফের ওপরে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। এখান থেকে নামার জায়গা নেই। কিন্তু নিচের জঙ্গলের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। সেখানেও সাদাটে তুষার জড়ানো। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর শরীর ধাতস্থ হল। একমাত্র হাঁটু এবং কনুইতে ব্যথা ছাড়া অন্য অস্বস্তি নেই। সে উঠে দাঁড়াল। এখনও সবুজের কোন চিহ্ন নেই। ক্যাপ্টেন স্কট অথবা হান্ট এইরকম বা এর চেয়ে বীভৎস বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সেইসব কাহিনী পড়ার সময় যে উত্তেজনা আসত তার বিন্দুমাত্র এখন নেই। বরং একটা শীতল ভয় ছড়িয়ে পড়ছে মনে—যদি আরও বরফ পড়ে, যদি এখান থেকে বের হতে না পারে! ডান দিকে একটি চাতালের মত বরফ রয়েছে দেখতে পেল সে। ওটা শক্ত না নরম তা এখান থেকে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ওইটে ছাড়া কোন রাস্তা নেই। জয়িতা ইতস্তত করল খানিক, তারপর মরিয়া হয়ে লাফ দিল। শূন্য থেকে শরীরটা চাতালে পড়ার পর পা-দুটো যখন অতলে তলিয়ে গেল না তখন হাসি ফুটল তার মুখে। এপাশে একটা পথ বের হতে পারে। সাবধানে এগোতে সে চমকে উঠল। এবং নিজের অজান্তে একটা আর্তনাদ ছিটকে বেরুল শরীর থেকে। দু'হাতে মুখ ঢাকল জয়িতা। এখন তার সমস্ত শরীরে শীত-ছাড়ানো কম্পন। খানিকটা সময় যাওয়ার পর চোরের মত আঙুল সরিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাল। লোকটা পড়ে আছে পা ছড়িয়ে। দুটো চোখ খোলা। নিঃসাড়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডান হাতের মুঠোয় আটকে আছে পাত্রটি, যে পাত্রে জল নিয়ে এসেছিল সে পর্বতশৃঙ্গ থেকে অসুস্থ মাকে সুস্থ করার বাসনায়। এই মানুষটির সঙ্গে গতকাল তারা কথা বলেছিল। এর জেদে বিস্মিত হয়েছিল, আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল। কিন্তু যে অত বড় পর্বত থেকে নেমে আসতে পারল সে এখানে মরে পড়ে থাকবে কেন? তারপরেই জয়িতার মনে পড়ল কুকুরটার কথা। লোকটার সঙ্গে ওরই তো থাকার কথা। কিন্তু কোথাও কুকুরটার হদিশ পেল না সে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। পাহাড়ি কুকুরের বিশ্বস্ততার গল্প সে অনেক পড়েছে। লোকটা পড়ল কি করে তা বুঝতে পারছে না জয়িতা। কিন্তু ওর মৃত্যু যে পতন থেকেই হয়েছে তা স্পষ্ট। মাথার পেছনে অনেকটা রক্ত ছড়িয়ে আছে এখনও। রক্ত জমে গেলে বীভৎস দেখায়।

জয়িতা দ্রুত মৃত্যুর গন্ধ এড়িয়ে যেতে চাইল। সে ওই মানুষটির জন্যে কিছুই করতে পারে না। এবং তখনই তার নজর গেল পাত্রটির ওপর। প্রাণ বের হবার মুহূর্তে লোকটি সতর্ক ছিল যাতে ঐ পাত্রটি ঠিক থাকে। সে ধীরে ধীরে পাত্রটি লোকটির আঙুলের বাঁধন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। ঠাণ্ডায় জমে

ওগুলো এখন লোহার মত শক্ত। অনেক কষ্টে পাত্রটিকে মুক্ত করে সে আবার এগোল। হঠাৎ তার মনে হল এখন দায়িত্ব দুটো। নিজের শরীরকে ঠিক রাখার সঙ্গে এই পাত্রটিকে মৃতের মায়ের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। এইভাবে হয়তো এক জীবনের আধো শেষ কাজ আর এক জীবন এগিয়ে নিয়ে যায় শেষ করতে। অতএব তার গন্তব্য তাপল্যাঙ নয়, পাশের গ্রামে তাকে যেতে হবে। রোলেন বলে লোকটাকে সে কথা দিয়েছিল তাদের গ্রামে যাবে। কিন্তু তারপর পালদেমদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় আর সময় পাওয়া যায়নি।

নিচের দিকে বরফ অপেক্ষাকৃত কম। মাঝে মাঝে পাথরের মুখ দেখা যাচ্ছে। সাবধানে হাঁটছিল সে। এখন গাছের মাথার কাছাকাছি নেমে এসেছে সে। দিনের আলো রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সন্ধ্যে হতে খুব বেশি দেরি নেই। ঠিক তখনই সম্মিলিত সারমেয়ধ্বনি কানে এল। জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচ থেকে কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে উঠে আসছে। তাহলে কি পুলিশ কুকুর নিয়ে উঠে আসছে তাদের সন্ধানে? বাঁ হাতে কোমরের রিভলভারটায় হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠল সে। সেটা কোমরে নেই। অথচ বের হবার আগে সেটা কোমরেই ছিল। নতুন একটা ভয় আক্রমণ করল তাকে। কোথায় গেল রিভলভারটা? সে যখন পা পিছলে নিচে পড়েছিল তখনই কি ছিটকে গেছে সেটা? হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করতে লাগল জয়িতা। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল। এখন তার পক্ষে আর ওপরে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শরীরের সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুলিশের কুকুর নির্ঘাৎ তাকে খুঁজে বের করবে। এদের হাত থেকে কোনভাবেই পরিত্রাণ নেই। জয়িতা চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর কোনরকমে একটা বড় পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকোল। এবং তখনই দুটো কুকুরকে দেখতে পেল। ডাকতে ডাকতে তারা ওপরে উঠে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। সন্দেহের চোখে পাথরটার দিকে তাকাল। একজন খানিকটা এগিয়ে এসে ডাকতে লাগল। আর দ্বিতীয়জন নেমে গেল নিচে। অর্থাৎ সে ধরা পড়ে গেছে। কুকুরটার বীভৎস দাঁতের দিকে তাকিয়ে সিরসির করে উঠল শরীর। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল। কেন যে সে আনন্দর কথায় অবাধ্য হল! আর তখনই দলটাকে উঠে আসতে দেখল। ওদের দেখতে পাওয়ামাত্র শরীরে প্রাণ ফিরে পেল জয়িতা। না, এরা পুলিশ নয়। গ্রামবাসীরা উঠে আসছে কুকুর নিয়ে হয়তো তাদেরই খুঁজতে। কিন্তু এত লোকের তো তাদের খুঁজতে আসার কথা নয়। পালদেমরা তো ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিল? তবু আশান্বিত হয়ে জয়িতা আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র কুকুরগুলো চিৎকার দ্বিগুণ করে লাফাতে লাগল। যারা উঠছিল তারা সম্ভবত জয়িতাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতে পারেনি। এইসময় শিস বাজল। বাজতেই যখন কুকুরগুলো বাধ্য হল তখন জয়িতা গতকালের কুকুরটাকে দেখতে পেল। সে অনেকটা পিছিয়ে কাতর গলায় ডেকে যাচ্ছে। এমনকি শিসের আদেশও তাকে থামাতে পারেনি। এক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপর জঙ্গলটা থেকে লোকটাকে বের হতে দেখল জয়িতা। শক্ত শরীরে বিশ্বাসের পা ফেলে এগিয়ে আসছে সামনে। কাছাকাছি হতেই জয়িতা চিনতে পারল, রোলেন। তাহলে এরা তাপল্যাঙের মানুষ নয়? পাশের গ্রামের লোক কুকুর নিয়ে ওপরে উঠছে। রোলেন সামনে দাঁড়িয়ে মাথা একবার ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে কি করছ জানতে পারি কি?'

জয়িতা মুখ উঁচু করে ওপরের দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'আমি ওপর থেকে নেমে আসছি।' রোলেন কি বুঝল সেই জানে, মাথাটা দুবার নাড়াল। এই অভ্যাস পাহাড়ি মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাচ্ছে জয়িতা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছ?'

রোলেন জবাব দিল, 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলে তার মায়ের জন্য ভগবানের জল আনতে পাহাড়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। সে ফেরেনি কিন্তু তার কুকুরটা ফিরে এসেছে। ওর ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারছি লোকটি খুব কাছাকাছি আছে। হয়তো অসুস্থ, হয়তো হাঁটতে পারছে না। কুকুরটা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল, তারপর দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। সে বেঁচে নেই।'

'কি বলছ তুমি?' তাকে দেখতে পেয়েছ? অত ওপর থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ। আমরা ওপরে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম পুলিশ হয়তো আমাদের খোঁজে গ্রামে আসতে পারে। গতকাল লোকটা জল নিয়ে আমাদের গুহায় নেমে এসেছিল। ওই

কুকুরটাও সঙ্গে ছিল। ও খাওয়াদাওয়া করে আবার রওনা হয়েছিল বিকেলে। আজ একটু আগে ওর মৃতদেহ দেখতে পেলাম আমি। এখান থেকে খানিকটা ওপরে গিয়ে খুঁজলেই তোমরা পেয়ে যাবে ওকে।' জয়িতা মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করেও ঠিক হদিশ পেল না জায়গাটার। রোলেন চিৎকার করে খবরটা সঙ্গীদের জানিয়ে দিতেই একটা হতাশ শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হল, কিন্তু কেউ কাঁদল না।

রোলেন বলল, 'ওর দেহ আমাদের তুলে আনা কর্তব্য। আজ পর্যন্ত অনেকেই ভগবানের জল আনতে পাহাড়ে উঠেছে কিন্তু খুব কম মানুষই ফিরে আসতে পেরেছে। ও যখন এতটা ফিরতে পেরেছিল তখন বোঝা যাচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ ছিল ওর সঙ্গে।'

হঠাৎ জয়িতার মনে পড়তে পাত্রটা তুলে ধরল, 'এইটে ওর হাতে ছিল মৃত্যুর মুহূর্তেও। এইটে করে যে জল এনেছিল তা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল সে।'

সঙ্গে সঙ্গে রোলেনের চোখমুখ পালটে গেল। পরম বিস্ময়ে সে পাত্রটির বরফ দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল। সে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল দলটার মধ্যে। একটি মৃত্যুশোককে ছাপিয়ে যে খুশি বড় হয়ে উঠতে পারে একটি প্রাপ্তির সংবাদে তা জয়িতার জানা ছিল না। হঠাৎ সমস্ত দলটা নতজানু হয়ে বসল জয়িতার সামনে। মাথা নিচু করে রোলেনও তাদের সঙ্গে বসে মৃদু স্বরে কিছু আওড়ে গেল। এই মুহূর্তে নিজেকে যেন ঈশ্বরীর মত মনে হচ্ছিল জয়িতার। পৌরাণিক ইংরেজি ছবিতে এমন দৃশ্য দেখেছে সে। বোঝাই যাচ্ছে এরা এই পবিত্রজলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কিন্তু তার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না।

প্রার্থনা শেষ হলে রোলেন সঙ্গীকে নির্দেশ দিল। কুকুরগুলো নিয়ে দলটা ওপরের দিকে রওনা হতে রোলেন বলল, 'তোমাকে এবার আমাদের গ্রামে যেতে হবে।'

'কেন?' জয়িতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া ওই জল কাহুনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তোমাকে। তুমি ওই মৃত মানুষটিকে প্রথম দেখেছ। ওই জল তুমি ওর কাছ থেকে না নিয়ে এলে হয়তো আমরা কোনদিন খুঁজে পেতাম না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল। এ ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। পাশের গ্রামে পৌঁছলে তাপল্যাঙের খবর জানা যাবে। সে রোলেনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এখন পথ অনেক সহজ। কিন্তু বরফ ছড়ানো সর্বত্র। এই দুটো রাতের মধ্যে প্রকৃতি এমনভাবে চেহারা পালটে ফেলবে কে জানত!

হঠাৎ রোলেন বলল, 'তোমাদের কাছে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পুলিশকে ভয় পাও?'

জয়িতা শক্ত হল। তার কাছে যে অস্ত্র নেই সেই কথাটা মনে এল। কিন্তু পুলিশের কথা তো রোলেনের জানার কথা নয়! সে কোন উত্তর দিল না। রোলেন খানিক চুপ করে থেকে নিজের মনেই বলে যেতে লাগল, 'গতকাল পুলিশ এসেছিল তোমাদের ধরতে তাপল্যাঙে। খুঁজে না পেয়ে পালদেমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাপল্যাঙের লোক এমন ভেড়ুয়া যে চুপচাপ সেটা দেখছিল। আমরা পাহাড় থেকে পাথর ফেলে ওদের তাড়িয়ে দিলাম। কাল থেকে তো বরফ নেমে গেছে। মনে হয় বরফ গলার আগে আর ওরা এদিকে আসতে সাহস পাবে না।'

'পালদেমের কি হয়েছে?' জয়িতার গলায় উদ্বেগ।

'ওকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। তোমরা পালিয়ে গেলে কেন? পুলিশদের লড়াই করে হারিয়ে দিতে পার না অথচ ওই সব বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের ভয় দেখাও! যে লোকটাকে তুমি আঘাত করেছিলে সে এখনও ভাল করে হাঁটতে পারে না। বড় বন্দুক নেই তোমাদের সঙ্গে?' রোলেনের গলায় কৌতূহল।

'সবসময় সামনাসামনি লড়াই করতে নেই। আমরা চাইনি পুলিশরা আমাদের কথা জানুক।'

'তোমরা ডাকাত? খারাপ কাজ করে এখানে লুকিয়ে আছ?'

জয়িতা চোখ তুলল। রোলেনের দৃষ্টি সরলরেখায় এল। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল জয়িতার। কোনরকমে সে বলতে পারল, 'আমাদের দেখে তোমাদের কি তাই মনে হয়?'

রোলেন কাঁধ নাচাল, তারপর বলল, 'কি জানি?'

পাহাড় শেষ হতেই দুটো পথ। একটা চলে গেছে তাপল্যাঙের ভেতরে, অন্যটা পাশের গ্রামে। পুলিশ এসেছিল এবং চলে গিয়েছে জানতে পারার পর একটা নিশ্চিন্তিবোধে আচ্ছন্ন ছিল জয়িতা। হঠাৎ রোলেন তার হাত ধরে টানতে সে চমকে সামনের দিকে তাকাল। লা-ছিরিঙ এবং পালদেম খানিকটা

দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং ওদের মুখ গম্ভীর। জয়িতা এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু রোলেন বাধা দিল, 'না, যাবে না। তোমার কাছে আমাদের জন্যে আনা ভগবানের জল আছে।'

'তার সঙ্গে আমার যাওয়ার কি সম্পর্ক?'

'ওরা জানতে পারলে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। আর তাই যদি হয়, তোমার কাছে যে অস্ত্রই থাক আমি জীবন থাকতে ওদের নিতে দেব না।' আচমকা রোলেনকে অত্যন্ত রাগী দেখাচ্ছিল।

পালদেমের গলা পাওয়া গেল, 'ওরা কোথায়?'

জয়িতা হাসবার চেষ্টা করল, 'ওবা এখনও ওপরে। শুনলাম পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল!'

কথাটা পালদেমের পছন্দ হল না। সে চুপ করে রইল, কিন্তু লা-ছিরিঙ বলল, 'আমরা পুলিশদের পেছনে পেছনে ওয়ালাংচুঙ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে আর ওরা ফিরে আসবে না।'

জয়িতা বলল, 'তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

কিন্তু কথাটা পালদেমের কানে গেল না। সে নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমরা ওপরে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রাত্রেই ফিরে আসব। তুমি কি একা একা গ্রামে ফিরতে পারবে?'

জয়িতা বলল, 'পারব।'

কথাটা শোনামাত্র পালদেম গম্ভীরমুখে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে লা-ছিরিঙকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। জয়িতা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কি হয়েছে?'

পালদেম জবাব দিল না। কিন্তু লা-ছিরিঙ দাঁড়াল, 'তুমি আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাঁটছ।'

'কিন্তু আমি তো তোমাদের বন্ধু।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার থাকাটা আমরা পছন্দ করছি না।'

'কেন? ওর সঙ্গে থাকলে কি আমি তোমাদের বন্ধু হতে পারি না? ও তো তোমাদের উপকার করেছে। পুলিশের হাত থেকে পালদেমকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।'

এবার পালদেম কথা বলল, 'সেটা তোমার ঋণ শোধ দেবার জন্যে। এখন ও মুক্ত। এবার নতুন করে শত্রুতা চালাতে আর কোন মনের বাধা নেই। আমরা ওদের বিশ্বাস করি না।'

রোলেন চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ সে কোমরে হাত রাখল। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'আর একটা কথা বললে আমি কুকরি বের করব!'

কথাটা শোনামাত্র পালদেম লাফিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল। এবং তারও হাত এবারে কোমরে। জয়িতা প্রমাদ গুনল। রোলেনের পক্ষে একা দুজন মানুষের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব কিনা তা বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু একটা খুনোখুনি হবেই। ক্ষ্যাপা ষাঁড়েব মতন দুটো মানুষ সতর্কভঙ্গিতে পরস্পরের কাছাকাছি হচ্ছে। লা-ছিবিঙ উত্তেজিত। যে কোন মুহূর্তে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ দৌড়ে ওদের মাঝখানে চলে এল জয়িতা। তারপর জলের পাত্রটা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা যদি লড়াই কব তাহলে আমি এটা দূরে ছুঁড়ে ফেলব!'

সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ বের হল রোলেনের গলা থেকে, 'না—!' তার মুখে ভয় এবং অসহায় ছাপ পড়ল ক্রোধ সরিয়ে। যেন আচমকা পাথর হয়ে গেল সে।

জয়িতা শক্ত গলায় বলল, 'তোমরা যদি এইরকম মারামারি কর তাহলে ভগবানের জল পাওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'ভগবানের জল?' পালদেমের গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ। ওদের গ্রামের একটি মানুষ মায়ের অসুখ সারাবে বলে ওই উঁচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে এই জল একা নিয়ে এসেছিল। বেচারা মারা গিয়েছে পথে কিন্তু জল ঠিক রেখেছিল এই পাত্রে।'

জয়িতার কথা শেষ হওয়ামাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পালদেমের, 'তুমি যা বলছ তা সত্যি?'

'আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না পালদেম। তোমাদের যে মেয়েটি ওপরে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে আঘাত কর তাহলে এটা আমি ছুঁড়ে ফেলব।'

জয়িতার কথা শেষ হবার আগেই পালদেম আর লা-ছিরিঙ হাঁটু গেড়ে বসে কিছু আওড়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পালদেম বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এই জল আমরা পেতে পারি? আমাদেব গ্রামে কখনও ভগবানের জল আসেনি।'

জয়িতা দ্বিধায় পড়ল। সে কি করে বোঝায় এই জলের কোন ক্ষমতা নেই। পৃথিবীর নদনদী বা বরফের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। একটা অন্ধ বিশ্বাস প্রশ্রয় দেওয়া মানে আধুনিক জীবনযাত্রার বিপরীত কাজ। তাপল্যাঙের মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তারা আনতে বদ্ধপরিকর তার সঙ্গে এই সংস্কার মিলতে পারে না। কিন্তু একটি বিশ্বাস তা যতই অন্ধ হোক যদি দুটি বিবদমান মানুষের প্রাণে শান্তি আনে তাহলে সে সেই সুযোগ নেবে না কেন? প্রথমে শান্তি, তারপর এগিয়ে যাওয়া। সে বলল, 'তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভগবানের নামে, আর কখনও তোমরা অস্ত্রে হাত দেবে না।'

প্রস্তাবটা শোনামাত্র রোলেন এবং পালদেম পরস্পরের দিকে তাকাল।

॥ ৪৬ ॥

দরজা খুলতেই কাঁটার চাবুকের আঘাত। টলতে টলতে সামলে নিল আনন্দ। যতটা সম্ভব মুখচোখ থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেওয়া সত্ত্বেও শরীরে হিমঅনুভূতি। ঝড়টা বইছে এখনও। বরফের কুচিগুলো আর তীরের মত ছিটকে আসছে না এই যা। দরজা ভেজিয়ে আনন্দ সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন অন্তত সকাল দশটা। অথচ অন্ধকার পাতলা হয়ে ঝুলে আছে তাপল্যাঙের ওপরে। আকাশের রঙের বর্ণনা করা অসম্ভব। চরাচর দেখা যাচ্ছে কিন্তু সাদা তুষারের গায়ে যে ছায়া পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা। এখন তাপল্যাঙ বরফে মোড়া। যেদিকে তাকাও শুধু বরফ আর বরফ।

তিন রাত দুদিন ব্লিজার্ড বইছে। ব্লিজার্ড শব্দটার সঙ্গে বইয়ে পরিচয় ছিল। য়ুরোপ আমেরিকায় তুষারঝড়ে পথ হারানো বা মৃত্যুমুখে পড়া মানুষের গল্প অনেক পড়েছে সে। ব্লিজার্ড শব্দটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাবনা সে আরোপ করে নিয়েছিল। কিন্তু গত তিনরাতের প্রতি মুহূর্তের আতঙ্কে সেসব শিকেয় উঠেছে। মনে হয়েছে যে কোন সময় আস্তানাটা উড়ে যাবে। কাঠের দেওয়ালে অনবরত বরফের কুচি নেকড়ের নখের আওয়াজ তুলেছে। ঠাণ্ডা নেমে গেছে এতটা যে আগুন জ্বালিয়েও মনে হয়েছে ওতে হাত ডোবালে ফোসকা পড়বে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলোও চাপা পড়ে গিয়েছিল। দরজা খোলার সাহস হয়নি। নিরুপায় হলে বাইরের জানলার নিচে বসতে হয়েছে। এবং এইখানে, এই সময়ে তার এবং সুদীপের সঙ্গে জয়িতা বা মেয়েটির কোন পার্থক্য ছিল না।

কাল সারারাত ঝড়ের দাপট ছিল মারাত্মক। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব বাতাস যেন একত্রিত হয়েছে। আর এভারেস্ট যেন আচমকা গলে এগিয়ে আসছে। কাল সারারাত ঘুম আসেনি কারও। এমন কি সুদীপেরও। ওর চেতনা এখন অনেক স্পষ্ট। মেয়েটি বিশ্বাস করে রোলেনদের গ্রাম থেকে চেয়ে আনা পর্বতশৃঙ্গের পবিত্র জলের কণা ওর কপালে মাখিয়ে দেওয়ায় এই পরিবর্তন। কিন্তু লা-ছিরিঙের মুখে সে শুনেছে গুহা থেকে নামিয়ে আনার সময় সুদীপ পা পিছলে অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। নরম বরফে শরীর পড়ায় তেমন আঘাত লাগেনি, কিন্তু পড়ার পর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল। আনন্দ ছিল অনেকটা আগে। চিৎকার শুনে পিছিয়ে গিয়ে দেখেছিল সুদীপ উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মুখে মৃত্যুভয় সেঁটে আছে। আনন্দর প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়েছিল সে। ওই আঘাত থেকে ওর চেতনা ফিরে এসেছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না অবশ্য। এখনও সুদীপ কথা বলে না। কিন্তু অন্যরা কথা বললে আগ্রহ নিয়ে শোনে। এটা কম স্বস্তির নয়।

দরজাটা দ্বিতীয়বার খুলল। জয়িতার গলা শোনা গেল, 'উঃ বাবা!'

আনন্দ কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। যেন ঠাণ্ডায় স্বরনালী বিকল হয়ে গেছে। জয়িতা বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ইশারা করে দৌড়াবার চেষ্টা করল সামনে। কিন্তু হাঁটু অবধি জমে থাকা নরম বরফে দৌড়ানো যে অসম্ভব ব্যাপার তা আবিষ্কার করে অসহায় চোখে তাকাল সে। আনন্দ সাবধানী পায়ে ওর পাশে দাঁড়াল। হাওয়ার দাপটে শরীর সোজা রাখা প্রায় অসম্ভব। সে জয়িতার হাত ধরল।

কয়েক পা এগোতে ওরা একটা ঘরের ছাদকে বরফের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল। আশেপাশে ঘর নেই। ভাঙচুর হওয়া ছাদটি কোত্থেকে উড়ে এসেছে বোধগম্য হচ্ছিল না। গ্রামের ভেতরে ঢোকার পর মনে হল কেউ যেন দুরমুশ করে দিয়েছে চৌদিক। অথচ কোন মানুষের শব্দ নেই। নবনির্মিত যৌথগৃহের প্রথমটির দরজা বন্ধ। আনন্দ দরজায় শব্দ করে যখন কোন সাড়া পেল না তখন চিৎকার করতে লাগল হাওয়ার দাপট ছাড়িয়ে।

দরজাটা খুলতে সময় লাগল। যে যুবকটি দরজা খুলেছিল সে তাদের দেখে যেন হতবাক। চটপট ভেতরে ঢুকে নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই অনেকগুলো গলা থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারিত হল। তারপর একসঙ্গে অনেকেই কথা বলে উঠল। অন্তত জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ মাচার ওপরে স্তূপের মত বসেছিল। তারা আনন্দদের দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত। নিচে আগুন জ্বলছে। জঙ্গল থেকে কেটে এনে সঞ্চয় করে রাখা কাঠ এখন ওদের উত্তাপ দিচ্ছে। যুবকটি ওদের আগুনের কাছে নিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে দেহে সাড় এল। জীবনে প্রথমবার আনন্দ অনুভব করল শরীরে রক্ত চলাচল করার অনুভূতি কি রকম। দাঁতের কাঁপুনি থামেনি কিন্তু এখন অনেক কম। আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'পালদেমরা কোথায়?'

যুবকটি মাথা নাড়ল, 'আমরা জানি না। বরফঝড় শুরু হওয়ার পর আমরা ক'জন এখানে এসেছি।'

একজন বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল, 'তোমরা এই ঘর বানিয়ে দিয়েছ বলে আমরা বেঁচে গেলাম। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

জয়িতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে শরীর নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঝড় কখন থামবে?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'জানি না, এবার সবই অদ্ভুত। আমি জ্ঞান হবার পর এমন মারাত্মক ঝড় দেখিনি। এত বরফ ঝড়ের সঙ্গে কখনও পড়েনি।'

আনন্দ যুবকটির দিকে তাকাল। এরা এখানে কি খাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র। যৌথগৃহের সব আয়োজন শেষ করার সময় পাওয়া যায়নি। ঝড়টা এসে পড়েছে আচমকা। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরাপদ কিনা। সে জয়িতাকে বলল, 'যতই ঝড় উঠুক একবার গ্রামটা ঘুরে আসা উচিত। মনে হয় কেউ বিপদে পড়তে পারে। তুই বরং এখানে থাক। ওদের ভাবতে দে আমরা ওদের সঙ্গে আছি। কোন আপত্তি আছে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'বেঁচে গেলাম। ওই ঠাণ্ডায় আমি আবার বের হলে বেঁচে থাকতাম না।'

আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাহুন কোথায়?'

যুবক বলল, 'মন্দিরে। মন্দিরে ঝড় ঢোকে না।'

আনন্দর মনে হল শেষ তিনটে শব্দ খুব স্বাভাবিক গলায় বলা হল না। কাহুনের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার ব্যাপারে এই যুবকের নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। কিন্তু এখনই সে ওকে প্রশ্রয় দিল না। সে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা ঝড়ের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। কিন্তু গ্রামের অন্য মানুষেরা কি অবস্থায় আছেন তা আমাদের দেখা কর্তব্য। আপনাদের মধ্যে যেসব যুবক শক্ত এবং সমর্থ তাঁরা আমার সঙ্গে আসুন।'

গুঞ্জন উঠল। আনন্দর চোখ তিন-চারজন যুবকের ওপর ছিল। তারা ইতস্তত করছে। মাচার ওপর গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল, প্রস্তাবটা শোনামাত্র সামান্য নড়ল। যে বৃদ্ধ আগবাড়িয়ে কথা বলছিল সে বলল, 'কি হল, কেউ মাচা থেকে নামছে না যে? বাইরের মানুষরা ঘর থেকে ঝড়ে বের হতে পেরেছে আর আমাদের হাত পা কি শরীরে ঢুকে গেল! কি হল?'

আর একটি বৃদ্ধার গলা শোনা গেল, 'সবাই ঠিক আছে। নইলে এই ঝড়ে তারাও আশ্রয়ের খোঁজে আসত।'

আনন্দ জবাব দিল, 'আপনি হয়তো ঠিক বলছেন মা কিন্তু তবু আমাদের নিজের চোখে দেখে আসা উচিত।'

সম্ভবত মা শব্দটি কানে যাওয়ায় বৃদ্ধার গলার স্বর পালটে গেল, 'তা ঠিক, ঠিক। এই ছেলেরা, তোরা এখানে বসে আরাম করছিস, একটুও লজ্জা করছে না? তোদের বয়সী ছেলেমেয়েগুলো বাইরে

বেরিয়ে আমাদের জন্যে কষ্ট করছে আর তোরা—, নাম, নাম!' বৃদ্ধার ঝাঁঝালো গলায় কাজ হল। তিন যুবক কোনরকমে শরীর মুড়ে নেমে এল এবং আসাটা যে নিতান্তই অনিচ্ছায় তা বোঝা যাচ্ছিল ওদের মুখের চেহারায়। আনন্দ ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না। দরজা খুলে সে এবং চারজন যুবক বেরিয়ে এল। যে যুবকটি প্রথম দরজা খুলেছিল সে এখন তার পাশে, পেছনে তিনজন। সোঁ সোঁ করে হাওয়া চলছে। বাতাসে যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার মিশছে তা কয়েক পা হাঁটতেই বোঝা গেল। শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম যে ঘরটিকে মুখথুবড়ে পড়ে থাকতে দেখল সেটার সামনে দাঁড়াল ওরা। সঙ্গী যুবকটি নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। কিন্তু সেই চিৎকার বেশিদূর পৌঁছানোব কথা নয় হাওয়ার দাপটে। কাঠের স্তূপ কোনমতে সরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই ওরা চমকে উঠল। একটি শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অনড়। মুখে চমৎকার শান্তি। যুবকটি দু'হাতে তাকে ধাক্কা দিয়ে হাঁউমাউ করে উঠল। মধ্যবয়স্কা মহিলাটিব ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়। আনন্দ যুবকটিকে টেনে তুলল। এই মাজাভাঙা ঘরে আর কোন মানুষ নেই। বোঝাই যাচ্ছে কাঠ চাপা পড়ে প্রৌঢ়া মারা গিয়েছেন। ওর পেটের ওপর থেকে এখন স্তূপটাকে সরিয়ে নেওয়ার কোন মানে হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য তিন যুবকের মধ্যে আচমকা পরিবর্তন আনল। এই দুর্যোগ মৃত্যুর কারণ হয়েছে জানার পর যেন তাদের সঙ্কোচ দূর হল। যতটা সম্ভব চটপট পায়ে তারা পরের ঘরে আঘাত করল। ভেতর থেকে সাড়া মিলল, 'কে?'

যুবকটি বলল, 'তোমাদের যদি এখানে থাকতে অসুবিধে হয় তাহলে নতুন ঘরে চলে যাও, সেখানে আরামে থাকতে পারবে।'

খানিক পরে এই ঝড়ের মধ্যে এক চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হল। দলে দলে ছেলেবুড়ো ছুটছে মাথা নিচু করে যৌথগৃহের দিকে। যে ক'টি যৌথগৃহ এই গ্রামে বানানো হয়েছিল তা সম্ভবত এতক্ষণে ভরে উঠেছে। যাওয়ার আগে সবাই অবাক চোখে আনন্দকে দেখছিল। পালদেমের ঘরের সামনে এসে আনন্দ চিৎকার করল। এই সময় সে আবিষ্কার করল বিপরীত আবহাওয়া প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেবার পর সহনীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এখনও অবশ্য ঠাণ্ডা লাগছে, ঝড়ে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেই কাঁপুনিটা নেই। ভেতর থেকে পালদেমের গলা পাওয়া গেল, 'কে, কে ডাকে?'

'দরজা খোল, আমি আনন্দ।' আনন্দ এবার আঘাত করল।

দরজা খুলল পালদেমের বউ। আনন্দকে দেখে সে চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। ভেতরে আসামাত্র বউটি হাঁউমাউ করে কিছু বলতে লাগল। পালদেম যে নেশায় চুর হয়ে বসে আছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরে আগুন নেই। বউটিও মদ খেয়েছে। বাচ্চাটা কুঁকড়ে একপাশে পড়ে আছে ছেঁড়া জামাকাপড় জড়িয়ে। একটা জীর্ণ কম্বল তার শরীরের ওপর চাপানো। আনন্দ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর দু'হাতে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। ওর ভারী শরীর কিন্তু ঠাণ্ডায় যে কাতর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এই সময় যুবকদের একজন এসে পৌঁছতেই আনন্দ তাকে বলল, 'এর মাকে নিয়ে এস যেখান থেকে তোমরা এসেছ।' তারপর মাথা নিচু করে দৌড়াতে লাগল ঝড়ের তাণ্ডব বাঁচি[illegible]। বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর আনন্দ ছুটন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল, দুটো কচি হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর মানুষের শরীরের উত্তাপ আনন্দকে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত করল। এই আরামের কোন বিকল্প নেই। পথ বেশি দূরের নয় কিন্তু আনন্দর কাছে যেন ফুরাতেই চাইছিল না।

ভেতরে ঢোকামাত্র জয়িতা এগিয়ে এল। আনন্দ কোনরকমে ওর হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে বলতে পারল, 'একে বাঁচা'। প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে জয়িতা বাচ্চাটাকে আগুনের পাশে রাখল। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট। মুখ নীরক্ত। সে উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল পরম মমতায়। এখন বৃদ্ধরা তার আশেপাশে। তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছিল কি করা উচিত এক্ষেত্রে। আনন্দ দম নিল। ঘর গিজগিজ করছে। মাচা নয়, এখন মাটিতেও মানুষ। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে দুধারে। সঞ্চিত কাঠ নিয়ে আসছে কেউ কেউ। এখন বেহিসাবী খরচ করা ঠিক নয়। কিন্তু কথাটা বলাব সময়ও এটা নয়। এই সময় যুবকরা বাচ্চাটির মাকে নিয়ে এল। একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে সে। এখনও তার হাবভাবে নেশার প্রতিক্রিয়া আছে। আনন্দ

আবার বেরিয়ে এল। এবং আসতেই পালদেমকে দেখতে পেল। পালদেমের পা টলছে এবং সেটা যে ঝড়ের দাপটে নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। আনন্দকে দেখামাত্র পালদেম বলল, 'আমার বাচ্চা-বউকে চুরি করে নিয়ে গেছে, মার শালাকে, মার।'

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠে গেল মাথায়। আনন্দ হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে পালদেমের শরীরটা বরফের ওপর আছড়ে পড়ল। যে-যুবকটি পালদেমের বউকে নিয়ে গিয়েছিল যৌথগৃহে সে বেরিয়ে এসেছিল এই সময়। পালদেমের অভিযোগ তার কানে পৌঁছেছিল। তাই ওর পড়ে যাওয়া দেখেও হাসি সামলাতে পারল না সে। বরফের ওপর পড়ে গিয়ে এখন পালদেম টানটান হয়ে শুয়ে আছে। আনন্দ যুবকটিকে বলল, 'ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাও। এখানে পড়ে থাকলে জমে যাবে।' যুবকটি চটপটে পায়ে কাছে গিয়ে পালদেমের হাত ধরে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল। তাপল্যাঙের বেশির ভাগ মানুষ যৌথগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের ঘর মজবুত তারা সেখানেই থেকে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা আপাতত চার। অবশ্য ঝড় থামলে সঠিক বোঝা যাবে। শেষ যাকে আবিষ্কার করল তাকে আশা করেনি কেউ। নিজের ঘরের খুব কাছাকাছি জমে থাকা বরফে মুখগুঁজে শরীরটা পড়েছিল। আবিষ্কৃত হওয়ার পর চেঁচামেচি করে সবাই ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে এল। প্রায় লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে পালার দেহ। আনন্দ দেখল, মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র তামাম তাপল্যাঙ চোখের জল ফেলছে। কেউ কেউ গলা খুলে কাঁদছে। যৌথগৃহের মাহিলারা সুর করে একটানা কাঁদতে আরম্ভ করল। পালা এই গ্রামের প্রধান। অন্যতম বয়স্ক ব্যক্তি। জরা তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষটাকে সবাই পালার সম্মান দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝড় শুরু হওয়ার পর যখন তার ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন পালা আশ্রয়ের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার শরীরের ওপর তুষার জমে ওঠায় চট করে কারও নজরে পড়েনি।

যৌথগৃহের আগুন এখন অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। সবাই তার চৌদিকে ভিড় করছে। কিন্তু আনন্দ ঢোকামাত্র কেউ কেউ তাকে আগুনের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিল। নিজেকে কোনরকমে সেখানে নিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বুকভরে বাতাস নিতে লাগল সে। মনে হচ্ছিল শরীরে একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। তার নাক দিয়ে অসাড়ে জল পড়ছিল। মুখের খোলা জায়গাগুলোতে কোন সাড় নেই। এই যৌথগৃহে এখন কান্না এবং শিশুদের চিৎকার সমানে চলছে। এই সময় একটা হাত আনন্দর কাঁধে উঠে এল। আনন্দ তাকাচ্ছিল না। আগুনের গনগনে তাপ শরীরে ছড়িয়ে দিতে উন্মুখ ছিল সে। হাতের মালিকের গলা শুনতে পেল সে, 'তোমরা যা করলে তার তুলনা নেই। প্রত্যেক বছর শীত শুরু হবার ঝড়ে অন্তত জনা সাতেক বুড়োবুড়ি মরে যায়। তোমরা আমাদের বাঁচালে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

এবার আনন্দ চোখ তুলল। ভেনা। পালদেমের ভগ্নীপতি। এই ভেনাই সেদিন অসহযোগিতা করেছিল। তাপল্যাঙের সচ্ছল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু ভেনা কেন যৌথগৃহে? ধরেই নেওয়া যায় ভেনার ঘরবাড়ি অনেক মজবুত। কিন্তু আনন্দ কোন কথা বলল না। আসলে কিছু বলার মত শক্তি সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এত তীব্র ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার ধার সে কোনদিন কল্পনাতেও আনেনি। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এই প্রকৃতি অচেনা। এবং যা অচেনা তাই অবাস্তব নয়। কলকাতার ঠাণ্ডায় যারা 'দারুণ শীত' বলে অভ্যস্ত তাদের কাছে এই আবহাওয়ায় মৃত্যু স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আর এক ধরনের সুখ চুঁইয়ে আসছিল আনন্দর মনে, সে অন্তত গ্রামের লোকগুলোকে আপাতত একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছে।

এখন দুপুর। হাওয়া কমেছে। তুষারমাখা ঠাণ্ডা বাতাস গুনগুনিয়ে ফিরছে। এই চেহারা দেখলে কে বলবে যে গত তিন রাতে কি ঘটেছিল! এখন বরফ পড়ছে না। জয়িতা শেষ পর্যন্ত পালদেমের বাচ্চাটাকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে ঘুমাতে দেখল। পালদেম আর তার বউ এখনও মড়ার মত পড়ে আছে। এই যৌথগৃহের অনেকেই মদ খেয়েছে। বস্তুত শীতের হাত থেকে বাঁচার সহজতম হাতিয়ার এদের কাছে মদ। যে বাচ্চাগুলো ঘ্যানর ঘ্যানর করছে তাদের যে খিদে লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মায়েরা প্রায় নির্বিকার। বৃদ্ধরা পালার শোকে কেঁদে চলেছে এখনও। এই কান্না চলবে যতক্ষণ পালার শরীর মাটির ওপরে থাকবে। জয়িতা আনন্দকে খুঁজল। আনন্দ বসে আছে যে ভঙ্গিতে তা দেখে

আপাতত ওকে না ডাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। তারপর তিনজন যুবকসঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বের হল। চমৎকার হলদে রোদ নেতিয়ে আছে বরফের ওপরে। আকাশের ফাঁক গলিয়ে সূর্য আপাতত এটুকুই তাপল্যাঙকে দিতে পারছে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত পাহাড় আর তার গায়ের বরফগুলো হলুদে মাখামাখি এখন। আর এসব দেখার মুহূর্তে জয়িতার কল্যাণের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর একটা মোচড়, টপটপ করে জল ঝরতে লাগল গাল বেয়ে। এই কান্নার একটুও প্রস্তুতি ছিল না। এই সময় হালকা হিম-বাতাস বয়ে যেতেই দুটো গাল জুড়িয়ে গেল। ফেটে যাওয়া চামড়ায় একটা নরম আরাম ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেটা টের পেতেই বুক নিংড়ে নিঃশ্বাস বের হল।

বাকি যৌথগৃহগুলোয় মানুষ উপচে পড়ছে। লা-ছিরিঙ একা তাদের দেখাশোনা করছে। জয়িতাকে দেখতে পেয়ে সে লাল দাঁত বের করে হাসল, 'আরও তিনটে এই রকম বাড়ি তৈরি করলে ভাল হত।'

জয়িতা বলল, 'আমাদের তো ধারণাই ছিল না। তোমার দেখা পেয়ে ভাল হয়েছে। আমরা যেসব চাল ডাল কিনে রেখেছিলাম সেগুলো বের করে রান্নার ব্যবস্থা কর! সন্ধ্যের আগেই প্রত্যেককে খাবার দিয়ে দাও।'

লা-ছিরিঙ মাথা নাড়ল, 'আমি এই কথাই ভাবছিলাম।'

হাওয়া বন্ধ হতে অনেকেই বেরিয়েছে যৌথগৃহ ছেড়ে। জয়িতা লক্ষ্য করল যে মানুষই তার সামনে পড়ছে সে-ই খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। যারা ঘর ছেড়ে বের হয়নি এবার তাদের খোঁজ নেওয়া শুরু হল। বৃদ্ধরা বলছে আজ রাত্রে আরও ভারী বরফ পড়বে। অতএব এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু যারা ঘরে রয়ে গেছে তারা জানে আপাতত কোন বিপদ নেই। তাদের উনুনে আগুন পড়েছে। স্পষ্টত এখন গ্রামে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু জোর করে এক করার চেষ্টা বোকামির নামান্তর হবে। সে প্রত্যেক দরজায় গিয়ে বলে এল যদি কোন অসুবিধে হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় যেন সবাই যৌথগৃহে চলে যায়।

এই সময় কাহুনকে দেখতে পেল সে। শিষ্যদের পেছনে নিয়ে তিনি মন্দির থেকে নেমে আসছেন। তাঁকে দেখে সবাই জড়ো হল। কাহুন ঘোষণা করলেন পালার অন্ত্যেষ্টিকাজ আগামীকাল হবে। তারপর তিনি তাকালেন জয়িতার দিকে। এক মুহূর্ত যেন চিন্তা করলেন। তাঁর শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি চাও? নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই গ্রামের মানুষদের সাহায্য করছ কেন?'

জয়িতা বলল, 'এই গ্রামের মানুষরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয়দাতারা আমাদের বন্ধু।'

'খুব ভাল উত্তর। কিন্তু তোমাদের জন্যে পুলিস এসেছিল এই গ্রামে। আমিও জীবনে পুলিশ এই প্রথম দেখলাম। শুনেছি তারা একবার আসলে বার বার আসে। আবার এলে কি হবে?' কাহুনের মুখে হাসি।

এবার লা-ছিরিঙ জবাব দিল। তার গলায় যেন ঝাঁঝ মেশানো, 'এবার এলে আমরা সবাই লড়াই করব। আমাদের এই পাহাড়ে বাইরের পুলিশ কি করতে পারে! এরা না থাকলে আজ আমরা কোথায় যেতাম বলতে পারেন?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাহুন, আপনি ঈশ্বরের সেবক। সত্যি কথা বলছি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে। এই গ্রামের মানুষরা যদি মানুষের মত বাঁচার পথ খুঁজে পায় তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব মূল্যবান হবে। আপনার ঈশ্বর কি চান না যে এরা মানুষের মত বেঁচে থাকুক!'

কাহুন মাথা নাড়লেন। কি যেন বিড়বিড় করে বললেন। বোঝা গেল তিনি জয়িতার কথার অর্থ ধরতে পারছেন না। যাওয়ার আগে বললেন, 'মৃতদের নিয়ে এস মন্দিরে। ওদের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে।'

শুধু চাল এবং ডালের ঘ্যাঁট যে মানুষের কাছে উপাদেয় লাগে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। জয়িতার গলা দিয়ে বস্তুটাকে নামাতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ক্ষুধা এমন জিনিস যে শরীরকে বাধ্য করে একটু রসের লালা নিঃসরণ করাতে, যা খাদ্যদ্রব্যটিকে পেটে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অথচ চারপাশের মানুষ গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে। সেই সম্মিলিত শব্দ শুনতে শুনতে জয়িতার মনে হল এই মানুষগুলো পৃথিবীর অনেক লোভনীয় খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। যারা বছরে এক-

আধবার চালের স্বাদ পায় তাদের কাছে এই খাবার অমৃত। আসলে আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের মনে অসন্তোষের বীজ বোনে।

আনন্দ এখন সহজ। কিন্তু সামান্য কাশি হয়েছে ওর এর মধ্যেই। জয়িতা ওকে বলল, 'তুই আজ এখান থেকে বের হোস না। আমি একবার আস্তানা থেকে তোর বিছানা আর ট্যাবলেট এনে দেব।'

'ট্যাবলেট কি হবে?' আনন্দ হাসল।

'বলা যায় না, এ যা ঠাণ্ডা কি থেকে কি হয়ে যায়!' জয়িতার আবার কল্যাণের মুখ মনে পড়ল। ওর পাঠানো ওষুধের ঝোলায় ঠাণ্ডা থেকে তৈরি জ্বর এবং কাশির ওষুধ ছিল।

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। অনেকক্ষণ সুদীপের খবর পাইনি। ওরা কিছু খেল কিনা তাও জানি না। কাউকে পাঠালে ভাল হয়।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই। আস্তানায় যা আছে তাই দিয়ে মেয়েটা খাবার বানিয়ে নিতে পারবে। এখন কি কি কাজ বাকি আছে চিন্তা কর।'

আনন্দ চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, 'লোকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। একটাতে বাচ্চা আর মেয়েরা থাকবে। আর একটায় বুড়োবুড়ি। জোয়ানরা আলাদা। মেয়েদেব একটা দল তৈরি করে তাদের ওপর রান্না আর সেবাশুশ্রূষার ভার দে। বুড়োবুড়িদের আপাতত কোন কাজ করতে হবে না। আজ আর সম্ভব হবে না, কাল থেকে ছেলেদের নিয়ে কাজে বের হতে হবে আমাদের।'

লা-ছিরিঙ পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বাংলা বোঝে না। জয়িতারা কথা বলছিল বাংলায়। অতএব সে উদ্বিগ্ন মুখে শুনছিল সব। শেষ হতে বলল, 'তিনটে মুরগি মারা গিয়েছে। একটা ছাগল খুব চোট পেয়েছে। যে মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে আছে তার ঘরে ওদের নিয়ে গিয়েছি। মুশকিল হল বরফ পড়ার পর ওদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায় বল তো?'

জয়িতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আনন্দ তাকে বাধা দিল, 'লা-ছিরিঙ, ওই জীবগুলো এই গ্রামের সম্পত্তি। ওদের সংখ্যা বাড়লে এই গ্রামের উপকার হবে। অতএব ওদের বাঁচিয়ে রাখা তোমাদের কর্তব্য। কিভাবে সেটা করবে তা তোমরাই ঠিক করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বলব এটা ঠিক নয়।'

লা-ছিরিঙ হাসল, 'আজ আমি ওদের ভাতডাল সেদ্ধ খেতে দিয়েছি।'

'না, তুমি অন্যায় করেছ।' আনন্দ রেগে গেল, 'তুমি অন্যায় করেছ। মানুষের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করা যেখানে কষ্টকর ব্যাপার সেই খাবার ওদের দেওয়া উচিত হয়নি। তুমি এখনই কিছু ছেলেকে পাঠিয়ে দাও জঙ্গলে। ছাগলরা যেমন পাতা খায় তা যেন সন্ধ্যের আগেই ওরা কেটে নিয়ে আসে। আর ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো মকাই-এর নষ্ট হয়ে যাওয়া দানা কার কাছে কত আছে। সেগুলো মুরগিদের জন্যে রাখ।'

লা-ছিরিঙ মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতে জয়িতা বলল, 'ওর ওপর ছেড়ে দিয়েও তো নিজে না বলে পারলি না। একটু আগে কাহুনের সঙ্গে কথা হল। আজ লোকটার হাবভাব ঠিক মনে হল না।'

চমকে উঠল আনন্দ, 'কেন? কি বলেছে কাহুন?'

'প্রশ্ন করছিল। কেন এসব করছি আমরা? পুলিশের দায় কে বইবে, এই সব।'

'লোকটাকে খাবার দেওয়া হয়েছে?'

'জানি না।'

'না দেওয়া হলে তুই নিজে দিয়ে আয়। এখনই ওকে চটানো ঠিক হবে না। এদের জন্ম-মৃত্যু ওই লোকটার সঙ্গে বাঁধা হয়ে আছে। এতবড় একটা দুর্যোগের পর বোধহয় কাহুন আশা করছিল গ্রামবাসীরা ওর কাছে প্রার্থনার জন্যে যাবে। আমার ভুলও হতে পারে, কি জানি।' শেষদিকে অন্যমনস্ক দেখাল আনন্দকে।

জয়িতা আর সময় নষ্ট করল না। একটা পাত্রে খাবার নিয়ে সে মন্দিরের দিকে রওনা হল। ধাপে ধাপে ওপরে উঠে সে দেখতে পেল শিষ্যরা মন্দিরের চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে একই খাবার খাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও খাবার পৌঁছে গেছে। জয়িতা ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই কাহুন বেরিয়ে এলেন শূন্য পাত্র হাতে। এবং তখনই তিনি জয়িতাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়িতার মাথায় মতলবটা খেলে গেল। সে ধীরপায়ে কাহুনের সামনে গিয়ে পাত্রটা এগিয়ে ধরল। এক পাত্র শেষ করার পরও যে

কাহুনের তৃপ্তি আসেনি তা বোঝা গেল তিনি যে তৎপরতায় জয়িতার হাত থেকে পাত্রটি নিলেন তা দেখে। খেতে খেতে কাহুন মাথা নাড়লেন, 'আমাকে একথা বলতেই হবে যে তোমরা গ্রামের মানুষদের উপকার করছ। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

জয়িতা বলল, 'আজ সবাইকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। কাল ঠিক হয়েছে, যারা গ্রামের মানুষের জন্যে পরিশ্রম করবে তাদেরই খাবার দেওয়া হবে।'

'পরিশ্রম!' কাহুনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'কেন, পরিশ্রমের কথা উঠছে কেন?'

'যারা কাজ করবে না তাদের খাওয়ানো হবে না, তাই।'

'কাজ বলতে কি বোঝ তোমরা?'

'যা করলে গ্রামের মানুষের উপকার হবে তাই।'

এবার কাহুনের মুখে হাসি ফুটল, 'তাই বল। আমি যে প্রতিনিয়ত ভগবানের কাছে গ্রামের মানুষের জন্যে প্রার্থনা করে যাচ্ছি সেটাও তো একটা কাজ। গ্রামের উপকারের জন্যেই করা।'

জয়িতা বলতে যাচ্ছিল যে-উপকার চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না তাকে স্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু আনন্দর পরামর্শ মনে রেখে সে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পাত্রটি শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে কাহুন মালা জপতে জপতে ফিরে গেলেন ভেতরে। এঁটো হাত ধোওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আস্তানায় ঢোকার আগেই চমকে উঠল জয়িতা। তীব্র গন্ধটা নাকে লাগছিল। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই সে হতবাক হয়ে গেল। মেয়েটি হাসছে। মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। সুদীপ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই চেষ্টার সময়েই বোঝা যাচ্ছিল ও প্রকৃতিস্থ নয়। সুদীপ এমনিতেই আপাতত সুস্থ নয়। কিন্তু এই ভঙ্গি সেই ছবিটা থেকে ভিন্ন। চিলের মত ছোঁ মেরে মাটিতে পড়ে থাকা গ্লাসটা যে ক্ষিপ্রতায় সে তুলে নিল তা অনেকদিন সুদীপের কাছ থেকে আশা করেনি কেউ। দু ঢোক গলায় নিয়ে মেয়েটার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুদীপ। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আঃ!'

জয়িতা যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তা দুজনের কারোর লক্ষ্যে নেই। দুবার টলে সুদীপ হাঁটু মুড়ে আবার বসে পড়ল মাটিতে। তার মাথা এবার মেয়েটার পাশে এলিয়ে পড়তে সে সযত্নে তাকে তুলে নিল কোলে। তারপর ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল লাগছে? তোমার ভাল লাগছে?'

'খু-উ-ব। খু-উ-ব।' চোখ বন্ধ করে শব্দ দুটো বিভিন্ন স্বরে উচ্চারণ করে মাথা নাড়ল সুদীপ। জয়িতা আরও অবাক। এখন সুদীপের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। মেয়েটা সুদীপের কপালে হাত বোলাচ্ছে। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে ও মদ পেল কোথায়? বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি জোগাড় করে এনেছে। তীব্র মদ সুদীপের চেতনা মুছে দিয়েছিল। সেই মদই কি আবার চেতনা ফিরিয়ে আনছে? বিষে বিষক্ষয়? এই সময় মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট চেপে ধরল সুদীপের কপালে। হঠাৎ জয়িতা আবিষ্কার করল তার শরীরে রক্ত সচল হয়েছে। আচমকা অস্বস্তি হচ্ছে তার। সুদীপ পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে। মেয়েটি মুখ তুলল। আলতো হাত বোলাল সুদীপের গালে। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট ছোঁয়াল সুদীপের বন্ধ চোখের পাতায়। প্রথমে বাম তারপরে ডান। সুদীপ নড়ছে না। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মুখ তুলে মেয়েটি সুদীপের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খিলখিলিয়ে হাসল। সেই হাসির ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল তারও বেশ নেশা হয়েছে।

জয়িতা নড়তে সাহস পাচ্ছিল না। এই দৃশ্যকে অশ্লীল বলা যায় না। অথচ এককালে যা অবশ্যম্ভাবী বলে সে আশঙ্কা করেছিল তা চোখের সামনে দেখে স্থবির হয়ে পড়েছিল। সেইসঙ্গে তার মনে দ্বিতীয় একটা ইচ্ছে জন্ম নিল। সুদীপ সাড়া দিক, মেয়েটি যে কামনার আগুন জ্বালতে চাইছে তাতে উদ্দীপ্ত হোক। এবং তা হলেই ও স্বাভাবিক সুদীপে ফিরে আসবে। মেয়েটির বোধহয় দেখা শেষ হল। তার মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল সুদীপের ওপরে। খুব যত্নে সে নিজের ঠোঁট দুটো ছোঁয়াল সুদীপের ঠোঁটে। প্রথমে আলতো। তারপর নিচের ঠোঁট বোলাল। ওর সাপের মত জিভ দেখতে পেল জয়িতা এবং এই প্রক্রিয়ার পর সে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল ঠোঁট সুদীপের ঠোঁটে। যেন সুদীপের ঠোঁট কামড়ে তুলে নিতে চায় এমন মনে হচ্ছিল তার ভঙ্গিতে।

এবং তখনই ঝটপট করে উঠে বসল সুদীপ। দু'হাতে নিজের ঠোঁট ঢাকল। মুখ থেকে উচ্চারিত হল, 'আঃ!' শোনামাত্র মেয়েটি আবার খিলখিলিয়ে হাসল। হেসে মদের গ্লাস তুলে ধরল। সুদীপ সেদিকে একবার তাকাল। তারপর ঢকঢক করে তরল পদার্থটি গলায় চালান করে দিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' ঠিক এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না জয়িতা। সুদীপের চেতনা ফিরছে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু ও যে অত স্পষ্ট ইংরেজী বলতে পারবে এবং সেই একই ভঙ্গিতে তা বিশ্বাসে ছিল না। ওর এত আনন্দ হচ্ছিল যে ছুটে গিয়ে সুদীপকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তৃপ্তি পেত। সুদীপ সুস্থ হওয়া মানে জীবনটাকে সচল দেখা।

মেয়েটা সুদীপের ইংরেজী বুঝতে পারল না। কিন্তু ওই প্রশ্ন উচ্চারণ করার ধরন হয়তো অনুমান করতে পারল। সে চোখ বন্ধ করে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দুটো ঠোঁট তুলে ধরল। সুদীপ এক মুহূর্ত তাকিয়ে বলল, 'গুড।' তারপর দায়সারা গোছের একটা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দ্যাটস এনাফ।' কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র তার শরীর টলতে লাগল। নিজের মনে সুদীপ বিড়বিড় করল, 'যাঃ শালা! আই অ্যাম ড্রাঙ্ক? শী ওয়ান্টস টু স্লিপ উইথ মি! শুড আই? কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। লুক, আই হ্যাভ নেভার স্লেপ্ট বিফোর। আমি যে শোব কিন্তু আমার বন্ধুরা কি বলবে? আনন্দ, কল্যাণ—!' হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। মাটিতে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েটি এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে তার মুখ থেকে সমস্ত বাসনার চিত্র উধাও হয়ে গেল। দূর থেকেই সে সুদীপের পায়ের ওপর একটা হাত আলতো করে রাখল। জয়িতার মনে হল ওই হাতের যে স্পর্শ তা যে কোন মায়ের হতে পারত।

বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তি পেল জয়িতা। যাক, সুদীপ এখন সুস্থ হয়েছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, ওই মেয়েটির সঙ্গে সুদীপ কাল নয় পরশু শারীরিক সম্পর্কে আসবে। এটা ন্যায় না অন্যায় সে জানে না। মেয়েটি যে দিনের পর দিন সুদীপের সেবা করে গেছে তা সবাই দেখতে পেয়েছে। সুদীপও সেটা জানে নইলে বলত না কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। হঠাৎ মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গেল জয়িতার। সটান ফিরে এল আস্তানায়। শব্দ করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, 'কি অবলার মত কাঁদছিস! তোর লজ্জা করছে না?'

মুখ তুলে তাকাল সুদীপ। তার মুখে হাসি ফুটল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, 'এই যে জোয়ান অফ আর্ক এসে গেছে! নাকি লক্ষ্মীবাঈ! আমি কাঁদছি তো কার কি? তুই তো একটা মরুভূমি, এক ফোঁটা জল নেই যে কাঁদবি। তাকাচ্ছিস কি, তুই কাঁদতে পারিস?'

জয়িতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, 'আমি মরুভূমি!'

'নোস?' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সুদীপ, 'তাহলে দাঁড়া। দেখি তোকে।'

কোনরকমে এগিয়ে এল সুদীপ। তারপর জয়িতার মুখের দিকে ঝুঁকে সোজা হয়ে হাসল। একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে জয়িতার চিবুক থেকে কিছু তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল, 'এটা কিরে? ভাত? তুই এখানে এসে জংলী হয়ে গেছিস জয়! খেয়েদেয়ে মুখ ধুতে হয় ভুলে গেছিস! আমাকে তোর খুব ঘেন্না দিতে ইচ্ছে করছে, না?'

'বাংলাটা ঠিক করে বল্। মরুভূমি দেখলি?'

মাথা নাড়ল সুদীপ। তারপর বলল, 'তোর দুটো হাত আমার গালে রাখবি জয়?'

নাড়া খেল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে সে দুটো হাতে সুদীপের মুখ ধরল। পবিত্র আলো ফুটে উঠল সুদীপের মুখে, 'আঃ! জন্মদিনে এত আরাম কখনও পাইনি রে!'

শীত এখন তুঙ্গে। পায়ের তলায় বরফের শরীর কাঠ। আস্তানার ছাদে তো বটেই, মাঝে মাঝে সিঁড়ির প্রথম ধাপেও বরফ উঠে আসে। ঝড় বা বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বয়ে যায় তখন বরফের শরীরে আঁচড় পড়ে।

কিন্তু একটা পবিত্র রোদ তাপল্যাঙের ওপর মশারি টাঙিয়ে রাখে। শিশুরা সেই রোদে তুষার-বল নিয়ে খেলা করে, অশক্ত মানুষেরা আর একটা বছরের আশা নিয়ে সেই রোদে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। এই সব মানুষের অঙ্গে শীতবস্ত্র বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না য়ুরোপ আমেরিকার নির্বান্ধব কোন গ্রাম্য মানুষেরও। অথচ এরা বেশ আছে, অন্তত শীতের কষ্ট প্রবল একথা কেউ মুখ ফুটে বোঝায় না।

আনন্দ সুদীপ এবং জয়িতা এতদিনে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে পেরেছে তাপল্যাঙের মানুষকে। আরাম পেতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখের জন্যে যে একক পরিশ্রম তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না এ সত্য তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে। যৌথগৃহেব সংখ্যা এখন বেড়েছে। মেয়ে শিশু এবং বয়স্ক মানুষেরা অনেক নিরাপদ বোধ করছে এখন। এমন কি সবল পুরুষেরা অনেক বেশি সহজ। শীতের সময় যখন একটা দিন কাটাতেই আর একটা দিনের শীতল নিঃশ্বাস গায়ে কনকনানি তোলে তখন এই যৌথগৃহে পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। বরফ গললে যদি প্রাণ চায় তাহলে যে যার গৃহে ফিরে যাবে। নিজস্ব সংসারের টান যে বড় গভীরে তা বোঝা যায় এখন এই শীতের সময়েও মেয়েপুরুষেরা নিজেদের ঘর রোজ ঠিকঠাক করে আসে। নিজস্ব ঘরের এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারলে ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডিটাকে দূর করা যেত। কিন্তু আনন্দ প্রথম থেকেই এত বড় আঘাতটা করতে চাইল না। এক শীতে অনেকটাই হল, আর এক শীত এলে এই তলানিটুকু দূর হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ঠিক, মানুষগুলো এর মধ্যে বুঝতে পেরেছে এভাবে কেউ জন্মাবধি নিশ্চিন্তে থাকেনি। কারও বাচ্চার অসুখ হলে অন্যের মা যে স্নেহের হাত বাড়ায়, সকাল-সন্ধ্যে পেট ভরাবার খাবার আসে যৌথ রান্না হয়ে, প্রবল শীতেও গায়ে উত্তাপ লাগে—এ তো স্বপ্নের মতো ব্যাপার কারও কারও কাছে।

কিন্তু সম্পন্ন নয় মানুষের সঙ্গে অন্তত দশটি পরিবার মেলেনি। তারা তুষারঝড়ের সময় থেকেই আলাদা, মজবুত ঘরের দরজা খুলে যৌথগৃহের জোয়ারে গা মেশায়নি। এদের সবাই যে খুব আরামে আছে তা নয়, কিন্তু নিজেদের আলাদা দেখাবার একটা অহঙ্কারে ভুগছে। নিজস্ব মুরগী, ছাগল এবং সঞ্চিত শস্য নিয়ে কোনরকমে থেকে যাওয়া। এদের বিরক্ত করতে চায়নি আনন্দ। কিন্তু গ্রামের মানুষ এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে ওরা আলাদা। বহুযুগ একসঙ্গে থেকেও এতদিন এই বোধের শিকার হয়নি ওরা। এখন অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষ্যম্যের ফসল হিসেবে দুটো জাত চিহ্নিত হল। সংঘাত শুরু হয়নি কিন্তু কথাবার্তায় খোঁচা দেবার প্রবণতা এসেছে। যৌথ রান্নাঘরের দায়িত্ব জয়িতার। যুবতী মেয়েদের নিয়ে সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়ে যায়। খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে কেনা খাদ্যসামগ্রী এখন শেষের দিকে। সুদীপের টাকা যা এখনও রয়ে গেছে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই বরফ ডিঙিয়ে খচ্চরওয়ালারা আসবে না। আজ অবধি বরফের সময় কেউ ওয়ালাংচুঙ কিংবা চ্যাঙথাপুতে কখনও যাওয়ার চেষ্টা করেনি। প্রাথমিক ইতস্ততা কাটানোর পর যে যার ঘরে জমানো শস্য এনে দিয়েছে যৌথরান্নাগৃহে। যুবতী মেয়েরা এখানে বসে রান্না করে আর গল্প বানায়। জয়িতা লক্ষ্য করছিল অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের সংখ্যা এখানে খুবই কম। বিবাহিতারা গল্প করে আর হাসে। আর সেই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের হাসি আরও বেড়ে যায়। নিমকিত নামের যুবতীটি বলল, 'ইনামিত বলছে ওর স্বামীর চেহারাটা ঠিক কিরকম তা এখন ভুলে গেছিল ও। কাল এই ঠাণ্ডার মধ্যে ঝরনার ধারে গিয়ে সেটা আবার জেনে এসেছে। কথাটা শেষ হওয়ামাত্র সম্মিলিত হাসির ঝড় উঠল। ইনামিত নামের মেয়েটি একটুও লজ্জা পেল না। তার সন্তান সবসময় পিঠেই বাঁধা থাকে। জয়িতা তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেখে সে বলল, 'আমি

বাবা মাঝে মাঝে যাই। যদি তোমরা বন্ধ করতে বল তাহলে ভাঙাঘরেই ফিরে যাব।'

জয়িতা কোন মন্তব্য করল না। কলকাতায় থাকলে হয়তো তার জিভে প্রতিবাদ ফুটত। পুরুষের শরীর ছাড়া নারীর আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় এটা ভাবতেই তার মনে ঘৃণা ফণা তুলত। কিন্তু এই না-সুন্দর, না-সচ্ছলা মেয়েটির মুখে যে অহঙ্কারের আরাম সেটাকেই বা এখন অস্বীকার করে কি করে?

নিমকিত বলল, 'তুমি বিয়ে করবে না? অমন সুন্দর দুটো পুরুষ তোমার সঙ্গে থাকে, ওদের তো মারপিটও লাগে না। ওদের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার চলছে?' প্রশ্নটা শেষ হওয়ামাত্র আবার হাসির ঝড় উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্তের চলাফেরা টের পেল জয়িতা। সে কোনরকমে বলতে পারল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয়। আমরা বন্ধু।'

নিমকিত বলল, 'বন্ধু! ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় কখনও শুনিনি বাবা! ওরা তোমার সঙ্গে শুতে চায় না?'

জয়িতা রাগ করতে পারল না। এদের প্রশ্নের মধ্যে সারল্য স্পষ্ট। সে নিজেকে নিচে টেনে আনল যেন, 'আমরা এই নিয়ে কখনও ভাবিনি।'

ইনামিত বলল, 'এখন তো সব সোজা হয়ে গিয়েছে। তোমাদের যে বন্ধুর মাথা খারাপ হয়েছিল মদ খেয়ে সে তো একটা জাহান পেয়ে গেছে। তাহলে থাকল শুধু বড়সাথী। ওর মত ভাম মানুষটাকেই তুমি মায়ালু বানিয়ে নাও। মেয়ে হয়ে জন্মেছ আর পুরুষের স্বাদ নেবে না?'

জয়িতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, 'তার জন্যে তো অনেক সময় পড়ে আছে। আগে আমরা সবাই একটু ভালভাবে বাঁচি, তারপর।'

'ভালভাবে বাঁচা! তা আর এ জীবনে হবে না। তোমরা এসেছিলে বলে এখন দুবেলা খেতে পাচ্ছি।'

'কেন হবে না? সবাই মিলে কাজ করব, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন তা যোগাড় করব। এবার বরফ গললেই এমন সব জিনিস তৈরি করতে হবে যা শহরে নিয়ে গেলে লোকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হবে। সেই টাকা দিয়ে জামাকাপড় খাবার ওষুধ কিনে নিয়ে আসা হবে। আমাদের সবসময় ভাবতে হবে এই গ্রামের সবাই এক পরিবারের।'

জয়িতা কথা শেষ করতেই নিমকিত বলল, 'এসব কথা তো কেউ বলেনি। দেখা যাক, তোমরা রাস্তা দেখাচ্ছ, রাস্তাটা যদি ঠিক হয় তাহলে মন্দ কি!'

এই সময় একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উত্তেজিত গলায় খবর দিল একটা ইয়াকের বাচ্চা হয়েছে। আর বাচ্চাটা মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই ছুটতে লাগল কাহুনের মন্দিরের দিকে। নিমকিত ধরে নিয়ে এল জয়িতাকে। ভিড় জমে গেছে সেখানে। এরই মধ্যে কাহুনের শিষ্যরা বিশাল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছে। সদ্যজাত ইয়াক শিশুটি এখনও পা-সোজা করতে পারছে না। তার শরীর পরিষ্কার করছে মা চেটেচেটে। এই ভিড়, যন্ত্রের আওয়াজে বিন্দুমাত্র ভীত নয় সে। বরং এই গ্রামের মানুষের জন্যে একটা শুভকাজ সে করতে পেরেছে বলে হয়তো আন্দাজও করতে পেরেছে। জয়িতার অন্তত ওর ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হল। হঠাৎ একটা গলা চিৎকার করে উঠল, 'এই যে এতদিন পরে একটা মেয়ে ইয়াক জন্মাল, কেন জন্মাল কেউ জানো?' জয়িতা ছেলেটাকে চিনতে পারল। তুষারঝড়ের সময় খুব পরিশ্রম করেছিল ছেলেটা। ব্যবহার বেশ ভাল। আনন্দ বলে এই রকম ছেলে কয়েকটা পেলে আর চিন্তা নেই। ওর নাম সাওদের।

সাওদেরের কথার জবাব কেউ দিতে পারল না। সে আবার গলা তুলল, 'ইয়াকের বংশ তো এই গ্রাম থেকে লোপ পেয়েই যাচ্ছিল। এবার আমাদের নতুন সাথীরা এসেছে বলেই ভগবান মুখ তুলল।'

একসঙ্গে সবকটা দৃষ্টি পড়ল জয়িতার ওপরে। সবাই খুশিতে গুঞ্জন শুরু করল। কাহুন বললেন, 'আমি জানতাম এবার মেয়ে বাচ্চা হবে। ভগবান আমাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন।'

গুঞ্জনটা থামল। বিপরীত দুটো বক্তব্যের কোন্‌টে সত্য তা নিয়ে ফাঁপরে পড়ল যেন সবাই। জয়িতা

ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। এ সবই সংস্কার। মেয়ে-ইয়াকের জন্ম হওয়া প্রাকৃতিক ব্যাপার, এ তথ্য এদের বোঝানো মুশকিল। আর তাই কাহুনরা চিরকাল বহালতবিয়তে বেঁচে থাকেন।

আনন্দ এখন গ্রামে নেই। ভোরেই ও বেরিয়ে গেছে পালদেম লা-ছিরিঙদের সঙ্গে নিয়ে। খানিকটা নিচে চমৎকার জ্বালানি কাঠ ছড়ানো আছে। সেগুলো কেটে কেটে আনা দরকার। কাঠের সঞ্চয়ে টান পড়েছে। সুদীপের ওপর দায়িত্ব ছিল মুরগী-ছাগলগুলোর জন্যে বড়সড় একটা খাঁচা তৈরি করার। কয়েকটা ছেলে বরফ সরিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জয়িতা জানতে পারল সুদীপ একটু আগে একজনকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। বুনো চমরির একটা ঝাঁক নাকি এসেছে এদিকে। যদি দু-তিনটেকে মারতে পারে তাহলে সারা গ্রামের মানুষের পেটে মাংস পড়বে। ব্যাপারটা জয়িতার কাছে হঠকারিতার সমান মনে হল। চেতনা স্বচ্ছ হওয়ার পর সুদীপ আরও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে। বন্য জন্তুগুলোকে না মেরে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি ধরতে চেষ্টা করত তাহলে আখেরে বেশি কাজ দিত। জয়িতা আস্তানায় ফিরে দরজা বন্ধ দেখল। সেই মেয়েটিও নেই—সুদীপের জাহান। আজকাল সব সময় সুদীপের সঙ্গে লেপটে থাকে ও। প্রথম দিকে যৌথরান্নায় হাত লাগাতে গিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু গ্রামের অন্য মেয়েরা তাকে প্রায় স্পষ্টই বলেছে ওখানে অনেক লোক, মেয়েটির সাহায্যের দরকার নেই। এখন বস্তুত গ্রামের অন্য মেয়েদের থেকে তাকে সবসময় আলাদা থাকতে হয়। এবং এজন্যে যেন ওর কোন আক্ষেপও নেই। সুদীপ যে কাজ করছে সেই কাজের সঙ্গী হচ্ছে সে আগবাড়িয়ে। সুদীপ ওকে ঠিক ভালবাসে কিনা বোঝা যায় না। যে গলায় কথা বলে তাতে আর যাই থাক ভালবাসা থাকে না। কিন্তু মেয়েটির ব্যবহারে কোন অস্পষ্টতা নেই। কাল রাত্রে সুদীপ আনন্দকে বলেছিল, 'আশা করি তোরা আমাকে ভুল বুঝছিস না। এ গ্রামের নিয়ম হল কোন নারীকে কেউ গর্ভবতী করলে স্ত্রীর সম্মান দিতেই হয়। এ জিন্দগীতে শালা আমার বিয়ে করার ধান্দা নেই, অতএব ঠিক আছি। মেয়েটার একটা শেলটার দরকার, দিয়ে যাচ্ছি।

জয়িতা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবং তখনই রামানন্দ রায়ের কথা মনে পড়ল ওর। বাবা কেমন আছে এখন? বাবার কি ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে? নাকি ওরা জেনে গেছে জয়িতা বেঁচে নেই! তাই বা হবে কেন? কল্যাণের মৃতদেহ পাওয়ার পর পুলিশ নিশ্চয়ই খবরের কাগজে কৃতিত্বের কথা বলেছে। কল্যাণের ভাইরা নিশ্চয়ই একটা লোকদেখানো শ্রাদ্ধ করেছে। আর যে পুলিশবাহিনী এখানে এসে শূন্য হাতে ফিরে গেছে তারা তিনজনের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছে। আর তাই জেনে রামানন্দ রায়ের কষ্ট কি খুব বেড়ে গেছে। ওর হঠাৎ মনে হল মদ খাওয়া পার্টিতে যাওয়া বা অন্য রমণীতে আসক্তি প্রকাশের নামে যে ফার্টিলাইজারের স্রোতে রামানন্দ রায় গা ভাসিয়েছিলেন সেটার পাশাপাশি আর একটা ভালবাসার কাঙালও বেঁচে ছিল। যেচে পরা মুখোশটা এত সেঁটে বসেছিল যে সেটা টেনে খোলা আর সম্ভব হয়নি। কি জানি হয়তো ভুল, এসব ধারণাই বেঠিক। হয়তো এর মধ্যে চলে যাওয়া সময়টা ভরিয়ে দিয়েছে মনের খাদগুলো। তবু একবার রামানন্দ রায় যখন মধ্যরাতে মাতাল হয়ে একাকী বসে থাকেন তখন সামনে আচমকা গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখখানা দেখতে বড় ইচ্ছে করে। এসব মাথার মধ্যে পাক খেতেই ওর হাসি পেল। সে একনাগাড়ে রামানন্দ রায়কে ভেবে চলেছে। অথচ সীতা রায়, তার মা? কল্যাণের একটা কথা মনে পড়ল, 'জানিস, আজকালকার মায়েরা না ঠিক মায়েদের মতন নয়, বলতে পারিস দিদির মত। ব্যবহারে চেহারায়। মা মা অনুভূতিটা যদি না আসে তো আর কি করা যাবে?' জয়িতা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন, তোর মা?'

'আমার মায়ের কেসটা আলাদা। অভাবের সঙ্গে লড়তে লড়তে ভদ্রমহিলাকে প্রায়ই বাড়িতে দলবদল করতে হয়। আর সেই কারণেই সন্তানদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হন।' কল্যাণের এই বক্তব্য কতটা সত্যি ছিল তা সে-ই জানত কিন্তু সীতা রায়কে স্মরণ করে আজ জয়িতার মনে হল এখন পাশে থাকলে সে ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করার চেষ্টা করত। মানুষ বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হয়, ঘরবদল করে যে আত্মিক অভাবের তাড়নায় সেটাকে বুঝতে চেষ্টা করত সে। এই কয়মাস, সময়ের হিসেবে কিছুই নয়, কিন্তু জয়িতার মনে হল অনেক দরজা তার কাছে খুলে গেছে।

জয়িতা পাশের পাহাড়ে চোখ রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রোলেনদের গ্রামে অনেকদিন

যাওয়া হয়নি। আনন্দ অবশ্য এখনই ওখানে কোন উদ্যোগ নিতে রাজী নয়। রোলেনদের অর্থনৈতিক অবস্থা অবশ্যই তাপল্যাঙের মানুষের চেয়ে ভাল। একসঙ্গে দু-জায়গায় পরিশ্রম করা তিনটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বরং সত্যি যদি তাপল্যাঙের চেহারা ওরা ফেরাতে পারে তাহলে রোলেনদের গ্রামের যারা নিঃস্ব মানুষ তারা নিজে থেকেই আকর্ষণ বোধ করবে। অন্তত একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত না রাখতে পারলে ওদের কাছে এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন। জয়িতা ভগবানের পবিত্র জল উদ্ধার করে দিয়েছিল শুধু এই কারণেই সম্পর্কটা এখন সহজ হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু করতে চাইলে সংঘাত হবে না তা কে বলতে পারে!

তবু জয়িতা পা বাড়াল। ওর মনে হল রোলেনদের গ্রামটায় একবার যাওয়া উচিত। এতে আর যাই হোক সম্পর্কটা ঠিক থাকবে। পায়ের তলায় বরফ এখন শক্ত ইঁট। সাবধানে না হাঁটলে পিছলে পড়তে হবে। এই সময় সে সাওদেরকে দেখতে পেল। দ্রুতগতিতে পাশে এসে সাওদের জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওভাবে চলে এলে কেন? আমি কি কিছু খারাপ কথা বলছি?'

'একটা ইয়াকের বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে কোন মানুষের সম্পর্ক থাকতে পাারে না।'

'বাঃ, তাহলে যে কাহুনও বলল, ভগবান ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তার বেলা?'

'সেই স্বপ্ন তো উনি ছাড়া কেউ দ্যাখেননি!'

'তার মানে তুমি বলছ কাহুন সত্যি কথা বলেন নি?'

'হয়তো তিনি যেটা বিশ্বাস করেন সেইটেই বলেছেন।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন?'

'রোলেনদের গ্রামের দিকে যাব ভাবছি।'

সাওদের এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

জয়িতা সম্মতি দিল। সঙ্গে কেউ থাকলে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে সুবিধে হয়। বলা যায় না, যেখানে বরফ জমেনি সেখানে পা ফেলতে দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর জয়িতা বলল, 'তুমি একা ওই গ্রামে কখনও গিয়েছ সাওদের?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামের পাশে গিয়েছি, ঢুকিনি। আমাদের মধ্যে মারপিট তো লেগেই ছিল এতদিন। কিন্তু তুমি যেভাবে হাঁটছ তাতে ওখান থেকে আজ রাত্রে ফিরে আসতে পারবে না। জোরে হাঁট, জোরে।'

সাওদের গতি বাড়াতে জয়িতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাব্বা, অত জোরে আমি পারব না।'

'কেন? এইভাবে পা ফেল।' সাওদের দেখিয়ে দিল শরীর কেমন রাখতে হবে।

জয়িতা অনুকরণ করতে চেষ্টা করল। গতি বাড়ছে কিন্তু অনভ্যাস তার পতন অনিবার্য করে তুলল। সে যখন হুমড়ি খেয়ে বরফের ওপর পড়ছে তখন ক্ষিপ্রহাতে সাওদের তাকে জড়িয়ে ধরল। বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পেটার শব্দ, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার আগেই সাওদেরের শরীরের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ টের পেল। এবং তারপরেই মনে হল যতটা সময় ধরে রাখা উচিত তার থেকে অনেক বেশি সময় এবং শক্তি ব্যয় করছে সাওদের। সেই অবস্থায় মুখ তুলল জয়িতা। সাওদেরের কিশোর মুখে যেন হোলি শুরু হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস ভারী। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে জয়িতা বলল, 'ছেড়ে দাও সাওদের।'

'নাঃ, আর একটু, আর একটু থাকো।' সাওদেরের গলার স্বর জড়ানো।

'মানে?' জয়িতার গলা থেকে শব্দটা ছিটকে এল।

এবার হাত শিথিল হল সাওদেরের, বিহ্বল দেখাল ওকে। তারপর বলল, 'তুমি কি নরম!'

হতভম্ব হয়ে গেল জয়িতা, 'আমি নরম! নরম মানে?'

সাওদের সরল হাসল, 'তোমাকে বাইরে থেকে দেখলে খুব শক্ত মনে হত, কিন্তু আজ বুঝলাম তা ঠিক নয়।' এখন দূরত্ব এক হাতের। মাথায় ওরা সমান সমান। জয়িতা অবাক। সাওদেরের বয়স বোঝা মুশকিল। দাড়ি এদের সবার বের হয় না। ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা। একমাথা চুল আর চমৎকার চামড়ার জন্যে বয়সটা বোঝাও দুস্কর হয়। তাছাড়া সব সময় ওর দিকে তাকালে যে ইংরেজী শব্দটা মনে পড়ে সেটা হল 'ইনোসেন্ট'। যা বয়স্ক মানুষেরা কিছুতেই পেতে পারে না। কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আচমকা কম্পন এল জয়িতার শরীরে। সে নরম! তার শরীরে এখন শীতের ভারী পোশাক। যে কথা কখনও আনন্দ বা সুদীপের মাথায় আসেনি সেই কথা কি বেমালুম উচ্চারণ করল সাওদের!

অথচ নিজেকে তার মোটেই নরম ভাবতে ইচ্ছে করছিল না।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল জয়িতা। আর হাসিটা যেহেতু শহুরে তাই সাওদের বুঝতে পারছিল না কি করা যায়। হাসি থামিয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বুঝি গ্রামের মেয়েদের জড়িয়ে ধরে পরীক্ষা কর কে নরম আব কে শক্ত?'

'দূর। গ্রামে আমার বয়সী মেয়েই নেই যে তাকে জড়িয়ে ধরব। বড় মেয়েরা আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় কিন্তু আমার ওদের মোটেই ভাল লাগে না।' সরল গলায় জানাল সাওদের।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওরা সব কেমন বড় বড়। অবশ্য রোলেনদের গ্রামে একটা আমার বয়সী মেয়ে আছে।'

'আচ্ছা? তাই তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইছ?'

'না, তা ঠিক নয়। কিন্তু মেয়েটার মুখ খুব খারাপ। অত সুন্দর দেখতে অথচ এমন গালাগাল দেয় যে কি বলব! একবার ওই ঝরনার পাশে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'তখন ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে?'

'উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না! চেয়ে আছি দেখে মেয়েটা চিৎকার করল, মেয়ে দ্যাখোনি কোনদিন যে চোখ বড় করেছ? ক্ষেতি আছে কতখানি? রোজ রোজ শেলরুটি খাওয়াতে পারবে? এই সব বলে চলে গেল। আমার তো ওসব কিছু নেই তাই ওর কথা ভাবি না।' সাওদেরকে মোটেই দুঃখিত দেখাচ্ছিল না। জয়িতা আবার হাঁটা শুরু করেছিল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সাওদের চাপা শিস দিচ্ছিল। আর গতি বাড়াচ্ছে না সাওদের। ক্রমশ ওরা চুপচাপ ঝরনার পাশে চলে এল। এরমধ্যে কখন ঝরনা জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। এবং তখনই নিচে গুলির শব্দ পেল জয়িতা। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে। সে সচকিত হল। সুদীপ! ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগল জয়িতার। নিরীহ চমরী মারার জন্যে বন্দুকের গুলি খরচ করার কোন মানে হয় না। আওয়াজটা খুব দূরের নয়। সঙ্গে সঙ্গে মত পালটাল সে। সাওদের কান খাড়া করেছিল। ওর মুখের রেখাগুলো এখন অস্বাভাবিক। শব্দটা শোনার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'আওয়াজটা কোত্থেকে এসেছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ সাওদের?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সাওদের। জয়িতা বলল, 'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে?'

'রোলেনদের গ্রামে যাবে না?'

'না। আগে দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে!'

সাওদের বলল, 'এপাশ দিয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে। এসো আমার হাত ধরো, ঝরনা পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব আমরা।' সাওদেরের বাড়ানো হাত ধরল জয়িতা। স্পর্শ পাওয়ামাত্র কেঁপে উঠল জয়িতা। তার মনে হল সাওদের হয়তো আবার ভাবতে শুরু করেছে জয়িতা কি নরম। কিন্তু ওর হাতের স্পর্শে বা ব্যবহারে সেসব কিছুই দেখতে পেল না জয়িতা। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে বরফ পরীক্ষা করে করে ওকে নিয়ে ঝরনা পেরিয়ে এল সাওদের। ওপারে পৌঁছে ঢালু পথে সামান্যই হাঁটা। রোলেনদের গ্রামের ঠিক উলটো পথ এইটে। গাছপালাগুলো বরফে ঢাকা। কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ সাওদের তার হাত চেপে ধরল। মুহূর্তেই তাকে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। নিঃশব্দে সে দূরের একটা বরফের চাঁই দেখিয়ে দিল। প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি জয়িতা। তারপর নজরে এল লম্বা একটা লোমশ লেজ অনেকটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে বরফের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। শরীর দেখা যাচ্ছে না। সাদার ওপর কালো ছোপ ছোপ লেজ বরফের গায়ে যেন মিশে আছে। ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করে পেছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সাওদের। কিন্তু জয়িতার মনে হল জন্তুটাকে না দেখে ফিরে যাওয়া বোকামি হবে। প্রায় মিনিটপাঁচেক সে সাওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল। এই সময় লেজটা একবারের জন্যেও জায়গা বদল করল না।

সময় সম্ভবত সাওদেরের সাহস ফিরিয়ে দিল। সে গোল করে অনেকটা জায়গা হেঁটে ঠিক উল্টোদিকে পৌঁছে গেল জয়িতাকে নিয়ে। এবং তখনই জন্তুটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। লম্বায় অন্তত ফুট সাতেক হবে। বরফের ওপর মুখথুবড়ে পড়ে আছে। এবং তার বুকের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে। শরীরে সামান্য কাঁপুনি নেই। স্নো-লেপার্ড? জয়িতা চমকে উঠল। সত্যি যদি

স্নো-লেপার্ড হয় তাহলে এ তো প্রায় রূপকথার প্রাণী। হিমালয়ের চৌদ্দ পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে এদের অবস্থান। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক কালে এদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন। জয়িতা একমুঠো বরফ ছুঁড়ল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সাওদের দুহাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করল। জিম করবেটের বইতে জয়িতা জেনেছে আহত চিতার কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখে সাওদের সাহস পেয়ে গেছে এখন। নিষেধ না শুনে এগিয়ে যাচ্ছিল পায়ে পায়ে। তারপর কাছাকাছি হয়ে চিৎকার করল, 'মরে গেছে, মরে গেছে!'

জয়িতা এবার ছুটে গেল। সত্যি এটা স্নো-লেপার্ড। এবং বেশ বড়সড়। সারা শরীরে মেরুভালুকের মত পুরু লোম এবং থাবাতেও লোমের গদি আছে যাতে বরফের ওপর সহজে হাঁটতে পারে। সাদাটে চামড়ার কালো ছোপ এদের লুকিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। জয়িতা পড়েছিল পৃথিবীতে ঠিক এই সময় কতগুলো স্নো-লেপার্ড আছে যার হিসেব নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটা বিশেষজ্ঞ দল রাশিয়ার বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ে চারটে শীত কাটিয়েও একটি স্নো-লেপার্ডের দর্শন পায়নি। এই জন্তু সাধারণ বাঘ কিংবা চিতা নয় তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এর মৃত্যু হয়েছে সামান্য আগে। এখন আসার পথে রক্ত ঝরিয়ে এসেছে ও। জয়িতার বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ কার উদ্দেশ্যে গুলি খরচ করেছে। এই বিরল জাতের প্রাণীটিকে মারা সুদীপের উচিত হয়েছে কিনা এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই সাওদের লেপার্ডটিকে ধরে টানতে লাগল। কিন্তু ওর একার পক্ষে ওজন অনেক বেশী। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে চাইছ ওটাকে নিয়ে?'

'উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না! এই এলাকাটা রোলেনদের। ওরা যদি এটাকে দ্যাখে তাহলে কিছুতেই আমাদের নিয়ে যেতে দেবে না। তুমি হাত লাগাও, তাড়াতাড়ি ঝরনার ওপারে নিয়ে যাব।'

সাওদেরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

'কি করবে এটাকে নিয়ে?'

'কি আর করব, খাব! এরকম বাঘের কথা শুধু শুনেই এসেছি। তোমরা আসার পর ইয়াকের মেয়ে বাচ্চা হচ্ছে, সাদা বাঘ এসে মরে পড়ে থাকছে। ধরো ধরো।'

ঠিক সেই সময় অত্যন্ত সাবধানে সুদীপ নিচের জঙ্গল সরিয়ে বেরিয়ে এল রক্তচিহ্ন ধরে। জয়িতাকে লেপার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে হতভম্ব। জয়িতা চেঁচিয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন, পৃথিবীর রেয়ার একটা প্রাণীকে তুই মারতে পেরেছিস!'

'রেয়ার প্রাণী? ওটা তো বাঘ! মরে গেছে?' সুদীপ দৌড়ে ওপরে উঠে এল।

'এর নাম স্নো-লেপার্ড।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল। ততক্ষণে মেয়েটি আর একটি ছেলে ওপরে উঠে এল। সুদীপ বলল, 'খুব ভুগিয়েছে লেপার্ডটা। চমরী খুঁজতে বনে ঢুকেছিলাম, পেয়ে গেলাম এটাকে। গুলি খেয়ে এতটা ছুটে আসবে ভাবিনি। একেবারে হার্টে লেগেছে। শক্তি আছে বটে। কিন্তু তোরা এখানে?'

'পৃথিবীর সমস্ত চিড়িয়াখানায় এই প্রাণীর সংখ্যা মাত্র তিনশো।'

'তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। আর একটু সময় পেলে ওটাই আমাকে এতক্ষণে আরাম করে খেত। ফালতু সেন্টিমেন্ট ছাড়।' সুদীপ ওদের ইঙ্গিত করল। সাওদের তো তৈরি হয়েই ছিল। বাকি দুজন হাত লাগাতে লেপার্ডটাকে নড়ানো সম্ভব হল। টানতে টানতে ওরা ওকে ঝরনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সুদীপ হাসল, 'তোর চামচেটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?'

'চামচে?'

সুদীপ সাওদেরকে দেখাল।

'চামচে বলছিল কেন?'

'তোকে দেখলে ওর মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লক্ষ্য করেছিস?'

জয়িতা দাঁড়াল না। তার মেজাজ খিঁচরে যাচ্ছিল। সম্প্রতি সুদীপের কথাবার্তায় সামান্য সৌজন্য থাকছে না। সুদীপ দৌড়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে থামাল, 'তুই এত ক্ষেপা হয়ে গেলি কেন?'

'ছেড়ে দে আমাকে!' এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়াল জয়িতা।

'তুই শালা খুব কাঠখোট্টা।' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনিটা ফিরে এল। সুদীপ বলছে কাঠখোট্টা, অথচ একটু আগেই সে শুনেছে, 'তুমি কি নরম!' কোন্‌টে সত্যি?

হঠাৎ সুদীপ বলল, 'শোন, মালপত্র কমে আসছে। আনন্দ বলছে চ্যাঙথাপু থেকে কিনে আনা দরকার। আমি নিজে যাব বলেছি। তোর জন্যে কিছু আনতে হবে?'

'তুই তাপল্যাঙের বাইরে যাবি?' অজান্তে প্রশ্নটা মুখ থেকে বের হল।

'হ্যাঁ।' তার পরেই হো হো করে হেসে উঠল সুদীপ, 'তুই কল্যাণের কেসটা ভাবছিস? আমি শালা কখনও মরব না। তাছাড়া চ্যাঙথাপুতে পুলিশফাঁড়ি নেই।'

জয়িতা কোন কথা না বলে নীরবে হাঁটছিল। সুদীপ বলল, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সোজা কলকাতায় চলে যাই। একবার দেখে আসি সেখানকার মানুষগুলো কে কেমন আছে!'

'কে কেমন আছে সেকথা জানতে যেতে হবে কেন? পুরু চামড়ার নখদন্তহীন চোখের পর্দা ছেঁড়া আত্মসম্মানহীন কয়েক লক্ষ বাঙালী গর্তে মুখ লুকিয়ে এ ওকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করেছিলাম তা অর্থহীন ওদের কাছে। আর এই যে আমরা তাপল্যাঙে যেজন্যে পড়ে আছি তা জানতে পারলে পেছনে একটা ধান্দা খুঁজবে। রগরগে মশলা না পেলে আমাদের কথা শুনতেও চাইবে না। ওদের দেখার জন্যে কষ্ট করার কি দরকার!' জয়িতা ক্লান্ত গলায় বলল।

হঠাৎ সুদীপ বলল, 'জয়ী?'

জয়িতা তাকাল। সুদীপ হাসল, 'তোকে অনেকদিন বাদে এই নামে ডাকলাম।'

'কি বলছিলি?'

'ধর, আমরা যা চাইছি সব হল। তাপল্যাঙের মানুষদের নির্দিষ্ট আয় হল। কো-অপারেটিভ ডেয়ারি, ফার্ম এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মানসিক সুস্থিতিও এল। তখন আমরা কোথায় যাব?'

'কোথায় যাব মানে? এখানেই থাকব, এদের সঙ্গে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ওরা গ্রামে ফিরে আসছিল। এর মধ্যে খবর পৌঁছেছে। দলে দলে লোক ছুটছে স্নো-লেপার্ডটাকে নিয়ে আসার জন্যে। এবং তখনই জয়িতা আনন্দদের দেখতে পেল। দশ-বারোজন লোক কাঠের বোঝা বরফের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। আনন্দ একটু ঝুঁকে হাঁটছে। জয়িতার মনে হল এই কয় মাসে আনন্দ যেন অনেক বয়স্ক হয়ে গিয়েছে। ওর শরীরেও ভাঙন এসেছে। সে চমকে সুদীপের দিকে তাকাল। এবং মনে হল সুদীপের চেহারায়ও সেই জেল্লা নেই। নিজেকে অনেকদিন দ্যাখেনি জয়িতা। সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। আনন্দর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা ছটফটানি টের পেল জয়িতা।

সে ছুটে এগিয়ে এল। আনন্দ হাসল, 'গ্রেট ডিসকভারি! কাঠ তো ছিলই, এই অঞ্চলে প্রচুর বড়-এলাচের গাছ আছে। বরফ গললে বড়এলাচ সাপ্লাই দেওয়া যাবে। আর নিচের দিকে বেতের বন দেখতে পেলাম। এত ওপরে বেত, ভাবা যায় না। পালদেম বলছে গ্রামের অনেকেই বেতের কাজ জানে। ব্যাপারটা অর্গানাইজ করতে হবে।'

'তুই ভাল আছিস আনন্দ?' জয়িতা প্রশ্নটা করে ফেলল।

'কেন? আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?' আনন্দ অবাক হল।

'না, ঠিক আছে।'

'তোদের মাথায় কখন কি ঢোকে কে জানে! আর হ্যাঁ, চমরীদের একটা দল এসেছে এদিকে। পায়ের ছাপ দেখলাম। জ্যান্ত ধরব বলে ফাঁদ পেতে এলাম। রান্না হয়ে গেছে?'

'আমি দেখছি।' জয়িতার মনে পড়ল তার কাজটার শেষ না দেখেই বেরিয়ে পড়েছিল।

এই সময় আনন্দর নজরে পড়ল। সে চিৎকার করে সুদীপকে ডাকল, 'কিরে, এখনও খাঁচাগুলো তৈরি করিসনি?'

সুদীপ জবাব দিল, 'আমি একটু শিকারে গিয়েছিলাম।'

'শিকার! তোকে কে শিকারে যেতে বলেছিল? পশু মারার চেয়ে পশু বাঁচানোই তো জরুরী। আমরা যদি নিজেদের কাজগুলো না করি—।' বিরক্তিভঙ্গে আনন্দ মুখ ফেরাল। জয়িতা আশঙ্কা করছিল সুদীপ

হয়তো একটা কড়া জবাব দেবে। কিন্তু সুদীপ কিছুই করল না। চুপচাপ চলে গেল খাঁচার কাছে। ব্যাপারটা অভিনব লাগল জয়িতার। আনন্দ ততক্ষণে চলে গেছে যৌথগৃহের দিকে।

জয়িতা খাবারের ব্যবস্থা দেখার আগে সুদীপের কাছে গিয়ে বলল, 'তুই হঠাৎ এত ভাল হয়ে গেলি কি করে রে?'

সুদীপ বলল, 'ফোট! ন্যাতানো কথা বলিস না।'

কথাটা খুব বিশ্রী লাগল জয়িতার। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল সুদীপ কখনও তাকে বলেনি সে ভিজে কথা বলে! সে কি তাই বলছে! এবং তখনই সেই তিনটে শব্দ কানের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল,'তুমি কি নরম।'

॥ ৪৮ ॥

দুবার বরফ গলে গেল কিন্তু সেই অদৃশ্য জন্তুটির অস্তিত্ব চাক্ষুষ হল না। যাকে এরা দানো বলে, যাকে ইয়েতি বলে ওদের মনে হয়েছিল। গেল গ্রীষ্মে পাহাড়টার যতদূর যাওয়া সম্ভব বন্দুক হাতে ঘুরেছে সুদীপ। ইয়েতি তো দূরের কথা, আর একটাও স্নো-লেপার্ড চোখে পড়েনি। দ্বিতীয়বার বরফ গলবার আগে যে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গিয়েছিল তা চমৎকার কাজে লাগানো গিয়েছে। দু'বছরে তাপল্যাঙের চেহারা ব্যাপক পালটে গিয়েছে।

বৃষ্টি এখানে সারা বছর হয়। কোথাও জল দাঁড়ায় না। শীতের প্রকোপ এত বেশি যে সমতলের সব শস্য এখানে ফলতে পারে না। কিন্তু আনন্দ এদের নিজস্ব ফসল ছাড়াও বাড়তি কিছুর জন্য ধাপে ধাপে পাহাড় কাটিয়েছে। এই গ্রীষ্মে কিছুই লাগানো হয়নি সেখানে। কারণ অনবরত আগাছা বের হচ্ছিল নবীন মাটি থেকে। সেগুলো তুলে ফেলা, মাটিটাকে সহজ করার কাজ চলেছে এতকাল। ডুঙডুঙ এবং গুন্ড্রুকের চাষ হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সেগুলো রোদে শুকিয়ে জমিয়ে রাখা হয়েছে বরফের সময়ের জন্যে। আর ব্যাপক ফলন হয়েছে ভুট্টার। দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে পিষলে চমৎকার আটা হয়। গম হবে কি হবে না এমন একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। আনন্দ চাইছে সামনের গ্রীষ্মে পরীক্ষা করতে।

জমির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। পরিশ্রম, উৎসাহ এবং পরিকল্পনা যদি জোরদার হয় তাহলে সারা বছর আর অভুক্ত থাকতে হয় না এই বিশ্বাস এসে যাওয়ায় ব্যক্তিগত সীমানা নিয়ে তিনজন ছাড়া আর কেউ জেদ ধরে থাকেনি। অবস্থাপন্ন সেই তিনজন বস্তুত এখন একঘরে। আনন্দরা ঠিক এইটে চায়নি। কিন্তু স্বার্থবিরোধী ভূমিকায় কাউকে দেখলেই মানুষের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই আসে। যদিও ওই তিনজন সমস্ত গ্রামের বিরোধী কোন ভূমিকা নেয়নি। যেভাবে তারা প্রতিবছর তাদের জমিতে চাষ করে এবারও তাই করেছে। সমস্ত গ্রামের মত মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। আমার জমি এবং তোমার পরিশ্রম মানে ফসলের আধাআধি, এই নীতি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। আনন্দ গ্রামের সবাইকে অনুরোধ করেছিল, যারা সঙ্গী হচ্ছে না তাদের যেন কেউ বিরক্ত না করে। কারও কারও মনে তাই দেখে যদি আলাদা হবার প্রবণতা এসেও থাকে ফসলের পর তা দূর হয়ে গেল। দেখা গেল জমির ফলন সম্মিলিত উদ্যোগে অনেক ব্যাপক। সুদীপ কিংবা জয়িতা আশাই করতে পারেনি এত সহজে সাধারণ মানুষ একত্রিত হবে। আনন্দর উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং এদের জন্যে নিজেকে নিয়োগ করার চেষ্টা ক্রমশ তাকে প্রায় কাহুনের সমগোত্রীয় করে ফেলেছে বলে ধারণা হচ্ছিল। আনন্দ যে কাজই করতে বলল তা করলে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে ফলে বিশ্বাস আরও বেড়ে যাচ্ছিল। কাহুনের সঙ্গে পার্থক্য একটাই ওরা আনন্দকে ভয় করে না, এড়িয়ে চলে না। জয়িতা ঠাট্টা করেছিল, ক্ষমতা যেহেতু মানুষের চরিত্রবদল করে সেইহেতু নিজেকে প্রায় দেবদূতের ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার নেশা আনন্দকে পেয়ে বসেছে। এবং সেখান থেকেই আর একজন মিনি ডিক্টেটারের জন্ম নেওয়া বিচিত্র নয়। তার বক্তব্য ছিল, প্রতিটি স্তরে নিজেরা এগিয়ে না গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদেরই নেতৃত্ব নিয়ে কাজ শেষ করতে দেওয়া উচিত।

আনন্দ কোন জবাব দেয়নি, হেসেছিল। জয়িতাও ভাল করে উত্তরটা জানত। এই গ্রামের ব্যাপক মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা একেবারেই নেই। এদের মানসিক গঠনও সেই পর্যায়ের নয়। এমনকি পালদেম, লা-ছিড়িঙ কিংবা সাওদের পর্যন্ত চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকাতা রাখে

না। কয়েকজনের উৎসাহ আছে প্রচুর কিন্তু হুকুমটা অন্যের মুখ থেকে শুনতে চায় এরা।

তাপল্যাঙে এখন গৃহপালিত পশু এবং প্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে। মুশকিল হল আধুনিক জীবনের কোন সুবিধে এখনই পাওয়া সম্ভব নয়। মুরগী চাষের জন্যে বিদ্যুতের দরকার এবং এখানে তা আকাশকুসুম চিন্তা বলেই মা-মুরগীদের ওপর ডিমে তা দেওয়ার আদ্যিকালের নিয়মটার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন যতটা বাড়া উচিত ছিল ততটা বাড়েনি। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণ সংখ্যাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। গত গ্রীষ্মে দশটা গরু কেনা হয়েছিল ওয়ালাঙচুঙ থেকে। কয়েকটা চমরীর বাচ্চাকে জঙ্গল থেকে ধরে ভাল পোষ মানানো হয়েছে। সম্প্রতি তিনটে বাচ্চা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত অসুস্থ বা দুর্বল শিশুরা কিছু দুধ পাচ্ছে। আর এইসব ব্যাপার গ্রামের তাবৎ মানুষের মনে একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া এনেছে। নতুন জমি আমাদের পেটে খাবার দেবে, মুরগীর ডিম প্রত্যেকের শরীরে শক্তি দেবে এবং আমার শিশু দুধ পাচ্ছে যে কারণে সেই কারণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এমত ধারণা প্রত্যেকের। সেইসঙ্গে এই গ্রামটা আমাদের, এই মাটি আমাদের এবং আমরা সবাই ঠিকঠাক খেয়ে আছি যেহেতু বাইরের তিনটি মানুষ আমাদের একত্রিত হতে শিখিয়েছে।

গত গ্রীষ্মে আশেপাশে যতটা দূর যাওয়া সম্ভব ততটা দূর গিয়ে বড়এলাচ সংগ্রহ করে আনিয়েছে আনন্দ। এই বস্তুটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি তাপল্যাঙের মানুষ এতকাল। প্রস্তাব শুনে ওরা খুব বিস্মিত হয়েছিল। যখন জানল বড়এলাচ সমতলে ভাল দামে বিক্রি হয় তখনও চাড় আসেনি কারও। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে এখানে যেমন জিনিসপত্র কেনা হয় ঠিক তেমনি ওই জিনিস সমতলের মানুষের কাছে বিক্রি করা যায়, তখন উৎসাহ বেড়ে গেল। খচ্চরওয়ালারা গত গ্রীষ্মেও এসেছে। তাপল্যাঙের এই পরিবর্তনে তারা আরও চমকিত। গতবছরও অর্থের বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনেছে পালদেমরা। পরিকল্পনা কাজে লাগাতে বেশ কিছু আবশ্যকীয় জিনিস পালদেমদের মারফত জানিয়ে খচ্চরওয়ালাদের দিয়ে আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং সেইসঙ্গে এই তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে, চ্যাঙথাপু, ফালুট, সান্দাকফু ছাড়িয়ে মানেভঞ্জন পর্যন্ত খবর ছড়িয়েছে—কয়েকজন ডাকাত এই গ্রামে দেদার টাকা ছড়িয়ে লুকিয়ে রয়েছে। গতবার পুলিশের সঙ্গে এখানকার লোকজন যুদ্ধ করেছে বলে একটা শঙ্কা চালু হয়েছে যে পুলিশ বদলা নেবে।

মজার ব্যাপার, খবরটা পালদেমদের আদৌ বিচলিত করেনি। বরং তারা খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে রসিকতা করেছিল, 'পুলিশদের বলে দিও এবার যখন আসবে তখন জানিয়ে আসে, চোরের মত আসাটা ভাল কথা নয়।'

ব্যাপারটা আনন্দর কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। ইদানীং তাপল্যাঙের মানুষজন এত বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যে তাদের সম্পর্কে কোন আড়াল রাখতে চাইছে না। গত গ্রীষ্মেও ওরা তিনজন খচ্চরওয়ালাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। এখন যৌথগৃহের সংখ্যা বেড়েছে। যারা অসুস্থ তাদের জন্যে আলাদা ঘর তৈরি হয়েছে। যখন বরফ নেই, ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা কম তখন যে যার নিজের ঘরে চলে যায়। সেই ঘরগুলোর চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু খচ্চরওয়ালারা লুব্ধদৃষ্টিতে এদের খামার এবং মুরগীর খাঁচাগুলো দেখেছে। সেই মুহূর্তে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু এই খবর যে পাহাড়ে পাহাড়ে বিস্তৃত হবে এ বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

শরীর এবং সামর্থানুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট মানুষ দায়ী থাকবে। তার কাজ ভাল হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা তাপল্যাঙের মানুষের কাছে নতুন। ফলে প্রত্যেকেই সচেষ্ট নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে। চাষের মাটিতে যারা আটমাস কাজ করছে তারা জঙ্গল থেকে কাঠ আনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। বাকি সময়টা তাদের পুরো বিশ্রাম। মুরগী এবং গরুর প্রতিপালনের জন্যে দুটো দল নির্দিষ্ট হয়েছে। গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণের এবং নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা দলকে। গ্রামের বৃদ্ধাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অসুস্থদের দেখাশোনা করার জন্যে। নিজেকে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের পর মানুষগুলোর উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে। যৌথরান্না এখন হচ্ছে না। বরফের সময় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া তিন-চারটি পরিবার একত্রিত হয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছে। মেয়েদের ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব জয়িতার। বিনা ওষুধে ফার্স্ট এইড দেওয়া বা অসুস্থকে প্রাথমিক আরাম দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো সে মেয়েদের রপ্ত করাতে

পেরেছে। জঙ্গল থেকে বেত কেটে এনে জলে ভিজিয়ে নরম করে এখানকার মেয়েরা নিজস্ব কায়দায় যে ঝুড়ি বানাতে পারত জয়িতা ভেবে ভেবে তার কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছে। এক ধরনের বেঁটে মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে সমান করে তাই দিয়ে টেবিল তৈরি করার একটা কায়দা বের করতে পেরেছে সে। তাপল্যাঙের মানুষ এই প্রথম টেবিল ব্যবহার করতে শিখল। বেতের জিনিস এবং এই টেবিল সমতলে পাঠাতে পারলে অর্থ আসবেই বলে তার ধারণা।

তিনটি পরিবার এবং একটি মানুষ এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড থেকে নিস্পৃহ হয়ে রয়েছে। কাহুনকে নিয়ে এদের দুশ্চিন্তা ছিল। গত গ্রীষ্মের শেষদিকে আরও তিনটি গ্রামের কাহুনরা জমায়েত হয়েছিল এই মন্দিরে। দুদিন ধরে তাদের পুজো চলেছিল। সুদীপের ধারণা ওটা মন্ত্রণা সভা। তৃতীয় কাহুনের আহ্বানে গ্রামের সব মানুষ জমায়েত হয়েছিল মন্দিরপ্রাঙ্গণে। সেইসময় কাহুনের এক শিষ্য এসে জানিয়েছিল ওই জমায়েতে যেহেতু এরা তিনজন বাহিরের মানুষ এবং তাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে সন্দেহ আছে তাই ওরা যেন উপস্থিত না হয়। সুদীপ খুব খেপে গিয়েছিল কথাটা শোনামাত্র। কিন্তু আনন্দ তাকে বাধা দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত গ্রামের মানুষ তাদের বিদেশী বলে মনে করে। কাহুনের নির্দেশ তারা জেনেছে কিন্তু কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। অতএব এখনই মাথা গরম করে এগিয়ে গেলে বোকামি হবে। শিষ্যটি আরও জানিয়েছিল, যদি তারা কাহুনের কাছে গিয়ে দীক্ষিত হয় তাহলেই ওই সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। সুদীপ বলেছিল, 'এ শালা শ্রুড পলিটিসিয়ান। এতকাল চুপচাপ থেকেছে এখন একটা ধান্দা বের করে আমাদের টুপি পরাতে চায়।'

জয়িতা বলেছিল, 'গেলে কেমন হয়?'

সুদীপ মাথা নেড়েছিল, 'ইম্পসিবল! ধর্মেটর্মে আমার কোন বিশ্বাস নেই। জন্মেছি হিন্দুর ছেলে হয়ে, শালা আজ পর্যন্ত কোন্ ধর্মটা করলাম? এসব বুজরুকিতে আমি নেই।'

আনন্দ বলেছিল, 'কথাটা সত্যি কিন্তু মিথ্যেও। আমরা মন্দিরে যাই না, পুজোপার্বণে ফুর্তি করি, হিন্দুধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুশকিল হল কেউ মারা গেলে শ্মাশানে নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করি। ওখানে কেন যে হিন্দু হয়ে যাই!'

সুদীপ চকিতে মুখ ফিরিয়েছিল, 'তোর এও মনে আছে নিশ্চয়ই আমি মায়ের শ্রাদ্ধ করিনি, মাথার চুল কামাইনি। ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। মুখাগ্নি করেছিলাম কারণ মৃতদেহ চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। দাহ করাটাই সবচেয়ে বেশি সায়েন্টিফিক।'

'দাহ করা আর মুখাগ্নি করা এক নয়। থাক সেকথা। এটা ঠিক আমরা, এখনকার ছেলেমেয়েরা আর বিশেষ কোন ধর্ম-বোধে বিশ্বাসী নই। অন্তত হিন্দুরা তো নয়ই। একটি ক্রিশ্চান কিংবা মুসলমান ছেলেকে যে নিয়মের খাতে শৈশব থেকে এগিয়ে যেতে হয় তা আমাদের জন্যে করা হয়নি। বোধহয় সেই কারণে রাজনীতি আমাদের সহজেই অধিকার করে।' আনন্দ বলেছিল।

জয়িতা বলেছিল, 'আমি কিন্তু এক্ষেত্রে এসব বলছি না। আমি এই গ্রামের মানুষের আস্থা পুরোপুরি পেতে চাই। এখনও পর্যন্ত আমরা বিদেশী, এটা আমার ভাল লাগে না। ধর্ম ব্যাপারে তোদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এখানে আমি একটা সমঝোতা চাই।'

'কিসের সমঝোতা?' সুদীপ চোখ ছোট করেছিল।

'আমি কাহুনের কাছে দীক্ষা নিচ্ছি। চমকে যাস না। ধরে নে এটা একটা ছলনা। জন্মইস্তক যে উত্তরাধিকারসূত্রে আরোপিত ধর্মটাকেই জানল না তার কোন আগ্রহ নেই নতুন নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নাথিং ইজ আনফেয়ার।' আস্তানার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল জয়িতা। তারপর প্যান্ট পালটে তাপল্যাঙের মেয়েদের পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছিল। এই পোশকটা সে ইদানীং প্রায়ই শখ করে পরে। দীর্ঘকাল চুলে হাত না পড়ায়, শহুরে বাতাস শরীরে না লাগায় তার চেহারায় ওই পোশাক পরলে একটা পাহাড়ি আদল এসে যায়। শিষ্যটির সঙ্গে যখন জয়িতা চলে গেল তখন সুদীপ আর একটা সত্য আবিষ্কার করল। সে ধর্মান্ধ নয়। কোন গোঁড়ামি নেই তার। নিজেকে হিন্দু বলে কোন গর্ব করার কারণও খুঁজে পায় না। কিন্তু জয়িতার এই ধর্মবদল করতে যাওয়াটা তার খারাপ লাগছে। কেন? ব্যাপারটা ধরা পড়তেই নিজেকে গালাগাল দিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'মানুষের আচরণ অনেক সময় এত ক্রেজি হয়ে যায়!'

আনন্দ কথাটা শুনে মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

এক বরফের আগে ওরা এখানে এসেছিল। তারপর টানা একটা গ্রীষ্ম এবং দ্বিতীয় বরফের সময় শেষ হল। এইরকম ধর্মসভার আয়োজন কখনও করেনি কাহুন। অন্য গ্রামের কাহুনদেরও দেখা যায়নি। আনন্দদেরও প্রয়োজন পড়েনি ওদের প্রার্থনা বা সভায় যাওয়ার। জয়িতা সাহস দেখাল। কিন্তু তবু আনন্দর মনে অস্বস্তি থেকে গিয়েছিল।

আর কেউ নয় শুধু জয়িতা কাহুনের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে দেখে কাহুন তো বটেই গ্রামসুদ্ধু সবাই অবাক হয়েছিল। এবং সেইসঙ্গে খুশী। সাওদের তো ওকে দেখামাত্র ছুটে এসেছিল। এসে বলেছিল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' গ্রামের অন্য যুবতীরা ওকে ঘিরে হইচই করে উঠেছিল। সে যখন কাহুনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন কাহুন বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাদের মানুষ হতে এসেছ?'

জয়িতা হেসে বলেছিল, 'আমি, আমরা আপনাদেরই মানুষ। এতদিন একসঙ্গে আছি এবং আমাদের ব্যবহারে নিশ্চয়ই সেটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আপনি যখন চাইছেন তখনই আমি দীক্ষা নিতে পারি।'

কাহুন বললেন, 'রক্ত ধর্ম এবং মাটি এক না হলে মানুষ অনাত্মীয় থাকে। তোমার সঙ্গীরা কি তোমার সঙ্গে একমত নয়?' মুখে জবাব না দিয়ে জয়িতা মাথা নেড়ে না বলেছিল।

কাহুন তাঁর দুই সঙ্গীর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আগে কখনও দীক্ষা নিয়েছ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমাদের ওসব কিছু করতে হয় না। আমি সেই অর্থে খ্রিস্টান, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু নই। অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে দীক্ষিত করতে পারেন।'

'সেকি? তুমি কখনও ধর্মাচারণ করনি?' কাহুন যেন খুব অবাক হলেন। জয়িতা মাথা নাড়তে আবার প্রশ্ন ছিটকে এল, 'জন্মাবার পর তোমাদের কাহুন তোমার কানে ঈশ্বরমন্ত্র শুনিয়ে যাননি?'

'না।'

কাহুনের মুখে এবার হাসি ফুটল। কিন্তু অন্য দুইজন কাহুন তাকে কিছু বলতে তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'তোমার আগ্রহ আমাদের খুশী করেছে! কিন্তু দীক্ষা নেবার মত উপযুক্ত হয়েছ কিনা তা আমাদের জানা দরকার। তাছাড়া তোমার শরীর এবং আত্মা এখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত তুমি প্রত্যহ একটি করে ফুল আমার কাছে দিয়ে যাবে। আমি তোমার নাম করে ভগবানের কাছে নিবেদন করব।'

চেষ্টা করে নিজেকে সংবরণ করল জয়িতা। সুদীপ এখানে থাকলে কেসটা জমতো। কিন্তু তার এই বলা ও ভঙ্গি দেখে কাহুন লোকটার চেহারাই যেন পালটে যাচ্ছে। ক্ষমতা মানুষকে চিরকালই অন্য চেহারা দেয়। এই সমর্থন জানাতে সমস্ত গ্রামবাসী একটা খুশীর ধ্বনি উচ্চারণ করল। কাহুন হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে আদেশ দিলেন এই অবস্থায় জয়িতা এখানে থাকতে পাবে। তবে তাকে আজ থেকে সবাই দ্রিমিত বলে ডাকতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র দ্রিমিত দ্রিমিত উচ্চারিত হল। মজা লাগছিল জয়িতার। অ্যাপ্রেন্টিস থাকাকালীন নামকরণ হয়ে গেল! কিন্তু সে লক্ষ্য করল চেনা মুখগুলোয় কেমন একটা নরম ছাপ এসেছে। ওরা যখন তাকে দেখছে তখন সেই দূরত্বটা যেন নেই।

পর্ব চুকলে কাহুন কিছুক্ষণ তাঁর নিজস্ব ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। শিষ্যরা বাজনা বাজাল। গ্রামের বৃদ্ধরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। বেশ একটা ধর্মধর্ম ভাব ফুটে উঠল। জয়িতার মনে হল হিন্দু-বৌদ্ধ পদ্ধতির একটা শঙ্কর রূপ এই উপাসনা।

এসব চুকে যাওয়ার পর কাহুন কথা শুরু করলেন, 'ভগবান আমাদের পাঠিয়েছেন এই মাটিতে। তিনি আমাদের জন্যে মাটি দিয়েছেন, গাছ দিয়েছেন। আমাদের সহ্যশক্তি বাড়াবার জন্যে যেমন বরফ এবং বৃষ্টি দিয়েছেন তেমন রোদও তাঁর সৃষ্টি। যুগযুগান্তর থেকে আমরা এইভাবেই আছি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে। ওই যে পাহাড় যার মাথায় প্রতিদিন ঈশ্বরের পায়ের চিহ্ন পড়ে সে আমাদের আড়াল করে থাকে কারণ ওই পাহাড়ের ওপারে রয়েছে অনন্ত বরফ এবং ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু আমরাই হলাম ভগবানের প্রথম সন্তান।' এই কথাটা বলামাত্র পিছনে বসে থাকা দুজন অন্য গ্রামের কাহুন কিছু বললেন চাপা গলায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে তাপল্যাঙের কাহুন তড়িঘড়ি বললেন, 'এই আমরা কারা? আমরা

বলতে আমি পাহাড়ের সমস্ত মানুষকেই বোঝাচ্ছি যারা বরফে কষ্ট পায়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে যারা বেঁচে থাকে।' বলে আবার অন্য কাহুনদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন দুবার।

'আমাদের উচিত আমাদের মত বেঁচে থাকা। ইয়াক যদি মুরগীর মত বাঁচতে চায় তাহলে কি সেটা তাকে মানায়? মানায় না। অনেকদিন হল আমাদের গ্রামে চারজন বিদেশী এসেছিল। এরা, তোমরা একটু আগেই শুনলে ভগবানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এই মানুষরা নিজেদের স্বার্থে তোমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু এদের সাহায্য আমরা কদিন নেব? এরা কেউ ভগবানের সন্তান নয়। আমাদের ধর্ম আমাদের রক্ত আমাদের মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই!' এই অবধি বলে কাহুন চুপ করলেন। জয়িতা চমকে উঠেছিল। এতদিন চুপচাপ থেকে আজ এমন কি কারণ ঘটল যাতে কাহুন প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতায় নামলেন? কিন্তু গ্রামবাসীরা চুপচাপ কেন? পালদেম, লা-ছিরিঙ, সাওদের? ঠিক এইসময় একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'দ্রিমিত!' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করল, 'দ্রিমিত, দ্রিমিত, দ্রিমিত!'

'হ্যাঁ, দ্রিমিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দ্রিমিত এখন পরীক্ষিত হয়নি। এই অবস্থায় আমার বন্ধুরা, এই দুই কাহুন আমার কাছে এসেছেন। আমাদের গ্রামে যেসব কাণ্ড হচ্ছে তার খবর ওঁদের গ্রামেও পৌঁছেছে। এই যে আমরা সাময়িক খেতে পাচ্ছি, বরফে গতবার কম কষ্ট পেয়েছি তা ওদের গ্রামের সরল মানুষদের প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু আমরা জানি হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। আজ খিদের তাগিদে কিংবা নতুন একটা ঝোঁকে তাপল্যাঙের মানুষেরা একসঙ্গে বিদেশীদের নির্দেশে কাজ করছে। কিন্তু আগামী কালই যে একটা পরিবারের মনে হবে না ও আমার চেয়ে বেশি পাচ্ছে, যার জমি নেই সে আমার জমি থেকে পেট ভরাচ্ছে তা কে বলতে পারে? আর তখন নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এই বিদেশীরা বেশিদিন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন কি হবে? আমরা জানি একজন বিদেশী এর মধ্যেই মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। পুলিশ একবার এখানে এসেছিল এদের খোঁজে। আমার কাহুনবন্ধুরা বলছেন পাহাড়ে পাহাড়ে বিচিত্র সব মানুষ আসা-যাওয়া করছে এদের খবর নেবার জন্যে। সেবার পাশের গ্রামের মানুষ পুলিশকে নাজেহাল করে অন্যায় করেছে। তখন ওরা তৈরি হয়ে আসেনি। কিন্তু আবার যদি পুলিশ এই গ্রামে আসে তাহলে বিদেশীদের নিস্তার নেই। শুধু তাই নয়, তারা তোমাদেরও ছেড়ে দেবে না।'

জয়িতা আর পারল না। সে এক পা এগিয়ে যেতেই কাহুন তাকালেন। জয়িতা গ্রামবাসীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, 'কাহুন যা বলছেন সেটা তাঁর বিশ্বাসে সত্যি। কিন্তু একটা কথা জেনো, পুলিশ এখানে এলে আমরা এমন কিছু করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হবে। ধর্ম রক্ত এবং মাটির কথা উনি বলছেন। কিন্তু ভালবাসার কথা তো উনি বলেননি! আমাদের যে বন্ধু পুলিসের গুলিতে মারা গিয়েছে সে তো দিব্যি বেঁচে থাকত আমাদের মত যদি তোমাদের ভালবেসে দার্জিলিং থেকে ওষুধ না আনতে যেত। আমাকে এই গ্রামের প্রতি টি মা বোন বন্ধু বলেছে যে আমরা আসার আগে তারা ভাবতে পারত না এইভাবে বাঁচতে পারা যায়। যে পরিশ্রম এবং কষ্ট তোমরা করেছ তার মূল্য সবে পেতে শুরু করেছ।পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কয়েকটা পরিবার আনন্দ করে থাকে। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে কাহুন তাদের দলে পড়েন না। তাঁর বন্ধুরা বিচলিত হয়ে ছুটে এসে অনুরোধ করায় তিনি এইসব কথা বলছেন। আমরা এতদিন এখানে রয়েছি। কিন্তু কখনও কাহুনকে অসম্মান করিনি। আমরা এও বলিনি তাঁর ইয়াকের দুধ সবাইকে দিতে হবে। কারণ তিনি শুধু তোমাদের ধর্ম এবং ঈশ্বর নিয়েই এতকাল ছিলেন। মনে হয়, অন্য দুজন কাহুনের অন্য ক্ষমতা আছে। গ্রামের লোকেরা যদি তাঁদের বিরুদ্ধে যায় সেই ভয়ে ওঁরা ছুটে এসেছেন। তাপল্যাঙের সহায়সম্বলহীন মানুষ যেমন সুস্থভাবে বাঁচবে ঠিক তেমনি সমস্ত পাহাড়ি গ্রাম, সমতলের নিঃস্বমানুষের সেই একই ভাবে বাঁচবার অধিকার আছে। বিরোধিতা করে নয়, কাহুনরা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে তাঁরাই উপকৃত হবেন। আর হ্যাঁ, আমরা আপনাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আপনাদের গ্রামের সামাজিক আইনের মর্যাদা আমরা সবসময় মেনে চলেছি। এবং বাধ্য না হলে কেউ এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব না। কখনও না। আমরা একই সঙ্গে থাকব। একজন বাইরের লোক চিরকালই বিদেশী থাকতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার আরম্ভ হল। চিৎকার উল্লাসের। সেই সঙ্গে দ্রিমিত দ্রিমিত ডাক। উল্লসিত

মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাপল্যাঙের কাহুন বসে পড়লে অন্য গ্রামের কাহুন দুজন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাঁরা কিছু কথা তাপল্যাঙের কাহুনকে বলে সদলবলে চলে গেলেন দু'ভাগ হওয়া জনতার মধ্যে দিয়ে। জয়িতা দেখল এর কোন প্রতিক্রিয়া হল না সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুধু যে তিনটে পরিবার জনতা থেকে আলাদা হয়ে কাহুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তারা ভীত হল। এবং উল্লাসের সুযোগে কখন যে তারা জনতার সঙ্গে মিশে গেল তা বোঝা গেল না। এইসময় সাওদের ছুটে এল জয়িতার সামনে। তার হাতে সদ্য ছেঁড়া একটা ফুল। হাসি হাসি মুখে সেটি এগিয়ে ধরল সে, 'দ্রিমিত, নাও।'

ফুলটা নিয়েছিল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল কাহুনের সামনে। সসম্ভ্রমে বলেছিল, 'আমার হয়ে ভগবানকে দিয়ে দেবেন কাহুন।'

বিধ্বস্ত মানুষটার মুখে প্রচণ্ড বিস্ময়। যেন তাঁর হিসাব মিলছিল না। তিনি কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দুবার বরফ গলে গেল। একটি পুরো গ্রীষ্ম যেমন এই গ্রামের অনেক পরিবর্তন এনেছে তেমনি সম্পর্কেরও। আস্তানার আয়তন বেড়েছে। একটির বদলে তিনটি ঘর তৈরি হয়েছে। কথা ছিল খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে হবে এবং ওরা তিনজন তিনটি ঘরে থাকবে। মেয়েটির স্বভাবতই জয়িতার সঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু প্রথম রাত্রেই সে বিদ্রোহ করে বসল। সুদীপকে ছেড়ে সে কিছুতেই থাকবে না। আনন্দ এবং জয়িতার কাছে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটূ ঠেকলেও তার ওসব কিছুই মনে হচ্ছে না। সে মুখের ওপর পালদেম, লা-ছিরিঙ এবং সাওদেবকে বলল, 'আমাকে কেউ কখনও ভালবাসেনি। আমিও কাউকে ভালবাসিনি। কিন্তু এই মানুষটাকে আমি যখন ভালবেসে মুখে কথা ফিরিয়ে দিয়েছি তখন কেন ওকে ছেড়ে থাকব? ও আমার মনের মত মানুষ, ওর সঙ্গে না থাকতে দিলে আমি মরে যাব, ব্যাস।'

জয়িতার মনে হয়েছিল পাঁচ বছরের মেয়ে চকোলেট আবদারে গলায় কথা বলছে এবং এর উত্তর হল ঠাস করে নরম গালে চড় কসানো। কিন্তু পালদেম অন্য কথা বলল। সে জিজ্ঞাসা করল সুদীপকে, 'এই মেয়েটার কপাল সত্যি খারাপ। ও তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছে, তুমি কি করবে?'

সুদীপ কাঁধ নাচিয়েছিল। তারপর বাংলায় বলেছিল, 'আমি শালগ্রাম শিলা, শোওয়াবসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাসলীলা। বহুৎ ধুর হয়ে গেছি এখন।'

জয়িতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সুদীপের মত শাণিত ছেলে এসব কি বলছে! কিন্তু তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওরা একসঙ্গে থাকবে, এতে তোমাদের আপত্তি নেই?'

পালদেম বলেছিল, 'এখন তোমরা আমাদের বন্ধু। ও তো তোমাদের তিনজনের সঙ্গে এখানে এতকাল ছিলই। তবে যদি ও মা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'সর্বনাশ হবে কেন?' জয়িতা প্রশ্নটা করেছিল, 'ওরা বিয়ে করবে তখন।'

'আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের কোন মেয়ের বাইরের লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়নি।'

পালদেমের কথাটা শুনে সুদীপ বলেছিল, 'স্টে টুগেদার, নো বিয়ে, নো বাচ্চা। গুড। কিন্তু ব্রাদার, এতদিনেও যদি আমরা বিদেশী তাহলে আর জবাব নেই।' কথাগুলোকে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বলায় পালদেমরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সুদীপের কথায় যে ঝাঁঝ ছিল তা টের পাওয়া গেল। এবং সেই থেকে মেয়েটি সুদীপের ঘরে। জয়িতা লক্ষ্য করছিল মেয়েটি মোটা হচ্ছে? মুখচোখে একটা লালিত্য ফুটছে। এত পরিশ্রম করে এত কম খেয়েও এইরকম উন্নতি হয় কি করে সে জানে না। এবং আলাদা থাকার ফলে ওর ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। যেন নিজেরটা আলাদা করে ভাবার প্রবণতা এসেছে। অথচ সুদীপের কোন বিকার নেই। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন কেউ জানে না, ওরা কোন কথা তোলে না আর।

ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না সুদীপের। এখনও ঘরে অন্ধকার পাতলা হয়ে ঝুলে রয়েছে। একটা বাসী গন্ধ পাক খাচ্ছে। একটু আগে মেয়েটাকে উঠে যেতে দেখেছে সে। সে যে দেখছে তা অবশ্য বুঝতে দেয়নি। বুঝলেই কথা বলত মেয়েটা। বড্ড কথা বলে। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা

হয় কেন সে জোর করে সুদীপের সঙ্গে থাকছে তাহলে যে উত্তর দেবে তাতে অনায়াসে একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। ও এত বিশ্বস্ত এবং সবসময় এমন আঠার মত লেগে থাকে যে মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে, বলেওছে, কিন্তু কমলী ছাড়বার পাত্র নয়।

আরও খানিকটা সময় আলসেমির পর সুদীপ উঠল। এখন এখানে মোটামুটি একটা বাথরুম-টয়লেটের ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। বাইরের ঘোলাটে আকাশ দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারাটা দিন আজ সন্ধে সন্ধে হয়ে থাকবে। সুদীপের প্রায়ই মনে হয় একটা জেনারেটার আনলে কেমন হয়? শিলিগুড়ি থেকে বস্তুটা কিনে যদি কোনমতে এখানে আনা যেত তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু জেনারেটারের রসদ এখানে নিয়মিত পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কথাটা শুনলে জয়িতা ঠাট্টা করত। জয়িতার কথা মনে হতেই ও অন্যমনস্ক হল। আজকাল জয়িতা আর মোটেই প্যান্ট পরে না। বস্তুত ওদের জামাপ্যান্টগুলো দুর্দশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। নতুন শার্ট প্যান্ট অবিলম্বে কেনা দরকার। জয়িতা এখানকার পোশাকে লা-ছিরিঙ আর সাওদেরদের সঙ্গেই বেশিক্ষণ সময় কাটায়। আগের মত আর সুদীপের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারে না। সুদীপ বুঝতে পারে না সে তাকে ঘৃণা করে কিনা। মেয়েটির সঙ্গে একত্রে থাকা যদি অপছন্দের ছিল তাহলে স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারত।

পরিষ্কার হয়ে বাইরে পা বাড়াল ও। খানিকটা হাঁটতেই আনন্দকে দেখতে পেল। পাশে জয়িতা। সামনে অন্তত জনাদশেক ছেলেমেয়ে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে পালদেম। সুদীপের খিদে পাচ্ছিল। এখন এখানে তিনবার খাবার হয়। চা সিগারেট বা জলখাবারের অভ্যেস অনেক দিন দূর হয়ে গেছে। প্রথম দুটো ছাড়া জীবন কাটানোর কথা একসময় কল্পনা করা যেত না অথচ এখন স্বচ্ছন্দে সেটা মেনে নিচ্ছে সে। একেই হয়তো বলে অভ্যেসের দাসত্ব করা।

আনন্দ সুদীপকে দেখে হাসল, 'আমরা রেডি।'

সুদীপ দেখল গোটা সাতেক এলাচের বোঝা তৈরি হয়েছে। মুরগি অন্তত পঞ্চাশটা। বেতের ঝাঁকায় ডিম। এই বোঝা নিয়ে মানুষজন তৈরি। ওরা যাবে সুকিয়াপোকরি বাজারে। চ্যাঙথাপু কিংবা ওয়ালাংচুঙে এলাচ বিক্রি হবে না। সেটা ফালুট সান্দাকফুতেও বিকোবে না। সুকিয়াপোকরির বাজার বেশ বড়। নানা জায়গার ব্যাপারীরা আসে সেখানে। সওদা নিয়ে যেতে হবে সেখানে। প্রতি সপ্তাহে এলাচ কেনার মত পাইকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগি, ডিম কেনার লোকের অভাব কখনও হবে না। পালদেমকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে আনন্দ। গ্রামের প্রতিটি মানুষ উত্তেজিত। এই প্রথম তাপল্যাঙ থেকে কোন জিনিস বাইরে বিক্রির জন্য যাচ্ছে। এইসব বিক্রি হলে যে টাকা আসবে তা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত।

হঠাৎ সুদীপ ঘোষণা করল, 'আমি পালদেমের সঙ্গে যাব।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ইম্পসিবল। তুই চ্যাঙথাপুতে পৌঁছনোমাত্র খবর চাউর হয়ে যাবে। পুলিশ তোকে ধরলে এদের ছেড়ে দেবে না। ব্যস, সারা জীবনের মত পরিকল্পনা ডকে উঠবে।'

সুদীপ স্পষ্টত বিরক্ত হল, 'দূর! এইভাবে এখানে বন্দী হয়ে থাকা যায়? পাইকাররা এদের ঠকাবে। এরা সভ্য মানুষের হালচাল কিছুই জানে না। সবাই লুটেপুটে নেবে।'

'প্রথমবার নিতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে অভিজ্ঞ করে। এর পরের বার ওরা যখন যাবে তখন আর ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না।' আনন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

এতক্ষণ পালদেম চুপচাপ শুনছিল। এবার সে সুদীপকে বলল, 'তুমি সঙ্গে যেতে চাইছ কেন?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আর বলে লাভ কি হবে! যাও ঠকে এসো। ঠকে শেখো।'

পালদেম হাসল, 'ঠকলে ক্ষতি নেই যদি তা থেকে কিছু শেখা যায়। মুশকিল হল এই এলাচের দাম কত তা তো আমরা জানি না, তোমরাও না। ওরা যা বলবে তাই মানতে হবে।'

সুদীপ হকচকিয়ে গেল। জয়িতা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পালদেমের কথাটা মিথ্যে নয়। সে সত্যি জানে না এলাচ কি দরে বিক্রি হয়। এমনকি ডিম অথবা মুরগির বিক্রয়মূল্য তার জানা নেই। কিন্তু সে এগুলো যে শহুরে কায়দায় জেনে নিতে পারে তা পালদেম পারবে না। কিন্তু কথাটা বলল না সে। কারণ তাহলে বলতে হয়, পালদেম, তোমাদের চেয়ে আমরা শহরের মানুষরা অনেক বেশি ধূর্ত।

মালপত্র মাথায় চাপানো হল। বাঁশের দু'প্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া হল। এই সপ্তাহে বিক্রির টাকায় কোন

জিনিস কিনবে না এরা। যেতে আসতে অন্তত দিন পাঁচেক সময় ব্যয় হবে। এবং পরের সপ্তাহের জন্যে খদ্দের তৈরি করে আসবে এরা। তখন ফেরার সময় গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হবে। পুলিশ কিংবা সাধারণ মানুষ যদি তাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে অনেককাল আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হলেও হতে পারে কারণ খচ্চরওয়ালারা পর্যন্ত ওদের দেখতে পায়নি। সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল পালদেমকে সিগারেট এবং চা-পাতার জন্যে টাকা দিতে। কিন্তু কিছু কেনা এযাত্রায় হবে না, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে চাইল না সে। তাছাড়া ওরা চা-পাতা এবং সিগারেট কিনতে দোকানে গেলে সন্দেহ বাড়বেই।

সম্মিলিত আনন্দধ্বনির মধ্যে পালদেমরা যাত্রা শুরু করল। গ্রামের বাইরে দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছে এরা। এই গ্রামের ইতিহাসে কখনও হয়নি। তাপল্যাঙের মানুষরা এখনও শঙ্কা এবং খুশিতে দুলছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। গ্রামের শেষপ্রান্তে এই সময় কয়েকটা মানুষকে দেখা গেল। এরা একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করল। রোলেন এবং তার গ্রামের চারজন এই যাত্রা দেখতে এসেছে। জয়িতা এগিয়ে গেল রোলেনদের কাছে।

সুদীপ এবং আনন্দ দুটো দৃশ্য দেখছিল। পালদেমরা যাচ্ছে এবং জয়িতা রোলেনদের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেসে হেসে কথা বলছে। সুদীপের অস্বস্তি হচ্ছিল। সেই সময় শেষবারের মত হাত তুলে পালদেমরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

তাপল্যাঙের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর করতে প্রথম দলটি বাণিজ্যে বের হল।

॥ ৪৯ ॥

পাঁচ দিন নয়, ওরা ফিরে এল দিন আটেক বাদে। এল উত্তেজিত হয়ে। দলের বেশির ভাগের উত্তেজনার কারণ নতুন জনপদ দর্শন। ফালুট পর্যন্ত ঠিক ছিল, তারপর যত ওরা নেমেছে তত বিস্মিত হয়েছে। সান্দাকফুর বাংলো বাড়ি, কালিয়াপোকরির বসতি দেখার পর সুকিয়াপোকরিতে গিয়ে তো একদম দিশেহারা। ডিমগুলো বিকেভঞ্জনে পৌঁছনোর আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। একটা বিরাট দল পাহাড় দেখার জন্য উঠছিল, তারাই কিনে নিয়েছে। সান্দাকফুতে মুরগিগুলো কিনেছিল কয়েকটা সাদা চামড়ার লোক। বুদ্ধি করে পালদেম চ্যাঙথাপু থেকে ওদের সম্ভাব্য দাম জেনে গিয়েছিল। বিদেশীদের কাছে তাই যেন অত্যন্ত সস্তা মনে হয়েছিল। সুকিয়াপোকরিতে এলাচ বিক্রি করতে অবশ্য ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। সেই জন্যে তিন দিন দেরি হয়ে গেল। পরে জেনেছে এবারে ওরা জলের দরে এলাচ বিক্রি করেছে। কিন্তু পাইকার ঠিক করে এসেছে ওরা। সুকিয়াপোকরি পর্যন্ত যেতে হবে না, কালিয়াপোকরি পর্যন্ত নামিয়ে দিলেই চলবে। ওখান থেকেই পাইকার চার চাকার গাড়ি করে নিচে নিয়ে যাবে। গ্রাম ছাড়ার আগে পালদেম ভাল করে টাকা চিনে গিয়েছিল। সে কুড়ি করে করে গুনে যা ঘোষণা করল তার যোগফল চারশো আশি টাকা।

সুদীপ মন্তব্য করল, 'যে যেমন পেরেছে এদের টুপি পরিয়েছে।'

আনন্দ হাত তুলে ওকে কথা বলতে নিষেধ করতেই সুদীপ খেপে গেল। সে বলল, 'দ্যাখ আনন্দ, দিনকেদিন তোর ধরন-ধারণ খোমেনির মত হয়ে যাচ্ছে। আমরা বন্ধু, তুই আমার ধর্মযাজক নোস। আমি এতদিন কিছু বলিনি কিন্তু!'

'আমি ধর্মযাজক? আমাকে দেখে তাই মনে হয়?' আনন্দ বিস্মিত হল।

'এমন মুখ করে থাকিস যেন পৃথিবীর সব সমস্যা বুঝে গেছিস। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়ে গিয়েছে। ওয়াইন আর উওম্যান তো দূরের কথা, জাস্ট একটা খিস্তি উচ্চারণ করা মহাপাপ। তুই ছাড়া এখানে যেন কোন প্রাণ জাগত না! এরা তোকে আর জয়িতাকে অনেক আপন ভাবে কেন তা জানি না। তোর ভান এরা না বুঝতে পারলেও আমি বোকা নই।' সুদীপ হঠাৎ উত্তেজিত হল।

'ভান? কি ভান করি আমি?'

'পৃথিবীরতে তোর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল তাপল্যাঙের মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর

সেটা ভাবতে গিয়ে তুই অন্য কিছু ভুলে যাস। এমন কি আমাকেও অপমান করিস!'

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল, 'আনন্দরটা বুঝলাম, আমি কি ভান করি সুদীপ?'

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকাল না, 'তুই শালা ছুপা রুস্তম! এদের মধ্যে এমনভাবে মিশে গেছিস যেন তোর বাপ-মা এখানেই জন্মেছিল! তাছাড়া ওই রোলেন লোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন তোর? দেয়ার ইজ এ ধান্দা বিহাইন্ড দ্যাট, সেটা কি বুঝতে পারছি না! তোদের মনে রাখা উচিত আমরা চারজন এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছিলাম। এখানে থেকে যাওয়ার কোন পূর্ব পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। গ্রামটাকে দেখার পর আমরা এদের সাহায্য করার কথা ভেবেছিলাম। এই দু'বছরে আমরা অনেক করেছি। এবার ওদের চরে খেতে দে। কিন্তু তোদের ভাবভঙ্গি দেখে মনেই হচ্ছে না কখনও এদের ছেড়ে যাবি। সেইটেই বিভ্রান্তিকর।'

আনন্দ বলল, 'সুদীপ, এ নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করতে পারি। পালদেমের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা এখনও শোনা হয়নি। হ্যাঁ, পালদেম বল। তোমাদের জিনিসগুলো বিক্রি করতে কি কি অসুবিধে হয়েছে?'

পালদেম এতক্ষণ সুদীপের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চটজলদি উচ্চারণের বাংলা মাথায় ঢুকছিল না তার। তবে সে বুঝতে পারছিল এদের মধ্যে ঝগড়া চলছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি খুব ঠকে গেছি? আসলে এত টাকা নিজেরা কখনও রোজগার করিনি তো, এর পরের বার এ রকম হবে না।'

পালদেমের এক সহযোগী হেসে বলল, 'আমরা যে বেতের দুটো ছোট ঝুড়িতে ডিম নিয়ে গিয়েছিলাম তাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করছিল ওরকম ঝুড়ি আরও আছে কিনা।'

আনন্দ জয়িতার দিকে খুশিমুখে তাকাল? জয়িতা বলল, 'বাঃ, তাহলে তো আমরা প্রতি বছর ভাল ঝুড়ি সাপ্লাই দিতে পারি। আহা এই বেতশিল্পটা যদি ভাল জানা থাকত!'

'কথা শুনলে লিভার ড্রাই হয়ে যায়। যেন মোটামুটি জানতিস কলকাতায় থাকাকালে।' সুদীপ মন্তব্য করল। জয়িতার চোয়াল শক্ত হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায় তোমাদের আর কোন অসুবিধের সামনে পড়তে হয়নি পালদেম?'

কথা হচ্ছিল যৌথগৃহে বসে। প্রতিটি মানুষ ঠিকঠাক ফিরে এসেছে বলে গ্রামবাসীরা খুশিমুখে ভিড় করেছিল। পালদেম মাথা নাড়ল। চারপাশে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। চট করে কেউ আমাদের থাকতে দেয়নি। নানান প্রশ্ন করেছে। তাপল্যাঙ নামটাই অনেকে শোনেনি। আমরা কেন এতদিন গ্রাম থেকে বের হইনি, গ্রামটা কি রকম, কি কি পাওয়া যায়—এই সব কথা জানতে চেয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে বারবার গেলে ওদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর ওরাও এখানে আসতে চাইবে। তখনই হবে মুশকিল।'

'ভয় হচ্ছে কেন?'

'চ্যাঙথাপু কিংবা ওয়ালাংচুঙের মানুষরা আমাদের মতন। কিন্তু নিচের মানুষদের হালচাল কেমন যেন! সবাই যেন সবসময় মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করে। আমাদের মদ আর মেয়েমানুষের আড্ডায় নিয়ে যেতে চাইছিল খুব। ছোকরারা প্রলোভিত হচ্ছিল কিন্তু আমি খুব সামলে রেখেছিলাম।'

পালদেমের কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল, 'মেয়েমানুষের আড্ডা? সেটা কি?'

পালদেম বলল, 'সেখানে মেয়েরা মুখে রঙ মেখে পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোয়।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া ছিটকে উঠল। পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার মত জঘন্য ব্যাপার যে মেয়েরা করতে পারে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হল। কেউ একজন চিৎকার করল, 'সত্যি বলছ তো, তোমরা তাদের কাছে যাওনি?'

'আমাদের কাছে তো পয়সাই ছিল না। আর এই বিক্রির টাকা তো খরচ করার জন্যে নয়।'

'যা হবার হয়েছে, এর পর আর সেখানে যেতে হবে না।'

কথাটা যে বলল তাকে চিনতে পারল সুদীপ। পালদেমের বউ। সে হাসল, 'আচ্ছা, আগুনে হাত দিলে পুড়ে ফোসকা পড়ে তাই বলে কেউ আগুন জ্বালবে না? কি বল তোমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক ঠিক। এর পরে পালদেম আসল প্রসঙ্গে এল। পথ চলতে চলতে

যে গ্রামে ওরা থেমেছে, যে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা যখনই জেনেছে তারা উত্তরের পাহাড় থেকে এসেছে তখনই জানতে চেয়েছে সেই ডাকাতরা এখনও ওখানে আছে নাকি যাদের পুলিশ ধরতে পারলে অনেক টাকা দেবে। যে ডাকাতরা নাকি একটা গ্রামে দু'হাতে টাকা বিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ডাকাতদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে যাকে ভোগ করতে পারলে যে-কোন পুরুষ ভাগ্য মনে করবে। পালদেমরা সমানে জবাব দিয়ে গিয়েছিল, ডাকাতরা এসেছিল কিন্তু অনেকদিন আগে, যখন পুলিশ হামলা করেছিল তখনই আরও উত্তরের বরফের পাহাড়ে ওরা পালিয়ে গিয়েছে। অনেকে কথাটা বিশ্বাস করেছে, বেশির ভাগ সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে। কিন্তু ওরা যে হঠাৎ গ্রাম থেকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে বের হল এতে সবাই অবাক হয়েছে। ডাকাতরা থাকলে তাদের টাকা দিয়েই খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনত? তারা নেই বলেই ওরা বাইরে পা বাড়িয়েছে? কেউ কেউ রসিকতা করেছে, টাকার স্বাদ বড় মারাত্মক। একবার টের পেলে আর রক্ষে নেই। নাহলে যারা কোনকালে গ্রাম ছেড়ে বের হত না তারা জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসে! খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে মানেভঞ্জনে দেখা হয়েছিল। তারা তো দেখেশুনে অবাক। এই গ্রীষ্মে তাদেব দরকার পড়বে না তাপল্যাঙে জেনে খুব রেগে গিয়েছে। ওরাই সমস্ত জিনিসপত্র কিনে নেবে এখানে এসে, কষ্ট করে আসতে হবে না নিচে, এই রকম বলেছিল। কিন্তু তাতে নারাজ হওয়ায় ওরা খুব হতাশ হয়েছে। ফেরার পরে ওয়ালাংচুঙের লোকরা গল্প শুনেছে তাদের কাছে। তারাও ঠিক করেছে জিনিসপত্র নিয়ে নিচে যাবে বিক্রি করতে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা সবশেষে বলল পালদেম। শেষরাত্রে তাদের সবাইকে ধরে রেখেছিল ফুলিয়াপোকরির পুলিশ। না, মারধোর করেনি। কিন্তু কোত্থেকে আসছে, কেন আসছে, কে তাদের আসতে বলেছে এইসব প্রশ্ন করেছে। এবং পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত বলেছে ডাকাতরা ওদের যাওয়ার আগে শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে নতুন করে বাঁচতে হয়। এই যৌথগৃহ, যৌথরান্না, যৌথ রোজগার এসবের হদিস পেয়েছে ডাকাতদের কাছ থেকেই। ডাকাতদের ওরা কখনই ভয়ঙ্কর মানুষ মনে করেনি। বরং বেশ বন্ধু বলেই মনে হয়েছে। পুলিশ ওদের অনেক প্রশ্ন করলেও ওরা কেউ বলেনি এই মুহূর্তে তাপল্যাঙে ডাকাতরা রয়েছে। পুলিশ ছেড়ে দেবার আগে বলেছে যদি ওই ডাকাতরা আবার গ্রামে আসে তাহলে যে করেই হোক ধরে ফেলে যেন ওরা। তাহলে ওদেশের সরকার অনেক অনেক টাকা তাদের উপহার দেবে। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে এই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাপল্যাঙ অনেক দূরে তাই খবরটা পৌঁছয়নি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল ডাকাতদের কাছে ভারী ভারী অস্ত্র আমরা দেখেছি কিনা! আমরা বলেছি সেসব কিছুই দেখিনি।

সবাই চুপচাপ শুনছিল। পালদেম কথা শেষ করামাত্র সুদীপ বলল, 'আমাদের নিয়ে তোমরা দেখছি দারুণ ঝামেলায় পড়েছ। এখন তোমরাই ঠিক কর আমরা এই গ্রামে থাকব কিনা! তোমরা চাইলে আমরা এক্ষুনি চলে যেতে পারি।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু কোথায় যাবে তোমরা? পাহাড়ের যে-কোন গ্রামে গেলেই লোকে তোমাদের চিনে ফেলবে।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল, 'তাহলে সোজা ব্যাপারটা করে ফেল। আমাদের ধরিয়ে দিলে তোমরা প্রচুর টাকা পাবে।'

হঠাৎ সাওদের উঠে দাঁড়াল, 'দ্রিমিত, তোমার বন্ধুকে বলে দাও আমরা বেইমান নই। বন্ধুর বন্ধুত্ব রাখতে জানি।'

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিল, 'সাবাস! আমি এই চেয়েছিলাম।' বলে উঠে দাঁড়াল, 'নেপালের পুলিশের কথা জানি না কিন্তু ইন্ডিয়ান পুলিশ এত সরল হবে মনে করার কোন কারণ নেই। এখান থেকে পাথর ফেলে যাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা হাতের মুঠোয় গ্রামের লোকদের পেয়েও ছেড়ে দেবে এটা আমি ভাবতে পারছি না। ইম্পসিবল!'

'কিন্তু ছেড়ে যে দিয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস।' জয়িতা জবাব দিল।

'পাচ্ছি। আর সেইটেই সন্দেহজনক।' সুদীপ বাংলায় কথা বলছিল।

হঠাৎ আনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'সুদীপ, সব কিছুর একটা সীমা আছে। নিজেকে ছোট করিস না।'

'কে কাকে ছোট করে। অঙ্কের হিসেবে গোঁজামিল আছে বলে দিলাম।' সুদীপ আর দাঁড়াল না।

সাওদের ওর যাওয়া দেখল। তারপর বেশ জোরেই বলল, 'ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝেই মনে হয় ও ঠিক তোমাদের মত নয়। এখন ও রেগে গেল কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সবার মন মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না। যা হোক, প্রথম যাত্রায় বেশ ভাল কাজ হয়েছে আমাদের। চারশো আশি টাকা তোমরা রোজগার করেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

পালদেম টাকাগুলো আনন্দর দিকে বাড়িয়ে দিল। আনন্দ দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না। এই টাকা আমার কাছে থাকবে না। দুজন মানুষ নির্বাচন কর, তারা টাকার হিসাব রাখবে।'

পালদেম বলল, 'গ্রামের মানুষ বেশি হিসাব জানে না।'

আনন্দ লা-ছিরিঙকে ডাকল, 'লা-ছিরিঙ, তুমি দ্রিমিতের কাছে হিসেব শিখে নাও। এখন টাকাগুলো এমনভাবে রাখবে যাতে তুমি আর পালদেম দায়ী থাকো। মাটির নিচে পুঁতবে না। যাও, তোমরা এবার বিশ্রাম করো।'

সভা ভেঙে যাওয়ার পর জয়িতা বলল, 'তুই তো বেশ এদের সামনে আমাকে দ্রিমিত বলে ডাকতে শুরু করেছিস! আমারও না সবার মুখে দ্রিমিত দ্রিমিত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে কোনকালে কলেজে পড়িনি। তুই আর আলাদা করে জয়িতা বলে ডাকিস না।'

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে জয়িতার মুখ দেখল। ইদানীং ওই মুখে অন্য ধরনের লাবণ্য এসেছে। সেই শহুরে পালিশটা নেই। মুখ ফেটেফুটে একাকার কাণ্ড ঘটেছিল একসময়। এখন একটা বুনো পাহাড়ি ছাপ পড়ে গেছে সর্বত্র। জয়িতার চুল বড় হয়েছে। কিন্তু বেদম রুক্ষ। এই চুল নিয়ে ও মরে গেলেও কলকাতার রাস্তায় পা বাড়াত না। চেহারা তাদেরও কম পালটে যায়নি। পোশাক জীর্ণ, গালে দাড়ি বেরিয়েছে, আরও রোগা হয়ে গেছে সে। চেহারা খারাপ হয়েছে সুদীপেরও, কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে ওর মেজাজের। কোন কিছুকেই আর ভাল দ্যাখে না সুদীপ।

কথাটা তুলল আনন্দ। জয়িতা বলল, 'দেখতে দেখতে কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে ও। সেই যে মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার পর থেকেই এই অবস্থা। তুই ভাবতে পারিস, ও মাঝে মাঝে পাহাড়ে ঘোরাফেরা করে কেন?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে মাথা নাড়ল আনন্দ। জয়িতা বলল, 'সেই ভালুকছানাদের দেখতে। ওর ধারণা ওরা ওকে দেখলেই চিনতে পারবে। পাহাড়ে ছেড়ে দেবার পর ওরা বেঁচে আছে কি-না তারই ঠিক নেই, আর বেঁচে থাকলেও যে এত বছরে মনে রাখার কথা নয় এটাই উধাও হয়ে গেছে ওর মাথা থেকে। আমি বলছি আনন্দ, এজন্যে ওই মেয়েটাই দায়ী।'

'কি রকম?' আনন্দ হাসল, 'তোর ওই মেয়েটাকে প্রথম থেকেই পছন্দ হয় না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, হয় না। মেয়েটা এই গ্রামেই থাকে অথচ গ্রামের মানুষের কোন কাজে হাত মেলায় না। আজ সমস্ত গ্রাম একজোট হয়ে কাজ করছে, তুই কখনও দেখেছিস ওকে এগিয়ে আসতে! গ্রামের মানুষও ওকে পছন্দ করে না। শুধু সুদীপের সঙ্গে লেপটে থাকা ছাড়া অন্য কোন ধান্দা নেই ওর। শী ইজ স্পয়েলিং হিম।'

'ইম্পসিবল। সুদীপকে যতটা জানি তাতে বিশ্বাস করি, কোন মেয়ে ওকে নষ্ট করতে পারে না।'

'তুই ওই আনন্দেই থাক। মেয়েটার কখনই বাচ্চা হবে না, এখানকার সবাই একথা জানে।'

'তুই মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্চিস জয়িতা।'

'কল মি দ্রিমিত।'

এবার আনন্দের মুখে কৌতুক ফুটল, 'তুই নামটাকে পছন্দ করছিস?

'অফ কোর্স। আমি ভুলে যেতে চাই আমার নাম জয়িতা। রামানন্দ রায় সীতা রায় আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। অতীতের একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে চাই এবং সেটা হল শিক্ষা। এদের সঙ্গে সারা জীবন এদের হয়ে থাকতে চাই আমি। সুদীপ যা করছে তা বাইরে থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকের মত। ত্রাণসামগ্রী ফুরিয়ে গেলেই চলে যাবে যেন। এখন আর আমি ওই ভূমিকায় থাকতে চাই না।' কথা বলতে বলতে জয়িতা আনন্দর সঙ্গে হাঁটছিল।

ওরা এতক্ষণ আস্তানার কাছে চলে এসেছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'যে কোন রেফারেন্সে তুই সুদীপকে টানছিস, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট মি?'

জয়িতা বলল, 'তোকে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারব না। ইট ইজ ইউ হু গেভ মি ইন্‌সপিরেশন। এখানকার সমস্ত পরিকল্পনাই তোর মাথা থেকে বেরিয়েছে। গ্রামের মানুষ তোকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমাকে মনের কথা খুলে বলে।'

কথাটা শুনে আনন্দ অনেকদিন বাদে হো হো করে গলা খুলে হাসল। কিন্তু জয়িতার মনে হল হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। একটানা অনেকটা উঠে আসায় ওর বুকে হাঁপ ধরল। ক'দিন থেকে এটা প্রায়ই হচ্ছে। মাথা ঘুরছে, এক ধরনের অস্বস্তি বেশ কিছুদিন সেঁটে থাকে শরীরে।

আনন্দ আর কথা বলল না। মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সামনে। ওদের দেখে বলল, 'খাবার হয়ে গিয়েছে। খাবে তো চলে এস।' আনন্দ তাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কনকনে জল মুখে কপালে দিতে জয়িতা যেন আরাম পেল। সে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। শরীরটা গোলাচ্ছে। সকাল থেকে কিছু পেটে না দেওয়ায় এরকমটা হচ্ছে। লিভারটার কি অবস্থা কে জানে! আজকাল একটা ভয় তার খুব করে। ভাল এবং নিয়মিত খাবারের অভাবে তার কি প্রেসার কমে যাচ্ছে? নাহলে মাথা ঘোরে কেন? সে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল মেয়েটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতে সে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দুটো পা সামনে ছড়িয়ে জয়িতা বসল। সামনেই বরফচূড়ো থেকে একটা হিম বাতাস নেমে এল তখনই। খুব ভাল লাগল জয়িতার। সে নিজের পোশাক দেখল। এগুলো পালটানো দরকার। খুব বেশিদিন টিকবে না। সুদীপের কাছে যে অর্থ অবশিষ্ট আছে তাতে আর হাত দেওয়া হবে না বলে ঠিক হয়েছে। এখন গ্রামগত উপার্জনে প্রত্যেককে বেঁচে থাকতে হবে। গ্রামের যে-কোন মেয়ে যা পোশাক পরে সে তাই পরবে। সে মুখ তুলে গ্রামটার দিকে তাকাল। এমনভাবে চেহারা পালটে যাবে তা কে ভেবেছিল! কলকাতা থেকে পালাবার সময়েও তাদের কল্পনায় ছিল না। পাথরের দেওয়ালে প্রাণশক্তি এতকাল আটকে ছিল। সবে ছিদ্রপথ পেয়েছে বাইরে বের হবার। এবং যে কোন তরল পদার্থের মত সেই ছিদ্র বড় করার চেষ্টায় ব্যস্ত সমস্ত গ্রাম। শুধু দেখতে হবে উৎসাহের আতিশয্য যেন সমস্ত কাজ ভণ্ডুল না করে দেয়। যে কোন সুপ্রাপ্তিই মনে আশঙ্কা আনে। সুখের গন্ধ পাওয়ার মুহূর্তে গ্রামবৃদ্ধরা বলতে শুরু করেছে, এসব যাদের জন্যে হল তারা যদি চলে যায় তাহলে কিছুদিন পরে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে গ্রামটা। মাঝখানে এই স্বাদ বদলের স্বাদ নতুন বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো ঠিক, কিন্তু জয়িতা ভাবে ব্যাপারটা ফুটবল টিম কোচিং-এর মত হয়ে যাচ্ছে। তারা সূত্রপাত করতে পারে মাত্র, কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষকেই। নেতৃত্ব নিতে হবে তাদেরই। নির্ভরতা এক্ষেত্রে কখনই কাম্য নয়। কিন্তু তাকে তো এই গ্রামেই থেকে যেতে হবে। একটা বাসযোগ্য পৃথিবী চেয়েছিল সে। এখন তো জয়িতা নেই, এখন সে দ্রিমিত। এই গ্রামটিকে ক্রমশ সেই জায়গায় পৌঁছে দেবে গ্রামবাসীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। রোলেনদের গ্রামেও এখন তাপল্যাঙের ছোঁয়াচে ভাব গেছে। সেখানেও যৌথগৃহ, যৌথখামার তৈরির চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখানে অভাব এবং অসুখ এত প্রবল ছিল যে বাধা আসেনি তেমন কিন্তু ওখানে সচ্ছল মানুষের সংখ্যা বেশি বলে প্রতিবন্ধকতা আসছে। কিন্তু গত বরফের সময় যে তাপল্যাঙের মানুষ কম কষ্ট পেয়েছে এটা ওরা লক্ষ্য করেছে। সেইটেই ওদের যৌথগৃহ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সময় আনন্দ তাকে খেতে ডাকল।

সুদীপ যার নাম দিয়েছে খিচুড়ি তার স্বাদ এখন ওদের সয়ে গেছে। কিন্তু এখানে উনুনে থাকতে থাকতেই খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওরা চারজন খাচ্ছে গোল হয়ে বসে। আনন্দ চটপট কিছু পেটে চালান করে দিয়ে বলল, 'জব্বর খিদে পেয়েছিল।'

সুদীপ ওর দিকে তাকাল। তারপর বাংলায় বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের কলকাতায় ফেরা দরকার। পুলিশ সম্পর্কে আমরা হয়তো মিছিমিছি আতঙ্কিত হয়ে আছি। অ্যাদ্দিনে কলকাতায় অনেক খুন হয়েছে, অনেক ডাকাতি, এখন আর আমাদের জন্যে কেউ নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে বসে নেই। লেটস গো ব্যাক।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ একথা তোর মনে হচ্ছে কেন?'

'কলকাতা থেকে বেরুবার আগে তুই বলেছিলি কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে আবার আমরা ফিরে আসব। কথাটা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে?' সুদীপের গলায় সামান্য ঝাঁঝ।

'আছে। কিন্তু বল্, কি উদ্দেশ্যে আমরা কলকাতায় যাব? আরও কয়েকটা মন্ত্রী অথবা চোর খুন করে কিছু লাভ হবে না। ব্যক্তিহত্যা কখনই সাধারণ মানুষের উৎসাহ আনে না। তাছাড়া মধ্যবিত্ত বঙ্গবাসী কখনই আঙুল তুলবে না। ওরা রাজনীতি করে কিছু পাওয়ার লোভে এবং ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগই গর্তে মুখ গুঁজে থাকা পছন্দ করে। ভারতবর্ষে যদি কখনও বিপ্লব হয় তাহলে গ্রামে আগুন জ্বলবে প্রথমে। সেই আগুনে রোস্ট হয়ে শহরের মানুষের যদি চৈতন্য জাগে। আমরা ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারব না। বরং এখানে তিল তিল করে এই নবজাগরণ চলছে, আমাদের উচিত এর সঙ্গী হওয়া।' আনন্দ খুব সিরিয়াস গলায় বলল।

'এই জন্যেই এখানে থাকা উচিত নয়, এদের উচিত আমাদের হাত ধরে নয়, নিজেদের পায়ে নিজেরা যাতে দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করা। নাহলে এরা কখনই স্বাবলম্বী হবে না। তাছাড়া তোদের কথা আমি জানি না, বাট আই অ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড।' সুদীপ একবার তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা মেয়েটির দিকে তাকাল। যেন ক্লান্তিটা উভয় অর্থে তা বুঝিয়ে দিল।

আনন্দ প্রথমে কিছু বলল না। তারপর সবাই চুপচাপ দেখে বলল, 'নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তোর আছে। তবে কিছু করার আগে তোর উচিত ভেবে দ্যাখা।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল। জয়িতা দুটো দলা পেটে দেবার পর আর খেতে পারছিল না। সে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু ক্রমশ তার শরীরের অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। শরীর গোলাচ্ছে, মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না। যে বিষয় নিয়ে সুদীপ প্রশ্ন তুলেছে সেটা তারও ভাবনায় এসেছিল কিন্তু যেভাবে সুদীপ সমাধান চাইছে তা মানতে সে নারাজ। কিন্তু এখন তার তর্ক করতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। খাবার ছেড়ে দিয়ে সে উঠে পড়তেই সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' জয়িতা কোন জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগতে সামান্য স্বস্তি হল কিন্তু পৃথিবীটা টলছে তার। হাত ধুয়ে মুখে জল দিতে দিতেই মনে হল গলার কাছে অস্বস্তি। সে বসে পড়তেই খাবার বেরিয়ে এল হুড়হুড় করে। শব্দ করে কয়েকবার বমি হল তার। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে হাঁপাচ্ছিল। মুখ হাঁ এবং চোখ বন্ধ। সে ওই অবস্থায় চোখের কোলে জলের অস্তিত্ব টের পেল। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে পড়লে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হল তার। সে চোখ খুলতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল। আস্তানার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা অবাক চোখে এদিকে চেয়ে আছে। ক্রমশ তার মুখে একটা আশ্চর্য আলো ফুটে উঠল। এক ঝটকায় সে ভেতরে চলে গেল। ও রকম কেন ও করল জয়িতা ঠাওর করতে পারল না। সে অবসন্ন শরীরটা টেনে তুলল, তারপর জল ঢালতে লাগল বমি পরিষ্কার করতে।

মেয়েটার ছুটে আসার ভঙ্গি সুদীপকে অবাক করল। আনন্দ দেখল নিজের খাবারের সামনে বসে মেয়েটা হাসিমুখে খাবার মুখে পুরছে আর মাথা দুলিয়ে মজার ভঙ্গি করছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই, তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে?'

মেয়েটা সেইভাবেই জবাব দিল, 'ভাল খবর, খুব ভাল খবর!'

'ভাল খবর? বাইরে আবার কি ভাল খবর হল?' সুদীপের বিরক্তি বাড়ছিল। মেয়েটি আচমকা তার এঁটো মুখ সুদীপের কানের কাছে নিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। কি বলল সে আনন্দ ঠাওর করতে না পারলেও লক্ষ্য করল সুদীপ অবাক হয়ে গেছে। চকিতে সুদীপ আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর সেই অবস্থায় উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে সুদীপ দেখল জয়িতা তখনও মাথা নিচু করে জল ঢালছে। এর মধ্যেই ওর চেহারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁট কামড়াল। তারপর নিজের মনে উচ্চারণ করল, 'না। ইটস ইম্পসিবল। আমি বিশ্বাস করি না।'

সেই সময় দূরে চিৎকার শোনা গেল। একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে। তার কথা শুনতে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এল। লোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছিল। সুদীপ অবাক হয়ে এবার সেদিকে তাকাল। পুলিশ নয়তো! এবার লোকগুলো আস্তানার দিকে ছুটে আসছে। লা-ছিরিঙ এবং পালদেম ওদের সঙ্গে রয়েছে। লা-ছিরিঙ সুদীপকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বহুৎ মারপিট চলছে, তিন চার জন লোক ঠিক মরে যাবে।'

'কোথায়?' সুদীপের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক, পুলিশ নয়।

'পাশের গ্রামে।'

এই উত্তেজনা সম্ভবত জয়িতাকে আচমকা সুস্থ করে দিল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে লা-ছিরিঙ?'

লা-ছিরিঙ বোঝাল পাশের গ্রামে ক'দিন থেকেই ঝামেলা চলছিল। আজ দস্তুরমত মারামারি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে তিন-চারজনের লাস পড়ে গেছে। ওই ছেলেটি গরু চরাতে পাশের গ্রামের কাছে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে ছুটে এসেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'লড়াইটা কাদের সঙ্গে হচ্ছে?'

এবার পালদেম জানাল, 'নিজেদের মধ্যে।'

এই সময় আনন্দ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। খবরটা শোনামাত্র সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এমন কি কারণ ঘটতে পারে যে একটা গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে! বরং গ্রামে গ্রামে রেষারেষি থাকায় এরা জোট বেঁধে থাকাটাই পছন্দ করে। সুদীপ বলল, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তাপল্যাঙে কিছু হলে না-হয় আমরা ভাবতাম।'

হঠাৎ জয়িতা ফোঁস করে উঠল, 'কেন, তাপল্যাঙের ভাল-মন্দের ইজারা নিয়েছিস নাকি তুই?'

সুদীপ হতভম্ব হল। জয়িতার সেই ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গিটা নেই। মেয়েটির কাছে যে ইঙ্গিত সে পেয়েছিল তার কোন হদিস পাচ্ছে না এখন। বরং জয়িতা যেন তাকে এদের সবার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সে কোনরকমে বলতে পারল, 'কি ভ্যানতারা করছিস?'

জয়িতা ওর কথায় কান দিল না। আনন্দর সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'রোলেনদের গ্রামে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। ওরা আমাদের সাহায্য করেছিল এক সময় এটা ভুলে যাস না।'

সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছিল আনন্দ! সে ভেতরে ঢুকে রিভলভারটা তুলতে গিয়ে মাথা নাড়ল। এর কর্মক্ষমতা এখন কতটা সন্দেহ আছে। কিন্তু তবু সঙ্গে থাকলে ভরসা হয়।

রোলেনদের গ্রামের ধার-বরাবর পৌঁছে দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। তাপল্যাঙের অন্তত জনাবিশেক যুবক এসেছে ওদের সঙ্গে। পাহাড়ের একটা ঢালে দাঁড়িয়ে ওরা সমস্ত গ্রামটাকে দেখতে পাচ্ছিল। কয়েকটা বাড়িতে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চারদিকে এখনও ছোটাছুটি চলছে। যে যৌথগৃহ রোলেনরা তাপল্যাঙের অনুসরণে বানিয়েছিল সেটি এখন মুখথুবড়ে রয়েছে। এখনও টানা কাঁদছে কেউ কেউ। থমথমে হয়ে আছে পুরো গ্রামটা। এই মুহূর্তে অবশ্য কোন মারামারি চোখে পড়ল না। আনন্দ অনেকটা নিজের মনেই বলল, 'ব্যাপারটা কি!'

সুদীপ বলল, 'যাই হোক না কেন,' এটা ওদের সমস্যা আমি আবার বলছি।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। তারপর নিচুগলায় বলল, 'তুই এরকম পালটে গেলি কি করে?'

'পালটে গেছি আমি?' সুদীপ হাসল, 'হয়তো পরোপকার করার ঠেলায়।'

আনন্দ আর কথা বাড়াল না। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা কয়েকটি যুবককে দেখল, দূরে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে বেশ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। এছাড়া তাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য সেখানে কোন মানুষের চলাফেরা নেই। জয়িতা বলল, 'আমাদের যাওয়া উচিত।'

আনন্দ বলল, 'তোরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি। কিছু হলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমিও যাচ্ছি। ওরা আমাকে কিছু বলবে না। রোলেনকে খুঁজে বের করা দরকার।'

তাপল্যাঙের যুবকদের সঙ্গে সুদীপ ওপরেই রয়ে গেল। আনন্দ আর জয়িতা সাবধানে নিচে নামতে লাগল। নিজের শরীরের অস্বস্তিটাকে এখনও টের পাচ্ছিল জয়িতা। কিন্তু বাইরের উত্তেজনা সেটাকে অনেক দমিয়ে দিয়েছে। ওরা নিচে এসে দাঁড়াতেই যুবকরা ওদের দেখতে পেল। প্রথমে ভয় তারপর সন্দেহ ওদের চোখে ফুটে উঠল। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে দুজন ছুটে চলে গেল আড়ালে। জয়িতা হাত তুলে চিৎকার করল, 'কি হয়েছে তোমাদের গ্রামে?'

খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটো কোন জবাব দিল না। জয়িতা আবার চিৎকার করল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের সাহায্য কবতে এসেছি।'

এবার দুজন নিচু গলায় কথা বলল। তারপর ওরা এগিয়ে এল থমকে দাঁড়ানো আনন্দর সামনে। প্রথম লোকটি বলল, 'এখানে আজ কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে না। তোমরাও বলো না।'

এইরকম কথা শুনবে কল্পনা করেনি ওরা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটি বলল, 'এই গ্রামের কয়েকটি পরিবার চায়নি যৌথগৃহ হোক, তাপল্যাঙের মানুষদের মত আমরা একসঙ্গে চাষ করি, বাইরে জিনিসপত্র বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসি। ওরা বাধা দিচ্ছিল খুব। আজ সকালে ওরা আমাদের একজনকে লুকিয়ে খুন করে। সেটা জানার পরে সমস্ত গ্রামের লোক ওদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ওদের তিনজনকে খুন করে বদলা নেওয়া হয়।' লোকটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'এখন আর আমাদের সামনে কোন বাধা নেই।'

এই সময় দুজন লোক ফিরে এল আরও কয়েকজনকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল জয়িতা। রোলেনদের সঙ্গে এ তাপল্যাঙে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সে জয়িতাকে বলল, 'এই প্রথম আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলাম, তোমরা কি তাই দেখতে এসেছ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'না। আমরা জানতাম না কি হয়েছে এখানে, তাই ছুটে এসেছিলাম।'

লোকটা বলল, 'ও! আমাদের আব কোন ঝামেলা নেই।' অত্যন্ত নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। আনন্দ বুঝল ওরা চাইছে না কেউ নাক গলাক। গ্রাম থেকে, সরাসরি না বললেও, চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওর ভাল লাগল। প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য এই রক্তপাত ওদের অনেক কাজে লাগবে। বলতে গেলে একত্রিত হবার প্রথম পদক্ষেপ এরা নিজেরাই অর্জন করল। ঠিকঠাক যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তাপল্যাঙের মানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশি স্বাবলম্বী এবং সংগঠিত হবে। আনন্দর মনে হল, তাপল্যাঙের যদি কিছু মানুষ প্রতি[illegible]ন্ধক হয়ে দাঁড়াত তাহলে ওদের অগ্নিপরীক্ষাটা সম্পন্ন হত।

সে জয়িতাকে বলল, 'চল ফিরে যাই।' তারপর যুবকদের বলল, 'যদি কখনও কোন সাহায্যের দরকার হয় আমাদের বলো।'

যুবকরা ঘাড় নাড়ল। আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল জয়িতা ফিরছে না। সে শুনল জয়িতা জিজ্ঞাসা করছে, 'রোলেন কোথায়?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকগুলো মাথা নিচু করল। জয়িতার গলার স্বর এক পর্দা উঠল, 'কি হল, কথা বলছ না কেন?'

লোকটি যে এতক্ষণ কথা বলছিল গম্ভীর গলায়, দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা শোনামাত্র হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নাটা সংক্রামিত হল তার সঙ্গীদের মধ্যে। ততক্ষণে গ্রামের আরও মানুষ ভিড় করেছে পেছনে। সম্মিলিত চাপা ক্রন্দনে ছেয়ে গেল গোটা চত্বর। জয়িতা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এমন অসাড় চেহারায় জয়িতাকে কখনও দ্যাখেনি আনন্দ। সে চাপা গলায় ডাকল, 'জয়িতা।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমি দ্রিমিত, দ্রিমিত।'

আনন্দ মাথা নাড়ল। তাবপর গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করল, 'রোলেন কোথায়?'

লোকগুলো দুটো ভাগ হয়ে গেল। একজন সেই রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে এল গ্রা[illegible] মাঝখানে। পথ চলতে ওবা পোড়া গন্ধ পেয়েছে বারংবার। ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ি নজরে এসেছে।

রোলেনকে চিনতে পারল আনন্দ। সুগঠিত শরীর নিয়ে সে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। ওকে ঘিরে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধা হাঁটু গেড়ে বসে সমানে কেঁদে যাচ্ছেন। আনন্দ মাথা নিচু করে দাঁড়াল। যে লোকটি নিয়ে এসেছিল পথ দেখিয়ে সে বলল, 'কাল রাত্রে ওরা রোলেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চুপিচুপি। আজ সকালে ওকে এই অবস্থায় পাই। রোলেন ওদের বারংবার অনুরোধ করেছে আমাদের সঙ্গে আসতে। সেই রাগে ওরা ওকে মেরেছে। ওর মৃতদেহ দেখে গ্রামের মানুষ খেপে গিয়ে—।' লোকটা আর কথা শেষ করল না।

যে কোন কাজ শুরু হয় কারও উদ্যম থেকেই। সেই উদ্যম যদি সে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে পারে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তাহলেই সে সফল। আনন্দ হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করল। যে কাজ তারা ভারতবর্ষের বিরাট প্রেক্ষাপটে করার কথা ভেবেছিল, যে কাজ তারা তাপল্যাঙের ছোট্ট পরিধিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রোলেন নিজেকে শহীদ করল। চকিতেই তার মনে পড়ল রোলেন তো কখনই তার এবং সুদীপের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেনি। তাকে তাপল্যাঙ গ্রামেও দেখা যেত না। তাহলে এই প্রেরণা সে কোত্থেকে পেল? আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোলেনের মৃতমুখের দিকে। আনন্দ শিহরিত হল। জয়িতা

যে কখন রমণী হয়ে গিয়েছে তা সে আগে লক্ষ্য করেনি। ওর ঠোঁট এখন থর থর করে কাঁপছে। এবং এই প্রথম আনন্দ জয়িতার দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়া দেখল।

আশ্চর্য গলায় জয়িতা বলল, 'আনন্দ, তুই ফিরে যা। আমি ওর শেষ কাজ পর্যন্ত থাকব।'

আনন্দ বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি সবাইকে ডেকে আনতে। তাপল্যাঙ আর এই গ্রামের মানুষ এক হয়ে শেষ কাজ শুরু করবে।'

॥ ৫০ ॥

লা-ছিরিঙ আর জয়িতা কথা বলতে বলতে আসছিল। গত সপ্তাহে যারা এই গ্রাম থেকে সুখিয়াপোকরিতে গিয়েছিল তারা ভাল ব্যবসা করছে। ওখানে একজন পাইকার তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এলাচ কিনবে। মুরগি এবং বেতের ঝুড়ি যদি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় অন্তত কালিয়াপোকরি পর্যন্ত তাহলে লাভ বেশি থাকবে। খচ্চরওয়ালারা যা যা জিনিস গ্রামে আনত তা অনেক সস্তায় ওরা কিনে এনেছে নিচু থেকে। এভাবে চললে আগামী বরফে প্রত্যেকের শরীরে গরমজামা একটা না একটা থাকবেই। আনন্দ চাইছে এ বছরের মধ্যে অন্তত তিনটে গরু কিনে আনতে নিচে থেকে। গরুর যা দাম তা শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা করা যাবে কিনা কে জানে! যদি জিনিসপত্র বিক্রির টাকা উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে আনন্দই ব্যবস্থা করবে। সুদীপের টাকা এখনও রয়ে গেছে অনেকটা। আনন্দ চাইছে এখানে একটা বেশ বড় ডেয়ারি করতে। পোলট্রি এবং ডেয়ারি যদি চালু করা যায় তাহলে সামনের বছর থেকে দুধ ডিম ও মুরগি চালান দিলে অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত হবে। তবে এখন সুদীপের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে। লাভ হবার পর শোধ করার দায় থাকবে। পাশের গ্রামের সঙ্গে তাপল্যাঙের এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেহেতু ওরা আনন্দ কিংবা জয়িতার সাহায্য সরাসরি নিচ্ছে না তাই এখনও পিছিয়ে। কিন্তু তাপল্যাঙ যা করছে ওরা সেই পথে এগোচ্ছে। লা-ছিরিঙের বিশ্বাস গরু কিনলে ওদের ওপর টেক্কা দেওয়া যাবে। এ বছর ওরা যাই রোজগার করুক গরু কেনার মত সামর্থ্য হবে না।

ওরা যখন আস্তানার কাছাকাছি তখন সুদীপকে দেখতে পেল জয়িতা। খানিকটা দূর থেকে দেখা বলেই জয়িতাব মনে হল সুদীপ খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। ইদানীং খুব খিটখিটে এবং সন্দেহপরায়ণ হয়েছে সুদীপ। বারংবার সে বোঝাবার চেষ্টা করছে, অনেক হয়েছে এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরলে কি হবে তা নিয়ে মোটেই ভাবছে না। হঠাৎ লা-ছিরিঙ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি তাপল্যাঙ ছেড়ে চলে যাবে?'

জয়িতা হাসল, 'হঠাৎ একথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

লা-ছিরিঙ জবাব দিল, 'গ্রামের সবাই বলাবলি করছে। সবাই ভয় পাচ্ছে যে তোমরা চলে যাবে।'

'ভয় পাচ্ছে? ভয় কেন?' জয়িতা অবাক হল।

'তোমরা আসার আগে আমাদের অবস্থা কি ছিল তা তো দেখেছ। তোমরা এলে বলেই এখন গ্রামের মানুষ কোনরকমে কিছু খেতে পাচ্ছে। আমরা সবাই বুঝতে পারছি এভাবে চললে আগামী তিন-চার বছরে আর কোন অভাব থাকবে না। আমরা কখনও ভাবতে পারিনি যে সবাই এক হয়ে লড়তে পারব। তোমরা চলে গেলে এসব ভেঙে যাবে। আমাদের বুদ্ধি দেওয়ার কে থাকবে?' অত্যন্ত সরল গলায় বলল লা-ছিরিঙ।

জয়িতা বলল, 'আমরা না হয় এখানে আছি কিন্তু পাশের গ্রামের মানুষরা কি করে পারছে?'

লা-ছিরিঙ হাত নাড়ল, 'ওরা তো তোমরা যা করতে বলছ আমাদের তাই নকল করছে। এই গ্রামের ব্যাপার দেখার পরেই তো রোলেন ওদের বোঝাল। চোখের সামনে কারও ভাল না দেখলে ওরা এসব মানত না। শোনা কথাতে কে বিশ্বাস করে!'

জয়িতা বলল, 'এটা ঠিক নয়। আমরা চলে গেলে যদি সব ভেঙে যায় তাহলে আমাদের সব পরিশ্রম অর্থহীন। তোমাদের উচিত নিজেরাই যাতে আরও এগিয়ে যেতে পার তা ভাবা।'

হঠাৎ লা-ছিরিঙ প্রসঙ্গ পালটাল, 'তোমাদের ওই বন্ধু আগে পালাতে চায়, না?' সুদীপকে দেখাল সে। সুদীপ হাঁটছিল কাহুনের মন্দিরের দিকে।

'একথা কে বলল তোমাকে?'

'জানি। ওর ব্যবহার যেন কেমন কেমন। তাছাড়া ওই মেয়ের সঙ্গে বেশিদিন থাকলে ও মরে যাবে। এটা বুঝতে পেরেছে বলেই পালাতে চাইছে।' মাথা নাড়ল লা-ছিরিঙ।

আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। মাথা ঘোরে। কপালে ঘাম জমে। জয়িতা দাঁড়াল একটু। মেয়েটির সম্পর্কে যে ইঙ্গিত লা-ছিরিঙ দিল তাতে কথা বলার লোভ বাড়ে। সেই প্রসঙ্গে যেতে চাইল না সে। কিন্তু লা-ছিরিঙ যেন নিজের মনেই বলে চলল, 'ওকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল রোলেনরা। কারণ ও নাকি মা হবার পক্ষে খুব উপযুক্ত। কারও সঙ্গে বিয়ে দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা তৈরি করতে পারবে। নিয়ে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পেত। ও একটা উকুন। যা দেখে তা শুষে নেবে। সেটা বুঝতে পেরেছে বলে তোমাদের বন্ধুটা পালাতে চাইছে। আর এই পালাতে চাওয়ার মতলবটা টের পেয়ে গেছে মেয়েটা। সে-ই সারা গ্রামে গাবিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'পালাতে চাইলেই পালাতে দেবে কেন তোমরা, ধরে রেখো।'

'না, তা কি করে সম্ভব! তোমরা তো কোন অন্যায় করোনি। অন্যায় না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়? ওই মেয়েটার যদি বাচ্চা হত তাহলে ওকে পালাতে দিতাম না আমরা।' কথাটা বলে কি ভাবল লা-ছিরিঙ আকাশের দিকে মুখ তুলে, তারপর মাথা নাড়ল, 'তাহলে হয়তো ও পালাতে চাইত না। আগুনে জল পড়লে তা আর গনগনে থাকে না।'

গ্রামের সমস্ত সমর্থ পুরুষ এবং নারী আজ মন্দিরের চাতালে জড়ো হয়েছে। আনন্দ এবং কাহুন ওপরে বসে। কাহুনকে জোর করেই এনেছে আনন্দ। জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে জয়িতা দেখতে পেল সুদীপ খানিকটা দূরে একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু দূরত্বটা ডিঙোতে গেলে অনেক মানুষেকে সরাতে হয়। পালদেম উঠে এল আনন্দর পাশে। এসে দু'হাত তুলে দাঁড়াতে জনতার গুঞ্জন বন্ধ হল। পালদেম যেন নিজের কৃতিত্বে খুশী হল, তার মুখে হাসি ফুটল. জয়িতার মনে হল, সারল্য মানুষকে কত অল্পে তৃপ্ত করে!

আনন্দ উঠল, 'তাপল্যাঙের ভাই এবং বোনেরা। আজকের এই জমায়েতের একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। তার আগে আমি জানতে চাই এই গ্রামের সমস্ত মানুষ এখানে উপস্থিত আছে কিনা। কেউ না থাকলে তাকে ডেকে আনতে হবে।'

খানিকটা সময় গলা তুলে এ ওর নাম করে ডাকাডাকির পর সমস্বরে জানান দেওয়া হল, 'আছে, আছে।' আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর প্রায় বক্তৃতা দেবার ঢঙে বলল, 'তোমরা জানো এই গ্রামে কোন পালা এখন নেই। যিনি ছিলেন তিনি বরফের সময় মারা গিয়েছেন। কাহুন আছেন কিন্তু তিনি তো পালা নন। আসলে এখন আর আমাদের একজন পালার কোন দরকার নেই। কারণ একজন পালা যে সবসময় ঠিক কাজ করবেন তার কোন স্থিরতা নেই। পৃথিবীর যেসব দেশে সমস্ত মানুষের পরিশ্রম একসঙ্গে যোগ হয় তাদের দেশের জন্যে, যেখানে প্রতিটি মানুষ একটি পরিবারের সদস্য সেখানে কোন একজন পালা সবার মাথার ওপরে থাকে না। থাকা উচিত নয়। অথচ সব কাজ ভাল ভাবে দেখার জন্যে, সবাই যাতে ঠিকঠাক সুবিধে পায় তা খেয়াল রাখার ব্যবস্থা থাকা চাই। কেউ কোন অন্যায় করে অথবা কেউ বা কারা যদি এমন কাজ করে যা সমস্ত গ্রামের ক্ষতি ডেকে আনবে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই শাস্তি কারা দেবে? সবাই মিলে? না, কখনও নয়। এর জন্যে দরকার দশজন মানুষের একটা দল। যাদের ওপর সমস্ত গ্রামের দায়িত্ব থাকবে। আগে আমরা গ্রামের বাইরে যেতাম না। এখন যাচ্ছি। সেখানে যাতে ভাল ভাবে ব্যবসা করা যায় তার দায়িত্ব থাকবে এই দলের ওপর। কিসে গ্রামের মানুষের আরও ভাল করা যায় তা ওরা দেখবে। এই দলে কারা থাকবে তা ঠিক করবে তোমরা। আর সেই জন্যে এই জমায়েত। দল ঠিক হওয়ার পর তারাই বুঝে নেবে কে কোন্ দায়িত্ব নিতে চায়। তোমরা এবার নাম বল। যে নামগুলো বেশি মানুষ বলবে তারাই দলে থাকবে।' আনন্দ কথা শেষ করামাত্র সব চুপচাপ হয়ে গেল। যেন বুঝে নিতে সময় লাগছে সবার।

কাহুন মাথা নেড়ে মুখ ফেরালেন, 'আমি কি দলে থাকব?'

আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবেন, সবাই যদি দলে আপনাকে চায়।'

কিছুক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আনন্দর অস্বস্তি বাড়ছিল। কি ব্যাপার? ব্যবস্থাটা এদের মনঃপুত হচ্ছে না নাকি? এইসময় সে সুদীপকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওপরে উঠে এসে সুদীপ বলল, 'অভ্যেস কখনও একদিনে তৈরি হয় না। উই শুড হেল্প দেম।' সে চিৎকার করল, 'যারা এই দলে থাকতে চাও তারা ওপরে উঠে এস।'

এবার নড়াচড়া শুরু হল। এ ওর দিকে তাকায়। কিন্তু উঠতে যেন সঙ্কোচ বোধ করছে সবাই। এই-সময় সাওদের গুটি গুটি পায়ে ওপরে উঠে এল। তাকে দেখে লা-ছিরিঙ এগিয়ে গেল। এবং অমনি আরও পাঁচজন বিভিন্ন বয়সী মানুষ এগিয়ে এল। আনন্দ পালদেমকে ধরে নিয়ে গুনল, আটজন। সুদীপ হাঁকল, 'আরও দুজন চাই।'

জনতার মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করল, 'তোমরা দুজন তো আছ।'

আনন্দ কিছু বলার আগেই সুদীপ জানাল, 'না, আমরা দলে থাকতে পারি না। আমরা বাইরের লোক। আমার নাম সুদীপ, ওর নাম আনন্দ, তোমাদের নামের সঙ্গেও মেলে না। এই গ্রামের মানুষের ভালমন্দ দেখাশোনা করবে গ্রামেরই মানুষ, বাইরের লোক নয়।'

এইসময় কাহুন গিয়ে দাঁড়ালেন দলে। নজন হল। আর একজন চাই। হঠাৎ একটি মেয়ে বলল, 'দলে সব ছেলে থাকছে কেন? একজন মেয়ে চাই।'

সুদীপ বলল, 'নিশ্চয়ই। মেয়েরা আগে আসছে না বলেই থাকছে না। দশ নম্বরের জন্যে তুমি এসো।'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আমি কি কিছু জানি যে দলে যাব। দ্রিমিত কোথায়? দ্রিমিত যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'দ্রিমিত! দ্রিমিত! দ্রিমিত!'

দুটি মধ্যবয়সিনী গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল জয়িতাকে। সুদীপ বাধা দিল, 'আরে ওকে আনছ কেন? ও তো আমাদের মতই বাইরের লোক!'

যে মেয়েটা কথা বলছিল সে ফুঁসে উঠল, 'কে বলেছে বাইরের লোক? ওর নাম দ্রিমিত। দ্রিমিত আমাদের নাম। ওর পোশাক আমাদের পোশাক। তুমি নিজেকে এখনও বাইরের লোক ভাবতে পার কিন্তু দ্রিমিত তা ভাবে না। ওকে আমরা আমাদের লোক মনে করি।'

কথাটার সমর্থন মিলল অনেক গলায়। সুদীপ কাঁধ নাচাল। ওরা ততক্ষণে জয়িতাকে ওপরে তুলে দিয়েছে। সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'চমৎকার!' বলে নিচে নেমে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

আনন্দ বলল, 'তাহলে এই দশজন আগামী বারোটা চাঁদ পর্যন্ত গ্রামের দায়িত্বে থাকবে। এই সময়ে যদি এরা ভাল কাজ করে তাহলে আবার দায়িত্ব পাবে। যদি কেউ খারাপ কিছু করে তাহলে গ্রামের সমস্ত মানুষ এক হয়ে তাকে দল থেকে সরিয়ে দেবে। তোমরা এ ব্যাপারে রাজী?'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা।' সবাই চেঁচিয়ে বলল।

আনন্দ এবার ঘোষণা করল, 'কে কোন্ দায়িত্ব নেবে তা এরা নিজেরা ঠিক করবে। এখন যে যার কাজে তোমরা যেতে পার।'

জমায়েত যখন ভাঙব ভাঙব করছে উল্লসিত হয়ে তখন একজন, এক বৃদ্ধ, চিৎকার করল, 'সবাই বলছে তোমরা নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, কথাটা ঠিক?'

কথাটা আনন্দর কানেও এসেছিল। সে মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমরা খুব খারাপ ছিলাম। তোমরা চলে গেলে আবার খারাপ থাকব।'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'কেন খারাপ থাকবে? তোমরা তো শিখে নিয়েছ ভালভাবে থাকতে গেলে কি কি করতে হয়। তোমাদের এই শেখাটা অনেক সভ্যদেশের মানুষ শিখতে পারেনি।'

বৃদ্ধর কানে যেন কথাগুলো ঢুকল না, 'আগে কেউ গ্রামের বাইরে যেতে সাহস করত না, এখন যাচ্ছে। সেখানে অনেক ডাইনি ওৎ পেতে বসে আছে। তারা এদের যাদু করবে। তোমরা না থাকলে এরা গ্রামের কোন নিয়মকানুন মানবে না। তাছাড়া—।'

আনন্দ দেখল বৃদ্ধ উদাস হয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাছাড়া?'

'আমাদের বাপ মা যারা স্বর্গে গিয়েছে তারা আমাদের কিছু শেখায়নি। আমরাও এদের কিছু শেখাতে

পারিনি। এরা, যেসব বাচ্চা এখন জন্মাচ্ছে তাদের কিছু না শিখিয়ে বড় করছে। আসলে আমরা কিছুই জানি না, শেখাতে পারব কি করে! আমরা যখন মরে যাব, এরা যখন মরে যাবে তখন একই অবস্থা চলবে। তোমরা থেকে গেলে এ অবস্থা চলতে পারত না।'

আনন্দ কিছু বলার আগে পালদেম বলল, 'তাহলে এরা কি করে আমাদের বাচ্চাদের শেখাবে?'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'কেউ রক্তের টানে শেখে, কেউ দেখে শেখে। ওরা চলে গেলে যারা আসবে তারা কিছুই শিখবে না। এখনও এই গ্রামের তিনটে পরিবার আলাদা রয়ে গেছে।'

আনন্দ উৎসাহিত করল, 'তোমরা মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছ। আমরা যাচ্ছি না এখনই। তবে পুলিশ যদি আমাদের ধরে নিয়ে যায় তাহলে অন্য কথা।'

বৃদ্ধ চিৎকার করল, 'পুলিশদের আমরা ঢুকতে দেব না।'

প্রতিধ্বনিত হল অনেক গলা পাহাড়ে পাহাড়ে, 'দেব না, দেব না।'

জমায়েত যখন ভেঙেছে, মানুষজন যখন চলে যাচ্ছে তখন আনন্দ এগিয়ে গেল জয়িতার দিকে, 'কনগ্রাচুলেশন জয়িতা।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'উঁহু, জয়িতা নয়, দ্রিমিত।'

'ও হ্যাঁ, দ্রিমিত।' আনন্দ মাথা নেড়ে নিজেকে সংশোধন করল। এইসময় সেই মেয়েটা এসে দাঁড়াল সুদীপের পাশে। ও যে এতক্ষণ জমায়েতে ছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নি। আনন্দ তখন পালদেমদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেমে গেছে।

জয়িতা গ্রামের তিনটে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে. হঠাৎ সুদীপ এগিয়ে এল তার সামনে, 'জয়িতা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, এদিকে আয়।'

জয়িতা ওর গলার স্বর শুনে চমকে তাকাল। অত্যন্ত রাগী দেখাচ্ছে সুদীপের মুখ। সে হাসবার চেষ্টা করল, 'জয়িতা এখন মরে গেছে সুদীপ, আমি দ্রিমিত।'

'এইসব ন্যাকামি রাখ। আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ স্ট্রেট কোয়েশ্চেন!'

'[illegible]

'তোর শরীরে বাচ্চা আছে?

সঙ্গে সঙ্গে জয়িতা পাথর হয়ে গেল। তার রক্ত চলাচল যেন এক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হল। তারপরেই [illegible] মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। সুদীপের গলার স্বর আর এক পর্দা উঠল, 'উত্তর দে! সরাসরি বল হ্যাঁ কি না?'

সুদীপ কথা বলছিল বাংলায়। জয়িতা দুর্বল গলায় জবাব দিল, 'কি শুনলে খুশী হবি সুদীপ?'

'আমার খুশী অখুশীর ওপর কিছু নির্ভর করছে না।'

'তাহলে জিজ্ঞাসা করছিস কেন?'

'প্রয়োজন আছে। তোকে আমরা বন্ধু বলে মনে করতাম। আই ট্রিটেড ইউ অ্যাজ এ পার্শন. তুই একটা মেয়ে এটা আমার মাথায় কখনও আসেনি। এবং তুই, তুই সবসময় নিজেকে তাই মনে করতিস। কিন্তু এই মেয়েটা বলছে তুই প্রেগন্যান্ট। এর আগেও ও আমাকে বলেছিল যেদিন তুই বমি করেছিলি। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ ও বলছে তোর মধ্যে নাকি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। আমি উত্তরটা চাই।'

'আমি বুঝতে পারছি না সুদীপ, এতে তোর উদ্বিগ্ন হবার কি আছে?'

'হু ইস দ্যাট ম্যান?' সুদীপের চোয়াল শক্ত হল।

'তুই তো বন্ধুর মত প্রশ্নটা করছিস না সুদীপ। তোর মুখ এখন কি হিংস্র হয়ে উঠেছে [illegible] আমি তোর কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না।' জয়িতা খুব শান্ত গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করল।

সুদীপ মুখ ফেরাল নিচের দিকে। তারপর বিড় বিড় করল, 'আই নো হিম।'

জয়িতা এবার হেসে উঠল, 'মিছিমিছি এ ব্যাপারে তুই উদ্বিগ্ন হচ্ছিস। এটা এখন সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদের কিছু নিজস্ব ব্যাপার থাকে যেখানে তোরা একেবারে অবাঞ্ছিত।'

হঠাৎ সুদীপ চিৎকার করে উঠল বিশ্রী ভঙ্গিতে, 'বাদ দে! আমার সব জানা হয়ে গেছে!'

'কি জেনেছিস তুই?'

চিৎকারটা করেই সম্ভবত সুদীপ চেতনায় এসেছিল। এবং এখন তার মধ্যে হতাশা স্পষ্ট হল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সে বলল, 'তোকে আমি এতদিন অন্যচোখে দেখে এসেছিলাম। কলকাতায় তুই কি ছিলি ভেবে দ্যাখ। মেয়েলি যে কোন ব্যাপার তুই ঘেন্না করতিস।'

'ঘেন্না?' জয়িতা ওর কাছে এগিয়ে এল, 'সুদীপ, তোকে আমাদের ঘেন্না করা উচিত নয়?'

'আমাকে? হোয়াই?' চোখ বড় হয়ে উঠল সুদীপের।

'এতদিন তুই কি করছিস? একটা মেয়ের হ্যাংলামির সুযোগ নিচ্ছিস। ওকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করছিস না। বরং কি করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায় তার ফন্দি ভাবছিস। কলকাতায় থাকলে তুই এই কাজটা করতে পারতিস?'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ। তারপর হাত নেড়ে মেয়েটিকে কাছে ডাকল। এখন নিতান্ত অনিচ্ছায় মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল ওর ভাষায়,'আমার বিরুদ্ধে তোর কোন নালিশ আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা কি এখানে বল্।'

মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলল দু'হাতে মুখ ঢেকে। সুদীপ ওর কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে, বল।'

মেয়েটা এবার কোনমতে বলতে পারল, 'ও আমার সঙ্গে একদিনও শোয়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। বললেই বলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু শোয় না। যদি কখনও আমাকে বিয়ে করে তবেই শোবে। আমাকে মেয়ে বলে যেন মনেই করে না ও।' কথাগুলোর সঙ্গে কান্না জড়ানো ছিল। সবাই অবাক হয়ে মেয়েটিকে দেখছিল।

সুদীপ এবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'পরে কথা হবে তোর সঙ্গে।' বলে দৌড়ে নিচে নেমে গেল।

তার শরীর তরতর করে নিচে নামছিল। জয়িতা স্তব্ধ হয়ে ওর যাওয়া দেখছিল। এতক্ষণ যে নাটক এখানে চলছিল তার দর্শকরা ব্যাপারটা সম্পর্কে ধন্দে ছিল যেহেতু সংলাপ ছিল বাঙলা-ইংরেজিতে মেশানো। তবে ব্যাপারটা যে মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছে তাতে কারও সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করে শেষ হল যখন মেয়েটির জবানবন্দীতে তখন তো বটেই। জয়িতা ওর আগে পাশের মেয়েদের দিকে তাকাল। সহজ সরল ঢলঢল মুখের মেয়েগুলোর নাম একই ধরনের—রোঙমিত, ইনামিত, পাশাংকিত, পরমিত। এবার যে মেয়েটির নাম ইনামিত সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? ও ওরকম রেগে গিয়েছিল কেন?'

জয়িতা আবার বিন্দুতে মিলিয়ে আসা সুদীপকে দেখল। সুদীপ কোথায় যাচ্ছে? এইসময় কান্না থামিয়ে সুদীপের বান্ধবী চিৎকার করে উঠল, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের শব্দ ছিটকে উঠল মুখগুলো থেকে। মেয়েরা উৎসাহে জয়িতাকে জড়িয়ে ধবল। ওরা এমন করছে যেন খুব বড় প্রাপ্তির খবর পেয়ে গেছে। এবং এই প্রথম অন্যধরনের লজ্জায় আক্রান্ত হল জয়িতা। সেই চিৎকার শুনে কাহুন নেমে এলেন মন্দির থেকে। মেয়েরা ছুটে গেল তাঁর কাছে, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে!'

লোকটির মুখ দেখে মন বোঝা দায়। কিন্তু কথাটা শোনামাত্র একটা হাত প্রসারিত হল তাঁর। যেন আশীর্বাদ করছেন কথাটা শোনামাত্র। পরমিত জয়িতাকে ইঙ্গিত করল বসার জন্যে। নিতান্ত অনিচ্ছায় হাঁটু গেড়ে বসল সে। মাথার ওপর অনর্গল অবোধ্য মন্ত্র বর্ষিত হতে লাগল। এরপর সবাই মিলে ওকে তুলে ধরতেই কাহুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো বিবাহিত নও, অতএব তোমার ভাবী স্বামী কে? বিয়ের আয়োজন করতে হবে।'

'নাম বলাটা কি খুব জরুরী?'

'নিশ্চয়ই। কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্চা এলে তার একটা পরিচয়ের ব্যবস্থা করাই নিয়ম।'

'আমি যদি না বলি।'

'তাহলে তোমাকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। শুধু তোমার ক্ষেত্রে নয়, এই গ্রামের যে কেউ এমন করলে একই শাস্তি দেওয়া হবে। পুরুষ হলে তা আরও ভয়ানক হত।'

'সেই বিচার কি আপনিই করবেন কাহুন?'

'যতদিন তাপল্যাঙের মানুষ আমাকে কাহুন বলে স্বীকার করবে ততদিন অবশ্যই আমি করব। তবে

আজ দশজনের দল তৈরি হয়েছে, তাদের কথাও শুনতে হবে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই।' কাহুন নির্লিপ্ত গলায় জানালেন।

জয়িতা মাথা নাড়ল। বন্দুক—এরা কেউ জানে না সমস্ত গুলিগুলো এখন অকেজো, আর এই গ্রামের মানুষদের দিকে বন্দুকের নল তোলা মানে নিজের গলায় ঠেকানো। সে বলল, 'আমাকে একটু সময় দিন কাহুন।'

ঢালু পাহাড় বেয়ে দৌড়াবার সময় শরীরের ভার যেন কমে যায়। কিন্তু বুকের ভেতর ঝড় বইছিল সুদীপের। অনেকটা নেমে আসার পর সে আনন্দকে দেখতে পেল। পালদেম এবং সাওদেরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওরা জমি দেখছে। পরিকল্পনা হয়েছে ওপরের ঝরনা থেকে জল যাতে সরাসরি জমিতে আনা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যাপারেই আলোচনা করছিল ওরা। সুদীপকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে অবাক হল সবাই। খানিকটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে দম নিতে নিতে সুদীপ ডাকল, 'আনন্দ, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'কি কথা?' আনন্দ ওকে জরিপ করার চেষ্টা করল।

'এদের সামনে বললে তোর হয়তো ভাল লাগবে না।'

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে পালদেমকে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলব। মনে হচ্ছে সুদীপের কোন সমস্যা হয়েছে—! ঠিক আছে।'

পালদেমরা চলে যাওয়ার পর আনন্দ এগিয়ে গেল, 'কি বলবি বল্।'

মুখোমুখি কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুদীপের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, 'ছিঃ!'

খুব অবাক হল আনন্দ, 'কি ব্যাপার? তুই এভাবে আমাকে ছিঃ বলছিস কেন?'

'তুই, তুই এমন কাজ করলি আনন্দ, তুই মুখে বলতিস যদি তাহলে কি আমি আপত্তি করতাম?'

'আঃ! কি বলছিস স্পষ্ট করে বল্।'

'ন্যাকামি করিস না। তুই জানিস না কি করেছিস?'

আনন্দর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ব্যাপারটা কি বল্ তো?'

'তোর সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক আছে সেটা এতকাল চেপে রেখেছিলি কেন?'

'শারীরিক সম্পর্ক? কার সঙ্গে? ওঃ, তোর মেয়েটা এই কথা বলেছে বুঝি?'

'আবার বুলি করার চেষ্টা! জয়িতা প্রেগন্যান্ট তুই জানিস না?'

'জয়িতা?' প্রায় চিৎকার করে উঠল আনন্দ।

'আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে।'

'কি যা-তা বলছিস তুই?'

'আনন্দ, আমি শেষবার আশা করছি তুই সত্যি কথা বলবি।'

'মিথ্যে কথা বলার কিছু দরকার আছে সুদীপ? আমি যদি করতাম তাহলে এই পাহাড়ে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসত?'

'তাহলে স্বীকার করছিস না কেন?'

'কারণ আমি করিনি।'

'বিশ্বাস করি না!'

'চমৎকার! জয়িতার খবরটা তুই কোথায় পেলি?'

'আমাকে বেশ কিছুদিন আগে মেয়েটা বলেছিল। বমি করছিল তখন। বিশ্বাস হয়নি আমার। আজ প্রশ্ন করতে ও ইনডাইরেক্টলি স্বীকার করে নিয়েছে।'

'হায় ভগবান!' আনন্দ চিৎকার করল এবার, 'ও স্বীকার করেছে?'

'হ্যাঁ। তোর আর লুকোবার পথ নেই। কিন্তু আনন্দ, ওকে তো আমরা সবাই বন্ধু বলেই জেনে এসেছিলাম এতদিন। একঘরে শুয়েছি কিন্তু কখনও মেয়ে বলে মনে করিনি। কল্যাণটা ওকে ভালবাসতো। আই নো দ্যাট। ওর সম্পর্কে দুর্বল ছিল। আমার মনেও যে দুর্বলতা আসেনি তা নয়। কিন্তু আমি সবসময় মনে করতাম ওকে বন্ধুর সম্মান দেব। ও মেয়ে নয়, একটা মানুষ। জীবনের সব প্রলোভন ছেড়ে আমরা

যে কাজে পা বাড়িয়েছি তাতে আর যাই হোক একটি মেয়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় প্রধান হয়ে ওঠে না। অথচ তুই তাই করেছিস। নাহলে তুই ওর শরীরের কথা ভেবে কলকাতার ওষুধের দোকান থেকে প্রটেকশান কিনতিস না। নাউ টেল মি, হোয়াটস দি ডিফারেন্স বিটুইন আস অ্যান্ড দ্যাট প্যারাডাইস পার্টি!'

আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওর রোগা শরীরটা শক্ত। এলোমেলো দাড়ি এবং চুলভর্তি মাথাটা নিচের দিকে ফেরানো। তারপর ও চোখ তুলল, 'তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে সুদীপ!'

সুদীপ চমকে উঠল। এই গলায় আনন্দ কখনও তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। সুদীপ আশঙ্কা করছিল আনন্দ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওর চোখ দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু আনন্দ কথা বলল, 'আমাকে যখন তোর সন্দেহ তখন আমিও বলতে পারি নিজে কাজটা করে তার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিস!'

'আমি? আমি করেছি?'

'নিশ্চয়ই। চোরের মায়ের সবসময় বড় গলা হয়। আর তাই কদিন থেকে তুই চলে যাওয়ার কথা বলে যাচ্ছিস। তুই এমন কাজ করলি কেন সুদীপ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র যেন উন্মত্ত হয়ে গেল সুদীপ। দু'পাশে মাথা নেড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইটস এ লাই, মিথ্যে কথা, আমি কিছুই জানি না। জানলে আমি তোকে এসে--।'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না সে। আনন্দ বলল, 'এটা তোর অভিনয় হতে পারে।'

'অভিনয়?' সুদীপের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'অবশ্যই। এতদিন ধরে ওই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে থেকেও তোর লোভ মেটেনি। আমি বুঝতে পারছি না জয়িতা এই ভুল কি করে করল! একসময় মেয়েটা সম্পর্কে জেলাস ছিল। কিন্তু সব জেনেশুনে--' শোন সুদীপ, আমি কখনও তোর আর ওই মেয়েটার সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলিনি। [illegible] [illegible] কিন্তু আজ হোক কাল হোক তোকে [illegible] করতে হবে [illegible] বলেই চুপ করেছিলাম। কিন্তু এইটে আমি সহ্য করব না।'

সুদীপ হাসল অনেকক্ষণ পরে, 'আমার সম্পর্কে চমৎকার ধারণা তোদের। একটু আগে জয়িতা একই প্রশ্ন করেছিল। মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। বাট আই নেভার শ্লেপ্ট উইদ হার। কথাটা ও নিজের মুখে আজ সবাইকে বলেছে।'

'তুই?' বিস্ময় ফুটে উঠল আনন্দর মুখে।

'হ্যাঁ।' সুদীপ জোরের সঙ্গে বলল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। তুই প্যারাডাইসের কথা বললি, চিরকাল যে ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে এলাম নিজে তা কিভাবে করব? হ্যাঁ, যদি জয়িতাকে ভালেবেসে পেতে চাইতাম তাহলে সেটা জোরগলায় বলতাম।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ওকে ভালবাসিসনি?'

'হ্যাঁ, বেসেছিলাম। কিন্তু পেতে চাইনি।'

'আমিও তাই।'

'আমার মনে হয় একমাত্র কল্যাণ পেতে চেয়েছিল।'

গলার স্বর দুজনের খাদে নেমে এসেছিল। হঠাৎ সুদীপ সজাগ হল, 'তাহলে কে?'

'তুই যে ভাবে ছুটে এলি, ওকি কারও নাম বলেছে?'

'না। কিন্তু তুই কিংবা আমি ছাড়া কে হতে পারে? আমরা তিনজনেই এক শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হয়েছি। রুচি বল্, মানসিকতা বল্, আমরা এক। জয়িতার মত মেয়ে--।'

'ঠিকই। হয় তুই নয় আমি।'

'কিন্তু আমি নই।' চিৎকার করল সুদীপ।

'চিৎকার করার কিছু নেই। আমিও নই সুদীপ। স্টিল আইদার ইউ অর মি! এবং সেটা নির্ভর করবে জয়িতার সিদ্ধান্তের ওপর।'

'না। আমি মানি না। এটা হতে পারে না।'

'কেন মানবি না সুদীপ?'

'ও, ও যদি সত্যি কথা না বলে!'

'জয়িতা কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না।'

'তুই এখনও ওকে বিশ্বাস করিস আনন্দ?' মাটিতে বসে পড়ে অদ্ভুত চোখে তাকাল সুদীপ।

'আমৃত্যু করব। তুই যে অস্বীকাব করছিস তাও আমি বিশ্বাস করছি সুদীপ। অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোর ওপর নির্ভব করছে।'

দুই হাঁটুতে মাথা রাখল সুদীপ, 'স্যরি আনন্দ।'

আনন্দ চারপাশে তাকাল। হালকা মিঠে রোদে এখন তাপল্যাঙ ভাসছে। ওপাশে নীল আকাশের নিচে চ্যামল্যাঙ, বরুণৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোমল গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এই তাপল্যাঙকে ওরা তিনবছর আগে দ্যাখেনি। কর্মযজ্ঞের সমস্ত চিহ্ন চারপাশে ছড়ানো। একটি প্রাণের পুরো চেহারা পালটে গেছে এর মধ্যে। মার্কস সাহেব চেয়েছিলেন মানুষের বেঁচে থাকবার রাস্তাটা পরিষ্কার হোক। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ সেই পথে যাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টিরা তো সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেখল কাজ আর আদর্শের মধ্যে দুস্তব প্রভেদ। গণতন্ত্র এবং ভোটের বাক্সে এমন একটা যাদু আছে যে এরা তার মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারল না। কলকাতা শহরে তারাও কি বোকামি শুরু করেছিল! এখানে এসে এই অরাজনৈতিক নিঃস্ব মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে করতে প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ সেটা অনুভব করেছে। ব্যক্তিহত্যা নয়, জীবন ফিরিয়ে দেওয়াতেই একজন কম্যুনিস্ট-এর বেঁচে থাকার স্বার্থকতা। আর সেই কাজ যখন তারা তিলে তিলে শুরু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন জয়িতা গর্ভবতী! এই খবরে এত বিচলিত হচ্ছে কেন? একটা ছোট্ট খবরে এত বড় বিশ্বাস ভেঙে যেতে পারে না। আনন্দ বলল,'সুদীপ, জয়িতার সন্তানের পিতা কে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আমাদের কি লাভ?' সুদীপ মুখ তুলল। আনন্দ বলল, 'এটা আমাদের সমস্যা নয়, তাই না?'

না। কিন্তু ও কি বন্ধুত্বে . . . রাখল? আমার লাগছে এখানেই।'

আনন্দ হাসল, 'ও যে মেয়ে . . . ভাবতাম না। ও নিজে কি ভাবে! . . . তুই ভুলে যাচ্ছিস আমবা যেমন ছিলাম তেমন আছি। কিন্তু ও এখন আর জয়িতা নয়। ইদানীং ও আমাকে বারংবার মনে করিয়ে দেয় ওর নাম দ্রিমিত। ওঠ, আজকের কাজগুলো সেরে ফেলি!'

॥ ৫১ ॥

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। রাত থেকেই শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। মন্দিরের সামনে রাখা বিশাল জয়ঢাকে ঘা পড়ছে সমান বিরতিতে। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা গড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা বুনো গাছগাছালি আর পাথরের খাঁজে খাঁজে।

এখন ভরা বরফের সময়। ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে শান্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলো অল্প সময়ের জন্যে আসে। এই রোদে তাপ নেই। দুপুর হল কিনা বোঝার আগেই হিমবাতাস নেমে আসে এভারেস্টের শরীর থেকে। এবারই প্রথম, বরফের প্রথম চোটটা বৃথা গিয়েছে। তাপল্যাঙ কিংবা পাশের গ্রামের কারও কোন ক্ষতি হয়নি। গ্রামবৃদ্ধরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। যৌথগৃহগুলোতে মানুষ এখন নিরাপদে বসবাস করছে।

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। শব্দটা বাজছে একনাগাড়ে। আনন্দ দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। সুদীপের জন্যে কাল রাত্রে তার বেশ ঠাণ্ডা লেগে গেছে। বেলা হয়েছে বেশ কিন্তু বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। এখনও জ্বর জ্বর ভাবটা ছেড়ে যায়নি। শরীরে রোদ পড়ায় ওর ভাল লাগল। ক্লান্ত চোখে ও চারপাশে তাকাল। এখন সাদায় সাদায় তাপল্যাঙ ঝকঝক করছে। অন্তত ফিটখানেক পুরু বরফ পায়ের তলায়। বাড়ির ছাদে গাছের পাতায়, চাষের ক্ষেতে, যেখানে চোখ রাখা যায় সেখানেই তুষার। রোজ জরুরী জায়গাগুলো থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওদের, ভোরেই আবার ফিরে আসছে। আনন্দ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাজনাটা বেজেই চলেছে একটানা।

পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটোই বন্ধ। জয়িতাকে ওরা নিয়ে গিয়েছে এক সপ্তাহ হল। অনেক যত্নে নতুন সুদকেরিঘর তৈরি হয়েছে ঠিক গ্রামের মাঝখানে। তিনজন মাইলিআমার সঙ্গে সে রয়েছে সেখানে। এক ফোঁটা শীতের বাতাস ঢুকছে না সুদকেরিঘরে। চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আর মাইলিআমারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে এসে জানিয়ে যাচ্ছে দ্রিমিত কেমন আছে।

সুদীপের ঘরটাও বন্ধ। এবং সুদীপ নেই। কাল রাত্রেই কাণ্ডটা করল সে। মদ খেয়ে মেয়েটাকে সে বলেছিল চলে যেতে। মেয়েটাও নেশা করেছিল। ফলে চটজলদি দুজনের মধ্যে লেগে গেল। ব্যাপারটা যখন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখনই আনন্দ ওদের দরজায় পৌঁছেছিল। ইদানীং প্রায়ই দুজনের মধ্যে লাগত। আনন্দ সেগুলোকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করত।

আনন্দকে দেখে সুদীপ চিৎকার করেছিল, 'ওকে চলে যেতে বল্ আমার কাছ থেকে।'

মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'ও কি বলল তোমাকে?'

আনন্দ শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিল, 'ও তোমাকে চলে যেতে বলছে এখান থেকে।'

'বলবেই তো। বলবে না? পুরুষমানুষের ক্ষমতা না থাকলে গলার জোর বাড়ে।' মেয়েটি চিৎকার করল।

সুদীপ মুখ ফেরাল, 'ক্ষমতা আছে কি নেই তার পরীক্ষা তোর কাছে দেব না!'

'দিতে পারলে তো! দিনের পর দিন আমার মত মেয়ে একটা পাথরের পাশে শুয়ে থাকলে সে-ও নড়ে-চড়ে বসত। আবার গলা ফুলিয়ে বলা হয় আমি ওকে ছুঁয়েও দেখিনি। যেন কত কৃতিত্ব! ছুঁবি কি করে? তোর মন তো পড়ে আছে দ্রিমিতের জন্যে। মুখের সামনে থেকে খাবার হাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে সাধু সাজছিস।' মেয়েটা কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই টলে গেল।

আর সুদীপ, 'দূর শালা, নিকুচি করছে' বলে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আনন্দ বলল, 'এসব কি হচ্ছে সুদীপ!'

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল, 'জ্ঞান দিস না।'

'কিছুই দিচ্ছি না আমি। শুধু বলছি স্টপ ইট।'

'এটা ওকে বল্। এমন একটা মেয়েমানুষ যে সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না। এবং ও আমার কাছে স্বীকার করেছে যে মা হবার কোন ক্ষমতা ওর নেই। শী ডিড দ্যাট নট অনলি উইদ হার হাজব্যান্ড! রোলেনরা ভুল করে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল।' সুদীপ হাঁপাচ্ছিল।

'কিন্তু মেয়েটা তোকে বাঁচিয়েছে। তোর সেবা ও যেভাবে করেছে তা আমরা দেখেছি।'

'ইয়েস, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর কত কৃতজ্ঞতা জানাব!'

'ও মা হতে পারলে তুই বিরক্ত হতিস না বলতে চাইছিস?' আনন্দ প্রশ্নটা করতেই যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সুদীপ।

উদ্‌ভ্রান্তের মত মুখ ফেরাল দূরের সুদকেরিঘরের দিকে। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বলল, 'আই কান্ট স্ট্যান্ড ইট।'

'বুঝলাম। কিন্তু সব কিছুর একটা শোভন ভঙ্গি আছে, এইটে ভুলে যাস না।'

'দূর! আমি ওই মেয়েটার কথা বলছি না। জয়ী, জয়ীটা এরকম করবে—!' সুদীপ কথা শেষ করল না। কিন্তু আনন্দ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে কি একটু আগে মেয়েটা যে অভিযোগ করল তা সত্যি? সুদীপ হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, 'ইটস ইনটলারেব্‌ল! ওকে যখন বুড়িগুলো আঁতুড়ঘরে নিয়ে গেল তখন ওর মুখ দেখেছিলি? হার হাইনেস হেঁটে গেলেন কি ভঙ্গিতে? আবার প্রত্যেকদিন মুরগির মাথার সুপ খাওয়াচ্ছে ওরা, ওতে নাকি বাচ্চার মঙ্গল হয়। রোজ চারটে মুরগি মারার সাচ্ছল্য এই গ্রাম এখন অর্জন করেছে? হোয়াই দিস ভি আই পি ট্রিটমেন্ট? কেন?'

'সুদীপ, তুই এইসব নজর করেছিস? এটা ঠিক না। গ্রামের লোকরা কেন জয়িতাকে কাছে টেনে নিয়েছে তা তোর অজানা নয়। ভুলে যা এসব।' আনন্দর কথাটা শেষ হতেই দূরের সুদকেরিঘর থেকে এক বৃদ্ধার চিৎকার ভেসে এল। বাইরে বেরিয়ে বৃদ্ধাটি চিৎকার করে আবার কিছু বলে ভেতরে ফিরে গেল। সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি বাজল মুখে মুখে। এবং তারপরেই কাহুনের নির্দেশে সেই মধ্যরাত্রে জয়ঢাকে ঘা পড়ল, ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ।

সুদীপ চোখ বড় করে আতঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করল, 'কি হল?' আনন্দও বুঝতে পারেনি। সুদীপ আবার ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়াল। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে টলছে। সুদীপ তাকে প্রশ্ন করতেই মেয়েটা কেঁদে ফেলল।

সুদীপ তাঁকে ধমক দিল, 'অ্যাই, কাঁদছিস কেন তুই?'

'আমার কোনদিন হবে না। ওটা নাকি খুব কষ্টের, আবার কি আরামের!'

'কোন্‌টা? ঠিক করে কথা বল।'

'ব্যথা হচ্ছে পেটে দ্রিমিতের। বাচ্চাটা বেরিয়ে আসবার জন্যে নড়াচড়া শুরু করেছে।'

মেয়েটি কথা শেষ কবামাত্র সুদীপ আফসোসে মাথা নাড়ল, 'মরে যাবে, নির্ঘাৎ মরে যাবে। ওই তো রোগা পটকা চেহারা। মেয়ে বলে মনেই হয় না। না খেয়ে খেয়ে শরীরে রক্ত নেই। জয়ী মরে গেলে—।'

এবার আনন্দ উত্তেজিত হল। এক হাতে সুদীপের কাঁধ চেপে ধরে চাপাগলায় বলল, 'চুপ কর!'

'তুই চুপ করতে বলছিস? ওই বুড়িগুলো ডেলিভারির কি জানে? যদি এটা সিজারিয়ান কেস হয়? একটা বাচ্চা জয়ীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে, ভাবতে পারিস? শী উইল নট সারভাইব! অ্যান্ড আই কান্ট স্টে হেয়ার। ওর মরা মুখ আমি দেখতে পারব না। নো।' এবং তখনই সুদীপ কাণ্ডটা করল। আচমকা আস্তানার বারান্দা থেকে নেমে সাদা বরফেব ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝতে পারা মাত্র আনন্দ পা চালিয়েছিল। বরফে পা পিছলে যাওয়ায় ওকে সে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছিল, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'কলকাতায়। ছেড়ে দে আমাকে।'

'কলকাতায়?' বিস্ময়ে জমে গিয়েছিল আনন্দ।

'হ্যাঁ।' চোয়াল শক্ত করেছিল সুদীপ।

'ও। কিন্তু এত রাত্রে কেন? ঠাণ্ডায় তো জমে যাবি!'

'জ্ঞান দিস না। ঠিক পারব।'

'ফিরে গিয়ে পুলিশেব কাছে ধবা দেওয়ার জন্যে এসেছিলি?'

'যা করতে চেয়েছি তা তো হয়েই গেছে। এই পাহাড়ি লোকগুলো এখন যথেষ্ট আত্মনির্ভর। দে ক্যান লুক আফটার দেমসেলভ্‌স।'

'কিন্তু কলকাতায় ফিরলে তুই মরবি।'

'মরব। এখানে থেকে একটা মেয়ে ওইভাবে মরছে দেখার পর বেঁচে থাকব?'

'জয়িতা মরবে এটা ভাবছিস কেন?'

'এছাড়া কোন উপায় নেই। ওকে মরতেই হবে।'

'তোর নেশা হয়েছে।'

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুদীপ। তারপর পাতলা জ্যোৎস্না গায়ে মেখে বরফের ওপর বড় বড় পা ফেলে চলে গেল ওপরের দিকে। আনন্দ মাথা নাড়ল। তার কিছু করার নেই। সুদীপকে সে ধরে বেঁধে রাখতে পারে না। অনেকদিন ধরে সুদীপ পালাই পালাই করছিল। হয়তো নিজের কাছে একটা দায় ছিল বলে যেতে পারেনি। আজ জয়িতার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে নিল। স্পষ্ট চোখে আনন্দ যেন দেখতে পেল সান্দাকফু পৌঁছবার আগেই সুদীপ অসুস্থ হয়ে মারা পড়ছে। অথচ তার কিছুই করার নেই। নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব মনে হচ্ছিল তার। সে এখন কি করবে? কলকাতা থেকে চার বন্ধু যে কারণে পালিয়ে এসেছিল তার একটা সার্থক রূপ এখানে দিতে পেরেছে। এবং এই গ্রামের অনুকরণ শুরু হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। অথচ তিনজন আজ তার পাশে নেই। কল্যাণ অবশ্যই শহীদ। জয়িতা? জয়িতাকে সে আজও বুঝতে পারল না। আর সুদীপ যে এভাবে পালিয়ে যাবে তাও তো কল্পনায় ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে একা দাঁড়িয়ে আছে সে, কোন সৈন্য তার সঙ্গে নেই। না, কোন অবস্থায় সে আর ফিরে যেতে পারবে না। ফেরা মানেই আত্মহত্যা, যেটা তার রক্তে আছে।

এখন এই হালকা মিঠে রোদে দাঁড়িয়ে আনন্দর খুব ইচ্ছে করছিল জয়িতাকে দেখতে। কিন্তু আঁতুড়ঘর, যাকে এরা বলে সুদ্ধকেরিঘর তার চৌকাঠে পা রাখা পুরুষদের নিষেধ। মজার ব্যাপার হল জয়িতা এইসব ব্যাপারের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। গত দু'মাস ধরে ওর সঙ্গে বেশি কথাই বলা

যায়নি। সব সময় পাশাংকিত নরমিতরা ওকে সঙ্গ দিত। সেই চটপটে ঝকঝকে মেয়েটা ক্রমশ শ্লথ হয়ে গেল। শরীরের স্ফীত অংশ নিশ্চয়ই ওকে কষ্ট দিত কিন্তু এবার সে-সব কথা তার জানার উপায় ছিল না। জয়িতা যেন এখন এই গ্রামের মানুষের এবং ও সেটা খুব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। সুদীপের মত তীব্র নয়, কিন্তু আনন্দর মনে হল জয়িতা তাদের থেকে অনেক পা এগিয়ে গিয়েছে। ঈর্ষাটা বুকে দুলছে কিন্তু সেটা বাধা হয়ে আছে। গত রাত্রে সুদীপের চলে যাওয়াটা পর্দা তোলার কাজ করেছে। সুদীপ বলেছে জয়িতা মারা যাবে। সুদীপ নিজেও বাঁচতে পারে না ওই পাহাড় রাত্রে ডিঙোতে গেলে। তাহলে রইল সে একা। চারজনেব শেষজন। অথচ তাকে গ্রামের মানুষ ভালবাসে। কিন্তু এখনও নিজের বলে মনে করে না। এরা ভেবেই রেখেছে সময় হলেই সে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। ফলে দূরত্ব ঘোচেনি।

ডুগু, ডুগু, ডুগু। জয়ঢাকের শব্দ হচ্ছিল একা একা, একটানা। এখন সেই শব্দের সঙ্গে আরও শব্দ মিলল। পাহাড়ে পাহাড়ে যেন শব্দের পিচকারি ছুটছে। আনন্দ আবও কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপরেই দৃশ্যটা নজরে এল। পাশেব গ্রামের একদল মানুষ ঢাকজাতীয় বাদ্য বাজাতে বাজাতে পাহাড় থেকে নামছে। ওপাশেও আর একটা দল মিছিল করে নামছে এই গ্রামের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটা দলের সঙ্গে উৎসবের বাজনা বাজছে।

সুদকেরিঘরের সামনে যে বিশাল চাতালটা সেখানে কোন নরম বরফ নেই। গ্রামের মানুষেব আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সুদকেরিঘরে ঢুকতে হলে দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সেখানে গ্রামের মেয়েদের ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। আনন্দকে দেখতে পেয়ে পালদেম এগিয়ে এল, 'কাল রাত্রেই ব্যথা শুরু হয়েছে কিন্তু বাচ্চাটা কখন বেরিয়ে আসবে মাইলিআমারা এখনও বলতে পারছে না। খুব কষ্ট পাচ্ছে দ্রিমিত। যে বাচ্চা মাকে বেশি কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতে আসে সে চিরদিন সুখী করে রাখে।'

[illegible] কথা বলছে যেন ওর বাড়িতেই সন্তান আসছে। পালদেম আবার বলল, 'আজ দেখছি গ্রামটা [illegible] আমাদের এখানে আসত না তারাও আসছে।'

'কেন?' প্রশ্নটা আচমকা বেরিয়ে এল আনন্দর ঠোঁট থেকে।

'বাঃ! সবাই জয়ঢাকের শব্দ শুনতে পেয়েছে যে!'

'ওই শব্দের মানে কি?'

'মানে হল আমাদের গ্রামে ভগবানের সন্তান আসছেন। এই শব্দ সমস্ত আবহাওয়াকে পবিত্র করুক। সমস্ত দানো দূরে থাক। যে যেখানে থেকে এই শব্দ শুনছে তারই ইচ্ছে হবে এখানে উপস্থিত হবার।' পালদেম হাসল।

ওর পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ বলল, 'তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছ গত দশ চাঁদের মধ্যে পাহাড়ের দানোটা আর আমাদের কান্না শোনায়নি। হে হেঁ বাবা, ওটাও ভয় পেয়েছে। বুড়ি মাইলিআমা বলছিল দ্রিমিতের শরীরে এমন সব চিহ্ন দেখেছে যা সে আগে দ্যাখেনি।'

ভিড় জমছিল ওদের ঘিরে। একজন কৌতূহলী হল, 'কি চিহ্ন বাউ?'

'নাভি থেকে সোজা একটা নীল রেখা নিচে নেমে গেছে। একটুও আঁকাবাঁকা হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলায় বিস্ময়ধ্বনি উঠল। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আনন্দর কাঁধ ধরল, 'সাথী, আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমরা তিনজন ছেলে ছিলে, কিন্তু তোমার মন সবচেয়ে ভাল। আমরা খেতে পেতাম না, কিভাবে বাঁচতে হয় জানতাম না। তোমরা নতুন জীবন দিলে। কিন্তু প্রায়ই মনে হত তোমরা চলে গেলে কি হবে? একদিন আমি মরে যাব, পালদেম লা-ছিরিঙরা থাকবে না পৃথিবীতে, তখন আমাদেব রক্ত শরীরে নিয়ে যারা বাঁচবে তাদেব কি হবে? আজ আর কোন চিন্তা নেই। আমাদের আর তোমাদের রক্ত শরীরে নিয়ে যে আসছে সে তো থেকে যাবে তার সন্তানদের মধ্যে। তাদের মধ্যে তোমরা থাকবে, আমরাও।'

এই সময় কাঙন নেমে আসছিলেন মন্দির থেকে, পেছনে তাঁর শিষ্যরা। সবার নজর গেল সেদিকে। আনন্দর মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছিল। না জেনে একি কথা বলল বৃদ্ধ! আমরা এখন এই একুশ

শতাব্দীর শুরুতেও যখনই কিছু চিন্তা করি সেটা আবর্তিত হয় নিজেকে কেন্দ্র করে। হয়তো বিস্তৃত হয়ে তা সমাজ এবং শেষতক দেশে গিয়ে পৌঁছায়। পরবর্তী প্রজন্মের কথা কেউ চিন্তা করি না। আগামীকালের নবজাতকের জন্যে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে যাওয়ার শপথ নিয়েছিলেন এক তরুণ কবি, কিন্তু তাঁর আবেদন কারও কানে পৌঁছায়নি। অথচ এই পাহাড়ি গ্রামের সরল বৃদ্ধ অকপটে বলতে পারল আসল সত্যিটা। যতই বিপ্লব করি না কেন, পরবর্তী প্রজন্মের ভিত সুদৃঢ় না করতে পারলে সেসবই এক সময় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

আনন্দ ধীরে ধীরে মন্দিরের চাতালে গিয়ে দাঁড়াল। এত মানুষ এতদিন ছিল কোথায়? ছোট ছোট দলে পাহাড় ফুঁড়ে এরা নেমে আসছে তাপল্যাঙে। গ্রামে ঢুকে এরা অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। হয়তো নিজেদের গ্রামের সঙ্গে তাপল্যাঙকে মিলিয়ে নিতে পারছে না। বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সঙ্গে শব্দ মিশে আরও গম্ভীর আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। সবাই জড়ো হচ্ছে সুদকেরিঘরের সামনে। ক্রমশ আনন্দ জয়িতাকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। এই এত মানুষ এসেছে দ্রিমিতের বাচ্চা হবে জেনে। দ্রিমিতের বাচ্চা মানে তাদের বাচ্চা। যে বড় হয়ে তাদের দেখাশোনা করবে। এত করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও ঠিক এই জায়গায় সে হেরে গেল জয়িতার কাছে। পুরুষ নতুন প্রজন্ম পালন করতে পারে, বীজ বপন করতে পারে, কিন্তু তাকে নির্মাণ করতে পারে না।

সেদিন এখানে, এই মন্দিরের চাতালে জয়িতা সেই সাহস দেখিয়েছিল। এমন কি সুদীপের মুখেও শব্দ ফোটেনি একটাও। সমস্ত গ্রাম জমায়েত হয়েছিল এখানে। নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে কাহুনও বসেছিলেন বিচারকের আসনে। জয়িতা খানিকটা তফাতে বসেছিল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। পালদেম কথা শুরু করেছিল প্রথমে, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে। দ্রিমিত বলছে তার কখনও বিয়ে হয়নি। ও নিজেকে এখন এই গ্রামের মানুষ বলে মনে করে। তাই আমাদের ওপর একটা দায়িত্ব এসে গেছে। আমরা জানি এই গ্রামের কোন কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্চা এলে সেই মায়ালুদের বিয়ে দিয়ে দিতে হয়। যদি যে দায়ী সে বিয়ে না করতে চায় তাহলে চরম শাস্তি দেওয়ার নিয়ম। দ্রিমিতের বেলায় আমরা জানি না তার প্রেমিক কে? সে এসেছে দুই বরফেরও আগে আমাদের গ্রামে। অতএব তার বাচ্চা এখানে আসার পরেই পেটে এসেছে। আমি দ্রিমিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু সে কোন জবাব দেয়নি।'

গুঞ্জন উঠল। আনন্দ লক্ষ্য করল সবকটা দৃষ্টি বারংবার তার এবং সুদীপের ওপর পড়ছে। কাহুন উঠলেন, 'দ্রিমিত বলুক তার বাচ্চার বাবা কে? সে যেই হোক তাকে বিয়ে করতে হবে। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ এই কাজ করে থাকে তাহলে তার নামও বলতে হবে।'

জয়িতা কোন উত্তর দিল না। যেন তার কানে কথা পৌঁচাচ্ছিল না। কাহুন এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'দ্রিমিত!'

জয়িতা মুখ ফেরাল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

কাহুন বললেন, 'তোমার সঙ্গে ওই যে দুজন এখানে এসেছে তারা কি বাচ্চার বাউ?'

জয়িতা আনন্দর দিকে তাকাল, তারপর সুদীপকে দেখল। জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। জয়িতা হাসল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, না। সঙ্গে সঙ্গে জনতা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে?

কাহুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বন্ধুরা যদি না হয় তাহলে ওটা তো আকাশ থেকে তৈরি হতে পারে না! তুমি কি বলতে চাও এই গ্রামের কেউ?'

জয়িতা বিড়বিড় করল, 'এই গ্রাম? তারপর মাথা নাড়ল, না।

উত্তেজনা এবার তুমুল হল। আনন্দর মনে হল জয়িতা অনাবশ্যক নাটক করছে। এই সময় পেছন থেকে এক বৃদ্ধের গলা ভেসে এল, 'আমি জানি, আমি দেখেছি।'

জনতা অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কাহুন নির্দেশ দিলেন লোকটাকে সামনে আনার জন্যে। মানুষটিকে দেখে সবাই অবাক। ও এই গ্রামে থাকে না। কাহুন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বলছ দেখেছ, কি দেখেছ?'

'একদিন বরফের সময়, ওরা আদর করছিল, আমি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওই যে যেখানে ঝরনাটা পাতালে ভেসে গেছে সেখানে।' লোকটা হাত বাড়িয়ে দেখাল।

কাহুন বলল, 'তুমি দাঁড়াও। দ্রিমিত, নামটা আমরা তোমার মুখে শুনতে চাই।'

জয়িতা এবার মাথা নাড়ল, 'কি বলব ভাবছিলাম। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কারণ ভেবেছিলাম এখন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এই মানুষটি যখন এগিয়ে এল তখন সত্যি কথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। ওর নাম রোলেন।'

'রোলেন?' একসঙ্গে শব্দটা জনতার মুখ থেকে ছিটকে আকাশে উঠে গেল। তারপরেই সব চুপচাপ। যেন সমস্ত তাপল্যাঙ নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু তখনই সুদীপের চিৎকার শোনা গেল; 'আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যে কথা বলছে ও। তুই আমাদের বোকা বানাতে চাইছিস জয়িতা?'

জয়িতা হাসল নিঃশব্দে। তারপর বলল, 'আমার নাম দ্রিমিত।'

কাহুন গলা তুললেন, 'সাথী, তুমি আমাদের ভাষায় কথা বল। তুমি কি বলতে চাইছ?'

সুদীপ ভাষা পালটে ব্যক্ত করতেই জয়িতা মাথা নাড়ল, 'তোর বিশ্বাসের পরিধিটা বড্ড ছোট্ট।'

সুদীপ বলল, 'রোলেন মরে গেছে। একটা মৃত মানুষের নামে দোষ চাপিয়ে তুই কাউকে আড়ালে রাখতে চাইছিস জয়িতা!'

জয়িতা কাহুনের দিকে ফিরল, 'এইজন্যেই আমি নাম বলতে চাইনি। আমি জানতাম আর কেউ না করুক আমার শিক্ষিত বন্ধুরাই প্রথমে অবিশ্বাস করবে।'

কাহুন মাথা নাড়লেন। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি দেখেছিলে? কার সঙ্গে ওকে দেখেছিলে?'

বৃদ্ধ গালে হাত দিল, 'এ নিয়ে তোমরা এত বিচলিত হচ্ছ কেন? পুরুষ এবং নারীর মন আর শরীর যদি একসঙ্গে সাড়া দেয় সেটা তো আনন্দের কথা।'

পালদেম চিৎকার করল, 'আঃ, তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাই বল।'

বৃদ্ধ বলল, 'ওই তো বললাম। ওই যে ঝরনাটা যেখানে আড়ালে নেমে গেছে সেখানে ওরা ছিল বরফের সময়ে।'

পালদেম বলল, 'কাহুন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কি দেখেছ, কাকে দেখেছ?'

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা যেন কল্পনা করে নিল, 'আমি যাচ্ছিলাম সাদা ফুল খুঁজতে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক নিচে নেমে গেছি। এমন সময় শব্দ শুনলাম। ভয় হল হয়তো ভালু উঠে আসছে খাদ থেকে। পা টিপে টিপে এগোতেই দেখি দ্রিমিতকে চুমু খাচ্ছে রোলেন। তখন ওদের আশেপাশে কেউ নেই শুধু আকাশ আর বরফ ছাড়া।'

পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

বৃদ্ধ বলল, 'তারপর ওরা অনেক গল্প করল। অনেক আদর। তারপর, হ্যাঁ, তোমরা শুনতে চাইছ তাই হবে ভেবেছিলাম, হল না। ওদুটোই পাগল, নইলে ওসব করার পর দ্রিমিত রোলেনকে কি বোঝায় কিভাবে গ্রামের মানুষের উপকার করতে হবে?'

পালদেম শুধাল, 'কিন্তু রোলেনই যে বাবা তার প্রমাণ কি?'

বৃদ্ধ হাসল, 'রোলেন আমাকে বলেছে। আমি যখন পরে তাকে একা ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কি রকম পুরুষমানুষ, গ্রামের মেয়েদের মনে ধরল না আবার বিদেশী মেয়ে পেয়ে শুধু চুমু খাওয়ার বাইরে কিছু করতে পারে না তখন সে বলেছিল, 'বাউ, একটা মেয়ের সঙ্গে শোওয়া নিশ্চয়ই আরামের কিন্তু দ্রিমিতের সঙ্গে শোওয়ার পর দেখেছি সেটাই সব নয়।'

এবার জনতার গুঞ্জন শুরু হল। জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল, 'সরি সুদীপ, আমি জানি না তুই কেন আঘাত পাচ্ছিস। কিন্তু আমি রোলেনকে ভালবেসেছিলাম। হি ওয়াজ এ রিয়েল ম্যান। আমি কোন অন্যায় করিনি। বরং আমি মনে করি এই পাহাড়ের সঙ্গে এতদিন আছি, এদের সঙ্গে মিশে যেতে যখন পারছি তখন এদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান শক্তিশালী পুরুষটির সন্তান শরীরে নেওয়া আমার কর্তব্য ছিল।'

স্পষ্টত দুটো ভাগ হয়ে গেল তাপল্যাঙের মানুষরা। একদল বলল, যদি কেউ রাজী হয় তার সঙ্গে দ্রিমিতের বিয়ে দেওয়া। নবজাতক একটি পিতৃপরিচয় পাবে। দ্বিতীয় দল বলল, এসবের কোন দরকার নেই। রোলেন মারা গিয়েছে। রোলেনের সন্তান নিশ্চয়ই তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির

অধিকারী হবে। সেক্ষেত্রে নতুন করে বিয়ে নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তখন সভা স্থগিত হয়েছিল। আনন্দ নির্বাক ছিল। এতদিন ধরে নিরন্তর পরিশ্রমে যে আদর্শ সমাজব্যবস্থা তারা তৈরি করতে চেয়েছিল সেটা মূলত ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঠামো অনুসরণ। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যেসে তৈরি মানসিক গঠন এত সহজে পরিবর্তিত হয় না। হলে জয়িতাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘটত না। তাছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক আইনকে সে স্পর্শ করতে চায়নি। সুদীপের মত কোন হঠকারী মন্তব্য করার চেয়ে সে ধৈর্য ধরতে চাইল। সমস্যার সমাধান কিভাবে হয় সেটা জানার পর বোঝা যাবে এতকাল ঘি ভস্মে ঢালা হয়েছে কিনা। সে লক্ষ্য করল, গ্রামের মেয়েরা কিন্তু জয়িতার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। দু'তিনজন সবসময় ওর সঙ্গে লেগেই আছে।

দুপুরে আর একটি ঘটনা ঘটল। সেই বৃদ্ধ গ্রামে ফিরে খবর দেওয়ার পর রোলেনের গ্রাম থেকে দশজন মানুষ এখানে উপস্থিত হল। তারা বলল যেহেতু দ্রিমিতের শরীরে রোলেনের সন্তান আসছে, যা এতদিন ওরা কানাঘুষায় শুনে এসেছিল, এখন সভার মাঝে ব্যক্ত হওয়ায় আর কোন ধন্দ নেই—তাই ওরা দ্রিমিতকে সসম্মানে গ্রহণ করতে চায়। তাদের গ্রামের মানুষদেব জন্যে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল বলে রোলেন নিহত হয়েছে কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন আজ প্রত্যেকের চোখে তখন দ্রিমিতকে তাদের মধ্যে দরকার।

কথাটা শোনামাত্র তাপল্যাঙের সাধারণ মানুষ আপত্তি জানাল। অসম্ভব। দ্রিমিত তাদের। প্রতি দিনের শোওয়া-বসা অভ্যেসে দ্রিমিত জড়িয়ে আছে। ওর পেটে বাচ্চা এসেছে বলেই রোলেনের গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে? শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কাহুন কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও সমাধান করতে পারছিলেন না। দু'পক্ষই সিদ্ধান্ত নিল দ্রিমিত যা চাইবে তাই হবে।

গ্রামের অধিকাংশ যুবকযুবতী চিৎকার করল, দ্রিমিত এখানেই থাকবে। জয়িতা উঠল, তারপর খুব বিনীত গলায় বলল, 'আমার দাজু, ভাই, বহিনী, আমা এবং সাথীরা। আজ সারাদিন তোমাদের খুব কষ্ট গেল। আমাকে নিয়ে তোমরা খুব অসুবিধেয় পড়লে।' জনতা নিশ্চুপ হল। জয়িতা আবার শুরু করল, 'এই গ্রামে আসার আগে আমি একটা শহরে ছিলাম। সেখানে কেউ আমাকে বলেনি তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমার বাবা মা নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসতেন কিন্তু আমি সেটা অনুভব করতে পারতাম না। অক্ষমতা আমারই। আমার বন্ধুরা আমাকে মেয়ে বলে ভাবত না। তাতে সুখী হতাম। এবং এসবের জন্যে কোন কষ্ট হত না। তোমাদের এখানে থেকে আমার মন পালটে গেল, শরীর বদলে গেল, নামও। তোমরা যদি আমায় ভাল না বাসতে তাহলে আমিও এভাবে বদলে যেতাম না। রোলেনকে আমি আমার লোকনে ভাবি। এই জন্যে আমি গর্বিত। আমাদের সাহায্য ছাড়াই রোলেন তাদের জীবন বদলাতে চেয়েছিল। তোমরা যারা ওব গ্রাম থেকে এসেছ তারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ তোমরা রোলেনের অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নিয়েছ। তোমরা যা করেছ নিজেদের জোরেই করেছ। আর আমার কাছে পাহাড়ের যে কোন কষ্ট পাওয়া মানুষের চেহারাই একরকম। আমরা যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন পালদেমরা আমাদের বাঁচিয়েছিল। পুলিশ যখন ধরতে এসেছিল তখন তোমরা আমাদের রক্ষা করেছ। এতদিন আমরা তোমাদের সাথী ছিলাম, এখন আত্মীয়। কারণ তোমাদের একজনের সন্তান আমার শরীরে। আমার কাছে দুটো গ্রামের মানুষের কোন প্রভেদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ রোলেনের সম্পত্তির ওপর আমার কোন লোভ নেই। তোমরা দুই গ্রামের মানুষ আশীর্বাদ কর যেন যে সন্তান আসছে সে যেন তোমাদের উত্তরাধিকারী হয়। এই তাপল্যাঙের মাটিতেই সে আসুক কারণ এখানেই আমরা আমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছি।'

আনন্দ মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে তাকাল। সুদকেরিঘরের সামনে কাহুন পৌঁছে গেছেন। তাঁর হাতে জপের মালা। শিষ্যরা দু'পাশে। সেদিন জয়িতার বক্তৃতা শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কলেজে কেউ কেউ ওকে ট্যাঁস বলত। কিন্তু সেদিন আনন্দর মনে হয়েছিল সে জয়িতাকে চিনতে পারেনি। বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র দুই গ্রামের মানুষ মিলিত স্বরে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। রোগুমিত, ইনামিত, পাশংকিতরা ওকে সযত্নে নিয়ে গিয়েছিল সভা থেকে।

আনন্দ ধীরে ধীরে নেমে এল। যে বৃদ্ধ একটু আগে কথা বলেছিল সে হাসল। তারপর বলল, 'প্রার্থনা

করো যেন ভগবান বাচ্চাটাকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে আনেন।'

আনন্দ বলল, 'প্রার্থনা?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমাদের মানুষ পৃথিবীতে আসছে, প্রার্থনা করবে না? তোমার ধর্মে কি প্রার্থনা করার রীতি নেই?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আছে।'

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। জয়ঢাক থেমে থেমে বাজছিল। হঠাৎ সুদকেরিঘরের দরজা খুলে একজন মাইলিআমা চিৎকার করে উঠল, 'আসল যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।' বলেই ফিরে গেল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে কাহুন দুটো হাত উপরে তুলে অদ্ভুত স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। আর সমস্ত পাহাড়ের মানুষ হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল সুদকেরিঘরের সামনে। প্রত্যেকের মাথা নিচু, ঠোঁট নড়ছে।

বিস্মিত হয়ে আনন্দ দৃশ্যটি দেখছিল। হাজার দুয়েক মানুষ বরফ উপেক্ষা করে হাঁটুগেড়ে কি প্রার্থনা করছে? সে মুখ ফেরাল। তুষারশৃঙ্গের ওপর সূর্যের আলো মাখামাখি। পৃথিবী তার পবিত্রতম হাসি হাসছে। সমস্ত চরাচর যেন উন্মুক্ত হয়ে আছে আগামীকালের মানুষের জন্যে। একমাত্র হিমালয়ের বাতাস ছাড়া কেউ শব্দ তুলছে না। হাঁটুগেড়ে বসে থাকা প্রতীক্ষারত মানুষদের ছবির মত মনে হচ্ছিল। আনন্দ মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। দুটো মূর্তি পাহাড় থেকে নেমে আসছে। একজন আর একজনকে অবলম্বন করেছে। কাছাকাছি আসতে সে সুদীপকে চিনতে পারল। সুদীপ বিধ্বস্ত, খোঁড়াচ্ছে। তার সঙ্গিনী তাকে সাহায্য না করলে হাঁটা অসম্ভব হত। আনন্দ নড়ল না। ওরা সামনে আসার পর সে দেখল সুদীপের শরীর এক রাত্রেই বীভৎস। চোখ তুলে সুদীপ তাকে দেখল। তারপর বলল, 'পারলাম না।' ওর গলার স্বর ভাঙা। মেয়েটা ইঙ্গিত করতে সুদীপ আরও একটু এগোল। তারপর বরফের ওপর বসে পড়ল। আনন্দ চুপচাপ।

সমস্ত পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে একটি কান্না বাজবে এই আকাঙ্ক্ষায় এখন মানুষেরা উদগ্রীব। একটি কান্না যা রক্ত এবং সংস্কৃতির ঋণ গ্রহণ করে আগামীকালকে শক্তিশালী করবে। সুদকেরিঘরে যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা তা টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ উন্মুখ সেই শব্দটি শোনার জন্যে। আনন্দ বড় বড় পা ফেলে দূরত্ব ঘোচাল। তারপর শেষতম মানুষটির পাশে হাঁটুগেড়ে বসে মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর, হৃদয় শান্ত হয়ে এল।

নবজাতকের সুতীব্র চিৎকার শোনা যাবে এখনই, যে কোন মুহূর্তে।

—সমাপ্ত—